বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের
লোকজ সংস্কৃতি
গ্রন্থমালা
কক্সবাজার

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

# বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

## কক্সবাজার

প্রধান সম্পাদক

**শামসুজ্জামান খান**

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

**মো. আলতাফ হোসেন**

সহযোগী সম্পাদক

**আমিনুর রহমান সুলতান**

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

**মুহম্মদ নূরুল ইসলাম**

সংগ্রাহক

**মুহাম্মদ মনির আলম**

**মোহাম্মদ ইব্রাহিম**

**মাস্টার শাহ্ আলম**

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
কক্সবাজার
প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫৩১২

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য : চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

---

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA COX'S BAZAR : (Present state of Folklore in Cox's Bazar District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Sonskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 450.00 only. US$ : 15

**ISBN-984-07-5321-5**

www.pathagar.com

# প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা

www.pathagar.com

আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী

www.pathagar.com

মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

## লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

**কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে**

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

**যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে**

**ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।
২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

**খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত**

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

## ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

**প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা**

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

www.pathagar.com

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item-যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধু পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক

www.pathagar.com

শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

## লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
## নির্দেশিকা

**সংজ্ঞা :** Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

**ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় :** Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

**১. নামকরণের ইতিহাস :** কাহিনি, কিংবদন্তি॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর॥ মৃত্তিকার ধরন॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি)॥ নারী-পুরুষের হার॥ তরুণ ও প্রবীণের হার॥ শিক্ষার হার॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয়॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি)॥ শিল্প-কারখানা॥ ব্যবসা-বাণিজ্য॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি)॥ খাদ্যাভ্যাস॥ পোশাক-পরিচ্ছদ॥ পেশাগত পরিচয়॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ)॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

**২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ :** আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই

www.pathagar.com

যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, আটপাড়া, নেত্রকোনা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

www.pathagar.com

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়ে হলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

**৩. উপাদানের বিন্যাস** : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

**৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

**৫. ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

**৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

www.pathagar.com

**মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :**

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম : বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

**মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না**

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

**প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)**

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

**দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)**

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

**তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)**

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

www.pathagar.com

**চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)**
ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

**পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)**
১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত),
২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়ে হলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

**ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)**
ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

**সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)**
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

**অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)**
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

**নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)**
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

**দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)**

**একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)**

**দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য**
১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

**ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)**

**চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)**
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান কক্সবাজার জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে কক্সবাজারের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

**শামসুজ্জামান খান**
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

# সূচিপত্র



www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# জেলা পরিচিতি

## ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

কক্সবাজার নামটি মাত্র ২১৫ বছর পূর্বের। অর্থাৎ ১৮০০ সালের শুরুতেই হয় এই নামকরণ। পূর্বে কক্সবাজার এলাকার একাধিক নাম ছিল বলে গবেষকদের অভিমত। এসব নামের মধ্যে ছিল পালংকি বা পলংকি বা ফালংকি বা ফলংজি, প্যাঁওয়া বা পেঁওয়া, পালোয়ানছি ও বাকোলী, অং শেং থা ম্রো। তবে পেঁওয়া নামটি বেশি প্রাচীন বলে অনেকেই মনে করেন। ১৭৮৪ সালের পরে আরাকান থেকে পালিয়ে আসা মগদের দেয়া নামই হচ্ছে প্যাঁওয়া। সে সুবাদে কক্সবাজারকে 'পেঁওয়া' বলা হতো বলে গবেষকদের ধারণা। প্যাঁওয়াকে স্থানীয় লোকজন বিকৃত করে 'প্যানোয়া' বা 'পানোয়া' বা 'পেনওয়া' বলে। কক্সবাজার জেলার অন্যতম উপজেলা রামুর প্রাচীন নাম 'পেঁওয়া প্রে'। বার্মিজ শব্দ 'পেঁওয়া প্রে'-র বাংলা অর্থ 'হলুদ ফুলের দেশ' বা 'হলুদ ফুলের রাজ্য'। বার্মিজ শব্দ 'পেঁওয়া' অর্থ 'হলুদ ফুল', আর 'প্রে' অর্থ 'দেশ' বা 'রাজ্য'। বর্তমানে কক্সবাজারের বিভিন্ন কাঁচাবাজারে এক প্রকারের শাক বিক্রি হয়। যাকে স্থানীয়ভাবে 'কলাপাতা' শাক বলা হয়। এই 'কলাপাতা' শাকটা দেখতে হলুদ (মশলা) উদ্ভিদের ন্যায়। এই কলাপাতা গাছে এক প্রকারের ফুল ফোটে, যা দেখতে হলুদ ফুলের মতো। কক্সবাজার, রামুসহ জেলার পাহাড়ি এলাকায় এরকম অজস্র কলাপাতা শাক জন্মায় এবং এসব গাছে হলুদ ফুলের ন্যায় সাদাসহ বিভিন্ন রঙের ফুল দেখা যায়। বার্মিজ ভাষাভাষী রাখাইনরা এসব ফুল দেখে পুরো এলাকাকে 'পেঁওয়া প্রে' আখ্যায়িত করেছে। প্রাচীনকালে বার্মিজ ভাষাভাষী রাখাইনদের বসবাস রামুতে বেশি ছিল বলেই শুধু রামুকেই 'পেঁওয়া প্রে' বলে মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে পুরো রামু-কক্সবাজারই 'পেঁওয়া প্রে' নামে চিহ্নিত হয়।

কক্সবাজারের বার্মিজ নামই 'ফালংক্যি' বা 'ফলংজি'। বার্মিজ শব্দ 'ফলং' অর্থ অফিসার বা সাহেব। আর 'জি' অর্থ বাজার। এভাবে 'ফলংজি' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় সাহেব-বাজার। স্থানীয় মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন 'কক্স' সাহেব প্রতিষ্ঠিত বাজারকে 'কক্সবাজার' নামে আখ্যায়িত করলেও রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন এই বাজারকে তাদের ভাষায় 'ফলংজি' নামে আখ্যায়িত করে এবং 'ফলংজি' নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। এ 'ফলংজি' শব্দের পূর্বে যদি 'কক্স' শব্দটি যুক্ত করে 'কক্স ফলংজি' বলা হতো, তাহলে নাম সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন হতো। 'কক্স-ফলংজি' অর্থ 'কক্স সাহেবের বাজার'। পরবর্তী সময়ে এই ফলংজি শব্দটি 'ফলংকি' হয়ে কালের বিবর্তনে 'পালংকি'তে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৭৮৪ সালে আভা'র রাজা বোধফ্রা বা বোধপায়া আরাকান দখল করে নিলে হাজার বছরের স্বাধীন আরাকানের সূর্য অস্ত যায় এবং সমগ্র স্বাধীন আরাকান দেশটি আভা'র আওতাধীন হয়ে যায়।

www.pathagar.com

কক্সবাজার জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com
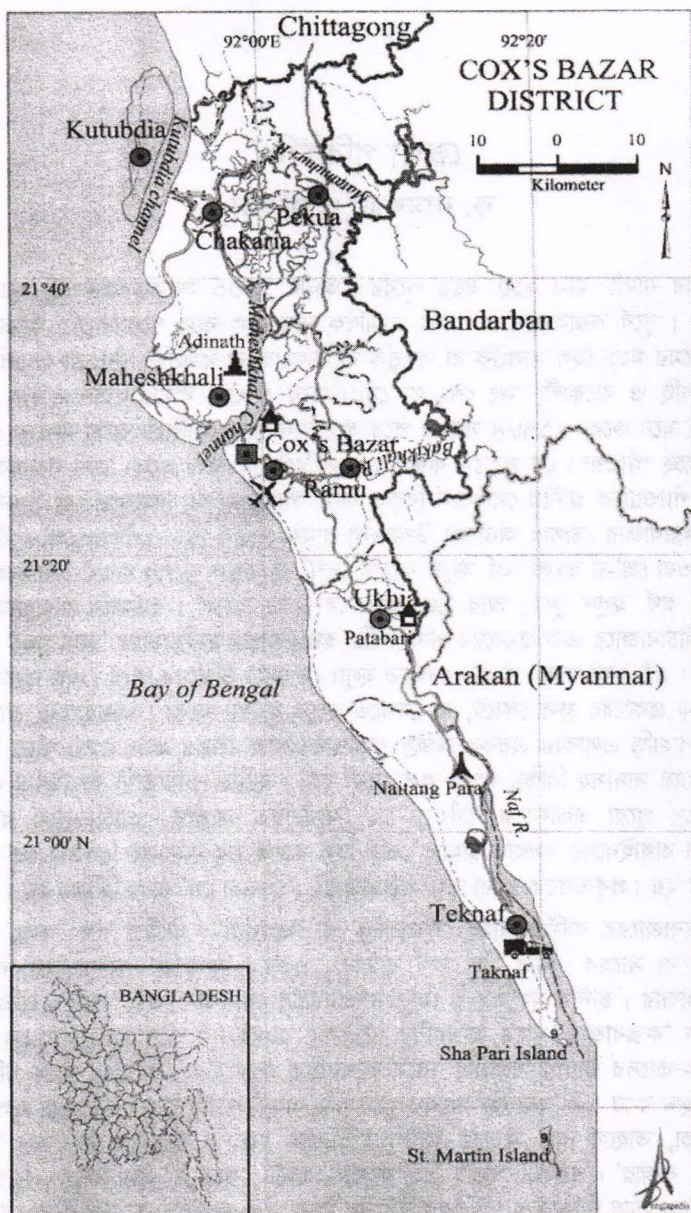
আরাকান দখল করেই আভা'র সেনাপতি মহাবান্দুলা আরাকানের জনগণের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাতো এবং ধরে নিয়ে মেইকাটিলা নামক স্থানে খননকাজে ব্যবহার করত। এছাড়া তারা অসংখ্য আরাকানিকে হত্যা করে। এসময় আতংকে আরাকানের হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লক্ষাধিক মানুষ নাফনদী অতিক্রম করে বর্তমান কক্সবাজার এলাকার নিরাপদ স্থানে চলে আসেন। এসব লোকজনকে পুনর্বাসনের জন্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সকে (Hiram Cox) নিয়োগ প্রদান করে। এসময় হিরাম কক্স পেগুর রাজধানী আভা'য় ব্রিটিশদের আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। ১৭৯৮ সালের ১২ জুন হিরাম কক্স আভা থেকে কলকাতা ফিরে আসেন। আরাকানি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব পাওয়ার পরে ১৭৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেন। কোম্পানি প্রতিনিধিরা পূর্বেই রামুতে অফিস স্থাপন করেন। হিরাম কক্সও রামুতে তাঁর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। সমুদ্র-উপকূলীয় পাহাড়ি এলাকা হিসেবে এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। হিরাম কক্স এ অঞ্চলে দায়িত্ব নিয়ে আসার পর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। ছয়মাস যেতে না যেতেই হিরাম কক্স মারা যান। আরাকানি শরণার্থীদের পুনবার্সন করার পরে বাঁকখালী নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় পাহাড়ের অগ্নমেধা ক্যাং-এর অদূরে সমতলভূমিতে হিরাম কক্স একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। হিরাম কক্স মারা যাওয়ার পর ঢাকার রেজিস্ট্রার মি. কার হিরাম কক্সের স্থলাভিষিক্ত হন। আর ইতোধ্যেই হিরাম কক্স প্রতিষ্ঠিত বাজারটি 'কক্স সাহেবের বাজার' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে মি. কারও বাজারের নাম 'কক্স সাহেবের বাজার' রেখে দেন। পরবর্তীকালে বাজারটি কক্স সাহেবের বাজার থেকে 'কক্সবাজার'-এ রূপ লাভ করে।

আবার কারো কারো মতে এই এলাকার নাম ছিল 'পালোয়ানছি'। বার্মিজ শব্দ 'পালোয়নছি' অর্থ নদীর মোহনা। সে অর্থে এ নামটি সঠিক বলে অনেকে মনে করেন। কেননা কক্সবাজার শহরের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে বাঁকখালি নদী। বাঁকখালি নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় কক্সবাজারের অবস্থান। তবে এই নামটি স্থায়ী রূপ নিতে পারেনি। এই পালোয়ানছি নামটি আরো প্রাচীন হওয়ার সম্ভাবনা। সম্ভবত নামটি পর্তুগিজ। পর্তুগিজ-মগ জলদস্যুদের আস্তানা ছিল বাঁকখালি নদীর মোহনা। এ সময়ের পূর্বে কক্সবাজার শহর ও আশপাশের এলাকায় বড় ধরনের বসতি থাকাও সম্ভব নয়, তাই সুনির্দিষ্টভাবে নামকরণ হবার কারণও নেই।

আবার কারো কারো মতে, কক্সবাজারের প্রাচীন নাম ছিল 'অং শেং থা ম্রো'। স্থানীয়ভাবে এই 'অং শেং থা ম্রো' শব্দটিকে 'অংকেচ্ছা' উচ্চারণ করা হয়। বার্মিজ শব্দ 'অং শেং থা ম্রো' অর্থ সমৃদ্ধিময় শান্তির নগর। অনেক রাখাইন গবেষক মনে করেন যে, "১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স 'অং শেং থা' গ্রামকে নতুন পর্যায়ে একটি উপনিবেশ করে তোলেন। ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স–এর আচার-আচরণ, ব্যবহার ও অবদানের কারণে ক্যাপ্টেন কক্স-এর মৃত্যুর পর এলাকাবাসী তাঁর সম্মানার্থে এলাকার আদি নাম 'অং শেং থা ম্রো' (শাব্দিক অর্থ সমৃদ্ধিময় শান্তির নগর) পরিত্যাগ করে ফালংশেই-ম্রো নামে নতুন নামকরণ করেন। রাখাইন ভাষায় 'ফালং' অর্থ অফিসার। কক্স সাহেবের নামেই পর্যটন নগরী কক্সবাজার-এর নামকরণ।"[১]

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে "১৭৯৯ সালে আরাকানি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়ে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এ অঞ্চলে আগমন করেন।"[২]

"ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ ঐতিহাসিক জো-আঁ-দ্যা-বেরস তাঁর মানচিত্রে এ অঞ্চলের নাম 'বাকোলিয়া' বলে উল্লেখ করেছেন। জো-আঁ-দ্যা-বেরস তাঁর অংকিত মানচিত্রে `I Bakolia' বা আইল্যান্ড বাকোলিয়া' উল্লেখ করেছেন। ১৫৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী নাবিক ছিদী আলী ছিলিবী তাঁর বর্ণনাতেও এ অঞ্চলকে 'I Bakolia' বলেই উল্লেখ করেছেন। ছিদী আলী ছিলিবী ইন্দোনেশিয়া উপকূল থেকে ভারত পর্যন্ত উপকূলের বর্ণনা দিতে গিয়ে এ অঞ্চলকে 'বাকোলিয়া' বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'বাকোলিয়া' নামকরণ থেকেই নদীর নাম 'বাঁকখালী' হয়েছে বলে অনেক গবেষকের ধারণা।"[৩]

১৯৮৪ সালের ১লা মার্চ কক্সবাজার মহকুমা জেলায় উন্নীত হয়। এ সময় সারা দেশের মহকুমা শহরকে একযোগে জেলা শহরে উন্নীত করা হয় (পটিয়া, রামগড় ও কাপ্তাই মহকুমা ছাড়া। পরবর্তী সময়ে এই তিনটি মহকুমাকে অবনমন করে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়)। ১৯৮৪ সালে ৭টি থানা নিয়ে কক্সবাজার জেলা গঠিত হয়। থানাগুলো হচ্ছে কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া, টেকনাফ, মহেশখালি, কুতুবদিয়া ও চকরিয়া। পরে ২০০২ সালের ৭ এপ্রিল চকরিয়া উপজেলা থেকে ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে 'পেকুয়া' নামের একটি পৃথক উপজেলা সৃষ্টি করা হয়। এ নিয়ে জেলায় উপজেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮টিতে। এছাড়াও কক্সবাজার, চকরিয়া, টেকনাফ ও মহেশখালি সদরকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে গঠিত হয়েছে পৃথক চারটি পৌরসভা।

"ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৫৪ সালে চট্টগ্রাম জেলার অধীনে কক্সবাজার মহকুমায় উন্নীত হয়। সে-দিক দিয়ে কক্সবাজার একটি প্রাচীন মহকুমা। সে সময় কক্সবাজার মহকুমার আওতায় থানা ছিল চারটি। এই চারটি থানা হচ্ছে কক্সবাজার, টেকনাফ, চকরিয়া ও মহেশখালি। পরবর্তী সময়ে কক্সবাজার থেকে রামু, টেকনাফ থানা থেকে উখিয়া এবং মহেশখালি থেকে কুতুবদিয়াকে পৃথক করে নতুন থানা সৃষ্টি করা হয়। এর মাধ্যমে থানার সংখ্যা হয় ৭টি। আর সর্বশেষ জেলাতে উপজেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮টিতে। পাক-ভারত উপ-মহাদেশের প্রাচীন মহকুমার ধারাবাহিকতায় ১৮৬৯ সালে কক্সবাজার শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয় 'কক্সবাজার মিউনিসিপ্যালিটি'। উক্ত টাউন কমিটি গঠন থেকে শুরু করে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি। ১৯২৭ সালেই সরকার এ ব্যবস্থাকে রদ করে টাউন কমিটিতে নির্বাচনের মাধ্যমে বা মনোনয়নের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অ্যাডভোকেট বিপিন বিহারি রক্ষিত কক্সবাজার পৌরসভার প্রথম বেসরকারি চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ মতে এটি মিউনিসিপ্যালিটি থেকে 'টাউন কমিটি'তে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে সরকার 'টাউন কমিটি' বিলুপ্ত করে 'পৌরসভায়' উন্নীত করে।"[৪]

১৮৬৯ সালে তৎকালীন মহকুমা সদরের ২.৬২ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে কক্সবাজার মিউনিসিপালিটি তথা টাউন তথা পৌরসভা গঠিত ছিল। সর্বশেষ ২০০৮ সালে ৩২.৯০

www.pathagar.com

বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে কক্সবাজার পৌর এলাকাকে সম্প্রসারিত করা হয়। পূর্বের পৌর এলাকায় ওয়ার্ড ছিল তিনটি। পরে উক্ত ৩টি ওয়ার্ডকে বিভক্ত করে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। বর্তমানে সম্প্রসারিত পৌরসভাকে ১২টি ওয়ার্ডে বিভাজন করা হয়েছে। আবার ১২টি ওয়ার্ডকে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য ৪টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে।

## খ. ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু

"কক্সবাজার বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত জেলা। জেলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে আন্তর্জাতিক নদী 'নাফ'। নাফ নদীর পূর্বে ও দক্ষিণে রয়েছে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের (যার পূর্বনাম ছিল বার্মা) আরাকান প্রদেশ। পূর্বে পার্বত্য বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি ও লামা উপজেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি ও লোহাগাড়া উপজেলা। জেলার অন্যতম প্রধান নদী বাঁকখালি ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটি 'কক্সবাজার' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত 'ক্যাডেস্টেল সার্ভে' বা 'সিএস জরিপ' নামে অভিহিত সার্ভেতে 'কক্সবাজার' নামে একটি মৌজা লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে সমগ্র মহকুমার নামকরণ করা হয় 'কক্সবাজার'। মূলত মহকুমা সদরের নামানুসারেই সমগ্র অঞ্চলের নাম কক্সবাজার হয়। ভৌগোলিকভাবে কক্সবাজার ২০.৩৫ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২১.৫৬ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৯১.৫০ পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৯২.২৩ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।"[৫]

বর্ষণের ফলে ক্রমে পাহাড়-পর্বত থেকে স্রোতবাহী পলি জমতে জমতে জেগে ওঠে চর, ডিয়া বা দিয়া বা দ্বীপ। এ কারণেই জেলায় সৃষ্টি হয়েছে বেশ কয়েকটি দ্বীপ। দ্বীপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মহেশখালি, কুতুবদিয়া, সেন্টমার্টিন বা নারিকেল জিনজিরা। এছাড়াও ছোটবড় আরো বেশকিছু দ্বীপ বা দিয়া রয়েছে। স্থানীয়ভাবে দ্বীপকে 'দিয়া' বা 'ডিয়া' বলা হয়। ফার্সি শব্দ ডিয়া বা দিয়া অর্থ দ্বীপ। জেলার বিভিন্ন নদ-নদী বা সাগরে জেগে উঠা দ্বীপগুলো ফার্সির প্রভাবে ডিয়া বা দিয়া নামে খ্যাত হয়েছে। এসব দিয়া বা ডিয়ার মধ্যে রয়েছে জইল্যারডিয়া, বিলাইরচরডিয়া, হউসেরডিয়া, তোতাডিয়া, শাহপড়ডিয়া (শাহপরীর দ্বীপ), সোনাদিয়া, জিনজিরা বা নারিকেল জিনজিরা (সেন্টমার্টিন), ছিরাদিয়া, মাতারবাড়ি-ধলঘাটা, কাউয়াড়ডিয়া, চরণদ্বীপ, রামপুর, করইয়ারদিয়া ইত্যাদি। মাতারবাড়ি-ধলঘাটা, সোনাদিয়া ও মহেশখালির সমন্বয়ে মহেশখালি উপজেলা গঠিত।

বঙ্গোপসাগরের ভাঙনের ফলে দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। বিশেষ করে দ্বীপের আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের তাবালেরচর গ্রাম, একই ইউনিয়নের জালিয়াপাড়ার বিশাল এলাকা সাগরে মিশে গেছে। টেকনাফ উপজেলার পশ্চিমে অবস্থিত বদর মোকাম ইতোমধ্যেই বঙ্গোপসাগরের ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে। এছাড়াও টেকনাফ উপজেলার শাহপরীর দ্বীপের ঘোলারচর,

www.pathagar.com

জালিয়াপাড়াতেও শুরু হয়েছে ব্যাপক ভাঙন। ফলে দ্রুত টেকনাফ উপজেলার আয়তন কমে যাচ্ছে। বিগত কয়েক দশক আগে শাহপরীর দ্বীপ একটি দ্বীপ হলেও এখন কিন্তু দ্বীপ নয়। সাবরাং থেকে শাহপরীর দ্বীপের মধ্যখানে একটি ছোট উপকূলীয় খাল ছিল। তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে উক্ত খালটি বন্ধ করার ফলে শাহপরীর দ্বীপ মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন বা নারিকেল জিনজিরা দেশের মূল-ভূখণ্ড টেকনাফ উপজেলার শাহপরীর দ্বীপ থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শুষ্ক মওসুমে সেন্টমার্টিন দ্বীপের সাথে স্টিমার সার্ভিস চালু হওয়ার ফলে পর্যটন শিল্পের নব দিগন্তের সূচনা হয়েছে।

এদিকে মহেশখালি উপজেলার ধলঘাটা দ্বীপটি বঙ্গোপসাগরের ভাঙনের ফলে সাগরে বিলীন হয়ে গেলেও দ্বীপের পশ্চিমে বিশাল চর জেগে উঠছে। শীত মওসুমে দ্বীপটি দৃশ্যমান হলে প্রচুর অতিথি-পাখি দেখা যায়। ভবিষ্যতে দ্বীপটি বসবাসের উপযোগী হলে জেলার আয়তন আরো বৃদ্ধি পাবে।

কক্সবাজারের আটটি উপজেলার মধ্যে দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া ছাড়া অবশিষ্ট সাতটি উপজেলা কিছু না কিছু টিলা, পাহাড় বা উঁচু ভূমির সমন্বয়ে গঠিত। বিচিত্র হচ্ছে মহেশখালি উপজেলা, দ্বীপ হলেও সেখানেও রয়েছে পাহাড়, টিলা এবং উঁচু ভূমির সমন্বয়। মহেশখালি উপজেলার আদিনাথ পাহাড় জেলার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাহাড়। সোনাদিয়া দ্বীপটি জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী বাঁকখালির পলিবিধৌত। বাঁকখালি নদী দিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে বয়ে নিয়ে আসা পলিতে সৃষ্টি হয়েছে সোনাদিয়া দ্বীপ। অপরদিকে মাতারবাড়ি-ধলঘাটা দ্বীপটি জেলার বৃহত্তম নদী মাতামুহুরি নদীর পলি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। "মহেশখালি উপজেলার অবশিষ্ট অংশটি বিশেষ করে আদিনাথ মন্দিরসহ গোরাকঘাটা থেকে শুরু করে কালারমারছড়া এলাকা কক্সবাজারের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল বলেই গবেষকদের অভিমত। ১৫৬৯ সালের পূর্বে মহেশখালি দ্বীপটি মূল ভূ-খণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল। ঐ বছর জেলায় প্রচণ্ড সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বা সুনামি আঘাত হানে। সেই সুনামিতে কতজন আদম সন্তানের প্রাণহানি হয়েছিল তার সঠিক তথ্য কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। তবে মহেশখালি সেই সুনামির ক্ষতচিহ্ন নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। মহেশখালি দ্বীপটি সেই সুনামির ফলে সৃষ্ট বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত। সিজার ফ্রেডরিক এ সময় সন্দ্বীপে ছিলেন। তাঁর বর্ণনা হতে এ তথ্য জানা যায়।"[৬] সে কারণে ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক ও লেখকেরা 'মহেশখালি'কে 'Mexal' নামে অভিহিত করেছেন।

"জেলার ৫০ ভাগের বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে পাহাড়, টিলা ও উঁচু ভূমি। হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণ দিকের সম্প্রসারিত আরাকান ইউমা পর্বতমালা জেলার পূর্ব ভাগের উপর দিয়ে গেছে। তাতে করে জেলায় পাহাড়ি অঞ্চল অত্যধিক বেশি। জেলার সবচেয়ে উঁচু চূড়া (পর্বতশৃঙ্গ) তুনঙানগা (Taunganga), সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৮৮০ ফুট উঁচু। এটি জেলার টেকনাফ উপজেলায় অবস্থিত। তাছাড়া রয়েছে চকরিয়া উপজেলার নাগাটং পাহাড়চূড়া, যার উচ্চতা ৫৪৫ ফুট, টেকনাফের নেটং পাহাড়ের উচ্চতা ৫৫১ ফুট এবং মহেশখালি উপজেলার গোমাইছড়ি ২৮৮ ফুট। জেলায় পাহাড়ের আধিক্য

www.pathagar.com

বলেই অসংখ্য ছোট-বড় নদ-নদী, খাল, ছড়া রয়েছে। এসব নদ-নদী, খাল, ছড়া পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বড় নদীর স্রোতের সাথে মিলিত হয়েছে। পরে নদী, খালগুলো মহেশখালি বা কুতুবদিয়া চ্যানেল হয়ে অথবা সরাসরি বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। খরস্রোতা নদীতে বালির প্রবাহের সাথে পাহাড়ি পলি মিশে উপকূলীয় এলাকায় গিয়ে তা কাদায় পরিণত হয়। যার ফলে উপকূলীয় এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট।"[৭]

"কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী কক্সবাজার জেলা খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি জেলা। বিগত কয়েক দশক পূর্বেও শুষ্ক মওসুমে ধানের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে আলু এবং সরিষা উৎপাদিত হতো। মাতামুহুরি, বাঁকখালি, ঈদগাঁওসহ ছোট-বড় নদ-নদী ও খাল-বিল রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেলার মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৯,৩৯৮ হেক্টর, মোট নিট ফসলি জমির পরিমাণ ৮৪,৩১২ হেক্টর, এক ফসলি জমির পরিমাণ ২০,৪৬৯ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ৪৯,৯০০ হেক্টর, তিন ফসলি জমির পরিমাণ ১৩,৯৪৩ হেক্টর এবং জেলায় মোট ফসলি জমির পরিমাণ হচ্ছে ১,৬৩,৯৩১ হেক্টর। জেলার উপকূলীয় ২৯,১৫০ হেক্টর জমিতের চিংড়ি চাষ করা হয়। সোনালি চিংড়ি রপ্তানি করে সরকার প্রতিবছর আয় করছে কয়েকশত কোটি টাকা। চিংড়ি খাত থেকে আয়ের পরিমাণ বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেলার মোট কৃষক-পরিবার ২,০৩,৪৬০টি। কক্সবাজার জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী জেলার মোট ভূমির পরিমাণ ২,৪৯,১৮৬ হেক্টর।"[৮]

**কৃষি জমিভিত্তিক তথ্য**

| জমির শ্রেণি বিভাগ | আয়তন (একরে) |
|---|---|
| জেলার মোট ভূমির পরিমাপ | ২,৪৯,১৮৬ হেক্টর |
| মোট চাষযোগ্য জমি | ৮৯,৩৯৮ হেক্টর |
| নিট ফসলি জমি | ৮৪,৩১২ হেক্টর |
| এক ফসলি জমি | ২০,৪৬৯ হেক্টর |
| দুই ফসলি জমি | ৪৯,৯০০ হেক্টর |
| তিন ফসলি জমি | ১৩,৯৪৩ হেক্টর |
| মোট ফসলি জমি | ১,৬৩,৯৩১ হেক্টর |
| ফসলের নিবিড়তা (%) | ১৯৪ |
| জমি ব্যবহারের নিবিড়তা (%) | ৯৫ |
| চিংড়ি চাষ এলাকা | ২৯,১৫০ হেক্টর |
| কৃষি পরিবারের সংখ্যা | ২,০৩,৪৬০টি |
| কৃষি ব্লকের সংখ্যা | ১৬৭ টি |

www.pathagar.com

**কৃষি-বিষয়ক তথ্য**

| বিবরণ | জেলার মোট |
|---|---|
| জলাভূমি | ৩৩,৪২০ হেক্টর |
| বনভূমি | ৯১,৯০২ হেক্টর |
| পাহাড়ি ভূমি | ৫৬,১৪৩ হেক্টর |
| উঁচু ভূমি | ১০,১৩৫ হেক্টর |
| মাঝারি উঁচু ভূমি | ৪২,৭০৭ হেক্টর |
| মাঝারি নিচু ভূমি | ৩১,৪৭০ হেক্টর |
| চাষযোগ্য পতিত জমি | ৫,০৮৬ হেক্টর |
| লবণাক্ত জমি | ২৮,০৮৭ হেক্টর |
| উপকূলীয় এলাকা | ২৭,৮৬০ হেক্টর |

**সেচ বিষয়ক তথ্য**

| বিবরণ | জেলার মোট |
|---|---|
| সেচভুক্ত জমি | ৭৪,১২৩ হেক্টর |
| সেচের হার (%) | ৬৫ |
| গভীর নলকূপের সংখ্যা | ২টি |
| অগভীর নলকূপের সংখ্যা | ৫,৬৪৫ হেক্টর |
| এলএলপি'র সংখ্যা | ৩,০০৪ টি |
| রাবার ড্যাম | ৭টি |

কক্সবাজার কর্কটক্রান্তিরেখার একটু উত্তরে অবস্থিত এবং বিষুবরেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে। তাই এখানকার আবহাওয়া প্রতিনিয়ত সমুদ্র থেকে নিয়ে আসছে নির্মল বায়ু।

বঙ্গোপসাগরের কারণে কক্সবাজারের আবহাওয়া দেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে ভিন্ন। বছরের ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম। আর এপ্রিল ও মে মাসে তাপমাত্রা থাকে সবচেয়ে বেশি। ১৮৮৮ সালে কক্সবাজারের ইতিহাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। আর তা ছিল ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট। বর্তমানে বার্ষিক তাপমাত্রার গড় ৭৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট। তবে এপ্রিল মাসে ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ও জানুয়ারিতে ৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। কক্সবাজার পাহাড়, টিলা ও উঁচু ভূমির সমন্বয়ে গঠিত বিধায় এখানে বৃষ্টিপাত একটু বেশি।

"১৫৬৯ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মহেশখালি মূল-ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৭৬২ সালে এক মারাত্মক ভূমিকম্প বৃহত্তর চট্টগ্রামের মানচিত্র বদলে

www.pathagar.com

দিয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। ১৭৯৫ সালের ৩রা জুন এক ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হেনেছিল। তার দু'বছর পরে ১৭৯৭ সালের নভেম্বর মাসে এক প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় হারিকেনের প্রচণ্ডতায় জেলার উপর আঘাত হেনেছিল। প্রায় একশত বছর পরে ১৮৭২ সালে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় জেলার টেকনাফ থেকে পেকুয়া পর্যন্ত লণ্ডভণ্ড করে ফেলে। ১৮৭৬ সালের ৩১ অক্টোবর আর এক মহাপ্রলয় জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এসময় সমগ্র কুতুবদিয়া দ্বীপ প্লাবিত হয়। এসময় কক্সবাজারে (তৎকালীন মহকুমায়) ১২ হাজার মানুষ নিহত হয়। ১৮৯৭ সালের ২৪ অক্টোবর জেলার উপর আঘাত হানে আরো এক মহাপ্রলয়, যা স্থানীয় প্রবীণদের কাছে ঊনষাট মঘীর (১২৫৯ মঘীর তুফান হিসেবে খ্যাত। মঘাব্দ এক সময় কক্সবাজারে প্রচলন ছিল। কক্সবাজার আরাকানের অধীন এলাকা হিসেবে এই মঘাব্দসহ অনেক আরাকানি টার্ম এখানে চালু ছিল। স্থানীয় জমির পরিমাপের এককও আরাকানি প্রথার নিদর্শন। ১৯৬০, ১৯৬৩ এবং ১৯৭০-এর প্রলয়ঙ্কর ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সর্বশেষ ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল জেলার উপর আঘাত হানে শতাব্দীর ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে কক্সবাজার জেলার প্রায় ৫০ হাজার মানুষ মারা যায়। সমুদ্র-উপকূলীয় এলাকা হিসেবে প্রতিবছর বর্ষা ও ঘূর্ণিঝড় মওসুমে (এপ্রিল-মে মাসে) কক্সবাজারে কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানবেই। সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড় ধ্বসে প্রাণহানি নতুন দুর্যোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।"[৯]

## গ. বনভূমি ও গাছপালা

প্রকৃতি অফুরন্ত সম্পদে ভরিয়ে রেখেছে কক্সবাজার জেলাকে। এ জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বনসম্পদ যুগ যুগ ধরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শুধু কক্সবাজার জেলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে নয়, সারা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কক্সবাজারের বনাঞ্চলের ভূমিকা রয়েছে। এ জেলার বনাঞ্চল থেকে যোগান দেয়া হচ্ছে জ্বালানি কাঠ ও বাঁশের স্থানীয় চাহিদা। কবে, কখন এবং কীভাবে এই বনাঞ্চল জন্ম নিয়েছে তার সঠিক কেনো ইতিহাস কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। তবে প্রাচীন গণ্ডোয়ানা মহাদেশ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে এই অঞ্চলে যে ভূখণ্ড জন্ম লাভ করে কক্সবাজারের বনাঞ্চল তারই ক্ষুদ্র এক অংশ। প্রকৃতি ধীরে ধীরে লতা, গুল্ম, ফলমূল, শাকসবজি, মূল্যবান বৃক্ষরাজি দিয়ে এই বনাঞ্চলকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এ বনাঞ্চলের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। কয়েক শতাব্দী পূর্বে কক্সবাজার জেলার বনাঞ্চলে কী পরিমাণ বনজদ্রব্য ছিল আমরা একটু পেছনে তাকালেই দেখতে পাই। প্রাচীনকালে সমগ্র জেলা ঘন বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বিশেষ করে চট্টগ্রামের শঙ্খ নদীর দক্ষিণ তীর থেকে দক্ষিণে নাফ নদী পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটি বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। প্রাচীনকালে জেলার বনাঞ্চলে সেগুন, সাদা গর্জন, লালি গর্জন, কালি গর্জন, বাটনা, জাম, কালাজাম, পুতিজাম, জামরুল, চাপালিশ, তেলশুর, চিকরাশি, বৈলাম, ভাদি, কদবেল, আমলকি, জলপাই, বত্তা, হরিতকি, চণ্ডুল, কামদেব,

www.pathagar.com

শিমুল, বট, মুচ, পিতরাজ, তেতুল, করই, শিল করই, হারপাড়া গোলা, ছাতিম, ভারালা, আম, উরি আম, জারুল, গামারি, কস্তুরি, হারগেজা, নাগেশ্বর, আরশল, চাউক্কা করইসহ শতাধিক প্রজাতির গাছ, বেত, বাঁশ, লতাগুল্মতে পূর্ণ ছিল। বিগত দুইশ' বছর আগেও কক্সবাজার জেলার বনাঞ্চলে কী পরিমাণ বৃক্ষরাজি ছিল তা এখন অনুমান করা অসম্ভব। এসব জঙ্গলে হিংস্র জন্তু থেকে শুরু করে সব ধরনের বন্যপ্রাণী বাস করত। বিশেষ করে বাঘ, ভালুক, শিয়াল, বাঘ-খাটাশ, বনবিড়াল, হাতি, সিংহ, নানা প্রজাতির হরিণ, গণ্ডার, রাম কুকুর, গয়াল, বন্য মহিষ, শূকর, খরগোশসহ বিভিন্ন প্রজাতির বন্য প্রাণী বনাঞ্চলে ব্যাপকভাবে দেখা যেত। বনাঞ্চল উজাড় হওয়ার সাথে সাথে বন্য প্রাণীর সংখ্যা কমতে থাকে। বিগত ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকেও কক্সবাজার জেলার বনাঞ্চলে বাঘ, ভালুক, হাতিসহ নানা প্রজাতির হিংস্র বন্যপ্রাণী দেখা যেত। বন্যহাতির পাল ছিল বর্তমান দেশীয় গৃহপালিত গরুর পালের ন্যায়। *'যখন পুলিশ ছিলাম'* গ্রন্থের লেখক শ্রী ধীরাজ ভট্টাচার্যের বর্ণনায় জানা যায়, জেলার বনাঞ্চলে হিংস্র বন্যপ্রাণীর কথা। উক্ত গ্রন্থে তিনি হাতির পাল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন "... বিভীষণ বাচ্চা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। আবার কী হলো? অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলাম আবার কি কেউ খাদে পড়ে গেল? না। সবাই তো দাঁড়িয়ে আছে। মজিদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, কেননা, দাদা কানা, ছোট ভাই চোখে দেখে না'র মতো, তিনি আমার চেয়ে আনাড়ী। পঞ্চুকে জিজ্ঞাসা করলাম। পঞ্চুর কথা শুনে ভয়ে আমার আর মজিদ সাহেবের হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে যায় আর কি। শুনলাম একপাল বুনো হাতি এই পথ বেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এখন উপায়?"

এছাড়াও ধীরাজ ভট্টাচার্য বাঘ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এভাবে, "দলের সবচেয়ে বিজ্ঞ মগ ইশারা করে সবাইকে চুপ করতে বলে দিলো। কাঠের পুতুলের মতো সেই সরু রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছি এক মিনিট দুই মিনিট তিন মিনিট। হঠাৎ মজিদ সাহেবকে জড়িয়ে ধরলাম। বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করতে লাগলো। স্পষ্ট শুনতে পেলাম কাছে খুব কাছে রুদ্ধ আক্রোশে ফুসে উঠে ডাকছে একটা বাঘ। প্রথমটা আস্তে তারপর ক্রমশ বাড়তে লাগলো গর্জন। হঠাৎ একেবারে কাছে শুনলাম আর একটা বিকট আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে দাগুলো মাটিতে রেখে মগ কনস্টেবলের দল এক হাতে মশালটা উঁচু করে নাড়ছে অপর হাতের আঙ্গুলগুলো মুড়ে মুখের কাছে এনে সবাই এক সঙ্গে বিকট বীভৎস আওয়াজ করতে শুরু করেছে।"[১০] (ধীরাজ ভট্টাচার্য ১৯৩২-৩৬ সালের মধ্যে কক্সবাজারের সীমান্তবর্তী থানা টেকনাফে দারোগা হিসেবে কর্মরত ছিলেন)।

১৯০৩ সালে চকরিয়া সুন্দরবন বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণার মাধ্যমে এই অঞ্চলে বন ব্যবস্থাপনা শুরু হয়। ১৯২০ সাল পর্যন্ত কক্সবাজার জেলার বনভূমি চট্টগ্রাম বনবিভাগের সাথে যুক্ত ছিল। ১৯২০ সালে কক্সবাজারের বনাঞ্চল নিয়ে কক্সবাজার বনবিভাগের সৃষ্টি হয়। ১৯৩৩ সালে কক্সবাজার বনবিভাগকে বিলুপ্ত করে পুনরায় এই বনাঞ্চলকে চট্টগ্রাম বনবিভাগের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। দেশ বিভাগের পর ১৯৫১ সালে পুনরায় কক্সবাজার বনবিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এসময়

www.pathagar.com

বর্তমান বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার পুরো বনাঞ্চল কক্সবাজার বনবিভাগের আওতাধীন করা হয়। তখন কক্সবাজার বনবিভাগের আয়তন ছিল অনেক বেশি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরে বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বনাঞ্চলকে কক্সবাজার বনবিভাগের আওতা থেকে পৃথক করে 'লামা বনবিভাগ' নামের একটি নতুন বনবিভাগ সৃষ্টি করা হয়। চলতি শতকের শুরুর দিকে কক্সবাজার বনবিভাগকে পৃথক করে 'কক্সবাজার উত্তর' ও 'কক্সবাজার দক্ষিণ' বনবিভাগ নামে দু'টি বনবিভাগ সৃষ্টি করা হয়। কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ বনবিভাগে মোট বনভূমির পরিমাণ হচ্ছে ৭৮,৬৭১.৭৬ হেক্টর। তৎমধ্যে ৬৫,৩৬৪.৭৬ হেক্টর সংরক্ষিত ও ১৩,৩০৭.০০ হেক্টর রক্ষিত বন। কক্সবাজার জেলার আওতাধীন পেকুয়া ও চকরিয়া উপজেলার বারবাকিয়া বনবিট, টৈটং বনবিট, পহরচাদা বনবিট, হারবাং বনবিট ও বরইতলি বনবিটের আওতাধীন বনাঞ্চল চট্টগ্রাম দক্ষিণ বনবিভাগের আওতাধীন রয়েছে। ১৯২০ সালে কক্সবাজার বনবিভাগ সৃষ্টির পর থেকেই উক্ত বনবিটগুলো চট্টগ্রাম বনবিভাগের আওতাধীন রয়েছে। তা কোনো কালেই কক্সবাজার বনবিভাগের আওতায় আসেনি। উক্ত বনবিটসমূহে বনভূমির পরিমাণ হচ্ছে ১৬,০০৭.১ হেক্টর। উক্ত বনভূমি যেহেতু কক্সবাজার প্রশাসনিক জেলার আওতাধীন সে কারণেই উক্ত বনভূমিসহ কক্সবাজার জেলার আওতাধীন বনভূমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯১,৮১৯.১ হেক্টর। তৎমধ্যে ৭৪,২৯৯.১২ হেক্টর সংরক্ষিত ও ১৭,৫১৯.৯৮ হেক্টর রক্ষিত বনভূমি।"[১১]

**রেঞ্জ ভিত্তিক বনাঞ্চলের পরিমাণ (হেক্টরে)**

| রেঞ্জ | সংরক্ষিত বন | রক্ষিত বন | মোট (হেক্টরে) |
|---|---|---|---|
| ফাঁসিয়াখালি রেঞ্জ | ৪,৮২৮.৬১ | ৮০৩.৯৯ | ৫,৬৩২.৬০ |
| ফুলছড়ি রেঞ্জ | ৩,৫০৫.৬৭ | ৬৭.৯৯ | ৩,৫৭৩.৬৬ |
| ঈদগাঁও রেঞ্জ | ১,৮৯৮.৩৭ | ৬১১.৩৩ | ২,৫০৯.৭০ |
| ইদগড় রেঞ্জ | ২,০৪৩.৩০ | ৬৪৭.১৪ | ২,৬৯০.৪৪ |
| মেহেরঘোনা রেঞ্জ | ২,৬১২.১৪ | ১৬৯.১১ | ২,৭৮১.২৫ |
| জোয়ারিয়ানালা রেঞ্জ | ২,৫২৪.০৮ | ১৫৮.৬৫ | ২,৬৮২.৭৩ |
| বাঘখালি রেঞ্জ | ৪,২৮২.১৮ | ১,২৮৬.৪২ | ৫,৫৬৮.৬০ |
| পিএম খালি রেঞ্জ | - | ১,০৩০.৬৪ | ১,০৩০.৬৪ |
| চকরিয়া সুন্দরবন রেঞ্জ | ৭,৪৮৯.৮৮ | ১,০২০.৯০ | ৮,৫১০.২৮ |
| কক্সবাজার সদর রেঞ্জ | ২,৪২১.০৮৪ | ৮৭৬.৬৭২ | ৩,২৯৭.৭৫৬ |
| পানেরছড়া রেঞ্জ | ১,২৯৫.৩১৬ | ৮২৪.৫৭২ | ২,১১৬.৮৮৮ |
| ধোয়াপালং রেঞ্জ | ১,৬৮১.৩২ | ৭৬০.৬৩৬ | ২,৪৪১.৯৫৬ |
| রাজারকুল রেঞ্জ | ২,৩৯৫.৪২৪ | ২,১৭৬.৭২৪ | ৪,৫৭৩.৯৪৮ |

www.pathagar.com

| উখিয়া রেঞ্জ | ৬,৭২৩.২০ | ১,৮৪২.৮২৪ | ৮,৫৬৬.০২৪ |
|---|---|---|---|
| ইনানী রেঞ্জ | ৭,৬৭৬.৪০ | ৪২৮.০১২ | ৮,১০৪.৪১২ |
| টেকনাফ রেঞ্জ | ৫,৯৪২.৯০৮ | ৫৬৯.২৪৪ | ৬,৫১২.১৫২ |
| শীলখালি রেঞ্জ | ২,৯২০.৭৯২ | ২১.৯৪ | ২,৯৪২.৮৬ |
| হোয়াইক্ষ্যং রেঞ্জ | ৫,১২৪.০৫২ | ১০.৭৩৬ | ৫,১৩৪.৭৮৮ |
| চুনতি রেঞ্জ (চট্টগ্রাম) | ১১,৯৬১.০২ | ৪,০৪৬.৯৮ | ১৬,০০৭.১ |
| সর্বমোট বনভূমি | ৭৭,৩২৫.৭৬৮ | ১৭,৩৫৩.৯৮ | ৯৪,৬৭৮.৮৬৬ |

বন্যহাতিসহ বন্যপ্রাণীর পরিমাণ উপরে টেকনাফের দারোগা ধীরাজ ভট্টাচার্য-এর বিবরণ থেকেই জানতে পারি। বিশেষ করে বন্যহাতির উপদ্রবে একসময় জেলার পাহাড়ি এলাকার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বন্যহাতির পায়ের তলায় কত নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। বন্যহাতি মাঝে মাঝে লোকালয়ে হানা দিয়ে বসত-বাড়ি ধ্বংস করত। মাঠের রোপা ধানের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করত। এ অবস্থা থেকে জনজীবনকে মুক্ত করার জন্য সরকারের বনবিভাগ হাতি ধরার ব্যবস্থা করে। খেদা (Kheda) নামক ফাঁদ ব্যবস্থা দিয়ে বন্যহাতিকে ধরার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে জেলায় খেদা দিয়ে কিছু সংখ্যক হাতি ধরা হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি এই শুষ্ক মৌসুমে জেলার উখিয়া ও গর্জনিয়ায় খেদা দিয়ে হাতি ধরা হয়। খেদা দিয়ে হাতি ধরে তা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রি করা হতো। প্রাচীনকালে কক্সবাজারের গর্জনিয়ার পাহাড়, ডুলাহাজারা, খুটাখালির ছড়ার প্রান্তভাগে খেদা দিয়ে হাতি ধরার বিবরণ জানা যায়। আশুতোষ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে এঅঞ্চলের পালা সংগ্রহ করতে এসে ১৯২৫ সালে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার চাকমারকুল থেকে হাতি ধরার পালা সংগ্রহ করেন। আশুতোষ চৌধুরীর 'হাতী খেদার গান' গ্রন্থে ১৮২১-১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে কক্সবাজারের জঙ্গল থেকে হাতি ধরার কথা জানা যায়। তিনি তাঁর বর্ণনায় লিখেছেন, "১৮২১-১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম হইতে একদল লোক রামুর পাহাড়ে হাতীখেদা দিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সেখানকার মগেরা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া অর্থ আদায়ের চেষ্টা করে। ইহাতে চট্টগ্রামের তদানীন্তন ইংরেজ শাসনকর্তা নাফ নদীর তীরে একদল ফৌজ প্রেরণ করেন। বাস্তবিক পক্ষে এই ঘটনাটিকেও তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে।"[১২]

আশুতোষ চৌধুরীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, "চট্টগ্রাম কেন, এই পূর্বভারতীয় হাতীখেদার ইতিহাসে গোলবদনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। ৭০ কি ৮০ বৎসর পূর্বে এই গোলবদন জমাদার গর্জনিয়ার পাহাড়ে হাতী খেদা দিয়াছিলেন। ইহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা আমরা পাইয়াছি।

"কাগবাজারের বহুৎ পুগে বাগখালির আগাৎ
অঘোর জঙ্গল আছে সেই ত জাগাৎ।
এমন গর্জন গাছ ছুঁইয়াছে আচ্‌মান।

www.pathagar.com

তার বেড় ঘুড়িতে মাইন্‌সের লাগে এক মাধান।
জারৈল গাম্বারী আর গল্লাক বেতর বন।
সেই জাগার খেদার কিছু কহি বিবরণ।

নুনা ছড়া আছে এক নুনা নুনা পানি।
পৌষ মাসে হাতী আসে সেই খালের উজানি॥
আর এক খাল আছে মিডাছড়া নাম।
ডাবর মতন মিষ্টা পানি নামর মতন কাম॥
ইহার দক্ষিণে আছে রোসাঙ্গার দেশ।
ভিন্‌চার লাগৎ পাইলে ছুরি মারি শেষ॥
মগে আর বাঘে জাইন্য এক্কই বরাবর।
বেঁকা ছুরি হাতৎ লৈলে তারারে ডর॥"[১৩]

বর্তমানেও জেলার বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় বন্যহাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে প্রতি বছর অনেক লোক প্রাণ হারায়। জেলার বিভিন্ন গ্রাম, পাড়া বা মহল্লার নাম বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে হরিণমারা, গয়ালমারা, বাঘঘোনা, ভালুক খাইয়াসহ বিভিন্ন নাম বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব মনে করিয়ে দেয়।

## ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রাচীনকালে সমগ্র কক্সবাজার জেলা স্বাধীন আরাকানের অধীন ছিল। কক্সবাজার একটি আধুনিক নাম। প্রশ্ন জাগতে পারে পূর্বে এই এলাকার অন্য কোনো নাম ছিল কিনা? আর কক্সবাজার নামকরণই বা কীভাবে হলো? এ সম্পর্কে 'নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল' অংশে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে অর্থাৎ ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কক্সবাজার অঞ্চল আরাকানের অধীন ছিল। এসময় আরাকান ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। আরাকানের তৎকালীন রাজা 'থামাদা' তাঁর অধীনস্থ এক সামন্ত রাজার সুন্দরী বোনকে অপহরণ করে এবং জোরপূর্বক বিয়ে করে। এতে আরাকানের সামন্ত রাজারা 'থামাদা'-র বিরুদ্ধে একাট্টা হয়। আরাকানের সামন্ত রাজারা 'থামাদা'র উপর ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশি 'আভা' বা 'পেগু'র ব্রহ্ম রাজাকে আরাকান আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। পেগুর রাজা 'বোধপায়া' বা 'বোধফ্রা' সে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আরাকান দখল করে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর সেনাপতি মহাবান্দুলা-কে দায়িত্ব প্রদান করেন। আরাকান সে সময়ে ছিল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে। ফলে প্রতিবেশী সব দেশ স্বাধীন 'আরাকান' দখল করে নেয়ার স্বপ্ন দেখতো।

আরাকানের সামন্ত-রাজাদের প্রস্তাব পেয়ে কালবিলম্ব না করে বোধফ্রার সেনাপতি মহাবান্দুলা ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বিনা বাধায় আরাকান দখল করে নেন। এর মাধ্যমে আরাকানের হাজার বছরের স্বাধীনতা বিলীন হয়ে ব্রহ্মদেশের অধীনে চলে যায়।

www.pathagar.com

কক্সবাজার নামটি খুব পুরোনো না হলেও কক্সবাজার জেলার ভূভাগটি অতি প্রাচীন, তেমনি এই ভূভাগের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। ১৮৮৮ সালে সমাপ্ত সিএস জরিপে (Cadastral Survey) 'কক্সবাজার' নামে একটি মৌজা লিপিবদ্ধ করা হয়। এই মৌজার নামেই পুরো জেলার নাম 'কক্সবাজার'। রামু ও চকরিয়াকে কক্সবাজার জেলার প্রাচীন জনপদ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সিএস জরিপে রামু ও চকরিয়া নামে কোনো মৌজা লিপিবদ্ধ হয়নি। 'চকরিয়া' নামে একটি গ্রাম লিপিবদ্ধ থাকলেও 'রামু' নামের কোনো গ্রামও লিপিবদ্ধ নেই।

কক্সবাজার জেলা বাংলাদেশের সর্ব-দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। এই জেলার উত্তরে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি (অবশ্য বাঁশখালি ও কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার কিছু অংশের মাঝখানে রাজাখালি খাল প্রবাহিত) ও লোহাগাড়া উপজেলা, পূর্বে পার্বত্য বান্দরবান জেলার লামা ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা ও আন্তর্জাতিক নদী নাফ, দক্ষিণে আন্তর্জাতিক নদী নাফ ও বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। ছোট বড় বেশকিছু দ্বীপ জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই দ্বীপগুলো হচ্ছে কুতুবদিয়া, মহেশখালি, মাতারবাড়ি-ধলঘাটা, সোনাদিয়া, শাহপরীর দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কাউয়ারডিয়া, তোতাডিয়া, জইল্যারডিয়া, হউসেরডিয়া, বিলাইচ্ছড্ডিয়া, চরণদ্বীপ, গুরাইয়ারদিপ (উজানটিয়া ইউনিয়নের একটি অংশ), গোলদ্বীপ (পেকুয়া উপজেলা)। তবে বর্তমানে অনেক দ্বীপ মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে দ্বীপ হিসেবে চেনার কোনো সুযোগ নেই। যেমন পেকুয়া উপজেলার সাবেক গোলদি যা প্রাচীনকালে দ্বীপ ছিল, টেকনাফ উপজেলার শাহপরীর দ্বীপ, উখিয়া উপজেলার গুরাইয়ারদিপ, পেঁচারদ্বীপ এবং চকরিয়া উপজেলার চরণদ্বীপ। কুতুবদিয়া দ্বীপ একটি পৃথক উপজেলা। মহেশখালি, মাতারবাড়ি-ধলঘাটা ও সোনাদিয়া দ্বীপ নিয়ে মহেশখালি উপজেলা, অন্যদিকে শাহপরীর দ্বীপ, জিনজিরা বা সেন্টমার্টিন দ্বীপ নিয়ে টেকনাফ উপজেলা। তবে সেন্টমার্টিন দ্বীপটি মূল ভখণ্ড থেকে প্রায় ১২ কিলেমিটার দূরত্বে অবস্থিত। সেন্টমার্টিন বা জিনজিরা দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ। এছাড়াও তোতাডিয়া, জইল্যারডিয়া, হউসেরডিয়া, বিলাইচ্ছড্ডিয়া নাফ নদীতে অবস্থিত যা টেকনাফ উপজেলাধীন। এসব দ্বীপে কোনো জনবসতি নেই। এককালে এসব দ্বীপে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ছিল বর্তমানে তা উজাড় করে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। কাউয়ারডিয়া মহেশখালি চ্যানেলের উপর অবস্থিত যা চকরিয়া উপজেলাধীন। এখানেও কোনো জনবসতি গড়ে ওঠেনি। এখানে চিংড়ি ঘের তৈরি করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলার সর্বোত্তর উপজেলা পেকুয়া ও চকরিয়া। পাশে বেশ বিস্তৃত হলেও সমগ্র জেলাটিই দক্ষিণ দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে এবং সরু হতে হতে সর্ব দক্ষিণে বদর মোকাম পয়েন্টে নাফ নদী এবং বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে মিলে গেছে। মূলত সাগরের ভাঙনের ফলে বদর মোকাম সাগরে বিলীন হয়ে গেছে। কক্সবাজার জেলার মূল-ভূখণ্ড বদর মোকাম পয়েন্টে এইরূপ ক্ষীণ হওয়ার একমাত্র কারণ নাফ নদীর গতি। এই নাফ নদী ঘেঁষে বার্মার সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত। সেন্টমার্টিন এখন একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন যা টেকনাফ উপজেলার অধীন। সুতরাং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় বা অ-উপকূলীয় জেলাগুলো থেকে কক্সবাজার জেলার কিছু

www.pathagar.com

স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কক্সবাজারের ভৌগোলিক অবস্থাও স্বতন্ত্র, এই জেলার একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে বিশাল বিস্তৃত সমুদ্র। বলতে গেলে পুরো জেলাতেই পাহাড়ের আধিক্য রয়েছে, এমনকি মহেশখালি দ্বীপের মূল অংশে রয়েছে পাহাড় ও বনাঞ্চল, যে পাহাড়ে প্রাচীনকালে বন্য জন্তু ছিল। এখনো হরিণ, বানর, শিয়াল প্রভৃতি প্রাণী রয়েছে। অপরদিকে সোনাদিয়া দ্বীপে রয়েছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। কক্সবাজার পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় বনজ সম্পদ এবং সমুদ্র-উপকূলীয় অঞ্চল হওয়ায় সামুদ্রিক সম্পদ ও পর্যটন শিল্প জেলাকে করেছে সমৃদ্ধ। তাই কক্সবাজার বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সাম্প্রতিককালে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসছে বলেই জেলার পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। দিন দিন এ শিল্পের পরিধি বাড়ছে।

কক্সবাজার জেলার তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাহাড়, নদী ও সমুদ্র। উক্ত বৈশিষ্ট্য তিনটিই জেলার জন্য যেমন আশীর্বাদ, তেমনি অভিশাপও বটে। অভিশাপ এই জন্য যে, সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রায়ই সাংবৎসরিক ব্যাপার, জলোচ্ছ্বাসের ফলে প্রায় সমগ্র জেলাই প্লাবিত হয়ে থাকে; ধ্বংস হয় অঢেল সম্পদ এবং প্রাণ হারায় অগণিত মানুষ। জেলার বিভিন্ন নদী, খাল ও পাহাড়ি ছড়াতে রাবার ড্যাম বা Water Control Structure স্থাপন করে শুষ্ক মওসুমে অতিরিক্ত খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে। পাহাড়ের মূল্যবান বৃক্ষরাজি সারা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। সমুদ্র-উপকূলের লোনা পানিকে ব্যবহার করে শুষ্ক মওসুমে উৎপাদিত লবণ দেশের লবণের চাহিদা মিটাচ্ছে। লবণ বিকল্পহীন একটি পণ্য; দেশের চাহিদার ৯৫ ভাগ কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া, মহেশখালি, কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া, পেকুয়া ও টেকনাফে উৎপাদিত হয়। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি উপজেলায় দেশের চাহিদার পাঁচ ভাগ লবণ উৎপাদিত হয়। সামুদ্রিক মাছ, বর্ষা মওসুমে উপকূলের উৎপাদিত চিংড়ি মাছ দেশে আনছে শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা।

কক্সবাজারের ভূভাগ যেমন প্রাচীন, কক্সবাজারের ইতিহাসও তেমনি প্রাচীন। কক্সবাজারের রাজনৈতিক ইতিহাস আরাকান, ত্রিপুরা ও বাংলার ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে কক্সবাজারের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বলতে গেলে ইতিহাস মোটেই স্বচ্ছ নয়, প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ইতিহাস পুনর্গঠন করার মতো উপকরণও বিশেষ পাওয়া যায় না। পারিপার্শ্বিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কিছুটা ধারণা করা যায়, যেমন, চট্টগ্রাম পর্যন্ত আরাকানের অধিকার বিস্তৃতির প্রমাণ থেকে ধরে নেয়া যায় যে, কক্সবাজারও আরাকানের অধীনে ছিল। বিপরীত ক্রমে কক্সবাজার বা কক্সবাজারের কোনো এলাকায় বাংলার সুলতান বা ত্রিপুরার রাজার অধিকারের প্রমাণ পাওয়া গেলে ধরে নেয়া যায় ঐ এলাকা পর্যন্ত বাংলার বা ত্রিপুরার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। তবে এটা ঠিক যে, টলেমির ভূগোলে কক্সবাজারের প্রাচীন জনপদ রামুর উল্লেখ রয়েছে।

প্রাচীনকালে এখানকার জনগোষ্ঠী পাহাড়ে, পর্বতে বা নদীর তীরে বসবাস করত। কারণ পাহাড়ে বা পর্বতে যেমন খাদ্য পাওয়া যেত, নদীর তীরেও তেমনি খাদ্যের অভাব হতো না। তবে এটা ঠিক যে, সেই প্রাচীনকাল থেকেই নদীর তীরে জনবসতি

www.pathagar.com

গড়ে উঠেছে। জনবসতির কারণেই গড়ে উঠেছে বন্দর। বিশেষ করে চাষবাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে নদীর তীর তাদের জন্য বেশি লোভনীয় ছিল। এই কারণে প্রাচীনকালে জাতি বা উপজাতি বা গোষ্ঠীভুক্ত জনগণ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত এবং সুবিধাজনক স্থানে বসবাস শুরু করত। তখন তাদের ছিল যাযাবর জীবন এবং এই কারণে প্রাচীনকালে বিভিন্ন জাতির এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বসবাস করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কক্সবাজার, আরাকান, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, আসাম বা এক কথায় গোটা পূর্ব-ভারতেও এইরূপ পাহাড়ি জাতিগুলির এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরাফেরা ছিল, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাদজা-তুয়ে'-এ নিম্নরূপ তথ্য দেওয়া আছে। ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা সুলত ইঙ্গ-চন্দ্র 'সুরতন' বিজয়ে বের হন এবং সেই দেশে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। রাজার উক্তি অনুসারে তার নাম হয় চেত্তগৌং অর্থাৎ 'যুদ্ধ করা অনুচিত'। কেউ কেউ মনে করেন যে, 'সুরতন' শব্দটি 'সুলতান' শব্দের আরাকানি বিকৃত রূপ এবং তাঁরা বলেন যে, চট্টগ্রামে ঐ সময়ে মুসলমানেরা একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যে আরবের মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ ছিল তা আরব ভূগৌলবিদদের বিবরণ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়; কিন্তু নবম শতকে চট্টগ্রামে মুসলমানদের আরব রাষ্ট্র গঠন একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। একটি মাত্র শব্দ 'সুরতন' যার অর্থ এখনও পরিষ্কার নয়, তার উপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ 'আরাকান বংশাবলী' পড়ে, মনে হয় 'সুরতন' শব্দটি 'সুলতান' শব্দের বিকৃত রূপ নয়, অধুনালুপ্ত কোনো একটি স্থানের নাম। ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত পর্তুগিজ ঐতিহাসিক জোয়া ডি বেরসের মানচিত্রে দেখা যায় যে চকরিয়ার নিকটে সোর (SORE) নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই 'সোর'কে হয়ত 'সুরতন' বলা হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রাম আরাকানের রাজার অধীনে যায়, ফলে সারা কক্সবাজার জেলাও যে আরাকানের রাজার অধীনস্থ হয় তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম পর্যন্ত জয় করেন।"[১৪]

"ইসলামাবাদের নিকটে একখানি রৌপ্যলিপি আবিষ্কৃত হয়। সম্ভবত: ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব লাভের পর লিপিখানি আবিষ্কৃত হয় এবং ইংরেজ কর্মকর্তারা এটি কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। স্যার জন শোর (লর্ড টিনমাউথ) লিপিখানি নিম্নরূপ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন:

"On the 14th Magha 904 Chandi Lal Raja, by the advice of Bowangari Rauli, who was the director of his studies and devotions and in conformity to the sentiments of twenty eight other Raulis, formed the design of establishing a place of religious worship; for which purpose a cave was dug, and paved with bricks, three cubits in depth and three cubits also in diametre; in which were deposited one hundred and twenty bronze images of small dimension denominated Languda; There was likewise a large

www.pathagar.com

image of stone call (Sic) Langudagari, with a vessel of Brass, in which were deposited two of the bones of thacur. On a silver plate were inscribed the Hanca or the mandates of the deity; with that also styled thumah Chucksowana and Ta'hma, to the study of which twenty eight Roulis devote their time and attention; who having celebrated the present work of devotion with festivals and rejoicings, erected over the cave a place of religious worship for the magas, in honour of the deity.

এরপরে বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

এই লিপির ৯০৪ সাল অতি মূল্যবান, তবে প্রশ্ন হলো, এটি কী সাল, মঘী সাল না অন্য কিছু? রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র দাশ এবং ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো মনে করেন যে, এটি মঘী সাল এবং সে হিসাবে তাঁরা চট্টগ্রামের উপর আরাকানের আধিপত্যের ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। তাঁরা আরও মনে করেন যে, রৌপ্যলিপির চন্ডিলাহ্ রাজা ছিলেন আরাকানের চট্টগ্রামে নিযুক্ত গভর্নর বা প্রাদেশিক শাসক। কিন্তু উপরিউক্ত মত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ 'রাজা' শব্দ যুক্ত হওয়ায় চন্ডিলাহ্ নিশ্চয়ই রাজা ছিলেন, তিনি কোনো রাজার অধীনস্থ গভর্নর বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন না। প্রাদেশিক শাসনকর্তা আরাকানের রাজার নাম বাদ দিয়ে শুধু নিজ নামে কোনো লিপি বা মুদ্রা উৎকীর্ণ করতে পারতেন না; লিপি বা মুদ্রা উৎকীর্ণ করার ক্ষমতা শুধু রাজারই ছিল। সুতরাং চণ্ডিলাহ্ রাজা নিজেই রাজা ছিলেন এবং খুব সম্ভবত তিনি আরাকানের রাজাই ছিলেন। প্রাচীন কালে বিভিন্ন সূত্রে আরাকানের রাজাদের যা নাম পাওয়া যায়, তাতে চণ্ডিলাহ্ রাজা নামে কোনো রাজার নাম পাওয়া যায় না, তাই চণ্ডিলাহ্ রাজা পাঠ নির্ভুল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে আমরা হয়ত আরাকানের রাজাদের সকলের নাম পাইনি। দ্বিতীয়ত, এই রৌপ্যলিপিতে প্রাপ্ত সনও আমরা মঘী সন বলে মনে করি না। মঘী সন প্রচলন আরম্ভ হয় ৬৩৮ বা ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে। সরহ্ন নামক একজন জবর দখলকারি পুরোহিত পেগানে ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি মঘী সনের প্রবর্তক। মঘী সন চান্দ্র বৎসর এবং এই সনের মাসগুলির নাম বাংলা সনের মাসগুলির নাম থেকে ভিন্ন। রৌপ্যলিপির তারিখ ৯০৪ সালের ১০ই মাঘ। এখানে মাসের নাম বাংলা। সনটি মঘী সন হলে মাসের নামও মঘীসনের মাস হতো। অবশ্য চট্টগ্রামে এই শতকের প্রথম দিকেও দলিলপত্রে মঘী সন প্রচলিত ছিল এবং মঘী সনে বাংলা মাসের নাম ব্যবহার করা হতো। এর কারণ চট্টগ্রামের লোকেরা মঘী সনে মঘী মাসের নাম উল্লেখ না থাকার কোন কারণ নাই। তাই আমরা মনে করি যে রৌপ্যলিপিতে উল্লেখিত সনটি শকাব্দ এবং ৯০৪ শকাব্দ=৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানতে পারি যে ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আরাকানের রাজার অধীনে ছিল, ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা সুলত ইঙ্গ চন্দ্র চট্টগ্রাম জয় করে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। আমরা বলতে পারি যে, সমগ্র দশম শতাব্দী কক্সবাজারসহ সমগ্র বৃহত্তর চট্টগ্রাম আরাকানের রাজার অধীনে ছিল।"[১৫]

"সুতরাং পাট্টিকেরার চন্দ্র বংশ এবং আরাকানের চন্দ্র বংশের শেষ দিক সমসাময়িক। পাট্টিকেরা চন্দ্র বংশের রাজধানী ছিল রোহিতগিরি। রোহিতগিরির

www.pathagar.com

পরিচিতি নিয়ে আগে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ থাকলেও ময়নামতিতে প্রাপ্ত তাম্রলিপির সাক্ষ্যে সে সন্দেহ কেটে গেছে। ময়নামতি বা লালমাই ও রোহিতগিরি অভিন্ন। সুতরাং পাট্টিকেরা রাজ্যের কেন্দ্র ছিল কুমিল্লা, তবে তাদের রাজ্যের সীমানা দক্ষিণ দিকে কতদূর বিস্তৃত ছিল তা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা সবাই স্বীকার করেন যে, আরাকানের চন্দ্র বংশ এবং পাট্টিকেরার চন্দ্র বংশের মধ্যে সংযোগ বা সম্পর্ক ছিল এবং প্রচলিত মত এই, মহাবীর আরাকান চন্দ্র বংশের উৎখাত করলে ঐ বংশের একটি শাখা পাট্টিকেরায় রাজ্য গঠন করে রাজত্ব করতে থাকেন। এই সম্পর্ক স্বীকার করার প্রধান কারণ পাট্টিকেরার টাকশালে উৎকীর্ণ মুদ্রায় আরাকানের মুদ্রার সঙ্গে বিশেষভাবে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। তাছাড়া পাট্টিকেরা চন্দ্র বংশ এবং আরাকান রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের বিবরণও পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পাট্টিকেরা চন্দ্র বংশের রাজ্যসীমানা দক্ষিণে কতদূর বিস্তৃত ছিল? সুতরাং আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, ঐ সময়ে কক্সবাজারসহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম আরাকানের অধীনে ছিল।"[১৬]

প্রাচীনকালে কক্সবাজার জেলা মোটামুটিভাবে আরাকানের অধীনে ছিল। তবে এই জেলা বা এর কিছু অংশ কান্তি দেব বা দামোদার দেব বা তাঁদের বংশের রাজাদের দ্বারা অধিকার স্থাপন করার সম্ভাবনাও আছে।

"জেলায় মুসলমানদের আগমনের সঠিক দিনক্ষণ নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আরবেরা বরাবর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তৎপর ছিল, এমনকি তারা প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করেছিল। এশিয়ার সমুদ্রপথ ইউরোপিয়ানদের জানা ছিল না, তাই প্রাচীনকালে তারা আরব বণিকদের মাধ্যমে এশিয়ার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করত। আরবেরা যখন আন্তর্জাতিক সমুদ্রবাণিজ্যে তৎপর ছিল, তখন আরবের মুসলমান ভৌগোলিকেরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমুদ্রপথ, বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের উৎপত্তি স্থল, মূল্যমান এবং আমদানি-রফতানি বিষয়ক খুঁটিনাটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং বণিকদের সুবিধার্থে তাদের সংগৃহীত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশেও অনুরূপ তথ্যাদি সংগ্রহ করা হতো। আরব ভৌগোলিকদের মধ্যে সোলায়মান ৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে সিলসিলাত-উত-তওয়ারিখ নামক একখানি বই লিখেন। তাঁর পরে আরও কয়েকজন আরব ভৌগোলিক একই রূপ বই লিখেন, তবে তাঁরা সকলেই মোটামুটিভাবে সোলায়মানের বিবরণ অনুসরণ করেন, যদিও তাঁরা কিছু কিছু নতুন তথ্যের সমাবেশ ঘটান। এই গ্রন্থগুলিতে দেখা যায় যে, আরবেরা চট্টগ্রামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। চট্টগ্রাম প্রাচীনকাল থেকে সামুদ্রিক বন্দর, সুতরাং চট্টগ্রামের সঙ্গে বণিকদের যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নয়, সমগ্র চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার উপকূলের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় ছিল। আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাজ-দা-তুয়ে'-এ নিম্নরূপ একটি তথ্য পরিবেশিত হয়েছে : "এই সময়ের শেষভাগে কান-রা-দজা-গীর (রাজাদিগ্রী) বংশধর মহুত-ইঙ্গ-চন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা বাইশ বছর রাজত্ব করার পরে মারা যান। কথিত আছে যে তাঁর সময়ে (৭৮৮-৮১০ খ্রিষ্টাব্দ) কয়েকটি কু-ল অর্থাৎ বিদেশি জাহাজ রণবী (রামব্রী) দ্বীপের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙে যায় এবং জাহাজের মুসলমান আরোহীদের আরাকানে পাঠানো হয়। তারা সেখানে

www.pathagar.com

গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ইহা আরাকানের ঘটনা, কিন্তু একদিকে চট্টগ্রাম বন্দর এবং অন্যদিকে আরাকানের সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ থাকলে মধ্যবর্তী উপকূল বাদ পড়ে না। সুতরাং বলা যায় যে, কক্সবাজার উপকূলের সঙ্গেও আরব মুসলমানদের পরিচয় বা যোগাযোগ ছিল। কক্সবাজার উপকূলের অদূরেই কয়েকটি দ্বীপ কুতুবদিয়া, মহেশখালি, মাতারবাড়ি, সোনাদিয়া, শাহপরী এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপসহ সমুদ্র-উপকূলীয় এলাকায় মুসলমানদের আগমন এবং বসবাস দেখা যায়। এই সকল দ্বীপে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি, অমুসলিমের সংখ্যা খুবই কম। নির্দ্বিধায় ধরে নেওয়া যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে আরব ব্যবসায়ীরা সর্বপ্রথম এই সকল দ্বীপে বসবাস শুরু করে। এর ফলে দ্বীপগুলিতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়।"[১৭]

পুরো চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং আরাকান উপকূলে যে আরবদের যাতায়াত, যোগাযোগ এবং ব্যবসা বাণিজ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই সব এলাকায় আরবদের উপস্থিতি, এমনকি কোনো কোনো আরব বসতি স্থাপনার নামও জানা যায়। কক্সবাজারস্থ সমুদ্রের দ্বীপগুলিতে মুসলমানদের একচেটিয়া বসবাসও এই বক্তব্য সমর্থন করে।

"তের শতকের গোড়ার দিকে বখতিয়ার খিলজি নদীয়া আক্রমণ করেন এবং লখনৌতে বা গৌড়ে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করে বাংলাদেশে মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রামের মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হয় তারও প্রায় দেড়শত বছর পরে। সোনারগাঁও এর স্বাধীন সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ) সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার শুরু হয়।"[১৮]

কক্সবাজারসহ চট্টগ্রামের নাবিক এবং খেলোয়াড়েরা বদরশাহের নাম স্মরণ করে থাকে। নাবিকরা সমুদ্র যাত্রার সময় বলে থাকে –

আমরা আছি পোলাপান
গাজী গঙ্গা নিঘাবান
শিরে গঙ্গা দরিয়া
পাঁচ পীর বদর বদর।

তারা আরও বলে, দরিয়াকে পাঁচ পয়সা বদর বদর। এই এলাকার ছেলেরা অবসর সময়ে বিশেষ করে শীতকালে হাডুডু, দাড়িবান্ধা খেলার প্রস্তুতিপর্বে বদর বদর চীৎকার করে সঙ্গী-সাথীদের ডেকে থাকে। এখানে পাঁচ পীর ও গাজীর (গাজী মিয়া?) নামের সঙ্গে বদর শাহের নাম করা হয়েছে। কবি মুহাম্মদ খানের বংশলতিকায় দেখা যায় যে, মাহি আছোয়ার এবং হাজী খলীল পীর সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে এসে পৌছলে বদর আলমের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়, অর্থাৎ বদর আলম আগেই চট্টগ্রাম অবস্থান করছিলেন। তিনি সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে এসেছিলেন কিনা তা মুহাম্মদ খানের বিবরণে জানা যায় না। কিন্তু নাবিকগণ কর্তৃক পীর বদরের নাম উল্লেখ করায় মনে হয় বদর আলমও সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে আগমন করেন।"[১৯]

"কক্সবাজার জিলায়ও বদর শাহের স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। এই স্মৃতি বদর মোকাম এর মাধ্যমে। সমুদ্রোপকূলে কক্সবাজার জিলার শেষ সীমানা অর্থাৎ টেকনাফ

www.pathagar.com

উপজেলার শাহপরীর-দ্বীপের বঙ্গোপসাগর ও নাফনদীর মোহনায় অবস্থিত বদর মোকাম। বদর মোকাম শুধু কক্‌সবাজার জিলার নয়, ত্রিপুরা থেকে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সর্বত্র বদর মোকামের স্মৃতি রয়েছে, অর্থাৎ এই সমুদয় অঞ্চলে, বিশেষ করে সমুদ্র-উপকূলে এই স্মৃতি বিদ্যমান। ড. এনামুল হক এবং মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন "খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে আরাকানে ইসলাম বিস্তৃতি ও মুসলমান প্রভাব অন্যান্য ঐতিহাসিক কর্তৃকও স্বীকৃত। এই সময় হইতেই আসামের সীমা মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী ভূভাগের নানা স্থানে 'বুদ্ধের মোকাম' নামক এক প্রকার অদ্ভুত মসজিদ গড়িয়া উঠিতে থাকে এই মসজিদগুলিকে বৌদ্ধ ও চীনা মুসলমান জাতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।"[২০]

"কক্সবাজারের বদর মোকামেরও প্রাচীন কোনো দালান কোঠা ছিল না, তবে বিগত শতাব্দীর নব্বইর দশকে প্রাচীন টিনের ছাউনিযুক্ত মসজিদটি ভেঙে দ্বিতল বিশিষ্ট দালান নির্মাণ করা হয়েছে। 'বদর' নামটিরও ঐতিহাসিক তাৎপর্য প্রচুর। দেখা যায়, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, কক্‌সবাজার, টেকনাফ, আকিয়াব, মালয় উপকূলবর্তী এই বিরাট এলাকায় ইসলাম প্রচারের এক জোয়ার নেমে আসে এবং ইসলাম প্রচারের এই সকল কর্মকাণ্ডে পীর বদর বা বদর শাহের নাম সম্পৃক্ত। পীর বদর একার পক্ষে এতদূর যাতায়াত করা সম্ভব ছিল কিনা সেটা ভাববার বিষয়, কিন্তু সম্ভব হোক না হোক, (অবশ্য সমুদ্রপথে যাতায়াত করলে অসম্ভব হওয়ার কারণ নাই) এটি ইসলামি আন্দোলনের এক গৌরবময় যুগের ইঙ্গিত বহন করে। কক্‌সবাজার এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল।"[২১]

"মুগল সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ শুনে তাঁর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ শুরু হয়। শাহজাহানের ছেলে শাহ শুজা ছিলেন তখন বাংলার সুবাদার। তিনিও উত্তরাধিকারের যুদ্ধে লিপ্ত হন, কিন্তু আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাংলা ত্যাগ করে আরাকানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। শুজার ইচ্ছা ছিল মক্কা শরীফে যাওয়া এবং সেখান থেকে পারস্যে যাওয়া। কিন্তু তাঁর যাত্রাপথ ছিল বিপদসঙ্কুল, স্থল পথে যাওয়ার প্রশ্নই উঠেনা, কারণ ঐ পথ ছিল শত্রুর অধীন। জলপথে যাওয়াও ছিল বিপদজনক। শাহ শুজা ৫ জানুয়ারি ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে খাজওয়ার যুদ্ধে পরাজিত হন এবং ৫ এপ্রিল ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁড়ার (তান্ডার) যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালাবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ৬ রমজান (১৬ই মে ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে) ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ঐ সালের ৩রা জুন তারিখে চট্টগ্রাম বন্দরের বিপরীতে দিয়াঙে পৌছেন এবং একই সালের (১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে) ২৬ আগস্ট তারিখে আরাকানের রাজধানী ম্রোহং পৌছেন। সুতরাং শুজার পলায়নের সময় ছিল আষাঢ়-শ্রাবণ মাস। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ভিতর দিয়ে মক্কা শরীফে বা ইরানে যাওয়া শুজার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ শুজা (বা মোগলেরা) সমুদ্রযাত্রার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তাই শাহ শুজা আরাকানের রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আরাকানের রাজা তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার এবং শীত মৌসুমে সমুদ্র শান্ত হলে মক্কায় পৌছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। এই জন্যেই শাহ শুজা আরাকানে যান। শাহ শুজার আরাকানে যাওয়ার পথ সম্পর্কে সমসাময়িক সূত্রগুলির মধ্যে ঐক্য নেই, কিন্তু সকল মতামত যাচাই করে আমরা মনে

www.pathagar.com

করি যে, শাহ শুজা চট্টগ্রাম (বা দিয়াঙ) থেকে সড়কপথে আরাকানের রাজধানী ম্রোহং এ যান।"[২২]

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও পূর্বতন পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থাই বহাল থাকে। যদিও ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহকুমা পর্যায়ে গভর্নর প্রথা চালু করে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরে ১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এইচ এম এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পরে তৃণমূল পর্যায়ে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ করার কার্যক্রম শুরু হয়। কর্মসূচির আওতায় থানাগুলোকে উপজেলায় এবং মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করার ব্যবস্থা করা হয়। থানাগুলোকে উপজেলায় উন্নীত করে সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে উপজেলার প্রধান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের উপজেলা প্রশাসনে সম্পৃক্ত করা হয়। জেলা পর্যায়ে উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে সৃষ্ট জেলাপরিষদের প্রধান ছিলেন জেলাপ্রশাসক। জেলাপ্রশাসকের স্থলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়। জেলাপরিষদের চেয়ারম্যানকে উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। কিন্তু সেই পদ্ধতি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

## ঙ. জনবসতির পরিচয়

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত জেলা কক্সবাজার। জেলার পূর্ব পাশে রয়েছে আন্তর্জাতিক নদী নাফ এবং তার পূর্বে প্রতিবেশী বার্মা (বর্তমানে মিয়ানমার) যা পূর্বে স্বাধীন আরাকানের অধীন ছিল। কক্সবাজার বিমানবন্দর সংলগ্ন নাজিরারটেক থেকে শুরু করে টেকনাফ উপজেলার বদরমোকাম পর্যন্ত ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত। জেলার পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে গিরিকুন্তলা বনানীর সবুজ শ্যামলিমা শোভিত গভীর জঙ্গল আর পশ্চিমে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর। প্রাকৃতিক সম্পদ, পর্যটনশিল্পসহ সম্পদের সমাহারে কক্সবাজার দেশি-বিদেশি মানুষের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। জেলার ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ইতিহাস বহু পুরোনো।

"নৃতত্ত্ববিদের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশে আগমন করেছিল নিগ্রো (Negrito), অস্ট্রিক (Proto-Australoid), মঙ্গোলীয় ক. Palace-Mongoloid, খ. Tibeto-Mongoloid, দ্রাবিড় (ক) Palaco-Mediterrancan, (খ) Mediterranean, আলপাইনীয় (Alpinoid), আর্মেনীয় (Armenoid), দিনারীয় (Dinaric), নর্ডিক (Nordic), আর্য প্রভৃতি গোত্রের জনগোষ্ঠী। তাদের সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতি তথা বাঙালি জাতি। এখানে আগমন ঘটেছে তুর্কি, চীনা, আরবীয়, পাখতুন, পাঞ্জাবি, পাঠান, পারস্য অঞ্চলের অগ্নি উপাসক আর্য, প্রকৃতিপূজারি দ্রাবিড়, মধ্য ভারতীয়, নিগ্রো, মঙ্গোলীয়, সাঁওতাল, রোহিঙ্গা, রাখাইন, মার্মা, বড়ুয়া, মগ, চাকমা, চাক, মুরং, উরিয়া, ত্রিপুরা, ইংরেজ, পর্তুগিজ, ডাচ, ভুটিয়াসহ অনেকের। এছাড়াও

www.pathagar.com

রয়েছে অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে নৌকাডুবি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত আরব মুসলমান যারা পরে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে বর্ণ শংকর জাতি হিসেবে রূপ নিয়েছে। স্থানীয়ভাবে তাদেরকে 'তাম্বুইরগা মগ' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলমান। তাদের আচার-আচরণ আরাকানের মগ সম্প্রদায়ের মতো বিধায় তাদেরকেও মগ বলে অভিহিত করা হয়। বার্মিজ শব্দ 'তামবুকিয়া' শব্দের অর্থ উদ্ধারপ্রাপ্ত।

কক্সবাজারের আদিম জনগোষ্ঠীর সাথে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান ও বৃহত্তর চট্টগ্রামে প্রথম রাজ্য স্থাপনকারী রাজা চন্দ্রসূর্যের মগধাগত হিন্দু ও বৌদ্ধ সৈন্যদের ধর্ম প্রচারের ফলে কক্সবাজারের নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ অধিবাসীর উদ্ভব হয়। ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁ'র সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ'র চট্টগ্রাম বিজয়ের পর থেকে সুফি সাধক ও গৌড়াগত মুসলমানেরা ইসলাম প্রচারের ফলে কক্সবাজারের মুসলমান অধিবাসীর উদ্ভব হয়। বর্তমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও স্বল্প সংখ্যক খ্রিষ্টান রয়েছে। বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বড়ুয়া, রাখাইন ও চাক। কক্সবাজারের সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টান ধর্মান্তরিত। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারা ইউনিয়নের ঘন বনবেষ্টিত মালুমঘাট নামক স্থানে 'খ্রিষ্টান মোমোরিয়াল হাসপাতাল' স্থাপন করার পরে স্বল্পসংখ্যক স্থানীয় নিম্নবর্ণের লোক খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে।"[২৩] এসব খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী লোকজনের মুখের ভাষা স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা। উখিয়া-টেকনাফের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা উখিয়ার মাদারবুনিয়া থেকে টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নের তেলখোলা পর্যন্ত এলাকায় কিছু সংখ্যক চাক সম্প্রদায়ের লোকজনের বসবাস রয়েছে। এই চাক সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলা ছাড়াও কক্সবাজারের আঞ্চলিক ভাষায় এবং যারা পড়ালেখা করছে তারা মান ভাষায় কথা বলতে পারে। জেলায় বসবাসকারী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় রয়েছে তারা হচ্ছে রাখাইন। কক্সবাজারে পূর্বে এদের বিক্ষিপ্ত বসবাস থাকলেও তাদের বেশিরভাগ আসে ১৭৮৪ সালে আরাকান বার্মার দখলে যাওয়ার পর। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনরা তাদের পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। এমনকি ঘরের বাইরে, সভা-সমাবেশে তাদের সম্প্রদায়ের দু'জনের মধ্যে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাদের নিজস্ব ভাষাতেই কথা বলে। তাদের দাবি, তাদের ভাষা রাখাইন ভাষা। তাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। তবে তাদের ভাষাকে বার্মিজ ভাষা থেকে পৃথক করা যায় না। বর্ণমালাও বার্মিজ। রাখাইনরা তাদের ভাষা ছাড়াও স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। ফলে জেলায় বৃহত্তর চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা তথা উপভাষার পাশাপাশি রাখাইন ভাষা তথা বার্মিজ ভাষা এবং চাক সম্প্রদায়ের ভাষা প্রচলিত।

জেলায় বর্তমানে মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকজন দেখা যায়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে বড়ুয়া বৌদ্ধ, রাখাইন এবং চাক বা চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা।

"আরাকানের ইতিহাস 'রাজোয়াং' সূত্রে জানা যায় যে, ১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজা চন্দ্রসূর্যের চট্টগ্রাম-আরাকান জয় করে রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তাঁর সঙ্গী মগধাগত হিন্দু সৈন্যরা বৃহত্তর চট্টগ্রামের অংশ বর্তমান কক্সবাজার জেলায় প্রথম হিন্দু ধর্ম প্রচার করেন। পণ্ডিতগণের মতে, এখানে প্রচলিত হিন্দু ধর্মে পৌরাণিক রূপ লক্ষ করা যায়।

www.pathagar.com

বৃহত্তর চট্টগ্রামের কবি দ্বিজরতিদেবের 'মৃগলব্ধ', রাম রাজার 'মৃগলব্ধ', মুক্তারাম সেনের 'সারদা মঙ্গল', কবিন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দীর 'মহাভারত' ও দ্বিজ ভবানী নাথের 'দিগ্বিজয়' প্রভৃতি কাব্য পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম অনুসরণের প্রত্যক্ষ ফল। আবার এখানে মনসা, চণ্ডি, শীতল পূজা, মগধেশ্বরী, ষষ্ঠি দেবীর সেবা, সত্য নারায়ণের শিরনি প্রচলিত আছে।"[২৪]

জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বহিরাগত হিন্দুদের অংশ বেশি। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও শূদ্র এই চার প্রধান বর্ণ ও ছত্রিশ জাত নিয়ে এখানকার হিন্দুসমাজ গঠিত বলা হলেও বর্তমানে এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ে অতগুলো জাত বা গোত্র চিহ্নিত করা দুরূহ। শূদ্র বা নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় হলো জেলার আদি হিন্দু অধিবাসী। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই তিন বর্ণের হিন্দুরা জেলায় বহিরাগত।

"কক্সবাজার জেলায় মুসলমানদের আগমন ও বসতি স্থাপন কখন থেকে শুরু হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। তবে কক্সবাজারের প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক-গবেষক-সমাজসেবক পরলোকগত আবদুর রশিদ সিদ্দিকী মনে করেন, "৭৮৮-৮১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মহত ইঙ্গ চন্দ্র নামে এক রাজা রোসাং সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় একদল আরব বণিক পালের জাহাজে আসিয়া 'রামরী দ্বীপে' উপস্থিত হইলে ঘটনাক্রমে জাহাজ ভাঙ্গিয়া বণিক দল বিপন্ন হইয়া তীরে অবতরণ করেন। রাজার আদেশে তাহারা এতদঅঞ্চলে বাস করিতে অধিকার পান। উপরোক্ত 'রামরী দ্বীপ' চকরিয়ার সুন্দরবনের 'রিমরং দ্বীপ' বলিয়া অনুমান করা যায়। কেননা কালক্রমে সমরকন্দের অধিবাসী নামের পরিচিত এক মুসলমান পরিবারই এ যাবতকাল রাজকীয় দান স্বরূপ এই বৃহৎ রিমরং দ্বীপ ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন। এই ইতিহাসোক্ত রামরীই যে বর্তমান রামুর প্রচীন নাম ছিল এইরূপ অনুমান করিতে পারা যায়।"[২৫]

"সম্ভবত ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দের পরেই কক্সবাজার জেলার সর্বত্র মুসলমানদের বসতি স্থাপন শুরু হয়। ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁর সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বঙ্গদেশের অধীশ্বর হন। এর আগে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ'র সেনাপতি কদল খাঁ গাজী চট্টগ্রাম জয় করে সর্বপ্রথম তা সোনারগাঁ মুসলমানদের শাসনভুক্ত করেন। এই দুই পরাক্রমশালী সুলতানের আমলে কক্সবাজার জেলায় সৈয়দ, শেখ, পাঠান (তুর্কি) ও মোগল এই চার শ্রেণির মুসলমানের আগমন ঘটে এবং ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারিত হয়। পরবর্তীতে ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা গণেশের পুত্র সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ কুড়ি হাজার সৈন্য দিয়ে গৌড়ে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত আরাকান রাজা নর মিখলাকে সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন এবং আরাকান গৌড়ের অধীনতা স্বীকার করে।"[২৬] আরাকানে চালু করা হয় মুসলমানি স্টাইলে মুদ্রা। সেই মুদ্রার একপিঠে কলেমা, অপরপিঠে আরাকান রাজার একটি মুসলমানি নাম। এসময় কক্সবাজারে মুসলমানদের প্রভাব এবং বসতি বৃদ্ধি পায়।

"জেলার মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাচীন সামাজিক শ্রেণিবিভাগ অত্যন্ত জটিল। এখানকার মুসলমানেরা কুলীন ও অকুলীন এবং বহিরাগত ও পেশাভিত্তিক গোত্র এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হলেও কিন্তু তারা প্রথমে রোয়াঁই বা রোয়াইঙ্গা ও চাটিগ্রামি বা চাড়ি বা চাঁড়ু এই প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত। অতঃপর রোয়াঁই বা রোয়াইঙ্গাদের মধ্যে যেমন সৈয়দ, শেখ, পাঠান (তুর্কি) ও মোগল এই চার শ্রেণির কুলীন ও অকুলীন আছে

www.pathagar.com

তেমনি চাড়িদের মধ্যে উক্ত চার শ্রেণির কুলীন ও অকুলীন বিদ্যমান। আর আছে কয়েকটি বহিরাগত ও পেশাভিত্তিক গোত্র। যথা : থাম্ভরগ্যা, জোলা, কুমার, তেলি, মলঙ্গি, কাঁহার, হাজাম ও হরইল্যা ইত্যাদি।"[২৭] তবে কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর লোকজন সবচেয়ে বেশি বলে গবেষকদের অভিমত। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রোহিঙ্গারা তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করে। তারও আগে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বার্মা রাজা বোধফ্রা আরাকান দখল করে নিলে আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগ বা রাখাইন, হিন্দুসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে এসে বসতি স্থাপন করে।

সেকালে আরাকানের রোয়াইঙ্গা মুসলমানেরা, স্থানিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আরাকানি মঘ সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। এই আরাকানি ও চট্টগ্রামি ভাষার সংমিশ্রণে বিকৃত হয়ে রোয়াইঙ্গা গোত্রের কথিত চট্টগ্রামি বুলি গঠিত হয়েছিল। রোয়াইদের মুখের বুলি চট্টগ্রামি উপভাষা হলেও তাদের উচ্চারণ ধ্বনি ও বলার ঢঙে আরাকানি ভাষার প্রভাব রয়েছে। তবে একথা সত্য যে, অষ্টম-নবম শতাব্দীতে আরবীয় বণিকদের নৌকাডুবির ফলে বসতি স্থাপনকারী বা আরবীয় বণিকদের প্রভাবে আরাকানের মুসলমানদের ব্যবহার্য শব্দের বেশিরভাগ আরবি থেকে আগত। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, রোহিঙ্গারা ডিমকে এখনো বদা (আরবি বয়জতুন থেকে বয়জা বা বদা), তরকারির পেয়ালাকে কদ্দা (আরবি কদ্আ থেকে কদ্দা) বলা, কাকেও সম্বোধন করলে 'ল' বলে প্রতি উত্তর দেয়া (আরবি লব্বায়েক থেকে 'লব্ব' বা 'ল') এখনো তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। শুধু তাই নয়, আরাকান বা আরাকানের রাজধানী আকিয়াব তো ফার্সি শব্দ 'এক আব' (এক জলস্রোত)। একইসাথে বলা যেতে পারে যে, আরাকানি রোহিঙ্গা মুসলমানরা আরাকানি, চট্টগ্রামি শব্দসহ বিভিন্ন শব্দের সংমিশ্রণে একটি ভাষা ব্যবহার করে। 'আরাকান' শব্দটি 'রোকন' শব্দ থেকে এসেছে বলে গবেষকদের ধারণা। 'রোকন' অর্থ নিয়ম। অরাজকতার বিপরীতে নিয়ম মেনে চলা অঞ্চল হলো আরাকান।

কক্সবাজারের মুসলমান জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ রোয়াইঙ্গা সম্প্রদায় থেকে আগত। সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানকে চাডি বা চাঁডু নামে উল্লেখ করা হয়। এই চাঁডু বা চাডি চট্টগ্রামি বা চাটিগ্রামি নামের বিকৃতি। প্রাচীনকালে এখানে চাডি এবং রোয়াইদের মধ্যে কোনোপ্রকার সামাজিক ও বৈবাহিক সম্বন্ধ হতো না। ইদানীং পূর্বের সেই নিয়মনীতি ভেঙে লোকজন বেরিয়ে আসছে। এখন চাডি এবং রোয়াঁইদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হচ্ছে এবং এই বিভেদরেখা প্রায় মুছে গেছে।

মুসলমানদের মধ্যে পেশাভিত্তিক যেসব গোত্রকে দেখা যায় তারা হচ্ছে, জোলা, কুমার, তেলি, মলঙ্গি, কাঁহার, হাজাম, হরইল্যা।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পেশাভিত্তিক যেসব গোত্রকে দেখা যায় তারা হচ্ছে– ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কুলগুরু, অক্ষিত, পূজারি, অগ্রদানী, রসুই ব্রাহ্মণ, আচার্য ও গণক, কায়স্থ, বৈদ্য, নাপিত, ধোপা, তেলি, কামার, কুমার, ছাতিয়াল, বারুই, ডোম, কৈবর্ত, গোয়ালা, মালাকার, যুগী, হাড়ী, ভূঁইমালী, সুতার, চামার।

জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে বাঙালি বৌদ্ধ বা বড়ুয়া বৌদ্ধ, আরাকানি বংশোদ্ভূত রাখাইন বৌদ্ধ ও চাক বা তঞ্চঙ্গ্যা বৌদ্ধ।

www.pathagar.com

কক্সবাজারে পূর্বে কোনো খ্রিষ্টান অধিবাসী ছিল না। মধ্যযুগে জেলায় পর্তুগিজ জলদস্যুদের দাপট থাকলেও তাদের ভাষা কেউ রপ্ত করেছে এরকম কোনো তথ্য এযাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি। তবে পতুর্গিজদের দাপট কালেও এখানে কোথাও খ্রিষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিল না। স্থানীয় রাখাইনদের একশ্রেণির অসৎ লোক পর্তুগিজদের সাথে মিশে সমুদ্রে জলদস্যুতা তথা লুটপাট করত বলেই তাদের নাম এখানে 'মগ জলদস্যু' হিসেবে খ্যাত হয়েছে। বিগত ষাটের দশকে চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারায় খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরেই জেলায় খ্রিষ্টানদের আর্বিভাব হয়। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের আগমনে ও প্রভাবে জেলার বিভিন্ন নিম্নবর্গের ও দরিদ্রশ্রেণির হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকেরা এসব নিম্নবর্গের অসচ্ছল লোকজনকে আর্থিক সুবিধা দিয়ে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষা দেয়। এতে করে ডুলাহাজারা মেমোরিয়াল খ্রিষ্টান হাসপাতালের পাশে চা বাগান নামক স্থানে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের গ্রাম গড়ে ওঠে।

১৯৯১ সালে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর দেশি-বিদেশি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা কক্সবাজারের দুর্গত মানুষের পাশে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। সে সুযোগে কিছু ধর্ম-ব্যবসায়ী সংস্থা মানুষের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়াবার সুযোগে কিছু কিছু নিম্নবর্ণের লোকজনকে ধর্মান্তরিত করে। এর মাধ্যমে জেলায় দ্বিতীয় দফায় কিছু খ্রিষ্টবাদী লোকজন দেখা যায়।

বাংলাদেশ সরকারের ২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় কিছু না কিছু খ্রিষ্টান পাওয়া গেছে। জরিপ অনুযায়ী উখিয়া উপজেলায় ৩১ জন, কক্সবাজার সদরে ১৭ জন, টেকনাফে ৯জন, রামুতে ৪৪ জন, পেকুয়ায় ৬জন, চকরিয়ায় ১,২৬৫জন, কুতুবদিয়ায় ১জন এবং মহেশখালিতে ৬জন খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী রয়েছে।

১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জরিপ অনুযায়ী জেলার আয়তন (তৎকালীন মহকুমা) ছিল ৮৯৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ২,০০,১৬৯ জন। সর্বশেষ ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের জরিপে জেলার আয়তন ৯৬২ বর্গমাইল তথা ১,৪৯১.৮৫ বর্গকিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ২৩,৮১,৮১৬জন। তন্মধ্যে ১২,১৬,৬৪১ জন পুরুষ ও ১১,৬৫,১৭৫ জন মহিলা। জরিপে শহুরে বাসিন্দা ২,৯২,৫২৩ জন। এখানে শহর বলতে শুধু চারটি পৌরসভাকে বলা হয়েছে। জেলার চারটি পৌরসভা হচ্ছে যথাক্রমে কক্সবাজার সদর, চকরিয়া, টেকনাফ ও মহেশখালি।

জেলার ৮টি উপজেলায় চারটি পৌরসভা ছাড়াও ইউনিয়নের সংখ্যা হচ্ছে ৭২টি। জেলায় মোট মৌজার সংখ্যা ১৮৮টি। আর গ্রামের সংখ্যা ৯৯২টি। তবে গ্রামের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। কারণ প্রতিবছর জনসংখ্যা বাড়ছে, সাথে সাথে গ্রামের সংখ্যাও বাড়ছে। ইউনিয়নগুলোর মধ্যে কক্সবাজার সদর উপজেলায় রয়েছে ১০টি ইউনিয়ন, রামু উপজেলায় ১১টি, উখিয়া উপজেলায় ৫টি, টেকনাফ উপজেলায় ৬টি, মহেশখালিতে ৮টি, কুতুবদিয়া উপজেলায় ৬টি, পেকুয়া উপজেলায় ৭টি এবং চকরিয়া উপজেলায় ১৮টি। জেলার উপজেলাভিত্তিক আয়তন, লোকসংখ্যা, পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা এবং শিক্ষার হার ছকের মাধ্যমে নিচে দেওয়া হলো।[২৮]

www.pathagar.com

## বিভিন্ন উপজেলার আয়তন ও লোকসংখ্যা

| ক্রম | উপজেলার নাম | আয়তন (বর্গকিমি) | লোকসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | টেকনাফ | ৩৮৮.৬৬ | ২,৭৪,৮৭১ | ১,৩৮,৩৯৩ | ১,৩৬,৪৭৮ |
| ০২ | উখিয়া | ২৬১.৮০ | ২,১৫,৩৩৩ | ১,০৮,৫৭৮ | ১,০৬,৭৫৫ |
| ০৩ | কক্সবাজার সদর | ২২৮.২৩ | ৪,৭৯,১১৬ | ২,৫২,২৬৮ | ২,২৬,৮৪৮ |
| ০৪ | রামু | ৩৯২.৭১ | ২,৭৬,৮৮৫ | ১,৪০,১৮৭ | ১,৩৬,৬৯৮ |
| ০৫ | চকরিয়া | ৫০৩.৮৩ | ৪,৯৩,৫৪৯ | ২,৪৮,৮২৯ | ২,৪৪,৭২০ |
| ০৬ | পেকুয়া | ১৩৯.৬১ | ১,৭৮,১৩৫ | ৮৯,৬২৯ | ৮৮,৫০৬ |
| ০৭ | মহেশখালি | ৩৬২.১৮ | ৩,৩৩,৮১৯ | ১,৭২,১৯৩ | ১,৬১,৬২৬ |
| ০৮ | কুতুবদিয়া | ২১৫.৭৯ | ১,৩০,১০৮ | ৬৬,৫৬৪ | ৬৩,৫৪৪ |
| মোট জনসংখ্যা | | ২,৪৯১.৮৫ | ২৩,৮২,৪১৬ | ১২,১৬,৬৪১ | ১১,৬৫,১৭৫ |

## উপজেলাওয়ারী শিক্ষার হার

| ক্রম | উপজেলার নাম | পুরুষ | মহিলা | গড় হার |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | টেকনাফ | ২৯.৭% | ২৩.৬% | ২৬.৭% |
| ০২ | উখিয়া | ৩৮.০% | ৩৪.৫% | ৩৬.৩% |
| ০৩ | কক্সবাজার সদর | ৫০.৪% | ৪৭.৯% | ৪৯.২% |
| ০৪ | রামু | ৩৭.৮% | ৩৫.৩% | ৩৬.৬% |
| ০৫ | চকরিয়া | ৪৭.৯% | ৪৭.৪% | ৪৭.৬% |
| ০৬ | পেকুয়া | ৩৫.৬% | ৩৫.০% | ৩৫.৩% |
| ০৭ | মহেশখালি | ৩০.৫% | ৩১.১% | ৩০.৮% |
| ০৮ | কুতুবদিয়া | ৩৪.৮% | ৩৩.২% | ৩৪.০% |
| জেলার গড় শিক্ষার হার | | ৪০.৩% | ৩৮.২% | ৩৯.৩% |

## চ. নদ-নদী ও খাল-বিল

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। শত শত নদ-নদী শাখা-প্রশাখা নিয়ে পুরো দেশে জাল বিস্তার করেছে। কক্সবাজার জেলাতেও রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। বিশেষ করে সমগ্র কক্সবাজার জেলা পাহাড়ি এলাকা এবং পাহাড়ের অববাহিকায় অবস্থিত বলেই জেলার বিভিন্ন উপজেলায় শত শত নদ-নদী, খাল, ছড়া বিদ্যমান। পাহাড়ি অববাহিকায় বলেই জেলার সব কটি নদ-নদী ও ছড়ায় রয়েছে সুপেয় পানির ভাণ্ডার। জেলার প্রতিটি নদ-

www.pathagar.com

নদী ও ছড়ার পানি শুষ্ক মৌসুমে কাজে লাগিয়ে জেলায় ধানসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হয়। তবে জেলার উপকূলের নদীতে রয়েছে সাগরের লবণাক্ত পানি।

জেলার টেকনাফ সর্ব-দক্ষিণ সীমান্ত উপজেলা। আর উত্তরে রয়েছে পেকুয়া ও চকরিয়া উপজেলাদ্বয়। পেকুয়া-চকরিয়া থেকে শুরু করে ভূভাগের টেকনাফ উপজেলার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল ও ছড়া। জেলার দ্বীপ-উপজেলা মহেশখালি ও কুতুবদিয়ায় বলতে গেলে তেমন উল্লেখযোগ্য নদ-নদী নেই। তবে মহেশখালি দ্বীপ উপজেলা হিসেবে কয়েকটি ছোট ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের পাহাড়ি ছড়া রয়েছে। এসব পাহাড়ি ছড়ার মধ্যে মুদিরছড়া, আমবশ্যাখালি, হরিয়ারছড়া, কালারমারছড়া, পানিরছড়ার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে মহেশখালি ও মাতারবাড়ি-ধলঘাটা দ্বীপের মাঝখানে 'কুহেলিয়া' নামের একটি নদী কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের নদীসমূহের তালিকায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা নদী কি না এ নিয়ে রয়েছে মতভেদ। কারণ এই নদীর কোনো উৎস নেই। এটি মূলত একটি প্রণালি। তবে মহেশখালি দ্বীপের কয়েকটি ছড়ার পানি এই কুহেলিয়া নদীতে পড়ে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। কুতুবদিয়া দ্বীপে রয়েছে অনুরূপ একটি নদী। যার নাম কুমিরখালি। তবে উক্ত নদীর কোনো উৎপত্তিস্থল নেই। দ্বীপের বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের এই কথিত নদীটি উপজেলার আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের উপর দিয়ে কুতুবদিয়া চ্যানেলে পড়েছে।

জেলার অন্যান্য নদ-নদী ও ছড়াগুলোর মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নে মনখালি, পুরানপাড়া ছড়া, শীলখালি ছড়া, শীলখালি বড় ছড়া, ডাক ছড়া, বাইল্যাপাড়া ছড়া, হলবনিয়া ছড়া, জাহাজপুরা ছড়া, মাদারবনিয়া ছড়া, পাগলির ছড়া, পানির ছড়া, মাথাভাঙা বড় খাল, মারিশবনিয়া বড় ছড়া, বত্তার ছড়া, ডাকছড়া, মামু-ভাগিনার ছড়া, কচ্ছপিয়ার ছড়া, পিনিছভাঙা, নোয়াখালি বড় ছড়া, রাজার ছড়া বড়খালি, টেকনাফ সদর ইউনিয়নে রয়েছে রাজার ছড়া, হাবিরছড়া, মিঠাপানির ছড়া, দরগাহ ছড়া, লম্বরী ছড়া, লেঙ্গুরবিল ছড়া, রবইতলি, মহেশখালিয়া পাড়ার ছড়া, তুলাতলির ছড়া, মাইল্যারমার ছড়া ও পাইকর ছড়া। হোয়াইক্ষ্যং ইউনিয়নে রয়েছে পালংখালি খাল, ঘিলাতলি ছড়া, কাটাখালি ছড়া, মিজ্জির ছড়া, হোয়াইক্ষ্যং খাল, উনচিপ্রাং খাল, ঝিমংখালি খাল, চাংগ্রী খাল, খারাংখালি খাল। হ্নীলা ইউনিয়নে রয়েছে হ্নীলা খাল, রঙ্গিখালি খাল, আলীখালি খাল, হ্নেদা খাল, দক্ষিণ হ্নেদা খাল, মুচনি খাল, জাদিমুরা খাল, ওমর খাল, দমদমিয়া খাল, দমদমিয়া বিডিআর ক্যাম্প খাল, পাঠানকাটা খাল, সারিয়াং খাল ও কেরুনতলী খাল। সাবরাং ইউনিয়নে রয়েছে রেনদুম খাল, কুয়াউংছড়ি, সাবরাং খাল, হেচ্ছার খাল, কাইয়ুকখালি খাল, ঝর্না ছড়া। সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইউনিয়নে রয়েছে ইনানী খাল, হুইচ কাটাবনিয়া ও গলাচিপা। সেন্টমার্টিন দ্বীপের এসব ছড়ার কোনো উৎস নেই। দ্বীপের পানি চুইয়ে সাগরে পড়ার জন্যই পানি চলাচলের নালার সৃষ্টি হয়েছে।

উখিয়া উপজেলায় রয়েছে পালংখালি খাল, মনখালি খাল, রেজু খাল, হিজলিয়া খাল, ধামন খাল, রত্না খাল, মরিচ্যা খাল (মরিচ্যা খালটি রামু ও উখিয়া উপজেলার সীমানা নির্ধারণী খাল), সোনাইছড়ি, বালুখালির ছরা, থিমছরি।

রামু উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদ-নদী, খাল ও ছড়াসমূহের মধ্যে রয়েছে, বাঁকখালি, গর্জইখাল, রেনুরছড়া, থিমছড়ি, হিমছড়ি (ইদগড় ইউনিয়নের অধীন),

চেইন্দাখাল, করইল্যাছড়ি, পানেরছড়া (দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন), মিঠাছড়ির খাল, মুরাংছড়ির নাসি, জাংছরি, ছোট জাংছরি, কালারপাড়া খাল, ধইল্যাছরা, গোয়ালিয়ারছরা, পাগলিরছরা (রামু উপজেলার অংশ), সোনাইছড়ি খাল (জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন), সোনাইছড়ি খাল (কাউয়ারখোপ ইউনিয়ন), ফারি খাল, নন্দাখালির ছরা, জোয়ারি খাল, ধোয়াপালং খাল, ধেচুয়াপালং-এর ছড়া, মরিচ্যাখাল, নুনাছড়ি, খুনিয়াপালং ইউনিয়নের হিমছরি বা হিমছড়ি (যেখানে সৃষ্টি হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ঝর্না), রশিদ নগর ইউনিয়নের পানিরছড়া।

চকরিয়া উপজেলার নদী, খাল, ছড়াসমূহের মধ্যে রয়েছে- মাতামুহুরি, বুড়ামাতামুহুরি, ভোলাখাল, ফুলছড়ি খাল বা হালের ফুলেশ্বরী, খুটাখালির ছরা, পাগলির ছড়া, গুইয়ারছড়ি, বগাছড়ি, ফাইস্যাখালির ছড়া, সোনাইছড়ি (বরইতলি ইউনিয়ন), বাইন্যারছরা, হারবাং-এর ছড়া, ফাইতং খাল, বমু খাল, পহরচাঁদা খাল, কুমারির ছড়া, মেদা খাল, বদরখালি খাল, গোমারফাড়ি খাল, ডুলাহাজারার ছড়া, হারগেজা ছড়া ও অংজারগোধা খাল।

পেকুয়া উপজেলায় নদ-নদী, খাল-বিল বলতে গেলে তেমন নেই। বিশেষ করে পেকুয়া উপজেলাটি চকরিয়া উপজেলার ভাটিতে বিধায় চকরিয়া উপজেলার প্রধান নদী মাতামুহুরির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা পেকুয়া উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পেকুয়া উপজেলার পাহাড়ি ইউনিয়ন শীলখালি ও বারবাকিয়া ইউনিয়নের মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়ি ছড়া রয়েছে। এছাড়াও পেকুয়া উপজেলার উত্তর পাশে রয়েছে রাজাখালি খাল। এই রাজাখালি খালটি পেকুয়া এবং চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি উপজেলাকে পৃথক করে রেখেছে। এই রাজাখালি খালটি মূলত কক্সবাজার জেলা ও চট্টগ্রাম জেলার সীমানা নির্ধারণী খাল হিসেবে অবস্থান করছে। টৈটং ইউনিয়নের সোনাইছরি উল্লেখযোগ্য। কক্সবাজার সদর উপজেলার নদ-নদী, খাল-বিলসমূহের মধ্যে রয়েছে বাঁকখালি নদী, পাতলি খাল, ছনখোলা খাল, মাছুয়াখালি খাল, তেতৈয়া খাল, কলাতলীর ছড়া (বর্তমানে বড় ছরা নামে পরিচিত), চৌফলদণ্ডি খাল, ভারুয়াখালি খাল, ইছাখালি, কালিরছরা খাল, কাইন্যাছড়া, ঈদগাঁও নদী (স্থানীয়ভাবে কথিত ঈদগাঁর ছরা), কক্সবাজার শহরের ছরাগুলোর মধ্যে রয়েছে তারাবনিয়ারছরা, রুমালিরছরা, মুরাংছরা ও চাউলবাজার ছরা। তবে বর্তমানে কক্সবাজার পৌর এলাকার কোনো ছরাকেই ছরা বলা যাবে না। ছরাগুলো দখল হতে হতে শীর্ণকায়া হয়ে গেছে। ছরাগুলো বর্তমানে পানি নিষ্কাশনের নালায় পরিণত হয়েছে। এসব ছরা দখল হওয়ার ফলে বর্ষাকালে একটু বৃষ্টি হলেই প্রতিবছর শহর প্লাবিত হয়ে নগরবাসী ও ব্যবসায়ীদের লাখ লাখ টাকার সম্পদ নষ্ট হয়। জেলায় হাওর-বিলসমূহের মধ্যে বর্তমানেও কয়েকটি বিলের অস্তিত্ব রয়েছে। হাওর বলতে যা বুঝায় কক্সবাজারে সে রকম হাওর নেই। তবে যে কয়টি বিলের অস্তিত্ব রয়েছে তার মধ্যে কক্সবাজার সদর উপজেলার জালালাবাদ ইউনিয়নের ধমকা বিল, চকরিয়া উপজেলার নলবিলা বিল, হারবাং-এর ডেবা, বাইন্যাছড়ার ডেবা ও ডেইংগ্যাকাটা। উখিয়া উপজেলায় মাছকারিয়া ও শৈলেরঢেবা। রামু উপজেলার জোয়ারিয়ার বিল। তবে ইতোমধ্যে অনেক বিল এবং জলাভূমি পলি পড়ে ভরাট হয়ে গেছে। বর্তমানে বিল তথা জলাভূমি হিসেবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে

www.pathagar.com

উখিয়া উপজেলার মাছকারিয়া, চকরিয়া উপজেলার নলবিলা, বাইন্যারছড়ার ঢেবা, হারবাং-এর বিল।

পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় কক্সবাজারে অনেক ছোট ছোট নদ-নদী, ছড়া সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে মূলত বর্ষা মওসুমে পানির প্রবাহ দেখা যায়। শুষ্ক মওসুমে এসব ছড়াগুলো শুকিয়ে যায়। সেই কারণে এসব ছোটখাট ছড়ার বর্ণনা না দিয়ে কেবল উল্লেখযোগ্য নদীগুলোর বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করা হলো। জেলার বৃহত্তম নদী মাতামুহুরি ও বাঁকখালি। এছাড়াও নাফ নদী, রেজু, মরিচ্যা খাল, সোনাইছড়ি, ঈদগাঁও ইত্যাদি খাল পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে একাধিক উপজেলা পেরিয়ে বঙ্গোপসাগরে বা মাতামুহুরি বা বাঁকখালি নদীতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। তাই এসব নদী ও খাল জেলার কৃষি বিপ্লবে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

জেলার দীর্ঘতম নদী মাতামুহুরি উত্তর আরাকান পর্বতমালা তথা আরাকান ইউমা রেঞ্জ হতে উৎপন্ন হয়ে আরাকান ও পার্বত্য বান্দারবান জেলার আলিকদম উপজেলার বুক চিরে লামা উপজেলার উপর দিয়ে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার বমু ইউনিয়ন হয়ে কক্সবাজার জেলায় প্রবেশ করেছে। পরে নদীটি আঁকাবাঁকা সাপের মতো পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে এবং গতি পরিবর্তন করে মহেশখালি ও কুতুবদিয়া চ্যানেল হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। মাতামুহুরি নদী উপকূলীয় মোহনায় গিয়ে ৩টি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভোলা খাল ও বুড়া মাতামুহুরি। নদী মোহনায় সৃষ্টি হয়েছিল সুন্দরবনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করার জন্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। উক্ত এলাকা 'চকরিয়া সুন্দরবন' নামে খ্যাত। নদীর তীরের উল্লেখযোগ্য গ্রামের নাম চকরিয়া। বার্মিজ নাম 'মা-মুরি' হতে 'মাতামুহুরি' নদীর নাম হয়েছে বলে গবেষকদের অভিমত। আবার কারো মতে চাকমা শব্দ 'মুরি মা' হতে 'মাতামুহুরি' নাম। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নদীর স্রোতে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কের (তৎকালীন আরাকান সড়কের) প্রায় ২০০০ ফুট সড়ক বিলীন হয়ে গিয়েছিল। ফলে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামগামী এবং চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হতো। সে সময় জনগণকে নদী পেরিয়ে যাতায়াত করতে হতো। নদীভাঙনের ফলে চকরিয়া সদরের চিরিঙ্গায় সৃষ্টি হয় মৌলভিরকুম। মাতামুহুরি নদীর উভয় তীরে গড়ে উঠেছে জনপদ। এর কোনো কোনো জনপদ হাজার বছরের প্রাচীন। বিশেষ করে খোদাবক্স খান-এর কথা বলা যেতে পারে। ১৫৫০ সালে পর্তুগিজ ঐতিহাসিক জোঁয়া ডি বেরস অংকিত মানচিত্রে বর্তমান চকরিয়া উপজেলার পাহাড়ি এলাকা বিশেষ করে মানিকপুর, সুরাজপুরসহ লামা, আলিকদম এলাকা খোদা বকশ খানের শাসিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই খোদা বকশ খানের এলাকা আলিকদম থেকে চকরিয়া ও কক্সবাজার জেলাব্যাপী বিস্তৃত। এটি হচ্ছে এই জনপদের প্রাচীন মানচিত্র। খোদা বকশ খান শাসিত এলাকাটি মূলত মাতামুহুরি নদীর তীরেই গড়ে উঠেছিল। যদিও খোদা বকশ খানের কোনো ধরনের স্মৃতি চিহ্ন এযাবৎ কোথাও পাওয়া যায়নি বা সে সময়কার কোনো স্থাপত্য নিদর্শন কোথাও এযাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি।

মাতামুহুরি নদীর উপর দিয়ে চলে গেছে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়ক। যে সড়ক কক্সবাজার থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল। কিন্তু দিন বদলে

www.pathagar.com

যাচ্ছে। মানুষের প্রয়োজনে নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে নির্মাণ করা হয়েছে একাধিক ব্রিজ ও সেতু। বর্তমানে নদীর উপরে চিরিঙ্গা, বাঘগুজরা, মানিকপুর-সুরাজপুর, আলিকদম পয়েন্টে ব্রিজ নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও পেকুয়া উপজেলায় নদীর শাখা নদীতে নির্মিত হয়েছে সেতু। মাতামুহুরি নদী প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ।

জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী বাঁকখালি। নদীটি বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব সম্পন্ন। বাঁকখালি নদী উত্তর আরাকানের ইউমা পর্বতমালা হতে উৎপন্ন হয়ে পার্বত্য বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা হয়ে কক্সবাজার জেলায় প্রবেশ করেছে। জেলার রামু উপজেলার গর্জনিয়া ইউনিয়ন হয়ে একই উপজেলার কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন, কাউয়ারখোপ ইউনিয়ন, ফতেখাঁরকুল, চাকমারকুল ও রাজারকুল ইউনিয়ন হয়ে দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নকে একপাশে রেখে অপর পাশে কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের খরুলিয়া গ্রামকে রেখে কক্সবাজার সদর উপেজলায় প্রবেশ করেছে। পরে বাঁকখালি নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বাঁকখালি নদীর উত্তর পাশে রয়েছে কক্সবাজার উপজেলার খুরুস্কুল ইউনিয়ন, পাতলি মাছুয়াখালি বা পিএমখালি ইউনিয়ন, রামু উপজেলার ফতেখাঁরকুল ইউনিয়ন, আরেকটু উপরে গিয়ে কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের উপর দিয়ে বেয়ে এসেছে। নদীর দক্ষিণ পাশে রয়েছে রামু উপজেলার রাজারকুল, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন, কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলওয়াঞ্জা ইউনিয়ন এবং কক্সবাজার পৌর এলাকা তথা পর্যটন শহর কক্সবাজার। বাঁকখালি নদীর স্রোতবাহিত পলিতে বঙ্গোপসাগরে গড়ে উঠেছে স্বর্ণের দ্বীপ সোনাদিয়া।

নদীতে অত্যধিক বাঁক রয়েছে বিধায় নদীর নাম 'বাঁকখালি' হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। প্রাচীনকালে নদীর নাম বাঁকখালি শব্দটি 'বাঘখালি' লেখা হতো। 'বাঘ' অর্থ ইংরেজি Tiger। পাহাড়ি স্রোতের পানিতে বাঘ ভেসে গিয়ে মারা গেছে বিধায় নদীর নাম 'বাঘখালি' হয়েছে বলে কারো কারো অভিমত। তবে ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ ঐতিহাসিক জো-আঁ-দ্যা-বারোজ তাঁর মানচিত্রে এ অঞ্চলের নাম 'বাকোলিয়া' বলে উল্লেখ করেছেন। জো-আঁ-দ্যা-বেরোস তাঁর অংকিত মানচিত্রে `I Bakolia' উল্লেখ করেছেন। ১৫৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি নাবিক ছিদী আলী ছিলিবী তাঁর বর্ণনাতেও এ অঞ্চলকে `I Bakolia' বলেই উল্লেখ করেছেন। ছিদী আলী ছিলিবী ইন্দোনেশিয়া উপকূল থেকে ভারত পর্যন্ত উপকূলের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই অঞ্চলকে 'বাকোলিয়া' বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'বাকোলি' নামকরণ থেকেই নদীর নাম 'বাঁকখালি' হয়েছে বলে অনেক গবেষকের ধারণা।

বাঁকখালি কক্সবাজারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী। প্রাচীনকালে নৌকায় করে এসে লোকজন এই নদীর দু'পাশে গড়ে তুলেছে গ্রাম, শহর, বন্দর, সভ্যতা। পর্তুগিজ জলদস্যুরা এই নদী হয়ে উপরের দিকে উঠে লুটপাট করত। স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পদ লুটপাট করার পাশাপাশি এখানকার লোকজনকে ধরে নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছে। এই নদীর সুপেয় পানিকে কাজে লাগিয়ে প্রতিবছর শুষ্ক মৌসুমে জেলায় উৎপন্ন করা হচ্ছে কোটি টাকার খাদ্য-শস্য। শাক-সবজি থেকে শুরু করে বোরো ধান। স্থানীয় জনগণের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে ১৯৯৩ সালে নদীর সদর উপজেলার ছনখোলা পয়েন্টে নির্মাণ করা হয়েছে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

ইতিহাসে প্রথম রাবার ড্যাম। এই রাবার ড্যাম প্রযুক্তি বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থায় নতুন সংযোজন। চীনা প্রযুক্তি ও কারিগরি পরামর্শ কাজে লাগিয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর উক্ত রাবার ড্যাম নির্মাণ করে। এই রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে শুষ্ক মওসুমে নদীর সুপেয় পানিকে আটকিয়ে রেখে কক্সবাজার সদর ও রামু উপজেলার কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে উৎপাদন করা হচ্ছে কোটি কোটি টাকার বোরো ধান ও শাক-সবজি। এই রাবার ড্যামের সফলতাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জেলার পাহাড়ি নদী, খাল ও ছড়াতে নির্মাণ করা হয়েছে রাবার ড্যাম বা রাবারের বাঁধ। এই রাবার ড্যামের সাথেও রয়েছে নদীর এপার-ওপার করার জন্য পায়ে হাঁটা একটি ফুট ব্রিজ।
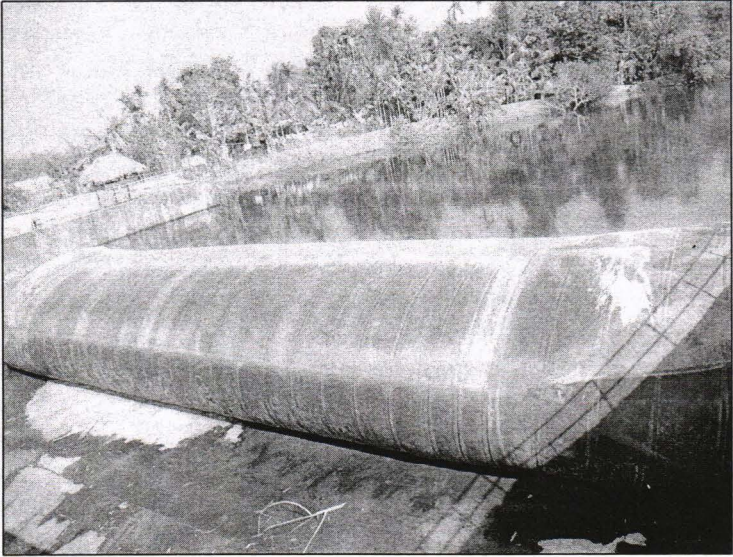
*কক্সবাজার বেশ কয়েকটি নদীতে চীনা প্রযুক্তিতে রাবারড্যাম নির্মাণ করে শুষ্ক মওসুমে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হচ্ছে*

বাঁকখালি নদী জেলার অর্ধেকের বেশি জনপদকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। পরে জনগণের যাতায়াত সুবিধার্থে নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে নির্মাণ করা হয়েছে ৫টি ব্রিজ। এ ব্রিজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে রামু উপজেলার ফতেখাঁরকুল ও রাজারকুল ইউনিয়েনের সংযোগ ব্রিজ বা শিকলবাহা ব্রিজ। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে দক্ষিণ ফ্রন্টে যাতায়তের সুবিধার্থে শিকলবাহা নামক স্থানে উক্ত ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছিল।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫১ সালে কক্সবাজার শহরের সাথে চট্টগ্রাম ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগোযোগ গড়ে তোলার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল দ্বিতীয় ব্রিজটি। কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের এস এম ঘাট নামক স্থানে

www.pathagar.com

উক্ত সেতু নির্মাণ করা হয়। এস এম অর্থাৎ সগির মোহাম্মদ নামের জনৈক ব্যক্তি ঝিলংজা ইউনিয়নের পাতলি ও মুহুরিপাড়ার মধ্যস্থলের খেয়া পারাপারের দায়িত্বে ছিল বলেই তার নামানুসারে ঘাটটির নামকরণ হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে 'বাঁকখালি সেতু' নাম দিয়ে উক্ত স্থানে নির্মাণ করা হয় আর সি সি অবকাঠামোর ব্রিজ। এছাড়াও ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নদীর রামু উপজেলার কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের মুইষকুম নামক স্থানে আরো একটি স্টিল স্ট্রাকচারের সেতু নির্মাণ করা হয়। কক্সবাজার শহরের পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন খুরুস্কুল। উক্ত ইউনিয়নের হাজার হাজার জনসাধারণকে নৌকায় করেই শহরে আসা-যাওয়া করতে হতো। পরবর্তীতে সড়ক ও জনপথ বিভাগ ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে শহরের মাঝেরপাড়া নামক স্থানে একটি লোহার স্ট্রাকচারের ব্রিজ নির্মাণ করে। যদিও ব্রিজের নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছিল ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। সর্বশেষ ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে রামু উপজেলার পাহাড়ঘেরা ইউনিয়ন গর্জনিয়া ও কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের মাঝখানে নির্মাণ করা হয় ৫ম ব্রিজটি। সড়ক ও জনপথ বিভাগ ব্রিজ ৫টি নির্মাণ করেছে। তবে রাবার ড্যাম সংলগ্ন ফুট ব্রিজসহ নদীর উপরে নির্মিত ব্রিজের সংখ্যা ৬টি। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের যাতায়াতের মাধ্যম ছিল জলপথ। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জলপথে চলাচল করত স্টিমার। এমনকি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও কক্সবাজার শহরের কস্তুরাঘাটে স্টিমার নোঙর করত। এই স্টিমার সার্ভিসের কারণেই কক্সবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ'। বাঁকখালি নদীর তীরে কক্সবাজার শহরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কক্সবাজার শহরের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ 'বদরমোকাম'। আধ্যাত্মিক পুরুষ হযরত বদর আলম বা বদর শাহ এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে এলাকায় প্রবাদ আছে।

নাফ বাংলাদেশের তথা কক্সবাজার জেলার সর্ব দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত নদী। নদীটি বাংলাদেশ ও মিয়ানমার (প্রাক্তন বার্মা রাজ্য) কে পৃথক করে রেখেছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক নদী। নদীর তীরে বাংলাদেশের অংশে গড়ে উঠেছে সীমান্ত উপজেলা শহর টেকনাফ এবং টেকনাফ স্থলবন্দর। অন্যদিকে মিয়ানমারের অংশে গড়ে উঠেছে মিয়ামারের আরাকান প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর মংডু ও মংডু টাউনশিপ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে টেকনাফ স্থলবন্দর।

আন্তর্জাতিক নদী নাফ মিয়ানমারের আরাকান ইউমা রেঞ্জ থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশের পার্বত্য বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুংধুম ইউনিয়নের তুমব্রু গ্রামে তুমব্রু খাল নামে প্রবেশ করেছে। তুমব্রুতে নদীর এক পাশে বাংলাদেশের তুমব্রু নর্থ ও আরেক পাশে মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের মংডু টাউনশীপের তুমব্রু সাউথ। বর্তমানে মিয়ানমার সরকার তুমব্রু সাউথকে টাউনশিপে উন্নীত করেছে। তুমব্রু সাউথে রয়েছে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষীদের একটি সেক্টর হেডকোয়ার্টার। নদীটি একটু গড়িয়ে পশ্চিমে এগিয়ে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের ঢেকিবুনিয়া গ্রামে ঢেকিবুনিয়া নাম ধারণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ঢেকিবুনিয়া থেকে নদীটি কয়েক কিলোমিটার গড়িয়ে নাফ নদী নামধারণ করে বাংলাদেশ-মিয়ানমারকে দু'পাশে রেখে এঁকেবেঁকে টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপের বদরমোকাম মোহনায় বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

বার্মিজ ভাষায় নাফ নদীকে 'নে ম্রাই' বলা হয়। বার্মিজ শব্দ 'নে ম্রাই' অর্থ 'দেবতার নদী'। 'নে' অর্থ 'দেবতা', 'ম্রাই' অর্থ নদী। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কটি টেকনাফ শহরে প্রবেশের পূর্বে 'নে টং' নামের একটি পাহাড় রয়েছে। বার্মিজ ভাষায় 'নে টং' অর্থ দেবতার পাহাড়। উক্ত পাহাড় সংলগ্ন গ্রামকে নাইট্টং পাড়া বলা হয়। গবেষকদের মতে 'নে ম্রাই' শব্দটি বিকৃত হয়ে নাফ নদী নামকরণ হয়েছে। গবেষকদের মতে 'নে' বর্ণটি ক্রমে নাফ হয়েছে। নাফ নদীর দু'পাশে কক্সবাজারের উখিয়া, টেকনাফ এবং নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার পাহাড়ি এলাকা। অপরদিকে মিয়ানমারের নবগঠিত তুমব্রু ও মংডু টাউনশিপের পুরো এলাকা পাহাড় বেষ্টিত। ফলে বাংলাদেশ ও মায়েনমারের পাহাড়ি এলাকা থেকে অসংখ্য ছোট-বড় খাল, ছড়া উৎপন্ন হয়ে সরাসরি নাফ নদীতে পড়েছে।

নদ-নদীর মতো জেলার বিভিন্ন উপজেলায় রয়েছে বিল ও জলাশয়। তার সংখ্যা ও পরিমাণও খুব বেশি নয়। বিল ও জলাশয়সমূহের মধ্যে রয়েছে উখিয়া উপজেলার মাছকারিয়া বিল, চকরিয়া উপজেলার নলবিলা, বাইন্যারছরা ঢেবা ও হারবাং-এর ঢেবা।

প্রায় দেড় হাজার একর জমি নিয়েই উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের মাছকারিয়া বিল। বর্তমানে বিলের চারপাশে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তবে এখনো শুষ্ক মওসুমে প্রচুর পরিমাণ অতিথি-পাখির আগমন ঘটে। অসাধু লোকজন বিভিন্ন উপায়ে বিশেষ করে জাল দিয়ে, ঘেরটোপ দিয়ে, বড়শি দিয়ে অতিথি পাখি শিকার করে এবং বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করে। বর্ষা ও শুষ্ক মওসুমে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। শুষ্ক মওসুমে উক্ত বিল থেকে লাই নিয়ে কারি কারি মাছ পাওয়া যায় বলেই বিলের নাম 'মাছকারিয়া' হয়েছে বলে স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা নিশ্চিত করেছেন। মাছকারিয়া বিল বনাঞ্চলের মধ্যখানে বিধায় শুষ্ক মওসুমে বন্য পশু-পাখি এখানে তাদের পানির তৃষ্ণা মিটায়।

চকরিয়া উপজেলার নলবিলা জলাভূমিটি লক্ষ্যারচর ও কাকারা ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত। কয়েক হাজার একর জমির সমন্বয়ে গঠিত নলবিলা জলাভূমিটিও বর্তমানে অবৈধ দখলে চলে যাচ্ছে। মূলত দু'পাহাড়ের মাঝখানে এই জলাভূমির অবস্থান। এখানে শীত মওসুমে প্রচুর অতিথি পাখি দেখা যায়। রক্ষাণাবেক্ষণসহ ব্যবস্থাপনার অভাবে এই জলাভূমিটিও অবৈধ দখলে চলে যাচ্ছে। শীত মওসুমে বন্য পশু-পাখি এই জলাভূমিতে তাদের তেষ্টা মেটায়। বর্তমানে জলাভূমিটি দখল করে মিঠা পানির মাছের চাষ করছে।

জেলার বৃহৎ জলাশয়টি অবস্থিত চকরিয়া উপজেলার বরইতলি ইউনিয়নে। কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পশ্চিম পাশে ও বাইন্যারছড়া-মগনামা-কুতুবদিয়া সড়কের দক্ষিণ পাশে এই বৃহৎ জলাশয়ের অবস্থান। প্রায় তিন হাজার একর জমি নিয়ে এই জলাভূমিটি অবস্থিত। শীত মওসুমে এখানে প্রচুর অতিথি-পাখির দেখা মিলে। পাওয়া যায় প্রচুর মিষ্টিপানির মাছ। হারবাং-এর ঢেবা কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পশ্চিম পাশে চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নে অবস্থিত। কয়েক শতাব্দী আগেও হারবাং-এর ঢেবার ব্যাপকতা ছিল। কিন্তু বর্তমানে উক্ত ঢেবার আকার আয়তন ক্ষীণ

www.pathagar.com

থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণ করে মিষ্টি পানির মাছ চাষ করা হচ্ছে।

## ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

"১৭৬০ সালে বর্তমান কক্সবাজার জেলার কিছু অংশসহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজ অধিকারভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু কিছু অংশ এর বাইর থেকে যায়। ১৭৮৪ সালে বার্মা আরাকান দখল করে নেয়ার পরেই কক্সবাজার আরাকান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের দেওয়ানী তথা শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে। চট্টগ্রামে সরকারিভাবে ১৮৩৬ সালে 'চট্টগ্রাম জিলা স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলেও কক্সবাজারে মাধ্যমিক (ইংরেজি) শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে আরো ৩৮ বছর পরে। ১৮৬৯ সালে কক্সবাজার মহকুমা সদরকে পৌরসভায় উন্নীত করার পরেই ১৮৭৪ সালে প্রথম এম ই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯০৮ সালে কক্সবাজার এম ই স্কুলটি সরকারি করা হয়। বস্তুত রামুতে খিজারি দালাল কর্তৃক ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত রামু খিজারি এম ই স্কুলটি জেলার প্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯১৯ সালে পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে এটি স্বীকৃতি লাভ করে।"[২৯]

কক্সবাজার জেলায় সাক্ষরতার হার ৩৯.৩ শতাংশ। এরমধ্যে পুরুষ ৪০.৩ শতাংশ ও নারী শিক্ষার হার ৩৮.২ শতাংশ। জেলায় কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নেই। তবে উচ্চ শিক্ষার অভাব পূরণ করছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কক্সবাজার সরকারি কলেজ, চকরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও কক্সবাজার সিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। কক্সবাজার জেলায় সবমিলিয়ে কলেজের সংখ্যা ২৯টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮০টি এবং মাদ্রাসা ১৩৩টি। তবে কওমি মাদরাসার সংখ্যা আরো অনেক বেশি। কক্সবাজারে রয়েছে কক্সবাজার শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, কক্সবাজার বিএড কলেজ। এছাড়াও ২০১৩ সালে 'কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' নামে জেলায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার সিটি কলেজ, চকরিয়া কলেজ, উখিয়া কলেজ, মহেশখালি কলেজ, রামু কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স চালু করেছে।

কারিগরি শিক্ষার জন্য রয়েছে সরকারি পরিচালনাধীন কক্সবাজার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, কক্সবাজার টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, রামু ভোকেশনাল টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট।

চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য ২০০৮ সালে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ। জেলা-সদরে রয়েছে একটি সরকারি নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মেডিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল এবং বেশ কয়েকটি বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট।

এর পরেই জেলার শিক্ষা বিস্তারে স্কুল, ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকে যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তারই ধারবাহিকতায় কক্সবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রাথমিক

www.pathagar.com

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার বিএড কলেজ। এছাড়াও জেলায় রয়েছে বেশ কিছু প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসব মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রামু খিজারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঈদগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, চকরিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, পেকুয়া জিএমসি ইনস্টিটিউশন, কুতুবদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, মহেশখালি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়। ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ঈদগাঁও আলমাছিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা, চকরিয়া আনোয়ারুল উলুম মাদ্‌রাসা ও হাশেমিয়া (কামিল) মাদ্রাসা। নারীশিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কক্সবাজার সরকারি মহিলা কলেজ, কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ইসলামিয়া মহিলা কামিল মাদ্‌রাসা ও কক্সবাজার আদর্শ মহিলা মাদ্‌রাসা।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। তাই ইনফরমেশন টেকনোলজি তথা আইটি বিষয়ে পড়ালেখার জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে এসেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ট্রেডে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষিত করার কাজ করছে। কক্সবাজার শহর সমাজসেবা প্রকল্প, জাতীয় মহিলা সংস্থা কক্সবাজার জেলা শাখা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় মহিলা সংস্থা মহিলাদের সেলাই শিক্ষা দিয়ে প্রশিক্ষিত করার কাজ করে যাচ্ছে।

**কক্সবাজার সরকারি কলেজ :** ১৯৬২ সালে কক্সবাজারের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসকসহ স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও সমাজসচেতন লোকজনের উদ্যোগে কক্সবাজার কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালে কলেজটিকে সরকারি করা হয়। এটাই জেলার সর্বোচ্চ ও একমাত্র সরকারি কলেজ। বর্তমানে কক্সবাজার সরকারি কলেজে বেশকিছু বিষয়ে সম্মানসহ মাস্টার্স চালু হয়েছে। পুর্বে কক্সবাজার থেকে কোনো শিক্ষার্থীকে মাস্টার্স ডিগ্রি নিতে হলে ১৬০ কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রাম শহর বা আরো দূরে রাজধানী ঢাকায় গিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি নিতে হতো।

**কক্সবাজার সিটি কলেজ :** ১৯৯৩ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯৮ সালে ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়। ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকেই কলেজে কয়েকটি বিষয়ে অনার্স চালু করা হয়। সর্বশেষ ২০১৩ সালে মাস্টার্স ক্লাশ শুরু করা হয়।

**কক্সবাজার আইন কলেজ :** ১৯৮৫ সালে কক্সবাজার আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইন বিষয়ে ডিগ্রি নেওয়ার জন্য পূর্বে চট্টগ্রাম বা রাজধানী ঢাকা যাওয়ার প্রয়োজন হতো।

**চকরিয়া কলেজ :** জেলার বৃহত্তম উপজেলা চকরিয়ার উপজেলা সদরে ১৯৬৮ সালে চকরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে কলেজে ডিগ্রি ক্লাশ যুক্ত করা হয়। ২০১২ কলেজে কয়েকটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়।

**কক্সবাজার সরকারি মহিলা কলেজ :** নারীশিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে এটি সরকারিকরণ হয়। বর্তমানে কলেজে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ডিগ্রি পর্যায়ে পড়ালেখা হচ্ছে।

www.pathagar.com

**কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় :** ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জেলার প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। প্রথমে এম ই স্কুল হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯০৮ সালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ১৯২৩ সালে এম ই স্কুলের পাশেই কক্সবাজার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেই বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হয়।

**কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় :** জেলার নারীশিক্ষার প্রসারে ১৯৬০ সালেই কক্সবাজার বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর সূচনা হয় ১৯২৩ সালে। শহরের লালদিঘির উত্তর পাড়ে কক্সবাজার মিউনিসিপ্যালটি-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মেয়েদের জন্য অবৈতনিক পাঠশালা চালু করা হয়। উক্ত পাঠশালা ক্রমে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

**রামু খিজারি উচ্চ বিদ্যালয় :** রামুর রাখাইন দানবীর খিজারি দালালের আর্থিক সাহায্যে ১৯১৪ সালে রামু খিজারি এম ই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালেই এম ই স্কুলটি উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে উন্নীত হয়।

**চকরিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় :** ১৯১৯ সালে চকরিয়া সদরে এম ই স্কুল হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। চকরিয়ার কাকারা গ্রামের জমিদার মোস্তাক আহমদ চৌধুরীর আর্থিক অনুদানে ও বদান্যতায় ১৯৩০ সালে এটি উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে উন্নীত হয়।

**পেকুয়া জিএমসি ইনষ্টিটিউশন :** জেলা প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পেকুয়া জিএমসি ইন্সটিটিউটও একটি। স্থানীয় জমিদার গুরা মিয়া চৌধুরীর অনুদান ও বদান্যতায় তাঁর নামেই ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। উক্ত বিদ্যালয়ে জেলার গুরু ট্রেনিং শিক্ষা (জিটি) কেন্দ্র চালু করা হয়।

**ঈদগাঁও আলমাছিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা :** ১৯২৮ সালে স্থানীয় জমিদার খান বাহাদুর মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরীর আর্থিক অনুদান ও বদান্যতায় তাঁর স্ত্রীর নামে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

**চকরিয়া আনোয়ারুল উলুম মাদ্‌রাসা :** এটি জেলার সবচেয়ে প্রাচীন মাদ্‌রাসা। তৎকালীন মহকুমাবাসীর মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯১৮ সালে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

**হাশেমিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা :** তৎকালীন মহকুমা সদরে ১৯৫২ সাল প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে মাদ্‌রাসাটি জেলার সর্বোচ্চ দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শহরের টেকপাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব কলিমুল্লাহ্‌ কন্ট্রাকটরের আর্থিক অনুদান ও বদান্যতায় তাঁর পিতার নামে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

**ইসলামিয়া মহিলা কামিল মাদ্‌রাসা :** নারীসমাজকে দ্বীনি শিক্ষায় দিক্ষিত করার জন্য ১৯৭৮ সালে স্বতন্ত্র মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি জেলার মহিলাদের জন্য প্রথম মাদ্‌রাসা। ২০০০ সালে মাদ্‌রাসায় মাস্টার্স চালু করা হয়। ২০০৯ সালেই কয়েকটি বিষয়ে অনার্স চালু করা হয়।

**কক্সবাজার আদর্শ মহিলা কামিল মাদ্‌রাসা :** নারীসমাজকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ১৯৮৯ সালে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ২০১০ সালেই কুষ্টিয়া

www.pathagar.com

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় মাদ্‌রাসায় কয়েকটি বিষয়ে সম্মান কোর্স চালু হয়েছে। তবে মাদ্‌রাসায় ২০০২ সাল থেকে মাস্টার্স সমমানের কামিল চালু হয়েছে।"[৩০] শিক্ষাবিদদের মাঝে স্মরণীয় ব্যক্তিত্বরা হচ্ছেন – মওলানা মুজহেরুল হক চৌধুরী, মওলানা আবদুল আলী দুররি, প্রিন্সিপ্যাল মোজাফ্‌ফর আহমদ, অধ্যাপক নূর আহমদ, অধ্যক্ষ স আ ম শামসুল হুদা চৌধুরী, অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, তালেব উল্লাহ মাস্টার, মওলানা মুজহের আহমদ, ছিদ্দিক আহমদ, হামিদ খান, এ কে এম মুজহেরুল হক, অমীয় বড়ুয়া, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বড়ুয়া, কক্সবাজার সদর উপজেলার ঈদগাঁও এলাকার মমতাজ উদ্দিন আহমদ-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

## জ. পত্রপত্রিকা

১. দৈনিক কক্সবাজার (রঙিন), ২. দৈনিক সৈকত, ৩. দৈনিক আজকের দেশ-বিদেশ, ৪. দৈনিক বাঁকখালী (রঙিন), ৫. দৈনিক হিমছড়ি, ৬. দৈনিক দৈনন্দিন, ৭. দৈনিক আপনকণ্ঠ, ৮. দৈনিক সমুদ্রবার্তা, ৯. দৈনিক সমুদ্রকণ্ঠ, ১০. দৈনিক আজকের কক্সবাজার, ১১. দৈনিক কক্সবাজার বাণী (অনিয়মিত), ১২. দৈনিক রূপসীগ্রাম, ১৩. দৈনিক সাগর দেশ, ১৪. দৈনিক কক্সবাজার বার্তা, ১৫. দৈনিক আমাদের কক্সবাজার, ১৬. দৈনিক ইনানী, ১৭. দৈনিক আলোকিত উখিয়া, ১৮. The Cox's Bazar Today (অনিয়মিত), ১৯. দৈনিক বকোড়ী (বকরিয়া থেকে প্রকাশিত)।

সাপ্তাহিক : ১. সাপ্তাহিক দরিয়ানগর ও ২০. সাপ্তাহিক সোনাইছড়ি (দুইটি পত্রিকাই অনিয়মিত)।

পাক্ষিক : ১. পাক্ষিক মেহেদী।

সাহিত্য সাময়িকী : সমুদ্র সংলাপ (কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমীর মুখপত্র), কক্সবাজার বিচিত্রা।

## ঝ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

১৭৮৪ সালে আভা রাজা আরাকান দখল করে নেওয়ার পরে কক্সবাজারে শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। বর্তমান কক্সবাজারের রামু ছিল এই অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র। অপর দিকে চকরিয়ার পূর্ব দিকের পাহাড়ি এলাকা নিয়ে ছিল অপর একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র। ১৮০০ সালের পরেই মূলত কক্সবাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে প্রশাসনিক কেন্দ্র। ১৮৫৪ সালেই কক্সবাজারকে মহকুমা হিসেবে উন্নীত করা হয়। অবশ্য এর আগেই কক্সবাজার শহরের বর্তমান কাচারি পাহাড়ে একটি প্রাচীন দালান ছিল। উক্ত দালানের নির্মাণ কাঠামো ছিল বর্তমান চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পুরোনো ভবনের আদলে। গবেষকদের অভিমত, কক্সবাজারের উক্ত দালানটি ছিল পর্তুগিজদের নির্মিত। বর্তমান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুমের উত্তর পাশেই ছিল সেই দালানটি। বঙ্গোপসাগরের তীরে নির্মিত উক্ত দালান থেকেই পর্তুগিজ জলদস্যুরা সমুদ্রগামী জাহাজে লুটপাট চালাতো। উক্ত দালানের মেঝ থেকে ছাদ প্রায় ১৪ থেকে ১৫ ফুট উঁচুতে। দালানের দরজা ছিল প্রায় নয় থেকে দশ ফুট। ১৯৮৮ সালের দিকে কক্সবাজার জেলা প্রশাসন ভবন নির্মাণের সময় সেই

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ও মূল্যবান স্থাপত্য শৈলী বিশিষ্ট পতুর্গিজ দালানটি ভেঙে ফেলা হয়। বর্তমানে প্রাচীন যেসব দালান আছে তার বয়স একশত বছরের অধিক নয়। তবে দু'একটি দালানের নির্মাণকাঠামো মোগল আমলের দালানের আদলে নির্মিত। তার অর্থ এই নয় যে, দালানগুলো মোগল আমলে নির্মিত। মূলত মোগল আমলের নির্মাণশৈলীকে ব্যবহার করে প্রাচীনত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কক্সবাজারে মোগল নির্মাণনকশাকে ধারণ করে নির্মিত কয়েকটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদগুলো হচ্ছে কক্সবাজার শহরের বিজিবি সেক্টর হেডকোয়ার্টারের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত পোটকা মসজিদ, রামু উপজেলার জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের আশকরকাটা বা অষ্টকাটা মসজিদ ও চকরিয়া উপজেলার মানিকপুর-সুরাজপুর ইউনিয়নের মানিকপুর গ্রামের ফজল কিউকের মসজিদ। অনুরূপ নিমাণশৈলীর আরেকটি মসজিদ ছিল কক্সবাজার সদর উপজেলার পাতলি মাছুয়াখালি (পিএমখালি) ইউনিয়নের জুমছরি মসজিদ। কিন্তু এলাকাবাসী কিছুদিন পূর্বে পেট্রো-ডলারের আগমনে উক্ত মসজিদটি ভেঙে দেশে প্রচলিত নকশার মসজিদ নির্মাণ করেছে। অপরদিকে এলাকার কিছু উৎসাহী লোকজনের আগ্রহে এবং আয়তনে ছোট এ অজুহাতে মসজিদটি ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। এলাকাবাসী মসজিদটির ইতিহাস ও প্রাচীনত্বকে গুরুত্ব দিলো না। বর্তমানে প্রাচীনকালের স্থাপত্য শৈলি নিয়ে একমাত্র ছাদি চৌধুরীর মসজিদটি কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
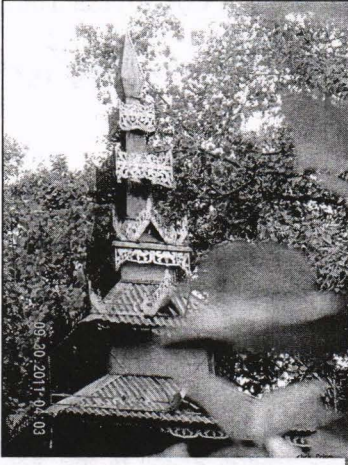
*১৭৯৯ সালে নির্মিত কক্সবাজার শহরের অগ্গমেধা ক্যাং*

*১৭৩৬ সালে নির্মিত রামু কেন্দ্রীয় সীমা বিহার*

এছাড়াও কয়েকটি মন্দিরের প্রাচীনত্ব রয়েছে বলে এলাকাবাসীর ধারণা। তবে রামু উপজেলায় কয়েকটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। তবে এসব মন্দিরে বর্তমানে প্রাচীনত্ব নেই। প্রাচীন অবকাঠমো ভেঙে নতুন করে পুননির্মাণ করা হয়েছে। এসব বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে ছিল ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের 'মেরংলোয়া সীমা বিহার'। মূল বিহারটি রাকখাইং বিহারের আদলে তৈরি। পূর্বমুখি কাঠের দোতলা ঘর। নিচের অংশ খোলা,

www.pathagar.com

তলা পাকা। ধর্মসভা ও অন্যান্য সমাবেশাদি এখানেই আয়োজন করা হয়। সামনের দিকে দু'পাশে দুইটি কাঠের সিঁড়ি। বিহারের উচ্চতা ৫০ফুটের মতো। বিহারের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দ। উক্ত বিহার ঝড়ে বিনষ্ট হওয়ায় ১৯৫৫-৫৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে পুনঃরায় তৈরি করা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সেই ভবনটিও দুষ্কৃতিকারীদের দেয়া আগুনে পুড়ে গেছে। ফলে এখন সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে, নতুন নির্মাণশৈলি ব্যবহার করে ইট-সুরকি দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাচীন বিহার কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রামু উপজেলা সদর থেকে ৪ কিলোমিটার উত্তরে জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের উত্তর মিঠাছড়ি গ্রাম, যা স্থানীয়ভাবে আষ্টকাটা বা আস্করকাটা গ্রাম নামেও পরিচিত। ব্রিটিশ আমলে এ গ্রামটি রাখাইন বা মঘ অধ্যুষিত সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পরে গ্রাম থেকে রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন বার্মা এবং দেশের অন্যত্র চলে গেছে। রাখাইন ভাষায় এই গ্রামের নাম 'টংশোয়ে রোয়া' অর্থাৎ 'স্বর্ণপাহাড়ের গ্রাম'। গ্রামে রয়েছে একটি প্রাচীন ক্যাং বা বৌদ্ধমন্দির বা বৌদ্ধবিহার। উত্তর মিঠাছড়ি বন বিহার বা আষ্টকাটা ক্যাং-এর ইতিহাস বেশ প্রাচীন। উক্ত বিহার রাখাইন যুগের সর্বশেষ স্মৃতিরূপে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান বিহারের পূর্বেও গ্রামে বিহার ছিল। উক্ত বিহার বিনষ্ট হওয়ায় বর্তমান বিহারটি তৈরি করা হয়। বিহারের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দ, ১১১২ বঙ্গাব্দ। পরবর্তীকালে উক্ত বিহারটি পুনর্নিমাণ করা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে দুষ্কৃতিকারীদের দেয়া আগুনে বিহারটি পুড়ে যায়। বর্তমানে সরকরের অর্থায়নে বাংলদেশ সেনাবাহিনীর প্রকৌশল বিভাগ নতুন আঙ্গিকে, নতুন নির্মাণশৈলী ব্যবহার করে ইট সুরকি দিয়ে নির্মাণ করেছে। প্রাচীন এসব স্থাপত্য পর্যটক ছাড়াও গবেষকদেরকে আকর্ষণ করে। কক্সবাজারের প্রাচীনত্ব এবং স্থাপত্যশিল্পের অনন্য বৈশিষ্টমণ্ডিত স্থাপনাসমূহের মধ্যে কক্সবাজার শহরের ঝিলংজা ইউনিয়নের মোগল স্থাপত্য বিশিষ্ট মসজিদ ছাচি চৌধুরীর মসজিদ, চকরিয়া উপজেলার ফজল কিউকের মসজিদ, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অগ্গমেধা ক্যাং, হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম পবিত্রতম স্থান মহেশখালি উপজেলার আদিনাথ মন্দির, রামু উপজেলার রাংকোট ও লামারপাড়া ক্যাং, জাদি বা জেদি বা স্মৃতিস্তম্ভ। এসব প্রতিষ্ঠানের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল।

## ছাচি চৌধুরীর মসজিদ

ছাচি চৌধুরীর মসজিদ জেলার প্রাচীন স্থাপনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। মসজিদটি বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড-বিজিবি তথা প্রাক্তন বিডিআর ক্যাম্পের উত্তর-কোণায় চৌধুরী পাড়াতেই অবস্থিত। অর্থাৎ কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পূর্ব পাশেই মসজিদের অবস্থান। যখন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল তখন কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কের অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তী সময়ে সড়কটি নির্মাণ করা হয়।

"গ্রামের আদি পুরুষ ছাচি চৌধুরী উক্ত মসজিদটি নির্মাণ করেন। ফলে তার নামেই মসজিদের নামকরণ। মসজিদটির নির্মাণশৈলী মোগল আমলের মসজিদের আদলে। মসজিদের ভেতরে বাইরে মোগল আমলের মসজিদের ন্যায় কারুকাজ করা। আয়তনে ছোট্ট মসজিদটির উত্তর পাশে রয়েছে একটি বিশাল দিঘি। মসজিদটির

www.pathagar.com

ভেতরে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা ২৩ ফুট, পূর্ব-পশ্চিম লম্বা ১৪ ফুট। মসজিদের বাইরের উত্তর-দক্ষিণ লম্বা ৩৪ ফুট আর পূর্ব-পশ্চিম ২৬ ফুট। মসজিদটি নির্মাণকালে স্থানীয়ভাবে নির্মিত বসতবাড়ির সাইজ (পরিমাপ) মাথায় রেখেই নির্মাণ করা হয়েছে। কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় বিগত চার বা পাঁচ দশক পূর্বেও নয়-চৌদ্দ সাইজের ঘর নির্মাণ করা হতো। নয় চৌদ্দ সাইজ হচ্ছে স্থানীয় একটি স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ। নয়-চৌদ্দ সাইজ অর্থ ৯ হাত X ১৪ হাত ধরে বসতবড়ি নির্মাণ করা হতো। ৯ হাত হচ্ছে সাড়ে তেরো ফুট ঢ ১৪ হাত বা একুশ ফুট। মসজিদটির সামনে তথা পূর্ব দিকে একটি পাঁচ ফুট বা ছয় ফুটের বারান্দা ছিল। তার সামনে ছিল খোলা উঠান। মসজিদের মূল পিলার বা স্তম্ভ চারটি। প্রতিটি পিলারের ফাউণ্ডেশন বা ভিত্তি চার ফুট বাই চার ফুট। মসজিদ নির্মাণকালে নামায পড়ার জন্য তিনটি কাতার বা সারি করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে চারটি কাতার বা সারি করা হয়েছে। ইমাম দাঁড়াবার বা মেহেরাবের ভেতরে কোনো জায়গা নেই বললেও চলে। বর্তমানে দেশে নির্মিত মসজিদসমূহে ইমাম সাহেব মেহেরাবের ভেতরেই দাঁড়ান। কিন্তু এখানে ইমাম সাহেব মেহেরাবের ভেতরে দাঁড়াতে পারেন না। মসজিদ নির্মাণকালে ইমাম সাহেব দাঁড়াবার জন্য পৃথক মেহেরাব তৈরি করা হয়নি, যা মসজিদের পশ্চিম পাশে গেলে বোঝা যায়।

মসজিদের দেয়াল তিন ফুট চওড়া। মসজিদের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে রয়েছে কবরস্থান। মসজিদের একটি মাত্র দরজা। দরজার উচ্চতা পাঁচ ফুট। জানালা রয়েছে দু'টি মাত্র। জানালার উচ্চতা সাড়ে চার ফুট, প্রস্থ তিন ফুট। মসজিদের ফ্লোর ও মসজিদের ভিটি প্রায় একই সমান্তরালে। ফলে মনে হচ্ছে মসজিদটি নির্মাণকালে ভিটি খুব বেশি উঁচু ছিল না।
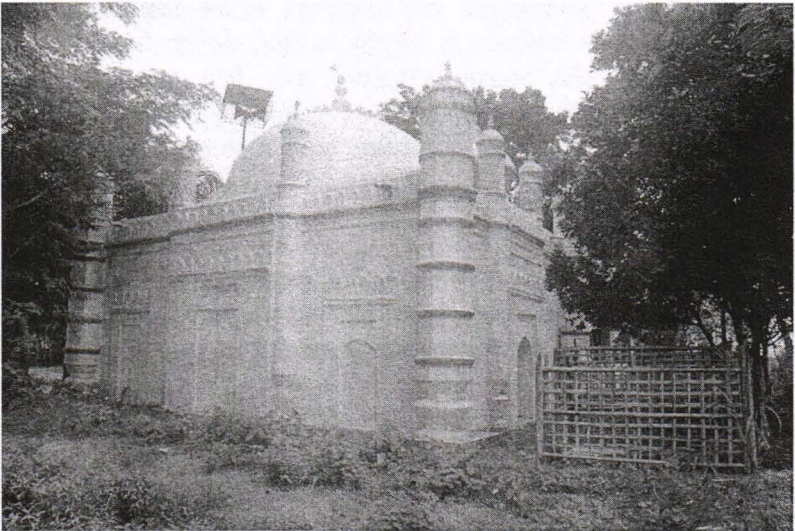
*কক্সবাজার শহরের ঝিলওয়াঞ্জায় ১৮৬১ সালে নির্মিত ছাচি চৌধুরীর মসজিদ*

www.pathagar.com

এ ধরনের অনুমান কিন্তু সঠিক নয়। মসজিদের ফ্লোর ভিটি থেকে কমপক্ষে পাঁচ ফুট উঁচুতে ছিল। বর্তমানে জানালাটি অনেকটা মসজিদের ভিটির সাথে লেগে রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের মসজিদ হোক আর বসতবড়ি হোক জানালা ঘরের ফ্লোর থেকে কমপক্ষে দুই থেকে আড়াই ফুট উপরেই থাকে। একইভাবে বসতবড়ি বা মসজিদের মূল ভিত্তি মাটি থেকে কমপক্ষে দুই থেকে তিন ফুট উপরেই থাকে। অনুরূপভাবে এ মসজিদের জানালাও মসজিদের ফ্লোর থেকে দুই বা আড়াই ফুট উপরে নির্মাণ করা হয়। আর মসজিদের ভিত্তি ছিল মাটি থেকে দুই বা আড়াই ফুট উপরে।

মসজিদের জানালা, দরজা ও মেহেরাবের সাথে রয়েছে দৃশ্যমান দুটি করে মোট আটটি পিলার। এই পিলারগুলো আকারে ছোট। এসব পিলার দরজা, জানালা ও মেহেরাব নির্মাণ করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের ভিত্তি মাটির সাথে সমান্ত রালে পিলার চারটি নির্মাণ করা হয়েছে কারুকাজ করে। এই কারুকাজ দেখতে পাতিলের মতো। দেখলে মনে হবে মসজিদটি পাতিলের উপর দণ্ডায়মান। মসজিদের ভিত্তির কারুকাজের জন্যই সেভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। পাতিলগুলো দেখতে স্থানীয় ভাবে গ্রামে ব্যবহৃত 'আইল্যা (মালসা) বা পিতলের চিলমচি (প্রাচীনকালে বুড়াবুড়িরা ব্যবহারের পানি ফেলার জন্য ব্যবহার করত) বা ফুলের টাবের ন্যায়। সে-কারণেই স্থানীয় লোকজন মসজিদের নাম দিয়েছে পোটকা মসজিদ। মসজিদের মূল পিলারগুলো ১৬ ফুট উচ্চতার। মসজিদের ছাদের উপর রয়েছে পাশাপাশি তিনটি গম্বুজ। তিনটি গম্বুজের মধ্যে মাছের গম্বুজটি বেশ বড়, অবশিষ্ট দুটি ছোট। বড় গম্বুজের উপর লোহার রড দিয়ে বৈদ্যুতিক বাতি লাগানো হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, তা সাম্প্রতিক কালের সংস্করণ। মসজিদটি বর্তমানে নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদের ফ্লোরে বসনো হয়েছে আধুনিক কালের টাইলস্। ফলে কত নিচে মূল ফ্লোর রয়েছে তা বলা মুশকিল। ১৮৬১ সালের দিকে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে।"[৩১]

### ফজল কিউকের মসজিদ

জেলার এক অনন্য স্থাপত্যশৈলী সমৃদ্ধ শতাব্দী প্রাচীন মানিকপুর তিন গম্বুজ বিশিষ্ট ফজল কিউকের মসজিদ। চকরিয়া উপজেলার মানিকপুর-সুরাজপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ মানিকপুর ইউনিয়নে অবস্থিত এই প্রাচীন মসজিদটি। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মানিকপুর গ্রামটি ত্রিপুরা রাজা ধন্য মানিক্যের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত। "১৫৮৪ সালে ত্রিপুরা রাজা ধন্য মানিক্যের ছেলে রাজপুত্র রাজদাহার নারায়ণের নেতৃত্বে আরাকান রাজার অধীনস্থ বর্তমান মানিকপুরসহ পাহাড়ি এলাকা দখল করে নেন। এর পরেই গ্রামের নামকরণ করা হয় ত্রিপুরা রাজ্যের রাজার নামে 'মানিকপুর'। মানিকপুর গ্রামের অদূরেই খনন করে বিশাল দিঘি, যাকে স্থানীয় লোকজন 'কমলার দিঘি' নামেই জানে। আর এই কমলার দিঘি রাজা ধন্য মানিক্যের স্ত্রী বীর কমলার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজা ধন্যমানিক্যের নামের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে অবস্থান করা মানিকপুর গ্রামে মুসলমান বসতি শুরু হওয়ার পরে নির্মিত হয় এই সুদৃশ্য নয়নাভিরাম স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন 'মানিকপুর' মসজিদ। পরবর্তীতে মসজিদটি 'ফজল কিউকের মসজিদ' নামেই অভিহিত হয়। প্রাচীনকালে মানিকপুর গ্রামটি উপজাতীয় চাক ও

www.pathagar.com

চাকমা সম্প্রদায়ের লোকজন অধ্যুষিত এলাকা ছিল। পরে এলাকায় মুসলমানদের আগমন এবং বসতি গড়ে ওঠে। ফজলুল করিম সিকদার তথা ফজল কিউক-এর পূর্ব পুরুষেরা উক্ত এলাকায় আগমনের পরেই তাদের জমিদারির পত্তন হয়। পরবর্তীতে ফজলুল করিম সিকদার 'ফজল কিউক' নামেই পরিচিত হয়ে পড়েন। 'কিউক' বাংলা না চাক ভাষা এলাকাবাসী বলতে পারেন না। তবে তাদের ধারণা তা চাক ভাষা। চাক সম্প্রদায়ের লোকজন স্থানীয় জমিদার ফজলুল করিম সিকদারকে উক্ত উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এরপর থেকেই তিনি 'ফজল কিউক' নামেই পরিচিত হয়ে যান। ১৯০৮ সালে স্থানীয় জমিদার ও আধ্যাত্মিক সাধক-পুরুষ ফজলুল করিম সিকদার প্রকাশ ফজল কিউক মোগল সম্রাটদের স্থাপত্য অনুসরণ করে তিনটি গম্বুজ ও বারোটি সুদৃশ্য পিলার সম্বলিত এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের দেয়াল প্রায় তিন ফুট চওড়া। ইটের শুরকির সাথে চুনা মিশিয়ে মসজিদের দেয়াল এবং ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদ সংলগ্ন গোরস্থানে তার কবরও রয়েছে।"[৩২]
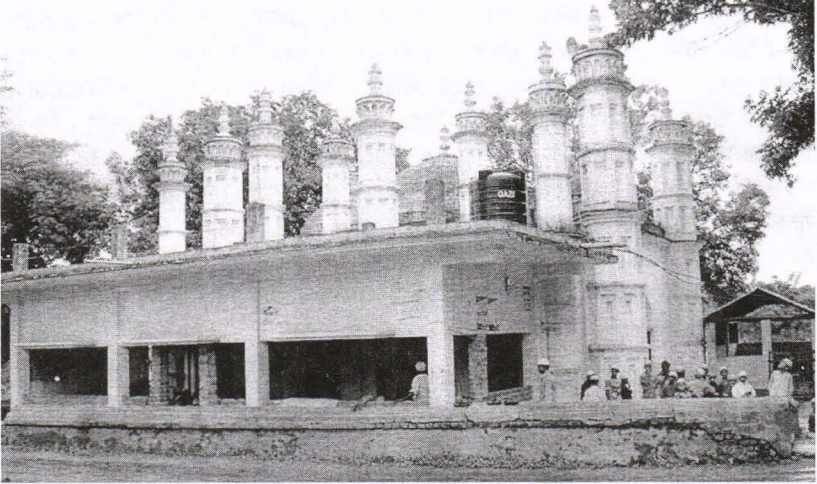
*১৯০৮ সালে নির্মিত চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের মানিকপুর গ্রামের ফজল কিউকের মসজিদ*

## আদিনাথ মন্দির

"হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান আদিনাথ মন্দির কক্সবাজার শহর থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মহেশখালি উপজেলা-সদরে অবস্থিত। চতুর্দিকে সমুদ্র বেষ্টিত মহেশখালি দ্বীপ। কয়েকশত বৎসর পূর্বে মহেশখালি কক্সবাজারের মূল ভূ-খণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল। ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ে কক্সবাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মহেশখালি। আদিনাথ মন্দিরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৮৮ ফুট উপরে মৈনাক পাহাড়-চূড়ায় অবস্থিত। মহেশখালি চ্যানেল সংলগ্ন চ্যানেলের পশ্চিম পাশে পাহাড়টির অবস্থান।

www.pathagar.com

এই আদিনাথ মন্দিরটি ঠিক কবে প্রতিষ্ঠিত হয় তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। হিন্দু-মুসলমানের অভূতপূর্ব সু-সম্পর্কের সেতুবন্ধন হিসেবে মহেশখালিতে নাথ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে এবং এই নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবে মহেশখালিতে আদিনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় মর্মে ধারণা করা হয়। পূর্বে আদিনাথ মন্দির সংলগ্ন ও এর অধীনস্থ জমির পরিমাণ ছিল ২১৭ একর। মন্দিরের পূর্ব পাশের অনেক জমি মহেশখালি চ্যানেল ইতোমধ্যে গ্রাস করে ফেলেছে।

আদিনাথ মন্দিরের দৈর্ঘ্য ১০.৮৭ মিটার, প্রস্থ ৮.৬২ মিটার এবং উচ্চতা ৫.৯৩ মিটার। কথিত আছে, মূল মন্দিরটি তিন ভাগে বিভক্ত। উত্তর অংশে প্রথম ভাগে ৩.৩৫ মিটার বর্গাকৃতির দুটো পূজাকক্ষ। পূর্ব কক্ষে রয়েছে বাণলিঙ্গ শিবমূর্তি এবং পশ্চিম কক্ষে রয়েছে অষ্টভূজা এক দুর্গামূর্তি।

মন্দিরে রক্ষিত অষ্টভূজা দূর্গামূর্তি ১৮১৭ সালে সুদূর নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুর রাজকীয় মন্দির থেকে এনে আদিনাথে প্রতিস্থাপিত হয়।

পুকুরসহ আদিনাথ মন্দির এলাকার জমির পরিমাণ ৫.০৭ একর। মন্দির সংলগ্ন জমিতে নানান প্রয়োজনে ১০টি ইটের ঘর এবং একটি মাটির ঘর নির্মিত হয়েছে। সম্পূর্ণ মন্দির সিমেন্টের আস্তরণে ঢাকা পড়ায় এর প্রাচীন বৈশিষ্ট্যগুলো হয়ে গেছে অদৃশ্য।

আদিনাথ মন্দির বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির। হিন্দুদের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে এখানে বসে সপ্তাহব্যাপী বিরাট মেলা।

*মহেশখালী উপজেলার আদিনাথ মন্দির*

www.pathagar.com

আদিনাথ মন্দির প্রাঙ্গণ বর্তমানে শুধু পূজা নয়, পিকনিক স্পট হিসেবেও বিবেচিত হয়ে আসছে। দেশি বিদেশি হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে মেলা ও পূজা প্রাঙ্গণ হয় মুখরিত। তাছাড়া প্রতিনিয়ত বিশেষ করে শীত মওসুমে অসংখ্য পর্যটকের পদভারে ছন্দময় হয়ে ওঠে মন্দির এলাকা।"[৩৩]

**রামকোট**

"কক্সবাজার সদর থেকে রামুর দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার। রামু জেলার একটি প্রাচীন জনপদ। গ্রিক ঐতিহাসিক টলেমি'র ভূগোলে, তিব্বতি লেখক লামা তারানাথ-এর বিবরণে রামুর কথা উল্লেখ আছে। রামু নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তি রয়েছে। তৎমধ্যে বনবাসে থাকাকালে রাম ও সীতা এসেছিলেন রামকোট এলাকায় এবং রামের নামানুসারে রামকোট কিংবা রামুর নামকরণ করা হয়েছে। পাঁচটি বড় বড় বটগাছ নিয়ে পঞ্চবটি বন। রামকোটে বড় বড় পাঁচটি বট গাছ রয়েছে। তাই রামকোটকে রামায়নের পঞ্চবটি বন বলেও কেউ কেউ মনে করে থাকেন। সীতার মরিচ পিষার পাটা রামকোটে রয়েছে বলে ধারণা করে একটি কালো পাথরকে পুজো করে থাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন।

রামকোটে একদিকে বৌদ্ধ-বিহার এবং অপরদিকে হিন্দুদের শিব-মন্দির ও তীর্থধাম বিদ্যমান। প্রতিবছর এখানে অনুষ্ঠিত হয় বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মেলা। হাজার হাজার তীর্থ-যাত্রী এখানে অনুষ্ঠিত পূজা ও অর্চনায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

*রামু উপজেলার হাজার বছর বছর পূর্বের ঐতিহাসিক রামকোট মন্দিরের গেইট*

www.pathagar.com

রামকোট বৌদ্ধ-মন্দির স্থাপিত হয়েছে প্রায় দু'হাজার বছরেরও আগে সম্রাট অশোকের শাসনামলে। শতাধিক সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে রামকোট বৌদ্ধবিহারের অবস্থান। রামকোট এলাকায় বিভিন্ন পাহাড়ে বিচ্ছিন্নভাবে আজো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তির ধ্বংসাবশেষ।

রামকোটের হিন্দু মন্দির ও তীর্থধামটি বনাশ্রমের পাশেই অন্য একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৯৪ সালে। আবার কারো মতে রামকোট তীর্থধামের হিন্দু-মন্দিরটি ১৭ শতকে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মানিক্য কর্তৃক নির্মিত হয়। রাজসিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃযুদ্ধে পরাজিত রাজা গোবিন্দ মানিক্য রামকোটে আরাকানি প্রশাসকের আশ্রয়ে থেকে এখানে স্থাপন করেন বনাশ্রম। কথিত আছে, ভাই আওরঙ্গজেবের রোষানল থেকে পালিয়ে আরাকান যাবার পথে শাহসুজা ও রাজা গোবিন্দ মানিক্যের সাথে রামকোটে সাক্ষাত হয়। তবে এর কোনো ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ নেই। যষ্ঠদশ শতাব্দীতে আরাকানের সামন্ত প্রধান আদম সাহের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল এই রামকোটেই, যা আমরা ত্রিপুরার রাজকীয় ইতিহাস 'রাজমালা' পাঠে জানতে পারি। 'রাজমালা'য় বর্ণিত এভাবে,

"মঘ রাজা সেকান্দর রণাঙ্গনেতে গেল।
অমরমাণিক্য স্থানে পত্র যে লিখিল॥
আদম সাহাকে রাজা পাঠাও ত্বরিত।
তবে তোমা সঙ্গে আমা হবে বহু প্রীত॥
সেকান্দর সাহা স্থানে নৃপে লিখে পুনি।
শরণাগত আদম সাহা না দিব কখনি॥"

রামকোট বা রামুর কেল্লা বিভিন্ন কারণে একসময় সামরিক গুরুত্ব বহন করত। আরাকানি সামন্ত প্রধানরা রামকোটকেই এ এলাকার রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করত। এই রামুর কেল্লা তথা রামকোটে অবস্থান নিয়েই ১৭৯৮-১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করে রামকোটে। অপরদিকে বার্মা সীমান্তে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল জাপানিরা। ব্রিটিশবাহিনী একটি টাকশালও স্থাপন করেছিল রামকোটে। সময়ের গহ্বরে বিস্মৃতির আড়ালে রামকোট একসময় বিলীন হয়ে পড়লে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীলংকা থেকে আগত বৌদ্ধ পুরোহিত জগৎজ্যোতি মহাস্থবির বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে রামকোট বৌদ্ধ বিহারটি পুনঃ আবিষ্কার ও সংস্কার করেন।

বর্তমান রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধ-বিহার ও রামকোট তীর্থ-ধামের মাঝামাঝি জায়গায় পাহাড়ের পাদদেশে বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা-এনজিও দেশি-বিদেশি দাতা ও সমাজসেবকদের সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে 'জগৎজ্যোতি শিশু সদন' নামে একটি বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম।

হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মীয় পীঠস্থান রামকোট পিকনিক স্পটে পরিণত হয়েছে ইদানীং। অসংখ্য দেশি-বিদেশি পর্যটক রামকোটে আগমন করেন। রামকোটের প্রাচীন

www.pathagar.com

স্থাপত্যের অনেক কিছু বাঁকখালি নদীর ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে। এছাড়াও মাটি ভরাটের ফলে অনেক কিছু মাটির নিচের চাপা পড়ে গেছে। ওখানে খনন করা হলে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। ১৯৬৩ সালে এখানে মাটি খনন করতে গিয়ে পাওয়া গিয়েছিল তিনটি মূল্যবান ধাতব মুদ্রা। প্রাপ্ত মুদ্রার ভিত্তিতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. আবদুল করিম এখানকার ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন। মুদ্রা তিনটি বর্তমানে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।"[৩৪]

## লামার পাড়া বৌদ্ধ বিহার

রামু উপজেলার অফিসের চরের পশ্চিমপাশে লামারপাড়া গ্রাম। এই গ্রামেই লামারপাড়া বৌদ্ধবিহার অবস্থিত। এটাও ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের অন্তর্গত। রাকখাইংগণ এই বিহারকে 'আউসাফা ক্যাং' বলে। এই গ্রামের নাম 'আউসাফা রোয়া' বা বার্মারকূল গ্রাম। গ্রামের নামানুসারে বিহারের নাম 'আউসাফা ক্যাং'।

লামারপাড়া ও অফিসের চর এলাকায় পূর্বে প্রচুর মঘ তথা রাকখাইং জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। বর্তমানে কোনো মঘ পরিবার সেখানে নেই, সকলে বার্মা চলে গেছে। বিহারটি বর্তমানে অযত্নে অবহেলায় আছে। একজন বহিরাগত ভিক্ষু সেখানে অবস্থান করেন এবং একটি বহিরাগত মঘ পরিবার বিহারে বসবাস করেন। তারাই বিহারের রক্ষণাবেক্ষণকারী। ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলে প্রথমে চোখে পড়ে মূল বিহারটি। উত্তর মুখি, বার্মাটিক (সেগুন) কাঠ দ্বারা বিহার নির্মিত। সামনে সিঁড়ি বারান্দা। দু'পাশে দুটা নড়বড়ে সিঁড়ি। ৪৯টি খুঁটি বা ঠুনির উপর দ্বিতল ঘর। দেখতে অন্যান্য রাকখাইং বিহারের মতোই। বিহারের দৈর্ঘ্য ৫১ ফুট × প্রস্থ ৫১ ফুট। খুঁটির বেড় ৪৪ ইঞ্চি। উচ্চতায় ৫০ ফুটের মতো। বর্তমানে বিহারটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ ও মলিন অবস্থায় দণ্ডায়মান। এই কারণে বিহারটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। বিহারের বুদ্ধমূর্তিগুলি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই বিহারটি তৈরি করেন ঐ গ্রামের (লামারপাড়া) বিখ্যাত জমিদার থোয়াইঙ্গ্য সওদাগর। ফতেখাঁরকুল, নাশিরকুল, রাংকোট, কাঠালিয়া পাড়া, দাড়িয়ার দিঘি এলাকায় তাঁর জমিদারি ছিল। তিনি ১২৬৬ মঘাব্দের (১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে) মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে উক্ত বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিহারকে অনেকে থোয়াইঙ্গ্য সওদাগরের ক্যাং বলে।

লামারপাড়া ক্যাং তথা খোয়াইঙ্গ্য সওদাগরের ক্যাং এর মধ্যে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় ঘণ্টা। এই ঘণ্টার জন্য রয়েছে পৃথক ঘর। ঘরটি অষ্টকোণাকৃতির, আটটি খুঁটির উপর উক্ত ঘর নির্মিত। নিচের দিক খোলা। শুধু ছাতার মতো চূড়াকৃতির চালটাই আছে। চাল তিন ধাপ বিশিষ্ট এবং কাঠের সুন্দর কারুকাজ করা। এই ঘরে দুটি বড় বড় ঘণ্টা টাঙানো আছে। একটি সামান্য ছোট। যে লৌহশিকলে টাঙানো আছে তাও কারুকার্য খচিত এবং সিংহ মূর্তি অংকিত। তিনটি বড় বড় সিমেন্টের পিলারের উপর একটি বড় কাঠের বিরালি (কড়িকাঠ বা Beam) বসানো। সেই বিরালিতে দুই ফটকে ঘণ্টা দুইটি টাঙানো। পিলারের বেড় ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। ঘণ্টা দুইটি গোলাকার, উপরের অংশ চূড়াকৃতির।

www.pathagar.com

রামু উপজেলার প্রাচীর নক্সা ও কারুকার্যমণ্ডিত লামার পাড়ার ক্যাং
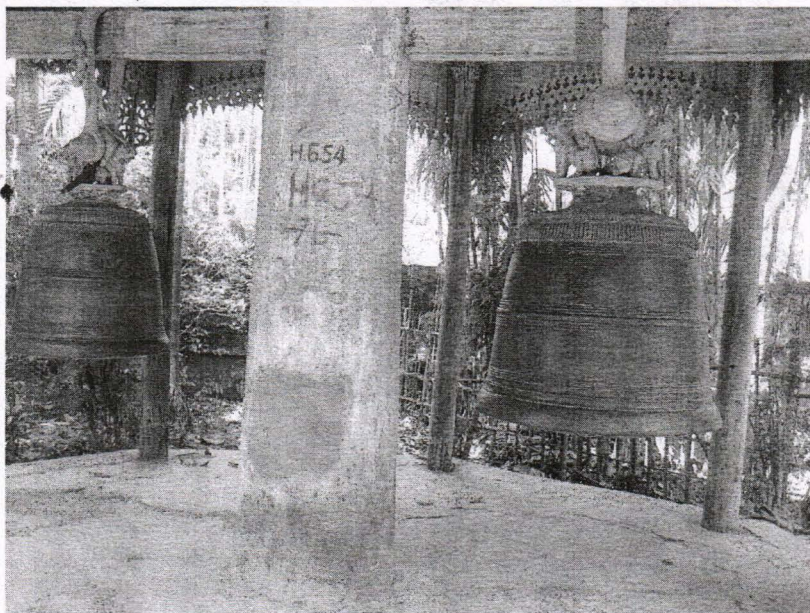
রামু উপজেলার প্রাচীন লামার পাড়া ক্যাং-এর ৮০ মন ওজনের ঘণ্টা

www.pathagar.com

ঘণ্টার নিচের মুখের বেড় সাড়ে ৯ ফুট এবং উচ্চতা ৪৮ ইঞ্চি এবং পুরুত্ব ৫ ইঞ্চি, মধ্যখানে সুরঙ্গযুক্ত। কাঠের বড় মুগুর বা গদা দিয়ে আঘাত করলে গুরুগম্ভীর আওয়াজ ওঠে। একটির আওয়াজ মোটা অন্যটির আওয়াজ চড়া। উক্ত আওয়াজ ৫ মাইল দূর থেকেও শোনা যায় বলে কথিত। এক একটা ঘণ্টার ওজন ৮০ মন বলে জানা যায়।"[৩৫]

**লাওয়ে জাদি (প্যাগোডা) ঃ**

বাঁকখালি নদীর তীরে বড় ক্যাং-এর সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে উত্তর পূর্বকোণে তাকালে দেখা যায় পাহাড়ের উপর একটি সোনালি রংয়ের জাদি। মনে হয় হাতছানি দিয়ে ডাকছে দর্শনার্থীদের। এই জাদির নাম 'লাওয়ে জাদি'। এই জাদিটিই রামুর বিখ্যাত প্রাচীন বিস্ময়কর নিদর্শন। যে পাহাড়শ্রেণি দৃষ্টিগোচর হয় তা কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের লট (লাট) উখিয়ার ঘোনার পাহাড়। ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের হাইটুপি বা হাইটুবি মৌজার পূর্ব ও উত্তর প্রান্ত জুড়ে এই পাহাড়শ্রেণি বৃটিশশাসনামলে বোম্বাইয়া লাট বা ধনীপুত্রের জমিদারির অংশ ছিল বলে উক্ত পাহাড়শ্রেণিকে লট উখিয়ার ঘোনা বলে। উখিয়ার ঘোনা নামটিও আরাকানি নাম। পূর্বে এই উখিয়ার ঘোনার নাম ছিল লাওয়ের ঘোনা (বাঙালি উচ্চারণ 'লাওয়ার ঘোনা')। উক্ত লাওয়ে (লাওয়ে ম্রেন বা লাওয়ে মুরং) ছিলেন আরাকানরাজের প্রধান সেনাপতি। বর্মিরাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গ্রেফতার এড়ানোর উদ্দেশ্যে সৈন্যসহ রামুর হাইটুপী মৌজায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে উক্ত পাড়ার নাম হয় লাওয়ের পাড়া। তাঁর আবাদকৃত ঘোনার নাম হয় লাওয়ের ঘোনা। তখন ওখানে কোনো জনবসতি ছিল না বলে জানা যায়।

*রামু উপজেলার কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের উখিয়ারঘোনার পাহাড়ের উপর নির্মিত লাওয়ে জাদি বা জেদি*

www.pathagar.com

ভূমি আবাদ ও চাষাবাদ উপলক্ষে সর্বপ্রথম তিন গ্রাম রাকখাইং সেখানে বসতি উপলক্ষে বসানো হয়। বর্তমানে উক্ত এলাকায় কোনো রাকখাইং সম্প্রদায়ের লোকজনের বসবাস নেই। সর্বশেষ পাড়াটি উচ্ছেদ হয় ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। উক্ত লাওয়ে তাঁর ঘোনার পাহাড়ের মাথায় যে জাদি বা প্যাগোডা বা স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম 'লাওয়ে জাদি'। রামু উপজেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই জাদি দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত জাদিতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাত্রিতে বাতি জ্বালানো হয়। সেই বাতির আলোকসারি অন্তত ৭/৮ মাইল দূর থেকে দেখা যায়। এতে মানুষ বুঝতে পারে যে আজ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা।

পূর্বে উক্ত জাদির পাদমূলে দক্ষিণ পাশে বিহার, পুকুর ও চেরাংঘর ছিল। বর্তমানে ওসব নেই। শুধু জঙ্গল, গাছপালা আর ধানের মাঠ। তবে এখানে ওখানে শ্মশানের স্মৃতি মঠগুলোর অবস্থান আছে। কারণ উক্ত জাদির (জাদিমুরা) পশ্চিম ও উত্তর পাশের স্থান বড়ুয়া ও রাখাইনদের শ্মশান হিসাবে শতাব্দীকাল পূর্ব থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বহুকাল আগে অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে এবং তার পূর্ব থেকে পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে জাদিতে উঠার একটি সরু পথ ছিল। কালের বিবর্তনে প্রাকৃতিক কারণে জাদির গোড়া থেকে মাটি সরে যাওয়ায় ওদিকে উঠার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম কোণায় পাহাড়ের গা বেয়ে অতি কষ্টে পাহাড়ের চূড়ায় জাদিতে পৌঁছতে হয়। জাদির গোড়া থেকে এমন ভাবে মাটি সরে যাচ্ছে যে, কিছুকাল পরে হয়ত বর্তমান পথেও উঠা সম্ভব হবে না।

পূর্বে পাহাড়ের মাথায় বিরাট সমতল স্থানে উক্ত জাদি নির্মিত হয়েছিল। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকেও পাহাড়ের চূড়ায় জাদি প্রাঙ্গণে বাৎসরিক মেলা বসতো। জাদির চারপাশে লোক সমাবেশ হতো। বর্তমানে উত্তর পাশে বসার জায়গাতো দূরের কথা একজন লোকের হাঁটার স্থানও নেই। তেমনি খাড়া হয়ে গেছে পাহাড়। সীমানা দেওয়াল ও প্রাঙ্গণ ভেঙে মূল জাদির তলদেশ স্পর্শ করেছে। কাজেই জাদিটি বলতে গেলে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। জাদির সূঁচালো চূড়ার মাথায় লোহার কারুকাজ করা একটি টোপর আছে। টোপরের চারপাশ ঘিরে ছোট ছোট পিতলের ঘণ্টা ছিল। বাতাসে ঘণ্টাগুলো নড়লে টুং টাং আওয়াজ উঠতো। সে আওয়াজ নিচের পথচারীদের কর্ণগোচর হতো। পাহাড়ের পাদদেশে টুংটাং শব্দে পথচারীরা স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ের উপরের দিকে দেখতো, আর তাতেই পথচারীদের দৃষ্টিগোচর হতো 'লাওয়ে জাদি'। পূর্বে জাদির পাশে কোনো লোকবসতি ছিল না। ছিল বড় বড় গর্জন গাছ আর ঘন জঙ্গল। জঙ্গলে থাকত বাঘ, ভালুক, শিয়াল, বনমোরগসহ আরো অনেক পশুপাখি। ১৯৫৫-৬০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বনের পথে চলতে গিয়ে মানুষ আতংকিত হয়ে পড়তো। বর্তমানে কোনো জঙ্গল নেই। প্রতিটি পাহাড়ে ঘন জনপদ গড়ে উঠেছে। জাদির পাশে বিরাট পাড়া বসেছে। নাম জাদিপাড়া। জাদিটি রামু-নাইক্ষ্যংছড়ি সড়কের পাশে হওয়ায় চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। উপজেলা সদর থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যে স্থানটি পর্যটনের সুবিধা থাকলেও সংস্কারের অভাবে জাদিটি পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেনি। জাদিটি লাওয়ে মোরং সর্বপ্রথম তৈরি করেন আনুমানিক ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। কারো কারো মতে উক্ত জাদিটি আরো ছোট ছিল। খিজারি দালালের জেঠা

www.pathagar.com

মংপ্রু বৈদ্য বা সাকটাং-এর পিতা উহা প্রথম সংস্কার করেন। পরবর্তীকালে দানবীর দঅং দালাল ওটার উপরে বর্তমান আকারের জাদিটি নির্মাণ করেন ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। পাহাড়ের চূড়ায় মাটি তুলে চারপাশ চওড়া করেন এবং চারদিকে সীমানা দেওয়াল দেন ও প্রাঙ্গণকে ইট দিয়ে ঢেকে দেন। সেই সময়ে উক্ত সংস্কার কাজে দঅং দালালের ৫০ হাজার টাকা খরচ হয় বলে জানা যায়। ওখানে দুই রকমের ইট ব্যবহৃত হয়েছে। একটার মার্কা O.D.N অন্যটার মার্কা উল্টা N.O.D. অর্থ উ. দঅং বা শ্রী যুক্ত দঅং। অন্যটির অর্থ আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। সমতলভূমি থেকে ৫৫০ফুট উপরে জাদিটি প্রতিষ্ঠিত। অতীতে হয়ত আরও কিছু উপরে ছিল। বর্তমানে নিচের দিকে বসে যাচ্ছে। এটা অনুমান হয় এই কারণে যে, ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে উক্ত জাদির গোড়ায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমদিকে থাকালে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ ভালোভাবে দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন উঁচু উঁচু অবকাঠামো নির্মাণ এবং বাতাসে কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা আর দেখা যায় না। জাদিটি চতুষ্কোণ আকৃতির। দৈর্ঘ ৩৬ ফুট, প্রস্থ ৩৬ ফুট। চারপাশে বাতি জ্বালানোর জন্য জাদির গায়ে ছোট ছোট খোপ বা সুদৃশ্য গর্ত আছে। জাদির মাঝামাঝি অবস্থায় চতুষ্কোণের পরিবর্তে ২০ কোণাকৃতির রূপ নিয়েছে। তার উপরের অংশ গোলাকার উপরদিক সুঁচালো কারুকাজ করা। সুঁচালো মাথায় টোপর, উচ্চতায় ৫০/৬০ ফুটের মতো। চারপাশে সীমানা দেওয়াল আড়াই ফুটের মতো পুরু। প্রধান ফটকের পিলার ৬ ফুট পুরু। চারপাশে ৪২ ফুট করে প্রাঙ্গণ আছে। প্রাঙ্গণ ইট দিয়ে ঢাকা। পূর্বের মত নিয়মিত মেলা না বসলেও কয়েক বছর পর পর ধর্মীয় সমাবেশ হয়।"[৩৬]

## ঞ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

রাজনীতি বলতে যা বুঝায় তা সঠিক অর্থে কক্সবাজার অঞ্চলের সাধারণ মানুষ কয়েক যুগ আগেও জানতো না। কক্সবাজারের রাজনীতি, সমাজনীতি আবর্তিত ছিল মূলত ভূ-রাজনীতির উপর নির্ভরশীল। জোতদার, জমিদারেরাই এখানকার রাজনীতির হর্তাকর্তা, বিধাতা। তারাই নিয়ন্ত্রণ করত এখানকার রাজনীতি। প্রাচীনকালে প্রবাদ ছিল 'যেখানে ভাত সেখানে জাত'। অনুরূপভাবে যেখানে ভাত সেখানে রাজনীতি ছিল আবদ্ধ। ফলে জমিদারের জমি না হলে প্রজার বাৎসরিক খাবার ছিল অনিশ্চিত। ভূ-রাজনীতির কারণে জেলার স্বাধীন রাজনীতি কোনো অবস্থাতেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। এই কারণেই জেলার পড়া-লেখা, শিক্ষা-দীক্ষা ছিল পিছিয়ে। অশিক্ষিত মানুষকে দিয়ে আর যাই হোক না কেন স্বাধীন রাজনীতি তো আর আশা করা যায় না। গরিবের পেটে যেখানে ভাত নেই সেখানে পড়ালেখা দিয়ে কী হবে, এই ছিল নীতি। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই গরিব প্রজা-সাধারণের স্বার্থে কোনো নীতি প্রণীত হয়নি। কোনো দিন প্রণীত হয় নি 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই নীতি। বরঞ্চ উল্টো দিকে বলা চলে জমির মালিক বরাবরই জোতদার ও জমিদারশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেখানে ছিল না মানুষের ভোটাধিকার। সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত অথবা মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-সরকার রাজ্য শাসন করত। সামন্ত প্রথা প্রচলিত ছিল বিধায় জমিদার, মাতব্বর, চৌধুরীদের মধ্যে শাসনপ্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ ছিল। একারণেই এলাকার

www.pathagar.com

গরিব প্রজা-সাধারণ জমিদারের ফরমায়েশ খাটতে পারলেই ধন্য মনে করত। এই অবস্থা থেকে জেলাবাসী পুরোপুরি মুক্ত হয়েছে একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলার সময় এখনো আসেনি। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে স্বাধীন রাজনীতির বদ্ধ কপাট খুলতে শুরু করেছে বলা চলে।

ভোটাধিকার রাজনীতির সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার শাসনতান্ত্রিক প্রধান সোপান। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শুধু শাসনতন্ত্রে আইনসম্মত ও অভীষ্ট পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। সর্বজনীন শিক্ষার অভাব ছিল বলেই জেলার মানুষের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল না।

অতীতের প্রেক্ষাপটে জেলার রাজনীতির অবস্থান বর্ণনা করা অতীব দুরূহ। প্রাচীন কাল থেকে কক্সবাজার অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার বিবর্তন কোনো ইতিহাস ধরে রাখেনি। আরব দেশীয় কিছু নাবিক, বণিক, ধর্মপ্রচারকের দুঃসাহসিক অভিযান, পর্তুগিজ দস্যু এবং তাদের স্থানীয় সহযোগীদের পদচারণাই মূলত আমরা জেলার প্রাচীন ইতিহাস হিসেবে দেখতে পাই। রাজন্যবর্গ সামন্তপ্রথার মাধ্যমে রাজ্য শাসন করেছে, যা আমরা জেলার রাজস্ব ইতিহাস থেকেই বুঝতে পারি।

ক্যাপ্টেন কক্স-এর নামাঙ্কিত ১৭৯৯ সালের কক্সবাজার এখন ২০১৫ সালে। এরমধ্যে কক্সবাজারের মাতামুহুরি, বাঁকখালি, নাফ নদীর পানি অনেক গড়িয়েছে। নাফ নদীর পানি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অনেকবার রঞ্জিত হয়েছে। জেলার রাজনীতির অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। এসেছে সমাজে পরিবর্তন। অনেক ভূমিজপুত্র এখানকার রাজনীতি, সমাজনীতিতে ভূমিকা রেখেছেন।

ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল উপমহাদেশের মানুষ। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার দাবিতে যাঁরা আন্দোলন করেছেন, তাদের অন্যতম কারাবন্দি নেতা রামুর আবদুল মজিদ সিকদার, পেকুয়ার জমিদার গুরা মিয়া চৌধুরী, কুতুবদিয়ার কৈয়ারবিলের মাওলানা আজিজুর রহমান, মাওলানা আফজালুর রহমান, চকরিয়ার বদিউজ্জামান আল কাদেরী, জালাল উদ্দিন চৌধুরী ও মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী, জোয়ারিয়ানালার মাওলানা মুজহেরুল হক চৌধুরী, রাম মোহন বড়ুয়া, অগ্নিযুগের বিপ্লবীপুরুষ কমরেড সুরেশ সেন, অ্যাডভোকেট জ্যোতিশ্বর চক্রবর্তী প্রমুখ। তারা তৎকালীন কক্সবাজার মহকুমায় খেলাফত আন্দোলনকে গতিশীল করেন। তারা খেলাফত আন্দোলনের স্বপক্ষে ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন। ওই সময় মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকীও *সাধনা* পত্রিকায় খেলাফত ও স্বদেশী আন্দোলনের স্বপক্ষে বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ লিখে বাঙালি সমাজকে স্থানীয়দের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। রামু উপজেলার আবদুল মোতালেব ব্রিটিশবিরোধী গজল ও গান রচনা করার দায়ে কারাবরণ করেন।

১৯২১ সালে উখিয়ার কোটবাজারে অসহযোগ আন্দোলনের সমাবেশে বৃটিশ বিরোধী বক্তৃতা প্রদান কালে পুলিশ আবদুল মজিদ সিকদারকে গ্রেফতার করে। তাঁর সাথে অন্য যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন তৎমধ্যে মাওলানা ওয়াজেদ আলী মক্কী ও রাস

www.pathagar.com

মোহন বড়ুয়া অন্যতম। তাঁদের গ্রেফতারের পরে কক্সবাজার মহকুমার বহু লোক (বিশেষ করে রামু ও উখিয়া থানার) স্বেচ্ছায় কারাবরণ করতে এগিয়ে যায়। আবদুল মজিদ সিকদারই কক্সবাজারের প্রথম রাজবন্দী।

আবদুল মজিদ সিকদারকে গ্রেফতারের পর কক্সবাজার মহকুমা হাকিম এম.এ. জি ইলিশন-এর আদালতে হাজির করা হয়। এসডিও এলিশন তাঁকে প্রশ্ন করেন- What are the aims and objects of your agitation ?

উত্তর দেওয়ার আগেই আবদুল মজিদ সিকদার এম এ জি এলিশনের কাছে একটি প্রশ্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহকুমা হাকিম তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দিলে মহকুমা প্রশাসকের কাছ থেকে তিনি উল্টো জিজ্ঞেস করেন- Why are the Scottish in your country struggling against the British government ?

প্রশ্ন শুনে এম এ জি এলিশন কোনো ধরনের উত্তর দেওয়ার আগেই আবদুল মজিদ সিকদার আগের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, We are agitating to drive away the foreign looters from our land. এতে মহকুমা হাকিম ক্ষিপ্ত হয়ে আবদুল মজিদ সিকদারকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

তিনিই জেলার প্রথম রাজবন্দী। বেনিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান এবং লোকজনকে সংগঠিত করার অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়েছিল। এর আগে ১৯১৭-১৮ সালে বোমাং রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে 'রক্ষ কবলে গরীব প্রজা' শিরোনামে একটি কবিতা লিখেন। কবিতায় বোমাং রাজার অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনা করা হয়। তখনকার ভাইসরয় রাজার অত্যাচারের অভিযোগ তদন্ত শেষে তা প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর জমিদারি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের অধীনে চলে যায়।"[৩৭]

চকরিয়া থানার হারবাং ইউনিয়নের জালাল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে এ, কে. ফজলুল হকের বঙ্গীয় বিধান সভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

ব্রিটিশবিরোধী খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন অবিভক্ত বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের পুরোধা চকরিয়ার মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী। তিনি সরাসরি খেলাফত আন্দোলনে অংশ নেয়ার পাশাপাশি এসব আন্দোলনের পক্ষে প্রচুর লেখালেখি করেন। জাতীয় জাগরণের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক *'মোসলেম জগৎ'* নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন করেন ১৫ আগস্ট ১৯২২ সালে। কলকাতা থেকেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। পত্রিকার ১৬ অক্টোবর ১৯২২ বাংলা ১৩২৯, ১৭ আশ্বিন সংখ্যায় 'সময় থাকতে সাবধান, বুঝে চল ব্রিটিশ' শীর্ষক সম্পাদকীয় লিখে রাজরোষের শিকার হন। ওই সম্পাদকীয় লেখার কারণে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ১৫৩-এ ধারা ১৯২২ সালের ২২ ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ওই কারাগারে তখন কাজী নজরুল ইসলামও কারাবন্দী ছিলেন। তিনি ১৮ দিন পর মুক্তিলাভ করেন।

মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল ব্রিটিশবিরোধী চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ এবং ঐতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন সুরেশ সেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার

www.pathagar.com

দখল করার পূর্বপ্রস্তুতি পর্বের সকল কর্মসূচির সাথে সুরেশ সেন যুক্ত ছিলেন। ১৮ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল সংঘটিত বৃটিশবিরোধী সকল যুদ্ধে অংশ নেন তিনি। তিনি ২২ এপ্রিল ঐতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর গুলিতে গুলিবিদ্ধ হন। তার সাথে বিনোদ বিহারী, বিনোদ দত্তও গুরুত্বর আহত হন। মহেশখালি আত্মগোপনকালে তিনি বৃটিশদের হাতে বন্দী হন। আটকের পর প্রহসনমূলক বিচারে ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত একটানা দীর্ঘ নয় বছর কারাভোগ করেন। ভারতের বিভিন্ন কারাগারে তাঁর জীবন কাটে। কারান্তরিন অবস্থায় রেকর্ড পরিমাণ মার্কস নিয়ে তিনি প্রথম শ্রেণিতে বি.এ এবং 'ল' (আইন) পাশ করেন। জেল থেকে বের হয়ে এসে তিনি আইন পেশা এবং রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন।

পরবর্তীকালে স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ এখানে এসে লাগে।

কক্সবাজার জেলা জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা হওয়ার কারণে ছিল অনেকটা অভিশপ্ত। ফলশ্রুতিতে রাজবন্দীদের এখানে দেয়া হতো নির্বাসন যাকে বলা হতো 'কালাপাইন্যা'। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ-এর স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ক্ষিতিশ চন্দ্র দেবরায়কে জেলার উখিয়াতেই দেয়া হয়েছিল নির্বাসন। বর্তমান উখিয়া থানার উত্তর পাশেই তাঁকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল। ক্ষিতিশ চন্দ্র দেবরায়ের উত্তর-পুরুষ অর্ধেন্দু দেবরায় প্রকাশ বেনু বাবু তাঁর পূর্বপুরুষ ক্ষিতিশ চন্দ্র দেবরায়ের বসতবাড়িতে এখনো বসবাস করছেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় ব্রিটিশরা এদেশের লবণশিল্পকে ধ্বংস করার জন্য স্থানীয় লবণ উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। লবণ উৎপাদনকারীকে (মলঙ্গিদের) আটক করার জন্য ব্রিটিশ পুলিশ লেলিয়ে দেয়।

অবশ্যি এর আগে ১৯০৫ সালের দিকে জেলার (তৎকালীন মহকুমা) চকরিয়া উপজেলার বরইতলি গ্রামের গোলাম কাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি লাভ করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১০ সালে (তিনি ফার্সি ও ইতিহাস বিষয়ে এম এ ডিগ্রি নেন) প্রথম এম এ পাশ করেন। তিনি এম এ ডিগ্রি নেয়ার পরেই সরকারি চাকরিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। পশ্চাদপদ জেলার রাজনীতিতে তাঁদে কোনো ভূমিকা ছিল না। একই এলাকার জালাল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী ১৯০৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি (তিনি জেলার দ্বিতীয় ডিগ্রিধারী) ১৯১০ সালে এল. এল. বি ডিগ্রি নেয়ার পরে আইনপেশা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনি এ. কে. ফজলুল হকের বঙ্গীয় বিধান সভার মন্ত্রী পরিষদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

"ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে তিনি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি সে-প্রচেষ্টায় সফলও হয়েছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম জেলায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে এলাকায় উৎসাহ সৃষ্টি করতে না পারলে চট্টগ্রামসহ কক্সবাজার আরো অনেক পিছিয়ে পড়তো। জালাল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী চট্টগ্রাম মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারি ছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার জালাল উদ্দিন আহমদ চৌধুরীকে খান বাহাদুর উপাধি দিয়েছিলেন। খান বাহাদুর জালাল উদ্দিন আহমদ ছিলেন বরাবর স্বাধীনচেতা। দেশকে

www.pathagar.com

বৃটিশ বেনিয়ার কবল থেকে মুক্ত করার কথা চিন্তা করতেন। বৃটিশ সাহেবদের প্রতি তিনি বরাবরই ক্ষিপ্ত ছিলেন। একটি উদাহরণ থেকে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বৃটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে বৃটিশরা তাদের কথা রাখেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে বৃটিশরা যখন মুসলমান ও হিন্দুদের কাছ থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে মতামত নিচ্ছিলো তখন খান বাহাদুর জালাল উদ্দিন আহমদ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মতামত দিয়ে অসীম সাহসের পরিচয় দেন। এক পর্যায়ে বৃটিশ জেলা প্রশাসক জালাল উদ্দিন আহমদকে জেলে প্রেরণের হুমকি দিলে তিনি সাহসিকতার সাথে বলেছিলেন, 'আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করে জেলে দিলে আমি জেল থেকেই আপনাকে পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত করবো'। ক্ষমতাসীন বৃটিশ জেলা প্রশাসকের সামনে একজন দৃঢ়চেতা ও অসীম সাহসী মানুষ ছাড়া অন্য কেউ একথা বলতে পারতো না।"[৩৮]

ক্রমে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি চালু হয়। ১৮৬৯ সালে কক্সবাজার মহকুমা সদরকে পৌরসভায় উন্নীত করার পরেই মহকুমা সদরে ১৮৭৪ সালে প্রথম এম ই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে কক্সবাজার এম ই স্কুলটি সরকারি করা হয়।

চকরিয়ার কৃতী সন্তান আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী ১৯২২ সালে কলকাতা থেকে মোসলেম জগত পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকায় ব্রিটিশবিরোধী সম্পাদকীয় লিখনের দায়ে কারারুদ্ধ হতে হয়। রামু উপজেলার আবদুল মোতালেব ব্রিটিশবিরোধী গজল ও গান রচনা করার দায়ে কারাবরণ করেন।

১৯৪৭ সালে পূর্বে পরিচালিত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন বিশেষ করে স্বদেশি আন্দোলনে আবদুল মজিদ সিকদার, আবদুল মোতালেব, জালাল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, আবদুর রশিদ ছিদ্দিকীসহ এরা অনেকেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৪৭ সালের পাক-ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হলে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভাববলয় চাপিয়ে দেয়া শুরু হয়। যার ধারাবাহিকতায় উর্দুকে পাকিস্ত ানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা করে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এর বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। রাজধানী ঢাকাতে শুরু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সেই আন্দোলনে অন্যদের সাথে নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন কক্সবাজারের সন্তান ফরিদ আহমদ। তিনি বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সরকারি চাকরি থেকে ইস্তেফা দেন। বাংলা ভাষার জন্য অন্য কেউ এরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করার দুঃসাহস দেখাননি। এ ঘটনাকে প্রখ্যাত লেখক বদরউদ্দিন উমর লিখেছেন এভাবে 'ফরিদ আহমদ ভাষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা কালে একাধারে আইনের ছাত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি এবং সরকারি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। সরকারি কর্মচারী হিসেবে আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ৬ই জানুয়ারি ১৯৪৮-এ প্রাদেশিক চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ সেক্রেটারিয়েটে নিজের অফিসে ফরিদ আহমদকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেন। আজিজ আহমদ এই সাক্ষাৎকারের সময় ফরিদ আহমদকে বলেন যে সরকারি কর্মচারী

www.pathagar.com

হিসাবে তিনি চাকরির নিয়মকানুন ভঙ্গ করে সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত হয়েছেন। এজন্যে তিনি তাঁকে প্রথম বরখাস্ত করবেন ভেবেছিলেন কিন্তু পরে অল্প বয়সের কথা বিবেচনা করে প্রথমবারের মতো তিনি তাঁকে সাবধান করে দেওয়াই স্থির করেছেন। ফরিদ আহমদ উত্তরে তাঁকে বলেন যে, কর্তব্য সম্পর্কে তিনি নিজের ধারণা অনুসারেই কাজ করেছেন। কাজেই এ ব্যাপারে তিনি মোটেই অনুতপ্ত নন। ঐ সাক্ষাৎকারের পর ফরিদ আহমদ ৮ই জানুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে অফিসে গিয়ে বাংলাকে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভাষা হিসাবে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে চাকরি হতে ইস্তেফা দেন। এই প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ একটি সম্পাদকীয় লেখেন।"[৩৯]

ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত ভাষা আন্দোলনের ঢেউ কক্সবাজারে এসে লাগে। ১৯৭১ সালে ফরিদ আহমদের ভূমিকা তাঁর ইতোপূর্বেকার সকল অবদানকে ম্লান করে দেয়। তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিতর্কিত হয়ে পড়েন।

১৯৫২ সাল। ২১ শে ফেব্রুয়ারি-এর ইতিহাস সবারই জানা আছে। তখন আমি কক্সবাজার হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। নূরুল আজীম চৌধুরী (পরে জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান), আবদুল কাদের (পরে কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক), নূরুল হুদা চৌধুরী (ক্রীড়া সংগঠক), সালামাতুল্লাহ (অ্যাডভোকেট ও লেখক), জয়নাল আবেদীন (ব্যাংকার), সগীর আহমদ (ফুটবলার), আবুল কাশেম এবং অনেকেই কক্সবাজারের আলোচিত ছাত্র আন্দোলনে অত্যন্ত ভূয়সী অবদান রাখেন। তাদের সকলের নাম এ মুহূর্তে আমার স্মরণে আসছে না। তাই ক্ষমাপ্রার্থী। কক্সবাজারে আমাদের আন্দোলন চলাকালে ঢাকা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সংবাদ নিয়ে আমি চিঠে পাঠাতাম রামু স্কুলের ছাত্র নেতৃবৃন্দের কাছে। সর্ব বিষয়ে আমাদের পরামর্শ বাবু জোতিস্বর চক্রবর্তী অ্যাডভোকেট, বদিউল আলম মাস্টার প্রমুখ। কক্সবাজার থাকাকালে ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কক্সবাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সকলের জন্য কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিলের ব্যবস্থা করতাম।

কক্সবাজারে আমাদের এ সংগ্রামে যাঁর কৃতিত্ব ও নেতৃত্ব সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তাঁর নাম খালেদ মোশাররফ। তিনি কক্সবাজারের অধিবাসী ছিলেন না। পেশা উপলক্ষে কক্সবাজারে তাঁর মামা এস আর খানের বাসায় থেকে লেখাপড়া করতেন। খালেদ মোশাররফের ডাক নাম মনি। তাঁকে আমরা সবাই মনি ভাই বলে সম্বোধন করতাম। তিনি সেই প্রখ্যাত সেনাপতি জেনারেল খালেদ মোশাররফ। আমাদের আন্দোলনের সর্বাত্মক নেতৃত্বে ছিলেন মনিভাই। অপর সকলের সাথে তাঁর স্মৃতির প্রতিও জানাই অফুরন্ত শ্রদ্ধা। একদিন মিছিলের পর অনুষ্ঠিত হয় একটি জনসভা। খান অ্যাণ্ড রায় রচিত *'রচনা সার'* বই থেকে বাংলা ভাষার উপর লিখিত একটি প্রবন্ধ মুখস্ত করে আমি ঐ সভায় বক্তৃতা করলাম। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন খালেদ মোশাররফের আত্মীয় আইয়ুব আলী।

www.pathagar.com

সভা শেষে কক্সবাজার শহরের তিনটি প্রধান সড়ক কাছারি পাহাড় থেকে কস্তুরাঘাট, কাছারি পাহাড় বাজারঘাটা এবং কাছারি পাহাড় থেকে সি-বিচ পর্যন্ত তিনটি সড়কের নাম দিয়েছিলাম আমরা যথাক্রমে সালাম, জব্বার ও বরকত এর নামে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ তা বিস্মৃত। আমাদের দাবি নামগুলো উদ্ধার করা হোক।"[৪১]

"জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী লোকজন রাস্তায় নামে সরকারের নির্দেশনা উপেক্ষা করে। অবশ্যি উপজেলায় এর পূর্বে শুরু হয় ছাত্ররাজনীতি। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে উখিয়ার ছাত্ররাই এলাকায় সর্বপ্রথম সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে। ছাত্রলীগ ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ১লা জুনকে শিক্ষাদিবস ঘোষণা করে এবং এ দিন উপলক্ষে দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ করার ঘোষণা করে। এ উপলক্ষে উখিয়াতেও ছাত্ররা রাস্তায় নেমে পড়ে। উখিয়া হাইস্কুলের ছাত্র শাহজাহান চৌধুরীর নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক ছাত্র ১লা জুন ৬৬ বিক্ষোভ করে রাস্তায় নেমে পড়ে। ছাত্ররা মিছিল সহকারে কোটবাজার হয়ে রূমখা বাজার পর্যন্ত অগ্রসর হলে পুলিশ তিনজন ছাত্রকে আটক করে। আটক ছাত্রদের মধ্যে ছিল আজকের জননেতা ও বিএনপি নেতা শাহজাহান চৌধুরী, আবদুল জব্বার চৌধুরী ও সন্তোষ কুমার বড়ুয়া। উক্ত তিন ছাত্রই পাকিস্তান আমলে উপজেলার প্রথম রাজবন্দী। পুলিশ তাদেরকে আটক করলেও রাতে থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।"[৪২]

১৯৬৪ সালে মহকুমা আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে করেন তরুণ আইনজীবী নূর আহমদ। তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জনাব নূর আহমদ ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে দলের প্রার্থী হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) নির্বাচিত হন।

১৯৬৪ সালে গঠিত মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন আফসার কামাল চৌধুরী। আফসার কামাল চৌধুরী ও নূর আহমদের নেতৃত্বে রাজধানী ঢাকার সাথে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালিত হয়।

১৯৬৮ সালে অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম কক্সবাজার মহকুমা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৭০ পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে দলের মনোনয়ন নিয়ে চকরিয়া-কুতুবদিয়া নির্বাচনী এলাকার প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু তাঁকে কক্সবাজার জেলা গভর্নর মনোনীত করেন।

১৯৬৯ সালে কক্সবাজার মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি আফসার কামাল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নূর আহমদের নেতৃত্বে কক্সবাজারেও কর্মসূচি পালন করে।

জেলায় জাতীয় সংসদের সংসদীয় আসন সংখ্যা ৪টি। এই আসনগুলোর মধ্যে চকরিয়া-পেকুয়া উপজেলা নিয়ে কক্সবাজার-১, কুতুবদিয়া-মহেশখালি উপজেলা নিয়ে কক্সবাজার-২, কক্সবাজার সদর-রামু নিয়ে কক্সবাজার-৩ এবং উখিয়া-টেকনাফ উপজেলা নিয়ে কক্সবাজার-৪ সংসদীয় আসন গঠিত। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় কক্সবাজার ছিল মহকুমা। সে-সময় কক্সবাজার মহকুমায় জাতীয় সংসদের আসন ছিল মাত্র একটি, পাশাপাশি প্রাদেশিক পরিষদের সংসদীয় আসন ছিল ৩টি। তৎকালীন

www.pathagar.com

কক্সবাজার মহকুমার একমাত্র জাতীয় সংসদ নির্বাচনী আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নৌকা প্রতীক নিয়ে অ্যাডভোকেট নূর আহমদ এম এন এ নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বৃহত্তর চকরিয়া (বর্তমানের পেকুয়া উপজেলা চকরিয়া উপজেলার অধীন একটি ইউনিয়ন ছিল) ও কুতুবদিয়া থানার সমন্বয়ে গঠিত আসনে অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হন, কক্সবাজার-মহেশখালি থানা নিয়ে গঠিত আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মোস্তাক আহমদ চৌধুরী ও রামু-উখিয়া-টেকনাফ থানা নিয়ে গঠিত আসনে ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরী আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হন। অবশ্যি পরে ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে মোস্তাক আহমদ চৌধুরী নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

কক্সবাজারের রাজনীতিতে আইনজীবীরাই বরাবর নেতৃত্ব দিয়েছেন। সে কারণে অনেক রাজনীতিবিদের নাম ইতোমধ্যে আলোচনায় এসেছে। তবু জেলার প্রথিতযশা আইনজীবী হিসেবে কক্সবাজারের রাজনীতিতে স্মরণীয় হয়ে আছেন তারা হচ্ছেন জালাল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (বঙ্গীয় বিধান সভার স্বাস্থ্য মন্ত্রী), বদিউর রহমান চৌধুরী, মৌলভী মেহের আলী, মৌলভী ফরিদ আহমদ, জোতিশ্বর চক্রবর্তী, বিপিন বিহারী রক্ষিত, ফিরোজ আহমদ চৌধুরী, নূর আহমদ।

## ট. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কক্সবাজার মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ এবং ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাছাড়া ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন আলাদা সংগ্রাম কমিটি গঠন করে।

"কক্সবাজারে মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবছার কামাল চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে একটি সর্বদলীয় মহকুমা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির পুর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া না গেলেও অ্যাডভোকেট জ্যোতিশ্বর চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট সুরেশ সেন, অ্যাডভোকেট নূর আহমদ এম.এন.এ, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম এমপিএ, ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরী এমপিএ, মোস্তাক আহমদ চৌধুরী এমপিএ, অ্যাডভোকেট মওদুদ আহমেদ, একেএম মোজাম্মেল হক, মনিরুল হক চৌধুরী, শামসুল হুদা ছিদ্দিকী, প্রফেসর মোশতাক আহমদ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শমসের আলম চৌধুরী, ইসহাক মিয়া চৌধুরী, এস.কে শামসুল হুদা, আলী মিয়া সিকদার, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ডা. শামসুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, বাদশা মিয়া চৌধুরী, হাজী আবদুল করিম, সিরাজুল হক সওদাগর, আমির আলী মাস্টার, সালেহ আহমদ চৌধুরী, সুলতান আহমদ, ছৈয়দুল আলম চৌধুরী প্রকাশ আলম মাস্টার, আমির মোহাম্মদ সওদাগর, ফয়েজ আহমদ চৌধুরী, আবদুল্লাহ খান, কামাল হোসেন চৌধুরী, ওবাইদুল হক, আকতার আহমদ, ছৈয়দ আলম সওদাগর, মাস্টার গোলাম কাদের, আজিজুল ইসলাম চৌধুরী, দীপক বড়ুয়া, সিরাজুল হক সওদাগর ও জ্ঞানেন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ।

www.pathagar.com

কক্সবাজার মহকুমা আওয়ামী লীগ কার্যালয়কে সাংগঠনিকভাবে মহকুমা সংগ্রাম কমিটির কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং জেলা পরিষদের ডাক বাংলোকে কন্ট্রোল রুম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকা থেকে অর্থ সংগ্রহ, জনসংযোগ, প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলা ও অস্ত্র সংগ্রহ করাই ছিল সংগ্রাম কমিটির কাজ। উখিয়া, টেকনাফ, মহেশখালি, চকরিয়া থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা হয় সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে।"[৪৩]

পরে মহকুমার বিভিন্ন থানায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি এবং সাথে ছাত্রসংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।

স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে কক্সবাজার মহকুমার সর্বত্র সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু করে। কক্সবাজার শহরের পৌর প্রিপ্যারেটরি হাইস্কুল, পিটিআই স্কুল নামে খ্যাত রুমালিরছড়া, ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বাহারছড়া বৌদ্ধমন্দির মাঠে, ছাত্রলীগের উদ্যোগে স্টেডিয়ামে, চকরিয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পরে চকরিয়া হাই স্কুল মাঠে, চকরিয়া কলেজ ময়দান, ফাঁসিয়াখালি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এবং রামুতে খিজারি হাই স্কুল মাঠে অস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। স্বাধীনতার ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যেই মেজর জিয়াউর রহমান কক্সবাজার আসেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে লোকজনকে বিভিন্ন নির্দেশ দেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ১নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর শওকত আলী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪০/৪৫জন বাঙালি সৈনিকসহ কক্সবাজার আগমন করেন।

চট্টগ্রামে যখন প্রতিরোধ চলছিল তখন আরাকান সড়কে ছিল ব্যারিকেড। চট্টগ্রামের পটিয়ায় মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা রাস্তায় ইট পাথর ও তেলের ড্রাম ফেলে ব্যারিকেড দেয়। পাশাপাশি সশস্ত্র পাহারাও বসানো হয় যাতে পাক হানাদারবাহিনী অগ্রসর হতে না পারে। ফলে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। চকরিয়ার মাতামুহুরি ব্রিজের নিচেও বসানো হয় কড়া পাহারা। চকরিয়ায় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্লাটুন কমান্ডার মোজাম্মেল হকের নেতৃত্বে এ পাহারা চলতে থাকে পাক হানাদার বাহিনীর আগমনের আগ পর্যন্ত। রামুতে চা বাগানেও বসানো হয়েছিল পাহারা। এমনি কড়া পাহারা বসানো হয় সে জালে মেজর জিয়াউর রহমান ও তার দল আটকা পড়ে। রামু চা বাগানে মুক্তিযোদ্ধারা মেজর জিয়াসহ সকলকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রাখে। তখন মেজর জিয়া মহকুমা সংগ্রাম কমিটির সাথে যোগাযোগ করে উদ্ধার পান। ১০ এপ্রিল কালুরঘাটে ভয়াবহ যুদ্ধের পরে ১১ এপ্রিল পাক হানাদারেরা কালুরঘাট দখল করে। যুদ্ধে ক্যাপ্টেন হারুন গুরুতর আহত হন, লে. কর্নেল শমসের মুবিন আহত হয়ে ধরা পড়েন। লে. মাহফুজ নিরাপদে সরে যেতে সক্ষম হন। এ যুদ্ধে বাঙালি সেনা ছিল মাত্র ৩৫ জন। পাক হানাদার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১০০জন। আহত ক্যাপ্টেন হারুনকে ডা. তড়িৎ কান্তির সহায়তায় ডুলাহাজারা হাসপাতালে নেয়া হয় এবং সেখানে অস্ত্রোপচার করা হয়। ওখান হতে উখিয়া রত্নাপালং-এ শমসের আলম চৌধুরীর বাড়িতে অবস্থান করেন ক্যাপ্টেন হারুন। পরে স্ট্রেচারে করে তাঁকে বার্মায় নিয়ে যাওয়া হয়।

www.pathagar.com

হানাদার বাহিনী চকরিয়া আগমনের পরে চূড়ান্তভাবে মহকুমার পতন হয়। এতে স্বাধীনতাকামীরা নিরাপদ ছিলেন না। যে যেভাবে পারে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের দেমাগ্রিতে চলে যায়। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে মাতৃভূমি রক্ষার পবিত্র ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন।

চকরিয়া বরইতলির বীর মুক্তিযোদ্ধা এএইচ সালাহ্ উদ্দিন মাহমুদ ভারতে না গিয়েও দেশের অভ্যন্তরে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে চকরিয়ায় আসেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি বিএলএফ কক্সবাজারের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

"২৮ সেপ্টেম্বর হাবিলদার আবদুস সোবহানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা জোয়ারিয়ানালা সেতুতে অভিযান পরিচালনা করে গোলাগুলি ব্যতিরেকে ১০ জন রাজাকার ও পুলিশকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে একটি ৩০৩ রাইফেল, ৮৫ রাউন্ড ৩০৩ (থ্রি নট থ্রি)'র গুলি হস্তগত করেন।

সফলভাবে জোয়ারিয়ানালা সেতু অপারেশনের পর হাবিলদার আবদুস সোবহানের নেতৃত্বাধীন দলটি জোয়ারিয়ানালা থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ঈদগাঁও সেতু অপারেশন করে। সফল অপারেশনের পরে মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের ফেলে যাওয়া ৯৫ রাউন্ড ৩০৩ রাইফেলের বুলেট উদ্ধার করে।

ঈদগাঁও সেতুর প্রথম অপারেশনের পরে মুক্তিযোদ্ধারা ২৩ নভেম্বর ভোর রাত ২টায় দ্বিতীয় অপারেশন চালায়। অপারেশনে রাজাকার ও পুলিশ বন্দী হয় ১২ জন। অন্যরা পালিয়ে যায়। এতে মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয় ৭টি ৩০৩ রাইফেল ও ৩০০ রাউন্ড গুলি।

১৫ অক্টোবর ভোর ৫টায় হাবিলদার আবদুস সোবহান, কমান্ডার ইদ্রিস মোল্লা ও গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বদেশে ফেরত আসা চকরিয়ার আবদুল হামিদ (শহিদ) ৭১জন মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে লামা থানায় অভিযান পরিচালিত হয়। দীর্ঘ ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট যুদ্ধ চলার পর শত্রুপক্ষের বেশ কিছু সংখ্যক হতাহত হওয়ার কারণে শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করে। এই অপারেশনে লামা থানা থেকে ৩৮টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও ১০,৬৫৯ রাউন্ড থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলি পাওয়া যায়।

১৯৭১ সালের কক্সবাজার ও বান্দরবান হাবিলদার আবদুস সোবহানের নেতৃত্বে ৩৫ সদস্যের এক মুক্তিযোদ্ধা দল নতুন মুরংপাড়াস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প থেকে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ২ নভেম্বর মধ্যরাতে ডুলাহাজারা সেতুতে অভিযান পরিচালনা করে। ওখান থেকে ৩টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও ৩০ রাউন্ড থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলি মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়।

পাক-হানাদার বাহিনীর স্থানীয় দোসরদের সহযোগিতায় ২৫ নভেম্বর সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে ঈদগড়ের পূর্বে গহীন জঙ্গলে মুরুং পাড়ার পাহাড়ের উপর পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকারের সমন্বয়ে প্রায় ৫০০ জনের একটি দল মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী সম্মুখ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের ৮ জন নিহত ও ৯ জন আহত হয়। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এ জেলার

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ইদগড়ের মুরুংপাড়ার যুদ্ধ সবচেয়ে বড় অপারেশন। এ যুদ্ধের ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন রামু উপজেলার সদর ফতেখারকূল ইউনিয়নের মণ্ডলপাড়ার আবু আহমদ।

১১ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা রামু থানায় অপারেশন চালায় এসময় থানায় কর্মরত পুলিশ ও আনসার সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তান্তর হয়।

১২ ডিসেম্বর উখিয়া থানায় অপারেশন চালানো হয়। বিনা রক্তপাতে থানার রাজাকার ও পুলিশ আত্মসমর্পণ করার পর ৮৭টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল, ৪৭৪০ রাউন্ড গুলি মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়।

৬ ডিসেম্বর সকালে ভারতীয় বিমানবাহিনী কক্সবাজার বিমানবন্দরে প্রায় ২০ মিনিট হামলা চালিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। বোমা হামলায় মহকুমা শান্তিকমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট মঈদুর রহমান চৌধুরী নিহত হয়। এর মধ্যদিয়ে কক্সবাজারে পাকবাহিনীর ভিত নড়ে যায়।

কক্সবাজার হানাদারমুক্ত হয় ১২ ডিসেম্বর। এদিন মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি গ্রুপ সম্মলিতভাবে কক্সবাজার শহরে উপস্থিত হয়। কিন্তু কক্সবাজার পরিপূর্ণভাবে হানাদারমুক্ত হয় ১৩ ডিসেম্বর। আর এদিকে ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর বঙ্গোপসাগরের রেজু নদীর মোহনা দিয়ে কক্সবাজারে ভারতীয় সৈন্যের অবতরণ শুরু হয়। প্রবেশের সময় সাগরে ডুবে দুই ভারতীয় সৈন্যের সলিলসমাধি হয়।"[৪৪]

৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। কক্সবাজার জেলার অনেক তরুণ-যুবা-প্রবীণ প্রাণ দিয়েছে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য, ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের সবার পরিচিতি দিলে পরিসর অনেক বৃদ্ধি পাবে। এসব শহিদের মধ্যে নিম্নলিখিতদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

**ফরহাদ**

ফরহাদ-উদ-দৌল্লা মোহাম্মদ এজহারুল ইসলাম প্রকাশ ফরহাদ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শহিদ। চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে জন্ম। ১৯৬২ সালে বৈলছড়ি নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাওল হলে ৩১ মার্চ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে কাজ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাক হানাদারদের দখলে চলে যাবার পরে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার দায়িত্ব নিয়ে কক্সবাজারে আসেন। কক্সবাজারে তখনও পাক-হানাদার বাহিনী পৌঁছেনি। তবে তা নিয়ন্ত্রিত ছিল স্থানীয় পাকিস্তানি দালালদের দ্বারা। তাই ফরহাদ ও তাঁর গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধাগণ দালালদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। এক পর্যায়ে সম্মুখ সংঘর্ষে দলের একজন আহত সদস্যকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার সময় ফরহাদ ও তাঁর সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধারা দালালদের হাতে ধরা পড়েন। ৫ মে' ৭১ পাকহানাদার বাহিনী কক্সবাজার পৌঁছলে দালালরা ফরহাদসহ তাঁর সহযোদ্ধাদের তাদের হাতে তুলে দেয়। পাকসেনারা সেদিনই তাদের সবাইকে বাঁকখালির পাড়ে নিয়ে

www.pathagar.com

এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ ফরহাদ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। হানাদারেরা তাকে মৃত ভেবে অন্যদের সাথে বাঁকখালি নদীর চরে বালিচাপা দেয়। পরে ফরহাদ বালু সরিয়ে মৃত্যুপুরী থেকে উঠে স্থানীয় একটি মসজিদে আশ্রয় নেন।

কিন্তু বিধি বাম, পাকিস্তানি দোসর আমির হোসেন মাঝি তাঁকে ধরে পাক-হানাদার বাহিনীর কাছে সোপর্দ করে। পরদিন ৬ মে পাক হানাদারেরা আবার বাঁকখালি নদী তীরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফরহাদের মরদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেয়। লাশ কয়েকদিন নদীর উজান-ভাটায় ভেসে ভেসে থাকার পর স্থানীয় লোকজন তাঁকে তুলে বদর মোকামস্থ কবরস্থানে দাফন করে।"[৪৫]

## সুভাষ দে

কক্সবাজারেই জন্ম। কক্সবাজার কলেজে অধ্যয়নকালেই বাম রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তৎকালীন মহকুমা ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) সাংগঠনিক সম্পাদক তিনি। ২৬ মার্চ রামু খিজারি হাইস্কুলের পাকিস্তানি পতাকা নামানো হয়। কক্সবাজারে হানাদার বাহিনী আগমনের পর পাকিস্তানি পতাকা পুড়ানোর দায়ে হানাদার বাহিনী তাকে হন্য হয়ে খুঁজতে থাকে। একদিন স্বাধীনতাবিরোধীরা তাঁকে হানাদার বাহিনীর কাছে ধরিয়ে দেয়। হানাদার বাহিনী কক্সবাজারে এসে পৌঁছলে স্বাধীনতাকামী তরুণদের সঙ্গে সুভাষকেও নুনিয়াছড়া বাঁকখালি নদীর তীরে নিয়ে গুলি করে। গুলিতে সুভাষের মৃত্যু না হওয়ায় একটি সেনা-জিপের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতেও সুভাষের মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়ায় পরে গাড়িচাপা দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য কক্সবাজার ইন্সটিটিউট ও পাবলিক লাইব্রেরির মিলনায়তনটি 'সুভাষ হল' নামকরণ হয়।"[৪৬]

## মোহাম্মদ ইলিয়াছ প্রকাশ ইলিয়াছ মাস্টার

কক্সবাজার সদর উপজেলার পোকখালিতে জন্ম। পিতা হাফেজ মোবারক আলী। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯৬২ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর উখিয়া হাই স্কুলে যোগদান করেন এবং উখিয়াতে বিয়ে করে স্থায়ী হয়ে যান। ১৯৭০ সালে ঘুমধুম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁকে পাক-হানাদার বাহিনী বন্দী করে ও কারাগারে নিক্ষেপ করে।

তাঁর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য উখিয়া উপজেলা পরিষদ ১৯৮৮ সালে উখিয়া মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'শহীদ ইলিয়াছ মিয়া পাঠাগার' এবং ঘুমধুম হাই স্কুলে 'শহীদ ইলিয়াছ মিয়া পাঠাগার' প্রতিষ্ঠা করে। গণ-পাঠাগারটি দীর্ঘ এক যুগ ধরে অযত্নে-অবহেলায় পড়ে রয়েছে।"[৪৭]

## আবদুল হামিদ

১৯৫০ সালে চকরিয়া উপজেলার বমুতে জন্ম। পিতা আবদুল ফাত্তাহ মাস্টার। মাতা গুলফরাজ বেগম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কক্সবাজারে যে কয়জন মুক্তিকামী যুবক শহিদ হয়েছেন তৎমধ্যে আবদুল হামিদ অন্যতম। ১৯৬৫ চকরিয়া হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি, ১৯৬৭ চট্টগ্রাম সরকারি বাণিজ্য

কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। এইচএসসিতে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের মেধা তালিকায় ১০ম স্থান অধিকার করেন। এসময় তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন এবং ১৯৬৮-৬৯ বাণিজ্য কলেজ শাখার সভাপতি মনোনীত হন। ৬৯-এর গণআন্দোলন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগে ভারতে গিয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে তিনি পাঁচ সদস্যের গেরিলা দল গঠন করে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁর নেতৃত্বে চকরিয়া উপজেলার নজির আহমদ, জহিরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, জয়নাল আবেদিন, মোহাম্মদ মুছা, পোস্ট মাস্টারের ছেলে মুছা চকরিয়া, লামা, আলিকদম এলাকায় গেরিলা অভিযান পরিচালনা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৪ নভেম্বর দেশদ্রোহীরা তাঁকে ধরে পাক-হানাদারদের হাতে সোপর্দ করে এবং হানাদার বাহিনী তাঁকে অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতন করে ১৯ নভেম্বর টেকনাফের নাইট্যং পাহাড়ের বধ্যভূমিতে গুলি করে হত্যা করে। দেশ স্বাধীন হলে ২৪ ডিসেম্বর তাঁর গায়ের জামা দেখে তাঁকে সনাক্ত করা হয় এবং তাকে চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের হযরত শাহ্ ওমর রা. মাজারের পাশে দাফন করা হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজে 'শহীদ আবদুল হামিদ পাঠাগার' এবং চকরিয়া কলেজে 'শহীদ আবদুল হামিদ ছাত্রাবাস' তাঁর স্মৃতি বহন করছে।"[৪৮]

এছাড়াও যাঁদের নাম জানা গেছে তাঁরা হচ্ছেন, গোলাম কাদের, গোলাম সাত্তার, আকতার হোসেন, আমির হামজা, জোনাব আলী, আবদুল লতিফ, মোহাম্মদ নুরুল আলম, মেছের আহমেদ, সিদ্দিক আহমেদ, মোহাম্মদ এজাহার মিয়া, আবুল কালাম, এনামুল হক, মকবুল আহমেদ, মনোহরি দে, উমাচরণ দে, যোগেন্দ্র শীল, রহীম বখশ, লাল মোহাম্মদ, অ্যাডভোকেট জ্ঞানেন্দ্র লাল চৌধুরী, অ্যাডভোকেট বধেন্দ্র বিকাশ ভট্টাচার্য, ফজু খলিফা, যতীন্দ্র মোহন দে, মনিন্দ্র নাথ দে, বিমল চৌধুরী, অর্জুন শীল, কালু পাল, সাধন চন্দ্র বিশ্বাস, আবদুস সাত্তার, আদুংমং, মাদ্রা, মংটিন যেইন, হামং, যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, নুরচ্ছফা চৌধুরী, অনিল কান্তি দাশ, মোহাম্মদ আলী, ধীরেন্দ্র চন্দ্র দে (ভেক্কামহাজন), মোহাম্মদ আলী, আবু সামা, আবুল কাসেম, কবির আহমদ, আলী আহমদ, দরবেশ আলী, মোহাম্মদ সোলেমান, শামসুল ইসলাম, সতীশ মহাজন দে, মাস্টার শাহ আলম, শশী কুমার বড়ুয়া, ভূট্টো বড়ুয়া, আবুল খায়ের, অমূল্য দে, মোহাম্মদ ইউনুছ, শফিকুল ইসলাম, হরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য, অজিত পাল, নির্মল ধর, আমান উল্লাহ, মনীন্দ্র বড়ুয়া, মাস্টার বশির আহমদ, আহমদ কবীর, মন্টু কুমার দাশ, বরেন্দ্র, মহেন্দ্র ভট্টাচার্য, বাসনী পাল, শামসুন নাহার, জাকা বকসুর পুত্র মোহাম্মদ জাফর, ভট্ট মহাজন, যামিনী মোহন শর্মা এবং শশাংক বড়ুয়াসহ আরো অনেক নাম না জানা শহিদ মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন।

এসব শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও জেলার উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করা হলো।

**আবদুস ছোবহান**

উখিয়ায় ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সালে জন্ম। পিতা: মকতুল হোসেন, মাতা: ফাতেমা বেগম। ১৯৫৫ সালে চট্টগ্রামের বাঁশখালি হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান, ১৯৭০ সালে হাবিলদার হিসাবে পদোন্নতি

www.pathagar.com

পান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং কক্সবাজার ও বান্দরবান অঞ্চলের উপ-অধিনায়ক নিযুক্ত হন। সম্মুখ সমরে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে ৮ ডিসেম্বর উখিয়া সদরে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং ১২ ডিসেম্বর কক্সবাজার জেলা মুক্ত করে কক্সবাজার পাবলিক হল মাঠে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। দেশ স্বাধীন হলে তিনি পুনর্গঠিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ফিরে যান এবং ১৯৮৮ সালে অনারারি ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৯৯৫ সালে তাঁর গ্রামে 'মরিচ্যা মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন।"[৫০]

## খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করেছে। সর্বোচ্চ সম্মানসূচক পদক- বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন, বীর উত্তম ৬৮জন, বীর বিক্রম ১৭৫ জন ও ৪২৬ জনকে সরকার বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করে। বাংলদেশ সরকার ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের গেজেট প্রকাশ করে। গেজেট অনুযায়ী কক্সবাজার জেলার তিন বীর মুক্তিযোদ্ধা সরকারের সম্মানসূচক খেতাব পেয়েছেন। সম্মানসূচক খেতাবের মধ্যে একজন বীর উত্তম ও অপর দুইজন বীর প্রতীক। খেতাবপ্রাপ্ত তিন মুক্তিযোদ্ধাই সরকারি বিধিবদ্ধ বাহিনীর সদস্য তথা ফৌজ। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর (বর্তমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী) মেজর জিয়াউদ্দিন, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-ইপিআর (বর্তমান বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ রাইফলেস্ তথা বিডিআর)-এর নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ নূরুল হুদা ও পাকিস্তান বিমান বাহিনীর কর্পোরাল (বর্তমান বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) নূরুল হক। তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিচে দেওয়া হলো।

### জিয়াউদ্দিন, বীর-উত্তম

লেফট্যানেন্ট কর্নেল জিয়াউদ্দিন বীর উত্তম, পিতা : আবুল কাশেম। ১৯৭১ সালে তিনি মেজর হিসেবে রাওয়ালপিন্ডিস্থ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে জি. এইচ. কিউ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেখানে তাঁর সতীর্থ ছিলেন মেজর মোহাম্মদ আবু তাহের (পরবর্তীতে বিখ্যাত কর্নেল তাহের)। একাত্তরের মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মেজর জিয়াউদ্দিন ও মেজর মোহাম্মদ আবু তাহের যৌথভাবে ছুটির নামে এপ্রিল মাসে সেনা-সদর থেকে আত্মগোপনে চলে যান। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসার সময় ঝিলাম থেকে ক্যাপ্টেন পাটোয়ারি ও শিয়ালকোট থেকে মেজর মনজুর তাঁদের সঙ্গ নেন। এভাবে এই চার বাঙালি সেনানায়ক সুকৌশলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে প্রথমে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। '৭১-এর জুলাই মাসে বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দেন। তিনি কক্সবাজার জেলার একমাত্র 'বীর উত্তম' উপাধিধারী মুক্তিযোদ্ধা।

www.pathagar.com

**নূরুল হক, বীর প্রতীক**

নূরুল হক বীর প্রতীক, পিতা : শফিকুল হক [প্রকাশ মাস্টার শফিকুল হক প্রকাশ মোহাম্মদ নবী মাস্টার]। মাতা : ছমুদা খাতুন। তিনি ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে এয়ার ক্রাপ্টম্যান হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কৌশলে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযদ্ধের ১ নম্বর সেক্টরে হরিণা ক্যাম্পে যোগদান করেন। হরিণা ক্যাম্পে নবাগত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলকালীন সময়ে প্রবাসী সরকারের নির্দেশে ৫০ জন বৈমানিকের সমন্বয়ে বিমানবাহিনী সেক্টর গঠিত হয়। ডিসেম্বর মাসে তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধবিমান নিয়ে চট্টগ্রামে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতাপূর্ণ অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' উপাধি পান।

**মোহাম্মদ নূরুল হুদা, বীর প্রতীক**

মোহাম্মদ নূরুল হুদা বীর প্রতীক, পিতা : মোহাম্মদ সুলাইমান, মাতা : চেমন খাতুন। ১৯৫১ সালের ৯ জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর)-এ সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান জম্মুরিয়া ইসলামিয়া দিবসে তিনি তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে যশোহর কোয়ার্টার গার্ড-এ পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন। পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের দায়ে তাঁদের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালে অভিযোগ তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কোর্ট মার্শালের আওতায় আর বিচার হয়নি। ২৭ মার্চ যশোর ক্যান্টনমেন্টে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপর হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি সেনাদের উপর গোলাগুলি করলে তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন রাত ১২টার দিকে এবং যশোর ইপিআর হেডকোয়ার্টারের অস্ত্রাগারের দরজা ভেঙে সমস্ত অস্ত্র নিজেদের দখলে নিয়ে অবাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করে বন্দি নড়াইল জেলখানায় আটক করে। তিনি ৮ নম্বর সেক্টরে (কল্যাণী ও কৃষ্ণনগর সেক্টরে) মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ৮ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন মেজর আবু উসমান চৌধুরী। পরে সেই সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন মেজর আবুল মনজুর (যিনি পরে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন)। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান ও বিচক্ষণতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

## ঠ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কক্সবাজার বাংলাদেশের একটি প্রান্তিক জেলা। পূর্বে এটি স্বাধীন আরাকানের অধীন একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান নামধারণ করে ভারত উপমহাদেশ থেকে পৃথক হওয়ার পরে কক্সবাজার চট্টগ্রাম জেলার মহকুমায় উন্নীত হয়। তবে ১৮৫৪ সালে কক্সবাজার মহকুমায় উন্নীত হলেও এখানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গড়ে উঠেনি। এমন কি কোনো ছাপাখান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু কি তাই, কক্সবাজারে একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কলেজ স্থাপিত হয়েছে ১৯৬৩ সালে। এখানকার শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৬০ কিলোমিটার দূরের চট্টগ্রাম শহর বা

www.pathagar.com

অন্য কোনো শহরের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। পরে কক্সবাজার কলেজে ডিগ্রি চালু করা হয়। ১৯৫৮ সালের দিকে এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ছাপাখানা। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হলেও সংবাদপত্র বা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে সেই ছাপাখানা কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেই এখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে স্থানীয় ছাপাখানা ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। স্বাধীনতার পরেই এখানে অনিয়মিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৭৮ সালেই নিয়মিত ভাবে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে লোকজ সংস্কৃতির নানা উপাদান নিয়ে গ্রামীণ সমাজে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই লোকসংস্কৃতি ও শিল্পের ঐতিহ্য লোকঅভিজ্ঞতা লোকমুখে ও লোকপরিবেশনার মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়ে আসছে। আরাকানের অধীন একটি অঞ্চল হিসেবে এখানকার লোকসাহিত্যকে হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। সে-কারণেই এখানে অনেক প্রতিভাবান লোকশিল্পী দেখা যায়। এসব লোকশিল্পী ও গায়কের মধ্যে কয়েকজন গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হলো।

## আবু বকর সিদ্দিক (১৯২৩-১৯৯৫)

১৯২৩ সালে কক্সবাজার শহরে জন্ম। পিতা আবদুল বারি পেশকার। শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৪২-৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। যুদ্ধ শেষে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে চট্টগ্রামে আর্য সংগীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরে ওস্তাদ মুন্সী রইস উদ্দিন ও চট্টগ্রামের ওস্তাদ জগনানন্দ বড়ুয়ার কাছে শাস্ত্রীয় ও ধ্রুপদী সংগীতের তালিম নেন এবং বিখ্যাত সংগীত বিদ্যাপীঠ ধ্রুব পরিষদ আয়োজিত বি. মিউজিক পরীক্ষায় সারা দেশের মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিছুদিন কো-অপারেটিভ বাংকের সুপারভাইজার পদে চাকুরি করেন। সংগীতসাধনার জন্য চাকরি ছেড়ে দেন এবং কক্সবাজার ইন্সটিটিউট ও পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের চাকরি নেন। ১৯৬০ সালে তিনি কক্সবাজারে সংগীতশিক্ষা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'সংগীতায়তন'। চট্টগ্রাম আর্য সংগীতের অধ্যক্ষ ও শাস্ত্রীয় সংগীতকার ওস্তাদ মিহির লালাসহ বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত শিল্পী তাঁর ছাত্র। সংগীত ও সংস্কৃতি সাধনায় স্মরণীয় অবদানের জন্য তিনি চট্টগ্রাম ধ্রুব পরিষদ সম্মাননা, কক্সবাজার গুণীজন সংবর্ধনা পরিষদের কক্সবাজার পদক ১৯৮৯ ও ১৯৯৮ (মরণোত্তর), সোহিনী শিল্পীগোষ্ঠী পদক

*ওস্তাদ আবু বকর সিদ্দিক*

www.pathagar.com

১৯৯৩, উদীচি শিল্পীগোষ্ঠী পদক ১৯৯৩, রামু দুর্বার শিল্পীগোষ্ঠী সংবর্ধনা ১৯৯৫ ও কক্সবাজার জেলা প্রশাসন কর্তৃক কক্সবাজার পদকে (২০০৪, মরণোত্তর) ভূষিত হন।

তাঁর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান 'সংগীতায়তন' বর্তমানে শত শত শিল্পীর মনন বিকাশে ভূমিকা রাখছে।"[৫১]

## আবদুল করিম বরকেতা গাইন (১৮৯৮-১৯৬৫)

কক্সবাজার সদরের ঈদগাঁতে ১৮৯৮ সালে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম। নিরক্ষর তবে স্বশিক্ষিত আবদুল করিম দারিদ্র্যকে সম্বল করে বেড়ে ওঠেন। বেঁচে থাকার তাগিদে আরাকানের বিভিন্ন স্থানসহ কক্সবাজার-চট্টগ্রামে ধানক্ষেতে শ্রম দিয়েছেন। এসময় লেটো দলে গাইনে, ধোঁয়া ধরতেন পুঁথি পাঠে, পরে এক পর্যায়ে নিজেই কবিতা রচনা শুরু করেন। নিজের ভেতর থেকে গান বের হতে চাইলে তাঁর শরীরে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসতো। জ্বর আসলে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তেন এবং গুন গুন করে গানের কলি বের হতো। নিজে তো লিখতে পারতেন না, তখন এমন কেউ ছিল না তা লিখে রাখার মতো। ফলে তার অনেক গান হারিয়ে গেছে। তাঁর গ্রামেরই এক লোকসাহিত্য সংগ্রাহক (গ্রন্থের প্রধান সমন্বয়কারী) তাঁর কয়েকটি গান সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থের নাম দিয়েছেন *বরকেতা গাইন*। গ্রন্থটি ২০০৩ সালে কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী প্রকাশ করেছে। গ্রন্থের একটি বিখ্যাত গান হচ্ছে 'ব্রিটিশ-জাপান যুদ্ধের গান'। মূলত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে আরাকানের মগ-মুসলমানদের মধ্যে সংগঠিত দাঙ্গা নিয়েই রচিত গানটি। 'বরকাঁথা' বা 'বড়কাঁথা' বা 'মোটাকাঁথা' গায়ে দিয়ে কবিতা বা গান রচনা করতেন বলেই তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম আবদুল করিম মুছে গিয়ে নতুন নাম হয় 'বরকেতা গাইন'। বরকেতা গাইনের ব্রিটিশ-জাপান যুদ্ধের গানের কয়েকটি লাইন নিম্নে উদ্বৃত করা হলো।

> কইন্যা কাড়ের কুম্‌মারী
> ফুইন্য যাদুর লরখরি
> সে যাদুরে মারি ফেইল্যে
> লোহার ছেল মারি।
> ছেলর আগাত যাদু লই
> দুষ্ট মগে নাচের গৈ
> মুসলমানে গরের কাঁদন
> জঙ্গলেতে বৈ।"[৫২]

## মোহাম্মদ হারু প্রকাশ হারু পণ্ডিত (১৮৬৬-১৯৩৬)

মোহাম্মদ হারু প্রকাশ হারু পণ্ডিত ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে উখিয়া থানার রত্না পালং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আলী। মোহাম্মদ আলীর ৫ পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র নুর আলী, ওয়াজ উদ্দিন, করিম উদ্দিন রত্নাপালং গ্রামে বসবাস করতেন। অপর দুই পুত্রের মধ্যে মোহাম্মদ হারু পালংখালি ইউনিয়নের থাইংখালি গ্রামে এবং বদিউদ্দিন বালুখালি গ্রামে বসবাস করেন। তাঁহাদের পরবর্তী বংশধরগণ এখনো সেখানে বসবাস করছেন। রত্নাপালং গ্রামের নুর আলী প্রকাশ নূর আলী মুন্সীর বড়

www.pathagar.com

ছেলে ফজলুল করিম বি এ একসময় কক্সবাজার হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং পরবর্তীতে নিজ এলাকায় রাজনীতি ও সমাজসেবায় ব্রতী ছিলেন। তিনি তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলা বোর্ডের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে ডা. জি. মবিন উদ্দিন মাহমুদ, (অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন), মাস্টার মিনহাজ উদ্দিন, দিদারুল আলম (প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও সমাজকর্মী) ও ডা. মাহাবুবুল আলম সর্বজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব।

মোহাম্মদ হারু প্রকাশ হারু পণ্ডিত অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তিনি স্বভাবকবি হিসেবে বহু গীত রচনা করেন এবং মুখে মুখে এগুলি প্রচলিত ছিল। তিনি যে কোনো বিষয়ে বা উপলক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে পদ রচনা করতেন। তাই এলাকায় তিনি পণ্ডিত হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সমসাময়িককালে তাঁর রচিত গীত বা বিভিন্ন পদাবলি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। তবে লিখিত বা সংরক্ষিত না থাকায় কালের প্রবাহে তাঁর রচিত গীত, গাঁথা বা পদাবলি প্রায় বিলুপ্ত।

মোহাম্মদ হারুর ছিল ৫ পুত্র। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে আশরফ আলী, আমির হামজা, আলী আকবর, মোহাম্মদ কালু ও শহর মুলুক। বর্তমানে কেউ জীবিত নেই। বর্তমানে শহর মুলুক-এর একপুত্র হাজী উমর মিয়া (৭৫) জীবিত আছেন। অর্থাৎ হারু পণ্ডিতের দ্রৌহিত্র বা নাতিদের মধ্যে হাজী উমরা মিয়া একমাত্র পরবর্তী নিকট প্রজন্ম। কক্সবাজার একাডেমীর জীবন সদস্য কবি সুলতান আহমেদ উক্ত হাজী উমর মিয়ার কাছ থেকে ৩টি গীত সংগ্রহ করেন যা একাডেমীর মুখপত্র 'সমুদ্র সংলাপ'-এ প্রকাশিত হয়েছে। মুদ্রিত গীতগুলো হচ্ছে ১. বংশনামা, ২. নাপিতের পালা ও ৩. নজু মিস্ত্রির বারমাস। গীতের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করেই গীত বা গানগুলোর শিরোনাম দেয়া হলো।"[৫৩]

## বংশিমোহন জলদাশ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেলার সদর উপজেলার ঈদগাঁও (বর্তমান জালালাবাদ ইউনিয়ন) মাছুয়াপাড়া বা জলদাশপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার আদি নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি উপজেলায়। বংশি মোহন জলদাশ ঈদগাঁও এলাকার লোককবি বিশেষ করে আবদুল করিম বরকেতা গাইন, ইনু চৌকিদারসহ অন্যান্য গাইন, কবিয়ালদের সাথে বিভিন্ন ভাইটাইল্যাগীত, কবিগান, নাউট্যার দলে (লেটোর দল) অংশগ্রহণ করতেন এবং গাইতেন। পরে তিনি নিজেই গান সৃষ্টি করেন। তবে তাঁর কোনো গানই লিপিবদ্ধ নেই। তিনি ১৯৩০ সালের দিকে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গানের কয়েকটি লাইন স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে।

আচুরি বিচুরি কন্যা দর্পণ ধরি চায়
যিআন দি হইয়ে ময়লা সোনা দিয় মরায়।
সাজিয়া মাঝিয়া কন্যা গুয়ানার পদে পদ
নাকের পরে দিয়ে তুলি ষোল্য টিক্কা নথ।
ষোল্য টিক্কা নথত্ মাঝে ষোল আনা বানি
চঅরে পারাইল্যা ভাইয়ান নথের ঢুলানি।"[৫৪]

www.pathagar.com

**নজির আহমদ**

১৯৩০ সালের ৫ জুলাই নজির আহমদ রাজাপালং ইউনিয়নের সিকদারবিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুল জলিল ও মা জমিলা খাতুন। তিন বোন পাঁচ ভাইয়ের পরিবারে নজির আহমদ তৃতীয়।

নজির আহমদ শৈশবে স্থানীয় মক্তবে আমপারা ও পবিত্র কুরআন মজিদ পড়া সমাপ্ত করেন। তিনি চাষাবাদের সময় কৃষকের গাওয়া রকমারি লোকসংগীত রপ্ত করেন। গ্রামে বিয়ে, ছেলেদের খৎনা ও মেয়েদের কানছেদানী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে হঁওলাসহ রকমারি লোকসংগীত পরিবশেন করে আসর জমাতেন।

এলাকার উৎসাহী ও সংগীতপ্রিয় যুবকদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন। তাঁর দলের নাম 'বায়েত দল'। তবে তা বেশিদিন টিকেনি। মাত্র তিন বৎসর স্থায়ী ছিল। এ দলে ছিলেন চকরিয়া উপজেলার আবদুস সোবহান গাইন। নজির আহমদের বড় ভাই আবুল খাইর পণ্ডিত ছিলেন লেটোর দলের সদস্য। নজির আহমদের পরিবার 'বৈইয়্যার গোষ্ঠী' নামে পরিচিত। 'বৈইয়্যা'র অর্থ হলো যারা গান, সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত। নজির আহমদের বড় ভাই আবদুস সোবহান ছিলেন দলের প্রধান। বায়েত দল জেলার গর্জনিয়া, রামু, চকরিয়া, ধলঘাটা, মহেশখালি, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, হ্নীলা, টেকনাফ, বার্মার (হালের মিয়ানমার) বুচিদং, টংবাজার ও বলীবাজার ইত্যাদি স্থানে গান পরিবেশন করত। দীর্ঘদিন তাদের কার্যক্রম সচল ছিল। আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাবে তাঁদের কার্যক্রম এখন অনেকটা সংকুচিত। আবদুস সোবহান ইন্তেকাল করলে দলটিও বন্ধ হয়ে যায়।

নজির আহমদের উদ্যোগে ২০০১ সালে গঠিত হয় 'উখিয়া লোকশিল্পী পরিষদ'। দলের সভাপতি নির্বাচিত হন শিল্পী নজির আহমদ। তাঁরই পরিচালনায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় লোকজ অনুষ্ঠান 'হাজেরার পিরিতি' নামক স্বরচিত আঞ্চলিক নাটক। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজারে ও ২টি লোকজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। নজির আহমদ একজন লোকশিল্পী হিসাবে চর্চা করে যাচ্ছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি গানের কয়েকটি লাইন নিম্নে প্রদান করলাম।

"আমার ভাবতে গেলে দিন
আমার চিন্তায় গেলো দিন
অনাসূতের তওলারে বানাইয়ম কত দিন।
অনাসুতায় তওলারে ভাই
অঁওলে অঁওলে বেরায়
এক অঁওল ছুরাইতঅ গেলে
পাঁচ অঁওলে জরায়।"[৫৫]

**আবদুর রহমান পণ্ডিত (১৮৯০-১৯৭১)**

জেলার উখিয়া উপজেলার ভালুকিয়াপালং গ্রামে ১৮৯০ সালে জন্ম। পিতা : আজগর আলী পণ্ডিত। ভালুকিয়া পালং বোর্ড প্রাইমারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ। ১৯১২ সালে ভারত গমন এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও সংস্কৃত শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯২২ সালে

www.pathagar.com

স্বদেশে ফিরে আসেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্র ও কবির গানে মনোনিবেশ, লোকসাহিত্যিক ও কবিয়াল হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি পয়ার ছন্দে একটি পুঁথি লিখেছেন বলে কথিত। জনৈক ব্যক্তি পুঁথিটি মুদ্রণের জন্য নিয়ে গায়েব করে ফেলেছে। ফলে উক্ত পুঁথির পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত কপি পাওয়া যায়নি। তাঁর পুঁথির বিষয় ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী বক্তব্য ও জমিদারের প্রজা উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাঁর পুঁথির সূচনাতেই ছিল জন্মস্থান সম্পর্কে বক্তব্য। যা নিম্নে প্রদান করা হলো। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রতিবেশী দেশ বার্মায় (বর্তমানে মিয়ানমার) আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু ওখানেই ইন্তেকাল করেন।

"তেরপালং বুকে লৈ, উখিয়ার পরিচয়।
রাজাপালং মাঝে থাকি রাজার কথা কয়
ধানের পালং উখিয়া, গানের পালং উখিয়া
আসর গ্যরি গায় গান, ভালুকিয়ার আবদুরান
নসু পণ্ডিত, আশরাফালী আর কালুগাইন"
লোকশিল্পী গায় গান আসর জমাইয়া ...
হায় হায়রে মর ... ।"[৫৬]

## ড. শিল্প-কারখানা

কক্সবাজার বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ-পূর্ব জেলা। জেলায় ছোট এবং মাঝারি ধরনের কিছু শিল্প-কারখানা রয়েছে। তৎমধ্যে লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করতে হয়। বোধগম্য কারণেই কক্সবাজারের অন্যতম প্রধান শিল্প পর্যটনশিল্প। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারেই অবস্থিত। সমুদ্রসৈকতকে কেন্দ্র করেই সমগ্র জেলাকে পর্যটন জেলা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। জেলা সদরে পর্যটনশিল্পকে কেন্দ্র করে তিনশতাধিক আবাসিক হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউস। এসব হোটেলের মধ্যে স্টার হোটেলও রয়েছে। এছাড়াও হিমছড়ি, ইনানী, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন দ্বীপে গড়ে উঠেছে অসংখ্য হোটেল-মোটেল।

শহর থেকে সাত কিলোমিটার দূরত্বে কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক সংলগ্ন ঝিলওয়াঞ্জা ইউনিয়নের মুহুরিপাড়াতে দীর্ঘ ছয় কি সাত দশক পূর্বে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের একটি শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে। উক্ত শিল্পনগরীটি কক্সবাজারের শিল্পের কোনো প্রসার করতে পারেনি। উক্ত নগরীতে ছোটো ছোটো শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়েছে। যেখানে রয়েছে সাবান তৈরির কারখানা। আশির দশকে সরিষার তেল কারখানা স্থাপিত হলেও তা বর্তমানে বন্ধ। নব্বইর দশকে একটি কোল্ডস্টোরেজ স্থাপিত হলেও তাও বন্ধ। তবে বর্তমানে কয়েকটি চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা শিল্পনগীর স্থাপনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, জেলার উপকূলীয় ৬০ থেকে ৬৫ হাজার একর জমিতে শুষ্ক মওসুমে লবণ উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের বাৎসরিক লবণের চাহিদার ৯৫ ভাগই

www.pathagar.com

কক্সবাজারে উৎপাদিত হয়। অবশিষ্ট ৫ভাগ লবণ চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি থানাতে উৎপাদিত হয়। বছরের অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত লবণ উৎপাদন হয়। শুষ্ক মওসুমে এসব লবণ মাঠ থেকে উৎপাদানের সময় কৃষিপণ্য, পরে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মিলে গেলে তা শিল্পের স্বীকৃতি পায়। এতে লবণ উৎপাদনকারীরা ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে। বৃষ্টির কারণে লবণ উৎপাদন বন্ধ হওয়ার পরে একই জমিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। ফলে বলা যেতে পারে যে, জেলা প্রধান শিল্প হচ্ছে পর্যটন, লবণ ও চিংড়ি। চিংড়ি চাষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে প্রায় ৫৫টি চিংড়ি পোনা উৎপাদনকারী হ্যাচারি। কাঁচামাল সংকটের কারণে জেলায় অন্য কোনো শিল্প গড়ে উঠছে না। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কাঠ বা বাঁশ নিয়ে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান কক্সবাজারে গড়ে ওঠে নি। সমুদ্র থেকে মাছ ধরা এবং তা বিপণন করা, প্রক্রিয়াজাত করা, শুটকি করার কাজে জড়িত রয়েছে হাজার হাজার নারী-পুরুষ শ্রমিক।

তবে আশার কথা জাপানি উন্নয়ন সংস্থা জাইকার অর্থায়নে দেশে একটি বৃহৎ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। একনেক উক্ত প্রকল্পের জন্য ৩৬ হাজার কোটি অনুমোদন দিয়েছে। জেলার দ্বীপ থানা মহেশখালির পৃথক অপর দ্বীপ মাতারবাড়ি-ধলঘাটাতে উক্ত প্রকল্প গড়ে উঠছে। উক্ত প্রকল্পে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

## তথ্যনির্দেশ

১. কক্সবাজার ও রাখাইন জাতি- মং বা অং (মংবা), প্রকাশক-ম্যাম্যাচিন, কক্সবাজার। প্রথম প্রকাশ ১৭ এপ্রিল ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। পৃষ্টা-৫৪-৫৫।

২. কক্সবাজারের ইতিহাস, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, প্রকাশক-কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রকাশ-১৯৮৯ সাল, পৃষ্টা-৩৩০।

৩. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯। পৃষ্টা-১৭।

৪. সওরয়ার কামাল, মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা।

৫. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯। পৃষ্টা-১৫।

৬. D. Sunil Bhushan Qanungo- A History of Chittagong, Vol-1, Pub-Chittagong. 1988, p.5 & 92.

৭. কক্সবাজারের ইতিহাস, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, প্রকাশক-কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রকাশ-১৯৮৯ সাল, পৃষ্টা-২।

৮. জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

৯. কক্সবাজারের ইতিহাস, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, প্রকাশক-কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রকাশ-১৯৮৯ সাল, পৃষ্টা-৫-৬।

১০. যখন পুলিশ ছিলাম-শ্রী ধীরাজ ভট্টাচার্য, পঞ্চম সংস্করণ, ১ লা মাঘ ১৪০৩, কলকাতা। পৃষ্টা-৯৬।

১১. কক্সবাজার উত্তর, দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ।

১২. আশুতোষ চৌধুরীর রচনা ও সংগ্রহ-সম্ভার, সম্পাদক মোমেন চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫, মে ১৯৮৮। পৃষ্টা-৪৫।

www.pathagar.com

১৩. কক্সবাজারের ইতিহাস, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, প্রকাশক-কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রকাশ-১৯৮৯ সাল, পৃষ্ঠা-৫-৬।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০-৫১।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০-১১।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১-১২।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩-১৪।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪-১৫।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭-১৮।
২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯।
২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯।
২২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০-২১।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪।
২৫. উখিয়ার ইতিহাস- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক-কক্সবজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-একুশে বইমেলা ২০১০, পৃষ্ঠা-৭৪।
২৬. কক্সবাজারের ইতিহাস, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, প্রকাশক-কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রকাশ-১৯৮৯ সাল, পৃষ্ঠা-৬৯।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৯-৭০।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭০।
২৯. জেলা তথ্য অফিস, কক্সবাজার ও Population Census-2001, Commnuity Series, Zila : Cox's Bazar by Bangladesh Bureau of Statistics, Planning Division, Ministry of Planning, Published : October 2006.
৩০. কক্সবাজারের ইতিহাস, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, প্রকাশক-কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রকাশ-১৯৮৯ সাল, পৃষ্ঠা- ১২০-১২১।
৩১. সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে প্রাপ্ত।
৩২. কামরুল হুদা চৌধুরী, মোতাওয়াল্লী, ছাচি চৌধুরী মসজিদ, ঝিলংজা, কক্সবাজার।
৩৩. নাসির উদ্দিন, পিতা : গোলাম ছোবহান, মাতা : ফোরকানা বেগম, বয়স : ৬০ বছর, মোতাওয়াল্লী, ফজল কিউকের মসজিদ, গ্রাম : মানিকপুর, ইউনিয়ন : কাকারা, উপজেলা : চকরিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৯-০১১-২০১৩, সময় : বেলা ১১টা।
৩৪. কক্সবাজারের ইতিহাস-ঐতিহ্য-হারুন-উজ্-জামান, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একার্ডেমী, প্রথম প্রকাশ- ২৬ মার্চ-২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা-২৬-২৭।
৩৫. রামুর প্রচীন স্থাপত্য ও ঐতিহ্য-ধনিরাম বড়ুয়া, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : মে ২০১২, পৃষ্ঠা-৩৮-৩৯।
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩-২৪।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫।
৩৮. কক্সবাজারের আলোকিত মানুষ-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক-কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা-২৩।
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১।
৪০. পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড-বদর উদ্দিন উমর, প্রথম প্রকাশ-আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা ১৯৭০।
৪১. একুশের স্মৃতিচারণ-১৯৮০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

www.pathagar.com

৪২. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কক্সবাজার-বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী, দৈনিক ইনানী, কক্সবাজার, প্রকাশ-২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ । পৃষ্ঠা-৩ ।

৪৩. সাগর পাড়ের কথকতা- নূরুল আজিজ চৌধুরী, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা-৭৯ ।

৪৪. শমশের আলম চৌধুরী, বয়স-৯১, পিতা : হাকিম আলী চৌধুরী, মাতা : আমিনা বেগম, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদের দীর্ঘদিনে চেয়ারম্যান, উখিয়া । তারিখ : ২০-০৬-২০১২, সময় : সকাল ১০টা ।

৪৫. অনা. ক্যাপ্টেন আবদুস ছোবহান (অব.) বয়স : ৭১, পিতা : মকতুল হেসেন, মাতা : ফাতেমা বেগম, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কক্সবাজার অঞ্চলের ১ নম্বর সাব-সেক্টর কমন্ডার, মরিচ্যাপালং, উখিয়া । তারিখ : ২০-০৬-২০১২, সময় : দুপুর ১২টা ।

৪৬. কক্সবাজার চরিত-কোষ- মালিক সোবহান, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৭, পৃষ্ঠা-১১৬ ।

৪৭. সাগর পাড়ের কথকতা- নূরুল আজিজ চৌধুরী, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা-১১৮ ।

৪৮. উখিয়ার ইতিহাস- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক :কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১০ । পৃষ্ঠা-২২৮ ।

৪৯. কক্সবাজার চরিত-কোষ- মালিক সোবহান, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৭, পৃষ্ঠা-২৪-২৫ ।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭ ।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭-১৮ ।

৫২. প্রফেসর মূফীদুল আলম, বয়স : ৭২, সভাপতি, সংগীতায়তন পরিচালনা কমিটি, লালদিঘির পশ্চিম পাড়, কক্সবাজার । তারিখ : ২০-০৬-২০১২, সময় : সন্ধ্যা : ৬টা ।

৫৩. বরকেতা গাইন-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা- ২০০৩ । পৃষ্ঠা-১৩-১৪ ।

৫৪. কক্সবাজারের লোকসাহিত্য : হারু পণ্ডিতের গীত-সুলতান আহমেদ, সমুদ্র সংলাপ, সংখ্যা-৮, এপ্রিল ২০০৮, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমীর মুখপত্র, কক্সবাজার । পৃষ্ঠা-১৫ ।

৫৫. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ । পৃষ্ঠা-৬৮ ।

৫৬. সিরাজুল হক, পিতা : শাহাব মিয়া, মাতা : নীলা খাতুন, বয়স : ৬৩ বছর, গ্রাম : উয়ালাপালং ঘিলাতলী, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার । তারিখ : ০১-১০-২০১১, সময়- সকাল সাড়ে ৯টা ।

৫৭. কক্সবাজার চরিত-কোষ- মালিক সোবহান, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৭, পৃষ্ঠা-২০ ও কবি আদিল চৌধুরী, বয়স : ৫২ বছর । পিতা : শমসের আলম চৌধুরী, মাতা : নূর নাহার চৌধুরী, সদস্য, স্থায়ী পরিষদ, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, কোট বাজার, রত্নাপালং, উখিয়া, কক্সবাজার । তালিখ : ১১-০৫-২০১২, সময় : সকাল- ১০টা ।

www.pathagar.com

# লোকসাহিত্য

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের সীমান্ত জেলা কক্সবাজার। যার একপাশে রয়েছে মিয়ানমার (পূর্বনাম বার্মা)। জেলার পশ্চিম পাশে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এই সাগরপথেই কক্সবাজার ও সংলগ্ন এলাকায় আগমন ঘটেছে আরবি, ফার্সি, হিন্দি, উর্দু, পর্তুগিজ, ইংরেজ ও ফরাসিসহ বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের। তাঁদের সাথে এসেছে তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি ও লোক-ঐতিহ্য। অপরদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলভুক্ত রাখাইন (পূর্বে তাদেরকে 'মগ' বলে সম্বোধন করা হতো। মগধ থেকে এসেছেন বলেই তাঁরা নিজেরা একসময় মগ বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন।), চাক, চাকমা, খুমি, ত্রিপুরা, মুরংসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন এবং তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও লোক-ঐতিহ্যের আগমন ঘটেছে পাহাড়ি পথে। ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কোনো সীমারেখা নেই। পানি, বাতাস, আগুনকে যেমন সীমানা দেয়াল দিয়ে আটকিয়ে রাখা যায় না, ঠিক তেমনিভাবে ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেও দেয়াল দিয়ে আটকে রাখা সম্ভব নয়। ফলে অপর একটি দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য সহজেই দেশের সীমানা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী দেশ বা অঞ্চলে।

প্রাচীনকালে পুরো কক্সবাজার জেলা আরাকান রাজ্যের (বর্তমান মিয়ানমার-এর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ) অধীনস্থ একটি এলাকা ছিল। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য যখন অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়ে তখন আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের পরিচর্যা হয়। এতে যে সাহিত্যের বিকাশ হয় তা পুঁথিসাহিত্যের অংশ। সাথে উত্তর-আরাকান ও বর্তমান কক্সবাজার এলাকায় বিকাশ ঘটে নানা লোকসাহিত্যের।

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির এযুগে অতীত ঐতিহ্যের কদর নেই। কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার ভাষায় বলতে হয়, 'যা মরে গেছে, যা পঁচে গেছে, তা রেশমি কাপড় পেঁছিয়ে লাভ নেই।" ফলে বর্তমান আধুনিক এই যুগে পেছনের দিকে তাকানোর অবকাশ কোথায়? সামনে বিশাল ভবিষ্যৎ। বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ করার প্রতিযোগিতায় মানুষ এখন মরিয়া। কল্পনার কিংবদন্তি সেতো অনেক বাসি। তারপরও বিজ্ঞজনের ভাষায় "অতীতের উপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যৎ রচিত"। সুতরাং অতীত সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখা উচিত। নতুন প্রজন্ম দিক নির্দেশনার অপেক্ষায়। তাদের জানতে হবে ইতিহাস। জানতে হবে ঐতিহ্য।

লোকগল্প, লোককাহিনি, কিংবদন্তি, কবিগান, লোককবিতা, ভাটকবিতা, লোকছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, পুঁথিসাহিত্য ও রূপকথা এঅঞ্চলের লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, দিয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

# ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

লোকগল্প তথা কিস্‌সা বা কাহিনির অন্যতম ও একমাত্র উৎস গ্রামীণ মানুষ, সমাজ ও পরিবেশ। লোকগল্প, লোককাহিনিগুলো সাধারণ মানুষের সৃষ্টি। গ্রামীণ লোকজনই এসব লোকগল্প, লোককাহিনি শতাব্দীকাল ধরে বয়ে বেড়াচ্ছেন ও সংরক্ষণ করছেন। এসব লোকগল্প বা লোককাহিনির শ্রোতাও সাধারণ মানুষ। তবে দিন যতই যাচ্ছে এসব লোকগল্প, লোককাহিনিগুলো লিপিবদ্ধ না করার ফলে আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মহাকালের গহ্বরে। মানুষ আধুনিক ও আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে লোকগল্প, লোককাহিনি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এটা মূলত মানুষের অপরাধ নয়। এসব লোকগল্প বা লোককাহিনি চর্চিত হচ্ছে না, গীত হচ্ছে না, মঞ্চায়িত হচ্ছে না বিধায় লোকজন এসবকে ভুলতে বসেছে। ফলে নতুন প্রজন্ম এসব লোকগল্প, লোককাহিনি সম্পর্কে মোটেই ওয়াকেবহাল নয়। লোকগল্প সম্পর্কে শামসুজ্জামান খানের মূল্যায়ন হচ্ছে, "লোকগল্প বিশ্বমানবের এক অনন্য সাংস্কৃতিক সম্পদ। বস্তুতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির আদিম স্তর থেকে নানা পর্যায় অতিক্রম করে বেড়ে ওঠার মানবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও গোষ্ঠিগত অভ্যাস, সংস্কারগত উপাদান, বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা এবং চিন্তন-প্রক্রিয়া তথা বিশ্বদৃষ্টিকে বুঝাবার জন্য লোকগল্প আমাদের এক মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। এদিক থেকে দেখলে লোকগল্প মানবসমাজ ও তার জীবনযাত্রা, বোধ-বিশ্বাস, উপলব্ধি ও অনুভূতিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এক চমৎকার মাধ্যম। অন্যদিকে মানুষের চিত্তবৃত্তি ও বিনোদন প্রক্রিয়ারও এক উৎকৃষ্ট উপাদান লোকগল্প। এ জন্যই সামাজিক ইতিহাসের গবেষক, নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, ফোকলোরবিদ, সংস্কৃতি-তাত্ত্বিক ও সাহিত্য সমালোচক লোককাহিনিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তবে লোকগল্পগুলো শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক মনীষী বা ইতিহাসের গবেষক পণ্ডিতের কাছেই বিশেষ প্রিয় ও মূল্যবান নয়–এর গুরুত্ব ও মর্যাদা লোকপ্রিয়তার জন্য, বয়স নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের বিনোদন পিপাসা নিবৃত্তির অদ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে।"[১]

## রামুর লোকগল্প

### সাপ কুমারের সাথে বিয়ে

অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে এক দম্পতি তাদের একমাত্র আদরের কন্যা বিলকিস বানুকে নিয়ে বসবাস করতো। তাদের আদরের কন্যা ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী। মাতা-পিতা ও কন্যাসহ তিনজনের সংসার। তিনজনের সংসারে কোনো কিছুর অভাব ছিল না। দিন যাচ্ছে আর মেয়ের বয়স বাড়ছে। বয়স বাড়তেই মেয়ের সৌন্দর্য দিন দিন আরো বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মেয়ের সুন্দরের ছটায় বিজলি চমকায়। অন্ধকার ঘরে মেয়েকে দেখার জন্য বাতির প্রয়োজন হয় না। মেয়ে বেড়ে উঠারও সাথে সাথে মেয়েকে বিয়ে দেবার চিন্তায় দম্পতি রাতদিন অস্থির। বলতে গেলে মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য তেমন কোনো পাত্রও পাওয়া যাচ্ছে না। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ

www.pathagar.com

একদিন গৃহকর্তা ইহধাম ত্যাগ করলো। পাড়া প্রতিবেশিরা এসে গৃহকর্তার দাফনের ব্যবস্থা করলো। বিলকিসের পিতার মৃত্যুর পরে মা-মেয়ে বড় অসহায় হয়ে পড়লো। তখন শুধু মা-মেয়ের সংসার। বিলকিসের পিতার মৃত্যুর পর তার মা তাকে বিয়ে দেয়ার জন্য বড় বেশি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু কোনো পাত্রই আসছে না। বিলকিসের মা সোনা বানু ছিল অত্যন্ত লোভী প্রকৃতির।

বিলকিসদের বাড়িটি ছিল পাহাড়ি এলাকায়। গভীর জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ের ধারেই ছিল বাড়ি। এক শীতের সকাল। পৌষের শেষের দিকে এমনিতেই একটু বেশি শীতের প্রকোপ। ভোররাতে শীতের প্রচণ্ডতায় হাত-পা জমে যাওয়ার উপক্রম। সকালে মা-মেয়ে ঘরের ওঠোনে বসে সূর্যের তাপে শরীর গরম করার প্রয়াস চালাচ্ছে। এরমধ্যে একটি বিরাট আকৃতির অজগর মা-মেয়ের দিকে এগিয়ে আসে। শীতের রাতে পাহাড় থেকে নেমে অজগরটি তাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে আশ্রয় নিয়েছিল। ঝোপঝাড়ের মধ্যেই ছিল সাপটি। সূর্যের তাপ পেয়ে একটু সতেজ হয়ে অজগরটি মা-মেয়েকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো। তবে মা-মেয়ে অজগরটিকে খেয়ালই করেনি। অজগরটি ছিল অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। অজগরের শরীরের উপর সূর্যের আলোকছটা পড়তেই তা ঠিকরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির প্রাঙ্গণ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এতে মা-মেয়ে হতচকিত হয়ে পড়লো। পর মুহূর্তে সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখতে পেলো একটি বিশাল আকারের অজগর তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মা-মেয়ে ভয় পেয়ে আত্মরক্ষার্থে ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা আটকে দিলো। অজগরটি দরজায় সটান শুয়ে রইলো। নড়াচড়া নেই। ওদিকে মা-মেয়ে ঘরের ভেতরে বন্দি হয়ে রইলো। সকাল গড়িয়ে দুপুরও পেরিয়ে যাচ্ছে। অজগরটি ওখান থেকে সরে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অজগর সাধারণত মানুষকে কামড়ায় না। অন্যান্য সাপ বিশেষ করে কালনাগিনী বা পদ্মগোখরো যেভাবে তাদের দাঁতের নালিতে বিষ বহন করে তেমনি করে কিন্তু অজগরের মুখে কোনো বিষ থাকে না। তবে ক্ষুধার্ত হলে আস্ত মানুষ, গরু-ছাগল, হরিণ গিলে ফেলে।

পূর্বেই বলেছি মহিলা ছিল কিন্তু খুবই লোভী এবং ধূর্ত। মহিলা ভাবলো সারা দিন অজগরটি যখন বাড়ির দরজায় অসাড় পড়ে রইলো তখন এটি সাপ নয়। সাপ হলে তো অন্তত এতক্ষণে চলে যেতো। কোনো রাজপুত্র সাপের ছদ্মবেশে তাদের বাড়িতে এসেছে। বিলকিসের মা সোনা বানু তো এ সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয়। সোনা বানু তার সুন্দরী কন্যাকে সাপের সাথে বিয়ে দিতে মনস্থ করলো।

যেই ভাবা সেই কাজ। এক পর্যায়ে সোনা বানু মেয়ে বিলকিসকে সাজিয়ে সাপ কুমারের কাছে পাঠালো। সাপটি ছিল প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। ফলে বিলকিসকে পেয়ে গিলে ফেলতে লাগলো। সাপটি প্রথমে বিলকিসের পা দু'টি গিয়ে ফেলতে লাগলো। এসময় বিলকিস তারস্বরে চিৎকার করে মা'কে গানের সুরে বলতে লাগলো সাপ কুমার আমার পা গিলে ফেলছে। এতে আমার পা ব্যথা করছে। তখন মা সোনা বানু মেয়ে বিলকিসকে অভয় দিয়ে গান গেয়ে উত্তর দিচ্ছে। কন্যা বিলকিসকে সাপে গিলে ফেলা, আর মা-মেয়ের এই কথোপকথন নিচে দেয়া হলো :

www.pathagar.com

সাপকুমার যখন কন্যা বিলকিসের পা দুটি গিলে ফেলতে লাগলো তখন কন্যা বলে উঠলো এভাবে-

অমা মা পা ঠেংব্যথা গরেদ দে
বিলকিসের মা সোনা বানু উত্তর দিচ্ছে
অঝি নঅ ন ঠেংঅর খারু পরাদ দে।

সাপকুমার পা গিলে ফেলার পরে যখন কোমর পর্যন্ত পৌঁছে গেলো তখন কন্যা বিলকিস মা সোনা বানুকে বলতে লাগলো-

অমা মা কোমর ব্যথা গরেদ দে।

বিলকিসের মা সোনা বানু মেয়েকে অভয় দিয়ে শান্তনা দিতে লাগলো এভাবে-

অঝি নঅ ন সোনার বিছা পরাদ দে।

এরপরে সাপকুমার বিলকিসের হাত গিলতে লাগলো। তখন বিলকিস মাকে বলতে লাগলো-

অমা মা হাত ব্যথা গরেদ দে।

বিলকিসের মা সোনা বানু মেয়েকে শান্তনা দিতে লাগলো-

অঝি নঅ ন সোনার বালা পরাদ দে।

সাপকুমার ক্রমেই বিলকিসকে গিলে ফেলতে লাগলো। এক পর্যায়ে সাপকুমার বিলকিসের গলা পর্যন্ত গিলে ফেলতে লাগলো। এসময় কন্যা বিলকিস মা সোনা বানুকে বলতে লাগলো-

অমা মা গলা ব্যথা গরেদ দে।

তখন বিলকিসের মা সোনা বানু মেয়েকে শান্তনা দিয়ে বলতে লাগলো-

অঝি নঅ ন কণ্ঠার ছুরা পরাদ দে।

মেয়ে বিলকিস মা সোনা বানুকে বলতে লাগলো-

অমা মা কান ব্যাথা গরেদ দে।

বিলকিসের মা সোনা বানু মেয়েকে শান্তনা দিয়ে বলতে লাগলো-

অঝি নঅ ন সোনার নাথং পরাদ দে।

কন্যা বিলকিস মা সোনা বানুকে বলতে লাগলো-

অমা মা কুয়াল ব্যথা গরেদ দে।

বিলকিসের মা সোনা বানু মেয়েকে অভয় দিয়ে বলতে লাগলো-

অঝি নঅ ন মাথার টিকলি পরাদ দে।

এক পর্যায়ে সাপকুমার কন্যা বিলকিসকে সম্পূর্ণ গিলে ফেললো। মা মনে করলো সাপকুমার (জামাতা) কন্যাকে গিলে ফেলে স্বস্তি বোধ করছে। পরে হয়তো উদর থেকে বের করে দেবে এবং সাপকুমারও মানুষরূপে আবির্ভূত হবে। ক্ষুধার্ত সাপকুমার কন্যা বিলকিসকে দিয়ে উদরপূর্তি করে অসাড় পড়ে থাকলো। দিনের আলো নিভে গেলো। সাপকুমার পড়েই রইলো ঘরের দাওয়ায়। ওদিকে মা সোনা বানু প্রহর গুনতে লাগলো কখন সাপকুমার তার কন্যা বিলকিসকে উদর থেকে বের করে দেয়। মেয়ের স্বর্ণালংকার দেখে মায়ের চোখ ভরে উঠবে। জামাতা সাপকুমারও মানুষের রূপ নিয়ে

www.pathagar.com

আত্মপ্রকাশ করবে। দিনের আলো নিভে রাত হয়ে গেলো। কিন্তু সাপকুমারের নড়াচড়া নেই। গভীর রাত হওয়ার পরেও সাপকুমারের নড়াচড়া নেই। এক পর্যায়ে মহিলা ঘুমিয়ে পড়লো। ওদিকে অজগরের উদরে কন্যা বিলকিস হজম হয়ে গেলে অজগর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কন্যার পরনের কাপড়-চোপড় উদর থেকে বের করে দিয়ে ভোর রাতেই গভীর জঙ্গলে চলে গেলো। ভোরে মহিলার ঘুম ভাঙলে তড়িঘড়ি করে ঘরের দরজা খুলে দেখে জামাতা সাপকুমার নেই। তার কন্যা বিলকিসও নেই। আছে শুধু কন্যা বিলকিসের পরনের কাপড়। লোভী সোনা বানু এতক্ষণে বুঝতে পারলো এটা কোনো রাজকুমার বা অজগরের ছদ্মবেশে কোনো মানুষ নয়। এটি প্রকৃতই একটি সাপ। তখন সে বিলাপ করে মেয়ে বিলকিসের জন্য কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালো।

আগে অন্তত মেয়ে বিলকিস তার সাথে ছিল। এখনতো সোনা বানু একা। ফলে সোনা বানুও বাড়ি ছেড়ে লোকালয়ে চলে গেলো এবং এক বাড়ির প্রাঙ্গণে আশ্রয় নিলো।"[২]

## চকরিয়ার লোককাহিনি

## পিঠাগাছ ও রাক্ষুসী

ছোটোকালে বাবাকে হারিয়ে একমাত্র ছেলে মায়ের সাথে কষ্টে দিনযাপন করছিল। ছোটবেলা থেকেই ছেলেটি পিঠা পছন্দ করতো। প্রতিদিনই মাকে তার জন্যে পিঠা বানাতে হতো। নয়তো ছেলেটি বেজায় মন খারাপ করতো। কিন্তু দুখিনী মায়ের জন্য দিনে দিনে এটি অসম্ভব হয়ে উঠলো। শেষ যেদিন পিঠা বানালো, সেদিন মা কীভাবে পিঠা বানিয়ে খাওয়াবে, সে-চিন্তা করতে করতে বাড়ির ওঠোনের একপাশে একটি পিঠা রোপন করে দিলো।

কয়েকদিন পর সেখানে একটি একটি চারাগাছ জন্মালো। পাতা গজালো। ডাল ছড়ালো। এভাবে স্বপ্নের মতো করে অদ্ভুত সুন্দর একটি গাছ বেড়ে উঠলো। ফুল ফুটলো অল্প দিনের মধ্যেই। সেখানে দেখা গেলো, ডালে ডালে ঝুলে আছে পিঠা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মা-ছেলে।

একদিন ছেলেটি গাছে চড়ে পাড়লো পিঠা। অপূর্ব স্বাদ। সে-কী আনন্দ ছেলেটির।

মজার পিঠা খেয়ে সুখে-শান্তিতে কাটছিল দিন।

কিন্তু কয়দিন যেতে-না-যেতেই শুরু হলো বিপত্তি। পিঠাগাছের নিচে আসতো এক নারীরূপী রাক্ষুসী। সুন্দর-সুন্দর কথা বলে ভোলাতে চাইতো ছেলেটিকে। ছেলেটির কাছ থেকে পিঠা চেয়ে নিতো। পিঠা দূর থেকে রাক্ষুসীর দিকে ছুঁড়ে দিলে বলতো নানা কথা। বলতো, 'এটাতে ময়লা লেগেছে'; নয়তো বলতো, 'এটি ভেঙে গেছে'। 'হাতে-হাতে দাও'। হাতে-হাতে দিতে গেলে ছেলেটিকে ধরে ফেলতে চাইতো।

এভাবে মনভোলানো নানা কথা বলে রাক্ষুসী ছেলেটিকে ধরে নিয়ে যাবার ফন্দি করতো। মাঝে-মাঝে ধরে ফেলতোও। ধরে ফেললে চিৎকার-চেঁচামেচি করে ছেলেটি ছাড়িয়ে নিতো নিজেকে।

www.pathagar.com

একদিন পিঠা নেবার ছলে রাক্ষুসী সত্যি সত্যি ধরে ফেললো ছেলেটিকে। এরপর হাত-পা-মুখ বেঁধে বস্তায় ভরে নিয়ে চললো ছেলেটিকে।

যেতে যেতে মাঝপথে রাক্ষুসী প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে রাস্তার পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়লে, ছেলেটি বস্তার ভেতরে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে হঠাৎ বস্তার মুখ গিট ছিঁড়ে খুলে গেলো। ছেলেটি আস্তে আস্তে বস্তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

বের হয়ে ছেলেটি বুদ্ধি করে বস্তার ভেতর মাটির ঢেলা, গাছের পাতা, কাঁটা, পানিভর্তি বাঁশের চোঙা ইত্যাদি ঢুকিয়ে দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে দিয়ে পালিয়ে বাড়ি চলে এলো।

এদিকে রাক্ষুসী এসে বস্তা আগের মতো দেখতে পেয়ে কাঁধে তুলে চলতে লাগলো। চলতে চলতে একটু যেতেই বাঁশের চোঙা থেকে রাক্ষুসীর গায়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। রাক্ষুসী মনে করলো, ছেলেটি শিশি করে দিচ্ছে।

এভাবে যত বার পানি পড়ে, তত বার রাক্ষুসী বলে, 'হুম। আমাকে তুই শিশি করে দিচ্ছিস। তোকে আমি খাবো'।

যখন গায়ে কাঁটা বিঁধে, তখন বলে, 'হুম। তুই আমাকে কাঁটা ফুটিয়ে দিচ্ছিস। তোকে আমি দেখাবো মজা'।

'হুত পুত মনুষ্যের পুত
আমি এর তুলবো শোধ'।

যখন মাটির ঢেলায় ব্যথা পায়, তখন বলে, 'তুই আমাকে লাথি মারছিস। তোকে আমি দেখে নেবো'।

'হুত পুত মনুষ্যের পুত
আমি এর তুলবো শোধ'।

এভাবে, রেগেমেগে আগুন হয়ে নিজের বাড়িতে পৌঁছে রাক্ষুসী।

'হুত পুত মনুষ্যের পুত
আমি এর তুলবো শোধ'।

বলে চিৎকার করতে করতে বস্তা খুলে ফেললো। আর তখন বস্তার ভেতর মনুষ্যের ছেলের বদলে মাটির ঢেলা, বাঁশের চোঙা, গাছের কাঁটা আর পাতা দেখতে পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উদ্ভট চিৎকার করতে লাগলো।

এর পরের দিন থেকে পিঠাগাছের ছেলেটিকে আবার বিভিন্নভাবে ফুসলাতে লাগলো। ফুসলানোর সময় এত মিষ্টি করে কথা বলে রাক্ষুসী, যে-কারো মন গলে যেতে বাধ্য। ঠিকই আরেকদিন আগের মতো করে রাক্ষুসী ছেলেটিকে ধরে নিয়ে গেলো।

যেতে যেতে রাক্ষুসী ছেলেটির আগেরবারের পালিয়ে যাবার কথা মনে করে রাগে ফুঁসতে লাগলো। ছেলেটিকে কীভাবে কেটে টুকরো টুকরো করে কীভাবে খাবে ভাবতে ভাবতে বাড়ি পৌঁছালো।

'বউ বউ, ঘুটিলা' ডেকে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'তাড়াতাড়ি এই মনুষ্যের পুতকে কেটে টুকরো টুকরো করে রান্না করো।

www.pathagar.com

বউ তার বরকে দিয়ে বাপের বাড়ির সবাইকে খবর দিলো।

বস্তাটি রান্নাঘরে নিয়ে বউ তার মুখ খুলে দিয়ে ছেলেটিকে বের করলো। আর আহ্লাদের সাথে তাকে রান্নার প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

ছেলেটি এদিক-সেদিক তাকাতেই দেখতে পেলো এক বিরাট আকারের দা। সে আর দেরি না করে রাক্ষুসীর ছেলের বউ ঘুটিলার ঘাড় থেকে মাথা ফেলে দিলো। তারপর চট করে ঘুটিলার কাপড়গুলো পরে নিয়ে বউ সাজলো। লম্বা করে ঘোমটা টেনে দিয়ে রাক্ষুসীর ছেলের বউকে রান্না করে ফেললো।

সবাই উপস্থিত। খাওয়ার জন্যে উতলা। রাক্ষুসী তার ছেলের বউয়ের মা-বাবা-বোন সবাইকে নিয়ে খেতে বসলো।

খেতে খেতে বউয়ের বোন বলে ওঠে, 'মা মা দেখো, হাতটা ঠিক আমার বুবুর হাতের মতো'।

সবাই হুই হুই করে অট্টহাসি দেয়।

মেয়েটি আবার বলে, মা মা, চোখটা দেখো, অবিকল বুবুর মতো'।

সবাই তাকে 'বোকা বোকা' বলে তীরষ্কার করে।

এভাবে খাওয়া শেষ না-হতেই পানি আনতে যাবার ভান করে বউয়ের সাজে ছেলেটি কলসি নিয়ে নদীর ঘাটে চলে গেলো।

ঘাটে গিয়ে এক সওদাগরকে পেলো। নিজের সব কাহিনি সওদাগরকে খুলে বললো।

সওদাগর সদয় হয়ে তাকে নৌকায় তুলে নিলো।

এদিকে খাওয়া শেষে রাক্ষুসীর ছেলেবউকে খুঁজে না পেয়ে ঘাটে এলো সবাই। বউয়ের সাজে ছেলেটিকে দূর থেকে দেখে ভাবলো, ওই তো ছেলের বউ। কাছে আসতে-না-আসতেই ছেলেটি সওদাগরের নৌকায় ওঠে বসলো, আর রাক্ষুসীর বউয়ের কাপড়চোপড় খুলে ফেলে দিলো।

রাক্ষুসীর দলের আর বুঝতে বাকি রইলো না কী ঘটেছে।

রাক্ষুসীর ছেলে, বউয়ের মা-বাবা-বোন সবাই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো।

রাক্ষুসী রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো।

সওদাগরের নৌকা ছেড়ে দিলো। মুক্ত ছেলেটি ছড়া কেটে বলতে লাগলো—

'রাক্ষুসিনি কাউ মাউ
ছেলের বউয়ের মাংস খাও'।"[৩]

## খ. কিংবদন্তি

### আদিনাথ মন্দির (মহেশখালি)

হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান আদিনাথ মন্দির কক্সবাজার শহর থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মহেশখালি উপজেলা সদরে অবস্থিত। চতুর্দিকে সমুদ্র বেষ্টিত মহেশখালি। কয়েকশত বছর পূর্বে মহেশখালি কক্সবাজারের মূল ভূ-খণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল। ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রলঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে কক্সবাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়

www.pathagar.com

মহেশখালি। আদিনাথ মন্দিরটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২৮৮ ফুট উপরে মৈনাক পাহাড়-চূড়ায় অবস্থিত। মহেশখালি চ্যানেল সংলগ্ন চ্যানেলের পশ্চিম পাশে পাহাড়টির অবস্থান।

এই আদিনাথ মন্দিরটি ঠিক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়-তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। হিন্দু-মুসলমানের অভূতপূর্ব সু-সম্পর্কের সেতুবন্ধন হিসেবে মহেশখালিতে নাথ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে এবং এই নাথ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে মহেশখালিতে আদিনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। পূর্বে আদিনাথ মন্দির সংলগ্ন ও এর অধীনস্থ জমির পরিমাণ ছিল ২১৭ একর। মন্দিরের পূর্ব পাশের অনেক জমি মহেশখালি চ্যানেল ইতোমধ্যে গ্রাস করে ফেলেছে।

আদিনাথ মন্দির সম্পর্কে রয়েছে নানা কিংবদন্তি। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, রাম-রাবন যুদ্ধের সময় রাবন শিবের কৃপা লাভের নিমিত্ত শিবকে লংকায় আনার জন্য যায় কৈলাস পর্বতে। শিবের অবস্থান তখন ছিল কৈলাস পর্বতে। রাবণের অনুরোধে শিব লংকায় আসতে প্রথমে রাজি হয়নি।

*মহেশখালি আদিনাথ মন্দিরের প্রধান ফটক*

পরবর্তীকালে দেবতাদের অনুরোধে শিব রাবণের সঙ্গে আসতে রাজি হয়। তবে শিব শর্ত দেয় কৈলাস পর্বত থেকে কাঁধে করে এক নাগাড়ে বহন করে তাঁকে লংকা পৌঁছাতে হবে, কোথাও যাত্রা বিরতি করা যাবে না। রাবণ এক বাক্যে শিবের দেয়া শর্তে রাজি হয়ে যায় এবং শিবকে কাঁধে করে কৈলাস পর্বত থেকে রওয়ানা দেয় লংকার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পথিমধ্যে রাবণের তীব্র প্রকৃতির ডাক অনুভূত হয় এবং ডাকে সাড়া দিতে রাবণ শিবকে নিয়ে মহেশখালির মৈনাক পাহাড়ে নামে। শর্ত ভংগ হওয়ায় শিব

www.pathagar.com

রাবণের সংগে আর লংকা যায় নি, মৈনাক পাহাড়েই থেকে যায়।

স্থানীয়ভাবে কথিত আছে, মহেশখালির স্থানীয় জমিদার (প্রকৃতপক্ষে নূর মোহাম্মদ সিকদার জমিদার ছিলেন না তিনি ছিলেন তালুকদার) নুর মোহাম্মদ সিকদার এর সাথে তার একটি গাভীর মাধ্যমে শিবের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একবার সিকদার সাহেব লক্ষ করলেন, বেশ কিছুদিন যাবত দুধ দিচ্ছে না তার দুধেল গাভী। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি হঠাৎ একদিন দেখতে পান মৈনাক পাহাড়ে একখণ্ড পাথর প্রতিদিন সেই গাভীটির দুধে সিক্ত হয়। অনেক চেষ্টা করেও গাভীটিকে তিনি সেই পাথরের কাছে যাওয়া থেকে নিবৃত করতে পারেননি এবং একসময় তিনি স্বপ্নে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট হন। আদেশ মোতাবেক নুর মোহাম্মদ সিকদার এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

আদিনাথ মন্দিরের দৈর্ঘ্য ১০.৮৭ মিটার, প্রস্থ ৮.৬২ মিটার ও উচ্চতা ৫.৯৩ মিটার। মূল মন্দিরটি তিন ভাগে বিভক্ত। উত্তর অংশে প্রথম ভাগে ৩.৩৫ মিটার বর্গাকৃতির দুটো পূজাকক্ষ। পূর্বকক্ষে রয়েছে বাণলিঙ্গ শিবমূর্তি এবং পশ্চিম কক্ষে রয়েছে অষ্টভূজা এক দুর্গামূর্তি।

জমিদার নুর মোহাম্মদ সিকদার কাঁচাঘরের মন্দির নির্মাণ করে দেয়ার পর মৈনাক পাহাড়ের সেই কালো পাথর মন্দিরে আনা হয়, যোগাড় করা হয় বাণলিঙ্গ শিবমূর্তি। মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার পর মন্দিরে পূজা চলতে থাকে এবং ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কিন্তু মন্দিরের ভক্তরা অনুভব করে, মন্দিরে একটি অষ্টভূজা দূর্গামূর্তি থাকা দরকার। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। নির্মিত মন্দিরে সুদূর নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুর রাজকীয় মন্দির থেকে অষ্টভূজা দুর্গামূর্তি এনে আদিনাথ মন্দিরে স্থাপনের জন্য জমিদার নুর মোহাম্মদ সিকদার আবার স্বপ্নাদিষ্ট হন। কিন্তু এ এক কঠিন কাজ। নেপালের রাজা রাজকীয় মন্দিরের দুর্গামূর্তি আদিনাথ মন্দিরের জন্য দেবেনই বা কেন? মহেশখালি থেকে কাঠমুন্ডু যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। অবশেষে আদিনাথভক্ত এক নাগা সন্ন্যাসী কাঠকুন্ডুর রাজকীয় মন্দির থেকে মূর্তি আনার জন্য রাজি হলেন। স্বাভাবিকভাবে মূর্তিটি আনা যাবে না, আনতে হবে চুরি করে। নাগা সন্ন্যাসী তা উপলব্ধি করে শিবের আর্শীর্বাদকে সম্বল করে আনুমানিক ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মহেশখালি থেকে রওয়ানা হন সুদূর নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুর উদ্দেশ্যে। অনেক দুর্গম বিপদ-সংকুল, কষ্টসাধ্য পথ পেরিয়ে অবশেষে নাগা সন্ন্যাসী একদিন পৌঁছে যান কাঠমুন্ডুর রাজকীয় মন্দিরে। নাগা সন্ন্যাসী সাধারণ ভক্ত হয়ে মন্দিরে পূজা অর্চনা করতে থাকে। ক্রমে-ক্রমে মন্দিরের রাজপুরোহিতদের সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠে। এভাবে চলতে থাকে অনেকদিন।

ইতোমধ্যে নাগা সন্ন্যাসী একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে মন্দিরের ভক্তদের আস্থা অর্জন করে। গভীর রাত পর্যন্ত মন্দিরে অবস্থান করলেও অন্য ভক্তরা তাকে যখন সন্দেহ করছে না, নাগা সন্ন্যাসী সে সুযোগের হাতছাড়া করেননি। উদ্দেশ্য হাসিলের সময় এসে গেছে উপলব্ধি করে একদিন গভীর রাত পর্যন্ত মন্দিরে পূজা অর্চনার নিমিত্ত অবস্থান করে মন্দিরের অষ্টভূজা দুর্গামূর্তিটি একটি চাদর দিয়ে ঢেকে কাঠমুন্ডু থেকে রাতের অন্ধকারে রওয়ানা হন মহেশখালির আদিনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো ভোরে প্রধান পুরোহিত কর্তৃক মন্দিরে ফুল দিতে গিয়ে। দরজা খুলে মন্দিরে

www.pathagar.com

ঢুকেই দূর্গামূর্তিটি না দেখে পুরোহিতের চোখ কপালে ওঠে যায়। দূর্গামূর্তিটি গেলো কোথায়? নিশ্চয় নাগা সন্ন্যাসীর কাণ্ড। দূর্গামূর্তি চুরির বিষয়টি ইতোমধ্যে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে যায়। নেপালের রাজদরবার হয় খুবই তটস্থ, মূর্তি উদ্ধার এবং সন্ন্যাসীকে ধরার জন্য রাজার আদেশে চারদিকে পাঠানো হলো পাইক পেয়াদা। এ খবর নেপাল ছাড়িয়ে এসে পৌঁছে ভারতবর্ষে। নেপালের মতো ভারতবর্ষের পুলিশও এ ব্যাপারে হয় সক্রিয়। অবশেষে কলকাতার কাছে এক গ্রামে মূর্তিসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে নাগা সন্ন্যাসী।

নাগা সন্ন্যাসী দাবি করে মূর্তিটি তার নিজের, নেপালের মূর্তি নয়। নাগা সন্ন্যাসীকে হাজতে প্রেরণ করা হয় এবং মূর্তিটি নেয়া হয় সরকারি হেফাজতে বিষয়টি শেষতক গড়ায় আদালত পর্যন্ত। নাগা সন্ন্যাসী তার দাবিতে অনড়। অবশেষে আদালতে রায় ঘোষণার তারিখ ধার্য হয়। ধার্য তারিখে নেপালের রাজা আদালতে তাঁর পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। রায় ঘোষণার আগের রাতে সন্ন্যাসী স্বপ্নে দেখেন, মহাদেব (শিব) তাঁর সামনে উপস্থিত। মহাদেব সন্ন্যাসীকে অভয় দেন। মহাদেব আগামীকাল আদালতে বাদীর কাছে মূর্তির রঙ কী জিজ্ঞেস করতে বলেন এবং মূর্তির রঙ বাদী সাদা বললে সন্ন্যাসী মূর্তিটির রঙ যেনো কালো বলে চ্যালেঞ্জ করে। যেমন কথা তেমন কাজ। পরদিন জনাকীর্ণ আদালত। একটু পরে ঘোষিত হবে রায়। আদালতে উপস্থিত উৎসুক লোকজন প্রকাশ্যে নাগা সন্ন্যাসীকে চোর হিসেবে ধিক্কার দিতে থাকে।

নির্ধারিত সময়ে বিচারক আসীন হন এজলাসে। বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সন্ন্যাসী বলেন : মাননীয় আদালত, মূর্তিটা আমার। মূর্তিটা যদি নেপালের হয়ে থাকে, তবে নেপালের রাজপ্রতিনিধিকে বলুন, তাদের মূর্তিটির রঙ কী? বিচারক তখন বাদী পক্ষকে তাদের মূর্তির রঙ কী জানতে চাইলে তারা সাফ জবাব দেয় যে তাদের মূর্তিটির রঙ সাদা। সন্ন্যাসী তখন তাৎক্ষণিক বলে ওঠেন, মাননীয় আদালত, আমার মূর্তিটির রঙ কালো। বিচারক তখন মূর্তিটি আদালতে তলব করার আদেশ দেন। তলবমতে আদালতে আনা হয় মূর্তিটি। কাপড় দিয়ে ঢাকা মূর্তিটির গা থেকে প্রকাশ্য আদালতে সরানো হয় কাপড়। বিচারক-সহ উপস্থিত সকল উৎসুক জনতা দেখতে পায় মূর্তিটির রঙ কালো। ফলে মূর্তিটি সন্ন্যাসীর এই মর্মে বিচারক রায় ঘোষণা করেন। হতভম্ব হয়ে যায় বাদীপক্ষ। সন্ন্যাসীর আইনজীবী বিচারক বরাবরে মানহানির জন্য অর্থের আবেদন জানালে তাও মঞ্জুর করে বিজ্ঞ বিচারক। নেপালের রাজপ্রতিনিধি রায় মেনে নেয় এবং মানহানির জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থদণ্ডও প্রদান করে। নেপাল-রাজার প্রতিনিধি এবার ব্যক্তিগতভাবে সন্ন্যাসীর কাছে জানতে চায় আসল রহস্য কী, সন্ন্যাসী তখন মহাদেবের (শিবের) নির্দেশ সম্বলিত তথ্য পেশ করেন। নেপালের রাজা ঘটনা শুনে থ। অষ্টভূজা দুর্গা মূর্তিকে নেপালে আর রাখা যাবে না উপলব্ধি করতে পেরে মূর্তিটি আদিনাথ মন্দিরে তাড়াতাড়ি প্রেরণের ব্যবস্থা নেন এবং সেই সঙ্গে আদিনাথ মন্দির-উন্নয়নের জন্য অনেক অর্থ প্রদানসহ সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন রাজা।

আদিনাথ মন্দির বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির। হিন্দুদের অন্যতম একটা প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে এই মন্দির। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে এখানে বসে সপ্তাহব্যাপী বিরাট মেলা। প্রতিবছর শিব

www.pathagar.com

চতুর্দশীর তিথি লাগার সাথে সাথে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শিবলিঙ্গকে মুসলমানের বাড়ি থেকে সংগৃহীত দুধ দিয়ে প্রথমে স্নান করিয়ে থাকেন। তারপর খুলে দেয়া হয় মন্দিরের গেইট। আগত অন্যরাও পরে তাদের সঙ্গে আনা দুধ বা ডাবের পানি দিয়ে কেউ কেউ শিবকে স্নান করিয়ে থাকে। মানত করে যারা আসে তারাও তাদের সঙ্গে আনা দুধ দিয়ে স্নান করিয়ে থাকে শিবলিঙ্গকে।

নুর মোহাম্মদ সিকদার এর জীবিতকালে তার বাড়ির গাভীর দুধ দিয়ে স্নান করানো হতো শিবলিঙ্গকে। নূর মোহাম্মদ শিকদার এর মৃত্যুর পর তার বংশের কারো গাভী থেকে সংগ্রহ করা হতো দুধ। বর্তমানে তার বংশের কারো গাভী না থাকায় যে কোনো একজন মুসলমানের গাভী থেকে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে দুধ সংগ্রহ করে রাখেন পূজা উদযাপন কমিটি। আদিনাথ মন্দিরপ্রাঙ্গণ বর্তমানে শুধু পূজা নয়, পিকনিক স্পট হিসেবেও বিবেচিত হয়ে আসছে। দেশি বিদেশি হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে মেলা ও পূজাপ্রাঙ্গণ হয় মুখরিত। তাছাড়া প্রতিনিয়ত বিশেষ করে শীত মওসুমে অসংখ্য পর্যটকের পদভারে ছন্দময় হয়ে ওঠে মন্দির এলাকা।

যখনই নির্মিত হোক না কেন, এই আদিনাথ মন্দির নির্মাণে বা পুননির্মাণে স্থানীয় জমিদার নুর মোহাম্মদ শিকদার এবং রামুর জমিদার প্রভাবতীর অবদান আছে মর্মে ঐতিহাসিকদের অভিমত। সেই সঙ্গে নেপালের রাজার আর্থিক আনুকূল্যও কম নয় মর্মে অনেকে মনে করেন।

আদিনাথ মন্দিরের তিনদিকে পাহাড় ও পূর্বপাশে মহেশখালি চ্যানেল। সুউচ্চ পাহাড় থেকে সমুদ্রের বিশাল জলরাশির হাতছানি যে-কোনো দর্শক বা পর্যটকের মনকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও একটু নাড়া দেয়।"[৪]

## রামকূট (রামু)

রাংকোট বা রামকূট কক্সবাজারের একটি প্রাচীন স্থাপত্য। এর অবস্থান রামু উপজেলা সদর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণে রামু-মরিচ্যা আরাকান সড়কের পূর্ব পাশে। কক্সবাজার শহর থেকে রামুর দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার। গ্রিক ঐতিহাসিক টলেমি'র ভূগোলে, তিব্বতি লেখক লামা তারানাথ-এর বিবরণে রামুর কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু রামু নামটি কীভাবে হয়েছে–তা নিয়ে যেমন রয়েছে নানা কিংবদন্তি, তেমনি রয়েছে লোকবিশ্বাসপ্রসূত নানা কল্পকাহিনি। অনুরূপ রামু রামকূট নিয়েও রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের কিংবদন্তি।

আরাকানের ধন্যাবতী (ধান্যাওয়াদী) রাজবংশ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, গৌতম বুদ্ধ ধন্যাবতীর রাজা চান্দসুরিয়ার (চন্দ্রসুরিয়া) রাজত্বকালে সেবক আনন্দকে নিয়ে আরাকানের প্রাচীন রাজধানী ধন্যাবতী আসেন। এক ধর্মসভায় আনন্দকে উদ্দেশ করে বলেন, 'হে আনন্দ, ভবিষ্যতে পশ্চিম সমুদ্রের পূর্বপার্শ্বে পাহাড়ের উপর আমার বক্ষাস্থি স্থাপিত হবে। তখন এর নাম হবে রাংউ।' ধারণা করা হয় মহামতি গৌতম বুদ্ধ রামুর তথা রামকূটের কথাই বলেছেন এবং 'রাংউ' কালক্রমে 'রামু' শব্দে পরিণত হয়েছে।

রামু নামের উৎপত্তি সম্পর্কে অপর কিংবদন্তি হলো- বনবাসে থাকাকালে রাম ও সীতা এসেছিলেন রাংকূট এলাকায় এবং রামের নামানুসারে রামকূট কিংবা রামুর নামকরণ করা হয়েছে। পাঁচটি বড় বড় বটগাছ নিয়ে পঞ্চবটি বন। রামকূটেও রয়েছে

www.pathagar.com

বড় বড় পাঁচটি বটগাছ। তাই রামকূটকে রামায়ণের পঞ্চবটি বন বলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের বিশ্বাস। সীতার মরিচ পিষার পাটা রামকূটে রয়েছে বলে ধারণা করে একটি কালো পাথরকে পূজো করে থাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। কিছুদিন আগে উক্ত পাটাটি চুরি হয়ে গেছে।

রাংকূটে একদিকে বৌদ্ধ-বিহার এবং অপরদিকে হিন্দুদের শিব-মন্দির ও তীর্থধাম রয়েছে। প্রতিবছর এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এখানে অনুষ্ঠিত পূজা ও অর্চনায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

রাংকূট বৌদ্ধমন্দির স্থাপিত হয় প্রায় দু'হাজার বছরেরও আগে সম্রাট অশোকের শাসনামলে। শতাধিক ধাপ সিঁড়ি সম্বলিত পাহাড়ের চূড়ায় রাংকূট বৌদ্ধবিহারের অবস্থান। রাংকূট এলাকায় বিভিন্ন পাহাড়ে বিচ্ছিন্নভাবে আজো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তির ধ্বংসাবশেষ।

ত্রিপুরা রাজা গোবিন্দ মানিক্য রাজপুরোহিতের রোষাগ্নির ভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করে পলায়নপূর্বক তাপস বেশে এই রামু দুর্গে বহুদিন ছিলেন। রাজ্যহারা নবাব শাহ্ সুজা ভ্রাতৃভয়ে আরাকান যাত্রার পথে এই রামু দুর্গে গোবিন্দ মানিক্যের সাথে দেখা হয়। রাজ্যহারা লোকনাথদ্বয়ের মিলন ঘটে অশ্রুসজল চোখে রাজারকুলে এই রামু দূর্গে। এখনো সেই অতীত দিনের স্মৃতি বহন করছে এই রাংকোট। রাংকোটের টিলা পাহাড়গুলোতে যত্রতত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন স্থাপনার ইটগুলো দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা সেই ইটের কংকর তৈরি করে বিক্রি করে থাকে। এছাড়াও বিরাট স্থান জুড়ে রয়েছে শ্মশান এলাকা।

রাংকোটে প্রবেশমুখে প্রথমেই নজর কাড়ে কারুকার্য খচিত সুদৃশ্য তোরণ। তোরণ পেরিয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে উত্তরমুখী হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলে বিহার চত্বর পাওয়া যায়। প্রথমে বামপাশে প্রাচীন মন্দির, ৩ ফুট দেওয়াল বিশিষ্ট ভিতরে স্বল্পপরিসরে প্রায় ৫ ফুট উচ্চতার স্বস্তিচিহ্ন বিশিষ্ট ১টি সিমেন্টের বুদ্ধমূর্তি। মূর্তিটি অত্যন্ত সুন্দর এবং জ্যোতিপরায়ণ। মূর্তিটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ঋদ্ধিময় বলে জানা যায়। উক্ত মন্দিরটির নাম বুড়া গোঁসাইর মন্দির। এই মন্দিরটি জমিদার মতিসিং মহাজন নির্মাণ করে দেন। প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ। তার উত্তর পাশে আর একটি মন্দির আছে। উক্ত মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন লামার পাড়ার থোয়াইঙ্গ্য সওদাগরের নাতনী অর্থাৎ ফাপ্রু সওদাগরের কন্যা নেছা। তাতে আছে অষ্টধাতু নির্মিত এক ফুট উচ্চতার একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি এবং ৫০টির মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি। উক্ত মন্দিরটি পূর্বমুখী। মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় একটি বোধিবৃক্ষ আছে। বোধিবৃক্ষ মূলে পূর্বমুখী একটি মন্দির আছে। মন্দিরে ৩ ফুট উচ্চতার একটি এবং এক ফুট উচ্চতার দুইটি সিমেন্টের বুদ্ধমূর্তি আছে।

কথিত আছে, লালুপ্রু ও ভোলাপ্রু নামক দুইজন উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী রামুতে আসেন। তারা এখানে ওখানে ভিক্ষা করে গাছের নিচে রাত্রি যাপন করতেন। ফাপ্রু সওদাগর যেহেতু একটা জাদি মন্দির সেখানে নির্মাণ করেছেন, অথচ দেখাশুনার জন্য কেউ ছিল না তখন তাঁদেরকে রাংকূটের বর্তমান জাদি মন্দির (হিন্দু মন্দির) এলাকায় থাকার অনুমতি দেন এবং তাদের জন্য একটি ছোট্ট ঘর নির্মাণ করে দেন। সন্ন্যাসীদ্বয় সারাদিন লোকালয়ে ভিক্ষা করে রাংকোটে রাত্রি যাপন করতেন। এইভাবে আমৃত্যু

www.pathagar.com

তারা সেখানে বসবাস করেন। সন্ন্যাসীদের হাতে থাকত ত্রিশূলযুক্ত লৌহদণ্ড আর কমণ্ডলু। সারা গায়ে ছাইভস্ম মেখে তাঁরা ধুসরবর্ণ হয়ে থাকতেন। এদিকে সন্ন্যাসীদ্বয়ের অবস্থান হেতু হিন্দুরা সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসীদেরকে পূজা, মানত দিতে লাগলো। ফলে ধীরে ধীরে সেই স্থান হিন্দুতীর্থে পরিণত হলো।"[৫]

**কানা রাজার গুহা (রামু-উখিয়া)**

জেলার রামু উপজেলার কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের লট উখিয়ার ঘোনার 'আন্ধার মানিক' ও উখিয়া উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের নিদানিয়া পাহাড়ের পাটোয়ারটেকে রয়েছে দুটি পৃথক রহস্যাবৃত সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ দুটির নাম অভিন্ন। তা হচ্ছে 'কানা রাজার গুহা'। স্থানীয়ভাবে কথিত আছে, সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে রয়েছে বুদ্ধমূর্তি, ধনদৌলতসহ বিভিন্ন ধরনের সামরিক অস্ত্র। আরো কথিত আছে, 'উখি' নামের একচোখ অন্ধ (অন্ধকে স্থানীয় ভাষায় কানা বলে) মগ রাজা সমুদ্রে চলাচলকারি সাম্পান, জাহাজ, বাণিজ্যিক জাহাজ লুঠপাট করে উখিয়ার এই সুড়ঙ্গে অবস্থান করতেন এবং পরে লুণ্ঠিত মালামাল রামু উপজেলার লট (লাট) উখিয়ার ঘোনার আন্ধার মানিকের গুহায় নিয়ে যেতেন।

নিদানিয়ার পাহাড়ে (কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক সংলগ্ন) প্রায় ১৪ ফুট উঁচু ও প্রস্থে ১০ ফুট ব্যাসের সুড়ঙ্গ পাহাড়ের অভ্যন্তরে চলে গেছে। ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। অপরদিকে রামুর আন্ধার মানিকের কানা রাজার সুড়ঙ্গটি একই ব্যাসের এবং কয়েক স্তর বিশিষ্ট কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ।

আজও সুড়ঙ্গ দু'টি রহস্যাবৃত। এব্যাপারে কোনো কার্যকর অনুসন্ধান চালানো হয়নি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আরাকানের অমাত্য মহাকবি আলাওল তাঁর মহাকাব্য 'পদ্মাবতী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'তিনি, তাঁর পিতা এবং সঙ্গীসহ নৌপথে রোসাং যাওয়ার সময় পথিমধ্যে হার্মাদ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁর পিতা দস্যুদের সঙ্গে মোকাবেলা করে শহিদ হন এবং তিনি ভাগ্যক্রমে জলদস্যুদের হাত থেকে কৌশলে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে যান এবং রোসাং রাজ্যে উপস্থিত হন।'

রামু ও উখিয়ার সুড়ঙ্গ দু'টি যে প্রাচীন আরাকানের পরাজিত সামন্ত রাজার ছেলে রাজপুত্র চিনপিয়ান বা কিং বেরিং বা কানা রাজার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আরাকান রাজপুত্র চিনপিয়ান বা কিং বেরিং এর নামানুসারেই 'কানা রাজার' সুড়ঙ্গ। আরাকান রাজপুত্র চিনপিয়ান বা কিং বেরিং বা কানা রাজা এই সুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থান নিয়ে আরাকানকে শত্রুমুক্ত করতে চেষ্টা করেন। তাঁর দলবল নিয়ে মাঝে মধ্যে তিনি আরাকানের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে দখলদার বর্মী বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখতেন। তবুও মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে পারেননি।

সুড়ঙ্গ দু'টির স্বরূপ উন্মোচন করা গেলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের একটি নতুন বিষয় সম্পর্কে দেশবাসি জানতে পারবে।"[৬]

**কালুফকির পাড়া মসজিদ (কক্সবাজার সদর)**

মানুষ অলৌকিকভাবে ফল পাওয়ার জন্য মসজিদে 'মানত' করে। কাকতালীয় ভাবে লোকজন ফল পেয়েও যায়। বিশেষ করে চুরিসহ বিভিন্ন অপরাধের বিচারের জন্য এসব মসজিদকে সাক্ষি হিসেবে মানা হয়। ফলে কোনো চোর সহজেই এসব মসজিদে

www.pathagar.com

এসে শপথ করতে চায় না। সামাজিক চাপের কারণে কোনো চোর এসব মসজিদে মিথ্যা শপথ করলেও তার রেহাই নেই। চুরির ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে বা চোর চুরির ঘটনা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অপরাধ করার পরেও যদি চোর বেটা চুরির ঘটনা অস্বীকার করে তা হলে তার খারাপ ফল তাকে ভোগ করতে হয়। এরকম অনেক ঘটনা জেলায় দৃষ্টান্ত হিসেবে রয়েছে। এসব কারণে জেলার বেশ কিছু মসজিদকে লোকজন গরম মসজিদ বলে আখ্যায়িত করে থাকে। ভুক্তভোগিরা এসব মসজিদে গিয়ে আরাধ্য ফল লাভ করেছে বলে জনশ্রুতি আছে।
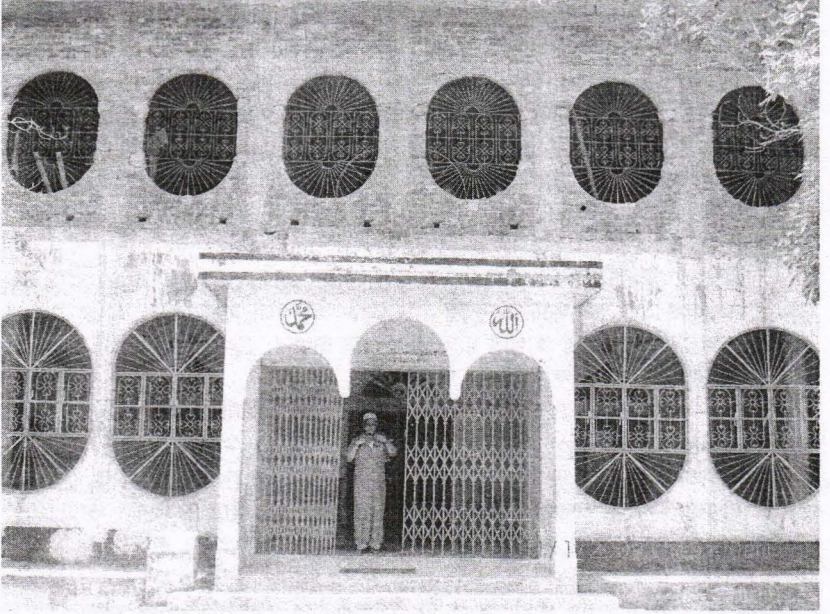
*কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদণ্ডি ইউনিয়নের কালুফকির পাড়া জামে মসজিদ*

কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদণ্ডি ইউনিয়নের কালুফকির পাড়া জামে মসজিদ এধরনের একটি গরম মসজিদ। ভুক্তভোগি লোকজন উক্ত মসজিদ থেকে অনেক উপকার পেয়েছে। তাদের চুরি যাওয়া মালামাল চোরের কাছ থেকে উদ্ধার করার দৃষ্টান্তও রয়েছে। স্থানীয় লোকজন যখন বিবাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ে তখন সত্য-মিথ্যা নিরূপণের জন্য কালু ফকির পাড়া জামে মসজিদে গিয়ে শপথ করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। মিথ্যার পরিণতি হয় ভয়ংকর। তাই দোষী ব্যক্তি সহজেই মসজিদে শপথ করতে রাজি হয় না। ফলে চুরি যাওয়া মালামাল সহজেই ফিরে পাওয়া যায়।

আবার সংস্কারপ্রবণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা উক্ত মসজিদে গিয়ে মনের বাসনা পুরনের মানতও করে থাকে। মসজিদে মোমবাতিসহ নগদ অর্থ দিয়ে মানত করে এবং তাদের প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার নজিরও আছে।"[৭]

www.pathagar.com

**বদর মোকাম মসজিদ (কক্সবাজার শহর)**

কক্সবাজার শহরের বদর মোকাম জামে মসজিদ একটি বতিক্রমধর্মী মসজিদ। বদর মোকার মসজিদটি শহরের বাঁকখালি নদীর তীরে কস্তুরাঘাট নামক স্থানে অবস্থিত। এই ঘাট দিয়ে লোকজনকে উপকূলীয় এলাকাসহ প্রাচীনকালে ঢাকা, চট্টগ্রাম বা অন্যত্র যাতায়াত করতে হতো। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মৎস্যজীবীরা বদরমোকাম মসজিদের পাশ দিয়ে সাগরে মাছ ধরতে যায়। যাতায়াতের সময় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের লোকজন এবং সাগরে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোকজন বদর মোকাম মসজিদে মানত করে থাকে, মসজিদে অর্থকড়ি প্রদান করে যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। শুধু মুসলমান নয়, হিন্দু ও রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন এখনো বদর মোকাম মসজিদকে ভক্তি করে।
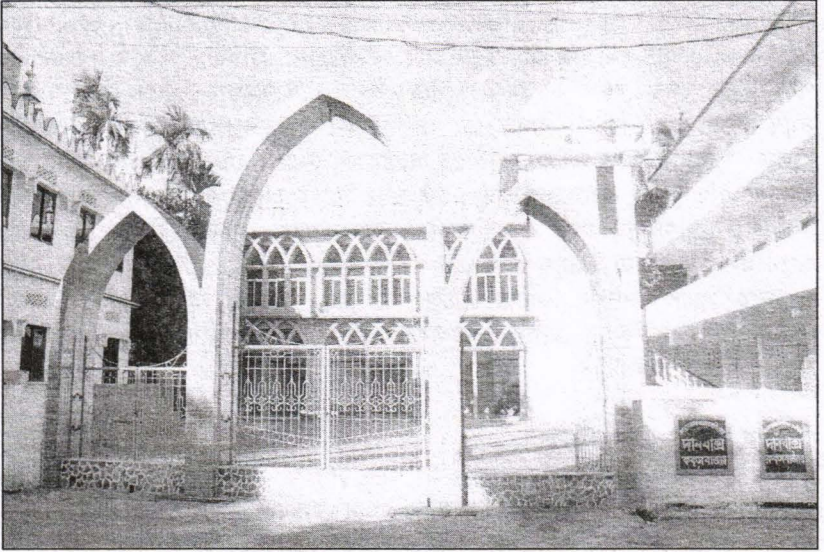
*কক্সবাজার শহরের বদর মোকাম জামে মসজিদ*

একটু পেছনে গেলেই আমরা বদর মোকাম মসজিদ সম্পর্কে জানতে পারি। জনশ্রুতি অনুসারে চট্টগ্রাম বারো আউলিয়ার দেশ, অর্থাৎ বারো আউলিয়া সর্ব প্রথমে চট্টগ্রামে এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। কবি মুহাম্মদ খানের সাক্ষ্য এই জনশ্রুতির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করতে সাহায্য করে; যদিও "পুস্তক বাড় এ হেতু" কবি বারোজন আউলিয়ার নাম উল্লেখ করেননি। শুধু মাতৃকুল পরিচয় দিতে গিয়ে কবি তাঁর পূর্ব পুরুষ শায়খ শরীফ-উদ-দীনের নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি কদল খান গাজীর 'প্রেমের সখা' ছিলেন, অর্থাৎ বারো আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন। পরে কবি তাঁর পিতৃকুলের পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষ মাহি আছোয়ার ও হাজী খলীল পীর আরব দেশ থেকে চট্টগ্রামে আসেন এবং সেখানে কদল খান গাজী, বদর আলম ও অন্যদের সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়।

www.pathagar.com

বদর আলমই বিখ্যাত বদর শাহ্ যিনি চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে বদরপাতিতে সমাহিত আছেন। বদর শাহ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আন্দরকিল্লার একটি টিলার উপরে পীর বদরের আস্তানা নামে একটি কবর আছে। খাদিমরা এখানে নামায আদায়সহ ধর্মকর্ম করেন। আরাকানের মঘ শাসকেরা কবরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কয়েকখানি গ্রাম ওয়াকফ করেন। তাঁর দরগাহে উপস্থিত হয়ে তাঁরা পীরের কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং দান খয়রাত করেন। কক্সবাজারসহ চট্টগ্রামের নাবিক ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন বদর শাহের নাম স্মরণ করে থাকেন। এলাকার ছেলেরা অবসর সময়ে বিশেষ করে শীতকালে হাডুডু, দাড়িবান্ধা খেলার প্রস্তুতি পর্বে বদর বদর চীৎকার করে সঙ্গী সাথীদের ডেকে থাকে।

কক্সবাজার জেলায়ও বদর শাহের স্মৃতি বিদ্যমান। এই স্মৃতি গড়ে ওঠেছে বদর মোকামকে কেন্দ্র করে। সমুদ্রোপকূলে কক্সবাজার জেলার শেষ সীমানা বদর মোকাম (টেকনাফ)। বদর মোকাম শুধু কক্সবাজার জেলার নয়, ত্রিপুরা থেকে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সর্বত্র বদর মোকামের স্মৃতি রয়েছে, অর্থাৎ এই সমুদয় অঞ্চলে, বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলে এই স্মৃতি বিদ্যমান। ড. এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন, "খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে আরাকানে ইসলাম বিস্তৃতি ও মুসলমান প্রভাব অন্যান্য ঐতিহাসিক কর্তৃকও স্বীকৃত। এই সময় হতেই আসামের সীমানা থেকে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্রতীরবর্তী ভূভাগের নানা স্থানে 'বুদ্ধের মোকাম' নামক এক প্রকার অদ্ভুদ মসজিদ গড়িয়া উঠিতে থাকে এই মসজিদগুলিকে বৌদ্ধ ও চীনা মুসলমান জাতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার (টেকনাফ উপজেলাসহ), আকিয়াব, মালয় উপকূলবর্তী এই বিরাট এলাকায় পীর বদর বা বদর শাহের নাম সম্পৃক্ত।"[৮]

## সোনারপাড়া মসজিদ (উখিয়া)

জেলার উখিয়া উপজেলার উপকূলীয় জালিয়াপালং ইউনিয়নের সমুদ্র সংলগ্ন সোনারপাড়া মসজিদকে স্থানীয় লোকজন গরম মসজিদ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। স্থানীয় লোকজন বিভিন্নভাবে মসজিদের উপকার পেয়েছে, চোরেরা যথার্থ শাস্তি পেয়েছে বলেই উক্ত মসজিদকে গরম মসজিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। চুরিসহ বিভিন্ন অপরাধের বিচারের জন্য উক্ত মসিজদকে সাক্ষি হিসেবে মানা হয়। কোনো চোর সহজে এই মসজিদে এসে শপথ করতে চায় না। সামাজিক চাপের কারণে কোনো চোর উক্ত মসজিদে মিথ্যা শপথ করলেও তার রেহাই নেই। চুরির ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে বা চোরে চুরির ঘটনা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অপরাধ করার পরেও যদি চোর বেটা চুরির ঘটনা অস্বীকার করে তা হলে তার খারাপ ফল তাকে ভোগ করতে হয়। ভুক্তভোগিরা উক্ত মসজিদে গিয়ে আরাধ্য ফল লাভ করেছে বলে জনশ্রুতি আছে। স্থানীয় লোকজন যখন বিবাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ে তখন সত্য-মিথ্যা নিরূপণের জন্য এসব মসজিদে গিয়ে শপথ করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। মিথ্যার পরিণতি হয় ভয়ংকর। তাই দোষী ব্যক্তি সহজেই এসব মসজিদে শপথ করতে রাজি হয় না।

আবার সংস্কার প্রবণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা এসব মসজিদে গিয়ে মনের বাসনা

www.pathagar.com

পুরনের মানতও করে থাকে। মসজিদে মোমবাতিসহ নগদ অর্থ দিয়ে মানত করে এবং তাদের প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার নজিরও আছে।”[৯]

**ঈদগাঁও (কক্সবাজার সদর)**

“ঈদগাঁও শাহসুজার সৈন্যবাহিনীর স্মৃতিবিজড়িত এলাকা। ঈদগাঁও ইউনিয়ন কক্সবাজার সদর উপজেলায় অবস্থিত। কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এই ঈদগাঁও ইউনিয়নের উপর দিয়ে চলে গেছে। ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে শাহসুজা পরাজিত হয়ে আরাকান রাজার আশ্রয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় ছিল পবিত্র রমজান মাস। শাহসুজা বাহিনী নিয়ে যেদিন ঈদগাঁও এলাকায় পৌঁছেন সেদিন সন্ধ্যায় শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়। তবে কোনো কোনো গবেষকদের মতে শাহসুজার বাহিনী এই এলাকায় আসেন। শাহ সূজা চট্টগ্রাম থেকে পাল তোলা জাহাজে পর্তুগিজদের সহায়তায় আরাকান পৌঁছেন। শাহসুজা তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঈদগাঁও এলাকায় পৌঁছে রাত্রে অবস্থানের জন্য সিদ্ধান্ত নেন। তাই তিনি ঈদগাঁওতেই তাঁবু খাটান। সকালে তাঁরা ঈদগাঁওতেই পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজ আদায় করেন বলে কথিত। এলাকার লোকজন বিশ্বাস করেন যে, শাহসুজা তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঈদগাঁওতে ঈদ-উল-ফিতরের নামাজ আদায় করেন বলেই এলাকার নাম ঈদগাঁও হয়েছে।”[১০]

**ইদগড় (রামু)**

“ইদগড় রামু উপজেলাধীন একটি ইউনিয়ন যা ঈদগাঁও থেকে নয় কিলোমিটার পূর্বে পাহাড়ি জঙ্গলাবৃত একটি জনপদ। ঈদগাঁও থেকে পাহাড়ি এলাকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটি সড়ক ইদগড় চলে গেছে। সড়কটি প্রাচীনকালে নির্মিত বলে স্থানীয়ভাবে জনশ্রুতি আছে। তবে পূর্বে দীর্ঘদিন সড়কটি কাঁচা ছিল। বিগত কয়েক বছর পূর্বে সড়কটি পাকা করা হয়েছে। কথিত আছে, ইদগড় এলাকাও শাহসুজার স্মৃতি বিজড়িত। এই ইদগড় ইউনিয়নের উপর দিয়ে চলে গেছে শাহসুজা সড়ক। শাহসুজা সড়কটি চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারা ইউনিয়নের ডুলাহাজারা বাজার থেকে শুরু হয়ে পাহাড়ি পথে ইদগড় ইউনিয়নের উপর দিয়ে গর্জনিয়া ইউনিয়ন হয়ে আরাকানে চলে গেছে। ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে শাহসুজা পরাজিত হয়ে আরাকানরাজার আশ্রয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় এই স্থানে তাঁর সৈন্যবাহিনী ঈদের নামাজ পড়েন বলে কথিত। স্থানীয় লোকজনের ধারণা শাহসুজার সৈন্যবাহিনী গৌড়ের সেনা। সে কারণেই এই স্থানের নাম ইদগড় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তবে অনেক গবেষকের মতে, শাহ সুজার সৈন্যবাহিনীর এক অংশ ইদগড়ে ঈদ উদযাপন করেন। তাই তার নাম ইদগড়। প্রকৃত অর্থে গড় হচ্ছে দুর্গ বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা। শাহ সুজার বাহিনী এখানে পৌঁছে পেছন থেকে আসা মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি দুর্গ স্থাপন করেন। সে কারণেই এর নাম হয়েছে ‘ইদগড়’।”[১১]

**নাপিতার পুকুর (উখিয়া)**

কোনো কোনো স্থাপনা বা দৃষ্টান্ত নির্দিষ্ট একটি এলাকার অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্যবাহী হয়ে থাকে। গবেষকরা বা ইতিহাসবিদরা ওখান থেকে ইতিহাসকে বের করে আনতে

www.pathagar.com

চেষ্টা করেন। উখিয়া উপজেলার ঐতিহাসিক 'নাপিতার পুকুর' এরকমই একটি নিদর্শন।

সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে টেকনাফ ভূ-ভাগকে চট্টগ্রাম ও আরাকান এলাকার মধ্যে লাওয়ারিশ স্থানের মতো পড়ে থাকতে দেখা যায়। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ধারণা ছিল ওটি ন্যায়ত আরকানের অধিকারভুক্ত এলাকা। কিন্তু ১৭৯৩ সালে 'লাহওয়া মুরং' নামে এক ব্যক্তি নিজেকে আরাকানরাজের ভ্রাতা পরিচয় দিয়ে কোম্পানির অধিকারে চলে আসেন এবং দক্ষিণে নাফ নদী, পূর্বে-উখিয়া ও নাফনদী, পশ্চিমে-সমুদ্র, উত্তরে-রেজু খাল এই চক বন্ধ দিয়ে এর অন্তবর্তী স্থানের তিনি বন্দোবস্তি প্রার্থনা করেন। কালেক্টর শিয়ারম্যান বার্ড লাহওয়ার প্রস্তাব সোৎসাহে গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ সহকারে পাঠান।

'নাপিতার পুকুর' উপজেলার রত্নাপালং ইউনিয়নের খোন্দকার পাড়ায় অবস্থিত। পুকুরটি কেউ খনন করেনি। এ পুকুর সম্পর্কে এলাকায় রয়েছে কিংবদন্তি। এলাকার লোকজন শত শত বছর ধরে সেই কিংবদন্তি বহন করছে।

জনৈক 'মজনুন' মানুষের এলাকায় আবির্ভাব ঘটে। মজনুন মানে পাগল বা অপ্রকৃতিস্থ মানুষ। একদিন পথে একা হাঁটতে হাঁটতে কী যেন খোঁজে বেড়াচ্ছিল ঐ মজনুন! হঠাৎ ছেঁড়াবস্ত্র পরা একজন নাপিতকে দেখে কড়া নির্দেশের সুরে বলল 'দে আমার দাড়ি কামিয়ে (ছেঁটে)।'

নাপিত পানি নেই এই বাহানা দিতে চাইলে মজনুন নাপিতের পিঠ চাপড়ে দিয়ে মাটির দিকে দেখিয়ে বলল, অকৃতজ্ঞ, পানি দেখছিস না? নাপিত তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখে শুকনো মাটি। বলল, পানি কই মামা? মজনুন জোর গলায় বলল, রাখ তোর কোটরা। রাখতেই মজনুন চাপ দিল কোটরায়! সোবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য! পানিতে ভরে যাচ্ছে কোটরা। উপচে পড়ে যাচ্ছে পানি। নাপিত সে পানিতে মজনুনের মুখ ভিজিয়ে দাড়ি ছাঁটলো। একসময় কোটরার সব পানি মজনুন ছিটিয়ে দিলেন চারদিকে। নাপিত বুঝলো না তার কিছু। সে তখন মজনুনের অলৌকিত্ব দেখে বিভোর। মজনুনের ডাকে সম্বিৎ ফিরে আসতেই নাপিত জড়িয়ে ধরলো তাঁর দু'পা। মজনুন বলল, কী চাস? নাপিত নির্বাক। তিনবার জিজ্ঞাসা করলো কী চাস? পা ছেড়ে দে। নাপিত নাছোড়বান্দা! বলল, মামা, আমাকে কিছু দাও। মজনুন আবার বললো, 'কী চাস'। নাপিত বলল, 'মামা আমি গরিব নাপিত'। মজনুন বলল, 'যা দৌড়ে যা'। নাপিত হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়! মজনুনের কর্কশ ডাকে সাড়া দিয়ে দিল এক দৌড়! অনেক দূর গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল নাপিত। আবার ওঠে ছুটে এলো মজনুনের কাছে। মজনুন বলল, 'যতদূর গিয়েছিস ততোদূর তোর'। এ কথা বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল মজনুন! বুড়ো নাপিত তারপর বিশাল জমির মালিক হয়ে গেলো। পরে পেট ও পরিবারের তাগিদে খণ্ড খণ্ড জমি বিক্রয় করে নিজ এলাকা পটিয়ায় চলে যায়। যেখানে কোটরায় পানি ওঠেছিল তা কালক্রমে একটি পুকুরে পরিণত হয়। সে সময় থেকে পুকুরটি নাপিতার পুকুর নামে পরিচিত হয়ে আসছে। ঐ পুকুরটির চারপাশে গড়ে ওঠে জনবসতি। তবে গ্রামের নাম হয় খোন্দকার পাড়া, পাড়ার মাঝখানে পুকুর। সংস্কার নেই। কেউ এ পুকুরের মাছও খায় না ভয়ে।"[১২]

www.pathagar.com

**বীর কমলার দিঘি (চকরিয়া)**

"রামু আদি ছয় সিক মারিয়া লাইল
রোসাঙ্গ নিকটে যাইয়া পুষ্করণি দিল"

উপরোক্ত লাইন দু'টি ত্রিপুরা রাজাদের রাজকীয় ইতিহাস 'রাজমালা' থেকে উদ্ধৃত। ত্রিপুরা রাজা ধন্য মানিক্যের (১৫৭৭-১৫৮৬) আমলে রাজপুত্র রাজদাহার নায়ারণের নেতৃত্বে আরাকান দখল করার জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। সেসময় বর্তমান সমগ্র কক্সবাজার জেলা আরাকানের অধীন ছিল। এসময় ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজদাহার নায়ারণ চকরিয়া পৌছে তাঁদের প্রথা অনুযায়ী একটি বিশাল দিঘি খনন করেন। চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নে এই দিঘি খনন করা হয় যা এখনো ত্রিপুরা রাজার আগমণের সাক্ষ্য বহন করছে। স্থানীয় লোকজন উক্ত দিঘিকে কমলারদিঘি নামেই জানে। উক্ত দিঘির অদূরেই রয়েছে 'মানিকপুর' গ্রাম। কথিত আছে ত্রিপুরা রাজা ধন্য মানিক্যের নামানুসারেই উক্ত গ্রামের নামকরণ করা হয়। ত্রিপুরা রাজার স্ত্রী বীর কমলার নামেই উক্ত দিঘির নামকরণ। পরবর্তীতে উক্ত দিঘির অদূরেই গড়ে ওঠে এলাকার কামেল পুরুষ হযরত ওমর শাহ (রহ.) মাজার। চকরিয়া উপজেলা সদর থেকে চার কিলোমিটার পূর্ব দিকে এই দিঘির অবস্থান।

স্থানীয়ভাবে কথিত আছে, স্থানীয় বিয়ে-শাদি, মেজবান, ওরসসহ বড় বড় সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বড় বড় ডেকসি, বাসনপত্র, পানি খাওয়ার জগ, গ্লাসসহ অন্যান্য তৈজসপত্রের প্রয়োজন হলে বীর কমলার দিঘিতে গিয়ে কিছু পান, সুপারি দিয়ে অপেক্ষা করতে হতো। পান সুপারির নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ ছিল না। পরে দিঘির মধ্যখান থেকে ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনীয় বড় বড় ডেকসি, পাতিল, বাসন, বোল, পিয়ালা, পানির জগ, গ্লাস ভেসে উঠতো। কোনো অশরীরী আত্মা বা দেবতা এসব তৈজসপত্র তা পানির উপরে নিয়ে আসতো বলে স্থানীয় লোকজনের বিশ্বাস। লোকজন তাদের প্রয়োজন শেষে এসব ব্যবহৃত তৈজসপত্র পরিষ্কার করে আবার দিঘিতে দিয়ে আসতো। এভাবে শত শত বছর ধরে চলতে থাকে। কিন্তু পরে এক অসাধু ব্যক্তি লোভ সামলাতে না পেরে তৈজসপত্রের মধ্য থেকে একটি পিতলের ডেকসি রেখে দেয়। এরপর দিঘি থেকে তৈজসপত্র ভেসে উঠা বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে স্থানীয় লোকজন দিঘির রহস্যজনক সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।"[১৩]

**হাঁসের দিঘি (ঈদগাঁও, কক্সবাজার)**

কক্সবাজার সদর উপজেলার হাঁসের দিঘিকে (কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন ইসলামাবাদ ইউনিয়নের খোদাইবাড়ি এলাকায় অবস্থিত) ঘিরে স্থানীয় লোকজনের মনে অনেক কৌতূহল ও রহস্য রয়েছে। এই 'হাঁসের দিঘি'কে কেন্দ্র করে অলৌকিক ঘটনার কারণেই জনমনে নানা ধরনের কৌতূহল। দিঘিটি অন্যূন ১৯০০ সালের দিকে খনন করা হয়েছে বলে প্রবীণদের কাছ থেকে জানা যায়। স্থানীয়ভাবে কথিত আছে, দিঘিটি খনন করার সময় অনেক অঘটন ঘটেছিল। যেমন, খননকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কোদালগুলো রাতের বেলা সংরক্ষিত স্থান হতে অদৃশ্য হয়ে যেতো। স্থানীয়ভাবে আরো কথিত আছে, এই পুকুর জ্বীন ও পরীরা কেটেছে এজন্য পুকুরপাড়ের উত্তর দিকের পাড়

www.pathagar.com

খোলা রয়ে গেছে। কারণ মাটি কাটতে কাটতে ফজর হয়ে যাওয়াতে জ্বীন ও পরীর দল চলে যায়। ফলে তারা এই পাড়ে মাটি দেয়ার সময় করতে পারেনি বলে প্রবীণদের মুখে শোনা যায়।

কথিত আছে দ্বিপ্রহরে ছেলে-মেয়েরা দিঘিতে একাকী গোসল করতে নামলে দিঘিতেই মারা যেতো ও পরে মৃতদেহ পানির উপরে ভেসে উঠতো। ছেলে-মেয়েরা একাকী গোসল করতে গেলে প্রায় এ অবস্থা হতো। এতে করে এলাকার লোকজন প্রমাদ গুণলো। অদৃশ্য জ্বীন-পরী, দেও-দৈত্য তাদের পুকুরে দুপুরবেলায় স্নান করতে আসতো। এসময় শিশুরা স্নান করতে গেলে তাদের স্নানের বিঘ্ন ঘটতো। ফলে ছেলেমেয়েরা দ্বিপ্রহরে স্নান করতে গেলে জ্বীন-পরী বা দৈত্য-দেওয়ের কবলে পড়ে মারা যেতো। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে স্থানীয় লোকজন ফুলের ঢালা সাজিয়ে জ্বীন-পরী, দৈত্য-দেওয়ের মন পাওয়ার জন্য পুকুরে ঢালি দিত। ক্রমান্বয়ে এখানে জনবসতি বাড়তে থাকলে পুকুরের ব্যবহার বহুলভাবে বেড়ে যায়। আর এর মাধ্যমে জ্বীন-পরীরাও পালিয়ে যায়। পুকুরটিতে এখন মাছ চাষ করা হয়।"[১৪]

**বলিখেলার পুকুর (কক্সবাজার সদর)**

কক্সবাজার সদর উপজেলার ঈদগাঁও-চৌফলদণ্ডি-কক্সবাজার সড়ক সংলগ্ন ঈদগাঁও ইউনিয়নের মাইজপাড়া গ্রামে অবস্থিত বলি খেলার দিঘি। যা স্থানীয়ভাবে 'বলি খেলার পুকুর' নামেই খ্যাত। এই দিঘির সাথে লাগোয়া খোলা মাঠেই প্রতিবছর শুষ্ক মওসুমে বলি খেলার আয়োজন করা হতো। বিশেষ করে বাংলা নববর্ষের পরেই অর্থাৎ বোশেখ মাসের শুরুতেই মাঠ যখন পরিত্যক্ত পড়ে থাকে তখনই বলি খেলার আয়োজন করা হয়। ফলে বলি খেলাটি উক্ত দিঘির নামেই পরিচিতি লাভ করে। আর বলি খেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হতো গ্রামীণ মেলার। বর্তমানে দু'ফসলা ধান উৎপন্ন হওয়ায় শুষ্ক মওসুমেও জমি পতিত থাকে না বিধায় বলি খেলার আয়োজন হয় না। দিঘিটি উত্তর-দক্ষিণ লম্বা ও পূর্ব-পশ্চিম প্রস্থ।

উক্ত দিঘিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের কিংবদন্তি ও লোকশ্রুতি এলাকায় প্রচলিত। কথিত আছে যে, প্রতি বছরের বোশেখ মাসের অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাতে দিঘির জলে সোনার নৌকা ভেসে উঠতো। নৌকাতে দেখা যেতো অপূর্ব সুন্দরী কুমারীকে। নৌকার আরোহী উক্ত সুন্দরী লোকজনকে তার সহযাত্রী হওয়ার আহ্বান জানাতো। যেই দিঘির জলে নেমে তার সহযাত্রী হওয়ার চেষ্টা করতো তাকে আর জীবিত পাওয়া যেতো না। পরদিন সকালে তার লাশ পানিতে ভেসে উঠতো। এছাড়াও লোকজন ভর দুপুরে বা মধ্যরাতে দিঘির পাশ দিয়ে একা একা বা দুই তিনজনের দলবদ্ধ লোক হেঁটে যাওয়ার সময় পথ হারিয়ে ফেলতো। তারা দিয়াকুল (দিবাভূতে পাওয়া) হয়ে যেতো। অবশ্যি বর্তমানে দিঘির সেই ঐতিহ্য নেই। সোনার নৌকা এখন আর কোনো সময় দেখা যায় না। পথচারীকে দিবাভূতে পায় না। বিশেষ করে দিঘি সংলগ্ন মাঠ এখন আর খোলা থাকে না। দিঘির উত্তর পাড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে মাদ্‌রাসা ও হেফজ্‌খানা। দিঘি সংলগ্ন সড়কে যানবাহনের যাতায়াত ও ব্যস্ততা দুই বেড়েছে। দুই ফসলা শস্য উৎপাদনের ফলে মাঠে হাঁটার সুযোগ নেই।"[১৫]

www.pathagar.com

**সিকদাররের পুকুর (চকরিয়া)**

ডুলাহাজারা বাজারের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে পুকুরটির অবস্থান। গ্রাম বৈরাগিরখিল। লোকের মুখে 'বৈরারখিল'। দিঘিটি পরিচিত 'সিদ্দারো পইর' [সিকদাররের পুকুর] হিসেবে। 'বর্ পইর' [বড় পুকুর]ও বলেন কেউ কেউ। আয়তন ৪ কানি [প্রায় ২ একর]।

এই দিঘি নিয়ে প্রচলিত আছে নানা কাহিনি।

পুকুরটি কাটা হয়েছিল অন্তত ৮০ থেকে ১০০ বছর আগে। পুকুরটি খনন করা হলো। কিন্তু জলের দেখা মেলে না। যতই গভীরে খোঁড়া হয়, শুকনো মাটিই কেবল দৃশ্যমান হয়। হতাশ হয়ে পড়েন পুকুরটির উদ্যোক্তাসহ মাটি খননের কাজে নিয়োজিত লোকজন। হতাশ হয়ে পড়েন এলাকার অধিবাসীরা, যারা জলের অভাব পুরনের জন্য পুকুরটির খননকাজের দিকে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

এক রাতে পুকুরের মালিক স্বপ্নে দেখেন, পুকুরে জল পেতে হলে যুবতি মেয়ে 'ডালি' [বলি বা উৎসর্গ] দিতে হবে। স্বপ্নের বিশ্বাস করলেন সহজেই। কারণ তখনকার দিনে এমন 'ডালি' দেওয়ার ঘটনা সাধারণ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। তিনি মনস্থ করলেন ডালি দিতে। কিন্তু যুবতি মেয়ে পাবেন কোথায়। বিয়ে করার জন্য পেতে পারতেন, কিন্তু বলি দেবার জন্য কোথায় পাবেন। শেষ পর্যন্ত তার ঘরের কাজের মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাজি করালেন, এই বলে যে, একটা সাজানো কুলা নিয়ে শুকনো পুকুরটাতে একটু নামতে হবে। জলহীন পুকুরে নামতে কেই-বা ভয় পায়। মেয়ে সহজেই রাজি। কারণ, পুকুরে নামার জন্য সাজগোজের যে আয়োজন করা হবে, সবকিছু সে পাবে।

যথাসময়ে চাকর-মেয়েকে ভালো-ভালো শাড়ি-গয়না দিয়ে সাজানো হলো। সারাজীবন যেমন অলংকার-আভরণ তার স্বপ্নকল্পনার বস্তু ছিল, সেসব পেয়ে তার আনন্দ দেখে কে? তাকে সাজিয়ে তার মাথায় তুলে দেওয়া হলো 'আঁৎকুলা'। বিশেষ ধরনের এই কুলায় রাখা হলো জ্বলন্ত মোমবাতি, সোয়া-সের চাল, দুটি ডিম, কয়েকটি জবা ফুল, কিছু 'দুধ-খের' [দুর্বা ঘাস] আর কাঁচা হলুদ।

নতুন চমৎকার কাপড়চোপড় আর হাতে-কানে-নাকে গয়নাপাতি দিয়ে সাজানো মেয়েটি মাথায় 'আঁৎকুলা' নিয়ে পুকুরে নামতে লাগলো। অবাক কা-। মেয়েটি পুকুরে পা দেবার সাথে সাথে শুকনো খটখটে মাটি থেকে জলের ক্ষীণ ধারা বেরোতে শুরু করলো। মেয়েটি যত নিচে নামে, জলের ধারা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে পুকুরের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে মেয়েটি কুলাটি মাথা থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখার সাথে সাথে প্রবল বেগে জলধারা বেরোতে লাগলো। মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য কোনো উৎস থেকে হিংস্র জলরাশি এসে মেয়েটিকে ডুবিয়ে কোথায় নিয়ে গেলো। তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না।"[১৬]

**রাজার দিঘি (উখিয়া)**

উখিয়া উপজেলার রাজার দিঘিটি উপজেলা সদর হতে মাত্র ২ কিলোমিটার উত্তরে সিকদার বিল গ্রামে অবস্থিত। ৬ একর জমি নিয়েই এই বিশাল দিঘির অবস্থান। স্থানীয়

www.pathagar.com

ভাবে কথিত আছে জনৈক মগ সামন্তরাজ দিঘিটি খনন করেন। সে কারণেই দিঘির নাম হয়েছে 'রাজার দিঘি'। কথিত আছে ত্রিপুরা রাজার আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য স্থানীয় মগ সম্প্রদায়ের লোকজন আরাকানে পালিয়ে যায়। আরাকান পালিয়ে যাওয়ার আগে তারা তাদের সোনা-রূপা, অন্যান্য অলংকারাদিসহ মূল্যবান বাসনপত্র ইত্যাদিতে তন্ত্রমন্ত্র পড়ে দিঘির পাড়ে পুঁতে রাখে। এ দিঘিটিকে ঘিরে জনশ্রুতি রয়েছে যে, একসময় এ দিঘিতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাতে বিভিন্ন আকার-আকৃতির ডেকচি, পাতিল, বাসনপত্র, পেয়ালা, পানির জগ, গ্লাস ইত্যাদি ভেসে উঠতো।
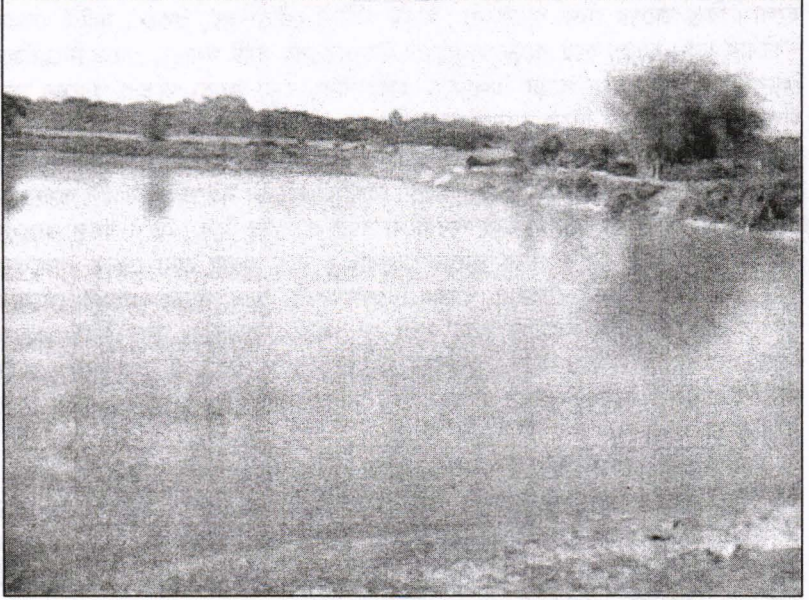
*উখিয়া উপজেলার রাজার দিঘি*

স্থানীয় সামাজিক কাজে এসব তৈজসপত্র ব্যবহার করা হতো। স্থানীয় কোনো পরিবারে বিয়ে-শাদি বা কোনো মেজবানের আয়োজন করা হলে ঐ দিঘির ঘাটে গিয়ে হাত পাতলে প্রয়োজনীয় সব হাড়ি-পাতিল ডেকচি-পাতিল, বাসন-কোসন, পানির জগ, পানি খাবার গ্লাস পাওয়া যেত। নিজেদের প্রয়োজন শেষে আবার দিঘিতে নিয়ে ঐ সব তৈজসপত্র ছেড়ে দিলে তা আবার পানির অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে যেত। এভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্থানীয় জনসাধারণ রাজারদিঘি থেকে এসব তৈজষপত্র এনে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতো। জনশ্রুতি আছে যে, একদিন জনৈক ব্যক্তি থালা বাসন ব্যবহার করার পর লোভ সামলাতে না পেরে একটি স্বর্ণবর্ণ পেয়ালা (স্থানীয়ভাবে কোটারা) রেখে দেয়। রাতে তাকে স্বপ্নে বলা হয় ঐ পেয়ালা ফেরত দিতে। ঐ ব্যক্তি কিছুতেই ফেরত দিতে রাজি না হওয়ায় পরের রাতে ঐ পেয়ালা গায়েব হয়ে যায় এবং পরদিন থেকে উক্ত ব্যক্তির বংশ নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করে। এরপর হতে আর ঐ দিঘিতে কোনা ধরনের মালামাল দেখা যায়নি।"[১৭]

www.pathagar.com

**মালভিটা পাড়া গ্রাম (উখিয়া)**

উখিয়া উপজেলা সদরে অবস্থিত মালভিটা পাড়া গ্রামটিকে ঘিরে যে কিংবদন্তি রয়েছে তা হচ্ছে- এখানে এক সময় আরকানি মগেরা বাস করতো। সতের শতাব্দীর দিকে ত্রিপুরা রাজার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মগেরা বার্মায় চলে যায়। বার্মা পালিয়ে যাওয়ার পূর্বে তারা তাদের মূল্যবান সম্পদ বড় বড় পিতলের ডেকচিতে ভরে মন্ত্র-তন্ত্র সহযোগে ফুঁক দিয়ে ঢাকনায় আবৃত করে মাটির গর্তে পুঁতে রাখে। পুঁতে রাখা এসব মালামাল কেউ যেন আত্মসাৎ করতে না পারে তৎজন্য দীর্ঘমেয়াদী মন্ত্র প্রয়োগে তেলেছমাত করে রাখে। মেয়াদ শেষ হলে নাকি এসব মালামাল মরে যায়। মৃত মাল যে পায় সে ভোগ করতে পারে। অপূর্ণ মেয়াদী মাল কেউ পেলেও ভোগ করতে পারে না। মালভিটা পাড়ার মগেরা পালিয়ে গেলে এখানে ক্রমশ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মুসলমানেরা গৃহনির্মাণের সময় মাটি কাটতে গিয়ে এ ধরনের পুঁতে রাখা মালের সন্ধান পায়। ফলে এ গ্রামের নাম হয় মালভিটা পাড়া গ্রাম।"[১৮]

**পল্লান পাড়া গ্রাম (টেকনাফ)**

টেকনাফ উপজেলার অন্তর্ভুক্ত একটি জনপদের নাম 'পল্লান পাড়া গ্রাম'। এ গ্রামের সৃষ্টি রহস্যে সুন্দর এক কিংবদন্তি রয়েছে। কিংবদন্তি হচ্ছে- পল্লানপাড়া এলাকাটি ছিল গভীর অরণ্য পরিবেষ্টিত আনাবাদী জায়গা। এখানে ছিল প্রচুর বুনো হরিণ, বন মোরগ-মুরগি এবং অন্যান্য শিকার্য পশু-পাখির বসবাস। টেকনাফ সদরে যারা ধনবান ব্যক্তি ছিল তদানিন্তন সময়ে তাদের সখ ছিল বন্যপ্রাণী শিকার করা। সপ্তাহের রবিবারে নাকি বন্যপ্রাণীরা পল্লান পাড়া বনে একত্রিত হয়ে শিং উচিয়ে, লেজ নেড়ে মনের আনন্দে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতো। একদিন কয়েকজন শিকারী (যাদের অঞ্চলিক ভাষায় পল্লান বলা হয়) অত্যন্ত সংগোপনে ঐ বনে শিকার করতে গলে বন্যপ্রাণীগুলো আকস্মিক কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেল। পল্লানেরা সেখানে বাসা বেঁধে রইল তিনদিন। কিন্তু শিকারের দেখা নেই। তারা ফিরে গেল। পরের রবিবার আবার এলো। বন্যপ্রাণীগুলো আগের মতো ছুটাছুটি করছিল। তীর ধনুক তাক করতে বন্যপ্রাণীগুলো আবারো গায়েব। পল্লানেরা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গেলো। পরে ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে অনেকে ঐ জঙ্গল কেটে সেখানে বসতি গড়ে তুললো। আবাদকৃত ঐ জায়গার নাম রাখা হলো 'পল্লান পাড়া'। 'পল্লান পাড়া' ক্রমে গ্রামে উন্নীত হলো। 'পল্লানপাড়া' টেকনাফের বিশাল জনপদের নাম।"[১৯]

**খাসমহাল পুকুর (উখিয়া)**

এই পুকুরটি উখিয়া উপজেলা সদরের একবারে প্রাণকেন্দ্রে স্টেশন সংলগ্ন তহশিল অফিসের পাশে অবস্থিত। পুকুরটি অন্যূন ১৯২৮ সালের দিকে খনন করা হয়েছে বলে প্রবীণদের মুখে শ্রুতি আছে। পুকুরটি খনন করার সময় অনেক অঘটন ঘটেছিল বলে কথিত আছে। যেমনটি খনন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কোদালগুলো রাতের বেলা সংরক্ষিত স্থান হতে গায়েব হয়ে যেতো। এভাবে তিনবার গায়েব হয়ে গেলে শ্রমিকেরা ৪র্থ বারের মতো কোদাল কিনতে বাধ্য হয় এবং খননকাজ সমাধা করে।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে পুকুরে কোনো ছেলে বা মেয়ে ঠিক দুপুরে গোসল করতে গেলে ওখানে মারা যেতো ও পরে মৃতদেহ উপরে ভেসে উঠতো। পুকুরের উত্তর-পূর্ব পাড়ে দুটি বড় বড় জারুল গাছ ছিল। জারুল ফুলে আসক্ত কোনো দৈত্য-দানবের বা জ্বীন-পরীর অবস্থান ছিল জারুল গাছে। তাই ঠিক দুপুরে কোনো ছেলে বা মেয়ে একাকী গোসল করতে গেলেই পুকুরে মারা যেতো। সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে ফুলের ঢালা সাজিয়ে পুকুরে ঢালি দিতো স্থানীয় বাসিন্দারা। ক্রমান্বয়ে এখানে জনবসতি বাড়তে থাকলে পুকুরের ব্যবহার বেড়ে যায়। জ্বীন-পরীরাও পালিয়ে যায়। বর্তমানে পুকুরটি সংস্কারবিহীন অব্যবহৃত অবস্থায় পরিত্যক্ত রয়েছে। এতে করে পুকুরের বর্তমান অবস্থা অনেকটা ভুতুড়ে পরিবেশ ধারণ করেছে। যা সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন।"[২০]

## ঘোড়ার পাহাড় (টেকনাফ)

টেকনাফ উপজেলাধীন বাহারছড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি পাহাড়চূড়ার নাম 'ঘোড়ার পাহাড়'। অরণ্য পরিবেষ্টিত এ পাহাড়টিকে ঘিরে কিংবদন্তি রয়েছে যে, এ পাহাড়ে কেউ একা কাঠ সংগ্রহ করতে গেলে চারিদিকে ঘোড়ার খট খট পায়ের শব্দ শুনতে পেতো। কাঠ বা লাকড়ী সংগ্রহকারীরা এক সঙ্গে থাকা অবস্থায় কোনো শব্দ হতো না এবং কোনো ঘোড়া হাঁটার আভাসও পেতো না। তবে দল থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো কাঠুরিয়া সেই খট খট শব্দ শুনতে পেতো, ভয়ে শিউরে উঠতো ও গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেতো। ঘোড়ার পায়ের খট খট শব্দ হতো বলে এ পাহাড়ের নাম হয় 'ঘোড়ার পাহাড়'। উল্লেখ করা যায় যে, এ অদৃশ্য শব্দ ছাড়া কেউ কোনো দিন এই পাহাড়ে কোনো ঘোড়া দেখেনি। রহস্যাবৃত এই জঙ্গলাবৃত পাহাড়ে অজানা আতংকে অদ্যাবধি কোনো মানুষ একাকী 'ঘোড়ার পাহাড়ে' যায় না। কেউ যদি কোনো কারণে বাধ্য হয়ে ঐ অরণ্য বেষ্টিত পাহাড়ে যায় বা ওঠে তখনই অদৃশ্য ঘোড়ার পায়ের খট খট শব্দ তাকে আতংকিত করে তুলে। বন বিভাগের কর্মচারীরা নাকি ঐ শব্দ কখনো শুনেনি। স্থানীয়ভাবে কথিত আছে, বন কর্মচারীরা বনের রক্ষক বলেই তারা এই রহস্যাবৃত ঘোড়ার পায়ের শব্দ কোনোদিন শুনেনি।"[২১]

## শাহপরীর দ্বীপ (টেকনাফ)

টেকনাফ উপজেলা থেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ। সাগর ও নদী বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র লোকালয় হচ্ছে 'শাহপরীর দ্বীপ'। এই দ্বীপটিকে ঘিরেই রয়েছে বিভিন্ন কিংবদন্তি। এসব কিংবদন্তীর মধ্যে রয়েছে, দ্বীপটি সাগরগর্ভে গড়ে উঠার পর তদানিন্তন সময়ে হোসেন বাদশাহ নামের একজন আওলিয়া এ দ্বীপে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি এখানে মহান আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে দিবারাত্রি মশগুল থাকতেন। সন্ধ্যা হলে প্রতি সন্ধ্যায় জ্বালাতেন একটি ঘৃতের প্রদীপ। তিনি নামাজ পড়তেন পাঁচ ওয়াক্ত। আযান দিতেন সুউচ্চ কণ্ঠে মধুর সুরে। তাঁর আযানের ধ্বনি ছড়িয়ে যেতো দ্বীপময়। ছড়িয়ে যেতো উর্মিমুখর সমুদ্রের উত্তালতায়। ছড়িয়ে যেতো আযানের ধ্বনি উর্ধাকাশের পরতে পরতে। আযানের ধ্বনিতে মোহময়তায় নেমে আসতো স্বর্গের ফেরেশতারা। নামাজে

www.pathagar.com

শরিক হতো, জামাতের সহিত নামাজ আদায় করতো। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে এ দ্বীপে রাতভর দিকদর্শন যন্ত্রের মতো মিট মিট আলো ছড়াতো হোসেন বাদশাহর সেই ঘৃত প্রদীপটি। হোসেন বাদশাহর নামানুসারেই এ দ্বীপটির নাম রাখা হয় 'শাহপরী' বা 'শাহপুরী'র দ্বীপ। পুরী মানে গৃহঅভ্যন্তর। সর্বপ্রথম হোসেন বাদশাহ আওলিয়া এ দ্বীপটিকে পুরী হিসাবে গড়ে তুলেন।"[২২]

তবে কারো মতে শাহ ফরিদ নামের জনৈক আল্লাহ্ তা'আলার নেকবক্ত লোক দ্বীপের আবাদ করেন। তাঁর নামানুসারে দ্বীপের নাম 'শাহপরীর দ্বীপ' হয়েছে। এছাড়াও কিংবদন্তি রয়েছে, সম্রাট শাহজাহানের পুত্র বাংলার সুবেদার শাহসুজা ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আরাকানরাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহসুজার স্ত্রী পরীবানু তাঁর সহচরীদের নিয়ে নাফনদীর এপারে আসা-যাওয়া করতো এবং প্রমোদভ্রমণ করতেন। লোকজন তাদেরকে ভ্রমে পরী মনে করতো। কারণ পরীবানু এমনিতেই অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। তার উপর মুখের প্রসাধন এবং বেশভুষা তাদেরকে পরী বলে লোকজন ভুল করে বসতো। লোকজন শাহসুজার 'শাহ' নিয়ে পরীবানুর 'পরী' নিয়ে দ্বীপের নামকরণ করে 'শাহপরী'র দ্বীপ।"[২৩]

## রাজার গড় (উখিয়া)

প্রায় সাড়ে চারশত বৎসর পূর্বে পাক-ভারত উপমহাদেশের সম্রাট শাহজাহানের পুত্র ক্ষমতাচ্যুত শাহসুজা সস্ত্রীক আরাকানরাজার আশ্রয়ে যাওয়ার প্রায় দুই শতাব্দী পর উখিয়া অঞ্চলের গোড়াপত্তন হয়। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, ১৭৯৩ সালে আরাকান রাজার কথিত ভাই লোয়ামোরং অনাবাদী উখিয়া ও টেকনাফ অঞ্চলের জমির বন্দোবস্তি চেয়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমি প্রশাসন অধিদপ্তর কলকাতা অফিসে দরখাস্ত পেশ করে।

কথিত আছে, কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে বার্মিজ ভাষায় পালং বলা হয়। রাজা মানে সামন্ত শাসক। এরকমই একজন সামন্ত শাসক কর্তৃক শাসিত এলাকার নাম রাজাপালং। ১৭৮৪ সালে বার্মারাজা বোধপায়া আরাকান আক্রমণ করে দখল করে নেয়। এসময় আরাকানের প্রায় লক্ষাধিক বার্মিজ ভাষাভাষি হিন্দু, মুসলমান, রাখাইন উখিয়াসহ কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয় এবং অস্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলে। বোধপায়ার সেনাপতি মহাবান্দুলার দুঃশাসন ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এসময় মগ বৌদ্ধরা চিনপিয়ান নামক আরাকানের জনৈক রাজপুত্রের নেতৃত্বে বার্মার বিরুদ্ধে গেরিলা তৎপরতা শুরু করে। পরে এসব পালিয়ে আসা আরকানিরা বিভিন্ন স্থানে জায়গা আবাদ করে বসবাস করতে থাকে। এদের মধ্যে প্রভাবশালীরা পালং বা এলাকা ভিত্তিক নেতা বা শাসক হয়ে যেত। পালংখালির পালু মং এদের মধ্যে অন্যতম। উখিয়া এবং টেকনাফের আবাদযোগ্য জায়গাসমূহের অংশবিশেষ তারা ঘরবাড়ি তৈরি করে। এ সময় জনৈক প্রভাবশালী মগ লালাপ্রু মং বর্তমানে রাজাপালং এ তার সামন্তীয় প্রভাব বিস্তার করে। এই লালাপ্রু মং-এর এলাকা পরবর্তীতে রাজাপালংয়ে পরিণত হয়। লালাপ্রু মং ছিলেন জনৈক ওইক্যা মং এর আত্মজ। লালাপ্রু মং-এর রাজবাড়ি ছিল একটি উঁচু পাহাড়ে। যে পাহাড়ের মধ্যখানে ১৯৩২ সালে গড়ে ওঠেছে রাজাপালং সিনিয়র মাদ্রাসা। লালাপ্রু মং তার এলাকাধীন বেশ কটি কীর্তি রচনা করে গেছেন। এ

www.pathagar.com

গুলোর মধ্য সিকদার বিল এলাকার বিশাল রাজার দিঘি এবং রাজবাড়ি সংলগ্ন প্রায় দেড় কিলোমিটার লম্বা ও ৭৫ ফুট প্রস্থ রাজাপালং রাজার গড় বা পরিখা। অদ্যাবধি লালাপ্রু মং-এর কীর্তি বহন করে আসছে। এ বিশাল গড়টি আর গড় নেই। দেড়শ বৎসরের মানব-অত্যাচারে গড়টি জমিতে পরিণত হয়ে গেছে।"[২৪]

## গ. লোকপুরাণ

**ওলাবিবি**

প্রাচীনকালে এ জনপদের মানুষ ওলাবিবিকে অত্যন্ত ভয় করতো। ওলাবিবির আচড়, আছর বা ছোঁয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হেন কোনো কিছু ছিল না যা করতো না। তৎমধ্যে অন্যতম, ওলাবিবি যাতে মহল্লার চৌহদ্দির মধ্যে আসতে না পারে সে জন্য 'পাড়া বন্ করা' হতো। পাড়া বন্ বা পাড়া বন্ধ করা ছিল প্রাচীনকালের একটি সামাজিক প্রথা। এতে প্রচুর আনুষ্ঠানিকতা ছিল। এই 'ওলাবিবি' আর কেউ নয়। ওলাবিবি হচ্ছে স্থানীয়ভাবে যাকে 'ওলাউঠা' বা 'গরম বিয়ারাম' বা 'কলেরা'। গ্রামীণ জনজীবনে পাড়া বন্ করা ছিল 'গরম বিয়ারাম' বা কলেরা রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সূত্রে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে কলেরা রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না। ফলে কোনো গ্রামে কলেরা শুরু হলে প্রচুর লোক মারা যেতো। চিকিৎসার অভাবেই কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিতো। এই রোগে যে আক্রান্ত হতো সে দ্রুত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। এই রোগে দ্রুত মৃত্যুর কারণ হতো বলেই এটাকে গ্রামে 'গরম বিয়ারাম' নামে আখ্যায়িত করা হতো। প্রাচীনকালে লোকজন মনে করতো 'ওলা বিবি' নামের জনৈক মহা ক্ষমতাবান মহিলা এই রোগ বহন করে নিয়ে আসতো। ওলা বিবি'র নজর যেখানে পড়তো সেখানে রেহাই ছিল না কারো। শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতি, বুড়া-বুড়ি, নির্বিশেষে কেউই এ রোগ থেকে রেহাই পেতো না। যে পাড়া বা মহল্লায় এ রোগের আগমন দেখা যায়, সে পাড়ার আর নিস্তার থাকতো না। মড়ক লেগে যেতো সর্বত্র।

কিংবদন্তি আছে, 'ওলাবিবি' বা 'গলাকাটা ভূত' এ রোগের বিস্তার ঘটাতো। 'ওলাবিবি' ছিল ভয়ংকর প্রকৃতির এক নারী। এ নারী গভীর রাতে চলাফেরা করতো। ওলাবিবি বিভিন্ন ছদ্মবেশে, বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লায় চলাফেরা করতো। এই ওলাবিবি কোনো সময় বিড়াল, কোনো সময় কুকুর বা অন্য কোনো প্রাণী বা কোনো খোঁড়া, ল্যাং মানুষের ছদ্মবেশ ধরে চলাফেরা করতো। একারণে গ্রামের মানুষের মধ্যে এক অজানা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তো। যে এলাকা দিয়ে সে গমন করতো সেই এলাকায় পরের দিন থেকে ওলাউঠা রোগ শুরু হতো এবং অকাতরে মারা যেতো এলাকার লোকজন। এ রোগে ঘন ঘন পায়খানা ও বমি হয় এবং এটা ছিল ছোঁয়াচে রোগ। এ রোগে যেই আক্রান্ত হয়েছে তাকে রক্ষা করার কোনো ঔষধ তখনও আবিষ্কার হয়নি। সে সময়ে ওঝা-বৈদ্যই ছিল ভরসা। উন্নত চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য গ্রামের লোকজন একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে ভাগ্যকে অদৃষ্টের হতে সপে দিতো। তবে প্রতিরোধ হিসাবে বেছে নিয়েছিল অভিনব এই কার্যক্রম।

এলাকার লোকজন সম্মিলিতভাবে এ রোগ প্রতিহত করার উদ্যোগ নিতো। মহল্লা-র মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে গ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন মিলে মসজিদে শিরনি

www.pathagar.com

বা পায়েস দেয়ার ব্যবস্থা করতো। শিরনি বা পায়েস দেয়ার জন্য সকলেই দলবদ্ধভাবে রাতের বেলা নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে 'গরম বিয়ারাম' বহনকারী ওলাবিবিকে তাড়াবার জন্য এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিরনির জন্য চাল ভিক্ষা করে তা সংগ্রহ করতো।

ভিক্ষার সময় তারা সমস্বরে গেয়ে উঠতো-

'ফকির আইলামরে... দরবেশ আইলামরে...
আল্লাহ নবীর বাণী লই ভিক্ষা চাইলামরে।'

ভিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত দোয়া বা গান গীত হতে থাকবে। গৃহস্থ তার ঐচ্ছিক চাল দিয়ে সকলকে বিদায় করতো। ভিক্ষার চাল গ্রহণ করার পর সকলে মিলে নিম্নরূপ দরুদ পাঠ করতো। যেমন-

'শামসুজ্জোহা মোহাম্মদ
বদরুদদোজা মোহাম্মদ
নুরে খোদা মোহাম্মদ
ছল্লে আলা মোহাম্মদ। (কম করে হলেও তিনবার পাঠ করতে)

দরুদ পাঠ শেষ করে তারা আবার যাত্রা করতো অন্য ঘরে। এভাবে ঘর ঘর ভিক্ষা নিয়ে যাওয়ার পথে তারা রাস্তার একপাশে দিয়ে সবাই ধীরে ধীরে হাঁটতো এবং উচ্চস্বরে দরুদ গাইতো-

'ইয়া মুখলেচু... ইয়া খাঁলেচু...
ইয়া মালেকু... ইয়া আল্লাহ...

এভাবে দরুদ গাইতে গাইতে পাড়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌছে আল্লাহ্র রাসূল সা.-এর নামাংকিত লাল পতাকা পুঁতে দিতো। পাড়া বা মহল্লার চারিপার্শ্বে লাল পতাকা পুঁতে সকলেই রাতের কাজ সমাপ্ত করতো। তিনদিন বা এক সপ্তাহ পরে জুমাবারে সংগৃহীত ভিক্ষার চাল, নারিকেল, গুড় দিয়ে শিরনি বা পায়েস তৈরি করে ঐ শিরনি মসজিদে মুসল্লিদের মাঝে বিলিয়ে দিতো। যদি অবশিষ্ট থাকতো তা পাড়ার ঘরে ঘরে বিতরণ করা হতো। উল্লেখ্য, ওলাবিবি যাতে গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যই পাড়া বা মহলার চারিপার্শ্বে দোয়া লেখা লাল পতাকা পুঁতে দেয়ার মাধ্যমে পাড়া বন্ধ করার কাজ সমাপ্ত হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাটির ছোট ছোট ঢাকনার উপর বিভিন্ন দোয়া বা পবিত্র কুরআন মজিদের সূরার আয়াত লিখে তা মহল্লার চারকোণায় গাছের ডালে আটকিয়ে দেয়া হতো। লাল পতাকাটা অনেকটা হিন্দু সম্প্রদায়ের ঠাকুরের ত্রিশুলের অগ্রভাগে ত্রিকোণাকৃতির যে লাল পতাকা বহন করে দেখতে অনেকটা তার ন্যায়। প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, পাড়া বন্ধ করা গেলেই 'ওলাবিবি' পাড়ায় প্রবেশ করতে পারবে না এবং গরম বিয়ারামও আনতে পারবে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন কলেরা বা বসন্ত বা হাআরা বা হাম ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'ওলাশীলতা দেবীর' পূজা করতো এবং তাদের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য গ্রামের একপ্রান্তে বা বটগাছের নিচে নানা প্রকারের খাদ্য-দ্রব্য রেখে আসতো। ওলা বিবির ধারণা হিন্দু সম্প্রদায়ের 'ওলা দেবী' থেকে পাওয়া। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসার বদৌলতে কলেরা প্রতিষেধক স্যালাইন আবিষ্কার হওয়ায় ঐ রোগ নির্মূল হয়ে গেছে এবং প্রচলিত 'পাড়া বন্ধ করার' কাজও বিলুপ্ত আজ।"[২৫]

www.pathagar.com

### আশ নাইদে দরিয়া

সাগরপথে চলাচলকারী নাবিক, জেলেরা বিশ্বাস করে যে, ভারত মহাসাগরের কোনো একটি অংশে পানিতে আঁশ নেই। যেখানে কোনো বস্তু পড়লে বা কোনো বস্তু গেলে মুহূর্তের মধ্যে তা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। যার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। এসব বস্তু কোথায় যায় তা কেউ জানে না। স্বচক্ষে দেখে এসে নাবিক ও জেলেরা অপরের কাছে এই তথ্য প্রকাশ করেছে। তাদের বর্ণনা অনুযায়ী ভারত মহাসাগরে এমন একটি পয়েন্ট রয়েছে যেখানে মানুষের হাত সদৃশ দু'টি বস্তু দৃশ্যমান হয়। নাবিকেরা ঐ হাত দু'টির কাছাকাছি গেলেই পানিতে ডুবে যায়। যারা ডুবেছে তাদের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি বলে কথিত আছে। নাবিকেরা ওদিকে যাওয়ার সময় বাম হাত দিয়ে তাদেরকে কাছে ডাকতে থাকে আর ডান হাত দিয়ে কাছে যেতে নিষেধ করে। ডান হাত সত্যের বাহন বলেই নাবিকদেরকে কাছে যেতে নিষেধ করে। বাম হাত শয়তানে ভর করেই আছে। বাম হাত মানুষের মঙ্গল কামনা করে না বিধায় মানুষকে তার কাছে ডাকতে থাকে, কাছে গেলে যাতে পানিতে ডুবে মারা যায়। সে কারণেই ওর কাছে গেলেই পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয়ে যায়। নাবিকেরা ঐ পয়েন্টের নাম দিয়েছে 'আঁশ নাই দে দরিয়া'। সেই দরিয়ার পানিতে কোনো আঁশ নেই বলেই নৌকা, জাহাজ ওখানে গেলেই ডুবে যায়। নাবিকদের বিশ্বাস, কোনো অদৃশ্য দেবতা এসব অপকর্ম করে থাকে। বর্তমানকালে ভারত মহাসাগরের বারমুদা ট্রায়েঙ্গেলকেই জেলে বা নাবিকেরা 'আঁশ নাই দে দরিয়া' আখ্যায়িত করেছে বলে ধারণা।"[২৬]

### গরুর শিং-এ পৃথিবী

স্থানীয়ভাবে লোকজন বিশ্বাস করত যে, একটি ষাঁড়ের কারণেই পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়ে থাক। বিশালকার একটি ষাঁড় পৃথিবীকে তার শিং-এর উপর ধারণ করে রেখেছে। পৃথিবীকে ধারণ করার জন্য ষাঁড়টি তার দুটি শিং ব্যবহার করে। তবে ষাঁড়টি তার দুটি শিং একসাথে ব্যবহার করে না। ষাঁড়টি পর্যায়ক্রমে পৃথিবী নামক গোলাকার বস্তুটাকে এক শিং থেকে আরেক শিং-এর উপর স্থানান্তর করে। পৃথিবীকে এক শিং থেকে অপর শিং-এ স্থানান্তর করার সময় কোনো কোনো সময় মৃদু থেকে মাঝারি এবং কোনো কোনো সময় তীব্র থেকে তীব্রতর ঝাঁকুনি লাগে। এই ঝাঁকুনির ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠে ভূমিকম্প সংঘঠিত হয়। এক শিং থেকে অপর শিং-এ স্থানান্তর করার সময় মৃদু ঝাঁকুনি লাগলে পৃথিবীপৃষ্ঠে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়। মাঝারি ঝাঁকুনি লাগলে পৃথিবী পৃষ্ঠে মাঝারি ভূমিকম্প সংগঠিত হয়। আর মাত্রাতিরিক্ত বা তীব্র থেকে তীব্র ঝাঁকুনি লাগলে ভূমিকম্পের মাত্রাও বেশি হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠে সম্পদহানি থেকে শুরু করে প্রাণহানি ঘটে। কথিত আছে, কোনো অদৃশ্য দেবতা ষাঁড়ের সাথে পৃথিবীকে নাড়াচাড়া করে থাকে।"[২৭]

## ঘ. কবিগান

কবিগান মানে দুই কবির যুক্তির লড়াই। লোকসংস্কৃতির অনবদ্য উপাত্ত কবিগানের লড়াই বা মল্লযুদ্ধ এখনও বিলুপ্ত হয়নি। অদূর ভবিষ্যতেও বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভবনা নেই। লোকসংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল বাহন হিসাবে এ উপাত্তটি শহরে, গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-

www.pathagar.com

বন্দরে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কক্সবাজার জেলাসহ বৃহত্তর চট্টলার বিভিন্ন এলাকায় এখনো কবিগানের আসর বসে। তবে পূর্বে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বসতো তা দেখা যায় না। তারই ধারাবাহিকতায় কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে শীত মৌসুমে বিশেষ কোনো উপলক্ষে কবিগান অনুষ্ঠিত হতো। কক্সবাজারে কবিগান তেমন প্রচলিত ছিল না, যেমনটি বর্তমানেও নেই। কক্সবাজারে কবিয়াল তেমন ছিল না বললেই চলে। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালি, চন্দনাইশ, রাউজান বা রাঙ্গুনিয়া থেকে কবিয়ালদের এনে স্থানীয়ভাবে কবিগানের আয়োজন করা হতো। আয়োজকরা নির্ধারিত একটি দিন ধার্য করে রাতব্যাপী কবিগানের আয়োজন করতো। কবিগানের আসরে বেশ লোক সমাগম হতো।

কবিদের সমঝোতার ভিত্তিতে বিষয় নির্ধারণ হয়ে থাকে। তবে বিষয় নির্ধারণী ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন 'একাল' নিলে আরেকজন নেয় 'সেকাল'। অথবা একজন 'নারী' ও অপরজন 'পুরুষের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে 'নারী বড়' না 'পুরুষ বড়' অথবা 'কে উত্তম' বা 'কে অধম' তা কবিগানের মাধ্যমে যুক্তি, তর্ক ও পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে নিজকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টায় রাতভর উভয় কবির মধ্যে ছান্দিক যুদ্ধ চলে। কবিগানের বিষয় অবশ্য অনেক কিছুই হতে পারে। যেমন একজন হিন্দু, অপরজন মুসলমান। অতীত-বর্তমান, দিন-রাত, স্বামী-স্ত্রী, দেশ-বিদেশ, স্বর্ণ-লৌহ ইত্যাদি।

কবিরা কবিগানের মাধ্যমে ছন্দোবদ্ধ আক্রমণ শানিয়ে নিজ নিজ বিষয়টিকে সর্বাগ্রে তুলে ধরে বিজয়ী হতে চায়। এভাবে একসময় একজনের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

**যেভাবে কবিগান শুরু :** পূর্বেই উল্লেখ করেছি কবিগান তার্কিক লড়াই। স্ব স্ব বিষয়কে উপজীব্য ও কেন্দ্র করে বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়ার অপ্রতিহত লক্ষ্যে কবিরা কবিগানে অবতীর্ণ হয়। উভয় কবির পক্ষে থাকে ৪ থেকে ৬জন দোহারি। এদেরকে বাইন দোহারি বলা হয়। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে থাকে ঝাঁজ, জুরি, ঢোল, হারমোনিয়াম ও তবলা। বাইন দোহারিরা কবির গান ও নৃত্যের তালে তালে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সমস্বরে দোহারি গায়।

যেমন :-

বাইন দোয়ারদ্দি ন আইস্য তুই নিশির কালে
মা বাপরে লাগায় দিব মাইনষে দেখিলে।।

অথবা

"তোরা দেখবি যদি আয় ... হায়রে দেখবি যদি আয় ...
সোনার মানুষ বিরাজ করে মাটির পিঞ্জিরায়"...

অথবা

রাত নিশিতে নু আইস্যো তুই বাড়ির পিছন তি. ইত্যাদি।

এক কবি প্রথমে আসরে ওঠে বন্দনা শুরু করে। মুসলিম হলে আল্লাহ এবং রসুল পরে ওস্তাদ ও দেশের বন্দনা গেয়ে ধীরে ধীরে মূল বির্তকে চলে যায়। হিন্দু/বৌদ্ধ হলে প্রথমে মানশীষ এবং দেব দেবীর বন্দনা ও নান্দীকীর্তন সহযোগে নির্ধারিত বিষয়ে অগ্রসর হয়। কবি নিম্নরূপভাবে শুরু করে যেটা পয়ার অথবা ত্রিপদী ছন্দেও হতে পারে।

www.pathagar.com

যেমন :
প্রথমে বন্দনা করি পাক নিরঞ্জন
বহু যত্নে গড়িয়াছেন এই ত্রিভূবন॥
সৃজিয়াছেন দয়াল তিনি আসমান জমিন
সৃজিয়াছেন দয়া করে রাত আর দিন॥
আকাশ পাতাল আর গ্রহ তারা চাঁদ
পাহাড়, পর্বত নদী সাগর সাক্ষাৎ॥
বৃক্ষপালা তরুলতা মানব দানব
সৃজিয়াছেন দয়াময় দয়াতে এসব॥
তাহার মহিমা বর্ণে নাহি মোর শক্তি
নূর নবী দোস্ত তার তান পদে ভক্তি॥
বন্দি সেই নূর নবী দু'জাহান আলো
ইসলাম ধর্ম বন্দি জগতের ভালো॥
বন্দি মাতা, বন্দি পিতা বন্দি গুরুজন
যাঁদের প্রভায় আত্মা হইল রৌশন॥
তারপরে বন্দি আমি নিজ জন্মভূমি
সুজলা সুফলা ভূঁইয়ে পূর্ণরত্ন চুমি॥
উত্তর দক্ষিণ বন্দি পূর্ব আর পশ্চিম
উর্ধ অধঃ বন্দি তথা অনন্ত অসীম॥
সকল বন্দিয়া আমি আসর বান্দিলাম
নারী/পুরুষের ধারায় (নারী হয়ে) আসরে নামিলাম॥

হিন্দু/বৌদ্ধ কবি হলে কবি গান শুরু করার পূর্বে মানশীষ ও মানশীষ গাওয়া শেষে আসর বন্দনা করে।

মানশীষ যেমন :-
ওমা তারা গৌ-ভবে দুঃখ হারা সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি তোমার (৩বার)
দুষ্ট পাকিস্তানে আর আমেরিকা চীনে বাঙালিরে প্রাণে মারে (৩বার) ঐ
বাঙালিদের বড় গর্ব, করিতেছে মুক্তিযুদ্ধ।
ও মুক্তি ভাইয়ের শক্তির বলে, পাঠান বংশ ধ্বংস হল (৩বার) ঐ

ত্রিপদী সুরে :
ওমা তারিনী মা হয়ে সন্তানেরে দুঃখ দিওনা (৩বার)
আদ্য স্বতী ভগবতী মা হয়ে সন্তানের কি গতিরে।
তোমার গান তুমি কর, উপলক্ষ এক জনা।
মা হয়ে সন্তানেরে দুঃখ দিওনা (৩বার) ঐ---
এভাবে মানশীষ শেষ করে শুরু করা হয় কবির বন্দনা।

প্রথমেতে ব্রহ্মদেবের বন্দনাটি শিরেতে উঠাই।
ব্রহ্মসামান্য নয়রে চর্তুবেদ চৌদ্দ শাস্ত্রে কয়।

www.pathagar.com

পদে তীর্থ হস্তে গদা মুখে অনল ভয়॥
ব্রহ্মশাপে সাত সমুদ্রের জল হল লোনা।
ব্রহ্মশাপে অহৌল্যা যে পাষাণ হইল॥
ব্রহ্মশাপে বলিরাজার পাতালে গমন।
ব্রহ্মশাপে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হল॥
ব্রহ্মশাপে কুন্তি দেবীর ছিয়াশি স্বামী হল।
ব্রহ্মশাপে দ্রোপদীর পঞ্চ স্বামী হল॥
কি বলিব শাপের এত জালা।
শচী রাণীর অর্দ্ধাঙ্গ হল কালা॥
এই পর্যন্ত এই বলিয়া
ব্রহ্ম দেবের কথা ইতি দিয়া যাই।
পিতা মাতার বন্দনাটি শিরেতে উঠাই॥
পিতা উপযুক্ত হলে ছেলেরে পড়ায়।
ছেলে উপযুক্ত হলে কা'বা শরীফ/গয়াকাশি যায়॥
গয়াকাশি যাইয়া ছেলে হাতে লইয়া কুশ।
একে একে উদ্ধার করে সপ্তম পুরুষ॥
পিতা মাতার বন্দনাটি রেহাই দিয়া যাই।
সরস্বতীর বন্দনাটি শিরেতে উঠাই॥
এস মাতা সরস্বতী রইলেন কতদূর।
সরস্বতীর নিবাস জানম নামে শান্তিপুর॥
তোমার গান তুমি কর উপলক্ষ আমি।
পদভঙ্গ হলে মারে লজ্জা পাবে তুমি॥
সরস্বতীর বন্দনাটি ইতি দিয়ে যাই।
ওস্তাদ গুরুর বন্দনাটি শিরেতে উঠাই॥
ওস্তাদ আমার বরকেতা গাইন ঈদগাঁওতে ঘর।
দেশ বিদেশে খ্যাত তিনি কবি বাহাদুর॥

উপর্যুক্ত বন্দনা শেষে কবি তাঁর মূল বিষয় নিয়ে আসর মাতিয়ে তুলেন। শত শত দর্শক আনন্দ-উল্লাস চিত্তে উপভোগ করে কবির গান। কবির কণ্ঠে বহুল উচ্চারিত দু'টি পদ নিচে উল্লেখ করা হল :

কবি অপর কবিকে বলেন :

কবি গাইতো আইস্যাস বেড়া বৈত আইন্যছ কি
তোর বাপ দাদার হাড্ডি আনগৈ চিয়ার বানাই দি॥
অথবা পুরুষ নারীকে লক্ষ্য করে :
'অ' মাইলর ঝাঁউক্যা গাই, ঝাঁক যাবি বিলর মাঝে যাই
বলদে পাইলে যেমন তেমন, দ'রা (ষাঁড়) দিব পেট বাজাই॥ ইত্যাদি ইত্যাদি।

নসরুল্লাহ খোন্দকারের কাব্য ধরা যায়
জুলুয়ার ছলে ভিন্ন নারীর বদন।

www.pathagar.com

হাসি হাসি রতিভাবে করে নিরীক্ষণ॥
ভিন্ন পুরুষের মুখ দেখি নারীগণ ।
এক লাফে পাইল যেন সর্গের দর্শন॥
মুখ কটি হাসিয়া চঙ্গু বাঁশ তুলি ।
মনপুরী হরে নিতি রতি রসে ভুলি॥

প্রাচীনকাল থেকে যে নারীর প্রথম ঋতু দর্শনে আচার অনুষ্ঠান করা হতো তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে শরীয়তনামা কাব্যে

কুমারীকে কেহ যদি ছোঁয় পুষ্পাকালে ।
কত সন্ধ্যা উপাস রাখয় তিরি কূলে॥
কুমারীকে কেহ যদি ছোঁয় পুষ্পাকালে ।
সেনান করিতে দুষ্ট সক্কলেরে বলে॥
পঞ্চ কিবা সপ্তদিনে লই খেলাচ্ছলে ।

কবিগানের যন্ত্র হিসাবে হারমোনিয়াম, ঢোল, বাঁশি, জুরি, বেহালা ও খোল প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় । সাধারণত গায়ক বা গায়িকা নিজেই বেহালা বাজিয়ে এ গান শুরু করে । কবিয়াল পায়জামা, পাঞ্জাবি, চাদর গায়ে জড়িয়ে নৃত্য করে করে পরিবেশন করেন ।"[২৮]

## ঙ. ভাটকবিতা

কোনো ঘটনা বা প্রেমঘটিত কর্মকাণ্ডকে উপজীব্য করে একটি ভিন্নমাত্রিক সুর ও ছন্দের আশ্রয় নিয়ে কবিরা যে উপাখ্যান তৈরি করে এবং তা বাজারে বা কোনো লোকসমাগম স্থলে আসর জমিয়ে বিক্রয় করে তাকে বলা হয় বাজারি কবিতা বা কবিতা কাহিনি বা পথকবিতা বা ভাটকবিতা । হাট-বাজারে, লঞ্চ-স্টিমারঘাটে বা জনবহুল স্থানে এসব কবিতা পঠিত হয় বলেই স্থানীয়ভাবে এই কবিতা পথকবিতা হিসেবেই বেশি পরিচিত । স্বল্পশিক্ষিত বা এক শ্রেণির কবি এসব কবিতা রচনা করেন । এসব কবিতা বাস্তবতার নিরিখেও তৈরি করা হয় । এসব কাহিনিমূলক কবিতা রচনা করে বিশেষ ভাঁজে মুদ্রণ করে কবি'রা জেলার বিভিন্ন জনবহুল স্থানে, হাটে-বাজারে, গঞ্জে-বন্দরে, বাস-ট্রেনস্টেশন, লঞ্চ-স্টিমারঘাটে আসর জমিয়ে বিক্রি করে থাকে । কবিতা বিক্রি করতে আয়োজন করে আসর করতে হয় না । নির্বাচিত স্থানে সুউচ্চ স্বরে সুর করে যখন কবি কবিতা পাঠ শুরু করেন তখনই চারিদিকে ধীরে ধীরে লোক জড়ো হতে হতে 'কবিতা পাঠের' আসর জমে যায় । রসিক কবি কবিতা পড়ার পূর্বে কবিতার রোমান্টিক কাহিনি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে দেন এবং রকমারি সুরের আশ্রয় নিয়ে কবিতা পাঠ করতে থাকেন । এ কবিতা একজন কবির পাঠের চাইতে দু'জন কবি পরস্পর লাইন করে গাইলে আরও সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং মনোমুগ্ধকর হয় । এ কবিতা পাঠে কোনো যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয় না । তবুও সুন্দর মার্জিত ও রুচিসম্মত পাঠ প্রদান করার জন্য হারমোনিয়াম ব্যবহার করা যায় । পয়ার ছন্দে রচিত এসব কবিতার প্রচলন মধ্যযুগ থেকেই দৃষ্ট হয় ।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষিত লোকদের কাছে এসব পথকবিতা বা ভাটকবিতার তেমন একটা কদর নেই। গ্রামাঞ্চলে স্বল্পশিক্ষিত ও সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকদের কাছে এ কবিতার গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি এবং এটা প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। পূর্বে এসব কবিতার বইয়ের মূল্য ছিল এক আনা কি দুআনা। বিগত ৮০ দশকে এসব পথকবিতা বা ভাটকবিতা দুই টাকা বা তিন টাকায় বিক্রি করা হতো। বর্তমান বাজারে ৪/৬/৮ পৃষ্ঠার ছাপানো কবিতা ৮ থেকে ১০ টাকায় বিক্রি করা হয়। স্বল্পমূল্যের কারণে এসব কবিতা খুব দ্রুত বেচা-বিক্রয় হয়ে থাকে। ক্রেতারা মনে করে একটাকা দিয়ে একটা কাহিনি ক্রয় করে নিলাম। অশিক্ষিত লোকেরাও শুনতে শুনতে মুখস্থ করে অনেক সময় গাইতে থাকে এ কবিতা। এ কবিতা-কাহিনিতে মূলত তিনটি ভিন্নমাত্রিক সুর উচ্চারিত হতে দেখা যায়। ধুয়া, পয়ার এবং ত্রিপদী। কোনো কোনো কবিতায় ভঙ্গ ত্রিপদী সুরও দেখা যায়।

এই জেলার কবিতা কাহিনি রচনায় প্রথিতযশা বেশ ক'জন কবির নাম জানা যায়। তাঁরা হচ্ছেন, চকরিয়া উপজেলার কবি আবদুস সোবহান, সদর উপজেলার কবি ছাবের আহমদ, আহমুদুর রহমান, রামু উপজেলার কাউয়ারখোপ নিবাসী কবির আহমদ, উখিয়া উপজেলার কবি আবুল খাইর পণ্ডিত প্রমুখ। আরও অনেক নাম না জানা কবি আছেন। তাঁরা ছড়িয়ে আছেন জেলার বিভিন্ন স্থানে। জেলার কবিদের লেখা অনেক কবিতা-কাহিনি রচিত হয়েছে। এ ধরনের উল্লেখযোগ্য ক'টি কবিতা হচ্ছে, 'আনর আলীর দুঃখের কবিতা', 'নুর জাহানের কবিতা', 'রেঙ্গুনের ডামিশের কবিতা', 'ডিসকো বিবির কবিতা', 'টেড়ি বেড়ির কবিতা', 'গুনাই বিবির কবিতা', 'জরিনা বিবির কবিতা', 'তুফানের কবিতা', 'শফিউল্লাহ হত্যার কবিতা' ইত্যাদি ইত্যাদি। কবিতাগুলোতে মূলত সুর ও ছন্দ একই।"[২৯]

**সংগৃহীত ভাট কবিতা-২**
**আল্লাহ্-আকবর**
**বাংলাদেশজিন্দাবাদ**

**দেল দাওয়াই কবিতা**
**চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত বই পরায়ণ**
**পণ্ডিত মরহুর আলহাজ্ব আমজাত আলী**
**সিকদার সাহেব প্রণীত।**

**এই বই স্বতাধিকারী**
**মৌলানা আলহাজ্জ মোহাম্মদ ছলিম উলাহ**
**ঈমাম ও মোতাওয়াল্লী**
**পূর্ব বড় ভেওলা সিকদার পাড়া আমজাদিয়া**
**জামে মসজিদ**
**পোঃ-সিকদার পাড়া, থানাঃ- চকরিয়া**
**জিলাঃ- কক্সবাজার।**

www.pathagar.com

*** আমার বিনা অনুমতিতে এই কেতাব কেহ্ ছাপাইবেন না।**
**৪র্থ সংস্করণ মূল্য– ১০ টাকা।**

## [দেল দাওয়াই]
### এলাহির তারিফ।

এলাহী আলামীন আলা আজব্ শান কোদরুতে করিলে পরদা, দোজাহান।
সাজাইলে জমি খোদা, কোদরুতেআছমানে কি খুবি, দিলে হেক্‌মতে।
বেহেস্ত সৃজিলে খোদা, আদরে আশা করি দেখা দিবা বান্দারে।
দোজক সৃজিলে খোদা কহরে করিতে আজব শাস্তি পাপীরে।
মালেক্ তুমি বান্দা তোমার আমি সব বেহেস্ত ও দোজখ তোমার তুমি রব্।

### তারিফ নবি (দঃ)

আছ্‌মানে শোভিত নাম আহম্মদ পড় দরুদ্ দুনিয়াৎ নাম মোহাম্মদ।
নিজ নুরে, পয়দা করে প্রথমে পুষিদা রাখিলে খোদা করমে।
হে নুরে কোদরূতের জোরে নিরঞ্জন। সকলি করিল পয়দা ত্রিভুবন।
কলেমা তৈয়বে লাগা নাম যার। দরুদ সালাম পদে বেসুমার

### নছিমত

কে আয় গাফেল শুন জররা নছিমতবেকামী জিন্দেগী বৃথা খোব্ ছুরত।
জোয়ানী থাকিত যদি চিরদিনযৌবন অমূল্য হৈতঃ অলেকিন।
আছমানে জমিনে ভব সিন্ধুক ঢেউএ বিপদে খোদা সব কু পানা দেউক।
আক্কল গলাইয়া ধৈর্য্য মাঝি চাইডুবিব ডুবিব ডিঙ্গা মাঝে যাই।
সাক্ষী দুজন কেরামন কাতেবীন্ যানমন্ মাঝি ইমানের জোরে সাবধান।
মোহাম্মদী অজুদ বান্দার সুলক্ষণ ইমান্ ভরা পুরাপুরা তেকারণ।
যৌবনে লালচে আমল্ না থাকেইমান যাইতে বান্দার অজুদ চমকে।
পানা মাগ খোদার কাছে দিবারাৎইমান দৌলত আসল দৌলৎ দুনিয়াৎ।
শয়তানি ফেরবে যানি বাঝিলে মজা মজা লাগে মজা না মিলে।
নফ্‌সের খাহেসে করি বুরা কামমজিলাম মজিলাম ভবে মজিলাম।
চোরে চুরি করে পরি লালচেমশার মুখে থাবার ভয় নাই পেয়াছে।
আসল কথা যার মনে নাই খোদার ডরকি করিবে মছিহতে ডুবি মর।
আলেম ওল্‌মা মৌলবী মাওলানা হইলালচির বান্দা কিতাব মতে চলে কই
জাহেরা কিতাবের কথা জবানে হিলা সাজি ফেরব বাজি গোপনে।
বড়ে বড়ে মিশামিছি সংসারে গরীব দুঃখ্যার তাম্বি তালাস কে করে
আগের লোকের কলব সুদ্ধ ছিল তায় সুতা কাটি দিঘী দিত জননায়।
বর্ত্তমানে হেকমৎ জানে আদমীআজব কারখানা কাণ্ড গুম্‌গুমী।
পূর্ব্বকালে দেলের হেকমৎ জানিতদৌলৎ ফেলাই দেলের চেষ্ঠা করিত
শীতে সুতে মরি যারগই গরীবগণ দৌলৎ দৌলৎ করি মরে দৌলৎ মন্দ।

www.pathagar.com

খাইৎ না পারি বুড়া বুড়ি জানে মইলবউয়ের কথায় দরদের পুত জুদা হইল
পুতে বউয়ে বলে মোরা কি করি বহুত বুজ্জি বুড়াবুড়ীর রাগ ভারী।
এ সব কথা কে বুঝিবা বুঝনাতার ঠেলাদি তে ডুবাইদের জমানা।
চলন্ ফিরণ খেদমত খাদিম নজানি পুরুষের মন না পাই মরের কামিনী।
দেখ একবার মদরচ্ আর স্কুলের পড়িতে যাই শিশুগণে কি পড়ের।
জালিমের জালেমী চমকে জোলমে বেকুপের বেকুফী বাড়ায় বেদোমে।
বেশী চালাক্ জানের হালাক ডাকে কয়, কম চালাকে পৈল বিপাকে মিছা নয়
মধ্যম রাশি চৈল্যে বাঁচি, বিপদেএই কথা লেখা আছে ছনদে।
খোদার জিকির নিজের ফিকির আজমী এক্ দেলে মন হক্ হালালে খোসনামী
হয়ে বান্দা পরের নিন্দা চচ্চিলেপাপের ভর্ত্তী মিলে পূণ্যের বদলে।

## নফ্স ও দিল

দিলে নফসে সদায় বিবাদ ফরছোৎ নাই দুই জনে দুই পথে টানে লাভ দেখাই
দিলে কহে পাপ না করিস মিছা কই নফসে বলে মোকৰ্দ্দমা যাবেগই।
দিলে কহে পরের দৌলৎ পরের হক নফ্সে বলে কারি আন্ বেশী হৌক।
দিলে কহে মরিতে হবে সবী নফসে বলে না মৈলে তুই কি খাবি।
দিলে কহে এ জিন্দেগী বেকামী নফসে বলে এ দুদিয়াৎ কি কামী।
দিলে কহে হিসাব হবে হাসরৎনফসে বলে হিসাব কিতাব জাহামৎ
দিলে কহে না করিস মন বদমাসী নফসে বলে একামে তোর চাবাসী
দিলে কহে পরের স্থাব্য হুসিয়ার নফসে বলে হাতে আস্যে নদিস্ আর।
দিলে কহে খোদা সেওয়া আশা নাই নফসে বলে হাজৎ মাগ পিরের ঠাঁই।
দিলে কহে পরের নারী জেন্ মাতা নফসে বলে নামরদের কি কথা।
দিলে কহে নিশা খুরি ভাল নয়নফসে বলে নিশা খাইলে দিশা হয়।
দিলে কহে নামাজ, পড় দের আজাননফসে বলে আর খানিক্ষণ হোঁক্কা টান।
দিলে কহে রাত্রে উঠি নামাজ পড় নফসে বলে লেপ তোযকতঃ শীতল হব।
দিলে কহে জুমা জমাৎ না ছাড়িসনফসে বলে কাম পিছ ফেলাই না মরিস।
দিলে কহে সবর কর এক্তিয়ার নফসে বলে আগে তারে জুতা মার।
দিলে কহে কছাদ মিঠোক হাতে ধরনফসে বলে ইজ্জৎ হুর্ম্মৎ থইলা ভর।
দিলে কহে হারাম হালাল খবরদার নফসে বলে আগে জলদি মজা মার।
দিলে কহে শরার বাহির না চলিস নফসে বলে লাভের হিচ্ছা না ছাড়িস।
দিলে কহে না করিও ফেরবী নফসে বলে ফের ব নৈলে মরিবি।
দিলে কহে সুদী কাজে তৌবা কর নফসে বলে সুদের ফলে তোয়াঙ্গর।
দিলে কহে লাল্ছির বান্দা গেরেপ্তার নফসে বলে লালছির ফলে রাজ্য পার।
দিলে কহে ভাল কথায় দিয় কাননফসে বলে একথা যার সাৎপিস্তান।
দিলে কহে যোগাসনে ধ্যানে সার নফসে বলে কে করিবে এ কারবার।
দিলে কহে নমাজ কাম আখেরের নফসে বলে ফলানাতঃ না পড়ের।
দিলে কহে পতি সেব মন লাগাইনফসে বলে সোণা রূপার কাচা নাই।

www.pathagar.com

দিলে কহে তালাক দিও মোহর দি নফসে বলে কি মোহর লেঃ বাঁদির ঝি
দিলে কহে ভিন্ন পুরুষ সতীর কাল্ নফসে বলে কোনে ন খার দ্বিঃচার গান
দিলে কহে জেনা করা মহা পাপ নফসে বলে তৌবা কল্যে হবে মাপ।
দিহে কহে জানি তৌবা কবুল নাইনফসে বলে না জানিলে বাঁচি যাই।
দিলে কহে জানা চাহি খবরদার নফসে বলে এত কথার কি দরকার।
দিলে কহে জলদি জলদি তৌবা কর নফসে বলে এখন তৌবা ছান্নে ডর।
দিলে কহে অক্তর নমাজ হারাবিনফসে বলে কজা পড়িৎ পারিবি।
দিলে কহে নমাজ বেহতর মিনান্নউম্ নফসে বলে না ভাঙ্গিও মজার ঘুম।
দিলে কহে সারিৎ পাল্যে কি খয়রাৎনফসে বলে আয়েৎ দেখ অজুযাৎ
দিলে কহে খোদার কাম কর মন লাগাইনফসে বলে পুৎ ঝিঃ পাল মাটিখাই
দিলে কহে বেশী না লইস্ খাজানা নফসে বলে না ছারিস তোর পাওনা।
দিলে কহে না ঠকাও পররেনফসে বলে এক আদমজাত খাইত পারে
দিলে কহে মা বাপ ফেলাই না বান ঘরনফসে বলে নিজের চেষ্ঠা নিজে কর
দিলে কহে জুদা হইলে বড় দোষনফসে বলে একা খাইলে দিল মন খোষ
দিলে কহে নামাজে মন রুজু থাউকনফসে বলে গরু ছাগে ক্ষেতি খাউক।
দিলে কহে রোজা রাখ নিয়তে নফসে বলে না পারিব মিন্নতে।
দিলে কহে কলেমা পড় ইললাহ্ নফসে বলে কালে পরগ্য আজ না পাইল্যা
দিলে কহে হজ্ব করগই মক্কা যাইনফসে বলে বিবাহ করগই সুন্দর চাই।
দিলে কহে নফসের কথা না ধরিসনফসে বলে মোরে ফেলাই না মরিস।
এছুরতে দিলের সাথে হামেহালনফসে আম্মারায় করে কুখেয়াল।
নফসের সাথে আসনাই রাখে সমজনে ঈমান দৌলত লুটে বন্দায় না জানে।

## শরিয়ত

শরীয়তের সরা মতে চলিও কোরাণ হাদীসের কথা মানিও॥
কলমা তৈয়ব পড় সবে একিনে জবানে আর দিলে মিলাই ঈমানে
পাহলা ঈমান আন খোদা এক দ্বিতীয় ফেরেস্তা বহুত জানিবেক।
তৃতীয় কেতাব খোদাই ব্যবস্থার চতুর্থে রছুল যত অবতার॥
পঞ্চমে আখেরর কথা সত্য যারশশমে তকদিরের লিখা যেই যার॥
সপ্তমে মউতের পরে জিন্দা হই এন্ছাফ হইবে আমল নামা লই।
এসব ঈমানের কথা মূল্যবান নাজানিলে নাহবে সে মুসলমান॥
কলমা নামাজ রোজা সকলে যতনে আনও বন্দা আমলে॥
হজ্ব আর যকাত সে দৌলত মন্দ কর আলায় আদেশ দিছে নিরঞ্জন
পুরাপুরী মোছলমানি হাকিমত আলেমে জিজ্ঞাসি চলে অবিরত।

## এস্ক

এস্কের কথা মনে ব্যথা কি বলিম। ছাদেকী ফাছেকী এক্ষ দু কিছিম॥
ছাদেকের হাকিকী এস্ক বা খোরী। ফাছেকের বরবাদী এস্ক খরাবি॥
হক মাসুকে মন মজাইলে হাকিকী নকল মাসুক সদায় অসুখ ফাছেকী

www.pathagar.com

এস্ক শিক্ষা দুই রকমে জাননী। জাহেরা মেজাজী গোপ্তে বাতেনী
আশেকের দিল মাশুকে মিল যদিসেএক হইলে খোরাক হাছেল কোশেখে
আসকের দিল মানুষকে মিল্ যদি সে। এক হইলে মুরাদ হাসেল কে শেষে
আওলিয়া আম্বিয়া যত বুজরগান ।এস্ক বাতে নিতে হাসেল ছিল জান
জাহেরা মেজাজী এস্ক ফনাই। বাতেনী হাকেমী এস্ক বকাই॥
মেজাজি দেল টিক হই গেলে আকিদায় হাকিকতে মিলিবে দিল বেখড়কায়
পহেলা দিল রুজু হৈলে বর্জ্জ খে। আসেকের হাল মালুম হবে মাসুকে॥
এক দিল সেওয়া ছুদিল হওয়া নাদানী কি হাসিল হইলে আছর শয়তানি॥
এক দিল আসেক হক্ মাসুকের পেয়ারা দিনে দিনে মিলিবে মন জহুরা॥
আসকের দিল গলি জ্বলি হৈলে ছাইমিশিবে মাসুকের সঙ্গে জোষে যাই
তোমার মধ্যে তুমি না রহিবে আর মাসুকে মিশিয়া হবে এক আকার।
আসেক মাসুক এক ছেলে সুখ হামিসা কি কহিব আজব আজব তামাশা॥
এস্কের জোযে মিশাল দেলতঃ গলেনানা গলিলে মাসুকে দিল মিছে না
এস্ক শুঃলা এমন জ্বিলা সেঃশুলায়। শেওয়া মাসুক বাকী সব কুচজ্বলি যায়
জ্বলি ভষ্ম গলি রসে সকৌতুক। মুরাদ হাসিল মৌজুদ ঐ মাসুক॥
সাদকের হাকিকি এস্ক গোপনে। সে এস্ক বর্ণিব বল কি গুণে॥
আসকঃ মাসুকের ইঙ্গিৎ পরস্পর। কেরামন আর কাতেবীন্ কু বেখবর
যোগ্য গুরুর কাছে এস্কের মামেলা। না শিখিলে খাবে শেষে কানডলা।
মেজাজী আমলে দেল তুই মুছাফের মুকিমী খাসলৎ নগেল তুই দেলের।
না দেখিছ কি করিছে দিওয়ানা। শামা পড়ে ঝাপদিগয়ে পরওয়ানা॥
এস্ক মেজাজির ফলে মকাফাৎযাওরে যাও গুন্দুমে গুন্দুমে ভবিষ্যাৎ।
মেজাজিতে শিক্ষা কর দেল দারী। না শিখিলে মিশিবে দেল্ কি করি॥
এস্কের পথে কদম দিতে খবদার। মঞ্জিলে মঞ্জিলে আছে বাটোয়ার॥
জানি মহব্বতের জলে তরতিবে। অজু গোছল সেওয়া হাসিল কি হবে।
মজার এস্ক জিনি মেস্ক সুগন্ধি। ধন্য ধন্য এস্কেতে যার পাঃ বন্ধি॥
মায়া জালে এস্কের ছলে বাহানা। এ হালে দিল কিছু হাসীল হবে না॥
রঙে দিলো না মিলিলে দিলে দিল। এস্কের ধুক্ষা বিষম খটকা বেহাশীল।
দিলের উজির আক্কাল চালাক চতুরিৎ ।রঙে দিলে মিলাই ফেলে মেজাজিৎ
মাসুকের জ্যোতিঃ ছায়া কোসশেশে। মিলে যদি ঘুরি ফিরি তালাসে॥
তবে জানি মহব্বতের মারে জোষ। ছুটীবে দেলেরী ফরামসী দোষ॥
দরিয়াতে ডুম্বদি ডুবালে জান। রতন মুকুতা তোলে মূল্যবান॥
জঙা মর্দ্দে ঝাপদী এস্ক দরিয়ায়। রত্ন মুক্তা জিনি আমুল মাসুক পায়।
কলে পালে ডিঙ্গায় চড়ি দৌলৎমন। ঐ পারে বেপারে পায় বহুত ধন।
মায়া সিন্ধু পার হই গেলে কোশেষে। মিলিবে মাসুকী মেওয়া তবে সে॥
কহি শুণ মেজাজী এস্কের হাল। আসকী কাহিনী নমুনা মেছাল॥
জুলেখা বাদশার বেটী মগরিবের। স্বপনে মজিল এস্কে ইউছুফের॥
নাজুক বদনে নাদি জেওরাৎ। হাতে পায়ে জিঞ্জির দিল কদখানাৎ

www.pathagar.com

মাসুখের ইঙ্গিতে রাজার কুমারী। মিছিরে হইল এস্কের ভিখারী॥
লুটাইয়া এস্কের পথে দেল দৌলৎমাসুকে কিনিল এস্কের বাজারৎ॥
দিলে কবুল মাসুকের খাদিমী। এস্কে পছন গোলামের গোলামী॥
দিদারে বহুত বাড়ে মহাব্বত। জুলেখা ইছুফে রাখে নজরত॥
মাসুকের দিল কেমন কঠিন জাননি। কাঁদি কাঁদি জুলেখার গেল জোয়ানী
সপ্তম খানা আদি নানা কৌশলে। মাসুখের দিল সহজেতে না টলে॥
মিছিরের হাছদি নারীর বাঞ্জনায়। খোদা রাজি রক্ষা পাইল তরুঞ্জয়॥
জলে ভিজাই অগ্নি সিজাই বারে বার করিল পরীক্ষা এস্কে জুলেখার॥
এস্কে মরে এস্কে জিরে এস্ক বাজ। না গণে আশকে কলঙ্কেরী লাজ॥
কে না জানে জুলেখার কাহিনী। কোরানে কহিছে খোদা আপনি॥
লিখা ছিল যেই মত তকদিরত ইছুফে পাইল সাহী মিছিরত॥
পুরা হৈল এস্ক দপ্তর জুলেখার। মিলিল ইছুফ মাসুক ঐ দিলদার॥
এস্কে জ্বলি এস্কে গলি দিলে দিল। তবে সে মাসুকের সঙ্গে হৈল মিল॥
সীরি খসরু লায়লী মজনু এস্কের গীত দেল সারিন্দায় আশকে গায় মেজাজীত।
এস্কে দিলদেওয়ানা করে বুঝিনু। লায়লী লায়লী করিক এস মজনু॥
বাঁচে বেহাশীলে আসেক কি করি। মৈল ফরহাদ কপালতে বাইস মারি॥
আসকে দিল এমন করে মস্তিওয়ার। সেওয়া মাসুক জায়গা নাহি দেলে আ
এক দিলে হাছেল এস্ক একদিক চাই। কাজল দিগে চক্ষেছুরমার জায়গা নাই
ফুলে বুল্ বুল যাবে তছবিহ জবানে। দিগে আশেক মাশুকের নাম স্মরণে
জলে পদ্মা রাখে কোস্তি আকাশে। আশেকের এয়াদে মাসুক বিকাশে।
আশেকে মাশুকে মিলে জলদিজান। এয়াদের নিঃশ্বাসে সুতে যারি টান।
বসন্ত কুকিল ভোমর নমুনা। মাসুকের খেয়াল আশেক দেওয়ানা।
দিল ঠিক নাই যার কি ঠিক আছে জাহানতবেজইত টা ক্কায়ার নাল ছিড়ি যায় মালঘরত।
যে জানে না জানে এস্ক জাহেরা কি জানিবে গোপ্ত প্রেমের মাজেরা॥
মেজাজিতে শিখিলে দিল কছরত। মাশুকে মিলিবে বেগর মছিবত।

## হাশর

শুন অল্প কথা হাশরের কলেজা কাঁপিছে ডয়ে যে অক্তের
প্রাণ যবে আজ রইলের কবলে। হাওলা করিয়া নিবে আজরাইলে॥
আদরের পিঞ্জরা কায়া বেখবর।ইষ্ট জ্ঞাতি আদেশ দিল দফন কর॥
এইত আখেরী সীমা জিন্দেগীরকি কামে আইলবন্দা নাবুঝির॥
সবে দিলি মাটি দিলা যত্তনে দেখি শুনি ভুলি গেলা কেমনে॥
দেখ বন্দা কত ধান্ধা করিলা। জর্‌রা দৌলত সঙ্গে নিতে নারিলা॥
এবে বুঝি খোদার বন্দা জানে মইলনফস আম্মারার খাহেশ খতম হইল।
আশা ছিল বহুত আছে আয়ূ খেল। চক্ষের পলকে হায়াত ফুরাই গেল।
কোটী কোটী কোটী কোটী সম্পত্তি। ফেলাই গেলানা খাটিল আপত্তি॥
ইষ্ট জ্ঞাতি নাতী পুতী পুত্র ঝি। না নিল আদরের আওরত নিবে কি

সীদা মাটি গর্জে উঠি দিল চাপ । খোদা খোদ খোদা করিম কর মাফ ।
কাসাই দৌলত ফেলাই গেলা জাহানত ফেরেস্তা বাজাইল খটকা কবরত ।
কবরের ভিতরে বন্দা এ খেলা । ইষ্ট জ্ঞাতি ছাড়ি সৃতি রইলা॥
ভাল মন্দ যে করিলা পৃথিবীতে । জর্রা জর্রা হিসাব হবে ঐ পুরিত॥
আমল শুদ্ধ সর্ব্ব সিদ্ধি হবে তার । ময়ুতে কবরে কেয়ামত আর॥
বন্দা গণে বুঝে মনে এই মত । বহু দুরে আছে হাশর কেয়ামত॥
শীঘ্র যাবে ফাকী দিয়া জমানা । দেখা দিছে কেয়ামতের নিশানা॥
শিঙ্গা মুখে যদি ফুঁকে ইছরাফিল (আ.)তখনি বুঝিবা বন্দা কি মুস্কিল॥ ।
আছমান জমিন যবে ভাঙ্গিয়া । নারবে পর্ব্বত মানুষ ধরিয়া॥
সকলের উপরে হবে অবস্থারহিবেনা আলার পেয়রা ফেরেস্তা॥
ফানা হবে খোদার সৃষ্টি শুন্যময় । একেলা রহিবে বাকী দয়াময়॥
আছমান জমিন খোদা পূর্ণব্বার । কুদরতে করিবে পয়দা চমৎকার॥
আজব হেকমতের জোরে খোদারব । জমি হইতে উঠাইবে বন্দা সব॥
কামি হাডিড যেই স্থানে আছে যার । তথা হতে উঠাইবে কর তার॥
খতা খুতা আইবের কথা জাহানতকি করিলা জাহের হবে হাশরত ।
যাহার আমলে তেমন ছুরতে । হাশরে উঠিবে বন্দা কুদরুতে॥
নেগ আমলের ফলে কেহ আরামে । পাপের দোষে কেহ আজাব ছিড়িয়ে
গোপ্ত গুণাহ্ জাহের হবে কি করিসসরলে ছিড়িয়ে কারে কি বলিস॥
খোদার হকেক আশা করিম খোদার নাম পরের হকেক মহানস্কিল খোল বাম
তবে যদি আলাহ হাদী করে মাফ । কেমনে সহিব দারুণ সুর্যের তাপ ।
পর্বত প্রমাণ হবে কার পেট । ঢুলিয়া পড়িবে হই ওটা নাভীর হেট
কেহ হাটি কেহ লোটি হাম্বুরী॥ হাশরের ময়দানে হবে লরখরী ।
লহু পুজে মাটি ভিজে এমন দুঃখ । মছিবতে খোদা সবকু পানা দেওক ।
আরামের জায়গা নহে হাসরত । সুর্যের তাপে মাটি গরম তামার মত ।
বাপে না লইবে পুতেরী খবর । নফছি ফুকারিবে সব পয়গাম্ব (আ.)
সহায়তা নাহি কেহ এমন দিন । আদরের রমনী পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন॥
যেই ওক্তে খোদার দোস্ত মোহাম্মদ (স.) খোদা যারে দিল সুপারিশী পদা ।
পাপীর বন্ধু গুণের সিন্ধু হযরত । উম্মতি উম্মতি করে হাসরত॥
বহুত ব্যাকুল হইয়া নবিজী (স.) গুনাহ্ বখ্ শাইবে করি আজিজী ।
এত দরাজ দিন হবে হাশরের পঞ্চশত অব্দ এই সংসারের॥ ।
কত শত বৎসর হেন আপদে । রহিবে খোদার বন্দা বিপদে॥
তক্তে ভার দিবে রব্বুল আলামীন । সকলের হিসাবের ধার্য্য সেইদিন ।
ফাকী ফুকী না খাটিবে বাহানা । হাশরে হইবে হাকেম রব্বানা ।
আমল নামা লিখে নিচে ফেরেস্তায় । দেখিয়ে হইবে ধন্ধ এ বন্দায়॥
জরা হিসাব হবে হাশরত । কত্রা কত্রা তৌল ইবে মিজানত ।

www.pathagar.com

হাসরে বুঝিবা বন্দা কি কৈল্যা । আলেম ওলমার কথা না ধল্যা ।
কহি ছিল আলেম ওলমা সকলে । না ধরিয়া দুই হাত মারীর কপালে॥
নেকী যদি তৌলাইতে একজনরে । অল্প নেকী উণা ছিল বাজীল্ কর ।
দোজকের দুতে তারে ধাক্কাদি । দোজকে লই যাইতে চাহে জলদি॥
গুণাগারে কাঁদি কাঁদি কাতরে । কহিতে লাগিল দোজ দুতেরে॥
বহু আশা আছে আমার বেহেস্তের । খোদার দোহাই কর মোরে থোড়াদের ।
দুনিয়াতে বাবাজানে আমারে । লালন পালন কৈল্যা আদরে॥
প্রাণি দিত দুনিয়াত মোর বদলে । অল্প নেকি দিব আমি খুঁজিলে॥
ফিরিস্তা বলিল বেটা বলিস কি । হাসরে কাহারে দিবে কে নেকী॥
খোদার পক্ষে আওয়াজ হল তখনি । বাপের কাছে নেও তারে এখনি॥
হাসরের ময়দানে ডুরি ফেরেস্তার । বাপের নজ্‌দিকে তারে লৈয়া যায় ।
পিতা দেখি সজল আঁকি গুণাগার । কাঁদিল চরণে পড়ি বেশুমা॥
বাপে পুতে মোলাকাতে যারে যার । পিতা কহে কহরে পুৎ সমাচার॥
কাঁদি কাঁদি কহে পুত্র বাপকে । অল্প পূণ্যের লাগি যাইর বাপ দোজকে ।
যদি মোরে থোড়া পূণ্য কর দান । ভেহেস্ত পাইব সুখে বাবাজান॥
বাপে বলে অল্প পূণ্য উণা তোর । কি জানি কেমন হবে দশা মোর॥
হাসরেতে পূণ্য দিতে না পারিব । নফ্‌ছি নফ্‌ছি সবি নফ্‌ছি না বুঝির
পুত্রে পূণ্য না পাইলে বাপের ঠাঁই । মাগিতে লাগিল মায়ের কাছে যাই॥
অল্প পূণ্য দেও মাতা জননী । যাদু তোমার বেহেস্তের যাইয়ম এখনি
মায়ে বলে অল্প পূণ্যের লাগি তুই । এত ব্যস্ত কি হাল করিম বল মুই ।
এত শুনি গুণাগারে হাহাকার । পুতের কাছে গেল পূণ্য মাগিবার॥
পুতে ঝিয়ে অল্প পূণ্য না দিল । ইষ্ট জ্ঞাতি হৈতে নাউম্মেদ হৈল॥
ফিরিস্তায়ে বলে পাপী না পাবি । দোজখেতে চল এবে সেভাবি॥
গুণাগারে বলে থোরা কর দেয় । মাগিয়া চাহিব কাছে আওরতের॥
আমার জানের জানি দুনিয়াত । মিশিয়া থাকিত সদায় দিবারাত॥
সেই আমার আমি উহার জানের জানআশা করি অল্প পূণ্য দিবে দান॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া অতি কাতরে । কহিতে কাঁদিল হাসর ময়দানে ।
স্বামী বলে ভাগ্যের ফলে মলাকাত । অল্প পূণ্যর লাগি যাইর দোজখত ।
দুনিয়াতের মহব্বতের খেয়ালে । থোড়া পূণ্যে দেয় দুস্তির বদলে॥
আদরের আওরতে বলে স্বামীরে । জ্বালাইতে আইলা পুনি হাসরে॥
দুনিয়াতে সব পুড়ি খাইলা । হাসরের পূণ্য নিতে আইলা ।
দোজকের ফিরিস্তা শুনি এ সকল । বলে পাপী রক্ষা নাহি শীঘ্র চল॥
দুনিয়াত সবে কামাইর হিচ্ছাদার । খবর গিরি না করিবে মৈলে আর ।
ধাক্কা মারি ত্বরা করি ফিরিস্তায় । দোজকের তরফে তারে লিয়া যায়॥

www.pathagar.com

নাউম্মেদ হৈয়া পাপী গুণাগারে। ফরিয়াদ করিয়া বলে পরওয়ার॥
তুমি করিম তুমি রহিম চোবহান। পানা দেও পানা দেও রহমান।
তুমি খালেক তুমি মালেক তুমি সাঁই। তুমি বিনে গুণাগারের উপায় নাই।
তুমি মোরে কৃপা করি করতার। ভেহেস্তের ভিতরে দেও অধিকার॥
তবে বারি দয়া করি ফেরেস্তায়। আজ্ঞা দিল ভেহেস্তেতে লিয়া যায়॥
উনা পূণ্য দানে খোদা পাপীরে। উদ্ধার করিল নিজের আদরে॥
দেখ বন্দা হাসরের সীমানায়। মাগিলা না দিল পূণ্য এগানায়॥
সকল এগানা হৈতে এগানা। এলাহী আওলমীন মালেক রব্বানা॥

**: নিজের প্রতি ভৎর্সনা :**

কে আয় খাকী তুমি নাকী আদমজাত। চালাকী করিলে বহুত দিবারত।
মরি যাইতে সঙ্গে নিতে নিশানি। এমন কিছু গুপ্ত দৌলত রাখ্যনি॥
হায়াত চালাকী করি ফুরাই যার। আফছোছে মরিবা শেষে খবরদার॥
দুধে মিশে আমরে রসে চিকন চাউল। এ হালেতে হারাইব দোন কুল॥
পায়ে জুতি সাইনের ধুতি রুমি তাজ। কোট আচ্‌কানে সারিবানী মহারাজ
দামের চস্‌মা পকেট ঘড়ী লকেট চেন। পেটোলেন খোদা জানে কি করেন।
লেপ তোষকে শুতি সুখে দিনতঃ যার। লেটা বাজায় নারী সজাই কি দরকার।
কি বুকেছ না ভাবিছ পরকাল। ঝাড়ুমার ছি ছি নগেল এ খেয়াল।
মাত্র আশা এ ভরসা না ছাড়িম। মছিবতে রাহমতে তো করিম॥
কহে হীন আমজদ আলী অধমে। গুনাহ্ খতা বকশ খোদা করমে॥
চট্টগ্রাম চকরিয়া পরগনা। ভেওলা নিবাসী অধিন দেওয়ানা॥

**: মোনাজাত :**

সবে মিলি ছিনায় তুলি দোন হাত। সকাতরে মাগ ডরে মোনাজাত॥
বারে খোদা তুমি পয়দা করিলে। বন্দা মোরা গুনাহ্ ভরা বুঝিলে।
এয়া রব্বানা বখশ গুণাহ পরওয়ার তুমি বিনে বখ্‌শে কেবা সাধ্য কার
গোপ্তে বাস্তে নানামতে গুণাগার।জানা শুনা বহু গুনা আমবার॥
এরে বুঝি তুমি রাজী না হইলে। এতগুনায় বাঁচিবনা মস্কিলে
রহমতে বখ্‌শ গুণাহ বন্দারে। আমিনঃ আমিনঃ বলি কাতরে॥

**: নাতীর রচিত সুনাম ধন্য মরহুম নানা সাহেবের সুখ্যাতিঃ**

কহি শুন মোমেন গন মোর নিবেদনমম নানার কথা ভাইগণ শুন দিয়ামন
নানাজীর নাম জান আমজদ শিকদার। সোনার ধরণ অজুদ ছিল দেখিতে বাহার।
নানা নাম দার ছিল বড়ই পণ্ডিত। স্বদেশে বিদেশে তন নাম প্রকাশিত
মছজিদ পুষ্করিনী নিম্মান করিয়া বেহেস্তর বাসিন্দা হলেন খোদাকে স্মরিয়া
মহাকবি ছিলেন তিনি এজিলার মাজারধর্ম কাজে ছিলেন তিনি বড়দীলদার
নুতন বাহার এক পুথি প্রকাশিল। সংসারে মরিয়া তিনি অমর হউল।

www.pathagar.com

দেল দাওয়াই কেতাবহয় তাঁহার প্রণীতচির দিন থাকিবে তান নাম প্রকাশিত
যতদিন বাঁচি আছে সারাল সংসার। সুনাম জারী থাকবে ভূবন মাজার
একমাত্র কন্যা তার মন আম্মাজান। তিনি ছাড়া নানাজীর নাহি কেহ আর
তিন বিবী এক সঙ্গে রাখে ছিলেন। তিনি প্রথম রমনী জান মোর প্রিয় নানী
তাহার তারীফ আমি কি লিখিব আর চট্টলের মধ্যে তিনি ছিলেন নামদার
দীন ধর্মে ছিলেন তিনি আলার মকবুল দয়া ও দানের মধ্যে ছিলেন মাকুল
তান তরে দোয়া করুন যত মোমেনগণতব্কা বোলন্দ করে যেন প্রভু নিরঞ্জন
কহে হীন মোহাম্মদ ছলিমউলা নাম। পদের মধ্যে ক্রুটী পাইলে না করলে বদনাম।
সুবংশেতে জন্ম গ্রহণ করিয়া। আলার রাহমতে আছি বাঁচিয়া।
দুই হাত উঠাইয়া দরবারে খোদারআমার জন্য দোয়া কর যত ঈমানদার
মোছলমানের অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া নানাজীর রচিত পুস্তক দিলাম ছাপাইয়া॥

............................

বি:দ্র:-বারিতালা আমার হায়াত দারুস করোক। আমার অবর্তমানে এই কবিতার সত্ত্বা অধিকারী আমার ওয়ায়েছ সান ও আমার বড় তাই মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ ছৈয়দ নুর আমিন সাহেবের ওয়ারেছান সত্ত্বা অধিকারী।"[৩০]

**বিছমিল্লাহ**
**বাংলাদেশ জিন্দাবাদ**

**৯১ এর গোর্কি জলোচ্ছ্বাস**
**ও**
**তুফানের কবিতা**
**॥শ্মশান হইল সোনার বাংলা গণ কবরে,**
**ঘূর্ণিঝড়ে লাখো লাশ ভাসে সাগরে॥**

**রচনায়ঃ নাট্যকার মাষ্টার শাহ আলম (উখিয়া)**
**প্রকাশনায় : পণ্ডিত আবুল খাইর তর্কবাগিশ**
বাঙ্গালীর মুখ বেশী, শুন ভাইগণ কানভরি
কালবৈশাখীর তুফানের কথা খাবায় দিয়ম পেটভরি।

**মূল্যঃ- ২.০০ টাকা মাত্র**

বি:দ্র:-কবিতা নকল করিয়া ছাপানো আইনতঃ অপরাধ

তারিখ-৭-৫-৯১ ইং

মুদ্রণে : মজিদিয়া প্রেস, বাজারঘাটা, কক্সবাজার।

॥শ্মশান হইল সোনার বাংলা গণ কবরে
ঘূর্ণিঝড়ে লাখো লাশ ভাসে সাগরে॥

www.pathagar.com

ওহে দয়াল মৌলা ২ তোমার লীলা বুঝে কোন জন। সৃজন পালন কর, যার কি কারণ॥ তোমার আজব লীলা ২ বুঝবার বেলা, শক্তি আছে কার। দুস্টে দমন সৃষ্টে পালন তোমার অধিকার। তোমার লীলা খেলা ২ রঙ্গ লীলা জগতের পরে, ঝড় তুফানে লাখো লাখো মানুষ যায় মরে॥ মহিমার ধনিব তব ২ নিত্য নব দেখি সর্বদায়॥ দ্বীপাঞ্চল ভাসাইনিল নিষ্ঠুর দরিয়ার॥ বন্দি তোরে বিশ্ব প্রভু ২ আমি কভু করি নাই পুণ্য। তবু তোমার দয়ায় আছি এই ভেবে ধন্য॥ তোমার গুণের নাই উপমা ২ কি মহিমা করিব প্রকাশ। মন চক্ষু না থাকিলে হয় সর্বনাশ॥ সৃজিছ মানব গোষ্ঠী ২ দিছ দৃষ্টি সাজানো বাগান, সে বাগানে ফুটে ফুল মানুষ যে তার নাম॥ নরনারী সৃষ্টি করি ২ পাক বারি আগে নিরাঞ্জন। কুদরতের কৌশলে সাজালে ভুবন॥ স্বর্গ মর্ত্ত পাতালপুরী ২ আহামরি আসমান জমিন। চাঁদ সূর্য্য গ্রহ তারা আরো রাত্রি দিন॥ নদীর তীরে মন্দা বায়ু ২ বাড়ায় আয়ু, মাঠে ফলে ধান। নানা শষ্যে বেড়ে ওঠে মানবের বাগান॥ সকলি মানুষের তরে ২ সৃজন করে দিয়েছেন গো-যাই। হায়াত মওত রিযিক দৌলত নির্ধারিত তাই॥ মোহাম্মদ মুস্তফা নবী ২ নুরের ছবির জগতের আলো॥ ইসলাম ধর্ম দিয়া ভাসিয়াছেন ভালে॥ পরে সেই নবী বন্দী ২ ইসকে ফন্দি, দরুদ হাজার, উস্তাদ গুরু শিরে বন্দি আমি গুনাগার॥ বন্দি আমার সোনার দেশ ২ পরিবেশ অতি পরিপাটি। মধুর চেয়ে মিষ্টি আরো সোনার চেয়ে খাঁটি॥ সবুজেতে তরুলতা ২ মনের কথা যায় প্রকাশিয়া। পাহাড় পর্বত কত আছে নদী আর দরিয়া॥ পদ্মা মেঘনা যমুনা ২ কাঞ্চা সোনা, স্রোত চমৎকার, শীতলক্ষ্যা বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী আর॥ কর্ণফুলী করতোয়া ২ যায় পাওয়া নদী মধুমতি রূপসা নদী নিরবধি সাগরেতে গতি। গড়াই আত্রাই আড়িয়াল ২ যেন জাল ছড়াইয়া আছে। পশুর আর সিরাজ নদী বহিয়া চলিছে॥ দক্ষিণতে শংখনদী ২ নিরবধি বহে করতর, কঙ্কাবতী বাকখালী আছে বহুতর॥ সোনার এই বাংলাদেশে ২ কত আছে নদীর নাহি শেষ, নাফ নদীর লইয়া আমার এই সোনার দেশ॥ দক্ষিণে পশ্চিমে আছে ২ নীল সাজে বঙ্গোপসাগর। উত্তাল পাতাল ঢেউ তাতে পর্যটক নগর॥ কক্সবাজার সৈকত রাণী ২ সোনার খনি রূপের নগরী। বিদেশীরা রূপের মোহে এতা যায় ঘুরি॥ ঘরে ঘরে জ্বলে আলো ২ লাগে ভালো। মাঠে ফলে ধান। কুতুবদিয়া হয় আরো স্বাস্থ্য কর্মস্থান॥ ধানে ধানে পুষ্পে ভরা ২ সাগর ভরা তাজা ইলিশ মাছ। সোয়াল বোয়াল রুই কাতলা আরো বাংলা মাছ॥ খাল বিল পরিপূর্ণ ২ ধন্য ধন্য রূপের যে রাণী। দারুণ গোর্কি আসি দেশে রাণীর চোখে পানি॥ জঙ্গলে জঙ্গলে গাছ ২ ভাজে ভাজ সেগুন গর্জন। শ্যামতরু জামতরু জুড়ায় নয়ন॥ মহিমার নাহি সীমা ২ কি উপমা দেব বন্ধুগণ। এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ সম্পদে ভরন॥ নাহি অভাব অনটন ২ সুধিজন সুখে কাটে কাল। গণতন্ত্র আসার পথে এ কোন জঞ্জাল॥ বিশ্বে মিলেনা তুল ২ ব্যাকুল মন উদাসিন। কালবৈশাখীর ঘূর্ণিঝড়ে সবই বিলীন॥

সর্বনাশা কাল বৈশাখী ২ ত্বরিত আসি বাংলার জনগণে। তছনছ করে দিল বিষম তুফানে॥ তুফানের কইতে কথা ২ বন্ধু ভ্রাতা আৎকে ওঠে হিয়া। শুনুন সবে কর্ণভরি যায় প্রকাশিয়া॥ তুফান তোনা খণ্ড প্রলয় ২ লোকে কর কেয়ামত ভাই। দেশ গ্রাম ভাসি গেল দারুন দরিয়ার॥ বঙ্গোপসাগরের পানি ২ উতাল জানি ঢেউয়ে তোলপাড়। সেই ঢেউ ধ্বংস করলো সোনার সংসার॥ জলোচ্ছ্বাস আর ঘুর্ণিঝড়ে ২ মানুষ মরে হাজার

www.pathagar.com

হাজার। তুফানের বর্ণনা দিতে ভাষা নাই আমার। বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখ ২ কথা ঠিক ২৯ এপ্রিল। ৯৮ বাংলা হয় ৯১ সাল॥ ভোর সকাল হতে ২ রেডিওতে সতর্কতা দিল। নিরাপদে আশ্রয় নিতে প্রচার করিল॥ ঘুর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস ২ জানায় আজ প্রচার মাধ্যম। ঘন ঘন সিগ্‌ন্যাল নম্বর করয় ঘোষণ॥ দ্বীপাঞ্চলের কুল বেয়ে ২ যাবে বয়ে হারিক্যান ঝড়। জলোচ্ছ্বাস হতে পারে ২৫ ফুট উপর। ঘন ঘন প্রচার মাধ্যম ২ হরদম প্রচারিয়া কয়। সাগরেতে সৃষ্টি হৈছে ঘুর্ণি গোর্কিময়॥ সন্ধ্যা ৭ টা হতে ২ পারে বইতে প্রচণ্ড বেগ তার। উপকূলের জনগণ হও হুসিয়ায়॥ নিরাপদে যাওনা চলি ২ সরে সরকারি বাহন। লোক সরানোর কাজে আছে চল না এখন॥ বারে বারে এই প্রচারে সোমবারে এই গোর্কি ঝড়। বিকেল ৫ টা আঘাত হানে বহে ধীয় খর॥ মানুষ ভাবে মনে ২ আলাহ বিনে কোন গতি নাই। তার উপর ভরসা করি দেব রাত কাটায়॥ কপালেতে আছে যাহা ২ বলি তাহা কে খণ্ডাতে পারে। এই ভেবে ঘরবাড়ি অনেকে না ছাড়ে॥ সিগন্যাল ওঠে কক্সবাজার ২, ৯ নম্বরে চট্টগ্রাম ১০। ৬ নম্বারে মংলা শুনি মনে পায় ত্রাস॥ বাতাস বহা হইল শুরু ২ দুরু দুরু কেঁপে ওঠে হিয়া। ধীরে ধীরে প্রবল হইতে প্রবল হৈয়া। গতিবেগ বাড়ি গেল ২ শুরু হইল তাণ্ডব নর্তন। সে দৃশ্য এই মুখে না যায় কহন॥ বুকের বল ওঠে গেল ২ দেহ স্থিতি আর দেহে নাই। দিশেহারা দ্বীপবাসী করে হায় হায়॥ ডাকে আলাহ আলাহ ২ বারিতালা ওহে মাবুদ সাই। বিপাকে পইড়াছি আল-াহ লহ না ত্বরায়॥ শুরু হইল তাণ্ডবতা ২ একি যেটা আকাশেতে ওঠে। বৃক্ষ উড়া বায়ু বহে আধারিয়া রাত্রে॥ ঘুরি ঘুরি মারে চক্র ২ মহাবক্র প্রলয়মুখী ঝড়। গাছপালা ভাঙ্গি পড়ে ভাঙ্গা কাচা ঘর॥ উড়ে টিনের ছানি ২ পাতা জানি উড়ে উড়ে যায়। বাতাসের জোর বাড়ে মানুষ অসহায়॥ থর থর কাঁপে জমি ২ বিশ্বস্বামী একি খেলা তোর। সাধের বাড়ী উড়ায় নিল বাতাসের জোর॥ রাত্রি ৯ টার দিকে ২ ঝড় রোখে প্রসারিয়া হাত। সবুজ বাংলা বানাইব আজি জুলমাত। হারিকেনের রূপ নিয়া ২ ঝাপাইয়া আজরাইলের পাখা। ধ্বংস লীলা জলোচ্ছ্বাস আনে প্রাণ সখা। বঙ্গোপসাগরের পানি ২ উতাল জানি টালে টাল মাতাল। আকাশ ছোঁয়া আসে ঢেউ হয়ে বেসামাল॥ একে তো বাতাসের গতি ২ তন্ত্রমতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়। প্রচন্ড জলোচ্ছ্বাস তাতে ভাসায় নারীনর। ভাসায় ঘর বাড়ি ২ আহামরি ভাসায় গাছ পালা। পশুপাখি গরু ছাগল জলোচ্ছ্বাসে মৈইলা॥ কিয়ামত ঘুররাত্রি ২ মহাযাত্রি পানির সাগরে। ২০ ফুট উচা পানি আসিল সাগর॥ উপকুলের জনপদ ২ কি আপদ কিছু নাই নাই। বিরান হৈইয়া গেছে সব জলের তলায়॥ কক্সবাজার হৈল বিরানা ২ গেছে জানা মহেষখালী ভাই। হাজার হাজার লাশ ভাসে বিষম দরিয়ায়॥ কুতুবদিয়া ডুবে গেল ২ ভাসি গেল সাগরের জলে। শুনি লোক দুর দুরান্তে আলাহ বলে॥ হাজার হাজার বসতবাড়ী ২ স্রোতে পড়ি হয়েছে ছারকার। ৭০ হাজার নরনারী মরছে এলাকার॥ কাঁদনের লোক নাই ২ পাই ভাই পত্রিকাতে আমি। পূর্বকোণ আজাদীতে লিখছে দিবাযামী॥ ৯ ঘন্টার কালো ঝড়ে ২ ডুবে মরে সন্দ্বীপ ও হাতীয়া। সাগর জলে ডুবে গেছে দ্বীপ সোনাদিয়া॥ মনপুর লণ্ডবণ্ড ২ আজব কাণ্ড নিঝুমদ্বীপ বাসি। কত হাজার পড়ছে মারা জানেন আলাজী॥ পতেঙ্গা আর হালি শহর ২ লাশের বহর ভাসি ভাসি যায়। টিভি টাওয়ার ভেংগে গেছে যোগাযোগ নাই॥ কর্ণফুলীর ভাংছে সেতু ২ কিবা হেতু। বুঝাব নাই দরকার। প্রবল ঝড়ে ডুবছে কতো নৌকা

www.pathagar.com

স্টীমার॥ আহারে দারুন তোফান ২ তোর শান ধ্বংস খেলা নিলি। পিতা পুত্র স্ত্রী কন্যা সব ভাসাইলি॥ বাহু জোরে ভাঙ্গি দিলি ২ মহাবলী ভেড়িবাঁধ কত। কলকারখানা ভাঙ্গি চুরি করিলি গারত॥ চরফ্যাশন আর উড়কিরচর ২ প্রলয়ংকর ঝড়ের বাতাসে। সাগরের উষ্ণজলে ভাসি গেল শেষে। চর পাতিলা ঢালচর ২ ভোলা শহর চরনিজাম ভাই। পটুয়াখালী পানির নিচে গড়াগড়ি যায়॥ বরগুনাও ভাসি গেল ২ লোক মৈল হাজার হাজার। কারে কেবা দাফন করে স্তুপ লাশের॥ মান্দারী আর লক্ষীপুর ২ রায়পুর সোনাগাজীতে। জলোচ্ছ্বাস বয়ে গেল তুফানের স্রোতে॥ রামগতি রামগঞ্জ ২ ভাজা ব্যঞ্জ পড়িয়া তুফানে। জনপদ বিরনা হইল মৃত সবখানে॥ ক্ষয়ক্ষতির নাহি তুল ২ হবে ভুল সত্য যদি বলি। উখিয়া টেকনাফ চিংড়ি প্রজেক্ট হৈয়া গেছে খালী। চকরিয়া হৈল ফানা ২ বন্ধুগণা আনোয়ারা নাই। বাঁশখালী হৈল খালি ঝড়েতে উড়ায়। ১২ জেলার জনপদ ২ সব সম্পদ বিলীন হৈয়া গেছে। বিরানা নিশ্চিহ্ন প্রায় নাহি বাকি আছে॥ যথাতথা লাশের ঝাঁক ২ ফোক ফাঁক নিখোঁজে ভরিছে। পরিসংখ্যান নায়ি তার মরিছে মরিছে॥ গোর্কির পানির টানে ২ প্রলয় হানে ধ্বংস জনপদ। যাহা ছিল নিয়ে গেল সাগরে সম্পদ॥

এই পর্য্যন্ত পাই খবরে ২ দেশের ভাইরে পত্রিকায় যেমন। ২৮ খানা উপজেলা-মরুর লক্ষণ। দ্বীপাঞ্চল আর উপকুল ২ নাহি তুল বিরানা হৈয়া গেছে। মানুষ পঁচার গন্ধে মরে আছে যারা বেঁচে॥ তিন লক্ষাধিক আদম সন্তান ২ হারায় জন লেখে পত্রিকায়। এমন জঘন্য ঘূর্ণি আর হয় নাই॥ মাঠের লবণ গেছে চলি ২ প্রজেক্ট বলি আর কিছু নাই। শতকরা শত ক্ষতি পত্রিকাতে পাই॥ ধান আদি শস্য যত ২ ধুলিস্মাৎ বাঁচার উপায় নাই। যারা বেঁচে আধা প্রাণে তাদের কি উপায়। জানেন আল্লাহ্ মালেক ২ তিনি খালেক তিনি দয়াবান। তার দয়া বিনে মোদের নাহি পরিত্রাণ॥ এই ভাবে ধ্বংসযজ্ঞ ২ আমি অজ্ঞ লিখিতে না পারি। দুই চোখের জলে ভিজে কলমের তরী॥ শুনেন এবার অন্য সুরে।

## মনোয়ারার বিলাপ

রাগ পয়ার:

আহারে দারুণ গোর্কি তুই বড় নিঠুর। সোমবার রাতে আসি করলি চুরমাচুর॥ মোর পাঁচ যাদুরে নিলি কাড়ি তোর গ্রাসে। বুক খালি মা জননী থাকি কার আশে॥ অ হাছিনা ও শাহিনা মোরে একা ফেলি। অ রেহেনা গেলি কোথায় কান্দে মা পাগলি॥ বিরান করিলি মোর সুখের সংসার। ইসমতে ভাসাইয়া নিলি কিসমতে আমার॥ গরম তুফাইন্যা তুইরে নাহি তোর দয়া। কি লাভ হইল তোর ভেঙ্গে মোর হিয়া॥ এইভাবে আউলা কেশী বুকে মারে চড়। কান্দিয়া ফরিয়াদ করে তোলে দুই কর॥ কি দোষ কইরাছি প্রভু তোমার দরবারে মোর যাদু নিল কাড়ি বিষম সাগরে॥

রাগ ত্রিপদ : তুফানের পরের দিন, দেশনেত্রী গমগীন,

মন্ত্রীসহ হেলিকেপ্টার নিয়া

কুতুবদিয়া মহেশখালি, জলোচ্ছ্বাসে নিচে ঢলি, আসে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া॥ দেখে সব স্থান স্থান, হৈয়া গেছে বিয়াবন, মরালাশ হাজারে হাজারে। ভাসি চলে জলোপরে,

www.pathagar.com

হাতিয়া সন্দ্বীপ ঘুরে, সব দেখে পানিতে ভরপুর॥ কোথাও নামিতে নারে, ব্যর্থ মনে যায় ফিরে, উদ্ধারিতে পাটায় ফৌজি লোক। ঐ দিকে শেখ হাসিনা, বন্যার্তদের দেখাশুনা, করিবারে লইল উদযোগ। আবদুর রহমান বিশ্বাস সাথে দলমত ভুলে তাতে, জনসেবার করে যায় কাজ। নির্ভিক খালেদা জিয়া, মন্ত্রীবর্গ সাথে নিয়া উপদ্রুত এলাকাতে নিত্য সকাল সাজ॥ উদ্ধারিতে মানবতা ২ ছুটে যায় যথাতথা, ত্রাণ দ্রব্য করয় বিতরণ। পূর্ণ বাসন করতে লোকের, সর্বশক্তি দেয় তাদের, বিবেচিত নির্বাচিত জন॥ কমিটি গঠন করি, স্থানে স্থানে টিম সারি। পাঠাইল পূর্ণবাসন লাগি। পরে বিশ্ব বিবেকেরে ফকারী কয়, বাংলা তরে, সাহার্য্য হস্তে অনুরাগী॥ প্রধান মন্ত্রীর আবেদনে ২ দেয় সাড়া জনগণে, বিশ্ব বিবেক উঠিলেক নড়ি॥ আমেরিকা হইল সখা সৌদী আরব দিল দেখা, ফ্রান্স, জাপান অতি তড়িঘড়ি॥ সাহায্য পাঠায় তারা ভুখা নাঙ্গা তুফানিয়া কিছু পায় বাঁচিবার আশা। হিন্দুস্থান এগি আসে, ত্রাণ আদি পাঠাতেছে, উত্তর কুরিয়া দেয় পূর্ণ আশ্বাস॥ এইভাবে বিশ্বভরা, সংগঠন আছে যারা, মানবতার শুনে ফরিয়াদ। দেশনেত্রী জিয়া তাই, সর্বলোকে নির্দেশয় সুষ্ঠভাবে কর দরদ॥ তালগোল যদি হয়, জনম জেলের ভয়, সাবধান সব সাবধান॥ এ দেশটা সবে গড়, বিপদেতে ধের্য্য ধর, এই মোর শেষ নিবেদন॥ পরিশেষে আলম বলে, হও হুসিয়ার ভাই সকলে, দেশগড় গণতন্ত্র সার। আকাঙ্খিত গণতন্ত্র, বাংগালীর আশার মন্ত্র, পুরাইতে হইবে সবার। হাতে হাত কাঁধে কাঁধ, ভুলে গিয়ে বিষ বিশ্বাস, ভুলে গিয়ে সকল মতবাদ সুন্দর দেশটি গড়ে তুল, উঠুক হাসির উঠুক রোল, ছড়ে পড়ুক বিশ্বে সুসংবাদ॥ এই পর্যন্ত সাঙ্গ করি, ভুলক্রটির সংখ্যার ভারি; মাফ করিবেন এ অধীনে। ফয়েজ বাংগালী নাম, উখিয়ার সুসন্তান, তান অনুরোধে ফুটে এ ছন্দ বাখানে॥

**আল্লাহু আকবর**
**বাংলাদেশ জিন্দাবাদ**

**সর্বনাশা বন্যার কবিতা**
**সোনার বাংলা হৈল বিরানা**
**দেশের গজব গেল না**
**অ-ভাই দেশের গজব গেল-না**
**এবার শুনুন, তারই বর্ণনা।**

**রচনায় : মাস্টার শাহ্ আলম (উখিয়া)**
**প্রকাশনায় : আবুল খাইর পণ্ডিত**
**উপজেলা/উখিয়া।**
**মূল্য– দুই টাকা মাত্র।**

বিঃ দ্রঃ কবিতা নকল করিয়া ছাপানো আইনত অপরাধ॥
তাং ৩-৯-১৯৮৭ ইংরেজি।
মুদ্রণে : ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস, কক্সবাজার।

www.pathagar.com

ওহে পাক সাই ২ মাফ চাই আমি গুনাগার। রাখ মার যাহা কর তোমার এক্তিয়ার॥ তোমার আজব লীলা ২ বুঝবার মেলা শক্তি আছে কার। দুষ্টে দমন সৃষ্টে পালন তোমার অধিকার॥ তোমার লীলাখেলা ২ রঙ্গলীলা জগতের পরে। ঝড় তুফানে হাজার হাজার লোক যায় মরে॥ মহিমার ধ্বনি তব ২ নিত্য নব দেখি সর্বদায়। দেশ গ্রাম ভাসি পেল দারুন বন্যায়॥ ১৯৮৭ সালে ২ আলম বলে শ্রাবণ মাস শুরু। ভাও বাতাস দেখিয়া প্রাণ করে দুরু দুরু॥

এইতো আমার সোনার দেশ ২ পরিবেশ অতি পরিপাটি। মধুর চেয়ে মিষ্টি আর সোনার চেয়ে খাঁটি॥ বৃক্ষপালা তরুলতা ২ মনের কথা যায় প্রকাশিয়া। পাহাড় পর্বত কত আছে নদী আর দরিয়া। পদ্মা, মেঘনা যমুনা ২ কাঞ্চা সোনা স্রোত চমৎকার। কর্ণফুলী, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী আর॥ শীতালক্ষ্যা করতোয়া ২ যায় পাওয়া নদী মধুমতি। রূপসা নদী নিরবধি সাগরেতে গতি॥ গড়াই, আত্রাই আড়িয়াল ২ যেন জাল ছড়াইয়া আছে পশুর আর সিরাজ নদী বহিয়া চলিছে॥ দক্ষিণেতে শংখনদী ২ নিরবধি বহে খরতর। কঙ্কাবতী বাকখালী আছে বহুতর। সোনার এই বাংলাদেশে ২ কত আছে নদীর নাহি শেষ। নাফনদী লইয়া আমার এই সোনার দেশ॥ জালের মত আছে ছাইয়া ২ বলি ভাইয়া দেশের গৌরব। সোনার মত শস্য ফলে শুনি জয়রব॥ সলিলকন্যা, জগধন্যা ২ মিল মোহনা সোনাফলা মাটি। কবি বলে সোনার চেয়ে এই মাটি খাটি। বিশ্বে মিলেনা তুল ২ ব্যাকুল মন উদাসিন। বর্গী আসি কত খাইল, শেষে গমগীন। পাকিস্তানী খাইয়া গেল ২ রসাতল শোষি তেইশ বছর। বিদেশীরা স্বর্গ ভাবি হইতে চায় নফর॥ ধন ধান্যে পুষ্পে ভার ২ সাগর ভরা তাজা ইলিশ মাছ। শোয়াল বোয়াল রুই কাতলা আর বাংলামাছ॥ খালবিল পরিপূর্ণ ২ ধন্য ধন্য রূপের যে রাণী। ইবনে বতুতা আসি জুড়াল পরাণী। জঙ্গলে জঙ্গলে গাছ ২ ভাঁজে ভাজ সেগুন গর্জন। শ্যাম তরু জাম তরু জুড়ায় নয়ন॥ মহিমার নাহি সীমা ২ কি উপমা দেব বন্ধুগণ। এতরঙ্গ বঙ্গদেশ সম্পদে ভরন। নাহি অভাব অনটন ২ সুধিজন সুখে কাটে কাল। দারুণ বন্যা আসি দেশে বাড়িল জঞ্জাল॥

এরশাদ ভাইয়ের শাসন হতে ২ কহি তাতে দেশে আইল সুখ। ন্যায়বিচারে দেশধন্য নাহি কোন দুঃখ॥ উপজেলা সৃষ্টি করি ২ ক্ষমতারী দিল বিলাইয়া। গরীব দুঃখি বিচার পায় আদালতে গিয়া॥ সুখে কাটে সবার দিন ২ নাহি চিন গরীব আর ধনী। গড়ি উডয়েতে প্রীতির বন্ধনী। এ সব বারন দিয়া ২ যাই লেখিয়া দারুন বন্যার কথা। সর্বনাশা বন্যা দেখি ঘোরে ওঠে মাথা।

শ্রাবণের বারিধারা ২ পায়তারা বৃষ্টি ঘন ঘন। আকাশেতে ঘনঘটা ঝড়ের লক্ষণ॥ শ্রাবনের প্রথম হতে ২ অবিরতের ঝড়ে বৃষ্টিধারা। মাট ঘাট নদী নালা হইল তাতে ভরা॥ পাহাড় হতে নামে ঢল ২ টলমল নদনদীর পানি। পাবন হইবে যেন কনে কানাকানি। ভরানদী মেঘনা ২ কুল মানে না ভাসায় দু কূল। পাহাড়িয়া ঢল ছুটে করি উৎরোল। দু' কুল ভাসাইয়া দিল ২ লোক মইল, ভাংগে ঘরবাড়ি। পশু পাখী মইল কত শোমার করতে নারি। গরু ছাগল যায় ভাসি ২ সর্বনাশী বুড়িগঙ্গা নদী। ঢাকা শহর ডুবাইল সেই অদ্যবধি। উড়ি গেল উড়ির চর ২ বেখবর সন্দ্বীপ হাতীয়া। মহেশখালী কুতুবদিয়া যায় যে ভাসিয়া। সিরাজগঞ্জ মাদারীপুর ২ ভরপুর বন্যার পানিতে। ঝিনাইদহ কিবা কহ প্রতি জিলাতে॥ নদীপাড়ের গ্রামগঞ্জ ২ সব ধংস শহর শহরতলী।

www.pathagar.com

নদীতে পাহাড়ি ঢলে সব ভাসাইলি॥ কোন স্থানে বন্যার পানি ২ যদি নামি যায় কদাচিত। আরেক জাগায় ভাসাই নিয়া ঘটায় বিপরীত॥ পশুপাখী গরুছাগল ২ হইল পাগল মরে থরে থরে। হাঁস মুরগী মরে ঝাঁকে পানির হাশরে॥ বৃক্ষপালা তরুলতা ২ ভাংগে তথা দারুণ বাতাসে। বন্যার জলে সোনাদিয়া গেল যেন ভেসে॥ মাছ মারিত জাইল্যা যারা ২ নাহি তারা বিষম দরিয়ায়। মাছ মারিতে গিয়া মরে সাগর উথলায়॥ বিষম দরিয়ার পানি ২ সাগর খানি উতাল পাতাল ঢেউ। হঠাৎ করে উঠবে তুফান না জানিত কেউ। ট্রলার নৌকার শত শত ২ ডুবে কত নাহিক শোমার। সর্বনাশা বন্যা দেশ করিল ছারখার॥ সাগরের পরে লাশ ২ সর্বনাশ ভাসিয়া বেড়ায়। উর্ধে থাকি মহা প্রভু কি খেলা দেখায়। কবি বলে সাবধান ২ মুসলমান হও হুসিয়ার। ঈমানের পরীক্ষা প্রভু নিতেছে সবার॥ চকরিয়া হইল ফানা ২ গেল জানা মাতামুরীর জলে। লোহাগাড়া ভাসি গেল কঙ্কাবতীর ঢলে॥ ফটিকছড়ি ডবলমুরি ২ দোহাজারী কালুরঘাটে জল। কর্ণফুলি ভাসাই দিয়া করিল বিকল॥ জলসন্ধি লোকসব ২ পরাভব যোগাযোগ নাই। ঘোড়া গাড়ি নাহি চলে বন্যার পানি লাই॥ জনগণের দুখের সীমা ২ নাই উপমা সারা বাংলা ব্যাপি। নিচু জায়গা ডুবি গেল সব অনুরুপি॥ কক্সবাজার হৈল বিরান ২ বন্ধুগণা রামু আর উখিয়া। রেজু আর বাকখালীর জল যে ঢুকিয়া॥ গবাদী পশু মরে কত ২ শত শত লেখা জোখা নাই। চাষ করিতে চাষের বলদ পাওয়া হবে দায়॥ এইভাবে সারা বাংলা ২ বন্যার খেলা চলে মাস ব্যাপি। আহারে দারুন বন্যা খাইল সর্বগ্রাসী॥ নিলা কাড়ি দুধের যাদু ২ গৃহবধু আনছি নতুন ঘরে। দয়া নাহি করলা তুমি একটু তাহার পরে॥ ভাসাইয়া নিয়া গেইলা ২ দুঃখ দিলা যাবত জীবন। মনের দুঃখ মনে রইল ঝরে দু নয়ন॥ ছখিনারে নিলা কাড়ি ২ সুন্দর নারী গৃহভরা আলো। বন্যায় ভেজা শুন্য ঘরে নাহি লাগে ভালো॥ মা জননী ভাসি গেল ২ বন্যা নিল মোর আব্বাজান। ভাই ভগ্নি ডুবি অইল মন পেরেশন॥ এইরূপে স্থানে স্থানে ২ সবে জানে দারুন বন্যার পানি। প্রবেশিয়া ধ্বংস করে সোনার সংসার খানি॥ ক্ষয়ক্ষতির নাহি তুল ২ কান্নার রোল পড়ি গেল দেশে। নাহি জানি ভাগ্যে মোদের আর কিবা আছে। এই পর্যন্ত পাই খবরে ২ দেশের ভাইরে হিসাব যেমন। ৫০ খানা জেলা হইল পানিতে মগন॥ ৩৪৭ টি ২ মোটামুটি উপজেলাতে। বন্যার পানি সর্বনাশ ঘটাইছে তাতে। ২২ লক্ষাধিক গবা-পশু ২ নহে মিছু আর অগনন। ৬০৩ জন লোকের হইয়াছে মরণ। সেতু ভাঙ্গি গেছে কত ২ শত শত কে করে শোমার। ৪৪ হাজার একর জমির ধান্য নষ্ট আর॥ দালান কোটা ঘরবাড়ী ২ ঢলে সাগরের জলে। মিলে যদি বড় দ্বীপ হইতে একটি পারে॥ হাতি ভাসে যেই জলে ২ আলম বলে তুচ্ছ মানুষ তথা। মাতামুরীর জলে ভাসে দাঁতাল হাতী একটা॥ ভাসি ভাসি দরিয়ায় ২ শুনি ভাই ভাসে মৃত লাশ। সত্য হইলে দাফন করা বন্ বিভাগের কাজ॥ এ সব বারণ করি ২ প্রকাশ করি রিলিফ ত্রানের কথা। দুরাবস্থা দেখি দেশের প্রেসিডেন্টের ব্যাথা॥ দেশ প্রেমিক প্রেসিডেন্ট ২ দেখিলেন্ত দুর্গতি দেশের। জনগণের পাশে গিয়া হলেন হাজির॥ বন্যার পানি আছে যথা ২ যান তথা মন্ত্রীবর্গ লইয়া। সম্মুখে প্রকাশ করেন ত্রাণ সাহায্য দিয়া॥ নিজের হাতে ত্রাণ টাকা ২ দেন ভুখা মানুষের হাতে। অন্ন, নিদ্রা ত্যাগিয়াছেন দিনে আর রাতে॥ যেথা বন্যা তথা ছুটে ২ দিন রাতে সেনা লোক নিয়া। শত শত মৃত লাশ উদ্ধার করিয়া॥ নিজ হাতে করে দাফন ২ এমন আপন কে আছে সংসারে। পঁচা লাশের গন্ধ তবু কত যত্ন করে॥ পুনর্বাসন করতে ফের ২ এই

www.pathagar.com

হাজের বীর কিশোরীগণ। প্রয়োজনের দ্রব্য দিয়া নেয় বড় যতন॥ এইভাবে দেশময় ২ কবি কয় সব সেনাগণ। বন্যার্ত লোকে করে খাদ্য বিতরণ॥ এরশাদ ভাই সাথে সাথে ২ যায় তাতে গরীব দুঃখির ঘরে। অনাহারে কেহ যেন নাহি যায় মরে॥ প্রেসিডেন্টের তহবীলে ২ আলম বলে যত টাকা ছিল। বন্যার্ত পীড়িতের তরে ব্যয় হইল॥ আরো বহু প্রয়োজন ২ ভাইগণ ভাল আছেন যারা। আমার ডাকে সাড়া দিয়ে দান করুন তারা॥ বন্যায় যারা গৃহহীন ২ নহে ভীন তারা মোদের ভাই। তহবীলে দান করিয়া শরীকও সবাই॥ প্রেসিডেন্টের আবেদনে ২ সাড়া আনে দেশের লোকজন। যেই যাহা পারে দিল বন্যার্ত কারণ॥

মানবতার পক্ষে যারা ২ বিশ্বভরা আছে সংগঠন। বাংলাদেশের দান করিল বন্যার কারণ॥ বিশ্ববিবেক উঠল নড়ি ২ আহামরী মরে লোকজন। বাংলাদেশে দিতে হবে সাহায্য এখন॥ রেডক্রস আগুবাড়ি ২ সারি সারি জাপান ইরান। সৌদি আরব, ইরাক দেশ লেবানন জার্মান॥ আমেরিকা দিল দেখা ২ হইয়া সখা দুঃস্থমানুষের। লক্ষ লক্ষ টাকা দানে নাহি হেরফের॥ বার্মা থাইল্যাণ্ড পাকিস্তান ২ হিন্দুস্থান ভুটান নেপাল। যার যেই যোগ্যমতে করে বন্যায় দান॥ দানি দিল এই দান ২ আলীশান দিল টিনের দুধ। কাপড় চোপড় দিল আর খাবার বিস্কুট॥ চাউল আর টাকা কড়ি ২ তরিঘড়ি দিল নিত্যদ্রব্য। প্রয়োজনের সব দিল যত অনিবার্য্য॥ এখন বিলায় তাহা ২ কহি ইহা বাংলার জোয়ানেরা। বন্যাস্থ স্থানে গিয়া করি পায়তারা॥ কেহ যেন পড়েনা বাদ ২ আর্তনাদ নাহি যেন আসে। নিঃস্থ দুস্থ আর্ত লোকে বিলায় হরিষে॥ জনগণ ওঠে কান্দি ২ ফরিয়াদী জুড়ে দুই হাত। এত দিনে দুঃখ মোদের ঘুছিল সাক্ষাৎ॥ সেনা লোক জিজ্ঞাস করে ২ কেন ভাইরে কহ একথন। জনগণ বলে শুনুন তার বিবরণ। পূর্বে অনেক বন্যা হৈছে ২ রিলিফ আইছে আমাদের জন্য। মেম্বারেরা নিজে খাইয়া করছে পেটধন্য॥ এবার তাদের ভাগ্যে নাই ২ কহি তাই ফুলাইছে গাল। সেনালোক রিলিফ দিচ্ছে তাদের হইল কাল॥ তাইতো এরশাদ প্রতি ২ ভক্তি প্রীতি রইল আমাদের। ভিক্ষুকের দ্বারে আসে প্রেসিডেন্ট দেশের॥ পৃথিবীতে নাই তুলনা ২ শোকরানা দরবারে আলাহর। এরশাদের আয়ু, দেহ হাজার বৎসর॥

কবিতা এই পর্যন্ত ২ গুনবন্ত দেশের সুজন। শান্তির বন্যার দেশে আসবে এরশাদের কারণ॥ নামাজ রোজা কায়েম কর ২ প্রভু স্মর তিনি দয়াময়। সৃষ্টিকর্তা পালন ক্রেতা তিনি বিশ্বময়॥ হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খৃষ্টান ২ ধর্মমান যে নিয়ম আছে। পালন কর রীতিমত কহি পরিশেষে॥ বন্যার মত গজব আর ২ আসবে না আর কহিল আলম। সবাকালে জনাবে মোর ছালাম অগনন॥

**এবার শুনুন বিলাপ সুরে**

ছন্দ পয়ার : আহারে দারুণ বন্যা তুই বড় নিষ্ঠুর।
শ্রাবণ মাসেতে আসি কইল্যা বড় জোর॥
খাল নাল ভাসাইলা দিয়া পানির ঢল।
ঘর-বাড়ি ভাঙ্গি নিয়া বানালি পাগল॥
কেন রে নিঠুর বন্যা আসিলা দেশেতে।
ভাই-ভগ্নি হারাইলাম তোর দাপটেতে॥

www.pathagar.com

কি ফল হইল তোর দিলি এত জ্বালা ।
ভাঙ্গিলা সাধের গৃহ দুঃখ বাড়াইলা॥
ছখিনারে কাড়িরে নিলা মোর নতুন বধু ।
যেই মোরে শান্তি দিত দিয়া প্রেম শুধু॥
বুকে নাহি প্রেম আর- যন্ত্রনার শেল ।
কাটারী হইয়া বুকে বিন্দিয়া যে গেল॥
হারাইলাম ঘর বাড়ি হারাইলাম সব ।
কেমনেতে সহি তোর হেন উপদ্রব॥
ধানের গোলা নিলা কাড়ি আর বাপও মাও ।
পারাপারে ডুবি গেল মোর সাধের নাও॥
কর্ণফুলির বক্ষ দিয়া আইলা খরতর ।
ডুবাইলা দুইকুল প্রতিবেশীর ঘর॥
সব হারাইয়া কান্দি এখন ঝরে চোখের পানি ।
মহা শ্মশান বানাইলা আমার দেশ খানি॥
এই পর্যন্ত করি ক্ষান্ত সাধু সুধিজন ।
সবাকার জানাবে মোর ছালাম অগনণ॥

: শেষ :

**ছখিনার বিলাপ**

কান্দে বিবিরে ছখিনায়, দরিয়ার কিনারে যাই,
দু'নয়ন হইল ঝর্ণধারা ।
আহা মোর প্রাণপতি, এরে হবে কোন পতি,
দুঃখিনিরে করলা পাগল পারা॥
কখন নদীর পারে, পানিরে জিজ্ঞাসা করে
বল নদীরে প্রিয় সে কোথায়?
দারুণ বন্যার পানি, হরি নিলি মোর প্রাণি
ঝাম্প দিয়ে খুজিব প্রিয়ার॥
কখন সাগড় পাড়ে, কান্দিয়া ঘুরিয়া ফিরে,
ক্ষণে কাঁদে ছিড়ে মাথার চুল॥
আহা প্রাণ প্রিয় মোর, বান্ধব নাহিক আর
অভাগিনীর হইল কোন ভুল॥
কেনবা সওদাতে গেলা আর নাহি ফিরে আইলা
এই ছিল তোর মনে যদি ।
এই নদী পথে গেলা জনম দুঃখী বানাইলা
দু'নয়নে বহে স্রোত নদী॥
কখন পন্থের পানে, চেয়ে থাকে নিরিক্ষণে
আসে কিনা ফিরি প্রাণনাথ ।

www.pathagar.com

আহারে বন্যার পানি, দেখি তোরে কানাকানি,
ডুবায়াছ অতল বারিত॥
কি ফল হই তোর কাড়ি নিলা প্রাণেশ্বর,
দাউ দাউ জ্বলে মনানল।
কপালেতে এই লেখ্য বন্যা হল অগ্নিশীখা,
মোর গৃহে দিল দাবানল॥
এই রূপে কান্দে ছখি, দুনিয়া আন্ধার দেখি,
আহা বিধি এই ছিল ভালে।
আলম বিলাপী কয়, কেন্দে আর কিবা হয়,
রুখে দাড়াও ভরসার ছলে॥"[৩১]

## চ. লোকছড়া

লৌকিক জীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোকছড়া ও লোককবিতা লোকসংস্কৃতির এক অনন্য সম্পদ। প্রাচীনকাল থেকেই এই ছড়া বহমান। কক্সবাজারের লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্যের অন্যতম উপাদান ছড়া। ছড়ার সাথে নারী, শিশু-কিশোর-কিশোরীর রয়েছে গভীর সম্পর্ক। এই ছড়াসাহিত্যের মধ্যে ঘুমপাড়ানির ছড়া বা ছেলেভুলানো ছড়া, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের খেলাধুলার ছড়া বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কক্সবাজারের আঞ্চলিক ভাষায় নারী, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের খেলার উপজীব্য হিসেবে ছড়া, শিশুকে ঘুমপাড়ানির উপভোগ্য অসংখ্য ছড়া মানুষের মুখে মুখে শুনা যায়। ঘরে ঘরে একদিন বাঁশের বা বেতের দোলনায় (ঢুলইন) শুইয়ে দিয়ে শিশুদের ঘুম পাড়ানো হতো। শিশু মনের আনন্দে হাত পা নেড়ে নেড়ে মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ফুফু, খালা বা অন্য কারো মুখে উচ্চারিত গানের সুরে ছড়া শুনে শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দোলতে দোলতে একসময় ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতো। বেতের বা বাঁশের, পরবর্তী সময়ে কাঠের তৈরি দোলনা এখন আর তেমন একটা দেখা যায় না। ফলে শিশুদেরও ঘুম পাড়াতে এসব ছড়াগান শুনাতে হয় না। এতে করে এসব হারিয়ে যাচ্ছে। এমন কি পাটের রশি দিয়েও দোলনা তৈরি করা হতো। ছড়াগানগুলো ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে হিন্দি অথবা বাংলা মিউজিকের আগ্রাসনে। অনেক আগে থেকেই মানুষের মুখে মুখে অসংখ্য ছড়া তৈরি করে আসছিল। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এসব ছড়ায় হিতোপদেশ, নির্দেশ, আহ্বান ও ইঙ্গিতময়তা সন্নিবেশিত রয়েছে। এসব লোকজ ছড়াকে বাণীবদ্ধ করে প্রচারে যত্নবান হলে লোকসাহিত্যের পরিধি আরও প্রসারিত হবে। আধুনিক সাহিত্যে বলুন অথবা লোকসাহিত্যে বলুন এগুলো অবহেলিত ও মুল্যায়নহীন অবস্থায় হারিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র জেলায় অসংখ্য লোকছড়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সংগ্রহ না করার ফলে দিন দিন সে সব বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাচ্ছে। এসব লোকছড়ার প্রধান বাহক তথা যাঁদের মুখে মুখে এসব ছড়া রয়েছে তাঁরাও পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন।

এখন আধুনিক প্রযুক্তির যুগ। আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাবে স্থানীয় লোকসংস্কৃতি চাপা পড়ে যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত সব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী। শিশুদের

www.pathagar.com

দোলনাগুলো এখন স্টিলের বা আলনাযুক্ত উন্নত কাঠের তৈরি। দড়ি নয়, চাকচিক্যময় শিকল দিয়ে টাঙানো দোলনায় শিশু পাশের টেপ রেকর্ডের শুনা হিন্দি বা বাংলা মিউজিক শুনতে শুনতে হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে, নয়তো উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকে। পিতা-মাতা বাড়ির ঝিকে শিশুসন্তান দিয়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে যায়। দীর্ঘ সময় শিশুর দেখাশুনা করে ঝি বা কাজের মেয়ে বা ছেলে। আগে মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানিরা দোলনায় দুলিয়ে শিশুদের ঘুম পাড়াতো। এখানকার লোকছড়াকে আমরা বিভিন্নভাবে বিভাজন করতে পারি। বিশেষ করে শিশুদের ঘুমপাড়ানি ছড়া, খেলাধুলার ছড়া, মেয়েলি ছড়াসহ হরেক রকমের ছড়া রয়েছে। এখানে সেসব থেকে কিছু ছড়া মুদ্রণ করা হলো। জেলার এসব আঞ্চলিক ছড়া মুদ্রিত করা হলে সেটা পৃথক একটি গ্রন্থে রূপ নেবে।

**শিশুদের ঘুমপাড়ানি ছড়া**

১.
ঘুম যারে দুধের বাছা ঘুম যারে তুই
ঘুমত্তুন উড়িলে তোরে দুধু দিয়ম মুই
বা'ছা ঘুম যারে তুই॥

২.
ন কাঁদিছ লে দুধের যাদু, ন কাঁদিছ লে তুই
কেলা গাছত বইস্যে বাঁদুর ধাপাই দমবই মুই।
যাদু ন কাঁদিছ লে তুই॥

৩.
ন কাদিছ লে কালাবির পোয়া
জ্বালা পি'ড়ার লায়
তর বাপ গেইয়ে আইক্যাব শ'রত
হেত্তু আইয়ক চাই
বাপে পুতে খাইয় খানা
লাল পালংয়ত বই
বা'ছা ঘুম যারে তুই॥

৪.
ন কাঁদিছ লে গুরা পুতু ন ভাঙগিচ রে গলা
সোনার গলা ভাঙ্গি গেইলে
আর ন লইব জোরা
যাদু ঘুম যারে তুই ॥

৫.
বাইজ্যা বাঁশর বেতর ঢুলুইন নারিছ পাউট্টার দরি
সেই ঢুলুইনে ঘুম যারে গুরা পুতু পরি
যাদু ঘুম যারে তুই॥

www.pathagar.com

৬.
আঁর পুতুরে ক'নে মাইল্ল ফুলর ছোঁয়ার বারি
মুই যদি দেইতুম ইয়ান ন লইতাম নে কারি
পুতু ঘুম যারে তুই॥
৭.
ঝর পরেদ্দে ফোঁড়া ফোঁড়া বাইরে ভিজের লাই
পুতুর বাপ ত আছার খাইয়ে পইরর ঘাড়ত যাই
বাছা ঘুম যারে তুই॥
৮.
যাদু ঘুম যারে তুই পরি ঘুম যা
তর বাপ গেইয়ে হাল চইত
তর মা গেইয়ে পানি আইনত
ছালাবরনী খাপদি রইয়ে তরে নিবল্‌লায়
বাছা ঘুম যারে তুই॥
৯.
কারে মাইল্যাম কারে ধইল্যাম
কার ঘর গইল্যাম চুরি
কি দোষে আঁর যাদুরে নিব হরি
পুতু ঘুম যারে তুই॥
১০.
আঁর পুতু কৈ কৈ, পন্নাত গেইয়ে গৈ
এতক্ষণে ন আইয়ের কিয়া, বারাই আনম বৈ ।
পুতুর বাপে ভাত খাইত বইস্যে বত্তন ভরা দৈ
এক্ষুত গরি মনত পইজ্যে গোরা পুতু কৈ?
যাদু ঘুম যারে তুই॥
১১.
ঘুম যারে দুধের বাছা ঘুম যারে তুই
কেলা গাছত বইস্যে বাধর ধাপাই দম বৈ মুই
বাছা ঘুম যারে তুই॥
১২.
শিয়াল আইয়ের মোয়াফ আইয়ের আইয়ের ছালাবুরি
ঘুম যারে দুধের যাদু চোখ দু'নুয়া খাড়ি
যাদু ঘুম যারে তুই॥
১৩.
বাইজ্যা বাঁশর বেতর ঢুলইন নারিছ পাওট্‌টার বান
সেই ঢুলুইনে ঘুম যারে আমার সোনার চান
যাদু ঘুম যারে তুই॥

www.pathagar.com

১৪.
কালা বিলাই ধলা বিলাই কন হতিনে পালে
কে'বার ধরি টেলে বিলাই নিশি রাইতর কালে
যাদু ঘুম যারে তুই॥
১৫.
দাদা গেইয়ে পুগর বিলত দাদি রইয়ে কই
দাদাও নাই দাদিও নাই ন কাদিস লে তুই
বাছা ঘুম যারে তুই॥
১৬.
তরে দিয়ম বস্‌সু যাদু তরে দিয়ম লুলে
আদর গরি খাবাই দিয়ম ঘুমত্‌তু উড়িলে
যাদু ঘুম যারে তুই॥
১৭.
উত্তরর বিলত ন যাইও যাদু মইশে মারিব
দাদাও নাই দাদিও নাই ক'নে ছুরাইব
পুতু ঘুম যারে তুই॥

এইভাবে দোলনা দুলিয়ে ছড়াগান গাইতে গাইতে দুধের শিশু নিরলে ঘুমিয়ে পড়ে, অতঃপর অবসান হয় ছড়া কাটার।

উপমহাদেশের মুঘল শাসনামলের শেষের দিকে বাংলার মসনদ নিয়ে যখন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, তখন বর্গীদের হামলায় এ দেশের মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো। বর্গীরা সদলবলে কেটে নিতো ক্ষেতের পাকা ধান। লুটে নিতো টাকা কড়ি। এ বর্গীদের নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক ছেলে ভুলানো ছড়া। একটি বহুল শ্রুতিমধুর ছড়া হচ্ছে।

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কি সে?
ধান পুরালো পান পুরালো
খাজানার উপায় কি
আর ক'টা দিন সবুর করো
রসুন বুনেছি॥

শিশুদের ঘুম পাড়াতে উক্ত ছড়াটির যেমন ব্যবহার হতো, তেমনি কক্সবাজার এলাকায় একই ভাবাদর্শে শিশুদের ঘুম পাড়াতে স্থানীয়ভাবে রচিত হয়েছে নিম্নের ছড়াটি। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকে কক্সবাজারের উপকূলে যখন পর্তুগিজ জলদস্যুদের সাথে মগ সম্প্রদায়ের অসৎ লোকজন সঙ্গবদ্ধ হয়ে লুটতরাজ চালাতো যা বর্গীর তাণ্ডবকেও হার মানাতো। তখনই এই ছড়াটি রচিত হয়।

www.pathagar.com

১৮.
মইগ্যা আইয়ের খালে নালে
মগিনী আইয়ের কৈ?
মইগ্যার ঝি মগিনী আইয়ের পিছা তুরুং লই।
বাছা ঘুম যারে তুই॥

এরকম অসংখ্য ছেলে ভুলানো ও ঘুম-পাড়ানি ছড়া জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যা এখনো স্থানীয় মানুষের মুখে শোনা যায়। তবে মেয়েদের মুখেই সবচেয়ে বেশি শ্রুত হয়। এসব ঘুমপাড়ানির ছড়াগানের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে গ্রামীণ জীবনের চিত্র, মানুষের মনের আকুতি, হৃদয়ের কোমলতা, সরলতা, স্নেহমাখা ভালোবাসা, মায়া-মমতা, হৃদয়ের ব্যাকুলতা, সুখ-দুঃখের প্রতিচ্ছবি।"[৩২]

**মেয়েলি ছড়া**

কক্সবাজার জেলার প্রতিটি ঘরে ঘরে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা নিম্নোক্ত ছড়াগুলো আওড়িয়ে থাকে।

১.
অঁমা অঁমা বুবুর জামাই আইস্যে
পইরর পারত বইস্যে
কি কি আইন্যে চাইম বৈ
ঢাকত যাই বইয়ম বৈ।
এক পাতিলা জিলাপী
তার জিলাপী তারে দে
তারে আরো কদ্দুর বারাই দে।

২.
পিন পিনি ঝর দে'র উড়ান ঘাড়া পানি
নই চাইন্দা লায় বউ আনেদ্দে নাওকা টানি টানি।

৩.
ভালা মাইনষে ভালা চিনে
গরুয়ে চিনে খের
উরুইষে চিনে ফাড়া কেঁথা
চোরে চিনে টে্র।

৪.
সোয়ারে সোয়া
পোয়াওয়া ঢো'লা
পোয়াল্যায় আইন্যম কঁরি গোলা
কঁরি গোলা গা'ছত নাই
পোয়া ঢুলাইত মনত নাই।

www.pathagar.com

৫.
লাল গাড়ীয়ান ক'ড়ে
মনিয়া ব'র ঘাড়ার হেড়ে ।
৫.
তা'ত্তু নাই দে ঘর বাড়ি
তে চলান্দে লাল গাড়ি
মানিয়া বর নাম কি
শহরাইল্যা হাংকি ।
হাংকি গেইয়ে পানির লায়
পোয়া কান্দের দুধর লায়
অপোয়া অপোয়া কান্দর কিল্যায়
লাল গাড়ীর চাক্কার লায়
সেলিম সেলিম বর সেলিম
দুধের মালায় আইসক্রীম
এক তালাত্তুন দুই তলা
ঘুরাই মাইল্য তাস খেলা ।
৬.
তর নাম কি? একই বেকই ।
তর মইষ ক'ড়ে চরে? মু'রাত চরে ।
তর মইষে কি খের খায়? খাঁনায়ার আগা ।
তর মইষে লা'দে কন্ডইল? ছেরা ছেরা ।
তর পুন ক্যা মরা? ভাতে মরা
ভাত কনে ন'দে? বউয়ে ন'দে ।
বউয়রে ধরি বায্যাইলে?
ছইল্যা কাঁদে ।
৭.
একখান কথা
ব্যাঙের মাথা ।
ক্যান ব্যাঙ?
সরু ব্যাঙ ।
ক্যান সরু?
হা'ড়র সরু ।
ক্যান হাট?
গজার হাট ।
ক্যান গজা?
চষ্যা গজা ।
ক্যান চষ্যা?

www.pathagar.com

বান্দর বাচ্ছা।
ক্যান বান্দর?
ঝরা বান্দর
ক্যান ঝরা?
বরই ঝরা
ক্যান বরই?
লাল বরই
ক্যান লাল?
কানি বগার টাল॥

৮.
ধইয্যার ফেনা
বোয়াল মাছর গদ্দানা
বটগাছর খোন্দা
জিলাপীর বোন্দা
ছইয়র লতা
পুইয়র লতা
পূইয়ার মাথা
ওইত্‌তলে গুনগুনি
কালা মিয়ার টুনটুনি
সুওয়ারী গাছত উড়নী
ছিরিত ছিরিত মুতনী।

৯.
বর গাছর বর আম
বর ছুরিদি কাড়ি খাম।

১০.
ডাব ডাব ডাব
বাইট্টা তোর বাপ
খালত দিয়ে ঝাঁপ
চত্বর ধইয্যে সাপ।

১১.
মছলারে মছল্লা
তুঁ'ই লই আঁই লই এক সল্লা
বছর বছর পান ছল্লা
কু'রা জরাই মল্লা
খাইতে মজা কল্লা।

১২.
আঁর ভাই বগাইয়া

www.pathagar.com

কলার ছড়া পাগাইয়া
সাত্যা সাত্যা তাবিজ
মধিন্যা মারে আনিস
মধিন্যা মা' চিতা খলাত
টে টে টে বে বে বে
আনা হঁনী দুয়ানত্
ডাক্তর আইয়ের উড়ানত
আঁর জেড়া কোমপানী
জবিন আছে আধগানী
আঁত্তু দু'য়া বিরিশ আছে
লারাই দিবানী
রেল গাড়ীর চাক্কা
বিরিশে দিয়ে ধাক্কা
এণ্ডা ফুরুত টাণ্ডার মা।
১৩.
আচ্ছালামু আলাইকুম
দুলা ভাই
পেট পুরেদ্দে তোয়ার লায়
ঘরত আছে লতাপাতা
কা'রে কৈয়ম দুঃখের ক'থা।
১৪.
শনিবার দিন বাজারত যাইয়ম
বি' ফাতেমা রে মাতাই লইয়ম
খলিবারে বুঝাই চাইয়ম
সু'ন্দি দু'য়া ফুল দিয়ম
আদ্দুল্যা তে ডেরাইভার
নুরনার তার পেসিন্দার।
১৫.
বাড়ির পিছে ইজল গাছ
ডেইলায় বইয়ে টিয়া
মনে মনে ভাবি য়েনে
তোয়ারে গইল্যাম বিয়া।
১৪.
পিয়াইজ্যারে ভাই
এ বছর অইব বান
গাছর আগাত বাসা বাঁধি
খুঁড়ি খাইও ধান।

www.pathagar.com

১৫.
ছা'রা খাতু বাজারত যায়
খারু বেচি লারু খায়।"[৩৩]

**রাখাইন ছড়া-১ :**
আ ফোঃ আ ফোঃ জা তুঃ লে?
সোওয়ে ঙোওয়ে তুঃ রে।
সোওয়ে না ঙোওয়ে না ফা ফোঃ লাঃ?
মা ফা।
আফোঃ জা র মা নি রে?
নেংদারা ছি র মা নি রে।
নেংদারা ছি তালুং পিঃ ফো লাঃ?
মা পিঃ।
মাং ঘং থাৎ-মা ক্রাৎ সি,
য়াক্ পা লাই,
মা য়াৎ।
চাঃ কা চাঃ লি, সিঃ মা পাউ ঘেঃ
ভূ ভূ ভূ ভূ।

**অনুবাদ**
দাদু দাদু কী খনন কর?
সোনা রূপো খনন করি।
সোনার সাথে রূপোর বদল করবে কি?
করবই না।
দাদু তুমি থাকো কোন গ্রামে?
থাকি আনারস গ্রামে।
দেবে কি আনারস একটি?
দেব না।
তোর মাথার ওপর মুরগীর বিষ্ঠা,
ফেলে দাও।
দেব না।
খাও তো খাও, পায়ু বুদ ফাটিও না
ভূ ভূ ভূ ভূ।

**বিবরণ :**
এটি এক ধরনের দৌড় খেলা বিশেষ। একদল ছেলেমেয়ে তাদেরই একজনকে দাদু বানিয়ে এক কোণায় বসিয়ে রাখে। উপরোক্ত আবৃত্তি করার পর সবাই পালিয়ে যায়। যাকে সর্বপ্রথম বর্ণিত দাদু স্পর্শ করতে পারে তাকেই পরবর্তীতে দাদুর ভূমিকা

www.pathagar.com

পালন করতে হয়। এভাবে পালাক্রমে দাদুর অভিনয় করে ছেলেমেয়েরা এ খেলা উপভোগ করে মজা পায়।

**রাখাইন ছড়া-১**

তেংখাঃ ছুগ্রিঃ তেংখা ফওয়াং?
মা ফওয়াং।
কোওয়েন য়া, ছিঃ-য়া পিঃ বা মে।
চা সউ খেংবামে।
ওয়াং বা লিগেট মাঃমা সেরো
তাগিং ওয়াং মং পেং জাং
নাক্রিং ওয়াং মং পেং জাং
ছুংগ্রিং ওয়াং মং পেং জাং
মাং মি নামে জালে?
ক্রাক্ ছেং নিং।
মাং ফা নামে জালে?
ক্রাক্ ছেং ফ্রু।
মোওয়ে ধা নাঃ খোওয়েত ফোলাঃ?
ঙোওয়ে ধা নাঃ খোওয়েত ফোলাঃ?
সোওয়ে ধা নাঃ খোওয়েত ফো?

**অনুবাদ**

দরজার মালিক দরজা খোলো
খুলব না।
পান কিলি তামাক কিলি দেবো
খাত খাওয়াবো।
আদরের সোহাগের মেয়েরা প্রবেশ করো
প্রথমবার প্রবেশে মংপেং জাং
দ্বিতীয়বার প্রবেশে মং পেং জাং
তৃতীয়বার প্রবেশে মং পেং জাং
তোর মায়ের নাম কি?
লাল পেঁয়াজ।
তোর বাপের নাম কি?
সাদা রসুন।
সোনা তরবারি দিয়ে জবাই করবে?
রূপো তরবরি দিয়ে জবাই করবে?
সোনা তরবারি দিয়ে জবাই করব।

**রাখাইন ছড়া-১**

ওয়েং খ্রি পেৎ পেৎ ওয়েং ওয়েং

www.pathagar.com

ওয়েংক্রি জা লাউ ক্রি লে?
এ লাউ ক্রিরে।
ওয়াইং ক্রি জালাউ ঙে রে?
এ লাউ ঙেরে।
ছেংগুরাছিঃ কোঃছে খ্রাউ লং
হাইশো-হাইশো-হাইশো।

**অনুবাদ**

বড় পেট বড় পেট
কড় পেট কত বড়?
এতবড়।
বড় পেট কত ছোট?
এত ছোট।
ছেংগুরাছিঃ ছিয়ানব্বটি
হাইশো-হাইশো-হাইশো।

**রাখাইন ছড়া-১**

আমেলে রাউ মঃলে
মোহাং খুঃজং লাঃগেৎমে
মোহাংলে খুঃ চুঃ লে চুঃ
চুঃকোলে থোওয়ে নিংলে ওয়াং
ইংগোলে রাউ মোঃলে থাউ
কাউকারি কাউ।

**অনুবাদ**

ও দিদি ও বৌদি গো
মোহাং শাক তুলতে চল
মোহাং শাকও তুলি, কাঁটাও ফুঁটি
কাঁটাও বের করি, সন্ধ্যাও হয়
বাসাও পৌঁছি, ভোরও হয়
মোরগও ডাকে, কুক কু রু কুক।"[৩৩]

## ছ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ

"বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিরূপ কী ছিল, তা নিয়ে নানামত বিদ্যমান। কিন্তু যখন একে প্রতিষ্ঠিত ভাষা ও সাহিত্য হিসাবে প্রত্যক্ষ করি– গৌড়ের মুসলমান সুলতানদের দরবারে, তখন তার বেশির ভাগই পরিচিত হত পুথি বলে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতকে সে সময়ে পুথি কাব্যই বলা হতো। তেমনি বলা হতো জয়নুদ্দিন, আলাওল, মিয়া সুলতান, মোহাম্মদ সগীর, শাহ গরীবুল্লাহ্ প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যবলীকেও পুথি

www.pathagar.com

কাব্য। বস্তুত কাহিনিমূলক পদ্য রচনাগুলিই প্রধানত সে যুগে পুথিকাব্য বলেই পরিচিত হত।"[৩৪]

"পুথি সাহিত্যের ধারায় বাংলাদেশের পুথিকাব্যে কারবালার ইতিহাস গৃহীত হবার বিশ্লেষণে গবেষক ডক্টর আহমদ শরীফ লিখেছেন– "সব দেশের কাহিনী কাব্যই ঐতিহ্য নির্ভর। আমাদের বাঙ্গালী মুসলমান রচিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যও বিশেষভাবে মুসলিম ইতিকথাকেই কাব্যের বিষয়বস্তু করেছিলেন।

...আর একটি কথা হচ্ছে, মানুষের রোমান্টিক রস-পিপাসা চরিতার্থ করবার পক্ষে গ্রীক এবং হিন্দু পুরাকাহিনী যেমন মনোময় কল্পনার অবসর নেই। কোরআন হাদিসকে বিকৃত করবার দুঃসাহস তাদের ছিল না। তাই ইসলামের প্রথম যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহের নানা কাহিনীকে মনোময় রসকল্পনা পুষ্ট করে জনসাধারণের রোমন্টিক রস পিপাসা মিটিয়েছেন আমাদের কবিগণ।

যখন এসব কাহিনী কাব্য রচিত হচ্ছে তখনও বীর ও বীরত্বের প্রতি জনসাধরাণের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাই মুসলিম ইতিকথার হজরত আলী, হামজা, হানিফা, হাসান, হোসেন, কাসেম প্রমুখ বীরগণের কীর্তি-কাহিনী রূপকথার আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এতে দেব-দৈত্য-রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে, নদ-নদী-নগরী উল্লঙ্ঘনে, ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিপদ অতিক্রমণে কোথাও বাধা নেই। শতমনী গদা হস্তে যুদ্ধ করা, আশি মণ চালের ভাত খাওয়া প্রভৃতি অদ্ভুত সব কাণ্ড নায়কেরা করে চলেন। এসব সত্ত্বেও দিবসের কর্মক্লান্ত অল্পশিক্ষিত লোকেরা রাত জেগে পরম আগ্রহে বহুকাল ধরে শুনে আসছেন। এত অলৌকিক অস্বাভাবিক কাহিনীর আড়ালে রয়েছে ইসলামী শিক্ষাপুষ্ট সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি। বীরত্বে, মহত্বে, মানবতায় প্রেম-প্রীতি সহৃদয়তার যে মধুর চিত্র এসব পুথিগুলোতে অঙ্কিত হয়েছে তা যুগ যুগ ধরে পাঠক ও শ্রোতাদের মনে ইসলামী সংস্কৃতির অন্তত একটি স্থূল রূপ জাগিয়ে রেখেছে। সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য যদি সমাজ-কল্যাণই হয়, তবে স্বীকার করতে হবে 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর কাব্য বাঙ্গালী মুসলমানদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভের সহায়তা করেছে। ..."[৩৫]

পুথি মানে কাব্যগাথা। বাস্তব কাহিনি এবং কল্পকাহিনিকে মধুময় সুর ও ছন্দ দিয়ে পুথি লেখা হয়ে থাকে। যে কোনো পুথিকাব্যে পয়ার, ত্রিপদী, ভঙ্গত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, ছুটকি ছন্দ ইত্যাদি সুরগুলো ধারণ করা হয়।

পুথি মূলত কাহিনি সম্বলিত উপাখ্যান। অনেক বড় কলেবরে বা ক্ষুদ্র পরিসরেও পুথি লেখা হয়ে থাকে। আবহমান বাংলার লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করে আছে একমাত্র পুথি। পুথি গ্রামীণ জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। লোকসাহিত্য এবং লোকসংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসাবে পুথি গ্রামবাংলার কাব্যপ্রিয় মানুষের অন্তরে কল্পনার জাল বিস্তার করে সাহসী, উৎসাহী ও আত্মতৃপ্তি বা চিত্তবিনোদনের সাথে সাথে কাব্যসুধা পানে উন্মত্ত ও ঔৎসুক্য দান করে।

কক্সবাজার জেলার হিন্দু, মুসলিম প্রত্যেকের বাড়িতে পূর্বে পুথিপাঠের জমজমাট আসর বসতো। বর্তমানে এ প্রক্রিয়া কিছুটা লোপ পেয়ে গেলেও গ্রামাঞ্চলে এর চাহিদা এখনো রয়েছে ব্যাপক।

www.pathagar.com
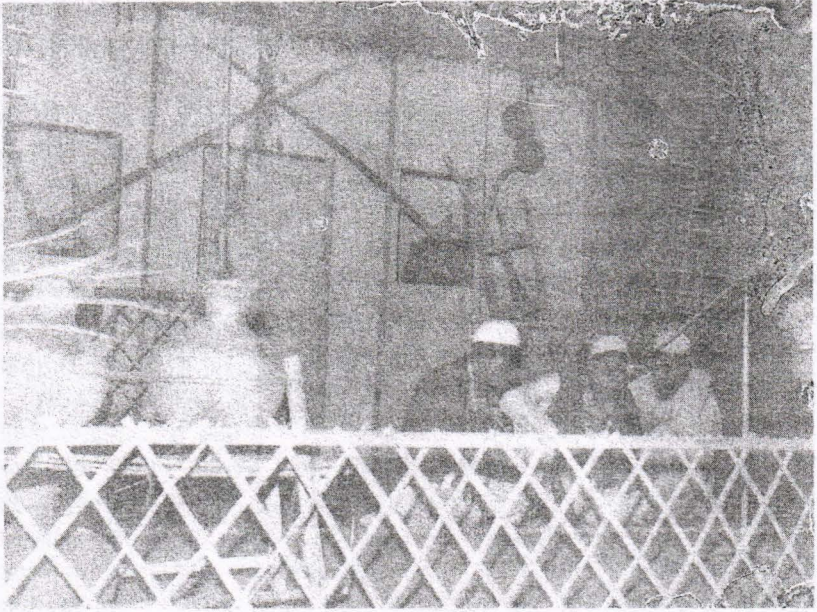
*কক্সবাজার সদর উপজেলার কবির আহাম্মেদ পণ্ডিতের নেতৃত্বে পুথিপাঠের আসর*

শীতকালে জোছনারাতে জেলার নিভৃত পল্লি এলাকার মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে পুথি পাঠের আসর বসাতে দেখা যায়। হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবের রাতে বিভিন্ন সুরে প্রতি বৎসর পুথিপাঠ করতে দেখা যায়। প্রায় পুথির কাহিনি প্রেম, ভালবাসা ও যুদ্ধ নিয়ে রচিত। রাজা বাদশার প্রেমকাহিনিগুলো মানুষকে কল্পনার তেপান্তরে নিয়ে যায়। মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বেমালুম সব ভুলে গিয়ে অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে পুথি পাঠ শ্রবণ করে থাকে।

**যেভাবে পুথির আসর বসে :** পুথির কথা ও ভাষা প্রত্যেক মানুষের মনকে নাড়া দেয়। প্রত্যন্ত জনপদে মধ্যরাতে দেখা যায় বিয়ের বাড়িতে বৈরাতিরা (বরযাত্রী) যখন কনের বাড়ি যায় তখন বৈরাতিদের বিশ্রামের দীর্ঘ সময়টা মধুময় করে তোলার জন্য কনে পক্ষ পুথিপাঠের আসর আয়োজন করে থাকে। কনেপক্ষ দুইজন পুথিপাঠক এবং একজন বিজ্ঞ ও পারদর্শী বাক্যের অর্থ বর্ণনাকারীর ব্যবস্থা করে থাকে। অর্থ বর্ণনাকারী সুন্দর সুন্দর উপমা সহযোগে পুথিতে বর্ণিত শ্লোকসমূহের অর্থ শ্রোতাদের বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণনা করেন। পাঠকদ্বয় মোহন সুরে সুললিত কণ্ঠে পুথির পদ গেয়ে যায়। এই দৃশ্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর।

জেলার প্রায় সর্বত্র দেখা যায় কোনো গৃহস্থের বাড়িতে বিশেষ কোনো উৎসবে ছেলের খৎনা বা মেয়ের কানছেদানির আয়োজনের সাথে গ্রাম্য পুথিপাঠক পণ্ডিতদের দাওয়াত করে আনা হয় এবং বাড়ির উঠানে বা প্রাঙ্গণে পুথি পাঠের আসর বসায়।

www.pathagar.com

এতে প্রেমকাহিনিভিত্তিক পুথি থেকে পাঠ আস্বাদন করা হয়। পুথির অমিয় মধুর ছন্দগুলো এবং তাতে লিপিবদ্ধ রোমাঞ্চকর কাহিনিধারা মানুষের মনকে সুদূর কল্পনায় নিয়ে যায়।

**পুথিকাব্য পরিচিতি :** বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মহাকবি আলাওল লিখিত কয়েকটি পুথি কাব্য যেমন–পদ্মাবতীর পুথি, সেকান্দর নামা বা দারা সেকান্দর/সফর মুলুক বদিউজ্জামাল/সপ্ত পয়কর এবং কবি দৌলত কাজির সতী ময়না কাব্য ইত্যাদি পুথিকাব্যগুলোর ভাষা অত্যন্ত উন্নত ও মার্জিত। রামু উপজেলার অধিবাসী মধ্যযুগের কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'জঙ্গনামা', 'মুসার সওয়াল', 'হেদায়তুল ইসলাম' ও 'শরিয়তনামা', কবি নেয়াজের 'নসিহতনামা', 'নুর জামাল', 'কায়দানী কিতাব', 'যুগকলন্দর', কবি আশরাফ-এর 'কিয়ায়েতুল মুসলেমিন', কাজী মোহাম্মদ হোসেনের 'আদমনামা', হাজী আলীর 'মাওতনামা', হাদীসের পুথি, সুফিকবি কাজী শেখ মনসুরের শির্নামা ও আমীর জঙ্গনামা প্রভৃতি পুথি সংগ্রহ করে পুথিপাঠের আসর বসানো হতো।

অন্যান্য লেখকদের উল্লেখযোগ্য পুথিগুলো হচ্ছে- আলমাছ গুল রায়হান/ জবর মুল্লক শামাবুখ/ হাতেম তাই/ খায়রুল হাশর/ এমরান চন্দ্রবান/ আমীর জঙ্গনামা/ জঙ্গনামা/মুসাফির, গাজী কালু চম্পাবতী/জৈগুন বিবির পুথি/ হানিফা সোনাভান/ দাস্তে কারবালা/ হযরত আমির হামজা/ ইউসুফ জুলাইকা/তমিম গোলাল চৈতন্য ছিল্লাল ইত্যাদি পুথিগুলো পাঠ হয়ে থাকে। বাংলার লোকসাহিত্যের অবয়বকে পূর্ণ করতে পুথির বিকল্প নেই। এছাড়া হিন্দু সমাজের মনসামঙ্গল কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় উপাখ্যান হিসাবে বিবেচিত। ব্যাস দেব ও কাশিরাম রচিত 'মহাভারত' এবং বাল্মিকি মুনি রচিত 'রামায়ণ' পুথি সাহিত্যের দুটো উজ্জ্বল নির্দশন। 'মহাভারত' কাব্যে লেখা হয়েছে-

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশিরাম দাশ কহে শুনে পূণ্যবান।

মহাকবি আলাওল তার সতী ময়না কাব্যে কবিদের উদ্দেশ করে কবির মাহাত্ম্য বর্ণনা করে লিখেছেন,

কদাচিত নহে কবি সামান্য মনিষ্য
নিশ্চয় জানিবে কবি ঈশ্বরের শিষ্য।
কবিগন ঈশ্বরের ভাণ্ডে প্রবেশিয়া
মনি মুক্তা রত্নাদি আনে আহরিয়া।

এছাড়া মহান স্রষ্টার স্তুতি গাহিতে গিয়ে বলেছেন,
তাঁর সপ্ত পয়কর পুঁথিকাব্যে।--
আদ্যতে নিরূপ ছিল প্রভু নিরাকার,
চেতনা স্বরূপ যদি হইল প্রচার।
মহা জ্যোতির্ময় হইল আকার বর্জিত
ঘোরতর তমরাশি হইল নির্জিত।
জ্যোতির সমুদ্রে আদ্য নুর মোহাম্মদ

www.pathagar.com

জগৎ বিজয়ী হৈতে পাইল সম্পদ।
সপ্ত স্বর্গ উদ্যানের আদ্য নবফুল
বুদ্ধি বাক্য শিরোমনি ভুবনে অতুল।
সেই পুস্প হস্তে আদ্য আদম উজ্জ্বল
সকলি কদর্যপূর্ণ সেই সে নির্মল।
অথবা
পদ্মাবতী কাব্যে প্রশ্নের উত্তর চেয়ে কবি লিখেছেন-
"অগন এগন আর রগন সগন
ভগন জগন অন্তে তগন নগন।
এই অষ্ট মহাগন দেখো হো বিদিত
বিরচিয়া কহো দেখি গনের চরিত॥"

"সয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল পুঁথিকাব্যে তাদের প্রেমের পরিণতি হিসেবে যে মিলন ঘটে এবং রাত্রি অবসান হয়ে ফর্সা লগ্ন দেখা দিলে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে যে বিরহী আর্তি ফুটে ওঠে তা কবি নিম্নরূপভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :
"আহারে নিঠুর রবি কঠিন দিবস
তুমি আসি ভঙ্গ কর রসিকের রস।
অনেক দিবসে এক পাইয়াছিলাম নিশি
হেন রস ভঙ্গ দিলি দারুণ রবি আসি।
রসেতে বিরস করি তোর কিবা ফল
রঙ্গ রস ভঙ্গ দিয়া বানালি পাগল॥"
এমরান চন্দ্রবান পুঁথিতে প্রেমিক-প্রেমিকাকে স্বাপ্নিকভাবে পাওয়ার একটি চিত্র নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করেছেন কাব্যকার :
দিবা গোজারিয়া যদি ঘোর ঘোর নিশি আইল
নিশি শশী প্রেম খুশি উদয় হইল।
যদিবা দিবসে পাপ-পূণ্য কিছু হয়
সকলি যে, গুপ্ত কার্য নিশা তুল্য নয়।
ফকির দরবেশ হয় নিশির খাহেশ
আশুক মাশুক হয় নিশি যোগে বস।
অর্ধ দণ্ড হইল যদি বিঘোর রজনী
আসিয়া পৌছিল সেই প্রেম রসধনী।
ধীরে ধীরে বিনোদিনী পালংকে প্রবেশিল
সংগীত করিয়া বাক্য কহিতে লাগিল।
কেনরে নিঠুর বন্ধু অঙ্গ টলমল
পানের ফিকেতে বুঝি না হইল আক্কল।
আরও কত ছল কথা কহিয়া সত্বর
বদল করিয়া লৈল অঙ্গের চাঁদর॥"

www.pathagar.com

কুমারীকে কেহ যদি ছোঁয় পুষ্পাকালে ।
কত সন্ধ্যা উপাস রাখয় তিরি কূলে॥
কুমারীকে কেহ যদি ছোঁয় পুষ্পাকালে ।
সেনান করিতে দুষ্ট সক্কলেরে বলে॥
পঞ্চ কিবা সপ্তদিনে লই খেলাওন্ত ।
ধোপা নাপিত আনি শুদ্ধ করাওন্ত॥
সহেলা গাওন্ত অনাদীনের ধরান ।
ঢোল বাজাই যুবক সবারে জানাওন্ত
আমার কুমারী বধূ পুষ্প দেখিছন্ত॥

মুসলমান সমাজেও হিন্দু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতো সন্তান প্রসবের পর রান্না করা সব কিছু ফেলে দেয়া হতো। কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের কবিতায় তার নজির আছে-

ইষ্টজন মরে কিবা শিশু প্রসবয়
রান্দনের ভাণ্ড সব নিকালি ফেলায়॥

সন্তানের মঙ্গলার্থে নিমুবিয়া পীরের উদ্দেশ্যে ফাতেহা দেওয়ার রীতিও ছিল চালু । কবির ভাষায়-

বালক জন্মিলে এক কুরকুট রাখয়
নিমুবিয়া পীর নামে ফাতেহা করায়

গফুর বাদশা বানচাপরীর পুঁথিতে কবি একটি প্রেমের দৃশ্য এনে পরীকে অসহায় করে লিখেছেন–

"পরীসব চলে গেল গোলেস্তা এরোম
বানেছা ভাবেন একা দেলে খায় গম ।
কে আমার বস্ত্র নিল লাজে আমি মরি
কেমন চোরা করে চুরি পাসরিতে নারী ।
অঙ্গেতে বসন নাহীরে বেবস্ত্র হইয়া
শরমের জায়গা ঢাকে হসবত যে রাখিয়া ।
আড়ালেতে ফিরে পরী বস্ত্র তালাশয়
কে আমার বস্ত্র নিল পুকারিয়া কয় ।
কে আমার বস্ত্র নিছ দেহনা আনিয়া
নহে ব্রহ্মশাপ দিয়া দেব জ্বালাইয়া ।
ব্রহ্মশাপ ভয় যদি পাইল কুমার
আড়াল হৈতে আসে নিকটে কন্যার॥"

ছৈয়দ হামজা লিখিত 'মধুমালতী' পুঁথিতে মধুমালতীর সংক্ষিপ্ত রূপ বর্ণনা নিম্নরূপভাবে ত্রিপদীতে দিয়েছেন ।

সহজে রূপের ভরে, আপনি চলিতে নারে
নবীন যৌবন তাহে ভার ।
রূপের মুরারী বালি, ক্ষীণমধ্যা পড়ে ঢলি,

www.pathagar.com

কেমনে বহিবে অলংকার॥
চন্দ্রের জিনিয়া রূপ, সূর্যের যেমন ধুপ
আবরণে কিবা প্রয়োজন।
এওরাও অন্য যত, দেশের চলন মত
আনিল কিঞ্চিত আভরণ॥
রাগ একাকী ছন্দে মালতীর বিলাপ গাঁথা যেভাবে কবি এঁকেছেন-
আমারে ধরিল কাল নিন
কোন চোরে দিয়া গেল সিন্দ।
পালংকে শুইয়াছিল প্রিয়া
পালংক সহিত গেছে লইয়া।
আমি অভাগিনী যদি জানি
পোহাইতাম জাগিয়া রজনী॥

রাগ ছুটকি ছন্দে অন্য একটি পুঁথির ছন্দ নিম্নরূপে বিধৃত হল।
এই বলে, হেঁটে চলে কতদূর যায়
আগ হেন, জ্বলে যেন, দেখিবারে পায়।
শাহাজাদা, বলে খোদা, কি হবে উপায়
তুমি বিনে, মোর সনে, আর কেহ নায়।
দয়া কর, মোরপর, সামনে সাগর
দেব ঝাম্প, হউক লম্প, সব দয়া তোর॥"[৩৬]

বিভিন্ন সুর ও ছন্দে গাওয়া হয় পুথি। পুথি লোকসাহিত্যের এক বিরাট উৎস। কিন্তু পরিতাপের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে, ইদানীং পুথিসাহিত্যিক ও পুথি চর্চা বলতে মোটেও নেই। নতুন করে আর পুথিও লেখা হয় না এবং পুথি পাঠের সে আসরও আগের মতো বসে না।

পূর্বে যাঁরা পুথি-পাঠের সাথে জড়িত ছিলেন তাঁদের অনেকেই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন না ফেরার দেশে। কেউ কেউ এখনো জীবিত আছেন। পুথি পাঠের সাথে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, কক্সবাজার সদরের আবদুল করিম (বরকেতা গাইন), কবির আহমদ পণ্ডিত, ইনু চকিদার, মোহাম্মদ মোস্ত ফা, বংশী মোহন জলদাস, চৌফলদণ্ডির আবদুস ছামাদ, শামসুল আলম বয়াতি, জগু হরিয়াল, রামু উপজেলার কালা মিয়া গায়েন, সোনা আলী, আবুল কালাম আজাদ, তজু পণ্ডিত, গর্জনিয়ার শামসু মিয়া, নছরত আলী পণ্ডিত, হাতি পণ্ডিত, মহেশখালির তাজর মুল্লুক, মকবুল আলী পণ্ডিত, উখিয়া উপজেলার মরহুম নছু পণ্ডিত, হামিদ বকসু পণ্ডিত, আবদু রহমান পণ্ডিত, আবদুল হাকিম পণ্ডিত, কালু পণ্ডিত, হারু পণ্ডিত, পুতুন আলী পণ্ডিত, জবর মুল্লুক পণ্ডিত, আবুল খাইর পণ্ডিত, ছৈয়দ নূর পণ্ডিত, জহির আলম পণ্ডিত, আবুল হাশেম পণ্ডিত, কবিয়াল নুরুল আলম পণ্ডিত, আলী আহমদ পণ্ডিত, আমির হামজা পণ্ডিত ও টেকনাফ উপজেলার রওশন আলী পণ্ডিত, দুলাল কান্তি পণ্ডিত, কামাল উদ্দিন মাস্টার প্রমুখ।

www.pathagar.com

## তথ্যনির্দেশ

১. শামসুজ্জামান খান, 'লোকগল্প ও সমাজ', আধুনিক ফোকলোর চিন্তা, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা ১৬৫ ।
২. মীর আহমদ, বয়স-৬৮, গ্রাম ডলুঝিরি, ইউনিয়ন : ইদগড়, উপজেলা : রামু, জেলা কক্সবাজার, তারিখ : ০২.১০.২০১২. সময় সকাল ১০টা ।
৩. অধ্যাপক মো. জামাল উদ্দিন। পিতা : মোহাম্মদ সেলিম। বয়স ৩৮। পশ্চিম বাইন্যারকুম, কৈয়ারবিল, চকরিয়া, কক্‌সবাজার। তারিখ : ২০ জানুয়ারি ২০১৩ ।
৪. কক্সবাজারের ইতিহাস-ঐতিহ্য-হারুন-উজ্‌-জামান, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ২৬ মার্চ ২০০৪, পৃষ্ঠা-২৬-২৭ ।
৫. রামুর প্রাচীর স্থাপত্য ও ঐতিহ্য- ধনিরাম বড়ুয়া, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : মে ২০১২ । পৃষ্ঠা-৩৮-৩৯ ।
৬. কক্সবাজারের ইতিহাস-সম্পাদিত, প্রকাশক : কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশ : ৩০ জুন, ১৯৯০ । পৃষ্ঠা-২৯২.
৭. মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন, বয়স : ৬৬, পিতাঃ আবুল হাসিম, গ্রাম : উত্তর পালাকাটা (বটতলী), ইউনিয়নঃ জালালাবাদ, কক্সবাজার সদর উপজেলা, কক্সবাজার। তারিখ : ২৪-০৮-২০১২, সময় : সকাল-১০টা ।
৮. কক্সবাজারের ইতিহাস-সম্পাদিত, প্রকাশক : কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশ : ৩০ জুন, ১৯৯০ । পৃষ্ঠা-১৯.
৯. মওলানা আকতার হোছাইন, পিতা : মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, মাতা : মাহমুদা বেগম, বয়স : ৪৪, গ্রাম : পাইন্যাসিয়া, ইউনিয়ন : জালিয়াপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২০-০৮-২০১১, সময় : সকাল : ১১টা ।
১০. কক্সবাজারের ইতিহাস-সম্পাদিত, প্রকাশক : কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশ : ৩০ জুন, ১৯৯০ । পৃষ্ঠা-২৯৩.
১১. কক্সবাজারের ইতিহাস-সম্পাদিত, প্রকাশক : কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশ : ৩০ জুন, ১৯৯০ । পৃষ্ঠা-২৯৩.
১২. ফারুক আহমদ, স্থানীয় সংবাদকর্মী, পিতা : মাস্টার সিরাজুল হক, বয়স : ৪৫, গ্রাম : খোন্দকারপাড়া, কোটবাজার, রত্নাপালং ইউনিয়ন, উপজেলা : উখিয়া, তারিখ : ২০-১২-২০১২, সময় : সকাল সাড়ে ১০টা ।
১৩. কক্সবাজারের ইতিহাস-সম্পাদিত, প্রকাশক : কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশ : ৩০ জুন, ১৯৯০ । পৃষ্ঠা-২৯০.
১৪. মিজানুর রহমান, বয়স : ৪৫, পিতা : মোস্তাক আহমদ কোম্পানী, মাতা : গোল বেচার, গ্রাম : ওয়াহেদের পাড়া, ইউনিয়ন : ইসলামাবাদ, কক্সবাজার সদর উপজেলা, কক্সবাজার। তারিখ : ১২-০১-২০১২. সময় : সকাল : ১০টা ।
১৫. মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন, বয়স : ৬৬, পিতাঃ আবুল হাসিম, গ্রাম : উত্তর পালাকাটা (বটতলী), ইউনিয়নঃ জালালাবাদ, কক্সবাজার সদর উপজেলা, কক্সবাজার। তারিখ : ২৪-০৮-২০১২, সময় : সকাল-১০টা ।
১৬. জোহরা বেগম। গৃহিণী। বয়স : ৬৩ বছর। গ্রাম : বৈরাগির খিল, ডুলাহাজারা, চকরিয়া, কক্সবাজার। তারিখ : ২০-১০-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা ।

www.pathagar.com

১৭. আমিন শরীফ ভুঁইয়া, প্রাক্তন রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, পিতা : মতিউর রহমান, বয়স : ৭০, গ্রাম : সিকদারবিল, রাজাপালং ইউনিয়ন, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২০-১১-২০১১, সময় : সকাল সাড়ে ৯টা।
১৮. মাস্টার শামসুল আলম, পিতা : জাকের হোছাইন, বয়স : ৬৫, গ্রাম : ওয়ালাপালং প্রকাশ মালভিটা, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০১-০৬-২০১১, সময় : বিকাল : সড়ে ৫টা।
১৯. মোহাম্মদ শাহ এমরান, পিতা : মোহাম্মদ আব্বাস সওদাগর, মাতা : মনজিলা বেগম, বয়স : ০১-০৩-১৯৮৭, গ্রাম : ফুলের ডেইল, ইউনিয়ন : হ্নীলা, উপজেলা : টেকনাফ, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৯-০৯-২০১১, সময় : সকাল ১০টা।
২০. জাকের আহমদ মুন্সি, পিতা : বাচা মিয়া সওদাগর, বয়স : ৭২, গ্রাম : ওয়ালাপালং দারগাবাজার, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২০-০৬-২০১১, সময় : সকাল : সাড়ে ৯টা।
২১. শামীম আরা পারভিন, স্বামী : মোস্তফা কামাল চৌধুরী, পিতা : জহির আহমদ, মাতা : মমতাজ বেগম, বয়ষ : ৪৫, গ্রাম : ওয়াইক্ষ্যং, ইউনিয়ন : ওয়াইক্ষ্যং, উপজেলা : টেকনাফ, জেলা : কক্সবাজার, পেশা : শিক্ষকতা, তারিখ : ১৫-১০-২০১১।
২২. মোহাম্মদ জাকারিয়া, পিতা : মাওলানা দিলদার আহমদ, মাতা : আনোয়ারা বেগম, বয়স : ৪৩ বছর, গ্রাম : ঝিমংখালী, ইউনিয়ন : হোয়াইক্ষ্যং, উপজেলা : টেকনাফ, জেলা : কক্সবাজার, পেশা : শিক্ষকতা, তারিখ : ১০-০৬-২০১১, সময় : বিকাল ৪টা।
২৩. মুহম্মদ নূরুল ইসলাম-'শাহপুরীর দ্বীপের পরীরা কোথায় গেল'-(প্রবন্ধ)- সাপ্তাহিক সচিত্র স্বদেশ, ঢাকা, প্রকাশ-১৯৮৬, ঢাকা। পৃষ্ঠা-৬৫।
২৪. অধ্যাপক তৌহিদুল আলম তৌহিদ, পিতা : মোহাম্মদ বদরুজ্জোদা মুন্সি, মাতা : মমতাজ বেগম, বয়স : ৪৮ (জন্ম : ১-২-১৯৬৬), গ্রাম : রাজাপালং, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১৫-০৬-২০১১, সময় : সকাল সাড়ে ৯টা।
২৫. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯। পৃষ্ঠা-৫৪-৫৫।
২৬. নূরুল আজিজ চৌধুরী, পিতা : এখলাছুল কবীর চৌধুরী এডভোকেট, মাতা : জয়গুন বিবি, বয়স : ৬৩, সিনিয়র শিক্ষক, কক্সবাজার কেজি এন্ড মডেল হাইস্কুল। কক্সবাজার পৌর এলাকা। তারিখ : ২০-০৬-২০১২. সময় : বিকাল ৫টা।
২৭. প্রফেসর মুফীদুল আলম, বয়স : ৭২, সভাপতি, সঙ্গীতায়তন পরিচালনা কমিটি, লালদিঘির পশ্চিম পাড়, কক্সবাজার। তারিখ : ২০-০৬-২০১২, সময় : সন্ধ্যা : ৬টা।
২৮. কবিয়াল নূর আলম সরকার, পিতা : শহর মুল্লুক, বয়স : ৫২, গ্রাম : ওয়ালাপালং ঘিলাতলী, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৭-০৮-২০১১, সময় : সকাল সাড়ে ৯টা।
২৯. ফেলে আসা দিন- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম সম্পাদিত, (১৯৮৭ সালে কক্সবাজারে প্রথম বারের ন্যায় আয়োজিত লোক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত), প্রকাশক : কক্সবাজার লোকসাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৭ সাল।
৩০. কবি সুলতান আহমেদ, সিনিয়র আইনজীবী, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, কক্সবাজার ও চেয়ারম্যান, স্থায়ী পরিষদ, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, বয়স : ৬২ বছর, তারিখ : ১৩-০২-২০১৩, সময় : সকাল সাড়ে ৯টা।

www.pathagar.com

৩১. কবিয়াল নূর আলম সরকার, পিতা : শহর মুল্লুক, বয়স : ৫২, গ্রাম : ওয়ালাপালং ঘিলাতলী, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৭-০৮-২০১১, সময় : সকাল সাড়ে ৯টা।

৩২. রেজিয়া বেগম, পিতা : ফয়েজ আহমদ বাঙালি, মাতা : বিলকিস খানম, বয়স : ৫০, পেশা : গৃহিনী, গ্রাম : ওয়ালাপালং ঘিলাতলী, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ :০১-০৬-২০১১, সময় : বিকাল ৫টা।

৩৩. বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায় : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা-মং বা অং (মং বা), লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ। পৃষ্ঠা-১০৮-১১১।

৩৪. পুথি সাহিত্য, 'আবুল কালাম শামসুদ্দীন'- নাজমীন মর্তুজা কর্তৃক গ্রন্থিতা ও সম্পাদিত বাংলা পুথি সাহিত্য, প্রকাশক : ইছামতি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৪১৭, পৃষ্ঠা-১৫।

৩৫. প্রাগুক্ত গ্রন্থের ভূমিকা, পৃষ্ঠা- ১০-১১।

৩৬. আবুল খাইর পণ্ডিত, পিতা : হামিদ বকসু পণ্ডিত, বয়স : ১০৮ বছর। গ্রাম : ফলিয়াপাড়া, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা কক্সবাজার। বিগত ২০১০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বিগত ২০০৬ সালে তাঁর কাছ থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

# বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

## লোকশিল্প

মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথা, কাঁসাশিল্প, বাঁশ-বেতশিল্প বা কারুশিল্প, নকশিশিকা, দেয়ালচিত্র, পটচিত্র ইত্যাদিলোকশিল্প পর্যায়ভুক্ত।

জন্মের পর থেকেই মানুষ বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রীর সাথে পরিচিত হয়। বলা যেতে পারে মানুষের নিজের প্রয়োজনেই এসব সামগ্রীর সাথে পরিচিত হতে হয়। মানুষ বেড়ে উঠার জন্য এসব পণ্য-সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে রান্নাবান্না করার তৈজসপত্র যেমন ডেকসি-পাতিল, থালা-বাসন, কদ্দা, হাত্তুয়া, বছি, বসবাসের বসতবাড়ি, মাছধরার সামগ্রী যেমন ঝাঁকিজাল, ডুলা, লাঙ্গল-জোয়াল, মই, বেড়া, ধান মাড়াইকল, ঢেকি, লাই (টুকরি)সহ হরেক রকমের ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি করতে হয়।

"বস্তুগত লোকসংস্কৃতি পূর্বপুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের নিকট, সমাজের একজনের একটি থেকে সমগ্র সমাজের নিকট এবং এক দেশ বা সমাজ থেকে অপর দেশে বা সমাজে কতকগুলো উপায়ে প্রচারিত, প্রবর্তিত বা অনুসৃত হয়– (ক) মুখে মুখে শুনে অনেক জিনিস প্রস্তুত করবার পদ্ধতি প্রচারিত হতে পারে। এছাড়াও (খ) দেখেও শিখতে পারে– যেমন ঘরবাড়ি, বেড়া, লাঙ্গল, জোয়াল, মই ইত্যাদি প্রস্তুত-পদ্ধতি। (গ) অনেক সময় অনুকরণের মাধ্যমেও শিখতে পারে। যেমন মাটির পাত্রে নকশা করা বা Folk Arts and Crafts- এর অন্তর্গত উপকরণসমূহ।"[১]

"ঈদগাঁও অনেক বড়ো একটা উপত্যকা, এর উপর দিয়ে ঈদগাঁও নামেরই একটি নদীর চমৎকার স্রোতধারা প্রবাহিত। এর মাটি হালকা, এবং বর্ষাকালে এটা এমন কোনো আকার নেয় না যাকে ঝিল বলা যাবে। অনুকূল মৌসুমে এ-অঞ্চল থেকে দু-রকম ধান উৎপন্ন হয়, কিন্তু বৃষ্টিপাত কম হলে একটিমাত্র শস্যই ভরসা। লোকেরা বলে, তারা এতো গরিব যে নদীতে বাঁধ দিয়ে নিজেদের শস্যক্ষেতে জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। সমতলভূমির সর্বত্র ইক্ষু চাষ করা যেতে পারে, কিন্তু একই জমি থেকে ফি-বছর একটা শস্য উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। প্রতি দু-বার অন্তর অন্তর ইক্ষুচাষের মধ্যে দুইবার ধান চাষ জরুরি। ইক্ষুচাষের জমির জন্যে যে সার ব্যবহার করা হয়, তা গাছপাতার ছাইভস্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আরাকান দখলের পর প্রায় একশো দুর্ভাগা পরিবার এখানে এসে উপত্যকায় আশ্রয় নেয়; কিন্তু ব্যাপকভিত্তিতে এলাকা যখন পরিষ্কার হয়ে উঠলো, দেখা গেলো পরিবারগুলোর সংখ্যা কমে গেছে, রয়ে গেছে কেবলমাত্র ২০টি পরিচিত গরিব পরিবার। এই গরিব পরিবারগুলো জীবন নির্বাহ করে বেতের ছড়ি, বাঁশ, তালপত্র দিয়ে ছাতা বানানো, মাদুর তৈরি, ঘর তৈরি প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে। এরা দেখতেও খুব

www.pathagar.com

জীর্ণ-শীর্ণ, এবং বলা যায়, যদি এদের এই দুরবস্থা না হতো তাহলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তারা এলাকা পরিষ্কার করতে পারতো।"[২]

পুরো কক্সবাজার জেলা পাহাড়, নদী-নালা-খাল আর সমুদ্রের সমন্বয়ে গঠিত। পাহাড়ি এলাকায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণের মূল্যবান বৃক্ষ, লতা-গুল্ম, ফল, বনজদ্রব্য। সমগ্র জেলার ভৌগোলিক পরিবেশে রয়েছে বৈচিত্র। যেমন কুতুবদিয়া ও মহেশখালি উপজেলা যা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। উপজেলা দুটিই দ্বীপ। মহেশখালি দ্বীপ হলেও তাতে পাহাড় এবং বনজ সম্পদে ভরপুর। এছাড়াও মহেশখালি উপজেলা সোনাদিয়া, মাতারবাড়ি-ধলঘাটা এবং মূল অংশ মহেশখালি পৃথক তিনটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। অপর দিকে কুতুবদিয়া উপজেলায় বনজ সম্পদ বলতে শুধু পারিবারিকভাবে সৃজিত বনজ সম্পদই। অপরদিকে সীমান্ত উপজেলা টেকনাফের এক পাশে নাফ নদী, অপরদিকে বঙ্গোপসাগর আর দ্বীপের মধ্যস্থলে রয়েছে পাহাড় এবং মূল্যবান বনজ সম্পদ। অনুরূপ ভাবে উখিয়া, রামু, কক্সবাজার সদর, চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। একদিকে রয়েছে বঙ্গোপসাগর আর অপরদিকে পাহাড় এবং বনজসম্পদ। বঙ্গোপসাগরে রয়েছে সামুদ্রিক সম্পদ আর পাহাড় এবং বনজঙ্গলে রয়েছে অন্য ধরনের সম্পদ। জেলার উপকূলে রয়েছে গোলপাতার বাগান। গোলপাতাগুলো মূলত জেলার উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় জন্মে। এসব গোলপাতা থেকে পাওয়া যায় কাঁচা ঘরের ছাউনি, তেমনিভাবে গোলপাতার গাছ দিয়ে হয় মাদুর। জেলার নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর বাড়ির ছাউনির জন্য এসব গোলপাতার উপর নির্ভরশীল। এসব মাদুর বিছানায় যেমন ব্যবহার করা যায়, তেমনি মসজিদে নামাজ পড়ার লম্বা জায়নামাজ (স্থানীয়ভাবে 'সফ' বলা হয়) হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে গোলাপাতার কোমল গাছের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। গোলপাতা গাছ বলা হলেও তা একটি উদ্ভিদ। গোলপাতার রসে তৈরি হয় বাংলা মদ। তবে স্থানীয়ভাবে এসব মদের কোনো ধরনের শিল্প বা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা গড়ে উঠেনি। পূর্বে যা বলছিলাম, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক ভিন্নতার কারণে জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যসহ শিল্পের ধরনও পৃথক। এখানকার প্রধান প্রধান লোকশিল্পগুলো হচ্ছে :

১. মৃৎশিল্প, ২. বাঁশ-বেত বা কারুশিল্প, ৩. নৌ শিল্প, ৪. নকশীকাঁথা, ৫. আল্পনা, ৬. দারু শিল্প ও ৭. ঝিনুক শিল্প।

## ১. মৃৎশিল্প

যারা মৃৎশিল্পের কারিগর বা নির্মাতা বা মৃৎশিল্প তৈরি ও বিপণনের উপর যাদের জীবীকা নির্ভরশীল তাদেরকে কুমার বলা হয়। সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনের মতো কুমার সম্প্রদায়ের লোকজনও সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সেই প্রাচীনকাল থেকেই কুমারগণ বংশানুক্রমে এ পেশায় নিয়োজিত। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমানভাবে এই শিল্পের সাথে জড়িত। কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকায় কুমার সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। বিশেষ করে সদর উপজেলার খরুলিয়া, ঝিলংজা, খুরুশকুল, ঈদগাঁও, রামু উপজেলার চেইন্দা, জোয়ারিয়ানালা, উখিয়া উপজেলার রাজাপালং, রুমখাঁপালং, টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যংয়, চকরিয়া উপজেলার ফাসিয়াখালি, চিরিঙ্গা, হারবাং, কাকারা, মহেশখালি উপজেলার হোয়ানক, কালারমারছড়া, কুতুবদিয়া উপজেলার আলী আকবর ডেইল, পেকুয়া উপজেলার বারবাকিয়ায় কুমার সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। বর্তমানে পেকুয়া উপজেলাসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের কুমার সম্প্রদায় তাদের আদি পেশা বন্ধ করে দিয়েছে। এতে করে তাদের পরিচিতিও হারিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

বর্তমানে জেলার কক্সবাজার সদর উপজেলার ঈদগাঁও ইউনিয়নের কুলাল পাড়া, খুরুশকুল ইউনিয়নের রুদ্র পাড়া, উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের জাদিমুরা, রামু উপজেলার জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের উত্তর মিঠাছড়ি চা বাগান গ্রাম, চকরিয়া উপজেলার ফাসিয়াখালি ইউনিয়নের কুলালপাড়া, চিরিঙ্গা ইউনিয়নে ও হারবাং ইউনিয়ন ও মহেশখালি উপজেলার বড় মহেশখালি ইউনিয়নের কুলালপাড়ায় কুমার সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। খুরুশকুল ইউনিয়নে রুদ্র পাড়ায় বিগত ১০ বছর পূর্বেও প্রায় ৪০টি পরিবার মৃৎশিল্প তৈরিতে জড়িত ছিল। বর্তমানে এই পেশায় আছে মাত্র ৬টি পরিবার। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকতে না পেরে অন্যরা তাদের পেশা পরিবর্তন করেছে। বর্তমানে যে ৬টি পরিবার পেশায় টিকে আছে তারাও দুবেলা ভাত খেতে পারছে না। তবে পৈত্রিক পেশা হিসেবে ছাড়তে পারছে না। দেখা যাবে আগামী ১০ বছর পরে সম্প্রদায়ের লোকজন মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত থাকবে না।"[৩]

*কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুলে মাটির কাজে ব্যস্ত একজন শিল্পী*

*কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশখুলে একজন শিল্পী মাটির কাজ করছেন*

www.pathagar.com
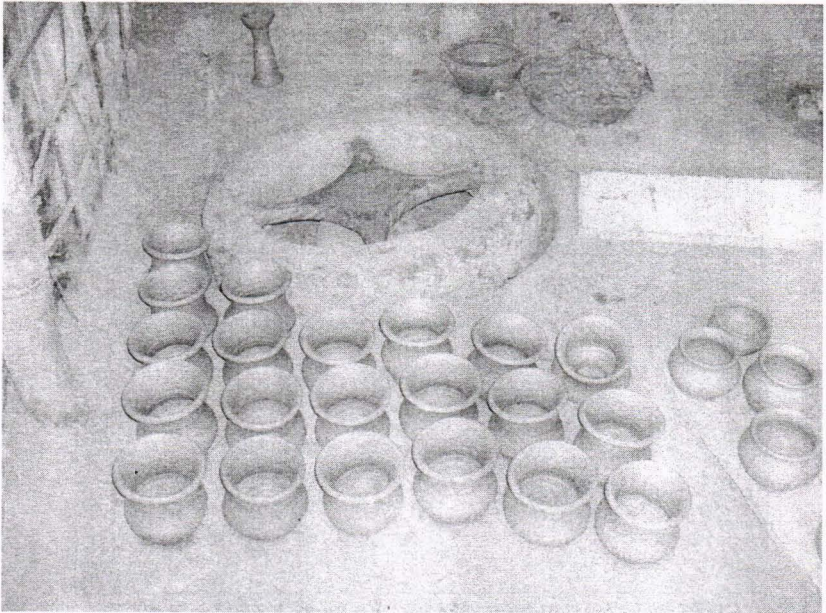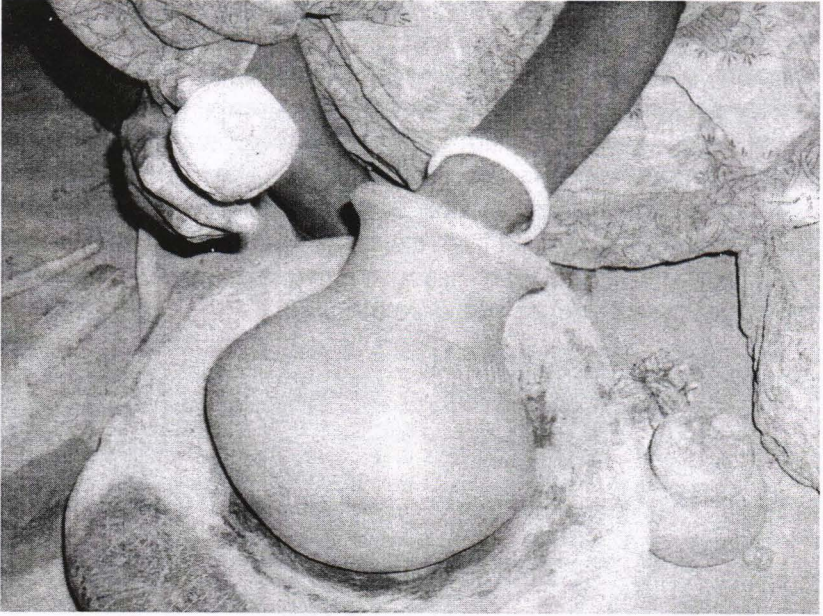
*মাটির কাজ নিয়ে ব্যস্ত একজনশিল্পী (উপরে), তৈরি সামগ্রী (নিচে)*

www.pathagar.com

মাটির নিয়ে কাজ ব্যস্ত একজনশিল্পী

www.pathagar.com

মৃৎশিল্প মানে মাটির তৈরি নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী। এটেঁল মাটি দিয়ে অঞ্চলের কুমার সম্প্রদায় স্থানীয় লোকজনের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য নানা রকম মাটির তৈজসপত্রসহ রকমারি দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি করতো। জেলার সকল কুমারেরা একই ধরনের সামগ্রী তৈরি করে। মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ মাটি। মূলত এঁটেল মাটি মৃৎশিল্পের জন্য উপযোগী উপকরণ। তবে এঁটেল মাটির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের। কালো ও লাল মিশ্রণের এঁটেল মাটি থেকে তৈরি মৃৎশিল্প বেশি টেকসই হয়। কক্সবাজারের প্রায় সর্বত্র এধরনের মাটি পাওয়া যায়। তবে কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুল ইউনিয়নের রুদ্রপাড়ার কুমারেরা নিকটস্থ সরকারি খাস পাহাড় থেকে মাটি সংগ্রহ করেন। আবার ঐসব পাহাড়ে বারুই সম্প্রদায়ের লোকজন পান চাষ করেন। ফলে ওখান থেকে মাটি আনতে হলে এসব পানচাষিদেরকে টাকা দিতে হয়। আশার কথা, সে টাকার পরিমাণ বেশি নয়। মৃৎশিল্পের পণ্য তৈরিতে প্রয়োজন মাটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, মাটিকে পণ্য তৈরির জন্য উপযোগী করে তোলা, পাত্রের আকৃতি দান, রোদে শুকনো, আগুনে পোড়ানো, রঙ বা প্রলেপ দেয়া। পরে মাটিকে উপকরণ তৈরি করার উপযোগী করে তুলতে প্রয়োজন অনুসরে ছোট কোদাল বা ছোট পাতলা ধারালো কাটার দিয়ে কেটে নেয়া হয়। এরপর পরিমাণমতো পানি দিয়ে মাটিকে নরম করা হয়। মাটিতে পানি দিয়ে মাড়িয়ে রুটি তৈরির খামিল তথা মণ্ড তৈরি করতে হয়। পা দিয়ে মাড়ানোর সময় মাটি থেকে কাঁকর, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি বের করে নেয়া হয়। এভাবে মাটিকে পা দিয়ে ডলে ডলে নরম ও আঁঠালো করে পাত্র তৈরির উপযোগী করতে হয়।

মৃৎশিল্পের এসব দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করতে প্রয়োজন দা, কোদাল, কাঠের তৈরি কয়েকটি হাতলযুক্ত কাঠি (স্থানীয়ভাবে এসব কাঠিকে 'ডউয়া' বলা হয়), মাটি কাটার জন্য চিকন পাতলা কাটার, মাটি পরিবহনের জন্য পেরগুয়া বা টুকরি, কাঠের তৈরি ফ্রেম এবং কাঠের তৈরি চাক বা হাচ বা ছাঁচ (কাঠের ফ্রেম তথা চাকা)। চাকা কাঠের পরিবর্তে সিমেন্ট দিয়ে ঢালাই করে স্থায়ী করা হয়। মাটির ছাঁচ বা ফ্রেম অনেক সময় ভেঙে যায় অথবা পানি পড়লে নষ্ট হয়ে যায়। সে কারণে কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুল ইউনিয়নের রুদ্রপাড়ার কুমার সম্প্রদায় মাটি বা কাঠের পরিবর্তে সিমেন্ট দিয়ে ঢালাই করে নিয়েছে। ছাঁচের মাধ্যমে শিল্পীরা রকমারী ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি করে থাকেন। মাটি দিয়ে যে সমস্ত দ্রব্যাদি তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে :

সাধারণত কলস, পাতিল, সোয়া ছ, হাড়ি, দধির ছোট পাত্র, মোমদানি, মঙ্গল প্রদীপ, পইন, ভাপা পিঠা তৈরির কা'কদ্যা (ভাপা পিঠা বানানোর পাত্র), ছঅন (বাসন), কন্দা (পেয়ালা), বচি (বোল), হাত্তুয়া (মাছ ধোয়ার বিশেষ ধরনের পাত্র। যে পাত্রের ভেতরে দাগ কাঁটা থাকে। যাতে সহজেই মাছের আঁশ থেকে অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা যায়), মটকা (বেশি পরিমাণ পানি রাখার পাত্র। এসব মটকা বা পাত্রে আবার সুপারিও ভিজিয়ে রাখা হয়), গজি (চাউল রাখার পাত্র), আইল্যা (মালসা), সুরাই (পানি পান করার পাত্র। দেখতে অনেকটা গ্লাসের ন্যায়।), সরা (স্বল্প পরিমাণ পানি রাখার পাত্র), পানির জগ, গ্লাস, মগ, লুটা (বদনা), কত্তি, ঘটি, খেলনা মূর্তি, হুক্কা, ইট, ফুলের টব, মাটির ঘোড়া, হাতি, ইলিশ মাছ, বউ-জামাই (পুতুল), টেপা পুতুল, খেলনা সামগ্রী ইত্যাদি।

www.pathagar.com

মৃৎশিল্পের এসব সামগ্রী তৈরি করতে প্রথমে মাটি সংগ্রহ করতে হয়। পরে বাড়ির আঙিনায় মটির স্তুপ করে রাখার পরে সে মাটি যাতে শুকিয়ে শক্ত হয়ে না যায় বা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে না যায় সেজন্য মাটির উপরে পলিথিন দিয়ে রাখা হয়। পরে প্রয়োজন মতো মাটি নিয়ে তা কোনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে কোদাল বা চিকন পাতলা টিনের কাটার দিয়ে মাটিকে কাটতে হয়। পাতলা টিনের কাটারটির দু'পাশে কাঠের হাতল যুক্ত করা হয় যাতে মাটি কাটতে গেলে হাত কেটে না যায়। মাটি কাটার সময় প্রয়োজনে মাটি নরম করার জন্য পানি দিতে হয়। পরে মাটিকে পা দিয়ে পিষে ও হাতে খামিল তৈরি করা হয়।

কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরশকুল ইউনিয়নের রুদ্রপাড়ার মৃৎশিল্পীরা মৃৎশিল্প তৈরি করতে চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করে। উক্ত চারটি পদ্ধতি হচ্ছে- ১. চাকার মাধ্যমে, ফারার মাধ্যমে, ছাঁচের মাধ্যমে ও হাতের মাধ্যমে।

পাতিল তৈরি করার জন্যে মণ্ড করা মাটির দলাটি ছাঁচে বা ফ্রেমে ফেলে ছাঁচকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত দিয়ে পাতিল তৈরি করা হয়। বানানো পাতিলটির ফিনিসিং-এর জন্য ঘরের ছায়াতে রাখা হয়। পরে পাতিলের পানি একটু শুকিয়ে যাওয়ার পরে কাঠের তৈরি ফারার উপর তুলে পূর্বে তৈরি করে রাখা হাতলযুক্ত কাঠি বা ডউয়ার সাহায্যে পিটিয়ে পিটিয়ে মসৃণ করা হয় একই সাথে পানিতে ভিজানো ন্যাকড়ার সাহায্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষে ঘষে মসৃণ করে নেয়া হয়। তারপর রোদে শুকিয়ে শুকানো হয়। পরে খড়ের আগুনে পুড়াতে হয়। খড়ের আগুনে পুড়ানো হলে পাত্রের শরীরে একটি কালো মতো রং ধারণ করে। হাঁড়ি, বছি, বত্তন বা সানকি, পেয়ালা, কলসি একই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। তবে খড়ের মূল্যবৃদ্ধি ও অতিরিক্ত বেশি খড় প্রয়োজন হয় বিধায় খুরুশকুলের রুদ্র পাড়ার মৃৎশিল্পীরা চুল্লিতে (স্থানীয়ভাবে চুল্লিকে পইন বলে) শুকানোর ব্যবস্থা করে। একটি চুল্লিতে ৫০টি বা ৬০টি বিভিন্ন আকৃতির ও সাইজের পাত্র পুড়ানো হয়। চুল্লিতে কাঠ দিয়েই এসব পাত্র পুড়ানো হয়। এদিকে বর্তমানে লাকড়ির মূল্যও অনেক বেড়ে গেছে। যার ফলে উৎপাদনখরচ পড়ে অনেক বেশি। কলসি বা অন্য কোনো পাত্র তৈরি করে শুকানো বা চুল্লিতে পুড়নোর আগে নির্দিষ্ট স্থানে নক্সা অঙ্কন করা হয়। এসব নক্সা অঙ্কন করার জন্য পূর্বেই আরেকটি ছাঁচ তৈরি করে রাখা হয়। এছাড়াও কলসি, হাত্তুয়া, গজি, মটকা এসবের তলায় বালু দিয়ে লিপে দেওয়া হয়। যাতে এসব ধারালো বালু পাত্রের তলে আটকে থাকে। বালু না দিলে পাত্রটি খুবই পিচ্ছিল হয়ে যায়। সে কারণে যে কোনো স্থানে যাতে আটকে থাকে সে জন্য বালু দিয়ে লেপে দেওয়া হয়।

সম্পূর্ণ শুকানোর পরে পাত্রে ইচ্ছামতো রঙ লাগানো হয়। ব্যবহারিক দ্রব্যগুলোতে নিজেদের তৈরি রঙই শিল্পী ব্যবহার করেন। পানিতে খয়েরের সাথে সোডা, লাল মাটিসহ একসাথে মিশিয়ে চুলায় দিয়ে আগুনে ফুটিয়ে লাল রঙ তৈরি করা হয়। রং করে দেয়ার পরে তৈরি সামগ্রী শুকিয়ে চুলায় পুড়ানো হয়।"[৪]

বর্তমানে কুমার সম্প্রদায় চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে রয়েছে। বর্তমানে প্লাস্টিক, মেলামাইন এবং চীনা মাটির তৈজসপত্রসহ নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী পুরো দেশ ছেয়ে গেছে। ফলে কুমার সম্প্রদায়ের তৈরি তৈজসপত্র, খেলনা-বাটিসহ অন্যান্য সামগ্রীর

www.pathagar.com

প্রতি মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া প্লাস্টিক ও মেলামাইনের দ্রব্যসামগ্রী দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে লোকজন ওয়ানটাইম মাটির তৈরি তৈজসপত্রসহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে কোনো কোনো এলাকায় কুমার সম্প্রদায় তাদের পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশা গ্রহণ করেছে। তবে এখনো কিছু কিছু মাটির তৈরি পাত্রের ব্যবহার আছে। তৎমধ্যে দইয়ের হাড়ি, মঙ্গল প্রদীপ, বাণিজ্যিকভাবে দই বিক্রির ছোট ছোটো পাত্রের ব্যবহার বেশি। এছাড়াও গ্রামে সুপারি ভিজিয়ে রাখার জন্য মটকা বা চা সংরক্ষণের গজির ব্যবহার কিছুটা আছে। চাউল রাখার গজির স্থান দখল করেছে এলুমিনিয়ামের বা টিনের তৈরি বক্স বা প্লাস্টিকের বক্স। পূর্বে বড় বড় মেজবান উপলক্ষে আগত লোকজনকে ভাত খাওয়াবার জন্য মাটির সানকি বা ছঅন (বাসন) ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে।

কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুস্কুল ইউনিয়নের কুলালপাড়া, ঈদগাঁও ইউনিয়নের কুলাল পাড়ার মৃৎশিল্পীরা কেবল হাঁড়ি-পাতিল, কলস, বত্তন বা বাসন, বছি বা ভাতের বোল, কন্দা বা তরকারির পেয়ালা, মটকা-গজি (চাউল মওজুদ করে রাখা বা সুপারি ভিজিয়ে রাখার পাত্র), হাত্তুয়া (মাছ ধোয়ার পাত্র), আইল্যা (মালসা), সানকি, হুক্কা, পানির পান করার গ্লাস, বরুনা বা ঢাকনা, কড়াই জাতীয় উপকরণ তৈরি করতো। নিত্য প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী ছাড়াও পাশাপাশি শিশুদের খেলনার জন্য বিভিন্ন আকৃতির পাখি, ময়ূর, ষাঁড়, হাতি, হাঁস, পুতুল, ছোট ছোট খেলনা হাঁড়ি-পাতিল প্রভৃতি তৈরি করতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মৃৎশিল্পীরা অনেক সামগ্রী তৈরি বন্ধ করে দিয়েছে। ঈদগাঁও ইউনিয়নের কুলাল পাড়ার দুলালের মতে বর্তমানে বাজারের সস্তা দামের প্লাস্টিক সামগ্রীর কারণে মাটির তৈরি সামগ্রী বাজার হারাচ্ছে। মাটির তৈরি সামগ্রীর স্থায়িত্ব বেশি না হওয়ায় মানুষ মেলামাইনের দিকে ঝুঁকছে। মৃৎশিল্পীরা মেলামাইনের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। এতে করে অনেক শিল্পী পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো পেশার সাথে জড়িয়েছে। আবার কোনো শিল্পী বেকার হয়ে জীবিকা অর্জনে ধুকছে।"[৫]

কক্সবাজারে মাটির তৈরি শিল্প সামগ্রী নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে লোকসাহিত্য। হাইল্যাগীতে আমরা তার উদাহরণ দেখতে পাই। যেমন :

"বাইট্যা মরিচ অল অইট্যা
মেইট্যা বাছন খসউজ্যা
পানি খাইত দিয়েরে কত্তি
ধইত্যে বিরবিজ্যা।
অভাইরে...
পানি খাইত দিয়েরে কত্তি ধইত্যে বিরবিজ্যা।"[৬]

## ২. মাদুর শিল্প

মাদুর শিল্প একটি প্রাচীন শিল্প। পুরো জেলায় মাদুরশিল্পীর কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই। গৃহকর্তা থেকে শুরু করে বাড়ির ছেলেমেয়ে এমনকি বউ-ঝিয়েরাও এ শিল্পের শ্রমিক। তবে এটাকে পেশা হিসেবে নিয়ে কেউ টিকে থাকতে পারবে না। বাড়ির

www.pathagar.com

কর্তাসহ সকলেই অবসর সময় এবং বাড়ির কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাদুর তৈরিতে আত্মনিয়োগ করতো। জেলার সর্বত্র মাদুর তৈরি করতে দেখা যেতো। তবে জেলার উপকূলীয় এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় মাদুর শিল্পের প্রসার বেশি। মাদুর শিল্পের কাঁচামাল হচ্ছে গোলপাতা এবং পাড়িজ্জাম নামে খ্যাত এক প্রকার পাহাড়ি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। বিশেষ করে উপকূলীয় ও নদীর তীরে যেসব নদীতে জোয়ার-ভাটা হয় সেখানে গোলপাতা উৎপন্ন হয় এবং পাহাড়ি এলাকার জলাবদ্ধ ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় পাড়িরজ্জাম উৎপন্ন হয় বেশি। যেখানে মাদুরার কাঁচামাল সহজলভ্য সেখানেই এই শিল্পের প্রসার বেশি। জেলার সদর উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নের ইউসুফের খিল, ঈদগাঁও ইউনিয়নের ভোমারিয়াঘোনা, পোকখালি, ঝিলংজা, কলাতলি, ইসলামপুর, রামু উপজেলার উখিয়ারঘোনা, খুনিয়াপালং কালাপাড়া, ধেছুয়া পালং, গর্জনিয়া, চাকমারকুল, জোয়ারিয়ানালা, রসিদনগর, ইদগড়, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে, টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং, টেকনাফ সদর, মহেশখালি উপজেলার প্রায় সর্বত্র, চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলার প্রায় ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে কাঁচামালের পাশাপাশি মাদুর শিল্প গড়ে উঠেছে। পাড়িজ্জামের নীল অংশ দিয়ে তৈরি হয় শীতলপাটি। বুকের অংশ দিয়েই তৈরি হয় মাদুর বা অমসৃণ পাটি যাকে স্থানীয়ভাবে পাড়িজ্জামের বুকের পাটি বলা হয়। বুকের পাটিকে স্থানীয়ভাবে 'খুয়ালা'ও বলা হয়। পাকা পাড়িজ্জামের নীল অংশ নিয়েই শীতল পাটি তৈরি করা হয়। তবে বর্তমানে কক্সবাজারে শীতল পাটি তৈরি করা হয় না বললেই চলে। কোনো একসময় জেলার সর্বত্র শীতল পাটি তৈরি করা হতো।
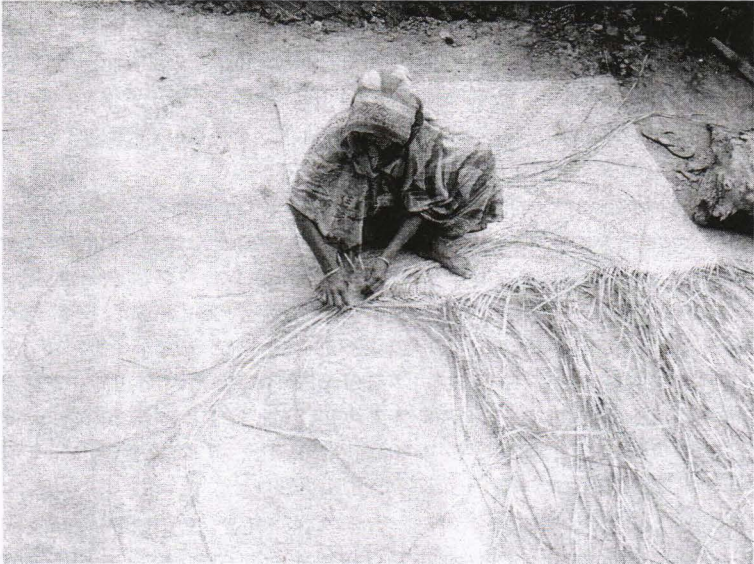
*রামু উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়িতে পাটি বানাতে ব্যস্ত একজন শিল্পী*

www.pathagar.com

আশার কথা বর্তমানে জেলার রামু উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের কোনো কোনো স্থানে কাঁচামাল প্রাপ্তি সাপেক্ষে শীতল পাটি ও চাটাই তৈরি করা হয়। চাটাই তৈরি করার একমাত্র কাঁচামাল হচ্ছে স্থানীভাবে কথিত 'চাড়াপাতা'। জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের পাহাড়ি এলাকা ও গ্রামের স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে এইসব গুল্মজাতীয় 'চাড়াপাতা' উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। এই চাড়াপাতাকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো স্থান চাটাই তৈরি করা হয়। তবে তা শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরঞ্চ পারিবারে ব্যবহারের জন্যই চাটাই নির্মাণ করা হয়।

মাদুরা, চাটাই, শীতল পাটি তৈরির কাঁচামাল হিসেবে প্রয়োজন গোলপাতার গাছ, পাড়িজ্জাম, চাড়াপাতা, পাটের সরু ও মোটা দড়ি, পাটকাটার কাঁচি, দা প্রভৃতি। পূর্বে বাঁশের চওড়া কাইম দিয়ে চাটাইর মুখ বাঁধতে হতো। এতে করে চাটাই দীর্ঘস্থায়ী হতো। অনুরূপভাবে পটির মুখও উপরে-নিচে দুই চওড়া কাইম দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে হতো। চাটাই ও পাটির মুখ বাঁধার জন্য পূর্বে কেইজ্যা বেত ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে কেইজ্যা বেতের পরিবর্তে প্লাস্টিক বা নাইলনের সুতা ব্যবহার করা হচ্ছে। চাটাই, শীতল পাটি তৈরির পদ্ধতি একই ধরনের। কিন্তু মাদুরা বা খুয়ালা তৈরির পদ্ধতি ভিন্ন। পাড়িজ্জাম বা গোলপাতার বুকের নরম অংশ দিয়েই খুয়ালা বা মাদুর তৈরি করা হয়। পাড়িজ্জামের এককেটি সলা পাটের সাহায্যে পরস্পরের সাথে বাঁধার মাধ্যমে মাদুরা বা খুয়ালা তৈরি করা হয়। ব্যবহারের জন্য পাশে তিনফুট বা পাঁচফুট প্রশস্থ খুয়ালা তৈরি করার সময় প্রয়োজন অনুসারে পাটের সুতা দিয়ে আটকানো হয়। অপর দিকে চাটাই তৈরি করা সময় পটের বা কোনো সুতার প্রয়োজন হয় না। পাড়িজ্জাম সংগ্রহ করার পরেই দা দিয়ে ফালা ফালা করে চিরাই করে নিয়ে চাটাই তৈরি করা হয়। চাটাই তৈরির অন্যতম শিল্পী হিসেবে কাজ করে ঘরকন্যারা। গৃহবধূ থেকে শুরু করে ঘরের মেয়েরাই এ কাজটি করে থাকে। ঘরের পুরুষ মানুষ মূলত পাহাড় থেকে বা অন্য কোনো এলাকা থেকে পাতা সংগ্রহ করে দেয়।"[৭]

পাটি তৈরির একমাত্র কাঁচামাল পাড়িজ্জাম। পাশাপাশি বুকের অংশের জামগুলো রঙ করার জন্য বাজার থেকে প্রয়োজনমতো রং কিনে আনতে হবে। পাড়িজ্জামগুলো কিনে আনতে হয়। প্রতিশত কাঠির পাড়িজ্জামের আঁটির মূল্য দুই থেকে আড়াই শত টাকা। অর্থাৎ প্রতিটি আঁটির পাড়িজ্জামের মূল্য দুই থেকে আড়াই টাকা পড়ে। পাড়িজ্জাম সংগ্রহ করার পরে তা দা দিয়ে চিরাই করে নিতে হবে। এরপরেই চিরাই করা পাড়াগুলো দিয়ে পাটি বুনতে হবে। অবশ্যি পাটি বুননের পূর্বে প্রয়োজন হলে জাম বা পাতা রং করে নিতে হবে। রং করার পরে পাটি বুননের সময় শিল্পীর ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন নক্সা তৈরি করে। অনেক সময় পাটির মধ্যে ময়ূর বা অন্যকোনো পাখি তৈরি করে। শিল্পী তাঁর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটান সৃষ্টির মাধ্যমে।"[৮]

কক্সবাজারের উপকূলের গোলপাতা গাছ থেকে তাড়ি বা দু'চুয়ানি সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও গোলপাতা বাড়ির ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ছাউনি হিসেবে গোলপাতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। গোলপাতার ছাউনি কমপক্ষে দুই থেকে তিন বছর স্থায়ী

www.pathagar.com

হয়। এ কারণেই ছাউনী হিসেবে গোলপাতার কদর অনেক বেশি। গোলপাতা গাছের কাণ্ড থেকে দু'চুয়ানী সংগ্রহ এবং ঘরের ছাউনি হিসেবে গোলপাতার ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে জেলার সর্বত্র গোলাপাতা দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে বলতে গেলে টেকনাফের নাফ নদীর তীরের কিছু কিছু অংশে, চকরিয়া উপজেলার ডেইঙ্গাকাটা গ্রামে মহেশখালি চ্যানেলের কোনো কোনো স্থানে, কক্সবাজার সদর উপজেলার বাঁকখালি নদীর তীরে, রামু উপজেলার চাকমারকুল ইউনিয়ন ও জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের আশকরকাটা গ্রামের ফারিরখালের তীরে কিছু কিছু গোলাপাতা দেখা যায়। বর্তমানে গোলপাতার যে যোগান আছে তা দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে মাদুরশিল্পকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বলতে গেলে মাদুরশিল্পের কাচামাল নিঃশেষ হয়ে গেছে। একই সাথে মাদুরশিল্পও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।"[৯]

## ৩. বাঁশ-বেতশিল্প

এই শিল্পের মূল কাঁচামাল বাঁশ ও বেত। বাঁশ এবং বেত মূলত বনজ সম্পদ। আলোচনার শুরুতেই বলেছি কক্সবাজার একটি পাহাড়ঘেরা, বন-জঙ্গলে আচ্ছাদিত জেলা। এই শিল্পের প্রধান কাঁচামালের প্রাচুর্য ছিল জেলার পাহাড় ও বনাঞ্চলে। তবে বর্তমানে পাহাড়ের সেই প্রাচুর্যে ভাটা পড়েছে। পর্যাপ্ত বাঁশ ও বেত পাওয়া যাচ্ছে না। যার ফলে এই শিল্পেও স্থবিরতা নেমে আসছে। লোকালয়ে বাঁশ কিছুটা পাওয়া গেলেও বেতের যোগান মোটেই কমে আসছে। তবে প্রাচীনকালে এই শিল্পের প্রসার ছিল জেলাতেই। চাহিদাও ছিল যথেষ্ট। বাঁশ ও বেত গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ হলেও এটি বনজদ্রব্য এবং বনজ সম্পদ। বাঁশ ও বেত দিয়ে রকমারি আসবাবপত্রসহ পারিবারিক ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা যায়। এককালে লোকজন বাঁশ ও বেতের তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহার করতো। দারুশিল্প বা কাষ্ঠশিল্পের প্রসারের আগে মানুষ বাঁশ ও বেতের তৈরি দ্রব্যসামগ্রীর উপর নির্ভরশীল ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাঁশ ও বেতের ব্যবহার এতই বেড়ে যায় যে বলতে গেলে বিগত ৪০ বছরে বনজ সম্পদ প্রায় উজাড় হওয়ার উপক্রম। তারপরও বাঁশ-বেতের ব্যবহার থেমে থাকেনি।

*একটি বাঁশের স্তুপ*

*রামু উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়িতে চালুন তৈরিতে ব্যস্ত একজন শিল্পী*

www.pathagar.com

রামু উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের খন্দকারপাড়া শিল্পীরা কারুশিল্প তৈরিতে ব্যস্ত

www.pathagar.com

রামু উপজেলার ফতেখারকূল ইউনিয়নের চালুনি পাড়ায় শিল্পীরা কারুশিল্প তৈরিতে ব্যস্ত


www.pathagar.com

*রামু উপজেলার ফতেখারকূল ইউনিয়নের চালুনি পাড়ায় শিল্পীরা কারুশিল্প তৈরিতে ব্যস্ত*

www.pathagar.com

*কক্সবাজার শহরের কুতুবদিয়া পাড়ায় একজন শিল্পী বেতের পণ্যে তৈরি করছে (উপরে) রামু উপজেলার ফকিরা বাজারে পণ্যের পসরা নিয়ে বসেছে একজন শিল্পী (নিচে)*

www.pathagar.com

বাঁশ এবং বেত সংগ্রহকারীরা বিভিন্ন বনজঙ্গল থেকে বাঁশ এবং বেত সংগ্রহ করে নানা প্রকার জিনিসপত্র (যাহা মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক চাহিদা মেটাতে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে) তৈরি করে বাজারজাত করার মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। ইদানীং জেলার পাহাড় এবং বনে বাঁশ ও বেতের সংকট দেখা দেওয়ায় পারিবারিক ও সামাজিক বনায়নে বাঁশ ও বেতের চাষকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এতে করে প্রয়োজনীয় বাঁশ পাওয়া যাচ্ছে গৃহস্থের ভিটিতে। বাঁশ দিয়ে যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা যায় তা হচ্ছে- কাগজ (কক্সবাজারে কাগজের মিল নেই। তবে একসময় এখান থেকে বাঁশ চন্দ্রঘোনার কাগজকলে চালান হতো।), বসতবাড়ি নির্মাণ, বাড়ির বেড়াঘেরা, বাড়ির কাঠামো তৈরি, ডোলা, ডুল (ডুলি), লাই (টুকরি), বড়শির ছিপ, তরজা, তলই, টিয়ারা, ঝুড়ি, দোলনা, চালঅইন (চালুনি), খারাং, কুলা, ঢালা, মুড়া, চাঁই, লুই, মোচা, গরুর কইর, ছাউম্মা, পবিত্র কুরআন মজিদ পড়ার রিয়াল, বাঁশ বা বেতের বক্স, খাচা, ছং, ধান মাড়াই কল স্থানীয়ভাবে যাকে ডলইন বলা হয়, থুরুং, সুতার মাকু, তাঁতের ফ্রেমসহ হরেক রকমের প্রয়োজনীয় দ্রবসামগ্রী বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। অবশ্যি ডলইন তৈরিতে বাঁশ, বেত ছাড়াও প্রয়োজন হয় কাঠ ও মাটি।

কক্সবাজার জেলার প্রতিটি গ্রামের হতদরিদ্র মানুষ বাঁশ দিয়ে উপরোক্ত সামগ্রী তৈরিকরত বাজারজাত করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এই শিল্পের অন্যতম উপকরণ বাঁশ। আকার ও প্রকারভেদে এসব বাঁশের নাম হচ্ছে সিবা বাঁশ, মিতা বাঁশ, পাইয়া বাঁশ, ডলু বাঁশ, মুলি বাঁশ, ওরাও বাঁশ। এ ছাড়া বেত দিয়ে উন্নতমানের টেবিল, চেয়ার, মোড়া, ছিক্কা, বুকশেলফ, সোফা, খাটসহ রকমারি আসবাবপত্র তৈরি হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক সময় মিয়ানমার থেকেও নাফনদী পেরিয়ে প্রচুর বাঁশ, বেত আসছে।

বাঁশ-বেতের সামগ্রী তৈরির কৌশল এক ও অভিন্ন। বিশেষ করে লাই (টুকরি), ডুল, কুলা, চারুন, ডুলা, খারাং, ছঙ বা ওইজ্যা বানানো একমাত্র কাঁচামাল হচ্ছে বাঁশ ও বেত। বেতেরও মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন রকমের। চালুন বানাতে প্রথমে কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ সংগ্রহ করতে হবে। চালুন তৈরির বাঁশকে স্থানীয় ভাবে 'লতাবাঁশ' বলা হয়। কক্সবাজারের বনাঞ্চলে এই বাঁশের জোগান রয়েছে। যারা বনজদ্রব্য সংগ্রহ করে তারা এসব বাঁশসহ অন্যান্য বনজ সম্পদ নিকটস্থ বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে। আবার যারা এই চালুন তৈরিতে জড়িত বিশেষ করে যারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চালুন বা কুলা তৈরি করে তারা নিজেরাও এসব বাঁশ ও বেত বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে। চালুন, কুলা তৈরির জন্য লতা বাঁশ, মিতা বাঁশ বা বরাক বাঁশ, লতা জাতীয় উদ্ভিদ, প্লাস্টিকের সুতা বা নাইলনের সুতা সংগ্রহ করে রাখতে হয়। চালুন বা কুলা তৈরির জন্য পূর্বেই একটি বাঁশের কাইম দিয়ে ছাঁচ তৈরি করে রাখতে হয়। চালুন তৈরির জন্য দা দিয়ে লতা বাঁশ সাইজ অনুসারে কেটে নিয়ে চিরে চিকন চিকন করে নিতে হবে এবং বাঁশের সরু কাঠিগুলোর ধারালো অংশগুলো দায়ের সাহায্যে ছেটে ফেলতে হবে। অন্যথায় চালুন বা কুলা তৈরির সময় টানাটানিতে হাত কেটে যেতে পারে। বাঁশ কেটে চালুনের উপকরণ তৈরির পরে মাটিতে ফেলে চালুন বানাতে হবে। চালুন তৈরির উপকরণ বাঁশের চিকন চিকন কাঠি যাকে স্থানীয়ভাবে 'বেত' মওজুত করে চালুন বানাতে হয়। বাঁশের প্রতিটি বেত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিদ্র রেখে গাঁথতে হবে এবং পর্যাক্রমে তা বড় থেকে বড়

www.pathagar.com

হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চালুনে পরিণত হয়। চালুনের গাঁথুনির কাজ শেষ হলে পূর্বে তৈরি করা ছাঁচের উপর বসিয়ে চালুনের মুখ মারতে হবে। চালুনের মুখ মারার জন্য আগে-ভাগে সিবা বাঁশ বা বরাক বাঁশের ফ্রেম তৈরি করে রাখতে হয়। সেই ফ্রেমের উপর বসিয়ে চালুনের মুখ মারতে হবে। ফ্রেমটি বসিয়ে নাইলনের সুতা দিয়ে আস্তে আস্তে যত্ন সহকারে মুখ বাঁধতে হবে। পূর্বে চালুন বা কুলার মুখ মারার কাজে কেজনি বেত ব্যবহার করা হতো।"[১০] চালুন তৈরির সময় শিল্পী ইচ্ছে করলে বিভিন্ন ধরণের নক্সা তৈরি করে তার মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। জেলার রামু উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের কালা খোন্দকারপাড়ার বেশিরভাগ লোকজন চালুন তৈরিকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ঘরের বউ-ঝিয়েরাই ঘরের সাংসারিক কাজের ফাঁকে চালুন তৈরি করে সংসারের আর্থিক দৈন্যদশা দূর করার জন্য স্বামীকে সাহায্য করছে।"[১১] ব্যবসায়ীরা সাপ্তাহিক হাটের দিন সকালে উক্ত গ্রাম থেকে পাইকারী দরে এসব চালুন কিনে নিয়ে রামু ফকিরাবাজার, খুরুলিয়া বাজারসহ বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে। পাইকারি ব্যবসায়ীরা উক্ত গ্রাম থেকে প্রতিটি চালুন ৫০ থকে ৫৫টাকায় কিনে নিয়ে বিভিন্ন বাজারে প্রতিটি চালুন ১০০ টাকা বা ১২০ টাকায় বিক্রি করে।"[১২]

"চালুন তৈরি করার কারণেই রামু উপজেলার একটি গ্রামের নাম হয়েছে চালুনি পাড়া। স্থানীয়ভাবে গ্রামটিকে চালুইন্যাপাড়া বলা হয়। কক্সবাজারের চালুনকে 'চালইন' বলা হয়। উপজেলার ফতেখারকুল ইউনিয়নের উত্তর ফতেখারকুল গ্রামটি বর্তমানে চালুনি পাড়া নামেই সমধিক পরিচিত। ইউনিয়নের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে উক্ত গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম পাশে রয়েছে ফারিখাল। এই ফারি খালের দুতীরেই রয়েছে গোলপাতা বাগান। বিগত কয়েক দশক আগেও গ্রামের প্রতিটি পরিবারে তৈরি করা হতো চালুন। কিন্তু বর্তমানে উক্ত গ্রামে চালুন বানানো হয় না। বর্তমানে উক্ত গ্রামে চালুনের পরিবর্তে কুলা বানানো হয়। উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের কালা খোন্দকার পাড়াতেই বর্তমানে চালুন বা চালইন বানানো হয়।"[১৩]

"দীর্ঘ ৩০ ছর ধরে পেশায় জড়িত। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কুলা বানানোর কাজে জড়িত। বাঁশের অগ্নিমূল্যের কারণে বাজার থেকে বাঁশ কিনে কুলা বানাতে পোষাতে পারছি না। উপরন্তু ভালো যোগাযোগের অভাবে তৈরি কুলাগুলো সহজেই বাজারজাত করতে পারছি না। স্বামী বাঁশ কিনে, বাঁশ থেকে বেত তৈরি করে দেয়। আর আমি কুলা বানাই। পাইকারি ব্যবসায়ীরা বাড়িতে এসেই এসব কুলা বাজারে নিয়ে যায়। এসব তৈরি কুলা বিক্রির মাধ্যমেই আমাদের সংসার চলে।"[১৪]

কক্সবাজারের বাঁশ ও বেত শিল্প নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে জনপ্রিয় লোকছড়া। এসব ছড়া মূলত শিশুদের ঘুমপাড়ানো জন্যই ব্যবহৃত হতো।

যেমন–

০১.

মইগ্যা আইয়ের খালে নালে
মগিনী আইয়ের কৈ?
মইগ্যার ঝি মগিনী আইয়ের পিছা থুরুং লই।
বাছা ঘুম যারে তুই॥

০২.
ঝর পরেদ্দে ফোড়া ফোড়া বাইরে ভিজের লাই
পুতুর বাপ ত আছাড় খাইয়ে পইরর ঘাড়ত যাই
বাছা ঘুম যারে তুই॥
০৩.
বাইজ্যা বাঁশর বেতর ঢুলুইন নারিছ পাট্টুয়ার দরি
সেই ঢুলুইনে ঘুম যারে গুরা পুতু পরি
যাদু ঘুম যারে তুঁই॥"[১৫]
০৪.
ছাম্মা ভরি আইন্যে ভাত
হাইল্যা বুলি দিয়েরে ডাক
দশ জনল্যা আইনন্যে পুরি
তিননোয়া লইট্যা মাছ।
অভাইরে...
দশ জনল্যা আইনন্যে পুরি তিননোয়া লইট্যা মাছ।"[১৬]

কক্সবাজারে বাঁশ বা বেত শিল্প নিয়ে যেমন সৃষ্টি হয়েছে লোকছড়া তেমনি সৃষ্টি হয়েছে ধাঁধা। যেমন-

০১. তিন কোণা মধ্যম গাতা
দুই আডুয়ে মাইল্লাম যাতা
ঝরঝরাইয়া পইল্ল পানি
হাতদি চা গইল্লেনি। উত্তর : লুই বা ফেঙ্গি জাল। (লুই তঞ্চগ্যা শব্দ। এটি কক্সবাজারের আঞ্চলিক শব্দের সাথে মিশে স্থানীয় শব্দে রূপ নিয়েছে। লুই দিয়ে মাছ ধরার কাজ করা হয়।)

০২. দিলে ন খায়, ন দিলে খায়। উত্তর : কইর বা কওর। (ধান মাড়াই করার সময় যা দিয়ে গরুর মুখে আটকে দেয়া হয়। মাঠ থেকে পাকা ধান কেটে আনার পরে তা গরু দিয়ে মাড়াই করা হয়। ধান থেকে খোষা ছাড়াই যেমন মড়াই করা বলা হয় তেমনি ধান শস্য থেকে ধান পৃথক করাও মড়াই করা বলা হয়)।"[১৭]

এরকম আরো অনেক ধাঁধাসহ বিভিন্ন লোকসাহিত্য বা লোকছড়া বা লোকজ উপাদান পাওয়া যাবে।

বাঁশ ও বেত নিয়ে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করতে যে সমস্ত সহায়ক হাতিয়ার ব্যবহার হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে দা, প্রয়োজনমত চিকন তার যা স্থানীয়ভাবে ২৪তার নামে খ্যাত এবং লোহার বহর (ছিদ্র করার কাজে ব্যবহার করা হয়)। তবে চিকন তারের পরিবর্তে বেত ব্যবহারের প্রতিটি পণ্য বেশি মজবুত হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে এই বাঁশ-বেত শিল্পের উপরও আধুনিকতার ছায়া পড়ছে। পূর্বে চাউল ধোয়ার জন্য বাঁশের এক ধরনের ছোট আকারের লাই (যাকে স্থানীয়ভাবে চাউল

www.pathagar.com

ধোয়ার বা-ইর বলা হয়) ব্যবহার করা হত। বর্তমানে এলুমিনিয়ামের তৈরি বড় বোল ছিদ্র করে চাউল ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। শহর ছাড়িয়ে গ্রামে পৌঁছে গেছে এসব এলুমিনিয়ামের পণ্য। চাষের কাজে গরুর ব্যবহার না থাকায় গরুর কওর বা কইর (গরুর মুখবন্ধ) তৈরি করা হয় না। মজুর বা ধান চাষের কাজের শ্রমিকদের কাছে ভাত নিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্বে বাঁশ বা বেতের তৈরি মোচা বা ছাউম্মার ব্যবহার ছিল প্রতিটি গেরস্থের ঘরে। একজন মজুর বা শ্রমিক হলে মোচাতে করে ভাত নিয়ে যেত। আবার বেশি হলে ছাউম্মা, লাই বা বা-ইর নিয়ে যেত হতো। কিন্তু বর্তমানে মোচা বা ছাউম্মার ব্যবহার সম্পূর্ণ উঠে গেছে। যার ফলে মোচা তৈরি করা বলতে গেলে প্রায় বন্ধ। বর্তমানে মোচার স্থান দখল করেছে স্টিলের বা মেলামাইনের টিফিন বক্স বা স্টিলের বা এলুমিনিয়ামের টিফিন ক্যারিয়ার বা এলুমিনিয়ামের বড় বোল। চাহিদা অনুযায়ী মেলামাইনের টিফিন বক্স বা টিফিন ক্যারিয়ার বা এলুমিনিয়ামের বোলের ব্যবহার। বর্তমানে মেলামাইনের টিফিন বক্স বা স্টিলের ক্যারিয়ারের স্থলে কেউ শ্রমিককে মোচা বা ছাউম্মায় করে ভাত দিলে তাকে অবহেলা করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। ফলে পরদিন থেকে সে শ্রমিক আর কাজেই আসবে না। ধান রাখার জন্য পূর্বে বাঁশের তৈরি ডোল ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে ধান রাখার জন্য পৃথক গুদাম বা গোডাউন তৈরি করা হয়। এসব গোডাউন পাকা অথবা মোটা টিন দিয়ে তৈরি করা হয়। ধান মাড়াই করার জন্য পূর্বে ধান মাড়াই কল বা ডলইন ছিল তা বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ। প্রাচীনকালে ধান মাড়াই করার একমাত্র মাধ্যম ডলইনের স্থান দখল করে নিয়েছে জ্বালানী বা বিদ্যুৎচালিত ধান মাড়াইকল। ডলইনের ব্যবহার বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে বর্তমানে ডলইন তৈরি করার মিস্ত্রির সংকট দেখা দিয়েছে। বলা যেতে পারে সেই সব মিস্ত্রিরা পেশা বন্ধ করে দেওয়ায় তাদের আর কোনো উত্তরসূরি এই পেশায় আসেনি। এত সবের পরেও বাঁশ ও বেতশিল্প এখনো টিকে আছে কিছু কিছু পণ্যসম্ভার নিয়ে। একইভাবে বলা যেতে পারে মাছ ধরার চাই-এর কথা। পূর্বে আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত সময়ে ধান ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণের দেশিয় মিটা পানির মাছ পাওয়া যেতো। এসব মাছ ধরার জন্য মাঠের আলে বসানো হতো 'চাই' (মাছ ধরার এক প্রকারের আধার)। আষাঢ় মাসের শুরুতে জেলার প্রতিটি হাটে শত শত 'চাই' বিক্রি হতে দেখা যেতো। কিন্তু বর্তমানে ধানক্ষেতে মিঠাপানির তীব্র সংকটের কারণে 'চাই'-এর ব্যবহারও প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই 'চাই'-এর মধ্যে থাকে দুটি 'পতর' (চাই-এর ভেতরে প্রবেশের জন্য পকেট)। ফলে 'চাই'-এর পকেট নিয়েও স্থানীয়ভাবে প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। যেমন-'দুই পতরি চাই, আসতেও মাছ আটকায় আবার যেতেও আটকায়। বর্ষার সময় ধান ক্ষেতের পনি আটকিয়ে 'চাই' বসানো হয়। এসময় পানি প্রবাহের সাথে মাছ চলাচল করতেই 'পতর' (পকেট)-এর ভেতরে চালান হয়ে যায়। আবার মাছের স্বভাব নিয়ম অনুযায়ী পানির স্রোতের উল্টো দিকে চলতে চেষ্টা করে। পানির স্রোতের উল্টো দিকে চলতে গিয়ে 'চাই'-এর নিচের পকেটের মাধ্যমে 'চাই'-এর ভেতরে চালান হয়ে যায়। তাই বলা হয় "'চাই'-এ আসতেও বাজে যাইতেও বাজে"।

কক্সবাজারে যারা বসতবাড়ি নির্মাণ, বাঁশ কেটে বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী নির্মাণ করে তাদেরকে 'ওঝা' বলে। তবে আধুনিককালে কেউ কেউ বসতবড়ি নির্মাণে জড়িত

www.pathagar.com

শিল্পীদেরকে 'মিস্ত্রী' হিসেবে আখ্যায়িত করতে চেষ্টা করছে। এতে করে আদি শব্দ 'ওঝা' বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

বাঁশের সামগ্রী তৈরি করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। প্রস্তুতির মধ্যে যে সামগ্রী তৈরি করা হবে তার জন্য প্রয়োজনমত বাঁশ বাছাই করে নিতে হবে। এর পরে বাঁশের গিরাগুলো দা দিয়ে ছেটে নিতে হবে। এরপর বাঁশগুলোকে দা দিয়ে দু'ফালা করতে হবে। দু'ফালা করার পরে বাঁশের তর্যা তৈরি করতে হয়। বাঁশের তর্যা তৈরি করার পরে ঘরের বেড়া, ডুল বা ডুলি, ঘরের সিলিং, ধারি, তলই (চাটাই) তৈরি করা যায়। তবে 'চাই', লাই (টুকরি) অন্য কোনো সামগ্রী তৈরি করার জন্য বাঁশের তর্যা বা কাইমের শলাকাগুলো অন্যভাবে তৈরি করতে হবে। 'চাই' বানাতে কাইমের শলাকাকে লম্বা করে মিহি করে তৈরি করতে হয়। কাইমের শলাকাকে মিহি করতে ধারালো দা দিয়ে কাইমের ধারগুলো ফেলে দিতে হয়। পাকা মুলি বাঁশ পরিমাণ মতো নিয়ে তাকে কেটে শলাকা তৈরি করতে হবে। যেসব বাঁশের গিট খুবই শক্ত এবং আঁশ মোটা সে রকম বাঁশই 'চাই' বানার জন্য উপযোগী। চাই বানার জন্য বাঁশের শলাকা ছাড়াও প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণের বেত। কয়েকটি বেত ফালা ফালা করে কেটে চিকন করে নিতে হবে দেখতে অনেকটা চিকন ২৪ তারের মতো। প্রতিটি চাই লম্বায় প্রায় সাতে তিন থেকে চার ফুট হয়ে থাকে। 'চাই' বানানোর প্রাথমিক উপকরণ তৈরি হওয়ার পরে বানানো শুরু করতে প্রথমে প্রতিটি শলাকা গাঁথতে হয়। চাই-এর বুনন পদ্ধতি লোকপ্রযুক্তি অংশে বিশদভাবে লিখা হয়েছে।

ডুল বা ডুলি তৈরির সময় বাঁশের তর্যা (বাঁশের বেতি) একটির সাথে আরেকটি গেঁথে গেঁথে তলা বানাতে হয়। নির্দিষ্ট একটি সাইজে তলা বানানো হয়। ডুলের আকার অনুযায়ী বর্গাকার করে তলা বানানো হয়। তিন ফুট বা চার ফুট বর্গাকারের তলা বানানো শেষ হলে চারটি কোণা তুলতে হয়। কোণা উঠার পর ডুল খাড়া করে মাথা মারতে হয়। মাথা মারার পর বাঁশের খাপের সাহায্যে চাক বানিয়ে মুখ বাঁধা হয়। এক প্রকার পাহাড়ি বেতের সাহায্যে ডুলের মুখ বাঁধতে হয়। এভাবেই একটি ডুলি তৈরি করা হয়। কক্সবাজারে ডুল তৈরি করা হয় কেবলমাত্র ফসলজাত দ্রব্য সংরক্ষণ করার জন্য। বিশেষ করে বছরের খাবারের ধান ডুলের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। ডুল তৈরি করার সময় শিল্পীরা ডুলের গায়ে বিভিন্ন ধরনের নক্সা ফুঁটিয়ে তুলে তাঁর মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।"[১৮]

## ৪. নৌশিল্প

সূচনাতেই কক্সবাজারের প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও সম্পদের বৈচিত্র্যের বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করেছি। পাহাড়, বন-জঙ্গল ও সমুদ্রের সমম্বয়ে কক্সবাজারের অবস্থান। কুতুবদিয়া উপজেলা ছাড়া জেলার অন্যান্য উপজেলাগুলোতে যেমন রয়েছে পাহাড় ও বনজসম্পদের আধিক্য তেমনিভাবে রয়েছে সামুদ্রিক সম্পদ। তবে একথা সত্য যে, জেলার প্রতিটি উপজেলার সাথে সমুদ্রের সংযোগ রয়েছে এবং প্রতিটি উপজেলাতেই রয়েছে সমুদ্র-উপকূল। বঙ্গোপসাগর জেলার প্রতিটি উপজেলার মানুষকে বিচিত্র পেশার

www.pathagar.com

সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সমুদ্র উপকূলে যারা বসবাস করে তাদের প্রধান উপার্জনের প্রধান উৎস মৎস্যসম্পদ। সাগরপাড়ের বাসিন্দা হিসেবে সমুদ্রের সাথে রয়েছে তাদের সখ্য। এপ্রসঙ্গে এ জনপদের সন্তান দেশের অন্যতম কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা তাঁর *'দরিয়ানগর কাব্যে'* 'কলম হাতে ধরি' কবিতায় বর্ণনা করেছেন এভাবে,

"আমি বানাইয়াছি দড়ির কাছি শাম্পান আমার বাঁধা
এই শাম্পানত চইজ্জে আঁআর দাদা বড়দাদা
তাঁরা সাম্পান মাঝি।
তাঁরা সাম্পান মাঝি কালু গাজী বার আউলিয়া
এই নগরর দক্ষিণেতে আঁশনাই দরিয়া
আর উত্তরেতে।"[১৯]

উপকূলের মানুষ সমুদ্রে জাল ফেলে মাছ সংগ্রহ করে, তা নিজেরা যেমন খায় তেমনিভাবে তা বিপণনের মাধ্যমে অপরকে খাওয়ায়। সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপকূলীয় বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে নৌ-শিল্প। সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণের জন্যই শুধু নৌকা নির্মিত হচ্ছে না। উপকূলে ও সাগরে বাহন হিসেবে ব্যবহারের জন্য রকমারি নৌকা বা জাহাজ তৈরি করা হয়। এসব নৌকা, সাম্পান বা জাহাজের মধ্যে রয়েছে ট্রলার, গদু নৌকা, জালিবোট, ডিঙ্গি নৌকা, ফারিরবোট, খেয়ানৌকা, বজরা পানসি, জেলে-নৌকা। এসব নৌকার ব্যবহারবিধিও ভিন্ন। কোনো কোনো নৌকা উপকূলের জনগণের পরিবহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কোনো কোনো নৌকায় মালামাল পরিবহন করা হয়, কোনো কোনো নৌকায় শুধু লবণ পরিবহন করা হয়, কোনো কোনো নৌকা যা আকারে ছোট তা দিয়ে সাগরে উপকূলের কাছাকাছি মাছ ধরা হয়, আবার কোনো কোনো নৌকায় গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা হয়। ব্যবহার ভেদে এসব নৌকার গঠনকাঠামো ও নির্মাণশৈলীও ভিন্নতর হয়। এমনকি নামও ভিন্ন। যেসব নৌকা উপকূলে জনগণের পরিবহন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা লম্বা করে তৈরি করা হয়। যেসব নৌকায় শুধু লবণ পরিবহন করা হয় তাকে স্থানীয়ভাবে জালিবোট বলে।

*কক্সবজার সদর উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নে একটি মালবাহি নৌকা নির্মাণ করা হচ্ছে*

www.pathagar.com

*মহেশখালি উপজেলার শাপলাপুরে ইউনিয়নে একটি মাছধরার নৌকা সাগরে ভাসাবার অপেক্ষায়*

এসব নৌকা বেশি লম্বা না হলেও বেশ বড়। এসব নৌকাতে হাজার হাজার মণ লবণ বোঝাই করে দূরপাল্লায় পরিবহন করা সম্ভব। যেসব নৌকায় সাগরে উপকূলের কাছাকাছি মাছ ধরা হয় তা স্থানীয়ভাবে জেলে-নৌকা হিসেবে স্বীকৃত। এসব নৌকা আকারে ছোট। এসব নৌকায় করে গভীর সমুদ্র বা মধ্য সমুদ্রে যাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে উপকূলের কাছাকাছি এসব নৌকায় মাছ ধরা যায়। তবে বড় ও বেশি অশ্বশক্তি সম্পন্ন নৌকাগুলো গভীর সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরে। এসব নৌকা ৬০ অশ্বশক্তি থেকে ১২০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। এসব নৌকা কক্সবাজার থেকে প্রায় একশত থেকে দেড়শত কিলোমিটার গভীর সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরে। এসব নৌকাকে অনেকেই ট্রলার বলে থাকে। তবে এটা সঠিক নয়। ট্রলার মূলত স্টিলবডির হতে হয়। এসব নৌকাকে ইঞ্জিনচালিত নৌকা বলা হয়। কক্সবাজারে নৌকা ও মাছ ধরা নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে রকমারি লোকসাহিত্য। পূর্বে এসব নৌকা ইঞ্জিন ছাড়াই পরিচালিত বা চলাচল করতো। স্বাধীনতার পরেই দেশে ইঞ্জিনচালিত নৌকার প্রচলন শুরু হয়। অর্থাৎ কাঠের বডির নৌকাতে ইঞ্জিন সংযুক্ত করা হয়। কক্সবাজারে নৌকা একটি পৃথক শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। নৌকা নির্মাণের জন্য পৃথক পেশাজীবী গড়ে উঠেছে। জেলার উপকূলেই মূলত বিভিন্ন প্রকারের ও আকারের নৌকা নির্মাণকরা হয়। নৌ শিল্পও দারুশিল্প শ্রেণিভুক্ত। তবে এই শিল্পের মিস্ত্রী বা নির্মাণ কর্মীরা আসবাবপত্র বা কাষ্ঠশিল্পের অন্যান্য মিস্ত্রীর মতো কাজ করে না বলেই নৌশিল্পকে পৃথকভাবে লিখা হলো।

এসব নৌকা তৈরিতে প্রয়োজন বনজ সম্পদ। এছাড়াও প্রয়োজন খন্তি পেরেকসহ বিভিন্ন আকারের ও সাইজের পেরেক, করাত, গদু দা, বাইশ, মাত্তুল বা হ্যামার, রেত,

www.pathagar.com

কুড়াল, বাডইল, বুরুং, গাঁনি, বিশেষ ধরনের সুতা এবং সর্বশেষে প্রয়োজন মাটিয়া তৈল বা আলকাতরা। জেলার সমগ্র বনাঞ্চল নৌশিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী পার্বত্য বান্দরবান জেলার বনাঞ্চল থেকেও বৃক্ষ সংগ্রহ করা হয়। নৌকা তৈরির জন্য মূল্যবান ও শক্ত কাঠ বেশি প্রয়োজন যা তাড়াতাড়ি গাছে পচন না ধরে বা নষ্ট না হয়। জেলার প্রতিটি উপজেলায় নৌকা তৈরি করা হয়। কুতুবদিয়া উপজেলায় পাহাড় বা বনাঞ্চল না থাকলেও জেলার অন্যান্য এলাকা থেকে নৌকা তৈরির প্রয়োজনীয় বৃক্ষ সংগ্রহ করা হয়। তবে এখানে রপ্তানিযোগ্য কোনো নৌকা তৈরি করা হয় না। স্থানীয় চাহিদা মিটাবার জন্যই শুধু নৌকা নির্মাণ করা হয়। বর্তমান সময়ে সরকারি বন-জঙ্গলে গাছের আকাল দেখা দিচ্ছে। ফলে নৌকাশিল্প অনেটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে তবে থেমে নেই। নৌকা নির্মাণে ব্যবহৃত গাছ সরকারি বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়। বনবিভাগের লোকজনের চোখ ফাঁকি দিয়েই এসব নৌকা তৈরি করা হয়। নৌকা, সাম্পান, গদু নৌকা, জালিবোট, ডিঙ্গি নৌকা, ফারিরবোট, খেয়ানৌকা, বজরা পানসি, জেলে, ইঞ্জিন চালিত নৌকা (যা স্থানীয়ভাবে ট্রলার নামে খ্যাত) তৈরি করার জন্য প্রথমে দরকার প্রয়োজনমতো কাঠ। এসব কাঠকে প্রয়োজনমতো বিভিন্ন আকারের তক্তা ও তিন ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি সাইজের বিম তৈরি করে চিরাই করতে হয়। এরপরে প্রয়োজনমতো পেরেক কিনে নিতে হবে। চিরাই করা বিমগুলো নিয়ে নৌকার ফ্রেম তৈরি করে নিতে হবে। ফ্রেম তৈরি করার পরে ফ্রেমের বাইর থেকে তক্তাগুলো লাগাতে হবে। তক্তাগুলো একটার সাথে আরেকটি সংযুক্ত করে পেরেক দিয়ে ভালোভাবে আটকাতে হবে। এভাবে নৌকা তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়। পরে নৌকাটিকে উল্টিয়ে তক্তার জোড়ার ফাঁকে ফাঁকে গাঁনি সুতা আটকাতে হবে। সুতাগুলো এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে কোনো ধরনের ছিদ্র না থাকে। সাগর বা নদীতে নৌকা চলাচলের সময় যেনো ভেতরে পানি প্রবেশ করতে না পারে। গাঁনি সুতা আটকানোর পরেই নৌকার নিচে আলকাতরা লেপে দিতে হবে। আলকাতরা লেপে দেওয়ার পরেই ভালো ভাবে রোদে শুকাতে হবে। রোদে শুকানোর পরে তক্তার জোড়ার মধ্যে যদি ফাঁক দেখা যায় তাহলে আবার গাঁনি সুতা দিয়ে ছিদ্র আটকাতে হবে। এভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ নৌকা তৈরি করা হয়। পরে নৌকাতে ইঞ্জিন সংযুক্ত করতে হয়। ইঞ্জিনগুলো নৌকার সাইজ অনুযায়ী হয়ে থাকে। বিশেষ করে ছোট থেকে বড় নৌকার জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচ অশ্বশক্তি থেকে একশো বা দেড়শো অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন সংযুক্ত করা হয়। তবে ছোট ছোট ছিপ দ্বারা টানা নৌকাতে ইঞ্জিন সংযুক্ত করা হয় না।"[২০]

## ৫. জাল বুননশিল্প

কক্সবাজারের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণেই বিচিত্র ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে। শিল্প গড়ে উঠেছে বলা যাবে না, বরঞ্চ বলা যেতে পারে বিচিত্র ধরনের শিল্প বিরাজমান। যেমন ঝিনুকশিল্প, জালশিল্প বা জাল বুননশিল্প অন্যতম। কক্সবাজার একটি সমুদ্র-উপকূলীয় জেলা। জেলার প্রতিটি উপজেলায় কিছু না কিছু সমুদ্র সংযোগ রয়েছে। মহেশখালি ও কুতুবদিয়া দুটি পৃথক দ্বীপ হওয়ার কারণে এখানে মৎস্যজীবীর সংখ্যা বেশি। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই শিল্পের সাথে নৌ-শিল্প ও মৎস্যজীবীদের সম্পর্ক

www.pathagar.com

বেশি। মৎস্যজীবীদের মৎস্য শিকারের অন্যতম হাতিয়ার জাল। যা দিয়ে সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ করা হয়। মাছ ধরার জালের মধ্যে রয়েছে হরেক রকমের, প্রকারের এবং সাইজের জাল। এসব জালের মধ্যে রয়েছে ঝাকি জাল, ফাইস্যা জাল, ইলিশ জাল, বাডা জাল, টানা জাল, চাক জালসহ রকমারি জাল রয়েছে। কথিত জালগুলো পৃথক পৃথক মৎস্য শিকারে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া জাল ছাড়াও সাগরে বড়শি দিয়েও মাছ ধরা যায়। কক্সবাজার একটি সমুদ্র-উপকূলীয় জেলা হিসেবে এখানে এই জালশিল্প তথা জাল বুননশিল্পের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। সমুদ্র থেকে মাছ শিকারের প্রয়োজনেই জাল বুননশিল্প একটি অস্বীকৃত শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। জেলার উপকূলীয় এলাকায় যেখানেই সাগর থেকে মৎস্য শিকারের নৌকা রয়েছে সেখানেই মাছ শিকারের জালের প্রয়োজনেই জাল বুননশিল্পটি গড়ে উঠেছে। তবে জাল বুনন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে সুতা। পূর্বে সুতা দিয়েই জাল তৈরি করা হতো। সুতার জাল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই মৎস্যজীবীরা ক্ষণস্থায়ী জালের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী জালের দিকে ঝোঁকে পড়েছে। নাইলনের জাল দীর্ঘস্থায়ী। নাইলনের জাল দীর্ঘস্থায়ী বলেই মৎস্যজীবীরা সুতার জাল ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। এই নাইলনের জালের প্রধান কাঁচামাল নাইলন সুতা বিদেশ-নির্ভরশীল। জাল বুননের কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও জড়িত। তবে নারীরা স্বল্প পরিসরের ঝাকি জাল ও বাডা জাল তৈরিতে জড়িত। গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারের জন্য মূলত ব্যবহৃত হয় ইলিশ জাল, টানা জাল, চাক জাল, বিহন্দি জাল, লাউক্যা জাল, ফাইস্যা জালের পরিমাণ বেশি বিধায় এসব জাল পুরুষেরাই তৈরি করে। স্থানীয়ভাবে জাল বুনন চাহিদা মিটাতে পারে না বিধায় জেলার বাইর থেকে জাল আমদানি করতে হয়। স্থানীয়ভাবে কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করা গেলে এখানেই শিল্পটি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।
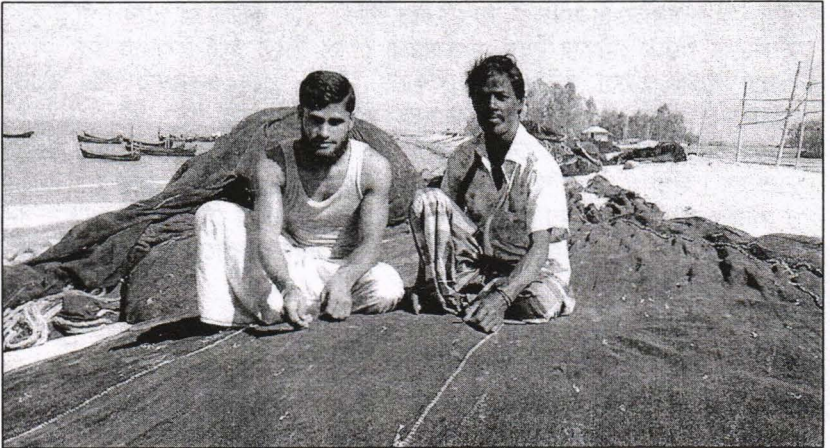
*কক্সবাজার কুতুবদিয়া উপজেলায় শিল্পীরা মাছধরার জাল বুননে ব্যস্ত*

জাল বুননশিল্পের জন্য প্রয়োজন সুতা, নাইলন সুতা, সীসা, চিকন রশি, সুতা আটকিয়ে রাখার জন্য তইলা ও হনি। তবে সুতার জাল বুননের আগে সুতাতে রঙ লাগাতে হয়, যাতে সমুদ্র লবণাক্ত পনি বা নদীর মিষ্টি পানিতে জালে পচন না ধরে।”[২১]

www.pathagar.com

## ৬. নকশিকাঁথা

নকশিকাঁথা বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত শিল্পকর্ম। নকশিকাঁথা চারুশিল্পের অন্তর্ভুক্ত শিল্পকর্ম। গ্রামাঞ্চলের মহিলারা প্রাচীনকাল থেকে নকশিকাঁথা সেলাই করে আসছে। অনেকেই এটাকে পেশা হিসেবে নিয়ে বেঁচে আছে। নকশিকাঁথা মূলত ব্যবহৃত পুরাতন কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়। নারীরাই মূলত এই শিল্পের শিল্পী তথা কারিগর। কাঁথার বুকে নকশি তথা নকশা বুননই হচ্ছে নকশিকাঁথা। নকশা বা নকশি বুননের মধ্যে রয়েছে এর মাহাত্ম্য, এর বিশেষত্ব, এর শৈল্পিকতা। বিভিন্ন বর্ণের ও প্রকারের ফল-ফুলের নকশা, পাতার নকশা, পশু-পাখির নকশা, রাজা-বাদশার ছবির নকশা, বাদশা-বেগমের ছবি বুননের নকশা, নর-নারীর ছবি অংকনের মাধ্যমে এই শিল্প ফুটিয়ে তোলা হয়। রকমারি সুতা সেলাই করে নকশা সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পকর্মটি উপভোগ্য করে তোলা হয়। সূচিকর্মের মাধ্যমে কাঁথার বুকে ফুটিয়ে তুলে নানা রঙের ছবি বা নকশা। নকশিকাঁথা বর্তমানে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশের বাজারে স্থান করে নিয়েছে। জয় করেছে বিদেশীদের মন। কিন্তু কক্সবাজারে এই শিল্পকর্মটি তেমন প্রসার লাভ করেনি। পারেনি দেশের বাজার দখল করতে। নকশি কাঁথা বা বরকেতার কোনো সুনির্দিষ্ট বাজার নেই। এমনকি কক্সবাজারে এই কাঁথাশিল্প বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারেনি। পূর্বে যেমন এই শিল্প বাণিজ্যিকভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারেনি তেমনিভাবে বর্তমানেও এই শিল্প বাণিজ্যিকভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। কক্সবাজার জেলায় শুধুমাত্র পারিবারিক ব্যবহারের জন্য নকশিকাঁথা বা বরকেতা তৈরি করা হয়। নকশিকাঁথা বা বড় কাঁথা বা বরকেতা একটি জনপ্রিয় শীত নিবারণের মাধ্যম। শুধুমাত্র শীত মওসুমে এই কাঁথা বা বরকেতার ব্যবহার দেখা যায়। ব্যবহৃত পুরাতন কাপড় সেলাই করে এই কাঁথা তৈরি করা হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন নতুন কাপড় দিয়েও বরকেতা সেলাই করা হয়।

এদিকে প্রাচীনকালে গ্রাম্যবধূরা কাঁথা পরিধান করতো। এই কাঁথাও বরকাঁথার ন্যায় করে তৈরি করতে হয়। তবে বরকাঁথা ও পরিধানের কাঁথার মধ্যে কিছুটা তফাৎ রয়েছে। আর তা হচ্ছে বরকাঁথা হচ্ছে শীত নিবারণের জন্য, পক্ষান্তরে কাঁথা হচ্ছে পরিধানের জন্য। বরকাঁথার সাইজ হয়ে থাকে সাত ফুট বাই আট/নয় ফুট। আর পরিধানের কাঁথা বরকাঁথার চেয়ে পাতলা; তা লম্বায় চার থেকে পাঁচ ফুট, উচ্চতায় আড়াই থেকে তিন ফুট। গ্রাম্যবধূরা সন্তান প্রসবের পরেই মূলত এই কাঁথা পরিধান করতো। সন্তান প্রসবের পরে রক্তস্রাব হলেও যাতে তা দেখা না যায় সে জন্যই কাঁথা পরিধান করা। এছাড়াও গ্রামের দরিদ্র ও অস্বচ্ছল পরিবারের মেয়েরা, গৃহবধূরা কাঁথা পরিধান করতো। কাঁথা বেশি টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী বলেই গ্রাম্যবধূ, মহিলারা কাঁথা পরিধান করতো। কাঁথা তৈরির পদ্ধতিও বরকাঁথার মতো। পুরোনো কাপড় নিয়েই বরকাঁথার ন্যায় পরিধানের কাঁথা সেলাই করা হতো। তবে কক্সবাজারে নকশিকাঁথা খুব একটা তৈরি হয়নি বা বণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি করা হয় না। তবে জেলার বিভিন্ন গ্রামে কিছু কিছু পেশাদার মহিলা কাঁথা ও বরকাঁথা সেলাই করে।

www.pathagar.com

*রামু উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের খন্দকার পাড়া নকশি শিল্পের কাজ করছে একজন শিল্পী*

সাধারণত বর্ষাকালে বৃষ্টির মধ্যে গ্রাম্য বধু-মেয়েরা কাঁথার উপর বিভিন্ন নকশি দিয়ে বা নকশা বুনে নকশিকাঁথা তৈরি করে থাকে। একটু একটু শীতের প্রভাব দেখা দিলেই গ্রামে গ্রামে নকশিকাঁথা তৈরি করতে দেখা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে লেপ, কম্বল ইত্যাদি মানুষের ঘরে ঘরে শীত নিবারণের উপাত্ত হয়ে আসলেও বিলাসী মহিলারা এখনও নকশিকাঁথা তৈরি করে আসছে। নকশিকাঁথা তৈরির সহায়ক উপকরণ হলো কাঁচি, সুঁই, ব্যবহৃত কাপড় (বিশেষ করে মেয়েদের শাড়ি, গায়ের স্কার্ফ (যাকে স্থানীয়ভাবে মাথার কাপড় বলা হয়), ওড়না, পুরুষের পুরোনো লুঙ্গি, গায়ের চাদর) ও রকমারি সুতা।"[২২]

বরকেতা নিয়ে সরাসরি লোকসাহিত্য সৃষ্টি না হলেও বরকেতা লোকসাহিত্যের উপাদান হয়েছে। যেমন কক্সবাজারের বিখ্যাত কবিয়াল ও গাইন আবদুল করিম-এর তাঁর পিতৃকপ্রদত্ত নামটি 'বরকেতা'র আড়ালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আবদুল করিম এখন বরকেতা গাইন নামেই সমধিক পরিচিত। 'বরকাঁথা' বা 'বরকেতা' বা 'মোটাকাঁথা' গায়ে দিয়ে কবিতা বা গান রচনা করতেন বলেই তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম আবদুল করিম মুছে গিয়ে নতুন নাম হয় 'বরকেতা গাইন'।"[২৩]

## ৭. আল্পনা

শৈল্পিক সুন্দর চারুময় কর্ম হচ্ছে আল্পনা। ঘরের দেয়ালে, মেঝে ও ফ্লুরে নানা রকমের ফুল, পাখি, নদ-নদী, রাস্তা-ঘাট, গাছপালা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদির ছবি বা নকশা অংকন করে গৃহের বা কক্ষের সৌন্দর্যবর্ধন করা মানেই আল্পনা। এ সুচারু কর্মটি শৈল্পিক সৌন্দর্যে ভরে তোলে। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষিতসমাজে এই আল্পনা শিল্পকর্মটির কদর পরিলক্ষিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নারীরা মেহেদির সাহায্যে হাতে ও পায়ে নানা বর্ণের আল্পনা একে নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চালায়। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায়ের তরুণরা শরীরে আলপনা তথা উল্কি আঁকতে পছন্দ করে। ফলে তারা শরীরে বিভিন্ন ধরনের আলপনা এঁকে নিজের শরীরকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে তৎপর। বিশেষ করে রাখাইন সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

মধ্যে এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। আল্পনা লোকসংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্পনাশিল্পীরা দেশের প্রধান প্রধান জাতীয় উৎসবে বিশেষ করে একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বাংলা নববর্ষসহ বিভিন্ন উপলক্ষে শহরের প্রধান প্রধান সড়কে আল্পনা অংকন করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এধরনের কাজের জন্য এটিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। ফলে এসব শিল্পী সাইনবোর্ড, ঘরে আল্পনা অংকন, গাড়ির বডিতে নকশা অংকন করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে।"[২৪]

## ৮. দারুশিল্প

প্রাকৃতিক কারণেই কক্সবাজারে দারুশিল্প সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বিশেষ করে দ্বীপ-উপজেলা কুতুবদিয়া ছাড়া সমগ্র কক্সবাজার জেলা যেখানে বনজসম্পদে সমৃদ্ধ। জেলার অধিকাংশ এলাকায় বনজসম্পদ বিদ্যমান থাকার কারণে কাঠের অভাব কম। পূর্বে যদিও কক্সবাজার বনজসম্পদে ভরপুর ছিল কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সেই বনজসম্পদে ভাটা পড়েছে। বিশেষ করে অপরিকল্পিতভাবে বনাঞ্চল থেকে অবাধে বৃক্ষনিধনের ফলে বনজ সম্পদের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। কথায় আছে না, 'বসে বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারেও টান পড়ে'। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। বর্তমানে জেলার বনজসম্পদে ভাটা পড়ায় প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে কাঠ আমদানি করতে হচ্ছে। সরকারি বনাঞ্চলের বৃক্ষসম্পদ শেষ হওয়ার আগে লোকজন সচেতন হয়ে উঠছে। লোকজন ব্যক্তিগত উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ করার অভ্যাস গড়ে তুলছে। এতে করে ব্যক্তিপর্যায়ের মূল্যবান বৃক্ষসম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে। কাঠপ্রাপ্তির সুবাদে জেলার যে-কোনো জায়গায় ব্যক্তিগতভাবে গড়ে উঠেছে শত শত ফার্নিচারস মার্ট। যদিও এসব ফার্নিসার মার্টে যান্ত্রিকভাবে আসবাবপত্র তৈরি করা হচ্ছে, আসবাবপত্র তৈরি করা হচ্ছে সেই প্রাচীন আমলের ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে। বৈধ ও অবৈধ এসব ফার্নিচারস মার্টে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে কাঠের ফুলের টব, টেবিল, চেয়ার, আলনা, খাট, হাইবেঞ্চ, লোবেঞ্চ, টুল, সোফা, আলমিরা, সিন্দুক, ড্রেসিং টেবিল থেকে শুরু করে হরেক রকমের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং গৃহনির্মাণ ও গৃহ সাজানোর মনোরম সব সামগ্রী। কাঠ সহজলভ্য বিধায় এখানকার আসবাবপত্র তৈরির কারখানাগুলো অবিরাম আসবাবপত্র তৈরি করে যাচ্ছে। এর ফলে এখানকার মানুষের ঘরে ঘরে নানা রকমের আসবাবপত্র দেখা যায়। এছাড়া এ জেলায় কর্মরত সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী ফার্নিচার মার্ট থেকে ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছেন। আবার কোনো বিশেষায়িত দোকানে হারমোনিয়াম, তবলা, গিটার, সেতারসহ রকমারি বাদ্যযন্ত্র তৈরি করছে এবং তা বাণিজ্যিকভিত্তিতে বিক্রি করছে। কিছুদিন আগেও বাড়িতে কাঠের রকমারি নকশা করা ঝালর ব্যবহার করা হতো। বিশেষ করে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাঠের উপর নকশা কেটে এসব ঝালর তৈরি করা হতো। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এসব ঝালর তৈরি এবং বাড়িতে এসব ঝালর লাগানো বন্ধ হয়ে গেছে। তবে কোনো কোনা ধনশালী জমিদার এবং অর্থশালী মানুষ দালান নির্মাণ করে তাতেও কাঠের রকমারি নকশা ব্যবহার করে ঘরকে আরো আকর্ষণীয় ও খানদানি করার প্রয়াস চালায়। যাই হোক, দারুশিল্প জেলার সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। এই শিল্পে সাথে কয়েক হাজার শ্রমিক জড়িত।

www.pathagar.com

রামু উপজেলা সদরে শিল্পীরা বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যস্ত

www.pathagar.com

রামু উপজেলা সদরে শিল্পীরা বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যস্ত



www.pathagar.com

দারুশিল্প

এই শিল্পের জন্য প্রয়োজন কাঁচামাল হিসেবে চাহিদামত কাঠ এবং প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, পেরেক। কাঠ সংগ্রহ করার পরেই প্রয়োজন অনুসারে স'মিলে কাঠ সাইজ করে চিরাই করে নিতে হয়। পরে আসবাবপত্র অনুসারে হাতকরাত দিয়ে কাঠ কেটে নিতে সাইজ করতে হয়। এরপরে রদ্দা দিয়ে কাঠগুলো মসৃণ করে নিতে হয়। মসৃণ করার পরে কাঠের প্রান্তে গাতা করতে হবে। এর পরেই কাঠগুলো পরস্পর গেঁথে নির্দিষ্ট আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। আসবাবপত্র তৈরির পরেই রং করা হয়। রং করার আগে কাঠে সিরিজকাগজ দিয়ে ঘষে ঘষে কাঠগুলো আরো মসৃণ ও চকচকে করে তোলা হয় যাতে সহজেই গ্রাহকের পছন্দ হয়। কক্সবাজারের রামু চৌমুহনী এলাকায় গড়ে উঠা বিভিন্ন আসবাবপত্রের দোকান থেকে রাজধানী ঢাকা, বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে চালান হয়।"[২৫]

## ৯. ঝিনুকশিল্প

ঝিনুক কক্সবাজারের আর একটি আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক পণ্য এবং অর্থকরী সম্পদ। বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকা কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের নাজিরারটেক থেকে টেকনাফের বদর মোকাম পর্যন্ত দীর্ঘ এলাকা, টেকনাফের সেন্টমার্টিন, মহেশখালি ও মহেশখালি উপজেলার সোনাদিয়া এবং কুতুবদিয়া এলাকা ঝিনুকের প্রধান উৎসস্থল। তবে টেকনাফের সেন্টমার্টিন দ্বীপে সবচেয়ে বেশি ও মূল্যবান ঝিনুক এবং শৈবাল পাওয়া যায়।

সমুদ্র উপকূলে এবং উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত পানিতেই ঝিনুকের উৎপত্তি এবং বংশ বৃদ্ধি। দেশের খেপুপাড়া-উপকূলেও কিছু কিছু ঝিনুক পাওয়া যাচ্ছে। তবে

www.pathagar.com

কক্সবাজারেই ঝিনুকের বাণিজ্যিক ব্যবহার গড়ে উঠেছে। এই ঝিনুকের সাথে জড়িয়ে রয়েছে জেলায় প্রায় ৫ হাজার মানুষ। এদের জীবিকা এই ঝিনুকের সাথেই জড়িত।

*কক্সবাজারের ঝিনুক শিল্প*

ঝিনুকশিল্পের কাঁচা মাল

www.pathagar.com
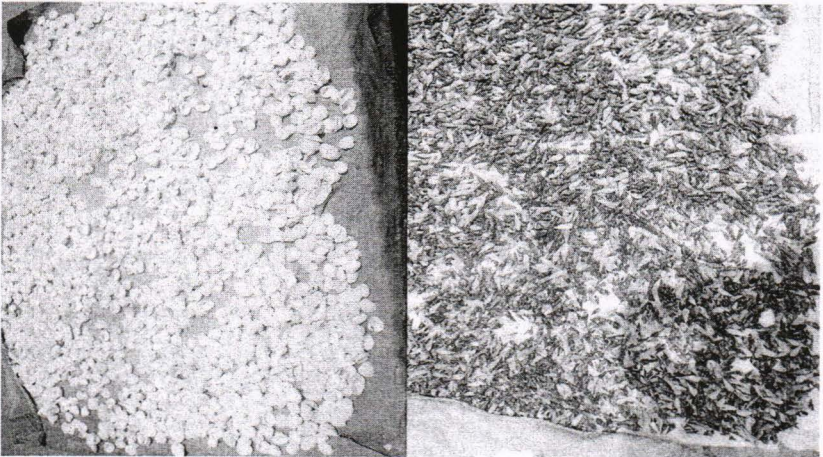
কক্সবাজার শহরে শিল্পীদের উৎপাদিত ঝিনুক সামগ্রী

www.pathagar.com
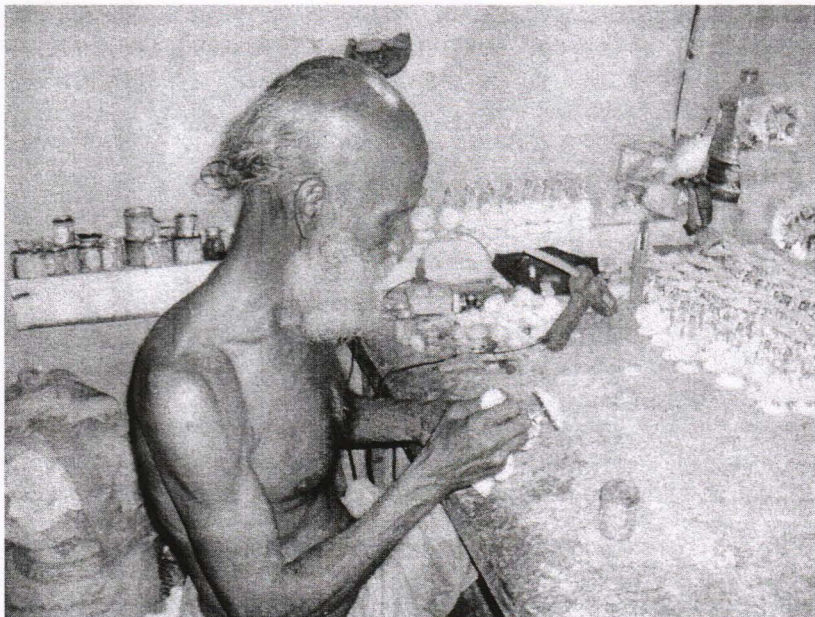
কক্সবাজারে একজন শিল্পী ঝিনুকে কারুকাজে ব্যস্ত

একজন শ্রমিক ঝিনুকগুলো পরিষ্কার করছে

www.pathagar.com

কক্সবাজারের উপকূলে রাজমুকুল, বিচ্ছু, শামুক, ফুল ছিলুন, মালিপুরী, বাঘকঁড়ি, তিলককঁড়ি, দাতছিলন, প্রবাল, করতালসহ বিভিন্ন জাতের মূল্যবান ঝিনুক আহরিত হয়। এসব ঝিনুকের মধ্যে দুই টাকা থেকে সর্ব্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা দামের ঝিনুক বা শৈবালও রয়েছে। তাছাড়াও এক ধরনের ঝিনুকের মধ্যে মুক্তাও পাওয়া যায়। সবুজ ঝিনুক (গ্রিন মাঝল), করতাল (উইন্ডোসপেল ওয়েস্টার), কস্তুরা (ওয়েস্টার), চিলোন (ক্লাস) জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে মূল্যবান আমিষও রয়েছে। করতালসহ কয়েকটি ঝিনুককে ঔষধ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। তবে এই মূল্যবান আমিষ আমরা অবহেলায় নষ্ট করে ফেলি। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এইসব ঝিনুকের মূল্যবান আমিষ আমরা সহজেই গ্রহণ করতে পারি। বিদেশে বিভিন্ন ঝিনুকের শাঁস নিয়ে মূল্যবান স্যুপ তৈরি করে, যা অত্যন্ত উপাদেয়।

বর্তমানে কক্সবাজারে ঝিনুকের ব্যবসা বেশ জমজমাট। এই ব্যবসা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শিল্পের জন্য গড়ে উঠেছে শতাধিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। এছাড়াও এই শিল্পের উপর নির্ভর করে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ঝিনুকশিল্পপ্রতিষ্ঠান, প্রদর্শনী, বিক্রয়কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। মানুষের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থানীয় কারিগররাই ঝিনুকসামগ্রী দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করছে। স্থানীয় কারিগরদের কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ফিলিপাইন থেকে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক এনে স্থানীয় কারিগরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এমনকি দু'জন ঝিনুক ব্যবসায়ীকে ফিলিপাইনে নিয়ে ৩ মাসের প্রশিক্ষণও দিয়েছে। এর ফলে ঝিনুকসামগ্রীর মান উন্নত হয়েছে পূর্বের চেয়ে বহু গুণ বেশি। স্থানীয়ভাবে ঝিনুক দিয়ে লাইটের সেড়, টেবিলল্যাম্প, (বিদ্যুৎচালিত), দরজার জন্য বিশেষ ধরনের পর্দা, চাবির রিং, ফুলদানি, কলমদানিসহ বিভিন্ন প্রকারের অলংকার, প্রসাধনী সামগ্রী, শোভা বর্ধনকারী জিনিসপত্র তথা শোপিস ও অন্যান্য খেলনা সামগ্রীও তৈরি করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনসহ আরো অনেক দেশ ঝিনুক রপ্তানি করে প্রচুর মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে।

বিদেশে বাংলাদেশি ঝিনুকের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। সর্বপ্রথম ১৯৮৫-৮৬ সালে ২ লাখ ৪৮ হাজার টাকার সামুদ্রিক ঝিনুক বিদেশে রপ্তানি করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। পরে ১৯৯১-৯২ সালেও ১৪ লাখ ১২ হাজার টাকার ঝিনুকসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হয়। অবশ্যি পরে অর্থাৎ ১৯৯২-৯৩ অর্থ সাল থেকে রপ্তানিতে এই খাতের হিসাবটি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে অনেক ব্যবসায়ী নিজেদের উদ্যোগে রপ্তানি করছে ঝিনুক, যা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অজ্ঞাতে। কর্তৃপক্ষ এই রপ্তানিপণ্যটি বিদেশে আরো ব্যাপকভাবে রপ্তানির ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে। এতে করে ঝিনুকসামগ্রী রপ্তানি করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

স্থানীয় ঝিনুকব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে প্রকাশ, কক্সবাজার থেকে বাৎসরিক প্রায় এক কোটি টাকার ঝিনুক ও ঝিনুকসামগ্রী বিক্রি হয়। এদিকে সমুদ্র উপকূল থেকে সংগৃহীত ঝিনুকের উল্লেখযোগ্য অংশ চুনা করা হয়। স্থানীয়ভাবে এই চুনা খুবই জনপ্রিয়। পান সেবনকারিদের মতে বিদেশি পাথুরী চুনা পান খাওয়ার উপযোগী নয় তাই জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঝিনুককে পানিতে দিয়ে আগুনে সিদ্ধ করে চুনা তৈরি করা হয়। এ খাতে বৎসরে ন্যূনতম ২০ লাখ টাকার চুনা তৈরি হয়ে তা বাজারজাত করা হয়।"[২৬]

বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করে কক্সবাজারে নিয়ে আসা হয়। ঝিনুকগুলো কক্সবাজারে নিয়ে আসার পরে প্রথমে পরিষ্কার পানিতে ধোঁয়া হয়। এরপরে ঝিনুকগুলোতে হালকা এসিড মিশিয়ে দিয়ে ভালোভাবে নাড়া-নাড়া করে যাতে সব ঝিনুকে এসিড যেতে পারে, এরপরে তা আবার পরিষ্কার পনিতে নিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। পানিতে ধোয়ার মাধ্যমে ঝিনুকগুলো পরিষ্কার ঝকঝকে হয়ে যায়। এসিড দিয়ে ধোঁয়ার মাধ্যমে ঝিনুকগুলো থেকে গন্ধ চলে যায়। পরে রোদে শুকাতে দেয়া হয় রোদে ধোয়ার প্রয়োজনীয় পণ্য তৈরি করা হয়। শিল্পীদের ইচ্ছা অনুযায়ী অথবা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য তৈরি করা হয়। এসব পণ্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেলনা সামগ্রী, লাইটের সেড়, টেবিল ল্যাম্প, (বিদ্যুৎ চালিত), দরজার জন্য বিশেষ ধরনের পর্দা, চাবির রিং, ফুলদানি, কলমদানি, হাতি, ঘোড়া, হরিণ, পুতুলসহ বিভিন্ন প্রকারের অলংকার, প্রসাধনী সামগ্রী, শোভা বর্ধনকারী জিনিসপত্র তথা সুপিচ ও অন্যান্য খেলনা সামগ্রীও তৈরি করা হয়। এসব পণ্য তৈরির পরে পণ্যের উপর নির্ভর করে রং করা হয়। এরপরেই উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা হয়।

এই শিল্পের জন্য কাঁচামাল হিসেবে ঝিনুক, শৈবাল, প্রবাল এবং যন্ত্রপাতির মধ্যে মাস্টারগাম, সুতা (নাইলনের), কার্টার, স্টিলের পাত, প্রয়োজনিয় রং, তুলিসহ হরেক রকমের পণ্যের প্রয়োজন।"[২৭]

## ১০. তাঁতশিল্প

তাঁতশিল্প কক্সবাজার জেলার একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। প্রাচীনকালে এই শিল্পের সাথে জেলার বিভিন্ন জনপদের হাজার হাজার মানুষ জড়িত ছিল। মূলত এই শিল্পই ছিল তাদের জীবিকার একমাত্র উপায়। কিন্তু দিনের পরিবর্তনে হস্তশিল্পে এখন দুর্দিন। বলতে গেলে বর্তমানে এই শিল্প প্রায় বন্ধ। জেলার কক্সবাজার সদর, মহেশখালি, চকরিয়ায় সীমিত পরিসরে রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শিল্প জিঁইয়ে রয়েছে। প্রাচীনকালে জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলায় হস্তশিল্প ছিল। হস্তশিল্পে তৈরি পোশাক পরিধান করা হতো। বিশেষ করে গায়ের চাদর, লুঙ্গি, মেয়েদের থামি, গামছা বা মাথার কাপড়, শরীর মোছার গামছা, নারী-পুরুষের কোমরবন্ধসহ রকমারি কাপড় স্থানীয় তাঁতশিল্পে তৈরি করা হতো। আর এই তাঁতশিল্পের সাথে হিন্দু, মুসলমান ও রাখাইনরা জড়িত ছিল। তবে তাঁতশিল্পে রাখাইনদের সংখ্যাই বেশি ছিল। তাঁতশিল্পের কারণেই রাখাইনদের বাড়ির নির্মাণশৈলী অন্য সম্প্রদায়ের বসতবাড়ি থেকে পৃথক। রাখাইন সম্প্রদায়ের দু'তলা বাঁশ-কাঠের বসতবাড়ির নিচে খোলা থাকে। যাকে স্থানীয় ভাবে মাচাং ঘর বলা হয়। বর্তমানে তাদের মাচাং ঘর নির্মিত হতে দেখা যায়। তবে তার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাঁতশিল্প স্থাপনের লক্ষ্যেই দোতলা তথা মাচাং ঘরের নিচে খোলা রাখা হয়। রাখাইনদের জীবিকা এই শিল্পের উপরই নির্ভরশীল ছিল। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে

www.pathagar.com

রাখাইনদের তৈরি কাপড়-চোপড় পার্শ্ববর্তী বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িসহ রাজধানী ঢাকায় বাজারজাত করা হতো। তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে এই শিল্পে ধস নেমেছে। বর্তমানে জেলার সদর উপজেলার খুরুস্কুল, চৌফলদণ্ডি, কক্সবাজার শহর, রামু উপজেলার পানের ছরা, মহেশখালি উপজেলা সদরের পৌরএলাকার রাখাইনপাড়া, চকরিয়া উপজেলার হারবাং এলাকায় রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত আকারে এই শিল্প টিকে আছে। তবে আগের মতো ব্যাপকভাবে কাপড় উৎপন্ন হয় না। বর্তমানে বলতে গেলে কিছু আধুনিক লুঙ্গি, শীতবস্ত্র, থলে ইত্যাদি বুনন করে। কক্সবাজার শহরে বার্মিজ মার্কেটে স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কোনো কোনো পণ্য বিক্রি হয়। তবে বার্মিজ পণ্য হিসেবে বিক্রিত বেশিরভাগ বস্ত্র সামগ্রী প্রতিবেশী বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, চীন দেশের পণ্য।"[২৮]

তাঁতশিল্পের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন প্রয়োজনীয় সুতা, রং, তাঁতশিল্পের যন্ত্রপাতি। সুতা সংগ্রহের পরেই প্রয়োজনীয় রং দিয়ে তা শুকাতে হয়। রোদে শুকানোর পরেই নির্দিষ্ট লুঙ্গি, স্কার্ফ, থলি বা ব্যাগ, গায়ের চাদর তৈরি করা হয়। কক্সবাজারের মহেশখালির রাখাইনপাড়ার কথিত বার্মিজ ব্যাগ কক্সবাজার থেকে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বরিশাল, পটুয়াখালি, বরগুনা, জামালপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, সুনামগঞ্জ, রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রাখাইনপল্লী থেকে ব্যাগ নিয়ে যায়।"[২৯]

## ১১. লবণশিল্প

লবণশিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প। কক্সবাজারসহ বাংলাদেশের প্রায় পনেরো লক্ষাধিক মানুষ এই শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। লবণ একটি বিকল্পহীন খাদ্যপণ্য।

*একজন শ্রমিক লবণ পরিবহন করছেন*

www.pathagar.com
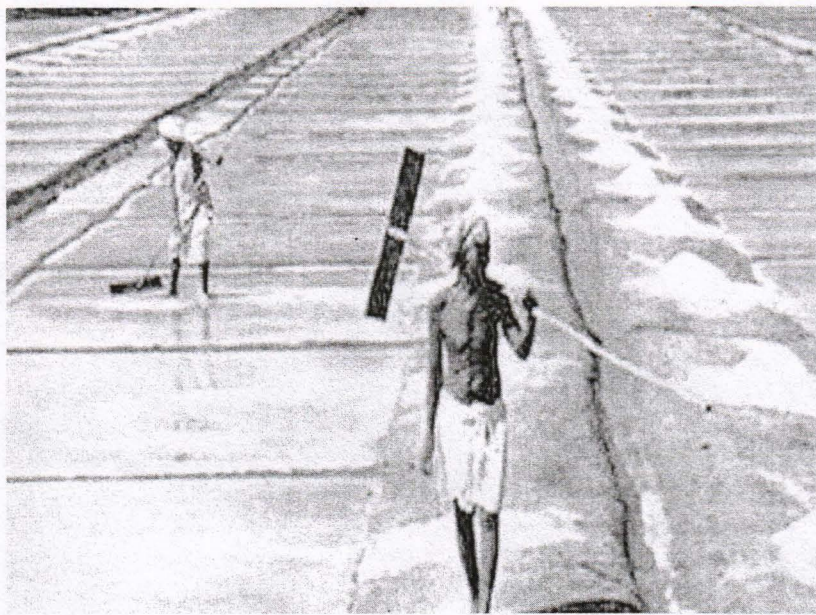
*কক্সবজার সদরের লবণ মাঠ (উপরে), লবণ পরিবহণের নৌকা (নিচে)*

www.pathagar.com

কক্সবাজারে লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়া

www.pathagar.com

লবণ উৎপাদনের দৃশ্য

www.pathagar.com

*কক্সবাজারে লবণ পরিবহণ করা হচ্ছে*

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক কারণে সাগরের পানি লবণাক্ত। বঙ্গোপসাগরের পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ ৩.৪০ ভাগ। যেহেতু বাংলাদেশে খনিজ লবণ নেই। সে কারণেই সম্পূর্ণ রূপে সামুদ্রিক লবণের উপরই আমরা নির্ভরশীল। সমুদ্রের লবণাক্ত পানিকে আগুনে ফুটিয়ে বা সৌরশক্তির মাধ্যমে লবণ উৎপাদন করা হয়। এককথায় বলতে গেলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানিই স্থায়ীভাবে লবণ উৎপাদনের একমাত্র উৎস।

"ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও মেঘনা নদীর মিঠাপানি সন্দ্বীপের নিকট ক্রমাগত বঙ্গোপসাগরের পানিতে মিশ্রিত হচ্ছে বলে ঐসব অঞ্চলের পানিতে লবণের গাঢ়ত্ব কম। লবণশিল্প একটি অতি প্রাচীন শিল্প। মুসলমানদের আগমনের আগে অর্থাৎ কক্সবাজার যখন আরাকান রাজার অধীনে ছিল তখনও কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে লবণ প্রস্তুত হতো। কক্সবাজারে উৎপাদিত লবণের উপর আরাকান রাজারা শুল্ক আদায় করতেন। কিছুদিন তারা লবণের বাণিজ্য একচেটিয়া তাঁদের নিজ হাতে রেখে দিয়েছিলেন এবং এজেন্ট মারফত সংগ্রহ করতেন। ভেনিসের পরিব্রাজক ফ্রেভিসি ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে এশিয়া মহাদেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁর রিপোর্ট মতে প্রতিবছর লবণ বোঝাই ২০০ জাহাজ সন্দ্বীপ হতে বিদেশে রপ্তানি হতো। লবণের বিক্রয়কেন্দ্র ছিল সন্দ্বীপে; কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম্ উৎপাদিত লবণ সেখানে নেওয়া স্বাভাবিক, কেননা সন্দ্বীপের সমুদ্রজলে উৎপাদিত লবণ নিম্নমানের এবং উৎপাদনের পরিমাণও অনেক কম।

১৫৮০-৮২ খ্রিষ্টাব্দে টোডর মল্ল যখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন তখন তিনি চট্টগ্রামকে রাজস্বের জন্য ৭টি মহালে ভাগ করেন। এরমধ্যে একটি মহল ছিল 'খেরাজ নিমক সার' অর্থাৎ লবণের মাঠের খাজনা। নিমক সার শব্দটি ফার্সি। এর অর্থ লবণের কড়াই বা লবণের খনি। এখানে ইহাকে লবণের ক্ষেত্রকেই বুঝান হয়েছে। ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ চট্টগ্রামকে ১৩টি মহালে ভাগ করেন। এরমধ্যে নিমকমহল একটি। মোগল আমলে চট্টগ্রামের নিমকমহল হতে ২৩,৫৮৭ টাকার রাজস্ব আদায় করা হয়। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামের চিফ বা প্রধান ভেরেলেট সাহেব লবণ উৎপাদনকে উৎসাহ দান করার উদ্দেশ্যে ২৩,৫৮৭ টাকা হতে কমিয়ে ৮,৭৬৯ টাকা রাজস্ব ধার্য করেন। অবশ্য পরে তা বাড়িয়ে ১১,৯০১ টাকা করা হয়।"[৩২]

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে কক্সবাজারে উৎপাদিত লবণের উপর প্রতিমণে আড়াই টাকা করে ট্যাক্স ধার্য করে। তখন ট্যাক্স বাদ দিয়ে লবণের পাইকারি মূল্য ছিল প্রতিমণ ৪.৫০ টাকা এবং খুচরা দর ছিল প্রতিমণ ১০টাকা। সুতরাং দেখা যায় যে, তখন দেশি লবণের উপর শতকরা ৫০ টাকার উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ ট্যাক্স পশ্চিম-পাকিস্তানি লবণ যাতে বাংলাদেশে বিক্রয় হয় সেজন্যই ধার্য করা হয়েছিল। ঐ সময় বিদেশ হতে প্রায় ৬৯ লক্ষ মণ লবণ আমদানি করা হয়। এতবড় ধকল সহ্য করেও কক্সবাজারের লবণশিল্প এখনও টিকে আছে।"[৩৩]

"বৃটিশ যুগে লবণ এজেন্টগণ বা বেনিয়ারা মলঙ্গিদেরকে (লবণচাষি) আগাম দাদন দিত এবং প্রতিমণ লবণের মূল্য হিসেবে যা দিবে বলে চুক্তি করতো নেয়ার সময়

জুলুম করে ঐ টাকার প্রায়ই বেশি লবণ নিয়ে যেত। ১৭৭০ সালের দিকে ক্যাপ্টেন হুইলার নামক এক ব্যবসায়ী প্রতি ১০০ মণ লবণের মূল্য ৪০ টাকায় চুক্তি করে। কিন্তু নেয়ার সময় ঐ টাকায় ১১২ হতে ১২৫ মণ লবণ নিয়ে যায়। কথিত আছে, লবণ চাষিরা এতে কলকাতা গিয়ে আপত্তি জানালে তাদেরকে বন্দী করা হয় এবং পরে সিপাহী পাহারায় দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই সুন্দরবনের জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায় এবং মনে হয় সকলেই বাঘের শিকারে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য তখন রেলপথ হয়নি। সেই সময় লবণচাষিদের অনেক সময় জোর করে কর্জ দেয়া হতো। যেহেতু তারা লবণের সঠিক মূল্য পেত না ফলে তারা কোনো রকমেই ঐ কর্জ পরিশোধ করতে পারতো না। তারা বংশানুক্রমে ঋণে জর্জরিত হয়ে থাকত এবং এক করুণ কৃতদাসের জীবন যাপন করতো।"[৩৪]

**লবণ উৎপাদনের পদ্ধতি**

"১৯৪৭ সালে এদেশ থেকে বৃটিশ সরকার চলে গেলে ব্রিটিশের লিভারপুলের লবণ আমদানিও বন্ধ হয়ে যায়। তখন দেশে খাবার লবণের তীব্র অভাব দেখা দেয়। খাবার লবণের চাহিদা ও অন্যান্য চাহিদা মেটাবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাথুরে লবণ আনা শুরু হলো। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত লবণ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তোনের চাহিদা মেটানো হতো।

ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশে লবণ উৎপাদন আইনত নিষিদ্ধ ছিল বলে ব্যাপক আকারে লবণ উৎপাদন হতো না। তাই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামধারণ করে দেশ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হওয়ার পর যখন লবণের ব্যাপক অভাব দেখা দিল তখন সরকার লবণ উৎপাদনের দিকে নজর দিলো এবং স্থানীয়ভাবে লবণ উৎপাদন করার জন্য স্থানীয় লবণ উৎপাদনকারীদের উৎসাহিত করতে থাকে। এতে করে লবণপানিকে ফুটিয়ে ব্যাপকভাবে লবণ উৎপাদনে সাড়া পড়ে যায়।

১৯৪৯ সালে সর্বপ্রথম এদেশে সৌরশক্তির মাধ্যমে বা সূর্যতাপকে কাজে লাগিয়ে লবণ উৎপাদন শুরু হয়। দেখা যায়, সৌরশক্তির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে লবণ উৎপাদন সম্ভব। এ পদ্ধতিতে কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে সর্বাধিক পরিমাণ লবণ উৎপাদন করা যায়। দেখা গেলো, এ পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বাধিক লাভবান হওয়া যায়। তখন থেকে শুরু হলো লবণশিল্পের অগ্রযাত্রা; উন্মোচিত হলো আর একটি অধ্যায়ের। সৌরশক্তির সাহায্যে উৎপাদিত লবণ আকারে মোটা তাই খাদ্যপণ্য হিসেবে এর ব্যবহারে অন্তরায় দেখা গেল। লবণপানিকে ফুটিয়ে যে লবণ পাওয়া যেতো তা দেখতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও মিহি তাই প্রথম প্রথম সৌরশক্তিতে উৎপাদিত লবণকে খাবার লবণে পরিণত করার জন্য তদানীন্তন "দাউদ কোম্পানি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সর্বপ্রথম যাতা (মোটা লবণ পিষে চিকন বা সরু করার কারখানা) আমদানি করে। 'যাতা' আমদানি করে সৌরতাপে উৎপাদিত মোটা লবণকে যাতা'র সাহায্যে পিষে মিহি ও চিকন করে তা খাবার লবণ হিসেবে ব্যবহার শুরু হলো।

১৯৪৯ সাল থেকে লবণ উৎপাদনের নবদিগন্তের সূচনা হয়ে কালের চাকা ঘুরলেও একই পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন অব্যাহত থাকলো এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত সেই পদ্ধতির আর কোনো পরিবর্তন হলো না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে লবণের অনেক

www.pathagar.com

উত্থান-পতন হয়েছে। লবণের এমনও যুগ ছিল যখন চার আনায় এক মণ লবণ বিক্রি করতে গ্রাহক খুঁজতে হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় পল্লি গোমাতলি যেখানে সৌর তাপের লবণ উৎপাদনের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তা পরবর্তীতে "কেরানি ঘোনা বা নুন কেরানির ঘোনা" নামে পরিচিত হয়েছে। উক্ত কেরানির ঘোনা এখনো বিদ্যমান।"[৩৬]

## দেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র কুটির শিল্প

"বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প লবণ যা কক্সবাজারের ৭টি উপজেলা ও চট্টগ্রামের একটি উপজেলার উপকূলীয় ৬০ থকে ৭০ হাজার একর জমি থেকে উৎপাদিত হয়।

এই লবণ উৎপাদনের সঙ্গে দেশের সর্বাধিক ১০ লক্ষাধিক লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। বিশেষ করে এই ১০ লাখ লোক লবণ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে। লবণ উৎপাদনের প্রাক্কালে কেউ চিন্তাও করেনি যে লবণ শিল্পের সঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী জড়িয়ে পড়বে এবং এই লবণশিল্পের উপর নির্ভর করে করবে জীবিকা নির্বাহ। লবণকে আমরা শিল্প হিসেবে বিশেষিত করে 'লবণ শিল্প' বললেও সরকারিভাবে লবণ 'শিল্প' নয়। লবণ যারা উৎপাদন করে তাদেরকে 'লবণচাষি' বলা হয়। অপর দিকে কৃষিপণ্য উৎপাদনে যারা শ্রম দিচ্ছে তাদেরকেও চাষি বলা হয়। ফলে লবণচাষি এবং শস্য উৎপাদনকারী চাষির মধ্যে শাব্দিক অর্থে কোন ব্যবধান নেই। তবে উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল তফাৎ। লবণ, উৎপাদনএলাকা থেকে মিলে গেলেই তা শিল্পের মর্যাদা পাচ্ছে। অথচ কৃষি পণ্য বিশেষ করে ধান কারখানায় গেলেও শিল্পপণ্যের মর্যাদা পাচ্ছে না। কিন্তু যারা সরাসরি মাঠে লবণ উৎপাদন করছে তারা শিল্পমালিক হিসেবে খ্যাত নয় এবং মর্যাদাও পাচ্ছে না। আমরা এসব লবণচাষিদেরকে সাধারণ কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে আলাদা করার জন্য 'লবণ উৎপাদনকারী' বলছি। লবণ, শিল্পপণ্য হিসেবে সমাদৃত হলেও লবণ উৎপাদনকারীরা শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। এখানে রয়ে গেছে বিরাট বৈষম্য। এই বৈষম্য দূর করা দরকার। অন্যথায় লবণ উৎপাদনকারীরা চিরদিনই বঞ্চিত হবে। অন্যদিকে লবণমিলমালিকরা ফায়দা লুটবে। লবণশিল্পের অভিভাবক হিসেবে দেখাশুনা করছে 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন'। অথচ লবণ সরাসরি কৃষিপণ্য হলে বিসিক দেখাশুনা করতো না। লবণের বিষয়টি বিসিক দেখাশুনা করলেও লবণকে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবেও সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। এই কাকতালীয়ভাবে চলছে লবণ নিয়ে যত সব কর্মকাণ্ড।

লবণের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিসিক, টিসিবি। অনেক সময় এই আন্তমন্ত্রণালয় রশি টানাটানি দিয়ে লবণনীতির বেহাল অবস্থা হয়। উৎপাদনকারীরা হয় প্রতারিত। এসব কারণে অনেকদিন আগে থেকেই দাবি উঠেছে কক্সবাজারে 'লবণ বোর্ড' গঠনের। লবণের, লবণ উৎপাদনকারীদের সুবিধা অসুবিধা দেখার জন্য লবণ বোর্ড অপরিহার্য যা স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। প্রশ্ন উঠেছে, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক বোর্ড, রেশম বোর্ড গঠন করা গেলে 'লবণ বোর্ড' কেন গঠন করা যাবে না? জেলাবাসী মনে করে কক্সবাজারে লবণ বোর্ড স্থাপন না করে জেলাবাসীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

দেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প হিসেবে লবণ উৎপাদনের সঙ্গে সর্বাধিক ১০ লাখ জনশক্তি জড়িত। এইসব জনশক্তি শুধু বছরের এক মওসুম তথা ৫/৬ মাসের জন্য জড়িত থাকে। বছরের অবশিষ্ট সময় অনেকেই বেকার থাকে, আবার অনেকে অন্যান্য পেশায় জড়িয়ে পড়ে।"[৩৭]

"বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশনের হিসেবে অনুযায়ী জেলায় বর্তমানে ৪৬ টি লবণমিল রয়েছে। তৎমধ্যে মাত্র ৫টি মিল চালু আছে। এদিকে সাধারণ লবণকে আয়োডিন মিশিয়ে আয়োডিনযুক্ত করার জন্য ইউনিসেফ প্রায় ২ কোটি ৬০ লাখ ব্যয়ে ৩৩টি লবণ মিলে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে। লবণমিলগুলো বন্ধ থাকার ফলে এইসব মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিরিবিলি সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ জেলার একমাত্র মিল ইউনিসেফের এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ লবণকে আয়োডিনযুক্ত করছে। সম্প্রতি নিরিবিলি আয়োডিনযুক্ত লবণ বাজারে ছেড়েছে।

সরকারের সুষ্ঠ ও বাস্তব কোনো লবণনীতি না থাকার কারণে চাষিদের সমস্যার অন্ত নেই। সরকারি সিদ্ধান্তানুযায়ী দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক লবণচাষিদের একর প্রতি ১০০০ টাকা করে ঋণ দেয়ার জন্য আদেশ দেয়। যেখানে একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৩৩,২০০ টাকা সেখানে ১০০০ টাকা খুবই নগণ্য। তা'ছাড়া লবণ মৌসুম আরম্ভ হয়ে মাঝামাঝি সময়ে উন্নীত হলেই ঋণ দেয়া হয়। এ সময়ে ঐ ঋণ লবণ উৎপাদনের কাজে ব্যয় হয় না। সোনা দানা ও বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস বন্ধক দিয়ে মহাজনের কাছ থেকে অধিক সুদে নেয়া টাকা পরিশোধের জন্য চাষিদেরকে মহাজন এবং ব্যাংক উভয় পক্ষকে সুদ দিতে হয়। তাছাড়া এ স্বল্প অংকের ঋণ নেয়ার জন্য উৎপাদনের কাজ বন্ধ রেখে দিনের পর দিন ব্যাংকে তদবির করতে হয়। সে জন্য তাদের কয়েক শত শ্রমঘণ্টা বিনষ্ট হয় এবং এতে চাষিরা উৎপাদনের দিক থেকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে জাতীয় স্বার্থে উদ্যোগী হয়ে যদি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো চাষিদের ঋণের অংক বৃদ্ধি করে ঋণ প্রদান করে, তা হলে চাষিদের মহাজনকে চড়া হারে সুদ দিতে হয় না এবং উৎপাদনে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় না। তদুপরি চাষিদের কাছ থেকে সরকারিভাবে লবণ ক্রয় করলে ব্যাংকের টাকাও অনাদায়ী থাকে না। অধিকন্তু উৎপাদন এলাকায় সরকারি সহযোগিতায় ও বেসরকারি মালিকানায় ৪৬টির অধিক মিল স্থাপিত হয়েছে।"[৩৮]

পূর্বেই আলোচনা করেছি, বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত পানি জমিতে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বাষ্পীয়ভবন করে লবণ উৎপাদন করা হয়। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে কক্সবাজারে লবণ উৎপাদিত হয় বছরের পাঁচ থেকে ছয় মাস। নভেম্বর থেকে শুরু করে এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত শুষ্ক মওসুমে লবণ উৎপাদিত হয়। আগাম বর্ষা শুরু হলে নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত লবণ উৎপাদন করা হয়। জেলার কক্সবাজার সদর, টেকনাফ, রামু, মহেশখালি, কুতুবদিয়া, চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলার প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ হাজার একর উপকূলীয় জমিতে লবণ উৎপাদন করা হয়। কক্সবাজারে মাঠ পর্যায়ে মোটা দানা লবণ উৎপাদিত হয়। এই মোটা দানা লবণ ক্রাসিং মিলে দিয়ে পরিশোধন করা হয়। পরিশোধিত লবণই বাজারজাত করা হয়। লবণ ক্রাসিং করার জন্য জেলার সদর উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নে গড়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল। শিল্পাঞ্চলে ৫০টির অধিক লবণ ক্রাসিং মিল স্থাপিত হয়েছে। এসব ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে লবণ ক্রাসিং মিল

www.pathagar.com

রয়েছে। তবে বিভিন্ন শিল্পে মোটা দানা লবণ ব্যবহার করা হয়। লবণশিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে দিনমজুর, নৌকা, জালিবোট, বালামবোট, গদু নৌকা। এছাড়াও লবণ উৎপাদনে প্রয়োজন ঢেকিকল বা ডংগিল, পানি সেচ দেওয়ার প্রাচীন মাধ্যম হিচইন (বাঁশের বেতের তৈরি পানি সেচের মাধ্যম), গরা বা কাঠের মসৃণ গুড়ি বা কাষ্ঠখণ্ড বা ইংরেজি শব্দ রোলার, পাইট্যা, নিড়ানি, দা-কোদাল, মই, বাঁশ বা কাঠের খুঁটি, লবণ উৎপাদনকারী শ্রমিকদের থাকার জন্য অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও পলিথিন। বর্তমানে লবণ মাঠে পানি সেচের প্রাচীন মাধ্যম হিচইন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। হিচইনের স্থান দখল করেছে ঢেকিকল বা ডংগিল। এই ঢেকিকল বা ডংগিল তৈরি করা হয় কাঠ দিয়ে। বর্তমানে ঢেকিকল বা ডংগিলও বাতিল হয়ে যাচ্ছে। পানি সেচের জন্য হিচইন, ঢেকিকল, ডংগিলের স্থান দখল করছে যন্ত্রচালিত পাম্প। এসব পাম্প বিদ্যুত বা জ্বালানী তেলের মাধ্যমে চলানো হয়। পূর্বে পানি সেচের জন্য প্রয়োজন হতো দু'জন শ্রমিক। ঢেকিকল বা ঢংগিলের মাধ্যমে পানি সেচ দিতে প্রয়োজন একজন শ্রমিক। বর্তমানে এক অশ্বশক্তি বা আধা অশ্বশক্তি সম্পন্ন পাম্প দিয়ে কম সময়ে অনেক বেশি পানি উত্তোলন করা সম্ভব। ফলে লবণ উৎপাদনকারীরা ক্রমেই পাম্পের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

লবণ উৎপাদনের জন্য সর্ব প্রথমে প্রয়োজন মাঠ প্রস্তুত করা ও লবণ উৎপাদনের অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করা। মাঠ প্রস্তুতের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে, নির্দিষ্ট জমিকে নির্দিষ্ট আকার-আকৃতির খণ্ডে বিভক্ত করা। এরপরেই বিভক্ত খণ্ডগুলোকে অলিখিতভাবে নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা। লবণ উৎপাদানের বিভক্ত খণ্ডগুলোকে ১ নম্বর খণ্ড, ২ নম্বর খণ্ড, ৩ নং খণ্ড ও ৪ নং খণ্ডে চিহ্নিত করে লবণ উৎপাদনের কাজ শুরু করা হয়। সমুদ্রের পানি লবণ উৎপাদন জমি সংলগ্ন নালা থেকে প্রথমে হিচইন বা ঢেকিকল বা ডংগিল বা সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে ১ নম্বর খণ্ডে নেয়া হয়। ১ নম্বর খণ্ড থেকে পানি নেওয়া হয় ২ নম্বর খণ্ডে, ১ নম্বর খণ্ড থেকে ২ নম্বর খণ্ডে নেওয়ার পূর্বে দেখে নেওয়া হয় পানির ঘনত্ব বেড়েছে কিনা। পানির ঘনত্ব দেখার জন্য পূর্বেই ছোট বাঁশের কঞ্চি নিয়ে তৈরি করা হয় ডিক্রি যা অনেকটা থার্মোমিটারের ন্যায়। থার্মোমিটারে পারদের মাধ্যমে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা দেখা হয়, পক্ষান্তরে পানির ঘনত্ব দেখার জন্য কথিত বাঁশের কঞ্চির ভেতরে সীসা ফেলে রেখে ঘনত্ব দেখা হয়। তবে বর্তমানে লবণ উৎপাদনকারীরা পানির ঘনত্ব দেখার জন্য ডিক্রি ব্যবহার করে না। তারা লবণপানি জিহ্বায় দিয়েই বুঝতে পারে পানির ঘনত্ব। এভাবে পানির ঘনত্ব অনুসারে ১ নম্বর খণ্ড থেকে ২য় খণ্ডে, ২য় খণ্ড থেকে ৩য় খণ্ডে এবং সর্বশেষ পানি যখন মোটামুটিভাবে ঘাঢ় ঘনত্বপ্রাপ্ত হয় তখন পানি ৪র্থ খণ্ডে নেওয়া হয়। ৪র্থ খণ্ডে পানি নেওয়ার একদিন অথবা আধা দিনের মধ্যেই লবণে পরিণত হয়। পানির ঘনত্ব বাড়ে-কমে মূলত সূর্যের আলোর উপর। সূর্যের তাপমাত্রা যত বেশি হবে তত তাড়াতাড়ি পানির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে। বোশেখ মাসের তাপমাত্রা বেশি থাকার কারণে অনেক সময় সাগরের লবণ পানি প্রক্রিয়াজাত করে মাত্র একদিনের মধ্যেই লবণে পরিণত হয়। লবণ পানি ৪ নম্বর খণ্ডে যাওয়ার পরেই পনি শুকিয়ে জমিতে সাদা সাদা লবণ পড়ে থাকবে। লবণের স্তরকে গাঢ় থেকে গাঢ় করতে চাইলে ৩ নম্বর খণ্ড থেকে 'জাত পানি' Concentrated water ৪ নম্বর খণ্ডে কয়েকবার দিলে লবণের স্তর কমপক্ষে দুই থেকে তিন ইঞ্চি পুরো হয়ে থাকে। তখন

www.pathagar.com

চাষিরা বা উৎপাদনকারীরা মাঠ থেকে লবণ সংগ্রহ করে। মাঠ থেকে সরাসরি হাত দিয়ে লবণ সংগ্রহ করা হয় না। কাঠের তৈরি পাইট্যা দিয়েই লবণ লাই বা ঝুড়ি বা টুকরিতে ভর্তি করে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। এর পূর্বে মাঠের লবণের স্তরকে ভেঙে দেওয়া হয়।

মাঠ থেকে লবণ উত্তোলন এবং পানি দেওয়ার পূর্বেই মাঠ প্রস্তুত করা হয়। মাঠ প্রস্তুত করার জন্য মধ্যে আগে জমির আবর্জনা, ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। এরপরে জমি সমান করে নিতে হবে এবং সমান করার পরে জমির পানি বের করে দিয়ে সূর্যের আলোতে জমি শুকিয়ে নিতে হবে। জমির উপর হাঁটার সময় পায়ের চাপ না পড়লেই বুঝতে হবে জমি শুকিয়ে গেছে। এরপরে জমিকে সমান ও তেলতেলে করার জন্য গরা দিয়ে মাঠ সমান করতে হবে। 'গরা' হচ্ছে কাঠের টুকরি বা কাষ্ঠখণ্ড বা রোলার। গরার দু'পাশে দুটি মোটা পেরেক গেঁথে দিতে হবে এবং উক্ত পেরেকের সাথে দুটি লম্বা কাঠি সংযুক্ত করতে হবে যাতে ধরে গরাকে সামনে পেছনে করা যায়। এই গরার মাধ্যমেই জমি সমান করার পরেই আরো দু'দিন মাঠ শুকাতে হবে। আবার গরা দিয়ে জমি সমান করার পরেই জমিতে লবণপানি তোলা হয়। লবণপানি দেয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাষ্পীয়ভবনের মাধ্যমে পানি শুকিয়ে সাদা সাদা লবণ মাঠে পড়ে থাকে। কয়েক দিনের টানা হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরেও মাঠে মোটা দানা সাদা লবণ দেখার পরেই চাষির মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠে। চাষি এসব লবণ কাঠের তৈরি পাট্টা দিয়ে সংগ্রহ করে স্তুপ করে রাখে। পরে স্তুপ থেকে টুকরিতে মওজুদ করে। এভাবে লবণ উৎপাদন করা হয়। এসব মোটাদানা লবণ পরে ক্রাসিং মিলে গিয়ে মিহি হয়ে যায় এবং আমাদের খাবারের লবণ হিসেবে বাজারে আসে। পূর্বেই বলেছি লবণ মাঠে নামার আগে বিভিন্ন সরঞ্জাম ও লবণ উৎপাদনের উপকরণ তৈরি করা হয়।"[৩৯]

## তথ্যনির্দেশ

১. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২২।
২. দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮) (কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর ভ্রমণ)- ভেলাম ভান সেন্দেল সম্পাদিত, অনুবাদ : সালাহউদ্দিন আউয়ুব, প্রকাশক : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, রুম ১১০৭, কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৪,পৃষ্ঠা-৬৮।
৩. সুধন রুদ্র, পিতা : রমণী রুদ্র, মাতা : প্রমিলা রুদ্র, বয়স : ৫০ বছর, গ্রাম : রুদ্র পাড়া, ইউনিয়ন : খুরুশকুল, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০২-০৪-২০১৩, সময় : সকাল- ১০টা।
৪. মনজু রুদ্র, স্বামী : রমণী রুদ্র, বয়স : ৬০ বছর, গ্রাম : রুদ্র পাড়া, ইউনিয়ন : খুরুশকুল, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০২-০৪-২০১৩, সময় : সকাল সাড়ে ১০টা।
৫. দুলাল রুদ্র, পিতা : অশ্বিনী কুমার রুদ্র, মাতা : বাসনা রুদ্র, বয়স : ৫৪, পেশা : মৃৎশিল্পী, গ্রাম : কুলাল পাড়া, ঈদগাঁও ইউনিয়ন, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৫.১০.২০১২, সময় : সকাল সাড়ে ৯টা।
৬. বরকেতা গাইন-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৬।

www.pathagar.com

৭. গোলচেহের, স্বামী : আবদুর রহিম, বয়স : ৩৫ বছর, গ্রাম : কালা খোন্দকারপাড়া, ইউনিয়ন : দক্ষিণ মিঠাছড়ি, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার। তারিখ : ০৫-০৪-২০১৩, সময় : সকাল- ১০টা।

৮. নূর বাহার, স্বামী : নূরুল আমিন, বয়স : ৪৫ বছর, গ্রাম ও ইউনিয়ন : দক্ষিণ মিঠাছড়ি, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৫-০৪-২০১৩, সময় : সকাল ৯টা।

৯. এডভোকেট আবুল কালাম ছিদ্দিকী, প্রাক্তন সভাপতি, কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতি, পিতা : মাস্টার মকবুল আহমদ, বয়স : ৬৩ বছর, গ্রাম : তেচ্ছিপুল, ইউনিয়ন : চাকমারকুল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১৫-০৬-২০১৩, সময় : সকাল- ১০টা।

১০. রোজিনা আকতার, পিতা : শরাফ জামান, মাতা : ছমুদা খাতুন, বয়স : ২২, গ্রাম : কালা খোন্দকারপাড়া, ইউনিয়ন : দক্ষিণ মিঠাছড়ি, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৫-০৪-২০১৩, সময় : সকাল সাড়ে ১০টা।

১১. গোলচেহের, স্বামী : আবদুর রহিম, বয়স : ৩৫ বছর, গ্রাম : কালা খোন্দকারপাড়া, ইউনিয়ন : দক্ষিণ মিঠাছড়ি, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার। তারিখ : ০৫-০৪-২০১৩, সময় : সকাল- ১১টা।

১২. বাচামিয়া, পিতা : আবদুল আলী, মাতা : গোলফরাজ খাতুন, গ্রাম ও ইউনিয়ন : দক্ষিণ মিঠাছড়ি, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৫-০৪-২০১৩, সময় : সকাল সাড়ে ৯টা।

১৩. নূর আহমদ, পিতা : হাফেজ ইমাম শরীফ, বয়স : ৯৪, চালইন্যাপাড়া (উত্তর ফতেখারকুল), ইউনিয়ন : ফতেখারকুল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২১-০৪-২০১৩, সময় : বেলা-১১টা।

১৪. জাকির আহমদ, পিতা : মোহাম্মদ হোসেন, বয়স : ৫৮, মেহেরুননেছা, স্বামী : জাকির আহমদ, বয়স : ৪৬, গ্রাম : চালইন্যাপাড়া, (উত্তর ফতেখারকুল), ইউনিয়ন : ফতেখারকুল, উপজেলা : রামু, জেরা : কক্সবাজার, তারিখ : ২১-০৪-২০১৩, সময় : বেলা সাড়ে ১১টা।

১৫. ফেলে আসা দিন- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম সম্পাদিত, (১১ ডিসেম্বর ১৯৮৭ সালে কক্সবাজারে প্রথম বারের মতো আয়োজিত লোক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত), প্রকাশক : কক্সবাজার লোকসাহিত্য পরিষদ, ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৭ সাল, পৃষ্ঠা-১২-১৩।

১৬. বরকেতা গাইন-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৫।

১৭. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯। পৃষ্ঠা-৭৪।

১৮. ছাবের আহমদ, পিতা : ফরুখ আহমদ, মাতা : ধলু বিবি, বয়স : ৫৯ বছর, গ্রাম : পশ্চিম উমখালী, ইউনিয়ন : দক্ষিণ মিঠাছড়ি, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১৭-১০-২০১৩, সময় : সকাল : ১০টা।

১৯. ষাট বছরের কবিতা-মুহম্মদ নূরুল হুদা, প্রকাশক : লেখালেখি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৭৯৭।

২০. কবির আহমদ কোম্পানী, বয়স : ৬৮, সভাপতি, কক্সবাজার জেলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, প্রযত্নে/ হোটেল সীকুইন, ঝাউতলা, কক্সবাজার। তারিখ : ২৫-১০-২০১৩, সময় : সকাল ১০টা।

২১. জালাল আহমদ বহদ্দার, পিতা : ফজল করিম, মাতা : বেগমজান, বয়স : ৫২, গ্রাম : উত্তর নুনিয়াছড়া, কক্সবাজার পৌর এলাকা, তারিখ : ১৯-১০-২০১৩, সময় : সকাল ১০টা।

২২. জরিনা বেগম, স্বামী : মোকতার আহমদ, বয়স : ৪৫, গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাগ, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১২-০৩-২০১৩, সময় : সকাল : ১০টা।

www.pathagar.com

২৩. বরকেতা গাইন-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৪ ।
২৪. রবী চৌধুরী, বাবা : তরনী চৌধুরী, মাতা : অনিমা চৌধুরী, বয়স : ৩৫ বছর, কক্সবাজার পৌর এলাকা, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০১-০৬-২০১৩, সময় : বিকাল ৫টা ।
২৫. এস এম জাফর, পিতা : কবির আহমদ সওদাগর, মাতা : ছৈয়দা চেমন বাহার, বয়স : ৩৫, গ্রাম : মণ্ডল পাড়া, ইউনিয়ন : ফতেখারকুল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২০-০৬-২০১২, সময় : সকাল : ১০টা ।
২৬. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কক্সবাজারের অবদান- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : বাঁকখালী প্রকাশনী, ঢাকা-কক্সবাজার, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৪৩-৪৪ ।
২৭. মোজাফ্ফর আহমদ, পিতা : সালে আহমদ, মাতা : জলিয়া খাতুন, বয়স : ৫৫, গ্রাম : নতুন বাহারছড়া, কক্সবাজার পৌরএলাকা, উপজেলা ও জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ৩১-১১-২০১৩.
২৮. বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়-ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা- মং বা অং (মং বা), লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, কক্সবাজার, পৃষ্ঠা-১১২ ।
২৯. ম্যাম্যাচিন, পিতা : মং কিউ লা, মাতা : উমেচেন, বয়স : ৪৫, গ্রাম : রাখাইনপাড়া, মহেশখালী পৌরসভা, উপজেলা : মহেশখালী, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১০-১০-০১৩, সময় সকাল : ১০টা ।
৩০. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন-বিসিক লবণ প্রকল্প, কক্সবাজার ।
৩১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কক্সবাজারের অবদান- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : বাঁকখালী প্রকাশনী, ঢাকা-কক্সবাজার, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-২১ ।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২-২৩ ।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩ ।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪-২৫ ।
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭ ।
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০-৩১ ।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩২ ।
৩৮. মোর্শেদুর রহমান খোকন, পিতা : মোহাম্মদ ইদ্রিচ, মাতা : নূর আয়েশা বেগম, বয়স : ৪১, গ্রাম : কাউয়ারপাড়া, ইউনিয়ন : খুরুশকুল, উপজেলা : কক্সবাজার সদর উপজেলা, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৫-০১-২০১৩, সময়: সকাল ১০টা ।

www.pathagar.com

# লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে বিচিত্র মানুষের বসবাস কক্সবাজার জেলায়। প্রাচীনকালে জেলার একটি বৃহৎ এলাকা জুড়ে ছিল মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত বার্মিজ ও পালি ভাষাভাষী মগ, রাখাইন সম্প্রদায়। যদিও তারা নিজেদেরকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে পরিচয় দিতে অস্বীকার করে। তবে অফিসিয়ালি তারা বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত। এছাড়াও প্রাচীনকালে ছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত মুরং, চাক, তঞ্চঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকজন। ১৭৯৮ সালে কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় মুরুংদের বসবাস ছিল কিন্তু বর্তমানে জেলার কোথাও মুরংদের বসবাস নেই।

"নদী থেকে দূরে একটা জেলা আছে, নাম ঈদগাঁও, যা অনেক বিলম্বে চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে। তার বিপরীতে আছে কাউং-লা-পরুর অধীন ঝুমিয়া মুরংদের গ্রাম। যে নদীর কথা বলছি, তার স্রোত মাতামুহুরীর মতো নয় বলে নৌকো ব্যবহারে অসুবিধা। তার ফলে, লোকেরা পিঠে করেই পাহাড়ী উৎপাদিত দ্রব্য–যেমন সুতো কিংবা অন্য কিছু বহন করতে অভ্যস্থ।"[১]

"বিকেলবেলা আমি রাখাইন গ্রাম দেখার জন্যে বেরুলাম, সেখানে ছয়জন মুরং (বাঙালিরা এদের মুরাং বলে) লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। এরা হলো সেসব লোক, যাদেরকে রাখাইনরা 'মুর' উচ্চারণ করে এবং বার্মিজরা ডাকে 'মেয়ো' বলে। নিজেদেরকে তারা বলে 'মু-রো-সা'। তাদের শরীর গড়ন এবং উচ্চারণের দিক থেকে তারা পুরোপুরি রাখাইনদের মতো। তারা প্রায় উলঙ্গ, শ্লীলতা ঢাকার জন্যে সামান্য কাপড় জড়ায়। লম্বা চুলের ঝুঁটি বেঁধে রাখে তারা মাথার সম্মুখভাগে, যে রকম বার্মিজদের অভ্যেস। তাদের কেউ কেউ রাখাইনদের মতো টুপি পরে, কেউ কেউ সবুজ চওড়া ফিতে দিয়ে চুল বাঁধে। তাদের কানে, নাকে, গলায় পিতলের অলংকার ঝুলে থাকে, কেউ কেউ গলায় পুঁতির মালা পরে, রুপোর অলংকারও পরে কেউ কেউ।"[২]

"নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশে আগমন করেছিল নিগ্রো (Negrito), অস্ট্রিক (Proto-Australoid), মঙ্গোলীয় ক. Palace-Monogoloid, খ. Tibeto-Monogoloid, দ্রাবিড় (ক) Palaco-Mediterranean, (খ) Meditrranean, আলপাইনীয় (Alpionid), আর্মেনীয় (Armenoid), দিনারীয় (Dinaric), নর্ডীয় (Nordic), আর্য প্রভৃতি গোত্রের জনগোষ্ঠী। তাদের সংমিশ্রণ ও সমম্বয়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতি তথা বাঙালি জাতি। কক্সবাজারের আদিম জনগোষ্ঠীও উপরোক্ত জনগোষ্ঠী এবং বাঙালি জাতির অংশ। নিগ্রো, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়রা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লোক। তারা আরব ও ইরানের মধ্য দিয়ে আসাম অবধি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশে এই তিন গোষ্ঠীর সংখ্যা অধিক দেখা যায়। আর্য জনগোষ্ঠীর প্রথম দল অন্যান্য দেশ হয়ে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশে আগমন করে। তাদের দ্বিতীয় দল আর্যবর্ত তথা উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করে। তবে আর্যদের সংখ্যা বাংলাদেশে

www.pathagar.com

নগণ্য। অন্যান্য জনগোষ্ঠীসমূহ হিমালয় পর্বতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের লোক। মঙ্গোলীয়রা বার্মা হয়ে আরাকান কক্সবাজারসহ চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ভোট চীনা গোত্রের লোকেরা কাছার হয়ে বার্মা অবধি বসতি স্থাপন করে। চট্টগ্রামি উপভাষার উপর বিশেষ করে ধ্বনি বিকৃতির দিক দিয়ে ভোট চীনা ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। পণ্ডিতগণের মতে, আসামের খাসি, বার্মার মন (Mons) জাতি শ্রেণির অস্ট্রো এশীয় জনগোষ্ঠীই কক্সবাজারের আদিবাসী। তাদের সঙ্গে মিশেছে ভোট চীনাগণ। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে এসেছে কুকী চীন। কক্সবাজারের আদিম জনগোষ্ঠি তাদের অংশ।

কক্সবাজারের আদিম জনগোষ্ঠীর সাথে ১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান বৃহত্তর চট্টগ্রামে প্রথম রাজ্য স্থাপনকারী রাজা চন্দ্রসূর্যের মগধাগত হিন্দু ও বৌদ্ধ সৈন্যদের ধর্ম প্রচারের ফলে কক্সবাজারের নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ অধিবাসীর উদ্ভব হয়। ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে সোনার গাঁ'র সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ'র বৃহত্তম চট্টগ্রাম বিজয়ের পর থেকে সূফি সাধক ও গৌড়াগত মুসলমানেরা ইসলাম প্রচারের ফলে কক্সবাজারে মুসলমান অধিবাসীর উদ্ভব হয়। ডুলাহাজারা খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল স্থাপিত হওয়ায় স্বল্প সংখ্যক স্থানীয় লোক খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। কক্সবাজার বর্তমানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও মুসলমান এই চার ধর্মাবলম্বীর আবাসভূমি।"[৩]

"আরব ভৌগোলিকদের মধ্যে সোলায়মান ৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে সিলসিলাত-উত-তাওয়ারিখ নামক একখানি বই লিখেন, তাঁর পরে আরও কয়েকজন আরব ভৌগোলিক একই রূপ বই লিখেন, তবে তাঁরা সকলেই মোটামুটিভাবে সোলায়মানের বিবরণ অনুসরণ করেন, যদিও তাঁরা কিছু কিছু নতুন তথ্যের সমাবেশ করেন। এই গ্রন্থগুলিতে দেখা যায় যে, আরবেরা চট্টগ্রামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। চট্টগ্রাম প্রাচীনকাল থেকে সামুদ্রিক বন্দর, সুতরাং চট্টগ্রামের সঙ্গে বণিকদের যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নয়, কিন্তু সারা চট্টগ্রাম কক্সবাজার উপকূলের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় ছিল। আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাজ-দা-তুয়ে'-এ নিম্নরূপ একটি তথ্য পরিবেশিত হয়েছে: "এই সময়ের শেষ ভাগে কান-রা-দজা-গীর বংশধর মহুত-ইঙ্গ-চন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা বাইশ বৎসর রাজত্ব করার পরে মারা যান। কথিত আছে যে, তাঁর সময়ে (৭৮৮-৮১০ খ্রিষ্টাব্দে) কয়েকটি কু-ল অর্থাৎ বিদেশি জাহাজ রণবী দ্বীপের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙে যায় এবং জাহাজের মুসলমান আরোহীদের আরাকান পাঠানো হয়। তারা সেখানে গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ইহা আরাকানের ঘটনা, কিন্তু একদিকে চট্টগ্রাম বন্দর এবং অন্যদিকে আরাকানের সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ থাকলে মধ্যবর্তী উপকূল বাদ পড়ে না। সুতরাং বলা যায় যে-কক্সবাজার উপকূলের সঙ্গেও আরব মুসলমানদের পরিচয় বা যোগাযোগ ছিল। কক্সবাজার উপকূলের অদূরেই কয়েকটি দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালি, মাতারবাড়ি, সোনাদিয়া, শাহপরী এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপ। এই সকল দ্বীপে মুসলমানদের বাস, অমুসলিমের সংখ্যা খুবই কম। নির্দ্বিধায় ধরে নেওয়া যায় যে মুসলমানদের মধ্যে আরব ব্যবসায়ীরা সর্ব প্রথম এই সকল দ্বীপে বসবাস শুরু করে। এর ফলে দ্বীপগুলিতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।"[৪]

এখানে "বদর শাহ সম্পর্কে আলোচনার কারণ কক্সবাজার জিলায়ও বদর শাহের স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। এই স্মৃতি বদর মোকাম-এর মাধ্যমে। সমুদ্রোপকূলে কক্সবাজার জিলার শেষ সীমানা বদর মোকাম। বদর মোকাম শুধু কক্সবাজার জিলার নয়, ত্রিপুরা থেকে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সর্বত্র বদর মোকামের স্মৃতি রয়েছে, অর্থাৎ এই সমুদয় অঞ্চলে, বিশেষ করে সমুদ্র-উপকূলে এই স্মৃতি বিদ্যমান। ড. এনামুল হক এবং

www.pathagar.com

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন "খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে আরাকানে ইসলাম বিস্তৃতি ও মুসলমান প্রভাব অন্যান্য ঐতিহাসিক কর্তৃকও স্বীকৃত। এই সময় হইতেই আসামের সীমা মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী ভূভাগের নানা স্থানে 'বুদ্ধের মোকাম' নামক এক প্রকার অদ্ভুত মসজিদ গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই মসজিদগুলিকে বৌদ্ধ ও চীনা মুসলমান জাতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।"[৫]

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের লোকজন কখন কক্সবাজার আগমন করেছেন এবং কখন বসতি স্থাপন করেছেন বিষয়টি স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে উপরের আলোচনার অবতারণা। বাইর থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সাথে করে নিয়ে এসেছেন। এই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও বসন-ভূষণ অন্যতম।

পোশাক-পরিচ্ছদ হচ্ছে মানুষের সৌন্দর্যের ভূষণ। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেই মানুষ নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণসহ নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলে। কক্সবাজার জেলায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বসবাস। জেলার সম্প্রদায়গুলোর পোশাকের মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র্য। বড়ুয়া বৌদ্ধ, রাখাইন বৌদ্ধ ও চাক সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদের পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যেও রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনকালে এখানকার প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী পুরুষ পোশাক-পরিচ্ছদ হিসেবে ধুতি, পাঞ্জাবি তথা কোর্তা, পায়জামা, শার্ট, আরখা বা আংগি, বাজু, লুঙ্গি, ফতোয়া, মাথার টুপি, কোমরবন্ধ বা দইরমান ব্যবহার করতো। মহিলাদের পোশাক হচ্ছে শাড়ি, ব্লাউজ বা চুলি, থামি, দুপাট্টা, কাঁথা, গামছা বা মাথার কাপড়, কোমরবন্ধ বা জালি। প্রাচীনকালে জেলার মুসলমান পরিবারের মহিলাদেরকে প্রতিবেশী আরাকানি মহিলাদের অনুকরণে থামি, চুলি, কোমরবন্ধ বা জালি ও ভেদাই পরতে দেখা যেতো। পুরুষেরাও মহিলাদের ন্যায় কোমরবন্ধ পরতো। পুরুষদের কোমরবন্ধের স্থানীয় নাম 'দইরমান'। পুরুষের দইরমানের ছিল পৃথক ব্যবহার। দইরমানের ভেতরটা থাকে ফাঁকা। দূরের যাত্রায় দইরমানের ভেতরে নগদ অর্থকড়ি সংরক্ষণ করে বহন করা হতো। নিরাপত্তার জন্য এটি ছিল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। অনুরূপভাবে মহিলাদের জালিও ছিল একই রকমের যা ভেতরে ফাঁকা। মহিলারাও জালির ভেতরে করে টাকা-কড়ি, অলংকারাদি নিরাপদে বহন করতে পারতো। মহিলাদের জালি বা কোমরবন্ধের মতো সুতা দিয়ে বা কাপড় সেলাই করে এইসব কোমরবন্ধ বা মহিলাদের জালি ও পুরুষদের দইরমান তৈরি করা হতো।

শাড়ির ব্যবহার খুবই কম ছিল। ধনী পরিবারের মহিলাদের মাত্র কয়েকটি শাড়ি থাকতো। তা ছাড়া মহিলারা ফুলহাতা ও হাফহাতা চুলি পরিধান করতো। কলাবাগান গামছা, বরইফুইল্যা গামছা ও গুলবাহার গামছা ছিল মহিলাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও প্রথম পছন্দের পরিচ্ছদ। বিয়ের নির্ধারিত শাড়ি ছিল বালুচুরি শাড়ি। কিন্তু ইদানীং এগুলোর ব্যবহার কমে গেছে। সালোয়ার-কামিজ, ওড়না ও শাড়ি প্রাচীন পোশাক পরিচ্ছদের স্থান দখল করে নিয়েছে। তবে রাখাইন নারীরা পূর্ববৎ দুপাট্টা তথা থামি ও ভেদাই বা চুলি পরে। অনেকেই হাতালম্বা চুলি পরিধান করে। রাখাইন মহিলারা ওড়না ব্যবহার করে না। রাখাইন নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পূর্ণরূপে আরাকানি এবং মিয়ানমারের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নারীদের অনুকরণে তৈরি। রাখাইন পুরুষেরা লুঙ্গি ও শার্ট পরিধান করে। অপরদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষিত এবং ইবাদৎ-বন্দেগীর সাথে জড়িত পুরুষেরা পায়জামা, পাঞ্জাবি, টুপি, গলায় জলগামছা বা হাজি রুমাল পরিধান

www.pathagar.com

করেন। প্যান্ট-শার্ট এর প্রচলন এখন বাড়ছে। মুসলিম মহিলারা ঘরের বাইরে গেলে বাধ্যতামূলকভাবে বোরখা পরতো। শুধু তাই নয়, দিনে হোক বা রাতে হোক মুসলিম নারীদের বোরকা পরিধান যেরকম বাধ্যতামূলক ছিল তেমনিভাবে ছাতা খুলে মাথা ঢেকে রাখতে হতো। বর্তমানের ন্যায় বহু রঙের বোরকার ব্যবহার ছিল না, ছিল শুধু কালো রঙের বোরকা। মুসলিম নারীদের ব্যবহৃত বোরকারও ছিল আলাদা বিশেষত্ব। আর তা হচ্ছে, বোরকা এমনভাবে তৈরি করা হতো যাতে মাথা ঢাকার পরে শুধু চোখ দিয়ে হাঁটাচলার রাস্তা দেখা যায়। একই সাথে মাথা ঢেকে রাখার পরেও মাথার উপর আলাদা একটি ঢাকনা দিয়ে রাখা হতো। যদি কোনো অপরিচিত পুরুষ দেখা যায় তখন মহিলারা তৎক্ষণাতে মাথার উপরের ঢাকনা তথা পর্দাটি মাথার উপর থেকে সামনে ফেলে দিতো যাতে করে পথিক মহিলার চোখও দেখ না পায়। মূলত পর্দা-পুষিদার কারণেই এধরনের বোরকা পরিধান করা হতো। হিন্দু সম্প্রদায় ও বড়ুয়া বৌদ্ধদের পোশাকও প্রায় একই রকম ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই সাদা রঙের খোঁচামারা ধুতি ও পায়জামা পরিধান করতো। ধুতি বা লুঙ্গি ও শার্ট নিত্য পরিধেয় হিসেবে স্বীকৃত। হিন্দু সম্প্রদায়ের বনেদি লোকজন শান্তিপুরি ধুতি পরিধান করতো। অন্যরা মোটা তাঁতের ধুতি পরিধান করতো। ধুতি পরিধান করে ধুতির একটি অংশ পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে রাখা ছিল এক আলাদা বৈশিষ্ট্য। তাদের পাঞ্জাবির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, আর তা হচ্ছে কোণা এককাটের ছিল। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা বর্তমানে এধরনের কোণাকাটা পাঞ্জাবি পরিধান করে থাকেন।

প্রাচীনকালে জেলার রামু, কক্সবাজার সদর, মহেশখালি, চকরিয়া, পেকুয়া, উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গেরস্থ পরিবারের প্রায় ঘরে চরকার ব্যবহার ছিল। পরিবারের বুড়ো ও মাঝবয়সী মহিলারা চরকায় সূতা কাটতো এবং চরকায় কাটা সূতা দিয়ে পরিবারের প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরি করতো ও মাছধরার জাল বুনতো। সেকালে গ্রামে শতকরা প্রায় ৯০/৯৫টি পরিবার ছিল কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবী। পুরুষরা দুধরনের কাপড় ব্যবহার করতো এবং তাদের কাজ-কর্মের পোশাক ছিল তাঁতের ধূতি যেটি পরিধান করলে হাঁটুর উপর থাকতো। তখনকার দিনে গ্রামের লোকেরা গায়ে খুব কমই কাপড় ব্যবহার করত। কারও কারও গায়ে 'আনতিরি' নামক এক প্রকার বুকখোলা হাফহাতা কোর্তা থাকতো যা দেখতে অনেকটা ফতুয়ার মতো। ফতুয়া হাফহাতা হলেও পুরো বুকখোলা নয়। এই আনতিরি গায়ে দিয়ে তারা হাট-বাজারেও যাওয়া-আসা করতো। মজলিশ, বিয়ে শাদি, সভা-সমাবেশ যেকোনো অনুষ্ঠানে সম্ভ্রম উদ্রেক কর পোশাক ছিল ধুতি, আনতিরি, আঁরখা ও চাদর। অনেকেই চাদরের উপর শাল ব্যবহার করতো। শাল গায়ে না জড়ালেও ঘাড়ের একপাশে ফেলে রাখতো। জমিদার ও বিত্তশালী পরিবারের লোকেরা চামড়ার তৈরি চটি জুতা ব্যবহার করতো ও মাথায় টুপি ব্যবহার করতো। গ্রামের পাঁচ থেকে সাত বছরের শিশুরা লুঙ্গির বা হাফ প্যান্টের সাথে পরিচিত ছিল না। আট থেকে দশ বছরের শিশু-কিশোরেরা পিতা বা দাদার কাছ থেকে পেলেও তা মাঝে মধ্যে পরিধান করতো। তবে বেশিরভাগ সময় গলায় ঝুলিয়ে রাখতো। তবে বনেদি পরিবারের আট থেকে দশ বছরের শিশুরা হাফ প্যান্ট পরিধান করতো। হাফ প্যান্টের ব্যবহার মূলত ব্রিটিশ ফৌজ এবং লালবাহিনী তথা পুলিশ ও গ্রাম পুলিশের সরকারি পোশাকের আদলে প্রচলন শুরু হয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরুষদের পোশাক ছিল ধূতি ও শার্ট। আজকাল তারা বেশির ভাগই লুঙ্গি, পায়জামা ও শার্ট ও পাঞ্জাবি পরিধান করে। হিন্দু মহিলার সাধারণ

www.pathagar.com

পোশাক ছিল শাড়ি এবং ব্লাউজ। আর্থিক অবস্থানুযায়ী শীতের দিনে তারা গরম কাপড় পরতো। তবে মোটা চাদর ছিল বলতে গেলে সবার শীত নিবারণের মাধ্যম।

প্রাচীনকালে সম্প্রদায় নির্বিশেষে ধনী গরিব সকলেই পায়ে কাঠের তৈরি খড়ম ব্যবহার করতো। তবে এক পর্যায়ে খড়ম আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে উঠে। ফলে জমিদার, মাতবার, চৌধুরী, ভূস্বামীরাই শুধু আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে খড়ম ব্যবহার করতো। গ্রামের সাধারণ কৃষক, শ্রমজীবীরা পায়ের কোনো ধরনের পাদুকা বা খড়ম ব্যবহার করতো না। খালি পায়েই তারা চলাফেরা করতো।

জেলার অধিকাংশ লোকজন লুঙ্গি পরিধান করলেও ঐতিহ্যগতভাবে টেকনাফ উপজেলার জনসাধারণের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র লক্ষণীয়। টেকনাফের পুরুষেরা আরাকানি রাখাইনদের মতো শার্ট তথা আরখা বা অঙ্গরাখা বা বাজুর উপরে লুঙ্গি পরিধান করেন। অর্থাৎ ইন করে প্যান্ট পরার ন্যায় শার্ট বা জামা লুঙ্গির ভেতরে ইন করে পরিধান করে। এতে করে সহজেই তাদেরকে টেকনাফের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদই প্রমাণ করে তাদের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস আরাকান। আরাকান থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করলেও তাদের পৈত্রিক সংস্কৃতি ভুলতে পারেনি বা ভুলেনি। তবে জেলার অন্যান্য এলাকার পুরুষেরা তাদের পিতৃপুরুষের রেওয়াজ অনুযায়ী শার্টের নিচে লুঙ্গি পরিধান করে তথা লুঙ্গির উপরেই শার্ট পরিধান করে।

এভাবে পোশাক পরিধানে ঐতিহ্যগতভাবে সবাই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন বংশ পরম্পরায় চলে আসা রেওয়াজ অনুযায়ী তাদের ঐতিহ্য লালন করে আসছে।

প্রাচীনকালে মুসলিম প্রসূতি নারীরা এক ধরনের থামি পরিধান করতো। তাকে স্থানীয় ভাবে কেথা বা কাঁথা বলা হয়। ব্যবহারের পুরাতন কাপড় দিয়ে এসব কাঁথা সেলাই করা হয়, যা এই পুস্তকের লোকসংস্কৃতির নকশিকাঁথা অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখা হয়েছে। সন্তান প্রসবকালীন, প্রসবের পরে এবং ঋতুবতী মহিলারা এসব কাঁথা পরিধান করতো। সম্ভাব্য রক্তস্রাব হলে তাতে যেনো ভালো কাপড় নষ্ট না হয় সেজন্যই কাঁথা পরিধান করা হতো। রক্তস্রাব হলেও কাঁথার মধ্যে তা সহজে দেখা যায় না। একারণেই প্রসূতি ও ঋতুবতী মহিলার জন্য কাঁথা ব্যবহার নিরাপদ।

প্রাচীনকালে কক্সবাজারের নারীরা বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন আকৃতি ও নকশার অলংকার পরিধান করে নিজেদের সৌন্দর্য্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতো। বিশেষ করে বিয়ে-শাদিতে মেয়েদেরকে নিজেদের দামি অলংকার পরতে দেখা যেতো। পবিত্র ঈদ-উল ফিৎর বা ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষেও নারীরা অলংকারে সজ্জিত হতো। শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়ি যাওয়া বা বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে যাওয়া-আসার সময়ও নারীরা তাদের দামি অলংকার পরিধান করতো। অন্যান্য সময় তারা সাধারণ অলংকার পরে থাকতো। এসব রেওয়াজ এখনো কম-বেশি প্রচলিত। এসব অংলকারাদির মধ্যে রয়েছে, হাঁসুলি, ঠেংখারু বা ঠেকখাড়ু যা দেখতে বলয় সদৃশ পায়ের গোড়ালিতে পরিধেয় রুপার অলংকার, তুববালা, পাঁচিখাড়ু (স্থানীয় উচ্চারণ খারু। স্থানীয়ভাবে খাড়ু কে খারু বলে।), নাকফুল, কানফুল, কানের বালি, নথ, টিকলি, মানতাশা, চুড়ি, খাড়ু, হার, লকেট, তাবিজ, কোমরের চেইন বা বিছা, কণ্ঠার ছড়া, নাকের আণ্ডা, শাখা ইত্যাদি। শাখাটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়েতে প্রদত্ত শাখার আদলেই তৈরি করা হয়। এখানে শুধু শাখার উপরের অংশে স্বর্ণের একটি পাতলা পাত লাগনো হয়। হিন্দু

www.pathagar.com

সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজনও একই ধরনের স্বর্ণালংকার পরিধান করতো। প্রাচীনকালে বর্তমানের মতো স্বর্ণের ব্যবহার ছিল না। প্রাচীনকালে উপরে উল্লেখিত অলংকারাদি রুপা দিয়েই তৈরি করা হতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই স্বর্ণের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, পক্ষান্তরে রুপার ব্যবহার কমে যাচ্ছে। স্বর্ণের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে অলংকারাদির ব্যবহার এবং অলংকারের আইটেমও কমে যাচ্ছে। বর্তমানে উচ্চবিত্ত পরিবার ছাড়া প্রচুর পরিমাণের অলংকারের ব্যবহার দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, বর্তমানে পায়ের খাড়ু (ঠেংখাড়ু), হাঁসুলি, কোমরের বিছা, নাকের নথসহ আরো অনেক অলংকার ব্যবহার করা হয় না। এসব অলংকার ব্যবহার করলে নিম্নরুচির ও গেঁয়ো বলে ব্যঙ্গ করা হয়। তবে সাম্প্রতিককালে কোনো সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী পরিবারের মেয়েরা শখ করে ঠেংখাড়ু ব্যবহার করে। তবে তা পূর্বের ন্যায় রুপার পরিবর্তে স্বর্ণের তৈরি ঠেংখাড়ু পরিধান করে।

প্রাচীনকালে মুরং সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ কাপড়ের ব্যবহারই জানতো না। মুরং নারীরা নিম্নাঙ্গে একটুকরো গাছের ছাল বা বাকল দিয়ে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখতো। পুরুষেরা তাও পরিধান করতো না। তবে নারী-পুরুষ উভয়েই হাতে, কানে, নাকে, গলায় প্রচুর পরিমাণের রূপার অলংকার পরিধান করতো।

## রাখাইন পোশাক-পরিচ্ছদ

"রাখাইন সম্প্রদায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণত রঙিন, উজ্জ্বল ঝলমলে হয়ে থাকে এবং বিশেষত ছাপা কাপড় (বিভিন্ন ধরনের নকশা মুদ্রিত) হয়। ছাপা কাপড় পরিধান করলে মনে আনন্দ-উচ্ছ্বাস থাকে। রাখাইন পুরুষেরা লুঙ্গি (ধো-য়া) আর শার্ট (আং-গ্যি) পরিধান করে। আর মহিলারা পরে মূলত দু'পাট্টা বা দুই প্রস্থ পোশাক। এগুলো হলো থামি (থা-বিং) আর মেয়েদের উপযোগী হাতযুক্ত/হাতছাড়া শার্ট (ভেঃ- ধাই/ রানজেই আংগি) ব্লাউজ (ব-দা-লি) পরিধান করে থাকে। ভে ধাই হাতাছাড়া অথবা হাতাযুক্ত হয়ে থাকে। উৎসব পার্বণে রাখাইনদের পোষাকে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। রাখাইনদের বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকল নারী পুরুষ একটি নির্দিষ্ট রঙের ও একই ডিজাইনের পোশাক পরিধান করে। এ সময় রাখাইন পুরুষেরা আংগ্যির উপরে জ্যাকেট জাতীয় (বারেষ্টার/প্রাং-খেং আংগ্যি) এক প্রকার পোশাক পরিধান করে। আর মহিলারা ওড়না (পোছা-পেইং) ব্যবহার করে। বয়োবৃদ্ধরা মাথায় পাগড়ি (ঘং-ভং) পরিধার করে। ধর্মীয় তিথিতে পুরুষ পূজারীরা সাদা রঙের লুংগি, শার্ট ও ছোট চাদর ব্যবহার করে। মহিলা পূজারীরা দুরঙের থাবিং, আংগ্যি ও চাদর ব্যবহার করে থাকে। রাখাইন রমণীরা প্রায় ত্রিশ প্রকারের খোপা বেঁধে সাজতে পারে।"[৬]

কয়েক যুগ পূর্বেও রাখাইন নারী-পুরুষেরা নিজেদের তৈরি পোশাক পরিধান করতো। বর্তমানে সুতা, তাঁতের মাকুসহ কাপড় বুননের অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এবং বাজারে টিকতে না পারার কারণে তাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প আর চালু নেই। যা কিছু চালু আছে তাও স্বল্প পরিসরে। একই নৃগোষ্ঠীর হওয়ার সুবাদে প্রতিবেশী মিয়ানমারের তৈরি পোশাক কক্সবাজারে সহজলভ্য বিধায় রাখাইন নারী-পুরুষ বার্মা থেকে আসা কাপড়-চোপড়ই সাধারণত পরিধান করে।

রাখাইনরা সৌন্দর্যপ্রিয় ও ঐতিহ্য রক্ষণশীল। তারা মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে মুখমণ্ডলে ও হাতে শ্বেত চন্দন লাগায়। মাথায় উঁচু করে কবরী রচনা করে তাতে উজ্জ্বল ফুল আটকিয়ে নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকতো যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

www.pathagar.com

প্রতিবেশী আরাকানের নারীদের অনুকরণে মুসলিম নারীরাও নিজেদের সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। নারীদের সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে যোগ হলো আধুনিক পার্লার।

প্রাচীনকালে রাখাইন পরিবারে দেখা যেতো নারীরা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতো, পক্ষান্তরে গৃহকর্তা দুপুরের খাবারের পরে স্থানীয় চেরাং ঘরে (বিশ্রামের ঘর) আড্ডা দিয়েই দিনের অবশিষ্ট সময় কাটিয়ে দিত। তবে সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। এখন রাখাইন নারীরা যেমন ঘরে-বাইরে কাজ করে তেমনি পুরুষরাও ঘরে-বাইরে বিভিন্ন পেশা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

গ্রামের সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের পোশাকেও তেমন পার্থক্য ছিল না। তারা মাথায় টুপি বা শামলা ধরনের মস্তকাবরণ ব্যবহার করত। গায়ে আংরাখা পরতেন আর জোলা, তাঁতী বা যোগীর তৈরি ধুতি পরত। মেয়েরা বুকে কাঁচুলি, গায়ে গাছড়া বা থামি পরিধান করত। সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দু মেয়েরা শাড়ি পরত আর মুসলমান মেয়েরা চুড়িদার ইজার, লম্বা কোর্তা ও কাচাই এবং মাথায় ওড়না পরত। অবশ্য শাড়িরও প্রচলন ছিল। সাধারণ ঘরের গ্রামের মেয়েরা চরকা কাটা সূতায় তৈরি গামছা, বুকে কাঁচুলি, গায়ে গামছা বা থামি পরিধান করত।

বাঙালি মেয়েদের অলংকারের মধ্যে ছিল হাতের দশ আংগুলে দশ আংটি, পায়ের দশ আংগুলে ঘুন্টি দেওয়া দশটি আংটা; মাথায় টিকলি বা মাথায় সিঁথিপাট ও কেচুয়া, গলায় হাঁসুলি, দোলরি, তেলরি হার, মাদুলি ও টাকার ছড়া; নাকে নথ; নাকফুল, নাকচাবি ও বোলাক। কানে কানফুল, ঝুমকা ও রোলি; হাতে বাজুবন্ধ, তাড়, বাহু, পৈঁচি, গাঁটিয়া, তাগা, তোড়ল ও খাঁড়ু; কোমরে চন্দ্রহার, সূর্যহার ও পিগলি পাত; পায়ে পাজর, নূপুর, মল, গোল, খুঁড় ও হাড়বেকি ইত্যাদি। তাছাড়া গলায় নানা রকমের পুতির মালা ও পুতির ছড়া ইত্যাদিও ব্যবহার করতো। রাখাইন নারীরা বয়স অনুপাতে বিভিন্ন প্রকারের হাতে বালা (লাৎ কউ), আঙ্গুলে আংটি, গলায় নানা প্রকারের ডিজাউন ও আকৃতির চেইন ব্যবহার করে। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা পায়ে সোনার নূপুর (খ্রা সাং) পরিধান করে।

প্রাচীনকালে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পুরুষেরা ধুতি পরতো। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে কেউ আর ধুতি পরে না। কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ধুতির ব্যবহার আছে। তবে বর্তমানে তাও কালেভদ্রে চোখে পড়ে। কোনো আচার-অনুষ্ঠানে ও বিভিন্ন পার্বণে, পূজায় ধুতি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া নিম্নশ্রেণির বিশেষ করে খুবই দরিদ্র জেলরা এখনও কম দামের ধুতি সবসময়ই ব্যবহার করে থাকে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের পুরুষেরা ঈদ ও অন্যান্য উৎসবসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাজামা-পাঞ্জাবি ব্যবহার করেন। মেয়েরা সাধারণত শাড়িই পরেন। নিত্য ব্যবহার্য পরিধেয় হিসেবে ম্যাক্সির প্রচলন রয়েছে।

সর্বস্তরের পুরুষেরা সাধারণত লুঙ্গিই পরেন। গামছার ব্যবহার যে-কোনো স্থানে চোখে পড়ে। বর্তমানে শহরে এবং গ্রামে সর্বত্র গামছার পাশাপাশি তোয়ালের ব্যবহারও বেড়ে গেছে।

পূর্বে বয়স্ক লোকজন শার্ট বা পাঞ্জাবির ভেতরে হাতাওয়ালা পাতলা গেঞ্জি পরিধান করতেন। তরুণ ও যুবকেরা হাতাকাটা বা স্যান্ডো গেঞ্জি ব্যবহার করতো। গেঞ্জির ব্যবহার এখনো অবিকল রয়ে গেছে। তবে বর্তমানে শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, যুবক নির্বিশেষে সবাই হাতাওয়ালা গেঞ্জি বা টি-শার্ট ব্যবহার করে। অনেকেই রাতে শোবার সময় হাতাওয়ালা গেঞ্জি ব্যবহার করেন।

www.pathagar.com

বর্তমানে সারা দেশের মতো কক্সবাজার জেলার সর্বত্র গ্রাম, গঞ্জ ও শহরে পুরুষের পোশাক হচ্ছে– লুঙ্গি, ধুতি, গেঞ্জি, শার্ট, প্যান্ট, পাজামা, পাঞ্জাবি, কোট, স্যুট, শেরোয়ানি, সাফারি, ফতুয়া, সুয়েটার, জাম্পার, জ্যাকেট, মাফলার, গামছা, জাইঙ্গা বা আন্ডারওয়্যার, মোজা, রকমারি টুপি, চাদর বা শাল। সাথে মিলিয়ে জুতা, মোজা, সেন্ডেল ব্যবহার করা হয়। আর মেয়েদের পোশাক হচ্ছে– শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া বা পেটিকোট, সালোয়ার, কামিজ, ওড়না, বোরকা, চাদর, ম্যাক্সি ইত্যাদি। এছাড়াও জেলার প্রতিটি কাপড়ের দোকানগুলোতে বিক্রি হয় দেশি-বিদেশি নানারকমের সুতায় তৈরি রকমারি শাড়ি। দেশে তৈরি শাড়ির পাশাপাশি বিদেশি শাড়ির বিপুল মজুত থাকে। এসব বিদেশি শাড়ির মধ্যে ভারতীয় শাড়ির মওজুত উল্লেখযোগ্য পরিমাণের বেশি। এসব শাড়ি কালোবাজারিদের মাধ্যমে চোরাইপথে স্থানীয় বাজারে চলে আসে। এসব শাড়ির মধ্যে জামদানি, কাতান, বেনারসি, তসর, গরদ, জর্জেট, সিল্ক শাড়ি, টিস্যু শাড়ি। এসব ছাড়াও পাকিস্তানের বাজার থেকে আসে মেয়েদের জন্য রকমারি ঘাগরা। ছেলেদের জন্য আসে কাবুলি ড্রেস।

এদিকে সীমান্তবর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের মহিলাদের আদলে এখনও কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের প্রবীণ মহিলারা দুপাট্টা ব্যবহার করে। দুপাট্টার মধ্যে থামি, ভেদাই পরিধান করে। তারা একই সাথে গায়ের দেয়ার স্কার্ফ নিয়ে মাথায় পাগড়ি পরিধান করে। প্রয়োজন হলে উক্ত পাগড়ি খুলে শরীরের উর্ধ্বাংশে পরিধান করে। তবে বর্তমানে মুসলিম তরুণীরা এসব দুপাট্টা ব্যবহার করে না।

## তথ্যনির্দেশ


১. দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮) (কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর ভ্রমণ)- ভেন্সাম ভান সেন্দেল সম্পাদিত, অনুবাদ : সালাহউদ্দিন আউয়ুব, প্রকাশক : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, রুম ১১০৭, কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৬৮।

২. দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮) (কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর ভ্রমণ)- ভেন্সাম ভান সেন্দেল সম্পাদিত, অনুবাদ : সালাহউদ্দিন আউয়ুব, প্রকাশক : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, রুম ১১০৭, কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৯০।

৩. কক্সবাজারের ইতিহাস- সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক : কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ-৩০ জুন, ১৯৯০। পৃষ্ঠা-৬৪।

৪. কক্সবাজারের ইতিহাস- সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক : কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ-৩০ জুন, ১৯৯০। পৃষ্ঠা-১৪-১৫।

৫. কক্সবাজারের ইতিহাস- সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক : কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ-৩০ জুন, ১৯৯০। পৃষ্ঠা-১৯।

৬. বাংলদেশে রাখাইন সম্প্রদায় : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা-মং বা অং (মং বা), লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ। পৃষ্ঠা-১১২।


www.pathagar.com

# লোকস্থাপত্য

অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান মানুষের মৌলিক অধিকার। মৌলিক অধিকারের প্রথম তিনটি বিষয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাসস্থান। একটি শিশু জন্ম গ্রহণের পরেই রাষ্ট্রের উপর মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র মানুষের মৌলিক অধিকার পূর্ণ করতেও পারে, নাও পারে। তবে মানুষের সার্বজনীন অধিকারের আওতায় রাষ্ট্র মানুষের এই অধিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য। বাংলাদেশের সংবিধানসহ পৃথিবীর যে-কোনো রাষ্ট্রের সংবিধানে মানুষকে সেই অধিকার দেয়া আছে। কিন্তু কোনো রাষ্ট্র মানুষের সেই অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে তা রাষ্ট্রের ব্যর্থতা।

মানুষ পুরোদিন কাজ করার পরে স্বাভাবিকভাবেই কর্মক্লান্ত হয়ে পড়েন। ফলে প্রতিটি মানুষকে রাতের বেলায় ঘুমিয়ে দিনের কাজের ধকল সামলে উঠতে হয় এবং পরের দিনের কাজের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজিদে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন 'আমি দিন ও রাত সৃষ্টি করেছি। দিনের কর্মক্লান্তি দূর করার জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছি।' ঝড়-ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য, হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মানুষের আশ্রয়ের প্রয়োজন। দিনের কর্মক্লান্তি নিবারণের জন্য, ঝড়-ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, জঙ্গলের হিংস্র বন্যপ্রাণীর হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ বসতবাড়ি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আর এই প্রয়োজন থেকেই মানুষ বসতবাড়ি নির্মাণের কৌশল রপ্ত করে। পরে বসতবাড়িকে আরো নিরাপদ ও হিংস্র বন্যজন্তুর হামলা থেকে রক্ষার জন্য, আরো নিরাপদ থাকার জন্য মানুষ ক্রমেই নিজেকে সচেতন করে তুলে এবং বসতবাড়ি নির্মাণ কৌশল থেকে শুরু করে বাড়ির কাঠামো পরিবর্তন করতে থাকে। প্রাচীনকালে মানুষ ছিল গুহাবাসী। পাহাড়ের গুহার মধ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখে বন্য জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা চালাত। পরে মানুষ কৌশলী হয়ে গাছের উপরেই বসতবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকে। বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় এখনো কোনো কোনো সম্প্রদায়ের লোকজন মাচাং অথবা বনজঙ্গলে গাছের উপরে বসতবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করে। কক্সবাজারের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় এখনো গাছের উপর বাসা নির্মাণ করে রাত্রি যাপন করতে দেখা যায়। পাহাড়ি এলাকায় বা পাহাড়ের পাদদেশের শস্য পাহারা দেওয়ার জন্যই গাছের উপর বাসা তৈরির আবশ্যকতা দেখা দেয়। পাহাড়ি এলাকা বা পাহাড়ের পাদদেশে রোপিত শস্য জঙ্গল থেকে বন্য শুকর, বন্য হাতি নেমে খেয়ে সাবাড় করে কৃষকের সর্বনাশ করে। এজন্যই শস্য রক্ষার জন্য কৃষককে কৌশলের আশ্রয় হিসেবে পাহাড়ের ধারে গাছের উপর বাসা নির্মাণ করতে হচ্ছে, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

www.pathagar.com

মানুষ তাদের বসবাসের জন্য যে বসতবাড়ি নির্মাণ করতো তাই লোকজ স্থাপত্যের পরিচায়ক। রবিউল হুসাইন যথার্থই বলেছেন, "আমাদের দেশের লোকজ স্থাপত্য মূলত গ্রামের ঘরবাড়িতেই পরিদৃষ্ট, যার ভিতর দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের রুচি, ব্যবহারিক চাহিদা সব কিছুর প্রকাশ পায়। প্রকৃতির অফুরন্ত রূপ, অবারিত ভূপ্রকৃতি, বৃক্ষ, জল, মাটি, এসব মৌলিক নির্মাণ-উপকরণ গ্রামীণ স্থাপত্যে সাধারণত মূলগঠন সামগ্রিকরূপে দেখা যায়। তার সাথে আবহাওয়া, বৃষ্টি পড়ার কৌণিক পরিমাপ, সূর্যরশ্মির আলো-ছায়ার রূপ ও পতনশীল অনুযায়ী আবাসগৃহের নকশা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবহারকারীর চাহিদা ও সুখ যাতে কোনোরূপ অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।"[১]

কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ও পাহাড়ি এলাকায় বসতবাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে খড়ের ছাউনি, ছনের ছাউনি, গোলপাতার ছাউনি ও গাছের শাখা-প্রশাখা বা গাছের কাণ্ডের উপর নির্মিত ঘর ও মাটির দেয়ালের ঘর আর খড়ের গাদা বা স্থানীয়ভাবে কথিত 'কুইজ্যা' এ ক্ষেত্রে লোকজ স্থাপত্যের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

কক্সবাজার জেলায় বসতবাড়ি নির্মাণে কিছু বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে,

"'দক্ষিণ দরজা ঘরের রাজা
পূর্ব দরজা তার প্রজা
পশ্চিম দরজা মুখে ছাই
উত্তর দরজার টেক্‌স নাই।'

প্রাচীনকালে কক্সবাজার অঞ্চলে এই 'খনার বচন'কে অক্ষরে অক্ষরে মেনে বসতবাড়ি নির্মাণ করা হতো। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এসবকে আমলে নেয়া হয় না। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এই খনার বচন এখনো পুরোপুরি মেনেই বসতবাড়ি নির্মাণ করে থাকে বলে অনেকেই মনে করেন। এ ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন 'দক্ষিণ দরজা ঘরের রাজা' হলেও তারা এখনো দক্ষিণ দরজা ঘর তৈরি করেন না। হিন্দু সম্প্রদায়ের যতসব মন্দির আছে তা দক্ষিণ দিকে দরজার দিয়েই তৈরি। দক্ষিণ দিকে দরজা দিয়ে মন্দির তৈরি করে বলেই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন দক্ষিণ দিকে দরজা দিয়ে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন না। সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

প্রাচীন স্বাধীন আরাকানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কক্সবাজারের রয়েছে পৃথক বৈশিষ্ট্য। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাষা-ভাষী মানুষের পদচারণা যেমন দেখা যায় তেমনিভাবে এখানে রয়েছে বহু ভাষা ও রকমারি সংস্কৃতির সমাহার। এসব কারণে এখানকার সংস্কৃতি হয়েছে অনেক ঋদ্ধ। প্রাচীনকালে এখানে ছিল বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের বসবাস। শত শত বছর পূর্বে যদিও এখানে খ্রিষ্ট ধর্মের মানুষের আনাগোনা ছিল। সে কারণে অনেকেই মনে করেন এখানে খ্রিষ্ট ধর্মের লোকজনের বসবাস ছিল। কিন্তু বিগত শত বছর পূর্বেও খ্রিষ্ট ধর্মের লোকের বসবাস এখানে ছিল না। তাদের নিজস্ব স্টাইলে বসতবাড়ি নির্মাণের প্রশ্নই আসে না। সহস্র বছর আগে এখানে প্রকৃতিপূজারীদেরই বসবাস ছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এখানে খ্রিষ্ট ধর্মেরও প্রসার

www.pathagar.com

ঘটছে। বিশেষ করে ধর্মযাজকদের বদৌলতে বর্তমানে এখানে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার, প্রসার এবং জনগোষ্ঠির সংখ্যাধিক্য দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে বিগত শতকের ষাটের দশকে জেলার চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারা ইউনিয়নের ঘন জঙ্গলঘেরা মালুমঘাট নামক স্থানে 'খ্রীস্টান মেমোরিয়াল হাসাপাতাল নির্মাণের পরেই খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়।"[২]

১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে ফ্রান্সিস বুকানন নামের এক ইংরেজ ভদ্রলোক চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকা জরিপ করেন। তাঁকে মূলত কক্সবাজারের মাটির গুণগত অবস্থা পরীক্ষা করা, স্থানীয় খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা দেখার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কক্সবাজারের মাটিতে কোন কোন কৃষিপণ্য উৎপন্ন হতে পারে তা পরীক্ষা করেই বুকনান কোম্পানির কাছে রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন। ফ্রান্সিস বুকাননের লিখিত রিপোর্টটিই মূলত এঅঞ্চলের সর্বপ্রথম তৃণমূলের লিখিত ইতিহাস। ১৭৯৮ সালের ৯ এপ্রিল তিনি কক্সবাজারের ঈদগাঁও এলাকায় মুরুং সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের বর্ণনা প্রদান করেন। এখানে তার উল্লেখ করা হলো।

"বিকেলবেলা আমি রাখাইন গ্রাম দেখার জন্যে বেরুলাম, সেখানে ছয়জন মুরং (বাঙালিরা এদের মুরাং বলে) লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। এরা হলো সেসব লোক, যাদেরকে রাখাইনরা 'মুর' উচ্চারণ করে এবং বার্মীজরা ডাকে 'মেয়ো' বলে। নিজেদেরকে তারা বলে 'মু-রো-সা'। শরীর গঠন এবং উচ্চারণের দিক থেকে তারা পুরোপুরি রাখাইনদের মতো। তারা প্রায় উলঙ্গ, শ্লীলতা ঢাকার জন্যে সামান্য কাপড় জড়ায়। লম্বা চুলের ঝুঁটি বেঁধে রাখে মাথার সম্মুখ ভাগে, যে রকম বার্মিজদের অভ্যেস। তাদের কেউ কেউ রাখাইনদের মতো টুপি পরে, কেউ কেউ সবুজ চওড়া ফিতে দিয়ে চুল বাঁধে। তাদের কানে, নাকে, গলায় পিতলের অলংকার ঝুলে থাকে, কেউ কেউ গলায় পুঁতির মালা পরে, রুপোর অলংকারও পরে কেউ কেউ।"[৩]

"পূর্বে কক্সবাজার অঞ্চলে বসতবাড়ির নির্মাণ শৈলীতে আরাকানি প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। আরাকান অঞ্চলের বসতবাড়ির লক্ষণীয় দৃশ্য হচ্ছে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান নির্বিশেষে সবাই মাচাং বা দোতলা বাড়ি নির্মাণ করতো। বর্তমানেও আরাকানে সেই দৃশ্যই চোখে পড়ে। কাঠের মাচাংবাড়িগুলোর নিচের অংশ থাকে খোলামেলা। কিন্তু বর্তমানে তা বিলুপ্তপ্রায়। এমনকি স্বয়ং রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজনও তাদের ঐতিহ্যবাহী গঠনকাঠামোর বদলে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত ধারার বসতবাড়ি নির্মাণ করছে। তবে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধদের মধ্যে বসতবাড়ি নির্মাণে শতাব্দীকাল থেকে চলে আসা স্থানীয় আদলে বসতবাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। মুসলমানদের বসতবাড়ির মধ্যে চারচালা, দুচালা ঘর দেখা যায়। পাহাড়ি এবং উপকূলীয় এলাকায় মাটি দিয়ে বসতবাড়ি তৈরি করা একটি স্বাভাবিক নিয়ম ছিল। এসব বসতবাড়িকে স্থানীয়ভাবে 'মাইট্যা-গুদাম' বলে। গুদাম মূলত দ্রব্যসামগ্রী ও মালামাল নিরাপদে রাখার জন্য বিশেষ ধরনের কক্ষ। যাকে ইংরেজিতে গোডাউন (Godown) বলা হয়। তবে এই গুদামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উক্ত কক্ষে আলো বাতাস বেশি প্রবেশ করতে পারবে না যাতে মওজুদকৃত মালামাল নিরাপদে থাকে। মানুষের বসবাসের জন্য নির্মিত এসব মাইট্যাগুদামের বৈশিষ্ট্যও বলতে গেলে প্রায় একই রকমের।

www.pathagar.com

*পাহাড়ি এলাকায় বনৌ হাতি ও শকুরের আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য এভাবে টং তৈরি করা হয়*

এই মাটির ঘরের রয়েছে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর তা হচ্ছে শীতকালে এসব ঘরের ভেতরে থাকে গরম এবং গ্রীষ্মকালে থাকে শীতল পরশ। এসব মাটির ঘরের এই বিশেষ বৈশিষ্ট হওয়ারও যৌক্তিক কারণ রয়েছে, আর তা হচ্ছে বাড়ির দেয়াল তৈরি করা হয় কমপক্ষে ১৮ থেকে ২৪ ইঞ্চি চওড়া। ফলে এসব দেয়াল ভেদ করে সূর্যের তাপ ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। অনুরূপভাবে শীতকালে শীতও প্রবেশ করতে পারে না। তবে এসব বসতবাড়ির একটি খারাপ দিকও রয়েছে। আর তা হচ্ছে বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের আঘাত লাগলেই ঘরটি মাটির সাথে বিলীন হয়ে যায়। ফলে বর্তমানে পাহাড়ি এলাকায় মাটির তৈরি বসতবাড়ি বা মাইট্যা গুদাম দেখা গেলেও উপকূলীয় অঞ্চলে তা আর দেখা যায় না। বিশেষ করে বিগত ১৯৯১ সালের শতাব্দীর ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় এলাকার হাজার হাজার মাইট্যাগুদাম বা মাটির বসতবাড়ি পানির সাথে বিলীন হয়ে যাওয়ার পরে লোকজন মাটির বসতবাড়ি নির্মাণ বন্ধ করে দিয়েছে।

এ অঞ্চলের সমতলভূমিতে নির্মাণ করা হয় চারচালা বা দুচালা ঘর। চার/পাঁচ সন্তানের পরিবারের বসতবাড়ি মূলত স্বাভাবিক ৯ হাত বাই ১৪ হাত বা সাড়ে ১৩ ফুট পার্শ্বে ও লম্বায় ২১ ফুট করার একটি নির্দিষ্ট সাইজ ছিল। যাকে স্থানীয়ভাবে 'নয়-চৌদ্দ' ঘর বলা হয়। তবে এই ৯ বাই ১৪ হাতের ঘরের চারিপার্শ্বে থাকতো বারান্দা। এই কমন সাইজের ঘর ছাড়াও বিশেষ ডিজাইনের 'রেকের' ঘর তৈরি করা হতো। এসব ঘরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, আর তা হচ্ছে এই ঘরটি হবে দুচালার। বেশ লম্বা এবং দুপার্শ্বের চাল নিচের দিকে ঝুলানো যা ঘরকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করে। এসব

www.pathagar.com

ঘর দেখতে অনেকটা এস্কিমোদের ঘরের মতো। ঝড়-বাতাস বা কালবৈশাখির আঘাত এইসব ঘরের খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে না। এস্কিমোরা বরফপাত বা তুষারঝড় থেকে রক্ষা পেতে আমাদের দেশের রেকের ঘরের মতো ঘর নির্মাণ করতো। হতে পারে এখানকার আদিম জনগোষ্ঠী এক্সিমোদের আদলে নিজেদের বসতবাড়ি নির্মাণ করতো।

কক্সবাজার অঞ্চলে ঘরের বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন, সামনের অংশকে বলা হয় হাইচ, পচ্ছাতি। এরপর রয়েছে বারান্দা বা বাআন্ড়া বা বাআন্দা, হাতিনা, পিরা, মান্ডক, খাড়াইল, অলা বা অওল্যা। বারান্দা শব্দটি ইংরেজিতেও ব্যবহার করা হয়। বাড়ির সদস্যদের বয়সভেদে বসবাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কামরা বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে হাতিনায় ঘরের বয়োবৃদ্ধরাই থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ হাতিনা ঘরের বয়োবৃদ্ধদের জন্যই বরাদ্দ থাকবে। 'হাতিনা'র অবস্থান হচ্ছে ঘরের মধ্যখানে। যেখান থেকে ঘরের চতুর্পার্শ্বে নজর রাখা যায়। 'পিরা' ঘরের মেয়েদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। এছাড়াও ঘরের 'খাড়াইল' ঘরের ছেলে ও পুত্রবধুর জন্য বরাদ্দ থাকবে। 'পিরা' ও 'খাড়াইল'-এর অবস্থান হাতিনার সাথো লাগোয়া। 'খাড়াইল'-এর আকৃতি এমনভাবে তৈরি করা হয় যেখানে সহজে বাইর থেকে আলো বাতাস ঢুকতে না পারে। এমনকি দিনের বেলায়ও কুপি বা বাতি জ্বালাতে হয়। ঘরের বউ বা পুত্রবধূকে যাতে বাইর থেকে দেখতে না পারে।

একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ অঞ্চলে বসতবাড়ির নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। উক্ত আয়োজন বা অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'হুত্তুর' দেওয়া। এ অঞ্চলের বসতবাড়ি নির্মাণের উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে 'হুত্তুর দেয়া'। বিশেষ করে গুরুবার বা শুক্রবার জুমার নামাজের পরে এই 'হুত্তুর' দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা আরম্ভ করা হয়। বাড়ি নির্মাণের প্রস্তাবিত ভিটির অগ্নিকোণায় একটি খুঁটি পুঁতে বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করাকে 'হুত্তুর' দেয়া বলে। তবে তার জন্য রয়েছে আনুষ্ঠানিকতা। হুত্তুর দেয়ার আনুষ্ঠানিকতার বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো।

হুত্তুর : 'হুত্তুর' কক্সবাজারের আঞ্চলিক শব্দ। এর অর্থ শুভ সূচনা বা ভিত্তি স্থাপন। হুত্তুর লৌকিক আঁচার। এখানে রয়েছে বেশ দীর্ঘ আনুষ্ঠানিকতা। প্রাচীন সমাজে কোনো ব্যক্তি যদি বসবাসের জন্য একটি স্থায়ীভাবে বসতবাড়ি নির্মাণ করার পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে জায়গা নির্বাচন করে এবং তাতে গৃহ নির্মাণের পূর্বে যে লৌকিক কর্মটি সম্পাদন করতেন তাকে 'হুত্তুর' বা শুভ সুচনা বলা হতো। অর্থাৎ বাইরের লোকজন অনুমান করতে পারতো যে এখানে একটি নতুন ঘর তৈরি হচ্ছে।

একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এতদঅঞ্চলে বসতবাড়ির নির্মাণ কাজ শুরু করা হতো। উক্ত আয়োজন বা অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'হুত্তুর' দেওয়া। বিশেষ করে শুক্রবার জুমার নামাজের পরে এই 'হুত্তুর' দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা আরম্ভ করা হয়। বাড়ি নির্মাণের প্রস্তাবিত ভিটির অগ্নিকোণায় বাড়ির একটি খুঁটি পুঁতে বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করাকে 'হুত্তুর' দেওয়া বলে। খুঁটি পূঁতার পূর্বে রয়েছে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা। খুঁটি পূঁতার আগে উক্ত গর্তে একটি জীবন্ত পুঁটি মাছ, একটি তামার পয়সা, একটি পেরেক বা লোহার টুকরো ফেলে দিতে হয়। এছাড়াও এক আঁটি দুর্বাঘাস, আমপাতার ডাল যা নিয়ে আমছুরতি বা আমসরতি (আম্র পল্লব) করা হয়, একটি বা একজোড়া পাকা

www.pathagar.com

নারিকেল এবং একটি কলার ছড়া নিতে হয়। তামার পয়সা, পুঁটি মাছ, দুর্বাঘাসের আঁটি ও একটি পেরেক পূর্বে খনন করা গর্তে ফেলার পরে আল্লাহর নামে পশ্চিমমুখি হয়ে খুঁটিটি পুঁতে দেওয়া হয়। তবে খুঁটি পুঁতার পূর্বে বাঁশের একটি তীর-ধনুক খুঁটির সাথে মজবুত করে বেধে দেওয়া হয়। একই সাথে এক জোড়া পাকা নারিকেল খুঁটির সাথে উপরে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়। বয়োবৃদ্ধ লোকজনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, খুঁটির গর্তে পুঁটি মাছ ও পেরেক দেওয়া হয় যাতে ভবিষ্যতে উক্ত বাড়িতে বসবাস করার সময় জ্বিন-ভূত বা অপশক্তির অত্যাচার বা প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যায়। বাড়ি তৈরির আগে একটি মাছ জীবন্ত 'বলি' দেওয়া হয়। উক্ত বলি দেওয়াকে স্থানীয় ভাষায় 'ডালি' দেওয়া বলে। এভাবে 'বলি' দিতে হয় যাতে ভবিষ্যতে উক্ত বাড়িতে বসবাসকারীদের কোনো অদৃশ্য অপশক্তি জান বা প্রাণের ক্ষতি করতে না পারে। মূলত জানের বদলে জান 'বলি' দিয়ে ঘরে বসবাসকারীদের জান রক্ষার ব্যবস্থা করা হতো। একই কারণে পেরেক বা লোহার টুকরো দিয়ে অপশক্তিকে তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। ঘরের ধন-দৌলত বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেওয়া হয় তামার পয়সা। অপর দিকে উক্ত খুঁটির উপরের অংশে তীর-ধনুক বেঁধে রাখা হয় মূলত অদৃশ্য অপশক্তিকে ভয় দেখানোর জন্য। কবি জীবনান্দ দাশ পেঁচাকে 'লক্ষ্মী পেঁচা' বলে সম্বোধন করলেও গ্রাম বাংলায় এখনো পেঁচাকে অমঙ্গলের প্রতীক মনে করা হয়। নির্মাণাধীন ঘরে পেঁচা বসা মানে উক্ত ঘরে ভবিষ্যতে অমঙ্গল ভর করা। তাই হুত্তুর হিসেবে দেওয়া খুঁটিতে যেন পেঁচা বসতে না পারে সে উদ্দেশ্যে খুঁটির সাথে তীর-ধনুক বেধে দেওয়া হয়।

এই তীর-ধনুক নিয়ে নানা রকম লৌকিক বিতর্ক প্রচলিত রয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকের মতে উক্ত নতুন ঘরের খুঁটির উপরে তীর-ধনুকের ব্যবহার হিন্দু সম্প্রদায়ের ত্রিশূলের অনুকরণে করা হয়। এভাবে তীর-ধনুক হিন্দু সংস্কৃতি থেকে মুসলমানদের মধ্যে চলে এসেছে বলে অনেকের ধারণা। আবার কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমান মনে করেন তীর-ধনুক হচ্ছে মুসলমানদের বিলুপ্ত ঐতিহ্য। সেকালের ধর্মযুদ্ধে এই তীর-ধনুক এর ব্যবহার ছিল। আবার সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন যে, তাদের দেবতা কার্তিক এর প্রতীক হচ্ছে তীর ধনুক। সে কারণেই নতুন ঘর তৈরির সময় এই তীর ধনুক ব্যবহার করা হয়। যাই হোক, বাড়ি নির্মাণ শেষে ঘরের কাঠামোর উপরে বেঁধে রাখা নারিকেল, কলার ছড়া এবং পাঁচ কুলায় নেওয়া চাল দিয়ে ছিন্নি বা শিরনি বা ফিরনি বা পায়েস তৈরি করে জুম্মার দিন মসজিদে পাঠানো হয়। ছিন্নির অবশিষ্ট অংশ ঘর তৈরির কাজে নিয়োজিত 'ওঝা' বা কাঠ মিস্ত্রিসহ প্রতিবেশীদের মাঝে বিলি-বন্টন করা হয়। এখন মসজিদে ছিন্নি বা অন্যান্য কোনো কিছু পাঠানোর লোকজ বিধান বিলুপ্ত প্রায়। মসজিদে ফিরনি বা ছিন্নি বা খাবার প্রেরণের কোনো বিধান ইসলাম ধর্মে নেই। কিন্তু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের রয়েছে মন্দিরে ঠাকুরের কাছে খাবার প্রেরণের বিধান চালু আছে। জনমনে ধারণা জন্মেছে যে, মসজিদে ছিন্নি বা এ জাতীয় খাবার প্রেরণ করা হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরে প্রসাদ প্রেরণের অনুকরণ। এজন্য এসব লোকাচার আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গৃহ নির্মাণের রেওয়াজের মধ্যে ছিল নির্ধারিত স্থানটি প্রথমে পবিত্র করা। এ লক্ষ্যে তারা সেখানে ঢাক-ঢোল ও সানাই বাজিয়ে আনন্দনৃত্য করতো এবং নানা সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করে অভ্যাগতদের মধ্যে পরিবেশন করতো।

www.pathagar.com

তারপর নির্দিষ্ট স্থানে চিহ্ন হিসেবে খুঁটি গেঁড়ে দিতো। পরে সে স্থানে গৃহনির্মাণ সম্পন্ন করা হতো। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ ধরনের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এ আচারটিও বিলুপ্ত প্রায়।

নতুন ঘরে প্রবেশ : নতুন ঘরে প্রবেশ করার সময়ও 'পাঁচ কুলা' করা হয়। জেলার প্রতিটি সম্প্রদায়ের লোকজন বিশেষ করে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন 'পাঁচকুলা'র তৈরি-পদ্ধতি অবগত। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমান প্রজন্ম এই 'পাঁচকুলা' সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে এই পাঁচকুলা সংস্কৃতি মুসলমানসমাজে বলতে গেলে বিলুপ্তপ্রায়। নতুন বাড়িতে প্রবেশের জন্য পাঁচকুলাসহ অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান করার পরে মহল্লার ইমাম বা খোনকার সাহেবকে দিয়ে দোয়া-দরুদসহ মিলাদের ব্যবস্থা করা হয়। এরপরেই পাঁচকুলা নিয়ে নতুন ঘরে প্রবেশের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। পাঁচকুলা নিয়ে ঘরে প্রবেশের মধ্যে রয়েছে একটু বৈচিত্র্য। এক্ষেত্রে তিনজন মানুষ একসাথে ঘরে প্রবেশ করে। তিনজনের মধ্যে একজন মাথায় পাঁচকুলা নেবে, দ্বিতীয় জন নেবে মৌলভী সাহেবের ফুঁ দেওয়া পানিভর্তি একটি কলসি এবং তৃতীয়জন নেবে ধানভর্তি একটি লাই (ধান নেওয়ার পাত্র)। পাঁচকুলার উপরে একটি জ্বলন্ত কুপি বা মোমবাতি বা জ্বলন্ত মশাল নিতে হয়। তিনজন একসাথে ঘরে প্রবেশ করে কলসি থেকে ঘরের ভেতরে চতুর্দিকে পানি ছিটাতে হয়। অনেক সময় আম সরতি বা আম্রপল্লব দিয়ে ঘরের ঘরের চতুর্দিকে পানি ছিটনো হয়। নতুন ঘরে প্রবেশের আনুষ্ঠানিকতার প্রথম পর্ব এখানে শেষ। পরে পাঁচকুলায় ব্যবহৃত চাল, হুত্তুর-এর সময় উপরে টাঙিয়ে রাখা কলার ছড়া, নারিকেল দিয়ে ছিন্নি করে পরের শুক্রবারে মসজিদে পাঠাতে হয় মুসল্লিদের জন্য। একই সাথে ঘর নির্মাণের 'ওঝা' বা কাঠ মিস্ত্রিসহ ঘর নির্মাণের কাজে জড়িত শ্রমিকদের খাওয়ানো হয়। দৌলতের প্রতীক হিসেবে নতুন ঘরে ধান ভর্তি লাই নেয়া হয়।

ঘর বন্ করা : নতুন ঘরে প্রবেশের সময় ঘর বন্ বা বন্ধ করা আবশ্যক। ঘর বন্ করার অর্থ ঘর তালা দিয়ে বন্ধ করা নয়। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, দোয়া-দরুদ পড়ে নতুন ঘরকে অশুভ শক্তির দৃষ্টি থেকে মুক্ত রাখা। বলা যেতে পারে যাতে অশুভ শক্তির দৃষ্টি ঘরের উপর না পড়ে সে জন্যই এই ব্যবস্থা। ঘর বন্ধ করার জন্যও রয়েছে একটি আচার-অনুষ্ঠান। নতুন ঘরে প্রবেশের সময় পাঁচকুলা ছাড়াও মৌলভী সাহেব ডেকে কুরআনখানি ও দোয়া-দরুদ করাতে হয়। বাজার থেকে পূর্বেই চারটি বরুনা বা মাটির তৈরি ঢাকনা কিনে আনতে হয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মাটির তৈরি বরুনার বদলে এলুমিনিয়ামের ঢাকনা ব্যবহার করা হয়। কুরআনখানির পরে উক্ত বরুনাগুলোর বুকের অংশে আরবিতে বিভিন্ন দোয়া লিখে তা ঘরের চার কোণায় খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হয়। চার কোণায় বরুনা বেঁধে দেয়ার সময় প্রতিটি কোণায় দাঁড়িয়ে আজান দিতে হয়। প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস মতে, আজান দিয়ে অশুভ অপশক্তিকে ঘরের চৌহদ্দি থেকে বিতাড়ন করা হয়। মৌলভী সাহেব একই সাথে কয়েকটি পেরেক নিয়ে তাতেও দোয়া-দরুদ পড়ে ফুঁ দিয়ে তা ঘরের বিভিন্ন অংশে সেঁটে বা গেঁথে দেবেন। কুরআনখানি শেষে পট বা গ্লাসের পানিতে ফুঁ দিয়ে তা একটি ভরা কলসিতে মিশিয়ে ঘরের বিভিন্ন স্থানে ছিটিয়ে দিতে হয়। কুরআনখানি করা, ঘরের কোণায় বরুনা বাঁধা, পেরেক গেঁথে

www.pathagar.com

দেয়া এবং ঘরের ভেভরে ফুঁ দেয়া পানি ছিটানোর মাধ্যমে ঘর বন্ধ করার কাজ শেষ হয়। ঘর বন্ধ করতে হয় নতুন ঘরে যাতে কোনো অশুভ অপশক্তি অবস্থান নিতে না পারে, ঘরের ভেতরে থাকলেও পবিত্র কুরআন মজিদের গুণে এবং বিভিন্ন আচারের কারণে যেন পালিয়ে যায়।

নতুন ঘরে প্রবেশ, ঘর বন্ধ করা এবং হুত্তুর দেয়ার প্রাচীন সংস্কৃতি বলতে গেলে প্রায় বিলুপ্ত। তবে নতুন ঘরে প্রবেশ করার সময় কুরআনখানির মাধ্যমে প্রবেশ করার বিধানটি মাত্র চালু আছে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মতো হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও বাড়ি নির্মাণের রীতিনীতি একই, তবে তারা ব্রাক্ষণ বা হিন্দু পুরোহিত দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র ও দিনক্ষণ দেখে ঘরের হুত্তুর দেবে এবং অনুরূপ ভাবে নতুন ঘরে প্রবেশ করবে। নতুন ঘরে প্রবেশ করে একইভাবে নারিকেল, কলারছড়া নিয়ে ছিন্নি বা শিরনি বা পায়েস করবে এবং সামর্থ অনুযায়ী ছাগল জবাই দিয়ে আত্মীয়স্বজনসহ প্রতিবেশীদের ভোজের ব্যবস্থা করবে। হিন্দু সম্প্রদায় এবং বড়ুয়া বৌদ্ধরা নতুন ঘরে প্রবেশের সময় বাড়ির জন্য নতুন তৈজসপত্র ক্রয় করে ঘরে প্রবেশ করে।"[৪]

## মাটির ঘর বা মাইট্যা গুদাম

কক্সবাজার জেলার পাহাড়ি এলাকা বিশেষ করে কক্সবাজারের সদর উপজেলার কিছু কিছু এলাকায়, মহেশখালি, রামু, উখিয়া, চকরিয়া উপজেলার কিছু কিছু এলাকায়, পেকুয়া উপজেলার কিছু এলাকায়, টেকনাফ উপজেলার কিছু পাহাড়ি এলাকায় লোকজন সনাতনী আমলের মাটির ঘর নির্মাণ করে বসবাস করেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মাটির ঘরে বসবাস করার মধ্যে রয়েছে বিশেষ সুবিধা। পাহাড়ি এলাকা মাটির ঘর নির্মাণের জন্য আদর্শ। তাছাড়াও পাহাড়ি এলাকায় মাটির ঘর করার জন্য মাটি কিনতে হয় না, হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় মাটি। পরিবারের সদস্য বিশেষ করে নারী-পুরুষ মিলেমিশে মাটির নির্মাণ করা যায়। আবার দিনমজুর দিয়েও মাটির ঘর নির্মাণ করা যায়। পাহাড়ি এঁটেল মাটি ও কাকরমিশ্রিত লালচে মাটি মাটির ঘর তৈরির জন্য উপযোগী। যে মাটি দিয়ে ঘর নির্মিত হবে প্রথমে উক্ত মাটি সংগ্রহ করতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে মাটি মওজুত করে তার সাথে পানি মিশিয়ে মাটিকে ভালোভাবে মাখাতে হবে। মাটিকে মাখিয়ে 'দলা' করাকে স্থানীয়ভাবে 'জাবা' বলে। এরপরে নির্দিষ্ট স্থানে ঘরের নির্মাণকাজ শুরু করতে হয়। প্রথমে পাকা দেয়াল নির্মাণ করতে যে-রকম পরিখা বা গর্ত বা স্থানীয়ভাবে 'নিয়ার' খনন করে পূর্বেই তৈরিকৃত মাটির জাবা দিয়ে ভিত্তি গড়ে তুলতে হয়। ভিত গড়ে তোলার পরে দুএকদিন অপেক্ষা করতে হয় যাতে ভিত্তি শুকিয়ে শক্ত হয়। ভিত্তি শুকিয়ে শক্ত হলে পরে নির্মাণকাজ শুরু করে অন্যূন দুই থেকে তিনফুট পর্যন্ত দেয়াল তুলতে হবে। মাটির জাবার উপর জাবা দিয়েই দেয়াল নির্মাণ করতে হয়। এরপরে আবার শুকাবার জন্য দুই বা তিনদিন অপক্ষো করতে হবে। শুকানোর পরে আবার মাটির জাবা দিয়ে ঘরের ছাউনি পর্যন্ত অর্থাৎ অন্যূন ছয় ফুট বা সাত ফুট পর্যন্ত দেয়াল তুলে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে।

www.pathagar.com

কক্সবাজারের খড়ের ঘর

www.pathagar.com
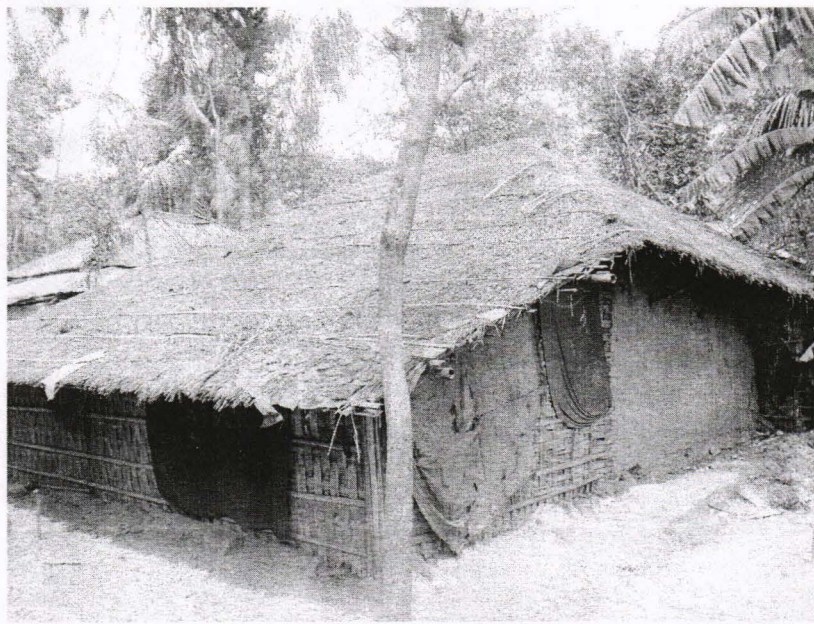
উপড়ে মাটির ঘর ও নিচে বাঁশের ঘর

www.pathagar.com

নির্মিত দেয়াল শুকিয়ে গেলে কাঠ দিয়ে ঘরের ছাউনির ফ্রেম তৈরি করে ছাউনি লাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্বে লোকজন ছাউনি হিসেবে খড় বা স্থানীয়ভাবে কথিত 'নাড়া' ব্যবহার করতো। কিন্তু নাড়ার ছাউনি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ফলে লোকজন একটু ব্যয়বহুল হলেও ছাউনি হিসেবে 'ছন' ব্যবহার শুরু করে। নাড়ার চেয়ে 'ছন' অনেকটা স্থায়ী। ছন ব্যবহারের পরে পাশাপাশি লোকজন গোলপাতা ব্যবহার শুরু করলো। গোলপাতাকে স্থানীয়ভাবে 'উমপাতা' বলা হয়। আর উমপাতার গাছকে উমপাতা গাছ বলে। নাড়ার ছাউনি, ছনের ছাউনি, গোলপাতার ছাউনির ঘর খুবই ঠাণ্ডা ও আরামপ্রদ হয় বিধায় মানুষ একটির বিকল্প আরেকটি ব্যবহার করতো। কিন্তু নাড়া বা খড়, ছন অথবা গোলাপাতা কয়েক বছর পর ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে ঘরের ছাউনি লাগাতে হয় বিধায় স্বচ্ছল মানুষ ছাউনির স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে টিন ব্যবহার শুরু। এভাবে নাড়া, ছন ও গোলপাতার ব্যবহার ক্রমেই বিলুপ্ত হচ্ছে। তবে বাজারে গোলপাতার চাহিদা থাকলেও সরবরাহ কম থাকায় ইচ্ছে থাকা সত্তেও তা ব্যবহার করতে পারছে না। পূর্বে কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় গোলপাতা সহজলভ্য ছিল। পাশাপাশি রাঙ্গাবালি থেকে ঘরের ছাউনি হিসেবে ব্যবহারের জন্য গোলপাতার সরবরাহ ছিল। বর্তমানে প্রতিবেশী মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশ থেকে নাফ নদী হয়ে জেলার টেকনাফে গোলপাতা আসছে। এদিকে এখনো জেলার বিভিন্ন স্থানে অস্বচ্ছল লোকজন নাড়ার বা খড়ের ছাউনি ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে। তবে খড়ের ছাউনির একটি খারাপ দিক হচ্ছে বর্ষা মওসুমে বৃষ্টির পানিতে খড় পচে ঘরের ছাউনিতে কেঁচো জন্ম হয়। আর এসব কেঁচো ছাউনি ভেদ করে ঘরের ভেতরে মেঝেতে পড়ে। অনেকেই বিষয়টি সহজ ভাবে নিতে পারে না। অপরদিকে খড় ও ছনের ছাউনি আগুনের জন্য অত্যন্ত স্পর্শ কাতর। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে গ্রামের কোনো বাড়িতে আগুন লাগলে প্রতিবেশীর বাড়ি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। খড়ের বা ছনের বা গোলপাতার ছাউনি পরিবর্তনের এটিও একটি অন্যতম কারণ। মাটির ঘরের চারপাশে প্রয়োজন মতো দরজা, জানালা লাগানো হয়। ২০ হাত বা ৩০ ফুট লম্বা ও ৯ হাত বা ১৪ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটি মাটির ঘরের শুধু দেয়াল তুলতে শ্রমিককে মজুরি হিসেবে দিতে হয় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। ঘরের কাঠমো ও দেয়াল যদি আরো বড় হয় তাহলে মজুরি আরো বেশি হবে।

অনেকেই মাটির ঘর দুতলা বিশিষ্ট করেও নির্মাণ করে। তখন প্রথমতলা তথা গ্রাউন্ডফ্লোরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার পরে কাঠের বিম ব্যবহার ও তক্তার মাধ্যমে দ্বিতীয় তলার ফ্লোর নির্মাণ করা হয়। পরে দ্বিতীয় তলা নির্মাণ করা হয়।"[৫]

কক্সবাজার জেলায় মাটির ঘর নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে লোকছড়া। যেমন-

মাইট্যাগুদাম টইনর ছানি
ঝরঝরাইয়া পরের পানি
আঁই ভিজিলে যেন তেন
তুঁই ভিজিলে পরান মানে না॥"[৬]

একথা সঠিক যে, বর্তমানে কক্সবাজার অঞ্চলের বসতবাড়ির নির্মাণকাঠামো দেশের যে কোনো অঞ্চলে দেখা যায়। তবে বাড়ি নির্মাণের কলাকৌশল বা গঠনকাঠামো ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায়ের বসতবাড়ি

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। রাখাইনদের বসতবাড়ি দোতলা করে নির্মাণ করা হয়। তাদের বসতবাড়ি কাঠের নক্সা করে দৃষ্টিনন্দন, মনোরম ও আকর্ষণীয়ভাবে তৈরি করা হয়। এসব বাড়ির নিচের তলায় বা গ্রাউন্ড ফ্লোরে বসানো হয় কাপড় তৈরির বুননসামগ্রী বা সুতা কাটার মাকু বা তাঁত। কারো কারো মতে এসব বাড়ি মাটি থেকে উপরে তৈরি করা হতো মূলত যাতে কোনো বন্যপ্রাণী তাঁদেরকে সহজে আক্রমণ করতে না পারে। এছাড়াও বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসে যাতে বসতবাড়ি প্লাবিত না হয় সে জন্যই এই ব্যবস্থা। যে কারণেই হোক না কেন রাখাইনদের বসতবাড়ির নির্মাণ অবকাঠামো অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন। ফলে সহজেই রাখাইনদের বসতবাড়ি নজর কাড়ে। রাখাইন সম্প্রদায় যেহেতু মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। চীন থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি দেশে বাড়ির নির্মাণকাঠামো একই ধরনের। যেহেতু রাখাইন সম্প্রদায় একই গোত্রভুক্ত সেজন্য তাদের বাড়ি নির্মাণশৈলিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাড়ির নির্মাণশৈলির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যেও বসতবাড়ি নির্মাণে আধুনিকতা নির্ভর হয়ে গেছে। প্রাচীন দৃষ্টিদন্দন বসতবাড়ি নির্মাণ ক্রমে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

রাখাইনদের ঐতিহ্যগত দ্বিতল বিশিষ্ট ঘরের সিঁড়ি ঘরকে 'খুই কা ধাৎ' Kheww Ka Dhat' বলা হয়। বার্মিজ শব্দ 'খুই' অর্থ কুকুর। উক্ত ঘরটি পালিত কুকুর থাকার স্থান হিসেবেও এটি পরিচিত। প্রথম কক্ষকে ড্রইং রুম 'ছাং ওয়াং/ San Wan', দ্বিতীয় কক্ষকে 'প্র থাং/ Praw Thang', তৃতীয়-চতুর্থ কক্ষকে 'আ থেঃ/ Aha Thaey' বলে থাকে। এছাড়া ঘরের উঠানকে 'মংজালাং/ Maaung Za Lan', বারান্দাকে 'ক্রং ব্রাং/ Nyaung Bran,' রান্না ঘরকে 'থামাং সাৎ খেং/ Tha Mang Shat As Khen', ঘরের পেছনের কক্ষকে 'নাউ প্রে/Now Pray,' কলসী রাখার স্থানকে 'রেজাং/ Ray Jan,' গোসলখানাকে 'রিসো খেং/ Riso Kheng', ও শৌচাগারকে 'ইংছা বা রেআইং বা ফংছা/ Eng Tha/Ray Aing/ Phaung Tha,' নামে অবহিত করে থাকে। অনেক এলাকায় সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনদের মূল্যবান শীলকড়ই কাঠ নির্মিত বড় বড় বসতবাড়িও রয়েছে। মান্ধাতার আমলে প্রণীত এ ধরনের ঘরে বর্তমানে অবস্থান করা সত্যি বিব্রতকর। তাই আধুনিক রাখাইনগণ যুগোপযোগী বসতবড়ি নির্মাণ করছেন।

প্রত্যেক রাখাইনবাড়িতে বুদ্ধের মূর্তি কিংবা বুদ্ধের প্রতিকৃতি সংরক্ষণ করা হয় এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত বাড়িতে আলাদাভাবে ঘর/স্থান বা কক্ষ নির্মাণ করা হয়। সাধারণ ঘরে ২য় কক্ষে অর্থাৎ 'প্রে থাং' বুদ্ধের মূর্তি রাখা হয়। বুদ্ধের প্রতিকৃতি বা বুদ্ধের মূর্তি রাখার স্থানকে রাখাইনরা 'ফারাচাং/ Fa Ra Chand' বলে। বুদ্ধের প্রতিকৃতি স্থাপনে কোনো ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োজন পড়ে না। তবে বুদ্ধের মূর্তি স্থাপনের জন্য ভিক্ষুসংঘকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিপালন করা হয়। তথায় প্রত্যুষে জল ও পুষ্প পূজা, সকালে আহার পূজা ও সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা করা হয়। বাড়িতে প্রস্তুতকৃত নিত্য নৈমিত্তিক আহারের কিছু অংশ সর্বপ্রথম বুদ্ধের নিকট উৎসর্গ করতে হয়। বিয়ে শাদীসহ অন্য যে কোনো মাঙ্গলিক কাজের জন্যও বাড়িতে প্রতিস্থাপিত বুদ্ধমূর্তি বা প্রতিকৃতিকে প্রণাম করা হয়। এছাড়াও দূরে কোথাও

www.pathagar.com

গেলে কিংবা কোনো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে গেলে এখানে পূজা ও প্রার্থনা করতে হয়।"[৭]

**কক্সবাজারের খড়ের ঘর**

খড়ের ঘর নির্মাণের সময় অগ্রহায়ণ থেকে বোশেখ মাস। খড়ের ঘর তৈরির উপকরণ হচ্ছে– খড় যাকে স্থানীয়ভাবে নারা বা নাড়া বলা হয়, বাঁশ, বাঁশের খাপ বা কাইম, কাঠের খুঁটি, বাঁশের বেত, প্রয়োজনে সুতলি।

**নির্মাণ প্রক্রিয়া**

নাড়া বা খড়ের ঘর তৈরির আগে বাজার থেকে বা পাহাড় থেকে কাঠের খুঁটি সংগ্রহ করতে হয়। কাঠের অভাব হলে শিবা বাঁশ বা বরাক বাঁশ সংগ্রহ করতে হয়। কাঠের খুঁটি বা বাঁশ সংগ্রহ করার পরে খুঁটির উপরের অংশে গালা কেটে নিতে হবে যাতে পাইর বা পাতালি করে আরো একটি ছোট লাঠি বা বাঁশ দিয়ে ফ্রেম তৈরি করা যায়। ঘরের মাপমতো খুঁটি পুঁতার পরে উপরের কাটা গালার মধ্যে ছোট লাঠি তথা পাইর দিয়ে বেত দিয়ে শক্ত করে আটকিয়ে নিতে হয়। এর মাধ্যমে ঘরের ফ্রেম তৈরি হয়। তবে ঘরের মাঝখানের লম্বা খুঁটি পুঁতে উপরে পাইর দিয়ে আটকাতে হয়। ঘরের মাঝখানে যে খুঁটি পুঁতা হয় তাকে স্থানীয়ভাবে তুইল্যার ঠুনি বলা হয়। তুইল্যার ঠুনিও নিচের পাইরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য উপরে-নিচে বাঁশ বা কাঠ দিয়ে পাশাপাশি বেঁধে আটকাতে হবে। উপরের ও নিচের পাইরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য যে কাঠ বা বাঁশ লাগানো হয় তাকে স্থানীয়ভাবে 'রোয়া' বলা হয়। চালের মধ্যে রোয়াগুলো ছয় ইঞ্চি দূরত্বে বাঁধতে হয়। আর নিচের পাইরের সাথে সঙ্গতি রেখেই তুইল্যার ঠুনি পুঁততে হয় যাতে বৃষ্টির পানি দ্রুত গড়িয়ে নেমে যেতে পারে। ঘরের এধরনের চালকে বলা হয় 'খর চাল', আর যে চাল থেকে বৃষ্টির পানি দ্রুত গড়িয়ে নামতে না পারে তাকে স্থানীয়ভাবে 'মাড়াচাল' বলা হয়। চালে রোয়া বাঁধার পূর্বে তৈরি করে রাখতে হয় বাঁশের কাইমের চাটাই। বাঁশ কেটে পাতলা কাইম তৈরি করে চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি ছিদ্র রেখে চাটাই তৈরি করতে হয়। চাটাই তৈরির পরেই তা চালের রোয়ার উপরে প্রতিস্থাপন করে মজবুত করে বাঁধতে হবে। কাঠের বা বাঁশের ঘর তৈরির কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে স্থানীয়ভাবে 'ওঝা' বলা হয়। ঘরের চালে খড় লাগাবার সময় একজন ওঝা চালের উপরে থাকে আর তার জোয়াইল্যা (স্থানীয়ভাবে মিস্ত্রি বা ওঝার সহকারিকে জোয়াইল্যা বলা হয়) থাকে নিচে। সহকারী নিচ থেকে ওঝাকে খড়ের আঁটিগুলো তুলে দেয়। চালের উপরে বসেই ওঝা খুড়ের আঁটিগুলো খুলে সমানভাবে বিলিয়ে খড়ের উপরে আরেকটি চওড়া কাইম দিয়ে আটকিয়ে রাখে। চালের উপর নাড়া বাঁধার জন্য পূর্বেই বাঁশের বেতি তৈরি করে রাখতে হবে। ঘরের চালায় খড় বাঁধার জন্য যে বেতি তৈরি রাখতে হয় তাকে স্থানীয়ভাবে 'বেত ফিরে রাখা' বলা হয়। বেতগুলো বাঁশের তৈরি বলেই ওঝা চালের উপরে বসেই জোয়াইল্যার সাহায্য ছাড়া চালার ফাঁক তথা ছিদ্র দিয়ে খড়গুলো ভালোভাবে আটকাতে পারে। এভাবে দুচালা বা চার চালার খড় আটকাবার কাজ শেষ হলে পরে তুলি ধরতে হয়। লম্বা খড় বা জুনা (আস্ত ধানের

www.pathagar.com

গাছকে জুনা বলা হয়। স্থানীয় লোকজন ঘরের তুলি ধরার জন্য বা আমান ধান কাটার পরে ধানের আঁটি বাঁধার কাজে জুনা আবশ্যক। তবে ধানের আঁটি বাঁধার জন্যে আস্ত ধানের নাড়াকে পাকিয়ে রশি তৈরিকেও জুনা বলা হয়) দিয়েই ঘরের তুলি ধরা হয়। ঘরের তুলি ধরার পরে ছাউনিকে আরো মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য খড়ের উপরে আরো একটি কাইমের চাটাল উপরে দিয়ে মজবুত করে আটকানো হয়। এর মাধ্যমে ঘরের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। খড়ের ঘর ছাড়াও ছন বা গোলপাতার ছাউনি দিয়েও চালার উপরেই কাইমের চাটাল দিয়ে মজবুত করে আটকানো হয় যাতে ছাউনি দীর্ঘস্থায়ী হয়। ছাউনির উপরে অতিরিক্ত চাটাল দেয়া হয় মূলত কালবৈশাখি, ঘূর্ণিঝড় বা টর্নেডোতে ঘরের ছাউনি উল্টাতে না পারে। নাড়ার বা খড়ের ঘরে বেড়া হিসেবে বাঁশের তর্যা দেয়া হয়। বাঁশের তর্যা দিয়ে বানানো বেড়ার মধ্যেও রয়েছে কয়েক প্রকারের বেড়া। এক গাইচ্ছা বেড়া, দুই গাইচ্ছা বেড়া, দনা বেড়া।"[৮]

কক্সবাজার অঞ্চলে যেমন ধানের নাড়া বা খড় ঘরের ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করে তেমনি ছন, গোলপাতা ব্যবহার করে। পাশাপাশি পাহাড়ি বিভিন্ন গাছের পাতাও ঘরের ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তৎমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, কুরূপপাতা। আবার মুচপাতাও বলে উক্ত কুরূপপাতাকে। শুধু কি ককুরূপপাতা? লাটিম গাছের পাতা, সেগুন গাছের পাতা, গর্জন গাছের পাতা, নারিকেলপাতাসহ পাহাড়ি বিভিন্ন গাছের বড় বড় পাতা ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করা হতো। নিঃস্ব ও দারিদ্র্য পিড়িত লোকজন এখনো ঘরের ছাউনি হিসেবে এসব গাছের পাতা ব্যবহার করে।

### খড়ের গাদা বা কুইজ্যা

জেলার প্রতিটি গ্রামের প্রায় বাড়িতেই কুইজ্যা বা খড়ের গাদা বা খড়ের পিরামিড রয়েছে। গেরস্থ ঘরে মাত্রই কুইজ্যা আছে। বিশেষ করে যেসব বাড়িতে চাষ আছে, আছে শস্য উৎপাদন প্রক্রিয়া তাদের বাড়িতে তো কুইজ্যা থাকবেই। যারা চাষবাস করে তাদের গরু বা মহিষ আছে। শুকনো খড় গরু-মহিষের অন্যতম খাদ্য। বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন মাঠে কাঁচা খড়ের অভাব দেখা দেয়, মাঠে আমন ধান লাগানোর পরে কাঁচা খড়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়, তখন শুকনো খড়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। ধান মাড়াইয়ের পর ধানের আঁটি রোদে শুকিয়ে খড় করা হয়। খোলা ও অল্প পরিসর জায়গায় অধিক পরিমাণ খড় রাখার জন্য কুইজ্যা তৈরি করা হয়। কুইজ্যা তৈরি করার জন্য খড়ের আগে প্রয়োজন একটি ১০ থেকে ১২ ফুট লম্বা মোটা মতো বাঁশ বা কাঠের খুঁটি। খুঁটিটি নির্দিষ্ট স্থানে পুঁতে কুইজ্যা তৈরির কাজ শুরু করতে হয়। খড় শুকানোর পরেই খুঁটির চারপাশে সমপরিমাণের খড় ছিটিয়ে ছিটিয়ে কুইজ্যা তৈরি করা হয়। ঘরের লোকজন বা মাসিক ভিত্তিতে নিয়োজিত মজুর অথবা দৈনিক বেতনধারী শ্রমিক দিয়েই কুইজ্যা তৈরি করা হয়। খুঁটির চারপাশে খড় ছিটিয়ে ছিটিয়ে উপরের দিকে উঠে যাবে। যা ক্রমে একটি টিলা বা ছোটখাট পাহাড়ের রূপ ধারণ করে। খড়ের পরিমাণ অনুযায়ী কুইজ্যা তৈরি করা হয়। কুইজ্যা তৈরির প্রক্রিয়াটা এমনভাবে করতে হয় যাতে উপরে যেতে যেতে ক্রমে সরু থেকে সরু হয়ে চূড়ায় গিয়ে তা মিলিয়ে যায় এবং খুঁটির মাথা যাতে খড়ের বাইরে থেকে না যায়।

www.pathagar.com

কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায়ের বাড়ি

www.pathagar.com

*খড়ের গাদা স্থানীয়ভাবে যাকে কুইজ্জা বলে*

খুঁটির অগ্রভাগ খড়ের বাইরে বেরিয়ে গেলে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি চুইয়ে কুইজ্যার ভেতরে প্রবেশ করে। এতে করে ভেতরের খড় পচে যায়। ফলে কুইজ্যার অগ্রভাগে এমনভাবে মিলিয়ে দিতে হবে যাতে খুঁটির অংশ খড়ের উপরে না থাকে। এভাবেই কুইজ্যার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। কুইজ্যার নির্মাণকাজ সমাপ্ত করার পরে উপর থেকে একটি লম্বা বাঁশ দিয়ে ভালো ভাবে পিটিয়ে এলোমেলো খড়গুলোকে সমান করে দেয়া হয় যাতে করে কুইজ্যার ভেতরে পানি প্রবেশ করতে না পারে। আবার কেউ কেউ পুরোনো মাছ ধরার জাল কুইজ্যার উপরে বিছিয়ে দেয় এতে করে খড়গুলো বাতাসে উল্টাতে পারে না। আবার কেউ কেউ কুইজ্যার উপরে ছোট ছোট কয়েকটি মুলি বাঁশ নিচের দিকে এমন ভাবে ঝুলিয়ে দেয় যাতে বাতাসে খড় উল্টো যেতে না পরে। বাঁশগুলো এমনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয় যাতে কুইজ্যার অগ্রভাগে বাঁশগুলো একই সুতাতে বন্ধ থাকে। নিচের দিকে বাঁশগুলো চারপাশে ছড়িয়ে থাকে। এরকম একটি কুইজ্যা দুই বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়।”[৯]

কুইজ্যা তৈরিতে সাধারণ মানুষের যে সৃজনশীলতা ও বৃদ্ধির পরিপক্কতা রয়েছে তা অসাধারণ। এসব লোকস্থাপত্যের নিদর্শন ক্রমেই বিলুপ্ত হয় যাচ্ছে। বর্তমানে কক্সবাজার অঞ্চলে চাষাবাদে গরুর স্থান দখল করে নিচ্ছে কলের লাঙ্গল বা স্থানীয়ভাবে

www.pathagar.com

কথিত ট্রাক্টর। অপর দিকে বছরে দুই থেকে তিনটি ফসল বিশেষ করে আউশ, আমন ও বোরো ধান উৎপাদনের জন্য কৃষকদের মধ্যে রয়েছে অঘোষিত প্রতিযোগিতা। যার কারণে আমন ধান উঠার সাথে সাথে বোরো চাষের জন্য জমি তৈরি করতে সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর ফলে ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত নাড়া পাওয়া দুষ্কর হচ্ছে যাচ্ছে। অপর দিকে চাষাবাদে লাঙ্গলের স্থলে কলের লাঙ্গল স্থান দখল করায় গরু পালন সংস্কৃতি ক্রমে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি পূর্বে যেখানে ধান মাড়াই করার জন্য গরু ব্যবহৃত হতো কলের লাঙ্গলের কারণে গরু দিয়ে ধান মাড়াইও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কৃষক হালচাষ করলেও ঘরের শুকনো খড় বিক্রি করে দিচ্ছে। ধান মাড়াই করার জন্য স্থানীয়ভাবে যে লোকজ ছড়ার সৃষ্টি তা আজ শ্রুত হয় না। পূর্বে গরু দিয়ে ধান মাড়াই করার সময় গ্রামে এসব ছড়া শ্রুত হতো।

হাঁড়ি দেরে মইয়ার বলদ
হাঁড়ি দেরে তুই
খারা খারা ধান ঝরিলে
এ্যারি দিয়ুম মুই
বইল বইল বইল।"[১০]

কুইজ্যা নিয়ে কক্সবাজার অঞ্চলে লোকধাঁধাও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—
"এক মন গোস্ত, এক্খান হাডডি। উত্তর : কুইজ্যা বা খড়ের গাদা।"[১১]

শুধু কি তাই উপরে উল্লেখিত লোকছড়া ছাড়াও কক্সবাজারে এই কুইজ্যা নিয়ে আরো রসাত্মক লোকছড়া, ধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বলা যেতে পারে, "বুইজ্জ্যা কুঁইজ্জ্যাত্তু গইজ্জ্যাই গইজ্জ্যাই দইজ্জ্যাত পইজ্জ্যে।"[১২]

## তথ্যনির্দেশ

১. রবিউল হুসাইন, 'বাংলাদেশের লোকজ স্থাপত্য ও গৃহনির্মাণ', বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, সম্পাদক শামসুজ্জামান খান, প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৬৭।
২. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা-৫৬-৫৭।
৩. দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮) (কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর ভ্রমণ)- ভেলাম ভান সেন্দেল সম্পাদিত, অনুবাদ : সালাহউদ্দিন আউয়ুব, প্রকাশক : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, রুম ১১০৭, কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৯০।
৪. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা-৫৬-৫৭।
৫. আলী হোসেন, পিতা : আবদুল করিম, মাতা : জবেদা খাতুন, বয়স : ৫২, গ্রাম : কালা খোন্দকারপাড়া, ইউনিয়ন : দক্ষিণ মিঠাছড়ি, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৫-১২-২০১৩, সময় : সকাল সড়ে ৯টা।

www.pathagar.com

৬. সিরাজুল হক, পিতা : শাহাব মিয়া, মাতা : নীলা খাতুন, বয়স : ৬৫ বছর, তারিখ : ০১-১০-২০১১, সময় : সকাল ১০টা।
৭. বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়- ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা-মং বা অং (মং বা), লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, কক্সবাজার, প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা-১০৩।
৮. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, পিতা : আবুল খাইর, মাতা : দিলমাছ খাতুন, গ্রাম ও ইউনিয়ন : গর্জনিয়া, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৮-১২-২০১৩, সময় : বিকাল : ৪টা।
৯. মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন, বয়স : ৬৬, পিতাঃ আবুল হাসিম, গ্রাম : উত্তর পালাকাটা (বটতলী), ইউনিয়নঃ জালালাবাদ, কক্সবাজার সদর উপজেলা, কক্সবাজার। তারিখ : ২৪-০৮-২০১২, সময় : সকাল-১০টা।
১০. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোঁকাচার-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা-৪৭।
১১. কক্সবাজারের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-১৫৮।
১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০১।

www.pathagar.com

# লোকসংগীত ও গাথা/গীতিকা

## ক. লোকসংগীত

লোকসংগীত লোকসহিত্যের একটি সমৃদ্ধতম অঙ্গ। প্রাচীনকালে মানুষের কাছে অক্ষরজ্ঞান পৌঁছার আগে মানুষ গান সৃষ্টি করে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতো। বিশেষ করে নিজের ও নিজেদের চতুর্পাশের লোকজনকে বিনোদন প্রদানের লক্ষ্যে এসব নিরক্ষর তবে স্বশিক্ষিত মানুষগুলো গান সৃষ্টি করে, গানগুলো গেয়ে মানুষকে আনন্দ দিতো। গ্রামীণ জীবনে কিছু কিছু স্বশিক্ষিত লোকজন এখনো এধরনের স্বরচিত গান গেয়ে মানুষকে বিনোদন দিয়ে থাকে। এসব গানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গান রয়েছে। প্রাচীনকালে সৃষ্ট এসব গান মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পরবর্তীতে সচেতন লোকজন এসব গান সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থাও করেছে। বিশ্বব্যাপী লোকসংগীতের ছন্দ ও তাল প্রায় একই রকমের। ফলে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের মানুষ লোকসংগীতের যেকোনো শাখার গান শুনে আন্দোলিত হয়, বিমোহিত হয়। হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটি ভিন্ন মাত্রার অনুভূতি স্পর্শ করে।[১]

### ১. মাজারের গান

কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় অনেক মাজার রয়েছে। এসব মাজারের আশেকান ও ভক্ত রয়েছে। জেলার মহেশখালি উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের মধুপুর দরবার শরীফ, কুতুবদিয়া উপজেলার দরবার শরীফ, কক্সবাজার সদর উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নের বোয়ালখালির পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত ডুলা ফকিরের মাজার, ঈদগাঁও ইউনিয়নের শিয়াপাড়া পাহাড়ি এলাকার বারো আউলিয়ার দরগাহ, পেটান ফকিরের মাজার, ঝিলংজা ইউনিয়নের খরুলিয়া এলাকার আলাউদ্দিন শাহের মাজার, চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের শাহ্ ওমরের মাজার, উখিয়া উপজেলার হলদিয়াপালং ইউনিয়নের খোঁদা ফকির, রামু উপজেলার কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের মনিরঝিল গ্রামের শাহ্ হাকিম ফকির প্রমুখের মাজার রয়েছে।

নূরুল হক ডুলা ফকির একজন সাধক পুরুষ। তাঁর পূর্বপুরুষ মিয়ানমারের আরাকানের প্রখ্যাত আলেম পরিবার। তিনি ভারতের নিজামিয়া মাদ্রাসা থেকে স্বর্ণপদকসহ টাইটেল পাশ করেন। একসময় জাগতিক জীবন ত্যাগ করে ইসলামাবাদ ইউনিয়নের বোয়ালখালির পাহাড়ি এলাকায় আস্তানা তৈরি করে আল্লাহ্তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন হন। তাঁর হাতে সর্বদা একটি ডুলা বা বাঁশের ঝুড়ি থাকতো। এজন্য তিনি জনগণের কাছে 'ডুলাফকির' নামে পরিচিতি লাভ করেন। আরাধনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি মানব কল্যাণে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি বহু মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদসহ ধর্মীয়

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। ইন্তেকালের পরে তাঁর দরবারে একটি পাসপোর্ট পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি ছদ্ম-নামে বহু দেশ সফর করেছেন। তাঁর সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রতিবছর ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর মাজারে ওরশ অনুষ্ঠিত হয়।"[২]
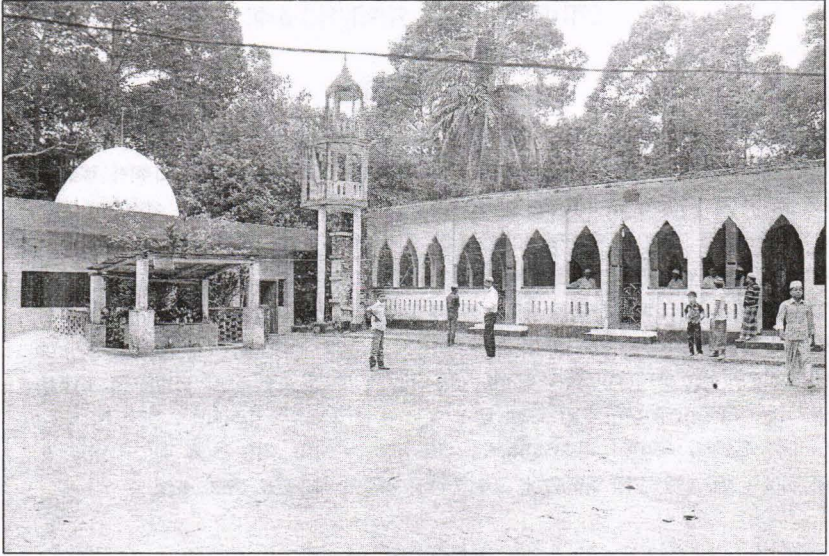
*কক্সবাজার সদর উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নের শাহ্ ডুলা ফকির মাজার*

শাহ উমর জেলার আরেকজন সাধক পুরুষ। চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের পাহাড়ি উপত্যকায় তাঁর মাজার। তিনি চট্টগ্রামের বারো আউলিয়ার একজন বলে কথিত। দক্ষিণ চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নোয়াখালির উমরাবাদে উমর শাহ নামে এক দরবেশ ছিলেন। চকরিয়ার শাহ উমর ও নোয়াখালির উমর শাহ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনুমিত হয়। জনশ্রুতি রয়েছে, তিনি ইয়ামেনের বাসিন্দা এবং শাহ জালাল (রা.)-এর সাতশ' অনুসারীর একজন ছিলেন। ১৩৩৮ সালে সুলতান ফখর উদ-দীন মোবারক শাহ-এর চট্টগ্রাম বিজয়ে সাহায্য করেছিলেন। এসময় তিনি নোয়াখালিতে ইসলাম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। পরে তিনি চকরিয়ায় আস্তানা গাড়েন। চাক এবং চাকমা অধ্যুষিত মানিকপুর গ্রামকেই তিনি ইসলাম প্রচারের লক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাই মানিকপুর গ্রামের অদূরেই তিনি আস্তানা গাড়েন। তিনি তাঁর আস্তানাতেই ইন্তেকাল করেন এবং গ্রামটি তাঁর নামানুসারে শাহ ওমরাবাদ নামেও পরিচিত। কয়েকটি পুকুরবেষ্টিত তাঁর মাজার। মাজারের পুকুরে রয়েছে গজাল মাছ। প্রতিবছর ২১ ফাল্গুন মাজারে ওরশ অনুষ্ঠিত হয়।"[৩]

জেলার আরেকজন কামেল পুরুষ ছিলেন আবদুল মালেক আল-কুতুবি। কুতুবদিয়া উপজেলায় তাঁর জন্ম। চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা থেকে

www.pathagar.com

পড়ালেখা শেষ করে ১৯৩৪ সালে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি উপজেলার ছনুয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৩৮ সালে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এসময় তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ও মাওলানা হোছাইন আহমদ মাদানী প্রমুখ শিক্ষকের সান্নিধ্যে জ্ঞান লাভ করেন। পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর তিনি আর দেওবন্দে ফিরে যাননি। তিনি নিজ গ্রামে শামসুল উলুম হামেদিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯ সালে মাদ্রাসার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের সান্নিধ্যে চলে যান। কক্সবাজারের উপকূলে ১৯৬০ সালের প্রলয়ঙ্করি ঘূর্ণিঝড়ের পরে তিনি কুতুবদিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং কুতুবদিয়া দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন। দরবারেই তিনি মুরিদ ও ভক্তদের সাথে দ্বীনি বিষয় এবং জিকির করে সময় কাটাতেন। ২০০০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি ইন্তেকাল করেন। কুতুবদিয়া দরবার শরীফে তাঁকে দাফন করা হয়। প্রতিবছর ৭ ফাল্গুন বা ১৯ ফেব্রুয়ারি কুতুবদিয়া দরবার শরীফে ওরশ অনুষ্ঠিত হয়।"[৪]

এছাড়াও আরো কয়েকজন কামিল মানুষ ছিলেন যেখানে গড়ে উঠেছে মাজার শরীফ। কিন্তু এসব মাজারে কোথাও নিজস্ব গান সৃষ্টি হয়নি। শুধু তাই নয়, উল্লেখিত মাজারসমূহে কোনো ধরনের গান পরিবশেন করা নিষিদ্ধ। সেসব আধ্যাত্মিক পুরুষ যাঁদের ইন্তেকালের পরে মাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা মনে করতেন যে, ধর্মের নামে গান বাজনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম।

তবে জেলার কয়েকটি মাজারে ওরশ এবং ভক্তবৃন্দ একত্রিত হলে গাজ-বাজনা করে থাকে। মহেশখালি উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের মধুপুর দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন ছৈয়দ একাম উদ্দিন। প্রতিষ্ঠাকালে মাজারে সেজদা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে কালে কালে ভক্ত, মুরিদরা পীর সাহেবের মাজারে সেজদা দেওয়া শুরু করে। বর্তমানে সেখানে ওরশ উপলক্ষে মুরিদ, সাগরেদদের সমাবেশে গানের জলসার আয়োজন করা হয়। জলসায় বিভিন্ন ধরনের গান পরিবেশিত হয়। তবে স্থানীয়ভাবে কোনো গান তৈরি হয়নি। ওরশে পরিবেশিত গানগুলো শফি মাইজভাণ্ডারির সাগরিদ বা ভক্তরা লিখেছেন।

## সংগৃহীত মাজারের গান

১.

ধ্বনীল শরীর ফুটিল রে
তাহের বাবার দরবারের ফুল ফুটিলরে
তাহের বাবা মাইজ ভান্ডারী
তাহের বাবা নয়নমনি
কোথায় গেলে পাব বাবা তোমারে। ঐ
তাহের বাবা কত সরল
আঁরারে ন দিত গরল
এতমিক্যা ঘুরি চাইলাম
ন' পাই তোয়ারে। ঐ



www.pathagar.com

তাহের বাবা সাদা সিদা
আঁরারে ন দিত ব্যথা
যেনে চাই এ্যনে লইয়ম তাহের বাবারে । ঐ
তাহের বাবা কত সুন্দর
আঁরারে গইত্য আদরে
কনদিন ভুলা ন যায় তাহের বাবারে । ঐ

২.
কি বিচার গইল্যা মুরশিদ আমারে
সারা রাইত্তান তাহের বাবা ঘুম ন ধরে
পিন্দনত আছে ছিরা লুঙ্গি
সামনে আইনে আমার লাজ করে॥
মরার খবর কমরে বাজান মাইলর খবর কম
মুরশিদ আইলে সময় ন পাই বাবাজান দিতাম
ঘরত আছে কাল ননদী মনর খবর লয়
ঘরত আছে সতীনর পোয়া মনত লাগে ভয়॥"[৫]

৩.
দয়াল মুর্শিদ যার অন্তরে
তারে কি আর যমে নিতে পারে
যে হইয়াছে গুরুর অধীন
যমে দেখলে ভয় করে॥ ঐ
যে হইয়াছে গুরুর অধীন
মুর্শিদ পরশ যাহার অন্তরায়
হনুমানে বুক চিরিয়া রামেরে দেখায়
আশুক মাশুক করে মিলন
অচেনা এক শহরে ।
অচীন দেশে যাবে যদি
গুরুর চরণ শক্ত করি
রাখবে বাজী
সাত সমুদ্র তের নদী
পার হবি এক নজরে॥ ঐ"[৬]

৪.
কি সাধন সাধিলাম গুরুরে
অ গুরু সাধন হইল না॥ (২)
মনের দুঃখে বনে গেইলাম

www.pathagar.com

মনের মানুষ পেলাম না।
সেই বনের বাঘ ভালুকে
আমায় ধরি খাইল না॥ ঐ
আনন্দ সাইগরর মাঝে
প্রেম করিলাম দুইজনা
তোমার আমার গোপ্ত প্রেম
অন্য সাধন জানবে কেনে
তা সঙ্গে মিলন হল না॥ ঐ"[৭]

৫.
মাইজ ভাণ্ডারে যাইতে গো
আশা করিলাম
আমার হযরত কেবলার মাজারেতে
করিব সালাম (২)
মাইজ ভাণ্ডারের প্রেমের মেলা
যে দেখেছে হয় উতলা
প্রেমের মালা গলে পরে
জপে মধুর নাম॥ ঐ
কলির পাপী উদ্ধারিতে
পাপের বৈঠা নিলেন হাতে
মাইজ ভাণ্ডারে উড়াইলেন
তৌহিদের নিশান॥ঐ"[৮]

৬.
যে জানে না প্রেমের মর্ম
তার সনে তোরা প্রেম করিস না
প্রেম করিয়া ছাইড়া গেলে
দুঃখে দুঃখে দিন যপনা॥ ঐ
প্রেম করিল সুজন বালা
কে কইল প্রেম যে জ্বালা
লোকে বুঝালো না॥ ঐ (২)
সেই প্রেমেতে মানুষ মরে
এই প্রেমের মর্ম বুঝেনা
প্রেম করিল লাইলী মজনু
তারার প্রেমে কত কথা হলো॥ (২)
জগত ছেড়ে চলে গেল
আইজ তারার প্রেমত মরে না॥ ঐ"[৯]

www.pathagar.com

৭.
বিনয় করি ডাকি তোমারে
ছৈয়দ বাবারে
কান্দি তোমার মাজারে॥ ঐ
ফুলের পালং সাজাই রাখি
আইলে শুয়াই অল্লাই
চিনির শরবত বানাই রাখি আইলে
খাবাইতাম তোমারে
কান্দি তোমার দরবারে॥ ঐ
কত পাপী তরাইত'আসলেন
এই ফাতেম পুরে (২)
খালি হাতে না ফিরাইও (২)
মনে আশা সবাররে
কান্দি তোমার মাজারো॥ ঐ"[১০]

৮.
নূর মোহাম্মদ সালল্লালাহ
চারে নাবীও কে সুলতান
অ হেলা হওয়াছে কা মেহমান
আবে আকাশ বাদে পানী
পুতলা বানাইয়া একেলা ছানি
নুরে আব চেহ্ ওয়া বানু নূরল্লাহ
চারে নাবীওকা সুলতান॥ ঐ"[১১]

৯.
বাবা সৈয়দ আউলিয়ারে
সালাম জানাই তোমার দরবারে (২)
আরকান থেকে আসিয়া
বাবা সৈয়দ আউলিয়া
আস্তানা করিলেন
হাতিন পুরে॥ ঐ
আমি তোমার প্রেমের পাগল
চাইনা বাবা কোন সম্বল
দয়া করো তুমি
আমারে॥ ঐ"[১২]

১০.
ইয়া মোহাম্মদ, ইয়া মোহাম্মদ
আরবী ওয়ালা ইয়া মোহাম্মদ তোমার নাম (৩ বার)

www.pathagar.com

তোমার নাম জপিরে খোদা, হৃদয়ে জ্বলে চেরাগ
এতিমের মোনাজাত। ঐ
যেতো আছে জঙ্গলবাসী মনিঋষি আওলিয়া
সারা জীবন কাটাই ফেলাই খোদার প্রেমে মজিয়া॥ ঐ
শামসুসদোহা মোহাম্মদ, বলছেন নুরুল হুদা মোহাম্মদ
ছাল্লিওয়ালা মোহাম্মদ মোহাম্মদের দুনিয়ায়॥ ঐ"[১৩]

১১.
নুরে নালা নুরে বাজান নুরের খোদা নুর
মুহাম্মদ নুর মুহাম্মদ নুর
খাজা বাজা নুররে বাবা খাজা বাবা নুর
শাহ্ জালাল নুররে বাবা শাহ্ পরান নুর
বার অলি নুররে বাবা জিন্দা অলি নুর (২)
আমিরুজ্জামান নুররে বাবা সমন অলির নুর
মালিক সাহা নুররে বাবা, মালেক সাহানুর
ফজরান শাহা নুররে বাবা ফজরান শাহানুর
নুরুচ্ছফা নুররে বাবা নুরুচ্ছফা নুর।"[১৪]

১২.
কোন মিকারে বানাই আছে আদমগাড়ি
খুঁজলে পাই না তারে
গাড়ি চালাই কেমন করি -২ বার
তেল মুবিল পানি চেক গরিয়া
ড্রাইবার যায় সিড়ত বসিয়া
আল্লাহর নামে ছাড়লো গাড়ি মদিনা পার করে
কলবেতে ৫টি কলমা আল্লাহর নামে জিকির করে॥ ঐ
হাছান হোছন চাক্কা অইল
ফাতেমা ইঞ্জিন অইল
আল্লাহর নামে ছাড়লো গাড়ি মদিনা পার করে
মগজেতে পাঁচটি কলমা আল্লাহর নামে জিকির করে
গাড়া চালাই কেমন করে॥"[১৫]

১৩.
ভান্ডারী তোর দিল কাবা
ভক্তজনে আজান দেয়
এক জামাতে নামাজ পড়েরে॥
সে নামাজের ভিন্ন কায়দা থাকে না রুকু সইদা

www.pathagar.com

নিয়তে পালন করে একবারে॥ ঐ
যকাত ছলাত এক সময়
নামাজে করে আদায়
৬ রূপে মেহরাজ কয় নজরে॥ ঐ
হুজুরী কলব ছাড়া, নামাজ পড়ে না তারা
রসুলের মূল ইশারা পালন করে
নামাজ তারা ছাড়েনা, কায়েম তারা ভুলে না
ভুলে না যাইতে বায়তুল্লাহর দরবারে॥ ঐ
নবীর মায়া ভান্ডারী, তারপরে বাঁধ ঢুরি
সেই ঢুরীতে বাইন্দে ভক্তরে
নমাজর ছুরত আছে, ভক্তরে দেখাইতেছি
ছালাম কয় রুহ্ বাচে নমাজের জোরে॥ ঐ"[১৬]

স্থানীয়ভাবে এসব মাজারের গান সৃষ্টি না হলেও কোনো কোনো গানের প্যারোডি সৃষ্টি হয়েছে। যেমন
"আশি টিয়াদি গরু কিনি গরুত হইয়ে গোস্তর টাল,
খাইয়ুম মত্তর মাইজজুম ফাল, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডার।"[১৭]
বলা যেতে পারে,
"ফইর ফইর আল্লাহ্‌র ফইর
পানিত দিলে ভাসে
পুদত তু বেত কেড়া
ঘলাই দিলে খট খটা মারি হাসে।"[১৮]

## ২. কর্মসংগীত

কক্সবাজার একটি প্রান্তিক জেলা। জেলার ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণে বিচিত্র ধরনের কর্মক্ষেত্র দেখা যায় এবং দেখা যায় বিচিত্র ধরনের পেশার মানুষ। জেলায় উল্লেখযোগ্য পেশাজীবী শ্রমিকের মধ্যে রয়েছে কৃষিশ্রমিক, লবণশ্রমিক, কাঠের শ্রমিক, মাটি কাটার শ্রমিক বা মাইট্যাল, কাঠ চিরাই করার শ্রমিক (স্থানীয়ভাবে তাদেরকে আরাকশি বলা হয়) রিক্সাশ্রমিক, ঝিনুকশিল্পের শ্রমিক, মৎস্যশ্রমিক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার, কৈয়াল, কলু, জোলা, বারৈ, ঘরামি, ছুতারসহ রকমারি শ্রমিকের দেখা পাওয়া যায়। প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য বলতে গেলে রকমারি সংগীত রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি পেশাজীবীর সংগীত প্রদান করা হলো।

**হাইল্যার গান**
হাইল্যা থাকে হাল ঘরত
গিরছ থাকে ব'র ঘরত
হাইল্যা ভাইয়র চালঘর গানত
নিত্তি ঝর পরে।

www.pathagar.com

অভাইরে ...
হাইল্যা ভাইয়র চালঘর চালঘর গানত নিত্তি ঝর পরে

দুঃখে সুঃখে রাইত পোয়াই
ফজর হইলে হাল লই যাই
পুগর বেইল পছিমে যারগই
ভাতর দেখা নাই ।
অভাইরে...
পুগর বেইল পছিমে যারগই ভাতর দেখা নাই

ছাম্মা ভরি আইন্যে ভাত
হাইল্যা বুলি দিয়েরে ডাক
দশ জনল্যা আইনন্যে পুরি
তিননোয়া লইট্যা মাছ ।
অভাইরে...
দশ জনল্যা আইনন্যে পুরি তিননোয়া লইট্যা মাছ ।

করই গাছর ডেইলা লই
ভাততুন খাইত বৈয়ের গই
আরেক জনে উড়ি কদদে
বাইট্যা মরিচ কই
অভাইরে...
আরেক জনে উড়ি কদদে বাইট্যা মরিচ কই ।

বাইট্যা মরিচ অল অইট্যা
মেইট্যা বাছন খসউজ্যা
পানি খাইত দিয়েরে কত্তি
ধইত্যে বিরবিজ্যা ।
অভাইরে...
পানি খাইত দিয়েরে কত্তি ধইত্যে বিরবিজ্যা ।

এখানে এসে গানের বক্তব্য অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। এই গানটি আবদুল করিম প্রকাশ বরকেতা গাইন সৃষ্টি করেছেন বিধায় তাঁর এলাকার বিষয়কে উপজীব্য করেই গানের বক্তব্য আবর্তিত। অন্য কোনো গাইন হাইল্যা গান সৃষ্টি করলে তাতে সেই গাইনের নিজস্ব বক্তব্যই পাওয়া যেত। বরকেতা গাইন এখানে বলেছেন এভাবে
শুনরে খবললে ভাইয়ান জানরে খবর
বারিতালার গজব হইয়ে দুনিয়ার ওয়র

www.pathagar.com

অভাইরে...
বারিতালার গজব হইয়ে দুনিয়ার ওয়র।

বারিতালার গজবে ছরার আগাত ঝর পরে
মিনি বাজার ছিজ্জে গোধা খালত ঢল পরে।
অভাইরে...
মিনি বাজার ছিজ্জে গোধা খালত ঢল পরে।

গোদা ছিরি বালুরচর হাইল্যার মনত লাইগগে ডর
ঝুপি ঝুপি যারগই হাইল্যা নিজ ঘরর ভিতর।
অভাইরে...
ঝুপি ঝুপি যারগই হাইল্যা নিজ ঘরর ভিতর।

সেইনা ঘরের ভিতরে যাই সদা মুখে হাইরে হাই
নাকর চংকি খুঁজের ভাইরে বাঁধা দিবল্‌লাই।
অভাইরে...
নাকর চংকি খুঁজের ভাইরে বাঁধা দিবল্‌লাই।

নাকর চংকি বাঁধা দি জালা কিনের ইগগতভু
সেইনা জালা ভাসাই আনের ইগগাচছরাতভু।
অভাইরে...
সেইনা জালা ভাসাই আনের ইগগাচছরাতভু।

পলকা মারি রুয়ের ধান ন বাঁচিব হাইল্যার জান
ভাতর মোছা বাঁধি দ'রে রাউন্যাতে যাম।
অভাইরে...
ভাতর মোছা বাঁধি দ'রে রাউন্যাতে যাম।

এখানে এসে গান অন্য মোড় নিয়েছে। স্থানীয় ভাবে আমন ধান লাগানোর কাজ শেষ। ফলে এলাকায় কাজের আকাল। এতে করে গাইন নিজে বা গানের নায়ক কাজের খোঁজে চট্টগ্রামের রাউজানে গেছে। এখানে এসে গাইন বলেন
রাউনন্যারঅ টিয়া লই ঘরে বসি খাইয়ুম বই
আশিন মাইস্যা যেন তেন রোয়াং যাইয়ুম বই।
অভাইরে...
আশিন মাইস্যা যেন তেন রোয়াং যাইয়ুম বই।

আশ্বিন মাসের শেষে গাইন নিজে বা গানের নায়ক রোয়াং চলে গেছেন। রোয়াং প্রাচীন আরাকানের রাজধানী। এই রোয়াং বর্তমানে মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ

www.pathagar.com

আরাকানের অধীন একটি এলাকা। তবে মায়েনমার সরকার উক্ত রোয়াং নামই বদলে ফেলেছে। মূলত আরাকানের রাজধানী ম্রোহং-কে রোয়াং বা পাত্থুরিকিল্লা বলা হয়। রোয়াং এসে গানের মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেছে। যেমন-

রোয়াং-অরঅ ধান কাড়ি হাতর চাম ভাই যার ফাঁড়ি
আইক্যাবতুন কিনের ভাইরে রেশমি শারি।
অভাইরে...
আইক্যাবতুন কিনের ভাইরে রেশমি শারি।

রেশম শারি মাদুলি কিনের ভাইরে কি গরি
ঘরত মাঝে খাইত ভাত নাই আইন্য কি বুলি?
অভাইরে...
ঘরত মাঝে খাইত ভাত নাই আইন্য কি বুলি?

সর্বশেষ গাইনের পরিচিতি। পথকবিসহ গাইনেরা যে ভাবে নিজের পরিচিতি প্রদান করে তেমনি ভাবে গাইনও নিজের নাম প্রদান করেছে।

গীত জুরাইয়ে রাতিয়া নিরলেতে বসিয়া
আক্কলে জুরাইয়ে গীত-লে মনে ভাপিয়া।
অভাইরে...
আক্কলে জুরাইয়ে গীত-লে মনে ভাপিয়া।

পদ বাইনদে পন্ডিতর কাম আবদুল করিম গাইনর নাম
ভালা ভালা কথা পাইলে জুরাই অ খুশ নাম।
অভাইরে...
ভালা ভালা কথা পাইলে জুরাই অ খুশ নাম।"[১৯]

### বিয়ার

'বিয়ার' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় কর্মসংগীত। 'বিয়ার' কক্সবাজার জেলার একটি বহুল প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দ। এর অর্থ বিনা মজুরিতে শ্রম দান বা বেগার খাটা। এর অন্য অর্থ হচ্ছে শ্রমোৎসব। অর্থাৎ আনন্দের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করা। 'বিয়ার ডাকা' মানে গ্রামের সুপরিচিত কৃষক শ্রমিকদের মিলনমেলা বা উৎসবের মাধ্যমে কোনো গেরস্থ আহুত কৃষিকর্মে সহযোগিতা করা। মিলেমিশে বড় কাজ সম্পাদন করা। বিয়ারে ডাকা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। তবে গেরস্থকে গরু-মহিষ বা ছাগল জবাই করে উন্নত খাবার পরিবেশন করতে হয়। গরু-মহিষ বা ছাগল জবাই হবে শ্রমিকের উপস্থিতির উপর। লোকজন বেশি হলে গরু জবাই করা হয, মোটামুটি হলে ছাগল জবাই করা হয়। বর্ষা মৌসুমে জমিতে ধান রোপণের সময় পাড়ার কৃষকদের দাওয়াত দিয়ে বিয়ার ডাকা হয়। রেওয়াজ আছে বিয়ারে ডাকা শ্রমিকদের সকাল, দুপুর ও রাতে উন্নত খাবার দিতে হবে। সকালে দিতে হয় গরম বিন্নি ভাতের সঙ্গে ডাল এবং মরিচচুরা (মরিচ ভর্তা)। শ্রমিকদের বড় উপাদেয় খাদ্য বিন্নি ভাত এবং মরিচচুরা

www.pathagar.com

(শুকনো মরিচের ভর্তা)। দুপুরে দিতে হয় গরম সাদা ভাত এবং মাংসের তরকারি। রাতের বেলা চিকন চালের গরম ভাতে ধোঁয়া উঠা তরতাজা গোশত। খাওয়া-দাওয়া শেষে শুরু হয় শ্রমিকদের উৎসব। আমন্ত্রিত শ্রমিকেরা সকাল বেলায় পেট ভরে খেয়ে কোমর বেঁধে দল বেঁধে নেমে পড়ে জমিতে। কেউ জমিতে চাষ দেয়, কেউ আগাছা সাফ করে, কেউ আল বাঁধে, কেউ বীজতলা থেকে চারা তুলে। মনের সুখে বিচ্ছিন্ন গান গেয়ে সবাই আনন্দে মেতে উঠে। তখন শ্রমিকদের সারিবদ্ধভাবে চারা বিতরণ ও চারা রোপণ শুরু করে। এসময় একজন টেনে ডাক ধরে এবং অন্যরা সুউচ্চ স্বরে অহো ঃ হোঃ হাঃ ইত্যাদি শব্দে 'হাইল্যা সাইর' গাইতে থাকে। সকলে 'হাইল্যা সারি' মারে এভাবে-

একজন ডাক ধরে (টেনে) উড়ন্ত রইদে---
(অপরেরা সমবেত কণ্ঠে) আঃ---আঃ
(১ম জন) পিঠ গইল্য কালা---
(অপরেরা) অঃ--- হাঃ--- হোঃ---
(১ম জন) খোদাভুন মাগম---
অপরেরা --- হৈ--- হোঃ অঃ---
তারপর ১ম জন শুরু করে বন্দনা সংগীত।
বন্দনা নিম্নরূপ :
আগে মানম আল্লাহ রসুল
মানমরে পয়গাম্বর
(অন্যসবাই) অমর হায় হায়রে (বলে গেয়ে উঠবে)
অংকোটি ফেরেশতা মানম শিরের উপর---
আওলিয়া আম্বিয়া মানম দিনের পরিমাণ
অমর হায় হায়রে
আছমান জবিন মানম সূর্য আর চাঁন---
বাংলাদেশশান মানি লইলাম নিজর জন্মস্থান
অমর হায় হায়রে

উক্ত রূপে দীর্ঘ বন্দনা শেষ করে সবাই মিলিত কণ্ঠে শুরু করে হাইল্যাগীত, হঁওলা, বারমাইস্যা ইত্যাদি গায়। দুপুরবেলা ধানের চারা রোপণ শুরু করে সকালের মতো শ্রমিকেরা গেয়ে উঠে উক্তরূপে:

তিন প'র পরনে বেইল পরের লাশে
হাত তুলি ডাকের বইন ছুরত জামালে ---

তারপর বন্দনা, বারমাইস্যা হঁওলা, ভাইট্যালি সবাই মিলিত কণ্ঠে গাইতে থাকে। সন্ধ্যা ও রাতে নিম্নরূপ ছন্দ দিয়ে শুরু করে।

হাঁজইন্যা অইলে রাঁধনির বেলা
চাম্পাফুল কানত দি নিরল কমলা
মেওলা করে খেলি চাঁদরে লই---"[২০]

তারপর পূর্ববৎ। নিম্নে দু'একটি গান তুলে ধরলাম।

www.pathagar.com

হাইল্যাগীতি
শুনরে খবল্‌লে ভাইয়াইন জানরে খবর
রোঁয়াং শহর বেরাই আইলাম
রাজার বিল সুন্দর---
হায় হায়রে মর---
অভাইরে --- রাজার বিলরে তুয়ানগর
মাঝে মাঝেরে টইনর ঘর
আরি মাপি বেচের ধান নাইয়া সদাগর।
হায় হায়রে মর---
অভাইরে---
আরি মাপের বেচের ধান উলেল্লে বৈশাখের চাঁন
ভাতর মোঁচা দ'না বান্দি বউ জুরিত যাম।
হায় হায়রে মর---
অভাইরে---
ভাতর মোঁচা হাতত লই পছিম কোলে পারার গই
সুন্দর বঁধু জুরি আইয়ের পাঁচশ টিঁয়া লই।
হায় হায়রে মর---
অভাইয়ে ---
পাঁচশ টিঁয়ার খরচ পাই খুশি অইয়ে বাপ অ ভাই
আমার মাইয়া দিয়ুম তারে এ বছর লামাই।
হায় হায়রে---
অভাইরে---
আমার মাইয়া লামাই দি মিজ্জি খোনকার ডাক দি
পাঁচ কলেমা পরাই তারে আদ্‌দোয়া গরাই দি
হায় হায়রে মর---
হাইল্যাগীতি শেষ হলে শুরু করে আঞ্চলিক দলীয় সংগীত।

দলীয়সংগীত
রসিক নাই ঘরে
শাম বন্ধুরে কইও--- (৪ বার)
যদি রসিক থাইকতো ঘরে
খুশবো দিতাম মাথার পরে
আঁচল দিয়ে মুছি লইতাম ঘামরে
বন্ধুরে কইও--- ঐ

আমি তো অবলা নারী
পরের ঘরে বা'রা বান্দি

www.pathagar.com

আঁর শরীর চুঁই পরের ঘামরে
বন্ধুরে কই ও --- ঐ

যদি রসিক থাইকতো ঘরে
টানি লইতাম বুকের পরে
হাসি হাসি খাবাই দিতাম পানরে.
বন্ধুরে কই ও --- ঐ
আইক্যাব গেইলা রঙ্গুম গেইলা
অভাগিরে ভুলি রইলা
মুই অভাগির হৈব কন্ উপায়রে
শাম বন্ধুরে কইও--- ঐ"[২১]

গান শেষে সম্মিলিত ভাবে শুরু করে হঁওলা। শ্রমিকদের বিরহী সুরে গাওয়া একটি হঁওলা কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করা হলো।

**কাকের হঁওলা**

উততুনঅ আইয়েল্লে কাউয়া
অরে কাউয়া দুই পাখ লারি চারি
মা নাইদে চেমইজ্যা (চেয়ইজ্যা) যাদু
বাপের কইল্লার বড়ুরে
আআঁর দেশইত্যা কাউয়া তুঁই
লই যা একখান সম্বাদ
মা নাইদে চেমইজ্যা (চেয়ইজ্যা) যাদু
বাপের কইল্লার বড়ুরে
উরকান দিয়া যাইতেরে কাউয়া
বইস্সে ঝলির টেনাত
মা নাইদে চেমইজ্যা·(চেয়ইজ্যা) যাদু
বাপের কইল্লার বড়ুরে
ঝলির টেনাত বসিরে কাউয়া
ওরে কাউয়া কিসের মাতা মাতেল্লে
মা নাইদ চেমইজ্যা (চেয়ইজ্যা) যাদু
বাপের কইল্লার বড়ুরে---

এভাবে হঁওলা চলতেই থাকে। আরও একটি হঁওলার কিছু অংশ নিম্নে প্রদান করলাম। এই হঁওলাটি বিশেষ করে বিয়ের আসরে বর সাজিয়ে নাপিতার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়। অত্যন্ত হৃদয়ছোঁয়া সুর। যেমনটি---

অরে সোনার নাপিতারে
অ নাপিতা আঁর কথা ধর
আঁর কথা না ধরিলে (২)

www.pathagar.com

ক্ষতি অইব তর
সোনার নাপিতারে---
অরে সোনার নাপিতারে
অঁ নাপিতা আঁর কথা ধর
কাত্তু কাত্তু পাবিরে বকশিশ (২)
তোয়াই তোয়াই ধর
সোনার নাপিতারে---
অরে সোনার নাপিতারে
অ নাপিতা আঁর কথা ধর
রাইতর সময় বেশি অইয়ে (২)
কামা শুরু গর
সোনার নাপিতারে---
অরে সোনার নাপিতারে
অ নাপিতা বহুত গইজ্যস আশা
ইছামাছে পাইজ্জে বদা (২)
তুই মিচ্ছিরীর মাথা
সোনার নাপিতারে---
অরে সোনার নাপিতারে
অ নাপিতা আঁর কথা ধর
টিয়া সিয়া পাবিরে বলি (২)
তোয়াই তোয়াই ধর
সোনার নাপিতারে---

হঁওলা গাওয়া শেষ হলে তাঁদের মুখে উচ্চারিত হয় ভিন্নমাত্রার গান। নিম্নে এমনি উল্টোগীত সংক্ষেপে তুলে ধরলাম :

আমার ভাবতে গেল দিনরে অভাই
চিন্তায় গেল দিন...
অউলা সুঁতার তওলারে বানাইয়ুম কতদিন। ঐ
অওলা সুঁতের তওলারে অভাই
অউলা (আঙ্গুল) অউলা (আঙ্গুল) বেরাই
এক অউলা (আঙ্গুল) ছুরাইতে গেলে (২)
তিন অউলে (আঙ্গুল) বেরায় ॥ ঐ
গাছের আগাত হাতির যুদ্ধ
বেইঙ্গা বাজার বাঁশি (২)
ছেইক্যা মাছে বিলাই খাইয়ে
কুত্তা অইয়ে খুশি ॥ ঐ

www.pathagar.com

পাতা পরি মাথা ফাইট্টে '
রাস্তা ধাইয়ে ডরে
দুধর পোয়া ধাই গিইয়েগৈ
মা'রে লইয়া কোলে ॥ ঐ
গঙ্গা গেইলাম সিয়ান গইত্য
সূর্যের উইট্টে জ্বর
কোণা ব্যাঙে শিয়ার ধইয্যে
তালগাছর ভিতর ॥ ঐ
এক আঁড়ুপানিত ছ'ল চরের
বগা গেইয়ে চাইত
দাইজ্যা পুড়ি খাপদি রইয়ে
বগারে ধরি খাইত ॥ ঐ
পিঁয়ারা আইস্যে হাতি মাইত্য
ঠেং দুনিয়ান তুলি
ধইন্যারে লেগুা বানাই
ডঁ'র (ধনি) অইয়ে কুলি ॥ ঐ"[২২]

এভাবে মোহনীয় সুর ও ছন্দে উল্লসিত শ্রমিকেরা ঝাঁঝ, জুরি, মোম, ঢোল, বাঁশি ও মুরলি বাজিয়ে দিন ও সারারাত 'বিয়ার' মহোৎসবে মেতে উঠে। অপূর্ব এবং বিচিত্র এ আয়োজন। একদিন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে এ উৎসবের আয়োজন করত কৃষকেরা। আজ আকাশ-সংস্কৃতি গ্রাস করে নিয়েছে আমাদের এই সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতিকে। আমাদের উচিত এ সুন্দর আয়োজনকে আগামী প্রজন্মের জন্য ধরে রাখা। বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমগুলো এ সব উপাত্তের মৌলিকত্ব অমর করে রাখতে পারে।
বলতে গেলে জেলার প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য পৃথক লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, লোকছড়া, লোকগীত সৃষ্টি হয়েছে। পেশাভিত্তিক লোকসাহিত্যের উদাহরণ দিতে গেলে কলেবর বৃদ্ধি পাবে। ফলে নব শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্য সৃষ্ট লোকসাহিত্যের উদাহরণ না দিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেয়ার চেষ্টা করলাম। কাঠুরিয়া বা আরাকষিরা (কক্সবাজারের আঞ্চলিক শব্দ) দলবদ্ধ হয়ে কোন কঠিনতর কাজ করার সময় এমন কতগুলো ছন্দোবদ্ধ ডাকের (আওয়াজ) জন্ম দেয় যা আধুনিক সুরকে কিছুক্ষণের জন্য পানসে করে রাখে। ধরুন আরাকষি জোট বেঁধে গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরে একটি বিশাল গাছ কেটে হাইঙ্গায় (কাঠ চেরাই করার জন্য তৈরি উঁচু মাচান, যার উপরে তুলে বিশাল গাছের লগটি চিরাই করা হয়) তুলবে, তখন তারা কিছু ছন্দোবদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করে। এ বাক্যগুলো কর্মের উদ্দীপনাবর্ধক। হাইঙ্গা লম্বালম্বি দু'পাশে পরস্পর দূরত্ব রেখে মাটিতে ৩টি করে ৬টি খুঁটি পুঁতে নির্মাণ করা হয়। ২টি শক্ত বড় কাঠ, উক্ত ৩টি করে ৬টি খুঁটির উপর বসাতে হয়। তারপর মধ্যখানে প্রস্থভিত্তিক বুক আড়াআড়ি আরো দু'টি কাঠ আটকিয়ে এ হাইঙ্গা তৈরি হয়। এতে ৫ জন আরাকষি কাঠ কাটে। হাইঙ্গার উপরে অবস্থানকারী দল নেতাকে বলা হয় 'শীল

www.pathagar.com

করাতি' বা 'কাইতাং' বা 'কাইদাং'। নিচের মধ্যখানে একজন মাঝ করাতি ও তিনজন কোর করাতি বা পার্শ্ব করাতি সমন্বয়ে কাঠ চেরাই করা হয়।
এখানে একটি কথা স্পষ্ট করে বলতে হয় যে, আরাকষি আর কাঠুরিয়া এক নয়। আরাকষির পেশা শুধু কাঠ চিরাই করা। আর কাঠুরিয়া হচ্ছে বন-জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করা। সেটা চিরাই করার জন্য হোক, জ্বালানী কাঠের জন্য হোক তাতে কোনো ফারাক নেই।"[২৩]

হাইঙ্গায় গাছ তোলার সময় আরাকষিরা অধিকতর শক্তি প্রয়োগে সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে ছন্দোবদ্ধ ডাক দিয়ে যায়। জোটবদ্ধ হয়ে ছন্দ, সুর ও তালের অবতারণা করা হয় তা সত্যই মানবমনকে মোহিত ও উৎফুল্ল করে রাখে। জঙ্গলে কেবল গাছ তোলার সময়ই নয়- কোনো বাহনে বড় বড় কাঠের লগ উত্তোলন বা নামানোর সময়ও নানা রকম উদ্দিপ্তমূলক সুর করে সংগীতের আশ্রয় নেয়। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে যখন এ সুর সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এবং তার সাথে যখন ঝিঝি পোকার একটানা ঝিঁঝি সুর উৎসারিত হয়, তখন মোহনীয় ও অনন্য সুন্দর সংগীত শ্রুত হয়। যাদের ভাগ্যে এ দৃশ্য উপভোগ করার সৌভাগ্য হয়েছে তারা জীবনে কখনও ভুলবে না এ দৃশ্য। শান্ত অরণ্যানীর শীতল বুকে আরাকষিদের ছন্দময় শব্দগুলো যেন মনে হয় কোনো পাখির গান। বেত কাটার পর সেটাকেও টানতে হয়। টানা, ঠেলা এবং তোলার মধ্যে সুরের বাঁধন জন্মায়। তাই কাঠুরিয়া বা শ্রমিকের ডাককে আমরা ডাকসংগীত বা কর্মসংগীত বলে অভিহিত করতে পারি। এ সংগীতের মধ্যে যে সুরলহরি উঠে তা আমাদের লোকসংস্কৃতির এক অনবদ্য অঙ্গ।

আমরা আবহমান বাংলার মানুষেরা সৃষ্টির শুরু থেকেই এ সংগীতের লালন করে আসছি আমাদের মন ও হৃদয় দিয়ে। হৃদয়ের নিভৃত কুঞ্জে লালিত এ সংগীত সাধারণ মানুষের দেহমনে যে অভাবনীয় শক্তি জাগায় তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শক্তিসঞ্চারক এ সংগীত বা ডাকসমূহ সংগ্রহ করা গেলে লোকসংস্কৃতির অবয়ব এবং কলেবর আরও অধিকতর প্রাণ পেত এটা নিঃসন্দেহে সত্য। স্থান এবং কর্মভেদে আহরিত ডাক সংগীতের কিছু উল্লেখ্যযোগ্য অংশ প্রদান করা হলো।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, টানা, তোলা এবং অপসারণ করা তথা নামানোর সময় শ্রমিকেরা ডাক সংগীতসমূহ সম্মিলিতভাবে গেয়ে থাকে। যেমন টানার সময় দলনেতা বা কাইতাং বা মাঝি ডাক ধরে-

হেইয়ারে হেইয়া- জোরে টান
(সবাই এক সাথে উচ্চারণ করবে) হেইও ....
(দলনেতা) জোরে মার ....
(সবাই এক সাথে উচ্চারণ করবে) হেইও...
দলনেতা-- আগে আল্লাহ,
(সবাই এক সাথে উচ্চারণ করবে) হেইয়া,
দলনেতা-- বাদে রসুল,
(সবাই এক সাথে উচ্চারণ করবে) হেইয়া,
দলনেতা-- মার ঠেলা মার জোরে,

www.pathagar.com

(সবাই এক সাথে উচ্চারণ করবে) হেইয়া...,
দলনেতা-- হে জোয়ান জোয়ান,
(সবাই এক সাথে উচ্চারণ করবে) হেইয়া... ইত্যাদি ।

তোলার সময় দলনেতার ডাক-
১. এ বলে জুম
(সবাই এক সাথে উচ্চারণ করবে) জুম---
দলনেতা ও সবাই বলবে এক্কুই টানে তুলি ফেল আল্লাহর হুকুম ... রে ....
২. এ বলে হেলা
(সবাই এক সাথে উচ্চারণ করবে) জোরে মার একবার ঠেলা .... রে ....
৩. এ বলে লালী
(সবাই এক সাথে উচ্চারণ করবে) বল দিব হযরত আলী .... রে ....

অপসারণের তখা নামানোর সময় দলনেতার ডাক-
১. লংকার বানু, বীর হনুমান-
(সবাই এক সাথে উচ্চারণ করবে) হেইয়ারে হেইয়া ....
২. আরো জোরে উল্লাস করে-
(সবাই এক সাথে উচ্চারণ করবে) হেইয়ারে হেইয়া ....
৩. কি বৈদ্য আনলি নাইতা বেড়া, নরিং দিদি পোছারে কেড়া
(সবাই এক সাথে উচ্চারণ করবে) হেইয়ারে হেইয়া ... ইত্যাদি ।”[২৪]

ডাক ধরার সঙ্গে এভাবে কোনো বৃহৎ কিছু টানা তোলা এবং অপসারণের সময় যে দৃশ্যের অবতারণা হয় তা দেখার জন্য লোকজনের ভিড় লেগে যায়। মনে হয় যেন সুন্দর মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠান। গ্রাম বাংলার গণ-মানুষের কাছে শ্রমিক মজুর বা আরাকষিদের এ সব ডাকধরা চিরঞ্জীব থাকুক ।

## ৩. গাইনের গীত

প্রাচীন স্বাধীন আরাকানের আওতাধীন এলাকা হিসেবে কক্সবাজার জেলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে। সে-কারণেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় অনেক কবিয়াল, গাইন-এর সাক্ষাৎ মেলে এবং তদের গান দেখা যায়। যা বর্তমানে জেলার আনাচে-কানাচে গীত হতে দেখা যায়। আবদুল করিম প্রকাশ বরকেতা গাইন তৎমধ্যে উল্লেখযোগ্য গাইন। নিচে আবদুল করিম প্রকাশ বরকেতা গাইনের একটি বিখ্যাত গান ব্রিটিশ-জাপান যুদ্ধের গান। গানটি নিচে প্রদান করা হল। বরকেতা গাইনের উক্ত গনের কোনো শিরোনাম ছিল না। গানটি সংগ্রহ করার পরে গানের বিষয় বস্তুর উপর ভিত্তি করেই আমি উক্ত শিরোনাম প্রদান করেছি ।

**ব্রিটিশ-জাপান যুদ্ধের গান**

আচ্ছালামু আলাইকুমরে
সবে মুসলমান

www.pathagar.com

ব্রিটিশ রাজার কথা কিছু
গরিমলে বয়ান ॥ অভাইরে...
ব্রিটিশ আচ্‌ছিল ফেরাঙ্গি
শুন ভাইয়ান তার খবর,
সেই ব্রিটিশর নিজর বাড়ি
বিলাতঅ শহর ॥ অভাইরে...
বিলাত শহর কলরবর
পানির উয়র [১] চলাচল
দরিয়াতে হিম্মত গরি [২]
বানাইয়ে শহর ॥ অভাইরে...
জাপান আছিল সদাইগর
জাপারঅ শহর ॥
দিনঅ দিনঅ লইত [৩] জাপান
ব্রিটিশরঅ খবর ॥ অভাইরে...
জাপান আছিল দোস্তিদার
নিত্তি[৪] জাপান আইয়ের যার [৫]
সদাইগরি গইত্ত [৬] জাপান
বিটিশরঅ মাজার ॥ অভাইরে...
বিটিশ রাজার হিম্মত ভারী [৭]
তোপ [৮] বানাইয়ে দোকানে
সেই তোপেরঅ নকশা তুলি
লইল জাপানে ॥ অভাইরে...
বিটিশ রাজার কথা ভাইয়ান
হগলে নিবারণ
জাপান রাজার কথা ভাইয়ান
শুন খানিকক্ষণ ॥ অভাইরে...
জাপান রাজা হিম্মত গরি
এনে মনে কল গরে
উরি উরি ফেইল্লে বোমা
রঙ্গুম শহরে ॥ অভাইরে...
যেত্‌তে বোমা ফেলাইল
রঙ্গুম শহর ভাঙ্গিল
রঙ্গুমরঅ পরবাসী ভাই
ঘরে ধাই আইল ॥ অভাইরে...
আইককাব শহর আছিল ভাইয়ান
মগ জাতিরঅ কারবারি ।
রাইফেল আরঅ বন্দুক নিল

www.pathagar.com

তারা চোর গরি ॥ অভাইরে...
রাইফল আরঅ বন্দুক পাই
খবর দিল রঙ্গুম যাই
রঙ্গুমত্তু চলি আইয়ের
কেরাইঙ্গরঅ [৯] সিবাই ॥ অভাইরে...
কেরাইঙ্গরঅ সিবাইর কথা
হগলে নিবারণ
আবার জাপান রাজার কথা ভাইয়ান
ফুনঅ খানিক্কন ॥ অভাইরে...
জাপান রাজার হিম্মত ভারি
মনে মনে কলগরে
উরি উরি ফেলের বোমা
আইক্কাব শহরে ॥ অভাইরে...
যেত্তে বোমা ফেলাইল
আইক্কাব শহর ভাঙ্গিল
আইক্কাবরঅ পরবাসী ভাই
ঘরে ধাই আইল ॥ অভাইরে...
পরবাসীরঅ কারখানা [১০]
দেইলে ভাইয়ান ভাপনা
দোভাষীরঅ বেটা দেখি
হইগেল দেবানা ॥ অভাইরে...
দোভাষীরঅ বেটা ছিল
রোসাঙ্গ শহরে
হাবার পরে [১১] টেলিগ্রাম
গইল্ল রাজারে [১২] ॥ অভাইরে...
হাজার হাজার সৈন্য দিল
দোভাষীরঅ বেটারে
গরুর জোয়াল কাধত দিল
সুইসা বাবুরে [১৩] ॥ অভাইরে...
গরুর জোয়াল কাধত দি
বেতলই বাইজ্যার মগরে
সুইসা বাবু ধাইয়া গেল
পুরমার [১৪] বাজারে ॥ অভাইরে...
আইক্কাব শহর ভাঙ্গি যাই
ভাপি ভাইয়ান কুল নপাই
রঙ্গুমত্তু চলি আইয়ের
আলংগির সিবাই [১৫] ॥ অভাইরে...

www.pathagar.com

আলংগিরঅ সিবাইর কথা
হগলে নিবারণ
মুসলমানর দুঃখের কথা
ফুনঅ খানিক্ষণ ॥ অভাইরে...
আনকরঅ [১৬] মুসলমান
ঘরে বৈ ন খার ভাত
রাইফল আরঅ বন্দুক মারি
আইয়ের মগর জাত ॥ অভাইরে...
রাইফল আর বন্দুক মারি
আইয়ের মগে ডাক ছারি
গুলি খাইয়া মুসলমান ভাই
ক'শত যার মরি ॥ অভাইরে...
যদি হইত লাড়ির কাম
বাইজ্যাই মাইত্ত মগর চাঙ
বন্দুক নপাই মুসলমান ভাই
হইগেল পেরেশান ॥ অভাইরে...
দুধের যাদু কুলত লই
কাঁদের বউয়ে হালদাত বৈ [১৭]
যাদু মণি গরের পুছার[১৮]
আমার বাবা কই ॥ অভাইরে...
তোঁয়ার বাবা গিয়ে মারা
রাইফলরঅ গুলি খাই
হেই কন্যারে বেরাই ধইজ্যে
মগর চাঙে যাই ॥ অভাইরে...
কইন্যা কাডের কুম্‌মারি [১৯]
শুন যাদুর লরখরি[২০]
হেই যাদুরে মারি ফেইল্ল্যে
লোহার ছেল[২১] মারি ॥ অভাইরে...
ছেলর আগাত যাদু লই
দুষ্ট মগে নাচের গৈ
মুসলমানে গরের কাঁদন
জঙ্গলেতে বৈ ॥ অভাইরে...
নিজস্থানের ঘর ফেলি
মুসলমানর লরখরি
গবন গইল্‌ল্য [২২]
আপকরঅ ফারি [২৩]॥ অভাইরে...
আপকরঅ ঢালাত [২৪] যাই

www.pathagar.com

কিয়রে ডাকের [২৫] বাপঅ ভাই
হাজার হাজার মরি যাদ্‌দে
পানির লাগ নপাই [২৬] ॥ অভাইয়ে...
যাত্তুন আস্‌সিল বুরাবুরি
তারার ফুইন্‌ন্য [২৭] লরখরি
ঢালাত মাঝে ফেলাই আইস্যে
হাড়াই নপারি ॥ [২৮] অভাইরে...
দুঃখে সুঃখে পথ ফুরাই
ভুচিধংঅর লাগত পাই[২৯]
দোভাষীরঅ বেটা আইস্যে
মুসলামানর লাই ॥ অভাইরে...
দোভাষীরঅ বেটা যদি
ভুচিধংঅত নুআইত
মুসলমানর কল্লা কাড়ি
ফেনী পার গইত্ত ॥ অভাইরে...
ছোড় আনক সোনালী [৩০]
তে-তো আসসিল বর্‌ বলি
মগের সনে গরের যুদ্ধ
ফুইন্‌ন্য কান ভরি ॥ অভাইরে...
নোয়া লারাই শুরু হইয়ে
ভুচিধংঅর পুক্‌কুলে
কচুর মত কাড়ি যারগৈ
দুষ্ট মগরে ॥ অভাইরে...
কচুর মত কাড়ি যারগৈ
কাড়ি কন কুল রপাই
দোভাষীরঅ বেটা চইল্‌ল্যে
মিশিনগানল্‌ল্যা ॥ অভাইরে...
রাচিধং [৩১] শহরে যাই
মগজাতিরঅ লাগত পাই
হাজার হাজার মারি ফেইলল্যে
মিশিনগান চালাই ॥ অভাইরে...
দোভাষীরঅ বেটা যদি
রাচিধংএ নু আইত
মুসলমানর দুঃখের কথা
দামচর [৩২] নযাইত ॥ অভাইরে...
শুন ভাইয়ান মুসলমান
দোয়া গর মিয়ার

সেই মিয়ারে লইয়া গেল
বোম্বাই শহরে ॥ অভাইরে...

রোয়াঙ্গরঅ কথা ভাইয়ান
হগলে নিবারণ
আনকরঅ কথা কিছু
ফুনঅ খানিকক্ষণ ॥ অভাইরে...
আনকরঅ বজজিলা [৩৩]
উখ্‌খ্যার ঘাড়র[৩৪] সীমানা
সাম্বালাতে [৩৫] বাঁধি রাইক্‌ক্যে
ক্যাম্বর কারখানা ॥[৩৬] অভাইরে...
ক্যাম্ব (ক্যাম্প) বাইনদে থরে থরে
পরবাসঅরঅ এ লস্কর
রাজা সাবে আদর গরি
মিলার ভাত কাপর ॥ অভাইরে...
ঝাঁকে ঝাঁকে আইয়ের চলি
গনি-কিয়ে[৩৭] উর ন পার[৩৮]
ঊাবু মিয়া চলি যারগৈ
ক্যাম্বর ভাত্‌তুন খাই ॥ অভাইরে...
উখ্‌খ্যার ঘাড়ত দেখি আইলাম
পন্নাছাড়া কনডকদার
বা-ই-ল্‌ল্যা [৩৯] কাড়ের কুরা ছঅল [৪০]
কনডকদারয্যা খার ॥ অভাইরে...
কইতর একজোর পাঁচটিয়া
রাতাকুরা দশটিয়া
অউগ্যা [৪১] পাড়া (পাঠা) কিনি
খাইয়ে সাওে বাইশটিয়া ॥ অভাইরে...
বারিতালা আদরগরি
দি-পেড়াইয়ে [৪২] রাস্তার কাম
পুয়া বুরা [৪৩] ছরে [৪৪] চইল্‌ল্যে
গইত্ত কুলিকাম ॥ অভাইরে...
ফজর হইলে রাস্তাত যায়
আছরত্‌ত্ত টিআ পায়
পাইববাজারর [৪৫] চইললুন কিনি
ঘরে বৈ খায় ॥ অভাইরে...
গরিব তোয়ানগর চিচন নাই
হেটে মাথাতদি রাস্তার যায়

www.pathagar.com

কুলি খারাই কিছু টিআ
কনডকদাইযয্যা খায় ৷৷ অভাইরে...
আলু খাইল ঘাড়ি ঘুড়ি
আরঅ খাইল কেলা গাছ
গরিব দুইখ্যা রাঁধি খাইয়ে
পাইন্যা মাদার গাছ ৷৷ অভাইরে...

গীত জুরাইয়ে খুশনামি
নগরিঅ বদনামি
বাংলা ভাষী গীত জুরাইয়ে
লেখা নজানি ৷৷ অখাইরে...
গীত জুরাইয়ে আক্কলে
ফুইনন্য ভাইয়ান সক্কলে
দোয়া গইজ্য সভার ভাইয়ান
গাইল নইদ্য তারে ৷৷ অভাইরে...
গীত জুরাইয়ে রাতিয়া
নিরলেতে বসিয়া
আক্কলে জুরাইয়ে গীতলে
মনে ভাপিয়া ৷৷ অভাইরে....
পদ্ বাইনদে পণ্ডিতর কাম
আবদুল করিম গাইনর নাম
ভালা ভালা কথা পাইলে
জুরাইঅ খুশ নাম ৷৷ অভাইরে..."[২৫]

**শব্দার্থ**

উয়র =উপর, ২.হিম্মত =সাহস, ৩. লইত = নিত, ৪. নিত্তি =নিয়মিত, ৫. আইয়ের যার = আসছে আর যাচ্ছে, ৬. গইত্ত = করত, ৭. হিম্মত ভারি = হিম্মত অর্থ সাহস, ভারি শব্দের প্রকৃত অর্থ ওজন বেশি। তবে এক্ষেত্রে গীতিকার ভারি অর্থে বেশি ব্যবহার করেছেন। ফলে হিম্মত ভারি শব্দের অর্থ হচ্ছে বেশি সাহস। ৮. তোপ= বোমা, ৯. কেরাইঙ্গ= ক্যারাঙ্গ বার্মার একটি প্রদেশ। ক্যারাঙ্গ প্রদেশের সৈনিকদের বোঝানো হয়েছে। ১০. কারখানা= কারখানার প্রকৃত অর্থ যান্ত্রিক কারখানা যেখানে উৎপাদন হয়। কিন্তু এখানে কাণ্ডকারখানা বোঝানো হয়েছে। প্রকৃত অর্থে পরবাসীর যন্ত্রণা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ১১. হাবার পরে= হাওয়া বা বাতাসের উপর, ১২. গইল্ল=করল, ১৩. সুইসা বাবু=রোসাঙ্গের বড় মগ জমিদার রেইগ্গছুর ছেলে ব্যারিস্টার সুয়েসা, ১৪. পুরমা=আরাকানের মংডু টাউনশিপের একটা গ্রামের নাম, ১৫. আলংগির সিবাই= হায়দ্রাবাদের শাসক নিজাম শাহের সৈন্য (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হায়দ্রাবাদের নিজাম শাহ বাহাদুরের সৈন্যরা মিত্রবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। ফলে তারা

www.pathagar.com

মুসলমানদের সাহায্য করেছিল), সম্রাট আলমগীরের সৈন্য ভ্রমে তাদেরকে আলংগীর সিপাহী বলা হয়েছে। ১৬. আনক=পশ্চিম (আরাকানের লোকজন কক্সবাজারের লোকজনকে এখনো আনইক্যা বলে থাকে।), ১৭. হালদাত বৈ=বড় রাস্তা থেকে বাড়িতে প্রবেশের মূল ফটক, বৈ বা বসে, বাড়ির প্রবেশদ্বারে বসে, ১৮. পুছার= জিজ্ঞেস করছে, আরবি শব্দ পুছ থেকে পুছার শব্দের উৎপত্তি, ১৯. কুম্‌মারি= দা'দিয়ে কুপিয়ে (এখানে কন্যা বলতে ঘরের বউকে বুঝানো হয়েছে। বাড়ির বউকে কুপিয়ে হত্যা করছে। ২০. লরখরি=যন্ত্রণা, ২১. ছেল=বল্লম, ২২. গবন গইল্‌ল্য=গবন বা গমন, গইল্‌ল্য বা করলো। গমন করলো। ২৩. আপকর ফারি=বুচিধং বা বুতিধং ও কিয়ক্‌ট টাউনশিপ দু'টির সংযোগ স্থলের গিরিপথকে আপকর ফারি বলা হয়, ২৪. ঢালাত=গিরিপথ, ২৫. কিয়রে ডাকের=কাউকে ডাকছে, ২৬. লাগ নপাই=নাগাল না পেয়ে বা নাগালের বাইরে, ২৭. তারার ফুইন্‌ন্য=তাদের শুন (শুনার আহ্বান), ২৮. হাড়াই নপারি= হাঠাতে না পেরে, ২৯. ভুচিধংঅর লাগত পাই=মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের একটি টাউনশিপের নাম, লাগত পাই অর্থ সাক্ষাৎ পেয়ে, ৩০. সোনালি= মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের মংডু টাউনশিপের দক্ষিণে অবস্থিত হাইছুরাতা গ্রামের সোনালি বলি একজন বিখ্যাত কুস্তিগির। (ছোট আনক সোনালি=এখানে ছোট আনক বুঝাতে নাফ নদীর পূর্বপাড় থেকে মংডু টাউনশিপ পর্যন্ত জায়গাকে ছোট আনক বুঝিয়েছে। আর নাফ নদীর পশ্চিম পার্শ্বে বড় আনক।) ৩১. রাচিধং=আরাকান প্রদেশের একটি টাউনশিপ, ৩২. কদামচর=কখনও, ৩৩. আনকরঅ বজজিলা=বজজিলা বা বড় জিলা বা পশ্চিমের বড়জিলা, ৩৪. উখ্‌খ্যার ঘাড়র=উখ্‌খ্যা বা উখিয়া (উখিয়া বর্তমান কক্সবাজার জেলার একটি উপজেলা। উপজেলাটির অবস্থান মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের সীমান্ত সংলগ্ন), ঘাড়=খেয়া পারাপারের ঘাট। উখিয়ার ঘাটের, ৩৫. সাম্বালাতে=নাইক্ষ্যংছড়ি পার্বত্য উপজেলার ঘুংধুম ইউনিয়নের তুমব্রু গ্রামের পূর্বপার্শ্বে মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের মংডু টাউনশিপে অবস্থিত একটি এলাকার নাম।, ৩৬. ক্যাম্বর কারখানা=ক্যাম্ব বা ক্যাম্প, পূর্ণ বাক্য ক্যাম্পের কারখানা বা কাণ্ডকারখানা (শত শত ক্যাম্প তৈরি করে লোকজন দিন যাপন করছে বলে কারখানা শব্দ ব্যবহার করেছেন, ৩৭. গনি-কিয়ে= গনি বা গুনে, কিয়ে বা কেউ, কেউ গুনে, ৩৮. উর-ন-পাই= শেষ করতে পারছে না, ৩৯. বাইল্‌ল্যা =বাঙ্গাল, এখানে নিরক্ষর বা অশিক্ষিত বুঝাতে ব্যবহৃত, ৪০. ছঅল= ছাগল, ৪১. অউগ্‌গ্যা= একটা, ৪২. দি পেড়াইয়ে=পাঠিয়ে দিয়েছে, ৪৩. পুয়া বুরা=ছেলে বুড়া, ৪৪. সঅরে= সকালে, ৪৫. পাইববাজারে=সকাল সন্ধ্যা যেখানে বাজার বসে। প্রকৃত অর্থে নলকূপকে স্থানীয়ভাবে পাইপ বলা হয়। পাইপ শব্দটা স্থানীয়ভাবে পাইব উচ্চারিত হয়। উক্ত বাজারে একটি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছিল। উক্ত নলকূপকে কেন্দ্র করে যে বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা পাইববাজার নামে পরিচিতি লাভ করে।)।

(বি:দ্র : ১৯৭৮ সালে এই গানটি আমি (প্রধান সমন্বকারী মুহম্মদ নূরুল ইসলাম) বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। পূর্ণাঙ্গ গানটি কারো কাছ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কক্সবাজার সদর উপজেলার বর্তমান জালালাবাদ (প্রাক্তন বৃহত্তর ঈদগাঁও ইউনিয়নভুক্ত) ইউনিয়নের দক্ষিণ লরাবাগ গ্রামের লোককবি লাল মোহাম্মদ (৫৫) ও

www.pathagar.com

আব্বাস আহমদ (৭০) এবং খামারপাড়া গ্রামের মোহম্মদ মোস্তফা (৭০)-র কাছ থেকে গানটি সংগ্রহ করেছি। ব্র্যাকেটে উল্লেখিত বয়স ছিল ১৯৭৮ সালে গানটি সংগ্রহকালে। বর্তমানে তিনজনই ইন্তেকাল করেছেন। এরা বরকেতা গাইনের সাথে বিভিন্ন সময়ে গানটি গাইতেন। বিশেষ করে মোহাম্মদ মোস্তফা বেশিরভাগ সময় বরকেতা গাইনের সাথে থাকতেন বলে তাঁর কাছ থেকে জানা গেছে।)

## ৪. মেয়েলি গীত

মেয়েদের প্রেম, ভালোবাসা, বিরহকে উপজীব্য করে প্রাচীনকালে কবি বা গাইন বা কবিয়ালরা গান বেঁধেছেন। এসবই মূলত মেয়েলি গীত বা গান বা হঁওলা। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়েও নারীর ভালোবাসা, প্রেম, বিরহকে উপলক্ষ, উপজীব্য করে কবি-সাহিত্যিকরা কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস রচনা করছেন, ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। বর্তমানকালে কবি-সাহিত্যিক কর্তৃক রচিত এসবকে কবিতা, গল্প, গান বা উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে অপর দিকে প্রাচীনকালে কবি-কবিয়াল বা গাইন যা সৃষ্টি করতো তাকে পালা, বারমাইস্যা, বা মেয়েলি গীত বা গান বলা হচ্ছে। বারমাইস্যা বা বারমাসি সাধারণত নারীর বিরহগাঁথা। প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে বছরের শেষ। লোকসংস্কৃতিতে বারমাসি একটি চমকপ্রদ লোকসংগীত। তবে জেলায় তেমন উল্লেখযোগ্য বারমাসি গান সৃষ্টি হয়নি। প্রবীণ লোকশিল্পীদের মুখে অনেক পুরানো বারমাসি গাথার সন্ধান পাওয়া যায়। বারমাসির সুর এবং ছন্দ অনেকটা হঁওলার মতো। বারমাসি দলীয় সংগীত। একজন শিল্পীর মুখে ফুটে উঠে না। বারমাসিতে প্রবাসে অবস্থানরত স্বামীর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্ট বিরহ তিলে তিলে ফুটে উঠে। অথবা আশায় আশায় কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকার মিলনের জন্য যে আকুতি ব্যক্ত করতে চায়, তা রসিক কবি'র গাঁথুনিতে প্রেম-বিরহগাঁথা হিসাবে লোকসংস্কৃতির আদল হয়ে বারমাসি নামে প্রকাশ পায়। এখানে অনেক অনেক দিন আগের বিরহকাতর প্রেমিকের একটি বারমাসি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে অবিকল গায়কের কথাগুলো তুলে ধরা হলো। বারমাসিটি সম্পূর্ণ। গায়ক নজির আহমদ (৭২) ও অছিয়র রহমান (৭৫)। বর্তমানে কোনো বারমাসি লেখা হয় না। তবে পুঁথিসাহিত্যে প্রেমিকার অনেক বারমাসি দেখা যায়। এ অঞ্চলের এককালের পুরোনো বারমাসিগুলো লুপ্ত প্রায়। এ অঞ্চলে এগুলোর প্রচলনও প্রত্যক্ষ করা যায় না। বারমাসি নিম্নরূপ :

অরে.. কালা ভ্রমরারে...(২) অ ভমরা বুকের লে বড় জ্বালা
কাইল বিয়ানে কইয়ম কথারে (২) জল ভরিতে আইলেরে মর হায় হায়রে...

অরে.. গাঁয়ে দিয়ে সোয়া চন্দনরে অস্বন্তী ভইন মাথারলে ফুলের তেল
হাসিয়া মাতিয়া স্বন্তী ভইন(২) জল ভরিতে গেল মর হায় হায়রে....
অ....ন 'ভইজ্য ন' ভইজ্য জলরে অ.. স্বন্তী ভইন ছাবাল্লে মাদার ঘাটে
সেই না ঘাটের চকিদারীরে ভইন (২) দিয়াছেরে আমারে মর হায় হায়রে...
অরে.....দাদাই দিল মোর ঘাটরে সাধের কুমার ধর্মে দিল পানি
মঁইয় স্বন্তী ভইত্যাম জলরে (২) কিয়ল্লে চকিদারিরে মর হায় হায়রে...
কি হৈলা স্বন্তীরে... সতী কন্যা ন' পুরাইলা আশা

www.pathagar.com

নবরং ছুরতির লাগি ভইন (২) সামনে জ্যৈষ্ঠ মাসের মর হায় হায়রে...
জ্যৈষ্ঠল মাসেতে স্বন্তীরে... অ স্বন্তী ভইন দেশেল্লে ফুল জালা
এ সমস্ত কথারে ভাইয়ান (২) হিলে দিলে নাইরে মর হায় হায়রে...

অরে.. এ মাস ভারাইলা স্বন্তীরে ... স্বন্তী ভইন রে ন' ফুরালি আশা
নবরং ছুরতির লাগি ভইন (২) সামনেরে আষাঢ় মাসরে হায় হায়রে...

আষাঢ় মাসেতে স্বন্তীরে... অ স্বন্তী ভইন বাসারলে কাওয়া লরে
আষাঢ় মাসে বৃষ্টির ঘোরে (২) বাসার লে কাওয়া লরেরে মর হায় হায়রে...

এই মাস ভারাইলা স্বন্তীরে ... অ স্বন্তী ভইন ন' পুরাইলি আশা...
নবরং ছুরতির লাগি ভইন (২) সামনেরে শ্রাবণ মাসের মর হায় হায়রে...

ওরে শ্রাবণ ও মাসেতে স্বন্তীরে অ স্বন্তী ভইন হাইল্যারে রুয়ে রোয়া
এমন বয়সের কালের তোর (২) কোলে নাই তোর পোয়ারে মর হায় হায়রে...
অরে হইও কো হইও কো সাধুরে অ সাধু ভাই আমার লে মনে লয়
ন থাকিলে ঘরত স্বামী (২) ছাওয়াল লে কেনে হয় (২) রে মর হায় হায়রে...
অরে এই মাস ও ভারাইলা স্বন্তীরে ... অ স্বন্তী কইন্যা ন' পুরাইলিরে আশা
নবরং ছুরতির লাগি ভইন (২) সামনে ভাদ্র মাসরে মর হায় হায়রে...
অরে ভাদ্রল মাসেতে স্বন্তীরে... অ স্বন্তীরে গাছেরে পাকে তাল
স্বামী ছাড়া মুই অভাগিরে (২) থাইক্যমলে কত কালরে মর হায় হায়রে...
অরে এই মাস ভারাইলা স্বন্তীরে অ স্বন্তী ভইন ন পুরাইলিরে আশা
নবরং ছুরতির লাগি ভইন (২) সামনে রে আশ্বিন মাসরে মর হায় হায়রে...
অরে আশ্বিনেরও মাসেতে স্বন্তীরে অ স্বন্তী ভইন দুর্গায় খা'দে ঢালি
মুইয় স্বন্তী থাইক্যম কেনে (২) পরাণরে কাঁপেরে ডরেরে মর হায় হায়রে...
অরে এই মাস ভারাইলা স্বন্তীরে ... অ স্বন্তী ভইন ন পুরাইলি আশা
নবরং ছুরতির লাগি ভইন (২) সামনে কার্তিক মাসেরে মর হায় হায়রে...
অরে কার্তিক মাসেতে স্বন্তীরে অ স্বন্তী ভইন হাতির মাথায় মতি
মুই ন' জানম অবলা স্বন্তী (২) কারেরে দিলা বিভারে মর হায় হায়রে...
অঘ্রাণ মাসেতে স্বন্তীরে... অ স্বন্তী ভইন চাষার কাড়ের ধান...
নবরং ছুরতির লাগিরে ভইন (২) জাননান গইজ্যম দান রে মর হায় হায়রে...
এই না মাস গেল স্বন্তীরে (২) অরে স্বন্তী ভইনরে আইল পোষ মাস
পোষর শীতে ভুত গোজরে তত্তো নাইরে ডর মর হায় হায়রে...
পোষ মাস গেল স্বন্তীরে... স্বন্তী ভইনলে আইলরে মাঘল মাস
মাঘর শীতে বাঘ গোজরে ভইন লে (২) ন' পুরাইলি আশারে মর হায় হায়রে...

মাঘ মাস ভারাইলি স্বন্তীরে... স্বন্তী ভইনলে আইলরে ফাগুন মাস

www.pathagar.com

ফাগুন মাসে নয়া যৈবন ভইনলে (২) কারে দিবার আশ' রে মর হায় হায়রে...
চৈত মাস আইল স্বন্তীরে অ স্বন্তী ভইন টাড়ারে রইদর জ্বালা
নবরং ছুরতির লাগি ভইনলে (২) মননানলে উতলারে মর হায় হায়রে।
চৈত মাস ভারাইলি স্বন্তীরে... স্বন্তী ভইনলে সামনেরে বৈশাখ মাস
এই না মাসে বধু বানাই স্বন্তীরে (২) ঘরে তুইলতাম আশরে মর হায় হায়রে...
কী কৈলা কী কৈলা কুমাররে... সাধের কুমার কী কৈলারে তুমি
ফুলর কলি ফুলে আছি কুমার (২) কেমনে লইবা তুলিরে মর হায় হায়রে...।
বৈশাখ মাসেতে স্বন্তীরে... স্বন্তী ভইনলে দ্বিতীয়া উলে চাঁন
পরের ঘরে বধু দেখি ভইন (২) বিদরে পরান রে মর হায় হায়রে..."[২৬]

## ৫. বিয়ের গীত

হঁওলাকে সাধারণত বিয়ের গান হিসেবে ধরা যায়। গ্রামাঞ্চলের বিয়েবাড়িতে হঁওলা হয়। বিয়ের গান হিসেবে সমধিক পরিচিত হঁওলা লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী উপাদান। প্রাণবন্ত সুর এবং জীবন্ত আমেজের এ হঁওলা মানুষের মনে সর্বাধিক নাড়া দিয়ে মনপ্রাণকে রঞ্জিত করে রাখে। বিভিন্ন সুরে হঁওলা গাওয়া হয়। পূর্বপুরুষদের আমল থেকে এসময় পর্যন্ত হঁওলা মানুষের হৃদয় আসনে আজও আসন গেড়ে আছে। তবে ইদানীং আধুনিক সংস্কৃতির ছোঁয়ায় হঁওলা শহরাঞ্চলে মুখ থুবড়ে পড়লেও গ্রামঞ্চলে তার আসন পূর্ববৎ অটল ও অনঢ়। ঐতিহাসিক হঁওলাগুলো অতীতের অনেক অজানা অচেনা ও তথ্যাদির সন্ধান দিয়ে আমাদের জ্ঞানের পথকে প্রশস্ত ও সুগম করে দেয়। গ্রামাঞ্চলে এমন পরিবার বা পরিবারের মেয়েলোক নেই, যারা হঁওলা কিছু না কিছু হলেও গাইতে পারদর্শী। আবহমান বাংলার লোকসংস্কৃতিতে হঁওলার স্থান অনেক উর্ধ্বে। দলীয় ও একক সংগীত হিসাবে হঁওলা গাওয়ার রেওয়াজ কক্সবাজার জেলায় বহুলভাবে প্রচলিত। কোনো গৃহস্থের বাড়িতে বিবাহ উৎসবের আয়োজন হলে অথবা কোনো মেয়ের কানছেদা অথবা ছেলের খৎনার আয়োজন হলে হঁওলার ধুম পড়ে যায়। সমবয়সী মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন রকমের হঁওলা পরিবেশন করে পাড়া-পড়শীকে মাতোয়ারা করে তুলে। ইহা ছাড়া পুরুষ গায়কেরাও মোম, ঝাঁজ, জুরি ইত্যাদি বাজিয়ে হঁওলা গেয়ে গৃহস্থের বাড়ির প্রাঙ্গণ মাতিয়ে তুলে।

রকমারি সুরে হঁওলা গাওয়ার সঙ্গে নৃত্যেও মেতে উঠে শিল্পীরা। হঁওলা গানের মেঠো সুর এবং ছন্দ শ্রোতাদের নির্বাক করে রাখে। জেলার প্রত্যন্ত জনপদে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় বেশ কটি হঁওলা হচ্ছে ধনাইর হঁওলা, শালা-বনাইর হঁওলা, বর্মীরাজার হঁওলা, কাসিম রাজার হঁওলা, সোনাই বিবির হঁওলা, কায়াপুথির হঁওলা, ছেমদ্দয়ার হঁওলা, নূরুর হঁওলা, তৈয়াবার হঁওলা, পরীবানুর হঁওলা, ধলীবগার হঁওলা, বহুল আলোচিত মলকা বানু ও মনুমিয়ার হঁওলা, আতুরার হঁওলা, ওন্দুরার হঁওলা, কোকিলার হঁওলা, শান্তির হঁওলা, ভাডইর হঁওলা, সুরুর হঁওলা, দুলা কামানি হঁওলা ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত হঁওলাগুলি এ জনপদে বহুল প্রচলিত ও জননন্দিত। হঁওলার সুতিকাগার হচ্ছে আরাকান এলাকা। এ এলাকা থেকে হঁওলা ছড়িয়ে পড়েছে চট্টলার বিস্তৃত জনপদে। প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব থেকে হঁওলার জন্ম বলে গবেষকদের

www.pathagar.com

ধারণা। প্রকার ভেদে হঁওলা দুই প্রকার।

১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট ও ২. চলতি বিষয় তথা প্রেম-পিরিতি, ভালোবাসাসহ হরেক রকমের বিষয় নিয়ে সৃজিত অন্যান্য হঁওলা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সৃজিত হঁওলার মধ্যে রয়েছে, যেমন 'মনুমিয়া ও মলকাবানু'র হঁওলা', 'কাসিম রাজার হঁওলা'। ঐতিহাসিক হঁওলা তথ্যবহুল এবং কাহিনিভিত্তিক।

২. অন্যান্য হঁওলা : হঁওলাগুলো সাধারণত কাহিনিভিত্তিক ও তথ্যসমৃদ্ধ। তবে রূপ-রস-গন্ধে ভরা। বিরহ গাঁথায় সমৃদ্ধ। বহুল আলোচিত স্বামী/স্ত্রীর প্রেম, ভালোবাসা ও বিরহ সমন্বিত ধনাই বিবির হঁওলাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

**ধনাই'র হঁওলা**

অরে... ধনাইর কাঁদনে ধনাইরে...
আদল ধনাই গাছের লে পাতা ঝরে
ভাসি যায় জোয়ারের পানিরে (২)
সদাইরে উজান চলেরে...মর হায়... হায়রে।
অরে...ন'কাইন্দ ন'কাইন্দ ধনাইরে
আদল ধনাই ন'ভাইঙ্গরে তর গলা
আইক্যাবত্তুন আনি দিয়ম, রেঙ্গমত্তুন আনি দিয়ম
সোনার কণ্ঠ মালারে..মর..হয়..হায়রে...॥
অরে ন'চাইয়ম তোর সোনা চান্দিরে
অ সাধু ভাই ন'থাইক্যম তোর ঘরে
এবার পন্থে যাইয়ম সাধুরে (২)
দুইখ্যারে বাপ মার দেশেরে...মর হায়..হায়রে॥
অরে আগে'ত ন'হইলা ধনাইরে
আদল ধনাই তোররে কেউ নাই..
এবার কিল্যাই কান্দর ধনাই (২)
বুঝাই ক'না' মোরে মর.. হায়...হায়রে...।
অরে আবাল কালে আইনল্যা সাধুরে
অ সাধু ভাই ছাওয়াল লে'লইলাম কোলে
এবার পন্থে যাইয়ম সাধু ভাইরে (২)
দুঃখ্যারে বাপ মার দেশে রে... মর হায় হায়রে।
অরে তুই নাইয়র গেলে ধনাইরে
আদল ধনাই আমার লে কথা ধর
সোনা রুপা এরি যাগৈ বইন (২)
সন্দুকে পাসরিরে মর..হায়.. হায়রে।
অরে কি'না কথা কইলা সাধুরে..
অ সাধু ভাই মুখে নাই তোর শরম
সোনা রুপা রাখি গেলেরে (২)

www.pathagar.com

ন' যাইয়ম লে বাপ মার নাইয়র রে
মর মর হায় হায়রে ।
অরে তুই নাইয়র গেইলে ধনাইরে
আদল ধনাই আমার লে কথা ধর
বিয়ার শাড়ি এরি যাগে বইন (২)
ধরনী'রে পাসরিরে
মরে হায় হায়রে... ।
অরে তুই নাইয়র গেলে ধনাইরে
আদল ধনাই আমার লে কথা ধর
দুধের ছাওয়াল এরি যাগেরে বইন (২)
ঢোলুইনর পাসরিরে
মর হায় হায়রে... ।
অরে কি'না কথা হৈলা সাধুরে
অ সাধু ভাই কি শুনাইলারে মোরে
দুধের ছাওয়াল এরি গেইলে (২)
ন' যাইয়ম বাপ মার দেশেরে
মর হায় হায়রে... ।
অরে তুই নাইয়র গেলে ধনাইরে
আদল ধনাই পালংরে অইব খালি
অ সাধু ভাই ন'পাইলাম তোর শোকর (২)
মাইজ্যাবইন বদলী দিয়ারে
খুইল্যা বইন বদলী দিয়ারে
ন' যাইম'লে বাপ মার নাইয়র রে
মর হায় হায়রে... ।
অরে তর বাপ মা গেইয়ে মরিরে
আদল ধনাই প্রথম'লে বৈশাখ মাস (২)
চিহ্ন নাইঃ পরিচয় নাইরে (২)
তুই রে কড়ে যাইবারে
মর হায় .. হায়রে... ।
অরে ন' থাকিলে মোর বাপ মারে
অ সাধু ভাই চাইয়ম'লে বাপ মার রাজ্য
তবে একবার যাইয়ম সাধুরে (২)
দুইখ্যা'রে বাপ মার দেশেরে
মর হায়.. হায়রে... ।

এরপর একটি **'দুলহাকামানি হঁওলা'** পরিবেশিত হল ।

মাথার অ'না টুপি আইনলাম দাবান'লে (২)
অরে দাবান রইস্যা

www.pathagar.com

রইস্যা দুলার পৈরনে
সাজুক সাজুক দুলা
সাজুক সাজুক দুলা
অমর হায় হায়রে...
সাধু ভাইরে ঐ না গোসলের ঘাটেরে
মর হায় হায়রে...
কাধর না চান্দর আইন্যম দাবান'লে (২)
অরে দাবান রইস্যা
রইস্যা দুলার পৈরনে
সাজুক সাজুক দুলা
সাজুক সাজুক দুলা
অমর হায় হায় রে...
সাধু ভাইরে ঐ গোসলের ঘাটের
অমর হায় হায়রে...
গায়ের অ'না গন্‌জি আইন্যম দাবান লে (২)
অরে দাবান রইস্যা
রইস্যা দুলার পৈরনে
সাজুক সাজুক দুলা
সাজুক সাজুক দুলা
অমর হায় হায়রে...
সাধু ভাইরে ঐ না গোছলের ঘাটেরে
অমর হায় হায়রে...
বেলা মার্কা জামা আইন্যম দাবানলে (২)
অরে দাবান রইস্যা
রইস্যা দুলার পৈরনে
সাজুক সাজক দুলা
সাজুক সাজুক দুলা
অমর হায় হায়রে...
সাধু ভাইরে ঐ না গোসলের ঘাটেরে
অমর হায় হায়রে...
হাতি মার্কা লুঙ্গি আইন্যম দাবানলে (২)
অরে দাবান রইস্যা
রইস্যা দুলার পৈরনে
সাজুক সাজুক দুলা
সাজুক সাজুক দুলা
অমর হায় হায়রে...
সাধু ভাইরে ঐ না গোসলের ঘাটেরে

www.pathagar.com

অমর হায় হায়রে...
পায়ের না জুতা আইন্যম দাবান লে (২)
অরে দাবান রইস্যা
রইস্যা বন্ধুর পৈরনে
সাজুক সাজুক দুলা
সাজুক সাজুক দুলা
অমর হায় হায়রে...
সাধু ভাইরে ঐ না গোসলের ঘাটেরে
অমর হায় হায়রে...
হাতেরঅ' না ঘরি আইন্যম দাবান লে (২)
অরে দাবান রইস্যা
রইস্যা বন্ধুর পৈরনে
সাজরে সাজুক দুলা
বিয়ার সাজন সাধু সাজেরে
অমর হায় হায়রে...॥ "[২৭]

## ৬. ভাটিয়ালি

লোকসংস্কৃতির আর একটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে হাইল্যাগীত বা ভাইটাইল্যা গীতি। মোহনীয় সুর এবং ছন্দে এ গীতি পরিবেশিত হয়। বর্তমানে এই হাইল্যাগীতি বা ভাইটাইল্যা গান বিলুপ্তির পথে। বাংলদেশের ভাটি অঞ্চলেই ভাটিয়ালি গীতের প্রচলন বেশি লক্ষণীয়। কক্সবাজার অঞ্চলে ভাটিয়ালি গীত নাই বললেই চলে। তবে ভাটিয়ালি গীতের আদলে হাইল্যাগান গীত হয়। বিগত কয়েক দশক আগেও কক্সবাজারে হাইল্যাগান শ্রুত হতো। কৃষক, শ্রমিক বা কামলা, মজুররা জমিতে ধান রোপন করতে গিয়ে মনের আনন্দে এবং একঘেয়েমি কাটানোর জন্য এই গীত পরিবেশন করতো। আগেকার দিনে জমিতে চাষাবাদের কাজ করার সময় দলীয়ভাবে হাইল্যাগান গেয়ে আনন্দ-উচ্চকিত মনে ধানের রোয়া (চারা) রোপণ করতো। দেশের সর্বত্র অঞ্চলভিত্তিক লোকসংস্কৃতির বাহন হিসাবে এসব লোকগাথা প্রচলিত থাকলেও কক্সবাজার জেলার লোকগাথাগুলো স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। এ গীতগুলোর মোহনীয় সুর এবং ছন্দ শ্রোতাকে বিমোহিত করে রাখতে সক্ষম। সুরের ব্যঞ্জনায় উদাস হয়ে যায় হৃদয়-মন। কেবল প্রাণভরে শুনতে ইচ্ছে করে। কক্সবাজার জেলায় হাইল্যাগীতিকে হাইল্যা সারিও বলা হয়। সারিবদ্ধ শ্রমিক, কৃষক, মজুরেরা ধানের চারা রোপণ করার সময় এগান গেয়ে থাকে। সারিবদ্ধ এবং একই সাথে এই গান গীত হয় বলেই হাইল্যাগীতকে 'হাইল্যাসারী'ও বলা হয়। এসময় শ্রমিক, মজুরেরা বাম হাতের মুঠিতে (জালার বাটি) ধানবীজ (চারা) রেখে ডান হাতে রোপণ করার সময় একজন দাঁড়িয়ে সুউচ্চ স্বরে গেয়ে উঠে এবং পর পর অন্যরা দলীয়ভাবে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠে হোঃ ... হাঃ ... হিঃ ... শব্দ করে হাইল্যা গীতে। অপূর্ব এ দৃশ্য, এ মোহনীয় সুর !

www.pathagar.com

**যেভাবে গাওয়া হয় এ গীতি**

বিত্তবান কৃষকেরা সাধারণত এতদঞ্চলে হাইল্যাগীতের আয়োজন করে থাকে। উত্তমরূপে চাষ দেয়ার পর জমি ধানের বীজ বা চারা বা জালা রোপন করার উপযুক্ত হলে, তখনই শ্রমিক, মজুর বা কৃষকেরা এ হাইল্যা গেয়ে থাকে। (১) কোনো গৃহস্থের বৃহত্তর পরিসর জমিতে ধান রোপণ করতে অধিক শ্রমিক একজোট হলে তারা তাদের মনের আনন্দে স্বেচ্ছায় এ গান পরিবেশন করে থাকে। (২) কিন্তু ২য় পর্যায়ের কার্যক্রমে শ্রমিকেরা ধান রোপণে দিনভর কাজ করেও কোনো পারিশ্রমিক দাবি করতে করতে পারে না। এটার পেছনে কারণ হচ্ছে, বিনা পারিশ্রমিকে যারা গৃহস্থের ডাকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে আসে তাকে এতদ্বঞ্চলের 'বিয়ার ডাকা' বলা হয়। বিয়ার ডাকলে বিনা পারিশ্রমিকে সবাই মিলে হাইল্যা গীতি গাইতে গাইতে ধানের বীজ রোপাণের কাজ শেষ করে থাকে। বিয়ার ডাকা হলে গৃহস্থের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। গরু অথবা ছাগল অথবা মোরগ জবাই করে দু'বেলা পেটপুরে খাবার দেয়া হয়। এ রেওয়াজ জেলার সর্বত্র এক সময় প্রচলিত ছিল। ধান রোপণ শেষ হয়ে গেলে গৃহস্থের বাড়িতে রাতভর চলে আনন্দ স্ফুর্তি। সেখানে শ্রমিক, মজুর, কৃষক কা গেরস্থ ঝাঁজ, জুরি ও মোম বাজিয়ে ছন্দের তালে তালে হাইল্যাগীতি পরিবেশন করে রাত মাতিয়ে রাখে। এ দৃশ্য যারা একবার প্রত্যক্ষ করেছে তাঁরা কোনো দিন ভুলতে পারবে না। মনোমুগ্ধকর এ গানের আয়োজন। এ আয়োজনে একজন হাইল্যা বা শ্রমিক গান ধরে, যেমন :-

'কৈ মাছর ঝুল ন খাবালি রে...বলে।
অ ডাইয়া পেড়ত লাইগ্যে ভুক
আর কতকাল থাইক্যম গরিব ন'খন্ডিল দুখ।
রঙ্গের আলবেলা
নারীর বুকে নারঙ্গ কমলা আ হায়রে...
কলিকা কলিকা খালা ধরে নানান বেশ
খালা যদি সুন্দর অইতো ন' রাখিত দেশ।

আবার সবাই একই কণ্ঠে গেয়ে উঠে মধুর সুরে হাইল্যা গীত। এ গীত অবশ্য বিরহ/প্রেম/মিলন/যন্ত্রণারও হতে পারে।"[২৮] এক যুবতিকে নিয়ে রচিত একটি হাইল্যা গীতি নিম্নে প্রদান করা হলো। এ গীতটি সংগৃহীত রচয়িতা কে কেউ জানে না।

হাইল্যা গীতি

আছরঅত্ত হৈয়ে বেইল, মাথায় লাগাই খুশব তেল, (২)
পিতলা কলসি লইয়া জল ভরিতো গেল ।
হায় হায় রে মর ...ঐ
অভাইরে... ছকিনা বইনে খবরদার (২)
পানিল্লাই ন'যায় আর (২)
তিনজনেতে ছল্লা গইজ্জে ধরিত এবার (২)
হায় হায়রে মর...
অভাইরে ...ডে'নাতে ঘুরাইয়ে জল,

www.pathagar.com

বা'মাতে লাগায়ে কল (২)
ডে'নডাকন্দি ধইজ্জে টানি আদ্দবের আঞ্চল (২)
হায় হায়রে মর...
অভাইরে ...আঞ্চল দইজ্জে আদ্দবে,
বিয়া ন'দের মা বাপে (২)
যুবক গরি ঘরে রাইক্ষে দারুণ মা বাপে (২)
হায় হায়েরে মর ...
অভাইরে... যুবক নারী'যে রাখে (২)
তারত্তুন বেকুপ ন'থাকে (২)
চালর রোয়া যারগৈ ফাঁড়ি নারীর নিয়াসে (২)
হায় হায়রে মর...
অভাইরে ...যুবক নারীর যুবক কাল (২)
নিত্তি চোখের কোণা লাল (২)
যুবক হয়ে বার বছর থাইক্যম কতকাল (২)
হায় হায়রে মর...
অভাইরে ...যুবক নারীর সিনা টান (২)
হাসি হাসি চাবার পান (২)
আংকি টারে ভুলিই নিল রসিকের পরাণ (২)
হায় হায়রে মর...
অভাইরে... যুবক নারী যে রাখে (২)
তারত্তুন গাধা' ন থাকে (২)
চালর রোয়া যারগৈ ফাড়ি নারীর নিয়াসে (২)
হায় হায়রে মর... "[২৯]

হাইল্যা মানে রাখাল। মাঠে যে গরু চরায়। আবার হাইল্যা মানে ধাধা কৃষিশ্রমিক যারা মাস ভিত্তিতে বা মওসুম ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বেতনে নিয়োজিত হয়। দিন ভিত্তিতে যে কৃষি মজুর নিয়োগ করা হয় তারা হলো গবুর (কামলা)। সাধারণত চাষাবাদের কাজ যতদিন চলবে ততোদিনের জন্য যে মজুর রাখা হয় তাকে বলা হয় হাইল্যা। আবার মাঠে যারা গরু চরায় তাদেরকেও হাইল্যা (রাখাল বালক) বলা হয়। দুপুরবেলা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে বসে হাইল্যারা যে গান গায় তাও হাইল্যাগীত। দুপুরে ক্লান্ত রাখাল গাছের সুশীতল ছায়ায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে মনের আনন্দে অথবা কেউ হয়তো মাটির বাঁশি বা কলাপাতার বাঁশিতে মধুর সুর তুলে। আর কেউবা সুউচ্চ কণ্ঠে গেয়ে যায় ভাইটাইল্যা গীতি। এ ধরনের আর একটি হাইল্যাগীতি বা ভাইটাইল্যা গীত নিচে প্রদান করা হলো। ঐতিহাসিক ইসলামি ঐতিহ্যকে নিয়ে হাইল্যার মুখে শ্রোত ভাইটাইল্যাগীত নিম্নরূপ :

### আবু শামার ভাইট্যালি

কথিত আছে ইসলামের ২য় খলিফা হযরত ওমর রা. মুসলিম জাহানের খলিফা হিসাবে দায়িত্ব নেন। তিনি একজন সুদক্ষ রাষ্ট্রপরিচালক ও ন্যায়বিচারক হিসাবে ইসলামের

www.pathagar.com

ইতিহাসে চির ভাস্বরমান ঔজ্জ্বল্যতায় প্রজ্জ্বোলমান। তাঁর একমাত্র পুত্র হযরত আবু শামা ছিলেন ধর্মভীরু এক যুবক। তাঁর সুরেলা কণ্ঠে পবিত্র কুরআন পাঠ শ্রোতাকে বিমোহিত করে রাখতো। সহজ সরল প্রাণের অধিকারী এ যুবক শয়তানের চক্রান্তে বিপথগামী হয়ে ভুলপথে পা বাড়ায়। এ ভুলই তাঁর জীবনে হয় কাল। ন্যায়বিচারক কাজী হযরত ওমর রা. তাঁর পুত্রকে ভুলের জন্য এতটুকু সহানুভুতি প্রকাশ করেননি। শরিয়তের নির্ধারিত আইনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্রের। সেই এক ঐতিহাসিক ন্যায়বিচার। রসিক উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করেছেন মনোহরা এক ভাইট্যাইলি গীত। সেটি নিম্নরূপ-

অ শ্যাম রে...
ওমর কাজীর বেটা ছিল, আবুল শামা তাঁর নাম ২ বার
শুক্রবারে জোঁয়ার আগে পইত্যরে কোরআন। হায় হায়রে মর...
এমন পরা পইত্য কোরান, ডেবায় লইয়ে খান্ খান্ ২ বার
দরিয়ার ভাটা পানিরে চলাইত উজান। হায় হায়রে মর...
দুয়াইন্যার বেশ ধরি, শরবত বেচের হাঁক মারি ২ বার
আবুল শামা খাইয়ে শরাব, শরবত বলি। হায় হায়রে মর...
যখন শরাব খাইল, নেশায় মাথা ঘুরিল ২ বার
আস্তে আস্তে ঢলি শামা পন্থে চলিল
যাইতে যাইতেরে কদ্দুর যায়, পিজারা কন্যার লাগত পায়। ২ বার
শ'তানে ভুলাইয়া নিল পিজারার বাসায়। হায় হায়রে মর...
শ'তানে তারে ভুলাইয়া, এক বিছানাত শুইয়া ২ বার
আবুল শামা হইল দোষী শরাবে মাতিয়া। হায় হায়রে মর...
যখন বিআন হৈইল, প্রেমের নেশা কাড়িল ২ বার
নিশি রাইতর কথা সামার মনেতে পরিল। হায় হায়রে মর...
তুমি হইলারে উম্মর কাজী, বিচার গর ঠিক ভাবি ২ বার
তোয়ার ছেলে আবুল সামা হৈল গেল গৈ দোষী। হায় হায়রে মর...
উম্মর কাজী হৈল রাগ, সোয়া লইয়ে চিলা পাক ২ বার
এক'শ দোরা মারি বল্যায় গরে মেড়ি ফাঁক। হায় হায়রে মর...
ষাইট দোররারে যেমন তেমন, চল্লিশ দোররা আখেরী ২ বার
সহিতে না পারি সামা গেইয়ে গৈ মরি। হায় হায়রে মর..."[৩০]

এ ধরনের আরও অনেক লোক গাথা রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির কারণে আর লিপিবদ্ধ করা গেল না। তবে কর্তৃপক্ষ যদি এ সমস্ত হাইল্যাগীত সংগ্রহে উদ্যোগী হন তবে লোকসাহিত্যের পরিসর আরও বলবৎ হবে।

**উনষাটমগীর তুয়ানর ভাইট্যালি**

প্রবাহ: অনেক দিনের পুরনো ৫৯ মগীর এ ভাইট্যালি গানটি। এটা অবিকৃত থেকেও সময় পরিবর্তনে কিছুটা বিকৃত। বৃহত্তর আরাকান রাজ্যে উনষাট মগীতে এক মহাপ্রলয়ঙ্কারী ঝড় কক্সবাজার-চট্টগ্রাম জেলাসহ বার্মার আরাকান উপকূলে আছড়ে

www.pathagar.com

পড়েছিল। নিকট অতীতে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ঝড়-ঝঞ্ঝা তেমন একটা হওয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের জানা নেই। ৫৯ মগীর প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। বারো হাত উচু সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল অসংখ্য ঘরবাড়ি ও গবাদি পশু। প্লাবিত হয়েছিল বার্মার মংডু মহকুমাসহ আরাকানের ছোট আনক ও বড় আনকের বিস্তৃত বসতবাড়ি। মানুষের দুঃখ দুর্দশার কোনো পরিসীমা ছিল না। সহায় সম্পদহারা মানুষেরা ভেসে বেড়াচ্ছিল অথৈ পানিতে। এ ঝড়ে প্রায় চৌদ্দ হাজার মানবসন্তান প্রাণ হারিয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। ভয়াবহ এবং ইতিহাসখ্যাত এ প্রলংয়করী ঝড়টি ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসের কোনো এক শনিবার এবং মগী সনে ১২৫৯ মগীতে সংগঠিত হয়। এ ঝড়ের তাণ্ডবতা নিয়ে রচিত ভাইট্যালি গীতটি নিম্নরূপ :

শুনরে খবরলে ভাইয়ান, জানরে পরিমাণ
উনষাট মগীর তুফানর কথা, করিতাম বয়ান॥
সেদিন আছিল শনিবার, মেঘে গইজ্জেরে অন্ধকার
হাওয়ার সনে সেই মিউলা, গগনে বেড়ার॥
বয়ারেরঅ আলামত, উইট্টে বয়ার পুগনত্
আগুনের কয়লার মত, পইজ্জে জমিনত্॥
বয়ার আইস্যে পুকারী, মাইজ্জে ছোলা জোরগরি
বড় বড় বট বৃক্ষ, ফেইল্লে উখারী...॥
উখারীয়া ফেলাইল, টইনর ছানি ভাঙ্গিল ২ বার
লেমিশ গাছর আগা লই যাই, সাম্পান বাজ্যাইল॥
পচ্চিমালী আভা পাই, বাহারাত্তুন পানি আই ২ বার
ছোট আনক মংডু জিলা, লই যারগই ভাসাই॥
পানি উইট্টে বার হাত, ছালত্তুন মাইজ্জে ঝাঁপ ২ বার
কড়ে গেলগৈ ভাই বেরাদর, কডে গেল মা বাপ্॥
কিয় রইয়ে গাছ ধরি, কিয় রইয়ে বাঁশ ধরি ২ বার
বেড়িয়াইন্দর দুধর ছাওয়াল গেইয়ে গৈ মরি॥
কিয় রইয়ে ভাসনত, কিয় রইয়ে ডুবনত ২ বার
ভাসি ভাসি যারগই তারা, পাঁচ কল্মা মুখত॥
আইছ্ সোরাতা, ডেউরতলঅ, পাড়া বাইন্ধে সুর গরী ২ বার
মরার গলাত ছুরি লাগাই, গুয়ানা লর্ কাড়ি॥
মরা মাইনষ্যে ছ'য়াল গরে, না পাক বন্দা ন ছুইছ মোরে ২ বার
তোর বাপ দাদার কর্জ নাইরে, আমার উপরে॥
শুদ্ধ বাপর জর্ম অইতো, ভালা কাম্মান তে গইত্য ২ বার
আগা পাছা খিরকা চালায়, দাফন গরিত॥
আহারে পুরিক্ষা ভাই, বুচিদং তো আইল ধাই ২ বার
সিদ্দার পাড়া ডেইলর মধ্যে, তাম্বু টাইকতাম যা॥
তাম্বু টাইক্যে ভালা কাম, বারি গেলগৈ মিয়ার নাম ২ বার
হাজার টিয়া খরচ গরি, জুরাইল সুনাম।"[৩১]

www.pathagar.com

## ৭. জারিগান

গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম একটি শাখা হলো জারিগান। জারির শাব্দিক অর্থ কান্না। সুরেলা কান্না। অর্থাৎ জারি করে সুর করে কান্না করা। তবে জারির অর্থ কান্না হলেও উচ্চস্বরে বা নিম্নস্বরে কান্না করা নয়। জারিতে কান্নার ভাবটা নিহিত থাকে মাত্র, যা গাইতে কান্নার সুর অনুভূত হয়, চাপা কান্নার ধ্বনি অনুরণিত হয়। জারির শাব্দিক অর্থ কান্না হলেও জারি কান্না নয়, মর্মস্পর্শী সুর মাত্র। অর্থ, তথ্য এবং তাত্ত্বিকতায় সমৃদ্ধ জারি শুধু লোকসংস্কৃতির নয়, আধুনিক সংস্কৃতিরও অমূল্য উপাদান। আধুনিকতার উগ্র ছোঁয়া পেয়েছে জারি, তাই জারি এখন কারও কান্নার খোরাক নয়। জারি এখন বহুবিধ যন্ত্র সমন্বয়ে গাওয়া হয়।

কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উচ্চারণ কণ্ঠে জারি সীমাবদ্ধ নয়। অঞ্চলভিত্তিক জারি বা ধর্মীয় জারি অথবা কোনো মহৎ ব্যক্তির জীবনালেখ্য নিয়ে জারি গাওয়া হয়। যেমন পিতা-মাতার জারি, হাসান-হোসেনের জারি, বড় পীরের জারি, মা ফাতেমার জারি, হরিণের জারি, হযরত বেলালের জারি, রহিমা বিবির জারি, আয়ুব নবীর জারি, ছালে জঙ্গীর জারি ইত্যাদি জারিসমূহ ক্যাসেটাবদ্ধ অবস্থায়ও এখন পাওয়া যায়। বর্তমানে জারি আধুনিকতার রূপ পরিগ্রহ করে দেশাত্মবোধক জারি, শিক্ষা ও কৃষি বিষয়ক জারি, বৃক্ষরোপনের জারি, ষড়ঋতুর জারি ইত্যাদি আধুনিক সুর এবং ছন্দে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে মাতিয়ে রেখেছে। কক্সবাজার জেলায় এ রেওয়াজ অব্যাহত রয়েছে। তবে স্থানীয়ভাবে কোনো জরি সৃষ্টি হয়নি বা কেউ লিখেনি। অন্যান্য অঞ্চলের জারিগুলো এখানে গীত হয়। এ অঞ্চলে আগেকার দিনে যে সমস্ত জারি গাওয়া হতো তাতে পিতা-মাতার জারি, হাসান-হোসাইনের জারি, মা ফাতেমার জারি, রাবেয়া বসরী ও হাসান বসরীর জারি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল।

### পিতা মাতার জারি

আচ্ছালামু আলায়কুম, আশেকান দর্শকমণ্ডলী, ভাই বন্ধুগণ। মোমেন মুসলমান আর রাসূলের উম্মত। প্রত্যেকের কাছে আমার সালাম রইল। লেকিন আমি গান গাইতেছি মা-বাপের দুঃখের জারি এবং তার ভিতরে কি ঘটনা আছে আপনারা শুনেন তাড়াতাড়ি। আল্লাহ্‌র নূরে রাসূল পয়দা, রাসূলের নূরে আঠার হাজার মাখলুকাৎ পয়দা শুনেন প্রাণের ভাই।

এইগুলা কুরআনের বয়ান আপনারা জানতে পারবেন ভাই॥

আলেম, উলমা, হাফেজক্কারী, মওলানা, মুন্সী, হাদিস কুরআন কিতাব হইতে অনারারে সব সময় জানাই॥

মিলাদ মাহফিল, মিলাদ শরীফ ওয়াজ মাহফিল অনারা ফুইনন,

মা বাপরে সেবিলে আল্লাহরে পায়।

মা-বাপ দুঃখ পাইয়া যদি একটা নিয়াশ (নিঃশ্বাস) ফেলে যায়। তোয়ার জিন্দাগীর এবাদত নাশ গরি দিব দয়ালরে আল্লাহ॥ "আল্লাহ্ উন্নিশ/তোর মা-বাপ বিশ/ তোর মা-বাপরে খুশি গরি আঁরে ডাকিলে আল্লাহ্ রাসূল আঁরা বিয়াগগুন, খুশি অইয়ম। ঘরত চেরাগদ্দি, মসইদত চেরাগ দিলে ঘররে দুঃখত রাখিয়া আল্লাহ্‌র নামে ফানাফিল্লাহ অইলে ঐগুলা কাটাক এবাদত আল্লাহ্‌র কুরআনে ফরমায়। ..."[৩২]

এভাবে সুর ছন্দ ও তাল দিয়ে গাইতে গাইতে জারি একসময় শেষ হয়ে যায়। বেহালা

www.pathagar.com

বাজিয়ে জারিগান পরিবেশন করা হয়। কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার উপকূলীয় জালিয়াপালং ইউনিয়নের মনখালি গ্রামের মোস্তাক আহমদ একজন জারি গায়ক।

## ৮. গাজির গান

"গাজীর গান সপ্তদশ শতকের বাঙলার মুসলমান সমাজে পূজিত গাজী পীরের লৌকিক-অলৌকিক কাহিনিকেন্দ্রিক কৃত্যমূলক 'পীর পাঁচালী'। মুসলমান সমাজের নিত্য অভাব ও অভিঘাতজাত গাজীপীর হিন্দু উপকথার বর্ণিত সত্য-নারায়ণ কিংবা অন্যান্য রীবগাথার অনুসরণে রচিত হয়ে আজ কিংবদন্তি এবং তৎকালে জীবন্ত সত্য বলে প্রতিভাত। গাজীর জীবনকাহিনি কবিকল্পিত হলেও ইতিহাসের গাজী নামের কোনো বীরের আদলে তাঁর অবয়ব গঠিত হয়েছে এ ধারণাটিও সমধিক প্রচলিত। গাজী পীর, সত্যপীর, মানিক পীর, খোয়াজ খিজির, বড়পীর, দমের মাদার প্রমুখ পীরের জীবন কাহিনি অবলম্বনে অন্ত্য-মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে জারিগান, ব্রতকথা এবং পাঁচালি নির্ভর আখ্যান নির্মিত হয়েছে। হয়তো এই পীরদের মধ্যে কেউ প্রবলভাবে অস্তিত্বমান ছিলেন তৎকালীন সময়ে। আবার কোনো পীরের উদ্ভাবন ঘটেছে লোকমানসে। গাজীকে কেন্দ্র করে রচিত গাজীর গান পাঞ্চালি অর্থাৎ 'তা আসরে নৃত্য-গীত-অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশনযোগ কাব্য এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। গাজীর জীবনকেন্দ্রিক কিংবা প্রসঙ্গ ভিত্তিক দু'ধরনের কাহিনির সন্ধান মেলে, (ক) গাজীকালু চম্পাবতী পুথির লেখ্যরূপ। (খ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত মৌখিক রীতির আখ্যান, জামাল-কামাল', আফতাব-মাহতাব' দিদার বাদশাহ' প্রভৃতি পালা।"[৩৩]

"গাজীর গানের প্রচলন রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। গাজীর গানের পরিবেশন রীতিতেও রয়েছে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা। গাজীর গানের বর্ণনাত্মক অভিনয়ে 'পাঁচালির আঙ্গিকগত অদ্বৈতরূপটি' যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি আবার গায়েন-দোহারের আলাদা অভিনয় গাজীর গানকে পাঁচালির ধারা থেকে চরিত্রাভিনয়ের ধারায় পর্যবসিত করেছে একথা সত্য। গাজীর গানে গায়েন এবং দোহার অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে মুহূর্তে, আলাদা হয় তার পরের মুহূর্তে মিলায় অদ্বৈতরূপে। এদের যুগপৎ ভূমিকা পাঁচালির আবরণে গাজীর গানের কাহিনিকে নাট্য সংঘাত ও দ্বন্দ্বমুখর করে তোলে।"[৩৪]

সাধারণ মানুষের মাঝে এলাকাভেদে গাজির পালা, গাইনের তামাশা, গাইনের পালা, গাজির গীত ইত্যাদি নামে এগুলো পরিচিত ছিল। *'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য'* গ্রন্থের লেখক কবি ওহীদুল আলম গাজির গানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে– 'ধর্মযুদ্ধে যারা লড়াই করে, বীরত্ব দেখায় তাঁরা গাজি, তাই গাজির গান বীরত্বব্যঞ্জক গান। ইহাতে লড়াইর বর্ণনা, শৌর্য বীর্যের কাহিনি বর্ণিত।' কিন্তু গবেষক আবদুল হক চৌধুরী ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, 'গাজির গানে পালাগায়কই গাজি।'"[৩৫]

লোকবিশ্বাস মতে, গাজি হলেন গায়েবী পীর। সেকালে গ্রামের জনসাধারণ রোগমুক্তি, সন্তান কামনা ইত্যাদির জন্য গাজী পীরের মানত করতো এবং এজন্য গাজির গানেরও আয়োজন করত। গাজির গানের মূল গায়ককে 'গায়েন' বলা হয়। একজন গায়েন 'নাউট্যা পোয়া' বা নাচুয়া বালক বা লেটুর দলের বালক, দোহারী ও 'বাইন' বা বাদক নিয়ে গাজির গানের দল গঠিত হতো। এদেশে গণমানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, ডাকাতের হৃদয় পরিবর্তনের কাহিনি বা নানা উপকার নিয়ে গাজির গান রচিত ও গাওয়া হতো। বিচিত্র ধরনের লুঙ্গি, রঙিন পাজামা, পাঞ্জাবি, ঢোলা লম্বা আচকান, গামছা পরে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে গাজির গানের মূল গায়েন

www.pathagar.com

আসরে নামতেন। গজির গানে যন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, বাঁশি ও জিপসি ব্যবহার করা হতো। কক্সবাজার উপজেলার খুরুশকুল ইউনিয়নের গাজির গানের জন্য একটি গ্রামের নামই হয়েছে 'গাজির ডেটল'। ইউনিয়নের অবস্থান কক্সবাজার শহরের উত্তর পাশে বাঁকখালি নদী। বাঁকখালি নদীর উত্তর পাশেই খুরুশকুল ইউনিয়ন। ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উক্ত গ্রামটি। গ্রামের অবস্থান বাঁকখালি নদী ও মহেশখালি চ্যানেলের সংলগ্ন। বিগত শতাব্দীতে উক্ত গ্রামে জনবসতি গড়ে উঠেনি। উক্ত এলাকাটি জনবসতি থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন ছিল। লোকালয় থেকে একটু দূরে বিধায় উক্ত স্থানেই গাজির গানের আয়োজন হতো। গাজির গানের আয়োজনের কারণেই গ্রামের নাম গজির ডেটল হয়েছে। স্থানীয় ভাবে ডেইল হচ্ছে জনবসতি থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকা যা নদীর মোহনায় সৃষ্টি হয়। অবশ্যি বর্তমানে গাজির ডেইলে নয় সমগ্র বর্তমানে কক্সবাজার জেলার কোথাও গাজির গান শোনা যায় না বা গাজির গানের আয়োজন চোখে পড়ে না।

নিচের উদ্বৃতি থেকেই গাজির গানের চরিত্র সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি।

"নিজাম উদ্দিন ডাকাত ছিল
এক কম একশো খুন করিলো
আল্লাহ্ তানে আউলিয়া
বানাইলরে দিন গেল
আল্লাহ্ তানে আউলিয়া বানাইলো...॥"[৩৫]

## খ. গাথা

### হাতি খেদার গান

মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'হস্তী সম্পদই বঙ্গের অন্যতম গৌরব' এবং বাঙলীরাই' সর্ব প্রথম জগতকে হাতি ধরিবার কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন।

বঙ্গের উত্তরপূর্ব প্রান্তস্থিত গভীর অরণ্যসমূহ হস্তীজাতির সর্বপ্রধান আবাসস্থল। খৃষ্টপূর্ব চারি সহস্র বৎসর পূর্বে কিম্বা ততোধিক প্রাচীন-কালে এই সময় পূর্ব ভারতে "পালকাপ্য' নামক একজন ঋষি বাস করিতেন। শাস্ত্রী মহোদয় পালকাপ্যের রচিত '*হস্ত আয়ুর্বেদ*' নামক হস্তী চিকিৎসা সম্বন্ধীয় এক অতি প্রাচীন পুথির বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুথিখানি সংস্কৃতে রচিত হইলেও ইহার ছন্দ ও শব্দসমূহে অনার্য ভাষার অনেক নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। এদেশের প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে জানা যায় যে পালকাপ্যের মাতা হস্তিনী ছিলেন। ইহার পিতার নাম 'শ্যাম গায়ন' ঋষি। পালকাপ্য অর্ধেক হস্তী ও অর্ধেক মানুষ-এক অদ্ভুত রকমের মিশ্র আকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে আপন মাতৃকুলের চিকিৎসার জন্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত পুথিগুলির মধ্যে '*হস্ত্যায়ুর্বেদ*' মূল্যবান গ্রন্থগুলির পর্যায়ভুক্ত।

ইহার বহু শতাব্দী পরে আমরা আবুল ফজলের '*আইন-ই-আকবরী*' গ্রন্থে এই দেশের হস্তীগুলির প্রশংসার বাণী শুনিতে পাই। তিনি লিখিয়াছেন যে দিলিশ্বরের পিলখানার সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তীগুলি বঙ্গের পূর্বসীমান্তবর্তী গিরিসঙ্কুল প্রদেশ হইতে সংগৃহীত। প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, মুসলমান বাদশাহেরা একমাত্র হস্তীর লোভেই এ অঞ্চল আক্রমণ করিতেন। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ অথবা অন্য কোনোরূপ আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সহায়তার জন্য ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ অনেক সময়ে সুবর্ণগ্রাম এবং

www.pathagar.com

লক্ষণাবতীর মালিককে শতাধিক হস্তী উপঢৌকন পাঠাইতেন। প্রাচীন 'রাজমালা'য় এই সকল বৃত্তান্তের বর্ণনা আছে। যথা-

'সর্বভ্রাতৃ জিনিয়া পাইল রাজ্যস্থান
পুর্নবার গেল গৌড়েশ্বর বিদ্যমান।
বহু করি হস্তী নিল অতি বৃহত্তর
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল গৌড়ের ঈশ্বর।

মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে অধিরোহন করিয়া কয়েকটি হস্তী নজরানা সরূপ দিলীশ্বরে নিকট প্রেরণ করেন।

'গোবিন্দ মাণিক্য রাজা পুর্ণবার হৈল
তদবধি নজরানা হাতির করিল।'

প্রাচীন ইতিবৃত্তে ত্রিপুরা, আরাকান, পেগু, ব্রহ্মদেশের রাজ-রাজড়াদের মধ্যে পরস্পরের প্রীতি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য এরূপ হস্তী উপঢৌকন প্রদান করার প্রথা দৃষ্টিগোচর হয়। ১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দে চাক্‌মারাজ 'চনুই' সাময়িকভাবে আরাকানরাজের বশ্যতা স্বীকার করত তাঁহার মনস্তুটির জন্য দুইটা প্রকাণ্ড শ্বেতহস্তী চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা তখন আরাকানরাজের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। এ দুইটি শ্বেতহস্তী আরাকান পাঠাইতে কর্ণফুলী নদী পার করার পর দেখা গেল সেইগুলি বস্তুত শ্বেতহস্তী নহে; কালো হস্তীর গায়ে চূণ মাখাইয়া শুভ্রবর্ণ করা হইয়াছে। এরূপ পরিহাস ও প্রবঞ্চনার জন্য চাক্‌মা রাজাকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

১৮২১-১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম হইতে একদল লোক রামুর পাহাড়ে হাতিখেদা দিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সেখানকার মগেরা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া অর্থ আদায়ের চেষ্টা করে। ইহাতে চট্টগ্রামের তদানীন্তন ইংরেজ শাসনকর্তা নাফ্ নদীর তীরে একদল ফৌজ প্রেরণ করেন। বাস্তবিক পক্ষে এই ঘটনাটিকেও তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে।

চট্টগ্রামের পূর্বসীমান্তবর্তী শৈলমালার সঙ্গে ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশের নাতিবৃহৎ গিরিরাজি একটি সুদৃশ্য মণিমালার ন্যায় সংগ্রথিত। এইগুলি গিরিরাজ হিমালয়েরই সন্তান-সন্ততি। এই শতোহস্র ক্রোশব্যাপী অরণ্যসঙ্কুল সুবিস্তৃত গিরিভূমিতে হস্তী, শুয়ার, সিংহ, ব্যাঘ্র, গয়াল প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বিহার করিতেছে। অনেক সময় এই অঞ্চলের পার্বত্য গ্রামের কৃষককুটিরে বন্যজন্তুর ভীষণ উপদ্রবের মর্মন্তুদ কাহিনি শোনা যায়। অগ্রহায়ণ-পৌষমাসে যখন ধান পাকিতে থাকে তখন বন্যহস্তী অনেক কৃষকের সর্বনাশ করে। আমরা এখানে চাষীর একটি খেদোক্তির উল্লেখ করিতেছে

ধূয়া... নছিব হায়রে হায়
আহন মাসে খোয়া ঝরের[১] ধানে নৈল পাক
করল ডেঁয়ার মুড়ার মাঝে শুইনলুম হাতির ডাক।
পাহাড়ীর মুখ শুকাইল, খেতি গেল, ভাবনা বিস্তর
জুম্মা[২] উডিল মাচার উয়র[৩], বাঙ্গাল নৈল ঘর।
মুড়ার গুড়িৎ[৪] বাড়ী যারার হৈল তারার নোগর গেড়োৎ জান্
বনর হাতি খাইলো হায়রে, পুগর বিলর ধান।
হাইল্যা চাবার কুইশ্যাল খেতি খাইল হাতি
খোদায় দিল দাগা
পৈমাল[৫] করিয়া গেল দোনাদোনি জাগা[৬]॥

www.pathagar.com

কারো খাইল বাইয়ন মূলা,
মৈক্যাগুলা[৭] ডলি গেল গৈ ভুঁই
কাঁইচনীর মা বুড়ী বলে
আঁয়ার ছঁইয়র ডুয়া কই[৮]!
কেহ কাঁদে মাথাৎ হাত দি
নিরবধি চৈক্ষের জল ঝরে
বউ পোয়া যে মারা যাইবো
আইয়ের[৯] যে বছরে।
ঝড়ে ভিজি রইদে পুড়ি করিলুমরে চাষ
বন্‌লা হাতি যে এইবার কৈল সর্বনাশ।
ধন নাই দৌলত নাই গায়ে ছিড়া তেনা
বউয়র জেয়র বাঁধা দিয়া করিলুমরে দেনা।
কেমনে হুজিব দেন[১০] খাইল্যা রৈল গোলা
কি খাইবা সোনার মাণিক এক বছরগ্যা পোলা।
নছিবের দোষে এইবার ভাসি গেল সব
বন্‌লা হাতি যে হৈল খোদার গজব॥
এই রূপে কাঁদে চাষা হাতির পৈমালে
পাহাড়িয়া জুম্মা চাউম্মা[১১] পড়িল বেনালে।
বাঁশ কাডেয়া ছন কাডেয়ার হৈল দুর্গতি
ঢালার মুয়ৎ[১২] বন হৈলরে মাইন্‌সর গতাগতি।

আমরা পাঞ্জালিদের মুখে যে হাতি খেদার গান শুনিয়াছি, তাহার ভাষা আঞ্চলিকতায় জটিল হইলেও অতিব চিত্তগ্রাহী। ইহাদের বর্ণজ্ঞান নাই, তবুও ছন্দ এবং পয়ারের মিলের প্রতি গায়কদের আশ্চর্য লক্ষ্য আছে। উপান্ত স্বরের মিল সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার ছন্দ প্রয়োজনানুযায়ী বিদ্রুত অথবা মন্থর এবং সর্বদাই ঘটনাপোযোগী। হাতির চরিত্র, চেহারা, আবাসস্থল এবং পার্বত্যাঞ্চলে গতিবিধি সম্বন্ধে ইহারা যে বর্ণনা দিয়াছে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে,-

শুন আচানক কাণ্ড হাতির চরিত
এতো বড়ো জানোয়ার নাই পৃথিম্বিত।
হাতির ঠ্যাং দেখিতে যেমন গুদামের থম
মুড়ার পস্থৎ লাগৎ পাইলে হাতি মাইন্‌সর যম।
ডাঁহর ডাঁহর কান যেমন দুইয়ান কুলা
দাঁতাল হাতির দাঁত দুইটা মাঘ মাস্যা মূলা।
ঢেঁকির সমান ছোড়তা[১৩] তার মাথা সদাই হেট
ছোড ছোড চোগ হাতির ডোলার মতন পেট।
কে বুঝিতে পারে ভাইরে আলার কেরামত
হাতির গা দেখিলে হাতির ঘটিত বিপদ॥

এই প্রকাণ্ডকায় হস্তীগুলি দলবদ্ধ হইয়া চলে। ইহারা দলপতির ইঙ্গিত মানিয়া লয়। মানুষের অসাধ্য কর্ম কিছু নাই। ইহারা খেদা নির্মাণ করিয়া কৌশলে হস্তীযুগকে

www.pathagar.com

বাঁধিয়া ফেলে।

ঝাঁকে ঝাঁকে চলে হাতি অঘোর জঙ্গলে
খেদা বানাই ধরে মাইনসে হেক্‌মতেরি কলে।
আগাপিছা হাতির খোঁচ[১৪] এক্কই বরাবর
খোঁচ্ ধরি পাঞ্জালি[১৫] লয়রে হাতির খবর।
অঘোর জঙ্গল সেই ওর[১৬] নাই তার
দিনে রাইতে এক্কই মত গুটগুট্যা আঁধার।
এক ছড়ি[১৭] হাড়ি গেলে ছ মাসের পথ
লাখে লাখে হাতি থাকে সেই জঙ্গলৎ।
একাত্তরে থাকে হাতি এক্কই ছুলুক[১৮]
সে গহীন বনে নাইরে বাঘ আর ভলুক।
আচমানে উড়ে না পঙ্খী জলে নাইরে মাছ
উপাড়িয়া ফেলে হাতি মস্ত মস্ত গাছ।
সে জঙ্গলের কথা কি বলিব আর
হাজার হাজার মাইল নাইরে শুমার।
দক্ষিণেতে আছে জাগা 'থম্বুফালুম' নাম
সেই জাগাতে বর্মার মাইনসে করে খেদার কাম।
পোহনাপরীর[১৯] মুলুক উত্তরেতে জানি
সাদা হাতি খায়রে পুগে ঐরাবতীর[২০] পানি॥

হাতির স্থায়ী আবাসস্থলের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই নিরক্ষর গায়কেরা আমাদিগকে অপূর্ব কথা শুনাইয়াছে। চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্তবর্তী শত ক্রোশব্যাপী অরণ্য সঙ্কুল স্থানটির একটি ভৌগোলিক মানচিত্র তাহাদের বর্ণনায় পাওয়া যাইতেছে। তাহারা গাহিয়া থাকে-

কোথায় থাকে এতো হাতি, আইসে কোথা হৈতে
শুনিয়াছি থোরা কথা বুড়াবুড়ী কৈতে।

(ওরে) আচ্‌মান লাগা মুড়া আছে চাটিগাঁর পুগে
কুকী মুরুং পাহাড়ীরা দিন কাডায় সুগে।
কুকীর মুলুক ছাড়ি গেলে আছে গহীন বন
মস্ত মস্ত গাছ সেথায় বাঁশ বেত ছন।

এই অরণ্যসঙ্কুল সুবিস্তৃত গিরিভূমি হইতে দলবদ্ধ হস্তীগুলি শীত ঋতুর প্রারম্ভে খাদ্যান্বেষণে যখন চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে, তখন এদেশের শিকারীরা খেদা নির্মাণকরত হাতি ধরিবার জন্য চেষ্টিত হয়। ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় যে, এদেশের খেদা নির্মাণকারীরা বহু বৎসর পূর্বে এই বিদ্যায় যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং তাঁহাদের দ্বারা এদেশের খেদা নির্মাণের কৌশল ও শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত হইতেছে। অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে ইংল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ শিকারী ক্যাপ্টেন কল্ডওয়েল এবং তাঁহার সহকর্মীরা পূর্বভারতীয় শিকারীদের বহু

www.pathagar.com

প্রশংসা করিয়াছেন। ইহারা কয়েকজন ভারতীয় শিকারীকে খেদা নির্মাণ শিক্ষা দিবার জন্য আফ্রিকার লইয়া গিয়াছিলেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি কৌতুকপ্রদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা চট্টগ্রাম এবং তন্নিকটবর্তী পার্বত্য প্রদেশের অনেকগুলি খেদাকেন্দ্রের বিবরণ অবগত হইয়াছি। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি খেদা-কেন্দ্রের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য-

চট্টগ্রামে : গর্জনিয়ার পাহাড়, ডুলাহাজ্‌রা, চুনতির পাহাড়, খৃন্তাখালী ছড়ার প্রান্ত ভাগ, বাঙ্গাল হালিয়া, মলুয়া ছড়া।

পার্বত্য চট্টগ্রামে : মায়নীর মুখ

ত্রিপুরা রাজ্যেঃ অমর সাগর দোয়াল, মনু দোয়াল, ছাইমা দোয়াল, দেওয়াং দোয়াল, ধলাই দোয়াল, কল্যাণপুর দোয়াল, কমল খাঁ দোয়াল।

এই সকল পার্বত্যাঞ্চলে অনেকবার হাতিখেদা হইয়াছে। রাঙ্গুনিয়ার বাঙ্গাল হালিয়া নামক স্থানে কয়েক বৎসর পূর্বে এক প্রকাণ্ড হাতি খেদা হইয়াছিল। নয়াপড়া গ্রামনিবাসী মকবুল আহমদ তৎসম্বন্ধে একটি গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। অছিমিয়া নামক একজন বিখ্যাত শিকারী কীভাবে খেদা নির্মাণ পূর্বক অনেকগুলি হাতি ধরিয়াছিলেন এই গানে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ধনাঢ্য জমিদার শ্রীনীলকৃষ্ণ রায় মহাশয় এই খেদা নির্মাণের ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। অছিমিয়ার সহকর্মীদের মধ্যে মফিজুলা চৌধুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিকদার মেহের আলী সেই বনপ্রদেশে তাঁহাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। ধুঞ্চি নামক মগ গুণ্ডা হস্তীর দ্বারা পদদলিত হইলে কিরূপে সেই বনপ্রদেশের অন্ধকার রাত্রি শিকারীদের শত শত মশালের আলোকে দিনের মতন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও শত শত হিন্দু মুসলমান দর্শকগণের সমাগমে সেই লোকবিরল বনভূমি কিরূপে কয়েকদিনের জন্য জনকোলাহল মুখরিত নগরীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিল, মকবুল আহমদ প্রণীত পালাগানটিতে সেই উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই বাঙ্গাল হালিয়ার হাতি খেদা সম্বন্ধে সুযোগ্য মুসেফ বন্ধুবর লালা শ্রীযোগেশ চন্দ্র মহাশয় মাসিক ভারতবর্ষে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত অছিমিয়ার পিতার নাম গোলবদন জমাদার।

চট্টগ্রাম কেন, এই পূর্বভারতীয় হাতিখেদার ইতিহাস গোলবদনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। ৭০ কি ৮০ বৎসর পূর্বে এই গোলবদন জমাদার গর্জনিয়ার পাহাড়ে হাতি খেদা দিয়াছিলেন। ইহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা আমরা পাইয়াছি।

কাগ বাজারের[২১] বহুৎ পুগে বাগখালির আগাৎ  
অঘোর জঙ্গল আছে সেই ত জাগাৎ  
এমন গর্জন গাছ ছুঁইয়াছে আচ্‌মান।  
তার বেড় ঘুড়িতে মাইনসের লাগে এক মাধান॥[২২]  
জারৈল গাম্বারি আর গলাক বেতর বন।  
সেই জাগার খেদার কিছু কহি বিবরণ।

নুনা ছড়া আছে এক নুনা নুনা পানি।  
পৌষ মাসে হাতি আসে সেই খালের উজানি॥

www.pathagar.com

আর এক খাল আছে মিডাছড়া নাম।
ডাবর মতন মিষ্টা পানি নামর মতন কাম॥
ইহার দক্ষিণে আছে রোসাঙ্গার দেশ।
ভিন্‌চায়[২৩] লাগৎ পাইলে ছুরি মারি শেষ॥
মগে আর বাঘে জাইন্য একই বরাবর।
বেঁকা ছুরি হাতৎ লৈলে তারারে বড় ডর॥
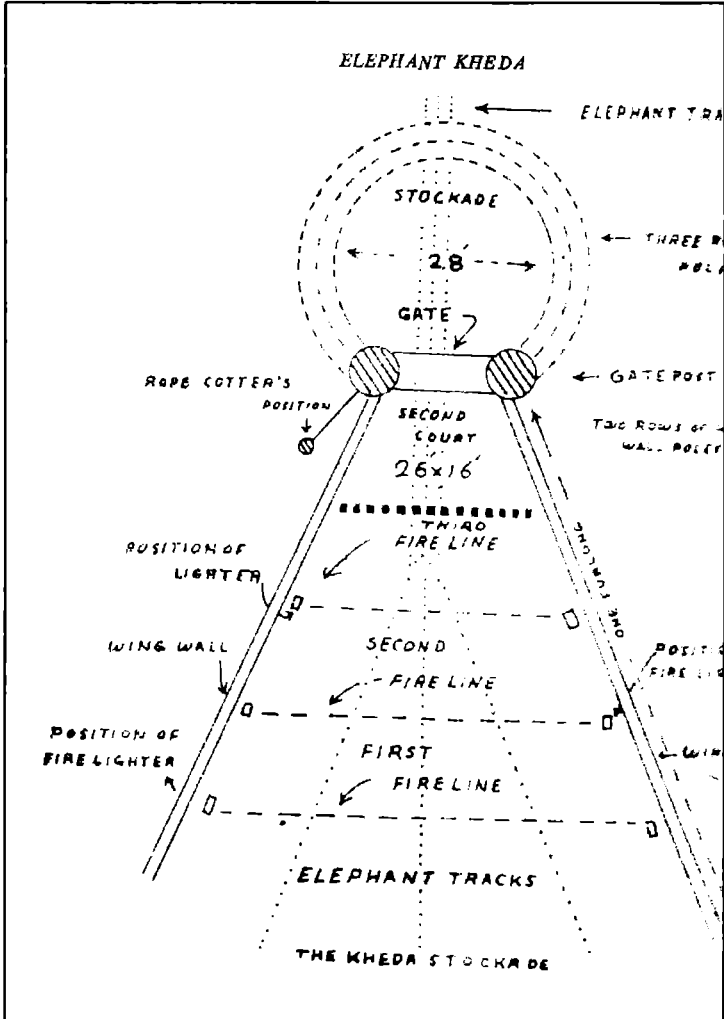
কক্সবাজারে বন্য হাতি ধরার খেদা

www.pathagar.com

সেই গর্জন্যার মুড়ায় আইলো হাতির ঝাঁক।
পলায় গেল গৈ হরিণ গয়াল টেইক্কা পোড়া বাঘ[২৪]॥
অজাগর হাপ কতো আছিল্ মুড়ায় মুড়ায়।
শোয়াসে শোয়াসে হাপর তুয়ান যেন ধায়॥

শোয়াসে পরাণ লয়রে এম্নি বিশাল তেজ।
এক মুড়ায় মাথা হাপর আরেক মুড়ায় লেজ॥
বনর পশু গিলি গিলি খায়রে অজাগর।
এম্নিকালে পাইলরে সে হাতির খবর॥
গাছর খোঁধাৎ[২৫] লুকাইলরে আছিল যত হাপ।
বনর হিয়াল গাতৎ ঘলই[২৬] রৈলরে চুপচাপ॥

এই গর্জনিয়ার পাহাড়ে যখন হাতির উপদ্রব আরম্ভ হইল, তখন চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ শিকারি গোলবদন জমাদার খেদা নির্মাণের ইচ্ছায় এখানে আগমন করিলেন।

মাঘ মাসে খেদার কার্য করে জমাদার।
জঙ্গলেতে হাতি ধরা আচানক কারবার॥
বহুদিন গত রে হৈল খবর শুনরে।
চাডিগাঁইয়া কালা আইল গর্জন্যার পাহাড়ে॥
চাডিগাঁথুন আইল তারা খেদা দিবার মন।
জমাদার আইলো সঙ্গে নাম "গোলবদন"॥

ওরে গোলবদন জমাদার মস্ত পালোয়ান।
সক্কলর ছরদার মিয়া আকল ভালা তান॥
বহুৎ খেদায় হাতি ধরি জোড়াইলা নাম।
বনর বাঘ ভালুক তানে করিতে ছালাম॥
আগে পিছে চলে মিয়ার পান'শ জনা কুলি।
কেহ লৈয়ে ছেল বলম কেহ লৈয়ে গুলি॥
সঙ্গেতে চৈক্যাল[২৭] চলে অতি হুশিয়ার।
কুড়াল খন্দা লৈল আর যতো হাতিয়ার॥
শতে শতে লৈল তারা দরি আর কাঁছি।
ভালা ভালা আলাত[২৮] লৈল মোটা মোটা বাছি॥
চাউল লৈল মরিচ লৈল আরো লৈল তেল।
গর্জন্যার ঢালায় তারা হাতি ধৈত্ত গেল॥

সেই দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলে পাঁচশত সহচরসহ জমাদার গোলাবদন দলবদ্ধ হস্তীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন তাহাদের প্রাণান্তকর কষ্ট।

www.pathagar.com

হায়রে মাঘর শীতে গা কাঁপিতে
লাইগঅল থর থর।
চুপ্পে চুপ্পে পার হয় তারা
টিলা আর টংকর[২৯]॥
পার হৈল নন্দী নালা, কত ঢালা
পার হৈয়া যায়।
ছড়ার কূলৎ গাছর তলে ভাত রাধিয়া খায়॥
কেহর হৈয়ে গায়র ব্যথা রজাই কেঁথা[৩০]
শীতর সম্বল নাই।
কেহর পেড ফুলি উইট্টে নুনা ইলিশ খাই॥
কেহ্ করে আনছান--'দিলাম জান'
কৈলাম এবার কি।
ঘরর কথা ভাবের কেহ্ বোঁচকা হিতান দি॥

এরূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে চাক্‌মারকুল গ্রামে উপস্থিত হইল। বর্তমানে এই চাক্‌মারকুল গ্রামটি রামুথানার (উপজিলা) অন্তর্গত।

চাউম্মারকুল গেরাম সেই যে দেখিতে সোন্দর।
তার মাঝে আছে যতো জুম্মা চাউম্মার ঘর॥
পাহাড়িয়া মগ রে তারা শুন কহি যাই।
বেপরদা মাইয়া মাইন্‌সর লাজ শরম নাই॥
পিঁধনের এক পেঁচর থাম্মি[৩১] আড়াই হাতির মাপ।
ন মানে যে ভাই বেরাদর না মানে মা বাপ॥
বুগর উয়র ধইয়া[৩২] বেড়ায় মাথা রাইখ্যে খোলা।
বেপরদা জুম্মা চাউম্মার যত মাইয়া পোলা॥
মা বাপরে পুছ্ না কৈরে নিজে খসম লয়।
মাইয়া লোকে পুরষরে ন করে ডর ভয়॥

গোলবদন চাক্‌মারকুলের রোয়াজা অর্থাৎ গ্রাম্য মোড়ল 'মংলা'র বাড়ীতে সদলবলে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং মংলাই তাঁহাদিগকে হাতির সন্ধান দিলেন।

'মংলা' নামে রোয়াজা এক চাউম্মারকুলৎ ঘর।
এক্কই ডাকে চিনে মাইনসে মস্ত তায়াঙ্গর[৩৩]॥
ঘরে আছে গরু মৈষ বাহিরে জোম'র খেত[৩৪]।
বছর বছর হাজার টেঁয়ার বেচে গলাক বেত॥
আশী বছর উমর বুড়ার মাড়ীর দাঁত নাই।
ছেঁইচ্যা পান খায়রে বুড়া মাট্যাই মাট্ট্যাই[৩৫]॥

www.pathagar.com

ঝুরি ঝুরি পড়ে[৩৬] বুড়ার বয়স হৈয়ে ভারি।
গোলবদন আইলো সেই মংলা মগ্যার বাড়ী॥
মংলা বলে, 'শুন তোমরা আমি বলি সার।
কোথায় থাকে বনর হাতি জানি সবিস্তার॥
মুড়ায় মুড়ায় মাঝে মাঝে ঘুরি অবিরত।
ভালামতে চিনি আমি জঙ্গলের পথ॥
লোক লস্কর লৈয়া থাক আমার বাড়ী।
গোলার ধানর ভাত খাইবা খেতর তরকারী॥
ঘরে আছে খামা খামা[৩৭] পানিছাড়া দই।
খাইয়া দাইয়া দেশে যাইবা হাতি ধরি লই॥
মংলা মগ্যার কথা শুনি খুসী হৈল মন।
তার বাড়ীতে ডেরা[৩৮] পাতিল মিয়া গোলবদন॥

মংলা সেই পার্বত্যাঞ্চলে 'গুঁইয়া' অর্থাৎ সন্ধানকারীদিগকে ডাকিয়া খোঁজ লইতে বলিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া যায়, কেহই কোনো খবর জানিতে পারিল না। ক্রমশ গোলবদনের উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গেল। হঠাৎ একদিন একজন পার্বত্য গুঁইয়া আসিয়া বলিল– শত শত হাতি আসিয়া এক ঢেবার (পার্বত্য হ্রদে) স্নান করিতেছে।'

এক কথা শুনিয়ারে মিয়া গোলবদন।
রোয়াজারে সঙ্গে লৈয়া চলিল তখন॥
ধীরে ধীরে যায়রে তারা চরণ না চলে।
গা-অরে[৩৯] লুকাইয়া রাখে গাছের আড়ালে॥
তারা আসি দেইখল হাতি ঢেবায় পানি খায়।
গোলবদন ভাবে মনে কেমনে ধরণ যায়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া তখন মন কৈল থির।
দলর যত মাইন্‌সর কাছে হৈল হাজির॥
পান ছলা[৪০] করিয়া তারা কি কাম করিল।
ইটগড়ের পাহাড়ে যাইয়া দাখিল্[৪১] হইল॥
পরে গেল পুগ্‌দিগে ছড়ার উজানে।
বড় বড় হাতির খোঁচ্ দেখিল সেখানে॥
বড় বড় হাতির খোঁচ রইয়ে তাজা তাজা।
'এই পন্থে হাতি চলে' বলিল রোয়াজা॥
'এইখানে ধরিব হাতি ডেকাইয়া[৪২] আনি।'
শুনিয়ারে গোলবদন'র বুগৎ আইলো পানি॥
কুলী আইলো চৈক্কাল আইলো আইলোরে সিক্‌দার[৪৩]
জমাদারে হুকুম কৈল, 'এখন হাতির কিলা মার।'

এইরূপে হাতির গন্তব্য স্থান এবং গতিবিধির সন্ধান পাইয়া তাহারা সেখানে খেদা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল।

www.pathagar.com

কোনাকুইন্যা দুই মুড়া পুগ্‌পশ্চিমে খাড়া।
দক্ষিণেতে থলি[৪৪] জাগা উত্তরেতে ছড়া[৪৫]॥
এক হোতি ছড়ার মাঝে খোরা খোরা পানি।
থলি জাগা হবেরে ভাই দশ কি বার কানি॥
ছড়ার কুলৎ কলাবন ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা।
এই পন্থে আছে জাইন্য বন্‌লা হাতির ডেরা॥
তারপরে কি হৈল কহিয়া জানাই।
কুলীগণে গাছ আনিল জঙ্গলেতে যাই॥
থলি জাগার চাইর দিগে কাইট্টে উয়া[৪৬] গড়।
বাহির কুলে খাম্বা[৪৭] গাইরল এক এক হাত অন্তর॥
বড় বড় খাম্বা সে যে দুই তিন হাতের বেড়।
দড় করি গাড়িয়ারে কৈল খেদার ঘের॥
তারপরে পত্তি খাম্বায় মোটা কাছি দিয়া।
বড় বড় গাছ বাঁধিল করি পাতারিয়া[৪৮]॥
বাহির কুলে খাম্বার পিছে লাগাইল ঠেক্।
গোলবদন কহে, 'একবার ঠেলা মারি দেখ॥
খেদার কাম জানিয়োরে পোলার খেলা নয়।
এমন করি ঠেক লাগাইবা (যেন) হাতির ঠেলা সয়॥'
উত্তর দক্ষিণে খেদার কৈলরে দুয়ারে।
তারপরেতে কিনা কাম করে জমাদার॥
উপরেতে কপ্পিকল ঘিলা[৪৯] দড়ি দিয়া।
আর্চয্য হেক্‌মতে[৫০] ঝাপ রাইখ্যে টাঙাইয়া॥
ঝাপ টাঙাইয়া রাখিল এক শত হাত উয়র।
দোন দুয়ার কৈল তারা একই বরাবর॥

তারপর জমাদার গোলবদন হাতিকে খেদাইবার জন্য চারিদিকে লোকজন পাঠাইয়া দিলেন---

জমাদার বলে, 'তোমরা ন করিও দে'র।
চুপ্প চুপ্পে যাইয়া এখন দাওরে পাতা বেড়[৫১]॥
উত্তর মিক্যা যাইবা কজন গজালিয়া ছাড়ি।
খানিক পুগে লাগৎ পাইবা খুঁডাখালির ফাড়ি[৫২]॥
দহিন মিক্যা যাইবা কজন ঢেবার পারৎ।
ভালা করি তোয়াই চাইবা[৫৩] ঘুরিয়া ঝাড়ৎ॥
পুগে আছে 'খামাং মুড়া' যাওরে বেশী লোক।
সেমিক্যা[৫৪] পোলাইতে হাতির বড় বেশী ঝোঁক॥
বেশি দূরে যাইবা তোমরা করি সাবধান।
পুগ পাহাড় ছুঁটলে হাতির না পাইবা সন্ধান॥

www.pathagar.com

সকলেই জমাদারের আদেশ প্রতিপালন করিল এবং সেই দুর্গম গিরিসঙ্কুল প্রদেশে তল-াসীরা চুপে চুপে হস্তীযুথের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

শীত কাইল্যা বেল্ চলতি নুকা
দেখতে দেখতে যায়।
আঁধার ঘনাইয়া আইলো গর্জন্যার মুড়ায়॥
তলাশীরা চলে বনে গাছর ফাঁকে ফাঁকে।
কন রকম ঝক[৫৫] পাইলের লুকাই লুকাই থাকে॥

অঘোর জঙ্গলে তারা তোয়াইছে হাতি।
জাইল্যা যেমন জাক[৫৬] ঘোলায় খালেতে জাল পাতি॥
খেদার পাশে মুড়ার উয়র আছে চৌকিদার।
কেহ গাছে বাসা বাঁধি নিরখি চাহার[৫৭]॥

'খামাটং' পর্বতটি রামু থানার প্রান্তভাগে অবস্থিত। যাহারা এখানে হাতির অনুসন্ধানে আসিয়াছিল; তাহাদের সঙ্গেই প্রথমে হাতির সাক্ষাৎ হয়।

যারা গিয়াছিল পুগে খামাটংএর মুড়ায়।
ওরা বাঁশর বনৎ তারা হাতির আবাজ[৫৮] পায়॥
আবাজ পাইয়া তারা কি কাম করিল।
আরো দুই মাইল পুগে যাই উপনীত হৈল॥
ওরে কোমরেতে দা তারার মুখে নাইরে রা।
ধুনী জাল্যি সক্কলেতে ছেগি লৈল গা॥
একে ত আঁধারি রাইত উতরালি বায়।
আগুন ধরাইয়া দিল মুড়ায় মুড়ায়॥
মাঝে মাঝে বাইরগ্যা ডুয়াৎ[৫৯] বড় বড় বাঁশ।
ধুমাই ধুমাই জলে, ফুডের ঠাঁস ঠাঁস॥
আবাজ শুনিয়া হাতির মনে হৈল ডর।
থোরা পুগে আসি মাইন্‌সর পাইলোরে লড়চড়॥
জলি উইঠ্যে মুড়ায় আগুন ছুঁইয়াছে আচ্‌মান।
উতরমিক্যা বনর হাতি হৈল আগুয়ান॥
ছোড়তা তুলিয়া ছুডিল্ পিছে নাহি দেখে।
খুডাখালীর পাড়ৎ আসি সক্কল হাতি ঠেকে॥

আগেতে পাঞ্জালী আসি সেই না জাগায়।
মাঘর শীতে ফুলি ফুলি হোক্কা টানি খায়॥
একে ত গহিন বন আঁধারিয়া রাইত।

www.pathagar.com

পা ছড়াইয়া বইস্যে কেহ, কেহ হৈয়ে কাইত॥
কোনজনে খায়রে তামুক আর কেহ চায়।
ন যাঁচিলে সেই হোক্কা কাড়ি লৈয়া খায়॥
এম্‌নি কালে কি হৈল শুনরে খবর।
বনর মাঝে শুনারে গেল পাতার মরমর॥
আতাইক্যা[৬০] হাতির ডাকে ভাঙ্গিল চমক।
তড়াতড়ি উডি তারা মারিল ধমক[৬১]॥

ইহাদের চিৎকার ও চেঁচামেচিতে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। হাতি কোন্‌দিকে যাইবে ঠিক করিতে না পারিয়া দিশাহারা হইল।

ওরে হৈল বড় হুলুস্থুল, শোরগোল
করিল সবার।
কেহ শিঙা ফুঁকে কেহ বাঁশর ঠাগ[৬২] বাজায়॥
কেহ ছাড়ে হাবুই বাজি, হৈল আজি
পরাণ লৈয়া টান।
কোন জনে গহিন বনে ফুকারে আজান॥
কেহ্ করে নানান ঢঙ, বাজায় ভং
কাঁসাৎ মারে বাড়ি।
কেহ্ গলা ফাডি ফেলার কুইক্যা চিক্কির মারি॥
পরাণের লালছ নাই সয়রে কত দুঃখ।
নানান ফন্দি করি তারা ফিরায় হাতির মুখ॥
ফিরাইল মুখ হাতি চক্‌মক্যা[৬৩] হইল।
পুগেতে আগুন দেখি মনে ডর পাইল॥
দহিনথুন আইলো মানুষ রাইতর হইল নিশি।
হাতিরে ডেকান্যা দিলো[৬৪] দোন দলে মিশি॥
পছিম চাবি দহিন মিক্যা যায়রে বনর হাতি।
ছোড়তায় টানি ভাঙ্গে গাছ গাছড়ার মাথি॥
পিছে থাকি কিনা কাম করিল পাঙ্গালী।
হাতিরে যে দিতে লাগিল্ নানান্ রকম গালি॥
ওরে কুলার আগাৎ নুন
হাতি কান পাতি হুন্
তেরিমেরি[৬৫] করিলে তোর কপালে আগুন---
হাতি কান পাতি হুন্॥
ওরে কুলার আগাৎ নুন
হাতি কান পাতি হুন্
কোনাকুন্যা যাওরে এখন উতরমিক্যাথুন
হাতি কান পাতি হুন্॥

www.pathagar.com

মাইন্‌সর কেরামতি হাতি ন বুঝিল হায়।
ছড়ার পন্থ ধরিয়ারে খেদার মিক্যা যায়॥
খেদার মিক্যা যায়রে হাতি খেদার মিক্যা যায়।
গাছর আগাৎ চৈক্কাল বসি ফুইক্যা[৬৬] মারি চায়।

ক্রমশ হাতি খেদার নিকটবর্তী হইল। পাঞ্জালী এবং অনুসন্ধানকারীরা আর অগ্রসর হইল না। সকলেই নীরব নিষ্পন্দ।

এক্কই খোঁচে চলে[৬৭] হাতি এক্কই বরাবর।
ডাল ভাঙ্গে গাছর পাতা করে মরমর॥
ভিতরেতে কলাবন আর তারা গাছ।
হাতি ন চিনে যে খেদা জাল ন চিনে মাছ॥
ভাবিল তাহারা এই অঘোর জঙ্গল।
বনর পশু ন চিনিল গুষ্টিমারা কল॥
খেদার মুখেতে ধীরের আইলো হাতির ঝাঁক।
দরজার উপরে দরান হামেশা সজাগ॥
বুকের মাঝে দুরু দুরু ন পড়ে শোয়াস।
ইশারায় ধরি রাইখ্যে কপ্পিকলর রাশ॥
ধীরে ধীরে কলাপাতা টানি টানি খায়।
খাইতে খাইতে সক্কল হাতি খেদার ভিতর যায়॥
গুণ্ডাহাতি[৬৮] চালাক ছিল ফিরিয়া আসিতে।
উপরের দরজা দরান ছাড়ে আচম্বিতে॥
দুই দিকে পড়িল ঝাঁপ এই যে বিষম ফন্দি।
বহুৎ হাতি খেদার মাঝে হৈয়া গেল বন্দী॥

ধল-পহর মারে পুগে নাইরে বেশী রাতি।
খেদার মাঝে বাধা পইরল শতর উয়র হাতি॥
ধাইয়া আইল চৈক্কাল আর যত কুলীগণ।
খেদার চাইর দিকে তারা ঘেরিল তখন॥
শত শত উজাল[৬৯] নৈল ছেল্ বলম আর।
আগুন লাগাইয়া দিল পাহাড়ে পাহাড়॥
তখন যে গুণ্ডাহাতি কি কাম করিল।
খেদার ভিতরে শুধু ঘুরিতে লাগিল॥
পথ না পাইলোরে হাতি হইতে বাহির।
আপন অবস্থা বুঝি মারিল চিক্কির॥
সেই ডাকে থরথরাইয়া কাঁপিল পাহাড়।
গুবগুবানির চোডে যেন মুলুক ডুবি যার॥

www.pathagar.com

গুজরি গুজরি[৭০] হাতি করে আনছান।
জঙ্গলেতে খেদা যেন করবলার ময়দান॥

মাথা মারে বনর হাতি খাম্বার কাছে যাই।
ভেরীকল[৭১] ভাঙ্গনের বুদ্ধি হাতির কাছে নাই॥
মন করিয়া হাতি যদি মারে এক টান।
হারি আইবো খেদার ঘিরা ছিঁড়ি যাইব বান॥
কে বুঝিবে মুরখ্ হাতির একি আলামত[৭২]।
টান ন মারি কেন হায়রে ঠেলে অবিরত॥
ছোড়তায় টানি ভাঙ্গে কত বড় ডাল।
খেদার ঘিরা বনর হাতির যেন মায়াজাল॥
মুরখ হাতির বুদ্ধি নাইরে খাম্বারে টানিতে।
চোখ বাঁধা বলদের মতন ঘুরিছে ঘানিতে॥
বাইরেতে চৈক্কালেরা ঘোরে চারিধার।
ঘিরার কাছে গেলে হাতি ছেলর গুথা খার॥
আখেমা হৈয়া[৭৩] হাতি যখন মারে ঠেলা।
গোলার মুয়ৎ আগুন লাগাই ভিতরেতে দে মেলা॥
গোলার আবাজে হাতি যায়রে থমকিয়া।
অঝোরে ঝরে যে পানি দোন চোগ দিয়া॥

খানিক পরে হৈল তথায় বাজিখেলার শুরু।
ওরে আচমানে হাবুই ছাড়ে জমিনে তম্বরু॥
তুম্বুর[৭৪] হুরপুরানি হাবুই বাজির ডাক।
শুনিয়া রে জঙ্গলা হাতি হইল অবাক॥
কেহ গোলা ছাড়ে কেহ বন্দুক করে ফৈর[৭৫]।
মনর ডরে বনর হাতি মাড়িৎ নৈল গৈড়[৭৬]॥
রাইত পোহাইল ধীরে ধীরে সুরুষ উডিল লাল।
দিনর পহর পাইয়া হাতি দিতে লাগিল ফাল[৭৭]॥
চিহ্ন নাইরে কলাবনর নাইরে এক গাছ খের।
ছিঁড়িভিড়ি ধুইলর হঙ্গে আচমানে উডের॥
লাড়াই বাজিল্ ভিতরেতে কি বলিব হায়।
শতর উয়র পৈড়গ্যে হাতি খেদা রাখন দায়॥

এ সময় জমাদার গোলবদন অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। খেদা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার চিন্তার অবধি নাই।

ওরে গোলবদন জমাদার কি করিল কাম।
মাঘমাস্যা শীতেও যে কোপালেতে ঘাম॥

www.pathagar.com

ডাক দিয়া কহে মিঞা নাই তান হোঁস।
গেরামে যাইয়া এখন আনহ মানুষ॥
দিনর গতে রাতুয়া আইজ বড় বিষম লেঠা।
আর পান'শ চাহি আমি জোয়ান জোয়ান বেটা॥
খেদার চাইরদিকে তোমরা কুড়াওরে কাঠ।
আজুয়া রাতুয়া কর ভালামতে ঠাঠ[৭৮]॥

দিন গত হইল। রাত্রিতেই বিপদের কথা। বাহিরের শত শত জঙ্গলা হাতি আসিয়া খেদা ভাঙ্গিতে পারে, জমাদার গোলবদন এরূপ আশংকা করিতেছিলেন। তাঁহার অনুমান সত্যে পরিণত হইল।

রাইতর নিশি হৈল যখন ভাতঘুমার সময়।
পুগের মুড়ায় গুম্‌গুমাগুম্‌ কিসের আবাজ হয়॥
তারপরে কি হৈল কহিয়া জানাই।
উজাল ধরি চৈক্কাল কুলি চাহিল উজাই[৭৯]॥
দেখিল হাতির ঝাঁক ছামনে রৈয়ে খাড়া।
আর এক্কানা আগুয়াইলে জানের দফা সারা॥

বাহিরের জংলা সেই কিনা কাম করে।
খেদার মিক্যা আইসত লাগিল্‌ ধীরে ধীরে॥
খবরিয়া খবর হৈল জমাদারের ঠাঁই।
কাইপ্‌ত লাগিল সক্কলের পেডর পিলাই॥
সপ্‌সপাসপ্‌ গুম্‌গুমাগু হাতির আবাজ।
দুনিয়াতে রোজ কেয়ামত হবে বুঝি আজ॥
হাতি যদি ভাঙ্গে খেদা পরাণ লৈয়া টান।
স্থানে স্থানে মুসলমানে ফুকারে আজান॥
হেঁদু ডাকে "জয়কালী" মগে বলে "ফরা"।
এইবার প্রভু নিরাঞ্জন সংকটেতে তরা॥

এমনিকালে কি হৈল শুন বিবরণ।
হাবুই ছাড়ে গোলা ফুডায় যত চৈক্কালগণ॥
উজাল জালাই তারা রাইতরে করে দিন।
কাঁসার ডংতত বাড়ি মারে বাজায় মৈষর শিঙ॥
ধুনির আগুন তখন ছুইল আচমান।
বাহিরের জঙ্গলা ধাইলো লৈয়া নিজর জান॥

বিপদ কাটিয়া গেল। পরে জমাদার গোলবদন একে একে সমস্ত হাতি বাঁধিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

www.pathagar.com

এক দুই তিন করি চাইর দিন যায়।
হেরান্যা হৈল[৮০] হাতি পড়িয়া খেদায়॥
খাওন বেগরে তারার গায়ে বল নাই।
চলিতে ফিরিতে পড়ে পাক্কাই পাক্কাই॥
তারপরে জমাদার কিনা কাম করে।
পালা হাতি আনিয়ারে বনর হাতি ধরে॥

আচানক তঁয়সা[৮১] সেই যে কি বলিব আর।
খেদার ঢাকৎ[৮২] আর এক খেদা বানায় চমৎকার॥
তার মাঝে কলাগাছ রাখে সারি সারি।
নতুন দুয়ার বানায় খেদার দুয়ারী॥
এমন দুয়ার সেই যে বড়ই হেকমত।
কেবল মাত্র একটি হাতির আসনের পথ॥
একটি হাতি আইসলে পরে বন্ হয় দুয়ার।
পালা হাতি দুইটা থাকে দুই পাশে তার॥
কলাগাছ খায়রে জংলা কলাগাছ খায়।
শুন এখন কেমন কৈরে হাতি বাঁধন যায়॥

পোষা হাতির পেডর নিচে ঢুলৈনে মাহুত।
জানের লালছ নাই অভাগ্যার পুত॥
ইশারা করিলে মাহুত পালা হাতি আসি।
দুই পার্শ্বদি জংলারে চিবি ধরে কসি॥
আর এক পোষা হাতি ছাম্নের দিকে যাই।
টানি ধরে ছোড়তাতে ছোড়তা বেড়াই॥
লড়িতে চড়িতে তার নাহি থাকে সাধ্য।
তিনটা হাতির ডরে জংলা হৈয়া যায় বাধ্য॥
এমনি কালে সেই মাহুত বলি --"বারে বা"।
বাঁধিলরে বনর হাতির পিছর দোন পা॥
বাঁধা পড়ি জংলা হাতি ছাড়ে চোগর পানি।
এই না মতে সক্কল হাতি বাহিরে আনে টানি॥

খুসী হৈয়া আইয়ের সবে আইয়ের খুসী হই।
মংলা মগ্যার বাড়ীৎ আবার খাইলো মৈষর দই॥
দেশ বিদেশে গোলবদনর হৈল বড় নাম।
শতেক হাতি ধরিয়াছে লাখো টাকা দাম॥"[৩৬]

**শব্দার্থ :**

১. আহন মাসে খোয়া ঝরের-অগ্রহায়ণ মাসে কুয়াশা পড়ে, ২. জুম্মা-জুমিয়া নামক পার্বত্য জাতি, ৩. মোচার উয়র-মাচার উপর, ৪. মুড়ার গুড়িৎ-পাহাড়ের পাদদেশে, ৫.

www.pathagar.com

পৈমাল-নষ্ট, সর্বনাশ, ৬. দোনাদোনি জাগা- দ্রোনের পর দ্রোণ জায়গা (১ দ্রোণ= ২৪ বিঘা), ৭. মৈক্যাগুলা-ভুট্টগুলো, ৮. আঁয়ার ছইয়র ডুয়া কই- আমার শিমের ডগা কোথায়, ৯. আইয়ের-আসছে, আগামী, ১০. হজিব দেন- দেনা পরিশোধ করবো, ১১. চাউম্মা-চাকমা, ১২. ঢালার মুয়ৎ-গিরিরত্নের মুখে, ১৩. ছেড়তা-গুড়, ১৪. হাতির খোঁচ-হাতির গভীর পদচিহ্ন, ১৫. পাঞ্জালি-হস্তীর অনুসন্ধানকারী, ১৬. ওর-সীমা, ১৭. একছড়ি-একদিকে, ১৮. ছলুক-দল বেঁধে, ১৯. পোহনা পরীর-মনিপুরের এক শ্রেণীর নর্তকী, এরা হিন্দু জাতীয়। রেংগুনে নাচগান করে, ২০. ঐরাবত-ইরাবতী নদী, ২১. কাগ বাজারের-কক্সবাজারের, ২২. এক মাধান-এক মধ্যাহ্ন বা ছয় ঘন্টা, ২৩. ভিনচায়- ডাকাতে, ২৪. টেইক্কা পোড়া বাঘ-কালো ডোরাকাটা বাঘ, ২৫. গাছর খোধাৎ-বক্ষের কোটরে, ২৬. ঘলাই- প্রবেশ করে, ২৭. চৈক্যাল– বন্যা হস্তীদের গতিবিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ২৮. আলাত– হাতি বাঁধবার জন্য শণ নির্মিত মোটা দড়ি, ২৯. টংকর– ছোট পাহাড়, ৩০. রজাই কেঁথা– লেপ কাঁথা, ৩১. থাম্মি–লুঙির মত পরিধেয় রেশমী বস্ত্র, ৩২. ধইয়া– এক প্রকার গামছা যা বুকের ওপর বেড় দিয়ে পরিধান করে, ৩৩. তোয়াঙ্গব– মাতব্বর, ৩৪. জোমর খেত– জুম ক্ষেত, ৩৫. মাট্যাই মাট্যাই– মাড়ি দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে, ৩৬. ঝুরি ঝুরি পড়ে– ঢলে পড়ে যায়, ৩৭. খামা খামা– জমাট বাধা, ৩৮. ডেরা– আস্তানা, ৩৯. গা-অরে– দেহটাকে, ৪০. পানছলা– শলা পরামর্শ, ৪১. দাখিল – উপস্থিত, ৪২. ডেকাইয়া– তাড়িয়ে, ৪৩. সিকদার– অভিজ্ঞ খেদা প্রস্তুতকারী, ৪৪. থলি– সমতল ভূমি, ৪৫. ছড়া– পাহাড়ী নদী, ৪৫. উয়া– খাঁড়া, ৪৭. খাম্বা– খুঁটি, ৪৮. পাতারিয়া– আড়াআড়িভাবে, ৪৯ .ঘিলা– ঢিলা, ৫০. হেকমতে– কৌশলে, ৫১. দাওরে পাতাবেড়– চারিদিকে ঘিরে ফেলো, ৫২. ফাড়ি– বড় নদী থেকে তীরে কিছু দূর বিস্তৃত খালকে ফাঁড়ি বলে, ৫৩. তোয়াই চাইবা– অনুসন্ধান করে দেখবা, ৫৪. সেমিক্যা– সেই দিকে, ৫৫. ঝক– নড়াচড়া, সাড়াশব্দ, ৫৬. জাক– মাছ ধরবার জন্য জলাশয়ের কিনারে যে সব গাছ গাছড়ার ডাল, বাঁশ ইত্যাদি পুঁতে রাখা হয় তাকে জাক বলে, ৫৭. চাহার– চারিধারে, ৫৮. আবাজ– আওয়াজ, শব্দ, ৫৯. বাইরগ্যা ডুয়াৎ– "বারিয়া" নামক এক প্রকার বাঁশ ঝাড়, ৬০. আতাইক্যা– আচম্কা, ৬১. মারিল ধমক– চিৎকার করে উঠলো, ৬২. বাঁশর ঠাগ– বাঁশের ঠকঠকি,। ৬৩. চক্মক্যা– সচকিত, ৬৪. ডেকান্যা দিলো– তাড়া করলো, ৬৫. তেরিমেরি– বিরক্তি বা রাগ প্রকাশ, ৬৬. ফুইক্যা– উঁকি, ৬৭. এক্কই খোঁচে চলে– একই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলে অর্থাৎ হাতির দল গুণ্ডা বা দলপতির পদচিহ্ন ধরে চলে, ৬৮.গুণ্ডা হাতি– হস্তী যুথের দলপতি, ৬৯. উজাল– মশাল, ৭০. গুজরি গুজরি– গর্জন করতে করতে, ৭১. ভেরীকল– বাইরের দিকে হেলান দেয়া কাঠের পেলা, ৭২. আলামত– অদ্ভুত খেয়াল, ৭৩. আখেমা হইয়া– ধৈর্য হারিয়ে, ৭৪. তুম্বুর– তুবড়ি বাজী, ৭৫. ফৈর– ফায়ার (Fire), গুলি, ৭৫. মাটিতে লৈল গৈড়– মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো, ৭৭. ফাল– লাফ, ৭৮. ঠাঁঠ– আয়োজন, ৭৯. উজাই– অনুসন্ধান করতে অগ্রসর হলো, ৮০. হেরান্যা হৈল– ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হলো, ৮১. তঁয়সা– তামাশা, ৮২. খেদার ঢাকৎ– খেদার ঢোকার পথে।

www.pathagar.com

## তথ্যনির্দেশ

১. জাফর আলম, পিতা : আবদুস ছমদ, মাতা : দিলরুবা খানম, বয়স : ৬০ বছর, গ্রাম : ইউসুফেরখিল, ইউনিয়ন : ইসলামাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১২-০১-২০১৩, সময় : সকল-১০টা।
২. মাহমুদুর রহমান মাহমুদ, পিতা : আলী হোসেন, মাতা : নুরুন্ননাহার, বয়স : ৫১, গ্রাম : দক্ষিণ কাকারা, ইউনিয়ন : কাকারা, উপজেলা : চকরিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১৩-০১-২০১৩, সময় : সকাল-১১টা।
৩. মোহাম্মদ হাসান কুতুবী, পিতা : নূর মোহাম্মদ, মাতা : আলবেলা খাতুন, বয়স : ৪২, গ্রাম : বিন্দাপাড়া, ইউনিয়ন : কৈয়ারবিল, উপজেলা : কুতুবদিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৫-১২-২০১৩, সময় : সকাল -১০টা।
৪. ভান্ডারী আবদুর রহমান, পিতাঃ মোহাম্মদ সোলায়মান, মাতা : নুর জাহান বেগম, বয়স : ৩২ বছর, গ্রাম : হাজির পাড়া, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ৪-৯-২০১২, সময় : বিকাল-৫টা
৫. মোঃ জাকের হোসাইন ফকির, পিতা : হাফেজ আহমদ, মাতা : গোল চেহের বেগম, বয়স : ৩১ বছর, গ্রাম : দরগাহ বিল, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেরা : কক্সবাজার, তারিখ : ১৫-১০-২০১৩, সময় : সকাল -১১টা।
৬. ফকির বাঁচা মিয়া, পিতা : মোহাম্মদ সুলেমান মাস্টার, মাতা : গোলফরাজ খাতুন, বয়স : ৭০ বছর, গ্রাম : ফলিয়া পাড়া, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ৪-১০-২০১৩, সময় : বিকাল -৫টা।
৭. আবদুল আলম ফকির, পিতা : মরহুম মুজাহের আহমদ সিকদার, মাতা : মলিয়া খাতুন, বয়স : ৫৮ বছর, গ্রাম : পূর্ব টাইপালং, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১১-১১-২০১৩, সময় : সকাল সাড়ে ৯টা।
৮. আবদুর রহিম ভান্ডারী, পিতা : নাজির হোছন, মাতা : হালিমা খাতুন, বয়স : ৪৪ বছর, গ্রাম : দরগাহ পালং, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১০-১২-২০১৩, সময় : সকাল -১০টা।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. মোঃ শাহ সৈয়দ আকবর, পিতা : ছিদ্দিক আহমদ, মাতা : ছৈয়দা খাতুন, বয়স : ২৭ বছর, গ্রাম : পূর্ব ডিগলিয়া পালং, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১০-১০-২০১৩, সময় : বিকাল-৫টা।
১১. মোঃ আমির হোসেন, পিতা : আনু মিয়া, মাতা : সিরাজ খাতুন, বয়স : ২৫ বছর, গ্রাম : ডেইলপাড়া, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা- কক্সবাজার, তরিখ : ২৫-১১-২০১৩, সময় : বিকাল-৫টা।
১২. মোঃ আলী ফকির, পিতা : হাসুমিয়া সিকদার, মাতা : আমেনা বেগম, বয়স : ৪৫ বছর, গ্রাম : হাজীর পাড়া, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তরিখ : ১০-১০-২০১২, সময় : সকাল - সাড়ে ৯টা।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. আবদুস ছালাম ভান্ডারী, পিতা : বদিউর রহমান, মাতা : মাবিয়া খাতুন, বয়স : ৫০ বছর, গ্রম : দরগাহ পলং, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখঃ ২০-০৬-২০১১, সময় : সকাল-১০টা।
১৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

১৬. শামসুল ইসলাম, পিতা : আহমদুর রহমান, মাতা : রাবেয়া খাতুন, বয়স : ৬৫ বছর, গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাগ,ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৯-০৯-২০১৩, সময় : সকাল -১০টা।

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. বরকেতা গাইন-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, কক্সবাজার, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৯.

১৯. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, কক্সবাজার, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃষ্ঠা-৪২-৪৪।

২০. দুলাল পাল, পিতা : দীপক পাল, মাতা : কণক প্রভাপাল, বয়স : ৬৮ বছর, গ্রাম : খারাংখালী, ইউনিয়ন : হোয়াইক্ষ্যং, উপজেলা : টেকনাফ, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১১-০৮-২০১১, সময় : সকাল সড়ে ৯টা।

২১. সুবর্ণ কুমার বড়ুয়া, (অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, কুতুপালং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উখিয়া), পিতা : খগেন্দ্র লাল বড়ুয়া, মাতা : মণি বালা বড়ুয়া, বয়স : ৭০ বছর, গ্রাম : পাতাবাড়ি উপজেলা : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৫-০৬-২০১১, সময় : সকাল সাড়ে ৮টা।

২২. মোহাম্মদ হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ সিকান্দর, মাতা : জরিনা খাতুন, বয়স : ৬৪ বছর, গ্রাম : কোদালিয়াকাটা, ইউনিয়ন : ইদগড়, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১২-০২-২০১৩, সময় : বেলা সাড়ে ১১টা।

২৩. সাধন সোহন দে, পিতা : গঙ্গা চরণ দে, মাতা : রাজবালা দে, বয়স : ৮৬ বছর, গ্রাম : ওয়ালাপালং, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ :০৬-০৮-২০১১, সময় : সকাল সাড়ে ৮টা।

২৪. বরকেতা গাইন-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, কক্সবাজার, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১৯-২৬।

২৫. নজির আহমদ, পিতা : আবদুল জলিল, মাতা : জমিলা খাতুন। বয়স : ৮৪, (জন্ম : ১৯৩০ সালের ৫ জুলাই) গ্রাম : সিকদারবিল, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১২-১২-২০১১, সময় : সকাল : ১০টা।

২৬. গোলাপজান বিবি, স্বামী : আবুল খাইর, বয়স : ৫৫, গ্রাম : আজুখাইয়া, ইউনিয়ন : ঘুংধুম, উপজেলা : নাইক্ষ্যংছড়ি, জেলা : পার্বত্য বান্দরবান জেলা (উক্ত গ্রামটি উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের কুতুপালং গ্রাম সংলগ্ন বিধায় কথিত আজুখাইয়া তেকে গীতটি সংগ্রহ করা হয়েছে।)

২৭. মোহাম্মদ খান, পিতা : নূর আহমদ, মাতা : দৌলত খাতুন, বয়স : ৫০, গ্রাম : সিকদারপাড়া, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১২-১২-২০১১, সময় : সকাল : ১০ট।

২৮. মীর আহমদ, পিতা : মকবুল আহমদ, মাতা : আমেনা খাতুন, বয়স : ৬৮, ডলুঝিরি, ইউনিয়ন : ঈদগড়, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০২.১০.২০১২, সময় : সকাল : ১০টা।

২৯. নজির আহমদ, পিতা : আবদুল জলিল, মাতা : জমিলা খাতুন। বয়স : ৮৪, (জন্ম : ১৯৩০ সালের ৫ জুলাই) গ্রাম : সিকদারবিল, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১২-১২-২০১১, সময় : সকাল : ১০টা।

www.pathagar.com

৩০. মো, জাকারিয়া, পিতা : পিতা : মৌলভী দেলদার আহমদ, মাতা : আনোয়ারা বেগম, বয়স: ৪৪, গ্রাম : ঝিম্মংখালী, উপজেলা : হোয়াইক্ষ্যং, উপজেলা : টেকনাফ, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১০-০৬-২০১১, সময় : বিকাল সড়ে ৫টা।
৩১. মোহাম্মদ শাহ এমরান, পিতা : মোহাম্মদ আক্কাছ সওদাগর, মাতা : মনজিলা বেগম, বয়স : ২৭ বছর, গ্রাম : ফুলের ডেইল, ইউনিয়ন : হ্নীলা, উপজেলা : টেকনাফ, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৯-০৯-২০১১, সময় : সকাল-১০টা।
৩২. গাজীর গান ঃ শিল্পরীতি- আফসার আহমদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২।
৩৪. সন্তোষ শীল, পিতা : ননী গোপাল শীল, মাতা : চিনু রাণী শীল, বয়স : ৪৫ বছর, স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : কানুনগোপাড়া, ইউনিয়ন : কানুনগোপাড়া, উপজেলা : বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানা : শিক্ষক, টেকনাফ ডিগ্রী কলেজ, কক্সবাজার, তারিখ : ১৫.০৭.২০১১, সময় : সকাল ১০টা।
৩৫. আশুতোষ চৌধুরীর রচনা ও সংগ্রহ-সম্ভার-মোমেন চৌধুরী সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ জৈষ্ঠ্য ১৩৯৬ মে ১৯৮৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা। পৃষ্ঠা- ৪৪।

www.pathagar.com

# লোকবাদ্যযন্ত্র

স্বয়ংসম্পূর্ণতা কখনো এককভাবে তৈরি হয় না। প্রত্যেক বস্তুর সম্পূরক এবং পরিপূরক সহযোগী উপাত্ত রয়েছে। অনুরূপভাবে সুর, ছন্দ এবং লয়কে আকর্ষণীয় করে তুলতে বাদ্যযন্ত্রের বিকল্প নেই। তাই মানুষ তার কণ্ঠের সুষমাময় সুরকে মধুময় ও অমিয় ধারায় সিক্ত করে অপরকে আনন্দ দিতে বাদ্যযন্ত্রের সহায়তা নেয়। মানুষের কণ্ঠে নির্গত সুর এবং ছন্দকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগিতা দিয়ে যে নান্দনিক পরিবেশের জন্ম দেয় তারই আলোকে সৃষ্টি হয়েছে যুগে যুগে নানা রকম বাদ্যযন্ত্র।

সংগীত যখন গীত হয়ে মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় তখন আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে, ইথারে ইথারে। সেই আদিকাল থেকে সংগীতের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয়ে আসছে। মানুষ গান বাঁধে, বাদ্যযন্ত্রও মানুষ তৈরি করে। বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে গানের অপূর্ণতার পরিপুরক। সুতরাং বাদ্যযন্ত্র ছাড়া সংগীত হয় না। ইদানীং সংগীত পরিবেশনায় ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক সব বাদ্যযন্ত্র। লোকজ বাদ্যযন্ত্রগুলোর ব্যবহার অবশ্য তেমন একটা লোপ না পেলেও কতগুলোর ব্যবহার একবারে লুপ্ত প্রায়। তবে জেলায় সংগীতানুষ্ঠানে লোকজ ও আধুনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে শংকর সংগীতানুষ্ঠান। সভ্যতা এবং শিক্ষার ক্রমবিকাশে জেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গণ ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। জেঁকে বসছে তথাকথিত আধুনিকতা। এর ফলে হয়তো যে কটি লোকজ বাদ্যযন্ত্র এখনও টিকে আছে সেসবও হয়তো আর থাকবে না। সারা দেশের প্রচলিত লোকবাদ্যযন্ত্রের প্রায় সবগুলোই প্রচলিত রয়েছে জেলার বিভিন্ন উপজেলায়। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রতো আছেই তার সাথে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন ও আধুনিক বাদ্যযন্ত্র। এসব বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঢোল, বাঁশি, করতাল, খোল, খঞ্জনি, তবলা, মাদল, একতারা, দোতারা, সেতার, মন্দিরা, গিটার, এস্রাজ, হারমোনিয়াম, সানাই, বেহালা, ঝাঁজ, জুরিসহ ইত্যাকার বাদ্যযন্ত্র।

জেলার লোকজ বাদ্যযন্ত্রগুলোর পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হলো।

**মোম :** বাসনাকৃতি পিতলের তৈরি প্রাচীন লোকজ বাদ্যযন্ত্র। বলী খেলা তথা গ্রামীণ কুস্তি খেলায় যাওয়ার সময় খেলোয়াড়েরা এবং গ্রামে হঁওলা পরিবেশনের সময় মোম বাজানো হয়। মোম সাধারণত পিতলের পাত দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। থালা আকৃতির পিতলের পাত দিয়ে ঠিক মধ্যখানে একটি সমান্তরাল গোলাকার বা বৃত্তাকার পাতের সৃষ্টি করা হয়। ঐ উত্তল পাতে গাছের একটি লাঠি (যা এক হাতের লম্বা নয়) দিয়ে আঘাত করতে থাকলে একটি অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি হয়। জেলায় মোমের ব্যবহার থাকলেও কোথাও মোম তৈরি করা হয় না। স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের জন্য জেলার বাইর থেকেই মোম ক্রয় করে আনা হতো। মোমের উপরের পাশে একটি রশি আটকানো থাকে। উক্ত রশি ধরেই মোম পিটানো হয়। হঁওলা বা লোকসংগীতকে মোহনীয় করে তুলতে এটার জুড়ি নেই। এটি বহু প্রাচীন লোকজ বাদ্য।

www.pathagar.com

**ঝাঁজ (ঝাঁজর) :** এটি বাসনাকৃতির দুটি পৃথক থালা। দুটির পেছন থেকে ধরার ব্যবস্থা আছে। বলী খেলায়, হাইল্যাগীত গাওয়ার সময় এবং লোকজ সংগীত অনুষ্ঠানে এটি ব্যবহার করা হয়। ঝাঁজ মূলত পিতলের তৈরি। ফলে মোমের ন্যায় স্থানীয়ভাবে ঝাঁজ তৈরি করা হয় না। জেলার বাইর থেকেই ঝাঁজ ক্রয় করে এনে ব্যবহার করা হয়।

**জুরি :** এটিও একটি লোকজ গানের সহায়ক বাদ্যযন্ত্র। জুরি থাকে দুই হাতে দুটি। দুহাতে দুটি জুরি নিয়ে মৃদু শব্দে বাজানো হয়। জুরি দেখতে অনেকটা ঝাঁজের ন্যায়। তবে আকারে, আয়তনে ও ওজনে ঝাঁজের চেয়ে অনেক ছোট। হাইল্যাগীত, হঁওলা, নাউট্টার নাচে, গাজীর গানের আসরে, লোকজ অনুষ্ঠানে এবং বলী খেলায় জুরি ব্যবহার করে। জুরিও ঝাঁজ বা মোমের ন্যায় পিতলের তৈরি। জুরিও কক্সবাজারে তৈরি করা হয় না। ব্যবহারের জন্য বাইর থেকেই এসব বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করে আনা হয়।

**সানাই :** সানাই পিতলের তৈরি অনেকটা ছোট মাইকের আকৃতির। বাঁশের বাঁশির মতো সুরের মুর্ছনা সৃষ্টি করে। স্থানীয়ভাবে সানাই তৈরি করা হয় না। জেলার বাইর থেকেই সংগীত অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য সানাই কিনে আনা হয়। লোকজ অনুষ্ঠান ছাড়াও আধুনিক গানেও সানাই ব্যবহার করা হয়।

**হারমোনিয়াম :** হারমোনিয়াম কাঠের তৈরি সবার চেনা সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একটি অপরিহার্য যন্ত্র। পশ্চিমা অর্গানের ধাঁচে তৈরি বহনযোগ্য এই যন্ত্র এখন দেশীয় বাদ্যযন্ত্র হয়ে গেছে।

*কক্সবাজার শহরে একজন শিল্পী হারমোনিয়াম তৈরি করছেন*

কক্সবাজার জেলা শহরে দুই-তিনটি প্রতিষ্ঠানে হারমোনিয়াম তৈরি করে বাণিজ্যিকভাবে বিপণন করা হয়। হারমোনিয়াম তৈরি করতে প্রয়োজন কাঠের তক্তা, চামড়া, অল্প তারকাটা।

www.pathagar.com

**ঢোল :** ঢোল অতি প্রাচীন ভারতীয় তথা দেশীয় বহুল ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। এটি ছোট, মাঝারি, বড় আকার ভেদে ২/৪/৬ ফুট ব্যাসের একটি সার যুক্ত ১/২/৩ ফুট দৈর্ঘ্যের গোলাকৃতির কাঠের গুড়ি নিয়ে বাকলহীন মসৃণ করতে হয়। এরপর বাটাল দ্বারা ভেতরে খনন করে শূন্য করে বেয়েলের মতো করে দুই প্রান্তে সাধারণত ছাগল বা গরুর চামড়া দ্বারা পূর্ণভাবে আবৃত করা হয়। দুই মাথা বা মহিষের চামড়ার চিকন ফিতা দ্বারা চামড়ার ছাউনিকে এবং চাক দুটোকে টেনে বাঁধা হয়। সুরের সমন্বয়ের জন্য লোহা বা পিতলের রিং দ্বারা ফিতাগুলোকে এমনভাবে বাঁধানো হয় যাতে সামান্যও ঢিলা না থাকে।

**তবলা :** তালে তালে গানের সুর মিলাতে তবলার বিকল্প নেই। তবলা জয়া গাছ দিয়ে এবং বায়া মাটি দিয়ে তৈরি হয়। বায়া এখন সস্তা স্টিলেরও তৈরি হয়। তবে স্থানীয়ভাবে তবলা তৈরির দুএকটি উপকরণ পাওয়া গেলেও স্টিল বাইর থেকে এনে তবলা তৈরি করতে হয়। তবলা হচ্ছে মূলত ঢোলের অর্ধেক আকারের। বলা যেতে পারে ঢোল কেটেই তবলা তৈরি করা হয়েছে। তবে তার মধ্যে কিছুটা তারতম্য রয়েছে মাত্র।

**বাঁশি :** চিকন বাঁশ কেটে বাঁশের বাঁশি তৈরি হয়। এটি গানের সুরকে মোহনীয় করে তুলে।

*কক্সবাজার শহরে একজন শিল্পী বাঁশি তৈরি করছেন*

www.pathagar.com
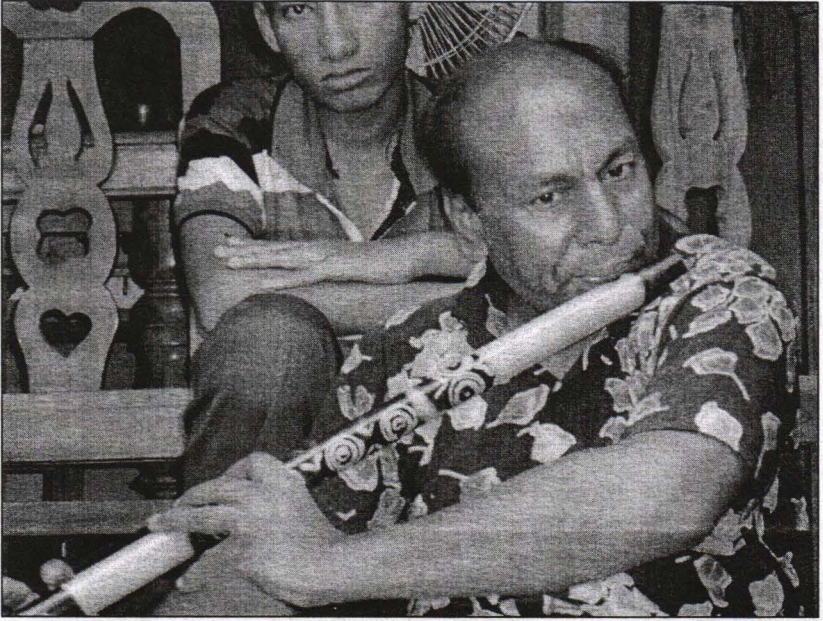
*কক্সবাজার শহরে শিল্পী বাঁশি তৈরি করে বাজাচ্ছেন*

**বাঁশের বাঁশি তৈরির প্রক্রিয়া :** বাঁশের বাঁশি কয়েক প্রকার বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। যা স্থানীয় বন-জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা হয়। এসব বাঁশের মধ্যে রয়েছে নলি বাঁশ, ডলু বাঁশ, পায়া বাঁশ, মুলি বাঁশ। প্রাচীনকালে এসব বাঁশের বলতে গেলে মূল্যই ছিল না। কিন্তু বর্তমানে একটি মুলি বাঁশের মূল্য ৭০ থেকে ৮০ টাকায় কিনতে হয়।

বাঁশি তৈরি করার জন্য পছন্দমতো বাঁশের পরেই দরকার যন্ত্রপাতি। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে হেস্‌কো ব্লেড, হাওয়া মেশিন, সুঁচালো রড, বাডিল, চাকু বা ছুরি, সিরিজ কাগজ, স্প্রিট বার্নিস, কফি বার্নিস, আটমাটি, রগতার।

বাঁশি তৈরি করতে প্রথমে বাঁশ বাছাই করে বাঁশের গিট ছেটে পরিষ্কার করতে হয়। প্রয়োজনে পানি দিয়ে ধুয়ে শুকনো কাপড় বা টিসু দিয়ে মুছে নিতে হবে। এরপরে তা রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো বাঁশের প্রয়োজনীয় অংশ কেটে নিয়ে বাঁশি তৈরি করতে হয়। বাঁশি ৮ ইঞ্চি থেকে ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। বাঁশ কেটে নেয়ার পরে নিম্নে অংশে সুরের জন্য প্রয়োজনীয় ২ ইঞ্চি পরিমাণ সমান্তরাল দূরত্ব রেখে উপরিভাগে পর পর ছয়টি ছিদ্র বা (কক্সবাজারের ভাষায় পুল) করা হয়। যে অংশ ঠোঁটে বা মুখে ধারণ করবে তার উপরিভাগেরও একটি গাট বা পুল বা ছিদ্র করতে হয় এবং এর নিম্নভাগে কাঠের ছোট একটি পাত সংযুক্ত করতে হয়। অবশ্য এর আগে বাঁশের ভেতরের গিট লম্বা রড দিয়ে গুতো দিয়ে ফেলে দিতে হবে। এরপরে সুঁচালো রড দিয়ে উপরে কথিত মতে ছিদ্র করতে হবে। এর মাধ্যমে হয়ে গেলো মনের মতো

www.pathagar.com

বাঁশের বাঁশি। এবার মনের মতো রঙ লাগিয়ে শুকিয়ে বাজারজাত করুন এবং ফুঁ দিতে থাকুন।

চারটি সার্ফের বাঁশি তৈরি করা যায়। আর তা হচ্ছে, 'এ', 'বি', 'সি' ও 'ডি' সার্ফ।

একটি বাঁশের বাঁশি সর্বনিম্ন ৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা দামেও বিক্রি হয়। তবে ইদানীং বাঁশির সমজদার দ্রুত কমে যাচ্ছে। বাঁশি বিক্রি করে কারো সংসার কোনো অবস্থাতেই চলবে না যদি না নির্দিষ্ট কোনো পেশা না থাকে।"[১]

**জিপসি :** টিনের তৈরি হালকা-পাতলা জিপসি হাতে বাজানো হয়। জিপসি স্থানীয়ভাবে তৈরি করা হয় না। অপরাপর বাদ্যযন্ত্রের মতো জেলার বাইর থেকেই জিপসি কিনে আনতে হয়।

**নাল :** ঢোল আর তবলার মতো বাদ্যযন্ত্র। বলা যায় ছোট ঢোল। এটাও লোকজ বাদ্য। নালও স্থানীয়ভাবে তৈরি করা হয় না।

**বেহালা :** বেহালা কাঠ ও চিকন তার দিয়ে তৈরি করা হয়। বেহালা কিন্তু এলাকার নিজস্ব লোকজ বাদ্যযন্ত্র।

**একতারা :** একতারা ও দোতারা এদেশের প্রাচীনতম বাদ্যযন্ত্র। একতারা প্রধানত বিভিন্ন প্রকার লোকসংগীত ও মরমি সংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। বড় আকৃতির পাকা লাউয়ের খোলস শুকিয়ে চিকন তার সংযুক্ত করে দোতারা তৈরি করা হয়। কিন্তু বর্তমানে পাকা লাউয়ের পরিবর্তে ভালো চামড়া দিয়েও একতারা বা দোতারা তৈরি করা হয়।

*একটি এক তারার ছবি*

**একতারা নির্মাণ-কৌশল :** বড় আকৃতির পাকা লাউ বা কদু পেকে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে গেলে তাই দিয়েই একতারা সৃষ্টি করা হয়। এ ধরনের লাউয়ের ৯ থেকে ১০ ইঞ্চি

www.pathagar.com

দৈর্ঘ্যের মোটা নিম্নাংশ করাত দিয়ে কাটা হয়। এরপর ভিতরের অংশের সবকিছু ফেলে দিয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে ৩ থেকে ৪ ফুট লম্বা একটি চিকন বাঁশের এক প্রান্তের গিট রেখে দিয়ে বাকি অংশটুকু করাত দিয়ে ফালি করে দায়ের সাহায্যে মসৃণ করা হয়। এরপর চিমটার আকৃতিতে বাঁশের গিটটি উপরে স্থাপন করে ফালিকৃত বাঁশের দুই প্রান্ত স্ক্রু-এর সাহায্যে খণ্ডিত লাউয়ের দুপাশে আটকানো হয়। এরপর বিশেষভাবে নির্মিত ক্রয়কৃত একটি তার বাঁশের গিঁট থেকে বাঁশের দুফালির মাঝামাঝি বরাবর নিচে এনে লাউখণ্ডের সাথে আটকানো চামড়ায় সংযুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে একটি একতারা নির্মাণ করা হলো।"[২]

## তথ্যনির্দেশ

১. রেজাউল করিম খান, পিতা : ইসহাক আলী খান, মাতা : আসমা বেওয়া, বয়স : ৪৮ বছর, গ্রাম : বাগাতিপাড়া, নাটোর। ২০০০ সাল থেকে কক্সবাজারে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলওয়ানজা ইউনিয়নের কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল সংলগ্ন উত্তর লারপাড়ায় বর্তমানের স্থায়ী নিবাস।

২. প্রফেসর মূফীদুল আলম, বয়স : ৭২, সভাপতি, সঙ্গীতায়তন পরিচালনা কমিটি, লালদিঘির পশ্চিম পাড়, কক্সবাজার। তারিখ : ২২-০৫-২০১৪, সময় : সন্ধ্যা : ৬টা।

www.pathagar.com

# লোকউৎসব

‘উৎসব’ হচ্ছে আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান। অন্য কথায়, যে সামাজিক-সাম্প্রদায়িক বা পারিবারিক সমাবেশ থেকে সুখ বা আনন্দ লাভ করা যায় তাকেই উৎসব বলে। আভিধানিক অর্থেও ‘উৎসব’ বলতে আনন্দময় অনুষ্ঠানকে বুঝায়। তবে সে-আনন্দের রূপ-চেতনা সবসময় একরকম হয় না। সেজন্যে পারিবারিক আঙিনায় সীমিত এবং দশজনকে নিয়ে কৃত উভয় অনুষ্ঠানকেই উৎসব বলা হয়।

ইংরেজি ‘ফেস্টিভ্যাল’ কথার অর্থও উৎসব। তবে একটু ব্যাপক অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সমাজের দশজনের সাথে এর সম্পর্ক। ব্যক্তি বা পরিবার সেখানে গৌণ, কখনো বা অনুপস্থিত। উৎসব সেখানে নির্দিষ্ট ঋতু বা দিনের অনুষ্ঠানমালার সমাহার। মোট কথা, বেশ বড় বা দেশব্যাপি সংঘটিত অনুষ্ঠানকে উৎসব বলা হয়ে থকে। প্রধানত সর্বসাধারণ বা বহুজনের জন্যে নির্দিষ্ট দিন, সময় বা ঋতুতে এক বা একাধিক স্থান কিংবা বিশেষ কোনো সমাজে বা সম্প্রদায়ে অনুষ্ঠেয় আনন্দজনক ক্রিয়া-কর্মই উৎসব।

প্রত্যেক জাতির জীবনে উৎসবের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের জনজীবনেও উৎসব সজীব ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এজন্যেই বুঝি বলে – বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ।

বাংলাদেশকে জানতে হলে এর জনজীবনের সঠিক পরিচয় জানা দরকার। সে-পরিচয়ের অনেকটা পাওয়া যায় বাংলাদেশের উৎসবে। আর তাই বাংলাদেশের উৎসবের উৎস, স্বরূপ ও ঠিকানা সম্পর্কে চূড়ান্ত খোঁজখবর অতি জরুরি। কেননা, এতে বাংলাদেশের জনজীবনের মৌলিক ঐক্যের সন্ধান মিলবে। সহজ কথায় বলা যায়, বাংলাদেশের আত্মা রয়েছে উৎসবের মধ্যে। উৎসবে কেবল সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপাদান লুকিয়ে নেই, মানুষে মানুষে সম্পর্কের উত্তম দিকগুলোও এতে লুকিয়ে রয়েছে। সমালোচকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই বলতে পারি–‘আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হোক, আমার শুভে সকলের শুভ হোক, এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।’ বাঙালি এই প্রাণের অধিকারী।

উৎসব ব্যতীত মানুষে মানুষে মিলনের এত বড় তীর্থ আর কিছুতেই নেই। গ্রামে যখন উৎসব হয়, তখন সমগ্র গ্রাম আনন্দে ও পরম শুভবোধে একটি পরিবারের রূপ ধারণ করে। দেশব্যাপি যখন উৎসব হয়, তখন সমগ্র দেশ ও জাতি বৈচিত্রের মধ্যেও এক অখণ্ড ঐক্যের অনুভূতিতে নিজের সার্থকতা যেন খুঁজে যায়। বাংলাদেশের সভ্যতার এটাই সমন্বয়ী প্রতিভা এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য।”[১]

www.pathagar.com

## ১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব

বাংলা নববর্ষের প্রথম মাস বৈশাখ। এই বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটি হচ্ছে বাঙালির উৎসবের উপলক্ষ। বৈশাখের প্রথম দিনটির আগমনে গোটা দেশ নবোদ্যমে, নব অনুপ্রেরণায় এবং নব অনুরাগে জেগে ওঠে। আনন্দের ফল্গুধারায় উচ্ছ্বাসঘন বাঙালি জাতি প্রত্যাশায় থাকে বৈশাখের প্রথম দিনটি উদযাপনে। সারাদেশ সাড়ম্বরে উপভোগ করে মেতে ওঠে বৈশাখি উৎসবে। বৈশাখ জাতীয় চেতনায় জেগে উঠার মাস। বৈশাখের প্রথম দিন সকলের আরাধ্য দিন হলেও বৈশাখ মাসব্যাপি চলে বৈশাখি রকমারি উৎসব। পুরো একটি বছরের দুঃখ, বেদনা, নৈরাশ্য পিছনে ফেলে বছরের নতুন এ দিনটি আসে। আমাদের মন তখন খুশিতে ভরে যায়, আমরা মেতে উঠি উৎসবে।

"জগতের সব জাতিই নিজ নিজ বছরের পয়লা দিনকে বরণ করে নেয়। আনন্দে উৎসবে দিনটিকে স্মরণীয় করে তোলে। প্রাচীনকাল থেকে এ রকম বর্ষবরণ প্রথা চলে আসছে। সকল জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এই নববর্ষ বা বছরের প্রথম দিনটিকে বরণ করে নেয়ার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। প্রাচীন আরবীয়রা 'ওকাজের মেলা', ইরানীরা 'নওরোজ উৎসব' এবং প্রাচীন ভারতীয়রা 'দোল পূর্ণিমার দিন' নববর্ষ উদযাপন করতো।

পুরাতনকে ধুয়ে-মুছে মানুষ চিরকাল নতুনের স্বপ্ন রচনা করে থাকে। এই তাৎপর্য নববর্ষ উদযাপনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। কবি রবীন্দ্রনাথ সেজন্যেই নববর্ষের আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন –

'এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।'

বছর শেষ হয়, আসে নতুন বছর। আসে নতুন আমেজ। পুরাতনের বিদায়ে আঁখিজল না ফেলে নতুনকে বরণ করাই উত্তম।

বাংলা নববর্ষের একটি ইতিহাস আছে। বাংলা নববর্ষের প্রবর্তন হয় ষোড়শ শতকে। মোঘল-সম্রাট আকবর তখন দিল্লীর শাহী তখতে সমাসীন। তখন বাংলাদেশ ছিল মোঘল-সম্রাটের করদ-রাজ্য। মৌসুমের প্রথম দিনে অর্থাৎ পয়লা বৈশাখে বাঙালি প্রজাদের খাজনা আদায় করা হতো। এটা শুকনো মৌসুমে বলে খাজনা আদায়ের সুবিধাও ছিল।"[২]

বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ উদযাপন এদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্য। এই দিনটিকে উদযাপনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সেই প্রাচীনতম ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক প্রবাহকে বাঁচিয়ে রেখেছি। নতুনকে গ্রহণ করার, পুরাতনকে মুছে ফেলার ও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা আমরা গ্রহণ করে থাকি নববর্ষ উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে। এ দিনটির গুরুত্ব এখানেই। বাংলাদেশের উৎসবাদির মধ্যে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে

www.pathagar.com
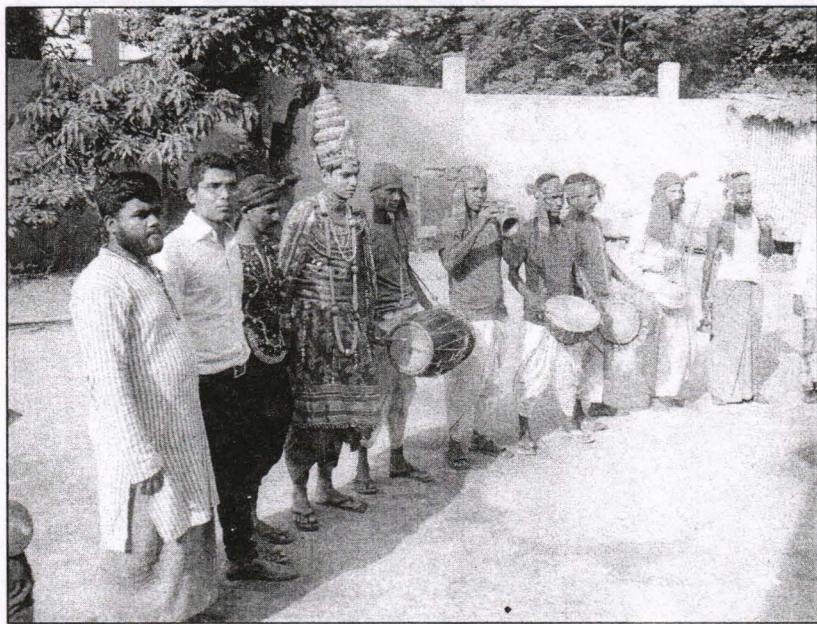
বাংলার নববর্ষ উপলক্ষে শহরের গোলদীর্ঘির পাড় থেকে র‍্যালি বের হচ্ছে


www.pathagar.com
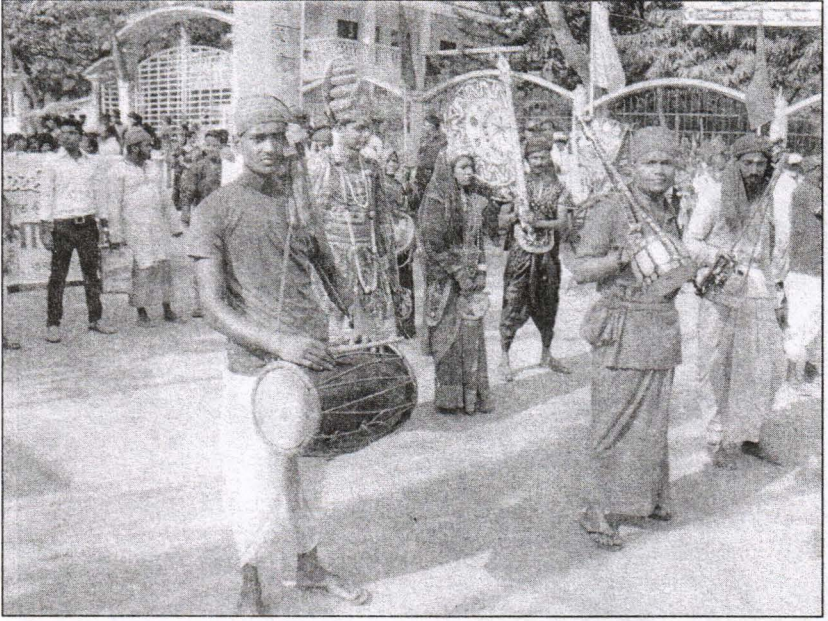
*বাংলার নববর্ষ উপলক্ষে শহরের গোলদীর্ঘির পাড় থেকে র‍্যালিতে বাদক দল*

নববর্ষ শ্রেষ্ঠতম উৎসব, এ কথা খুবই সত্য। এসব কারণেই এদিনে সমগ্র দেশ উৎসবে ভাসতে থাকে। দেশের সাথে সংগতি রেখে কক্সবাজারও এই উৎসব থেকে পিছিয়ে নেই। বরঞ্চ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম উৎসবের আয়োজন করে থাকে। কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে আমরা দেশবাসী পরিচিত হওয়ার সুয়োগ হয়েছে। কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায় নববর্ষকে বরণ ও পুরোনো বছরকে বিদায় উপলক্ষে আয়োজন করে থাকে সপ্তাহব্যাপি অনুষ্ঠানমালার। সপ্তাহব্যাপি অনুষ্ঠানমালার অর্ধেকেই রয়েছে উৎসব, সাথে রয়েছে ধর্মীয় ক্রিয়া।

প্রাচীনকালে কক্সবাজারের কিছু কিছু এলাকা বোমাং সার্কেলের আওতাধীন ছিল। ফলে বোমাং সার্কেলের আওতাধীন প্রজাগণকে জমির খাজনা প্রদান করতে হতো বোমাং রাজার কাছে। বোমাং রাজা বাৎসরিক খাজনা আদায় উপলক্ষে আয়োজন করতেন 'পূণাহ্য'-এর। এই পূণাহ্য উপলক্ষে দু'দিনের উৎসব বসতো, যা বান্দরবানে এখনো অব্যাহত রয়েছে।

বছরের প্রথম দিনের উৎসব আয়োজনে থাকে বৈশাখি খাবার হিসাবে পান্তাভাতে ইলিশ, গির্মী তিতা, মামিনা তিতা শাক, তিতা করলা, শাক্‌সবজি ইত্যাদি রান্না করে সবাই মিলে মিশে খায়। দিনভর চলে আনন্দ উৎসব। সন্ধ্যায় বা রাতে ঘটা করে শুরু করে লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য আনন্দ পর্ব। ভেদাভেদ থাকে না হিন্দু,

www.pathagar.com

মুসলমান, বৌদ্ধের মধ্যে। সবাই মিলিত হয়ে উপভোগ করে বৈশাখি উৎসব। বৈশাখি উৎসব নিয়ে লোকশিল্পীরা গেয়েছেন–

"উইল্লেরে বৈশাখের চাঁন,
আড়ি মাপি বেচের ধান
ভাতর মোচা দ'না বাঁধি বউ জুরিত যাম
ভাতর মোচা হাতত লৈ
পচিম কূলে পারার গৈ
সুন্দর বধু জুরি আইস্যে পাঁচশ টিয়া লৈ
পাঁচশ টিয়া খরচ পাই
খুশী অইয়ে বাপ অ মাই
আঁর মাইয়া এই বৈশাখত দিয়ুম রে লামাই।"[৩]

আবহমান বাংলার লোকজীবনে বৈশাখ অত্যন্ত আনন্দের মাস। নতুন বছরকে নতুন করে বরণ করার জন্যই এ বৈশাখি উৎসব। এ উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে জৈষ্ঠ্যমাস পর্যন্ত চলে বলী খেলা ও বৈশাখি মেলা। রকমারি আয়োজনে এ উৎসব হয়ে ওঠে জাতীয় উৎসবে।

"নববর্ষের উৎসবে, নবান্নের উৎসবের মতো সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফুর্ত। স্বতঃস্ফুর্ত আনন্দ- উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের সিংহভাগ মানুষ দরিদ্র শ্রেণির। গ্রামের মানুষ এই দিনটি আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়। গ্রামের সাধারণ কৃষকও এই দিনটির কথা মনে রাখে।

নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় যেমন থাকে চারুশিল্পের সম্ভার, তেমনি থাকে কারু ও দারুশিল্পসহ হস্তশিল্পের বিপুল সমাহার। এই ধারা চলে আসছে সেই শতাব্দীকাল থেকে। দেশে এই সংস্কৃতি এখনো বহমান।

কক্সবাজার অঞ্চলের সংস্কৃতির রয়েছে আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য। নববর্ষের উৎসবে রয়েছে তারই প্রভাব। এ অঞ্চলের সংস্কৃতিতে রয়েছে দ্রাবিড়, আর্য, রাখাইন, হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান।

এখানে উল্লেখ্য যে, কক্সবাজার অঞ্চলে মুসলিম, হিন্দু, রাখাইন, মারমা, চাকমা, চাক ও খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকজনের বসবাস। এ অঞ্চলের সংস্কৃতি ও লোকউপাদানে যুক্ত হয়েছে আরবি, ফার্সি, আর্য, পর্তুগিজ ও দ্রাবিঢ়ীয় সংস্কৃতির আচার-অনুষ্ঠানের উপাদান। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী পৃথক পৃথক আঙ্গিকে পালন করে বাংলা নববর্ষ, বিযু, বিযু ও সাংগ্রেং পোয়ে বা সাংগ্রে উৎসব। এখানে ভিন্ন ভিন্ন নামে উদযাপিত হয় বাংলা নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষের উৎসবের সঙ্গে আমাদের দেশের অর্থনীতির রয়েছে একটি সুপ্রাচীন সম্পর্ক। কৃষিনির্ভর আমাদের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই অর্থনীতি সীমিত পরিসরে সক্রিয় থাকে নববর্ষের উৎসবে। হালখাতা অনুষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ এই অর্থনীতির একটি বাস্তব রূপ।

www.pathagar.com

কক্সবাজার অঞ্চলে বাংলা নববর্ষকে ঘটা করে উদযাপন করা হতো সেই প্রাচীনকাল থেকেই। নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গরুর লড়াই, বৈশাখি মেলা, বিয়ু খেলা, সূর্য খেলা, বলী খেলার আয়োজন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এসব আয়োজন ছাড়া বাংলা নববর্ষ উদযাপন কল্পনা করাই যেত না। এছাড়াও বিয়ুফুল তোলা, ঘরের দরজা এমনকি ঘরের আঙিনায়, ব্যবসায়ীরা দোকানের দরজায় বিয়ুফুলের মালা এবং নিম পাতা টাঙানো, তিতাশাক খাওয়া, ঘরে দুর্বাঘাসের ব্যবহার, চারু ও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, মিষ্টান্নদ্রব্য তৈরি এবং তা বিতরণ ইত্যাদি অন্যতম।

গত কয়েক দশক আগেও বৈশাখি মেলা ছিল এ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগণের আনন্দ-উৎসবের প্রধান মাধ্যম। এই বৈশাখি মেলার জন্য কামার, কুমারসহ বিভিন্ন হস্ত শিল্পের সাথে জড়িত পরিবার দীর্ঘ অপেক্ষা করতো। বিশেষ করে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির উপর নির্ভরশীল ছিল তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। গ্রামের জনগণ তাদের এক বছরের পারিবারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিশেষ করে তৈজসপত্র বৈশাখি মেলা থেকে কিনে মজুদ রাখতো। বিশেষ করে ধান, চাল রাখার মটকা ও গজি (মাটির বড় পাত্র), মাটির বাসন (মাটির সানকি) পেয়ালাসহ যাবতীয় তৈজসপত্র, দা, যাতাসহ অন্যান্য হস্তশিল্পপণ্য। সবার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস ছিল বৈশাখি মেলা থেকে কেনা সামগ্রী বেশি মজবুত ও টেকসই। নববিবাহিত স্ত্রীর জন্য তার স্বামী সবার অজ্ঞাতে বৈশাখি মেলা থেকে কিনে আনতো বাতাসা, নাড়ু, জিলাপিসহ মিষ্টান্নদ্রব্য। আবার অনেক ক্ষেত্রে হবু বর বাগদত্তা স্ত্রীর জন্য বৈশাখি মেলা থেকে মিষ্টান্ন দ্রব্য কিনে রাতের বেলায় বাগদত্তাকে দেখতে যেতো। অথবা স্ত্রীর ছোট ভাই, নানা-দাদা বা নিকটআত্মীয়কে দিয়ে (স্ত্রীর বাবা-মা'র অজ্ঞাতে) বাগদত্তা স্ত্রীর কাছে পাঠাতো। এসব করতো নির্মল ভালোবাসার আকর্ষণে, যা বর্তমানে কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে।

নববর্ষ উপলক্ষে গ্রামীণ জনপদে তিতা শাক সংগ্রহের সাড়া পড়ে যেতো। পরিবারের সবাইকে তিতা খেতেই হতো। এছাড়াও দ্রাবিড়দের প্রতীক দুর্বাঘাস ছিল এ অঞ্চলের গ্রামীণ জনপদের অন্যতম সাংস্কৃতিক উপাদান। দুর্বাঘাসের ব্যবহার ছিল লক্ষণীয়। মাঠে নুতন ধান লাগাবার সময়, গোলায় ধান ফেলার সময়, নুতন বাড়িতে প্রবেশ করার সময়, ঝাড়-ফুঁক ও নববর্ষসহ বিভিন্ন উপলক্ষে এই দুর্বাঘাসের ব্যবহার ছিল লক্ষণীয়। প্রধানত মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রবণতা ছিল বেশি; বর্তমানে যা লুপ্তপ্রায়।

গরুর লড়াই ছিল এ অঞ্চলের নববর্ষ উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। গরুর লড়াই উপলক্ষে হাট-বাজারে ঢোল পিটিয়ে জনগণকে জানান দেয়া হতো। পূর্বনির্ধারিত স্থানে ও সময়ে গরুর লড়াই হতো। পাশাপাশি দুটি গ্রামের বা দূরবর্তী গ্রামের দুটি গরুর মধ্যে লড়াই হতো। গরুর লড়াইকে কেন্দ্র করে অনেক সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ পর্যন্ত হতো। গরুর লড়াইকালে অনেক গরু মারা যাওয়ার নজিরও রয়েছে। বার্ষিক গরুর লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য অনেক পরিবার দু'চারটি গরুকে বলবান করে তুলতো। যার

www.pathagar.com

গরু লড়াইয়ে বিজয়ী হতো গ্রামে তার ছিল আলাদা সম্মান। তাকে সবাই সমীহ করে চলতো। নববর্ষে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এই গরুর লড়াইয়ের আয়োজন করা হতো।

অবশ্যি ইদানীং গরুর লড়াই সংস্কৃতি আমাদের এ অঞ্চল থেকে বলতে গেলে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির মন্দাভাবের কারণে লোকজন পূর্বের মতো গরু পুষতে পারছে না। তাছাড়াও পূর্বের মতো শুষ্ক মওসুমে এখন জমি পতিত থাকছে না। জমিতে হচ্ছে দু'তিন ফসলা চাষাবাদ। গরুর চারণক্ষেত্র যেমন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে তেমনিভাবে দু'একটি গরু থাকলেও লড়াইয়ের জন্য উন্মুক্ত জমি নেই।

পূর্বে বৈশাখি মেলার সাথে বলী খেলা ছিল এ অঞ্চলের সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। বৈশাখি মেলার পাশাপাশি বলী খেলা লোকজনকে দিতো নির্মল আনন্দ। লোকজন প্রচণ্ড উত্তেজনা চেপে রেখে বলী খেলা উপভোগ করতো। বড় বড় বলী বা কুস্তিগীরের জন্য নির্ধারিত থাকতো বাদক দল।"[৪]

## ২. রাখাইন সম্প্রদায়ের বর্ষবরণ উৎসব (সাংগ্রেং পোয়ে)

"কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায়ের বর্ষবরণ উৎসব তথা মাহা সাংগ্রেং পোওয়ে/Maha Thon Gran Powe' উদযাপনের মাধ্যমে পুরোনো বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। বাংলা ভাষাভাষীরা এ উৎসবকে পানিখেলা বা জলকেলি বা জল সিঞ্চন উৎসব (Water Festival) বলে। সাংগ্রেং এর শাব্দিক অর্থ সংক্রান্তি। প্রতি বছর ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উৎসবটি পালন করা হয়। সামাজিক উৎসবের মধ্যে সাংগ্রেং উৎসবটি সর্ববৃহৎ ও আনন্দ উপভোগের উৎসবও বটে। সাংগ্রেং পারস্পরিক মৈত্রী বন্ধনকে আরো দৃঢ় ও গাঢ় করে তোলে। কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই এ উৎসবে কয়েকদিন আনন্দে মেতে ওঠে। সাংগ্রেং উৎসবের কয়েকদিনে সব দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে সবাই একাকার হয়ে যায়। এ যেন বছরের এক দীর্ঘ প্রতিক্ষীত সময়। তরুণ-তরুণীদের এ উৎসব কবে আসবে দিনক্ষণ গুনতে দেখা যায়। সাংগ্রেং যেন নিজের অন্তরে গচ্ছিত ও পুঞ্জিভুত গোপন আপন সব কথা প্রিয়জনকে বলার সূবর্ণ সুযোগ করে দেয়। সাংগ্রেং একে অপরকে খুব কাছে এনে দেয়। তাই সাংগ্রেং রাখাইন সম্প্রদায়ের এত আনন্দের ও সুখের। এ উৎসবের প্রধান তিনটি দিক হচ্ছে ১) ধর্মীয় আচারাদি পালন, ২) আনন্দ উপভোগ ও ৩) রাখাইন সংস্কৃতির ধারায় সৃষ্ট কৃষ্টিকে লালন। ধর্মীয় আচারাদি ও আনন্দোৎসব পালন ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হলেও রাখাইন সংস্কৃতিধারায় সৃষ্ট কৃষ্টিকে সকলেই গুরুত্ব দিয়ে পালন করে থাকে।

সাধারণত ধর্মীয় পুরোহিত এবং জ্যোতিষীরা গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বিশ্লেষণ করে ঠিক করেন কোন দিন সাংগ্রেং হবে। কোন দিন আচাটাক হবে। আচাটাক দিনের কোন সময়ে কী করণীয় ইত্যাদি তারাই ঠিক করে দেন। বাংলাদেশে রাখাইন জ্যোতিষী না

www.pathagar.com

থাকায় কিংবা সংখ্যায় কম থাকায় মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে আসা 'রাখাইন বর্ষপঞ্জি' মোতাবেক সাংগ্রেং উৎসব আয়োজন করা হয়। প্রতিবছর সূর্য যখন মেষ রাশিমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন মধ্য এপ্রিলে রাখাইন নববর্ষের সূচনা হয়। সাধারণত খ্রিষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর রাত ১২টা থেকে ক্ষণ অতিক্রম হওয়ার সাথে সাথে খ্রিষ্টাব্দে নববর্ষ আগমন হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। তবে রাখাইনদের নববর্ষের প্রারম্ভ কিন্তু ১২টা অতিক্রমের দিবসে যে-কোনো সময়ে নববর্ষ সূচনা হয়ে থাকে। এ সময় বৃক্ষরাজি নব পল্লবে মুকুলিত হয়। প্রস্ফুটিত হলুদ ফুলের পাপড়ি, ময়ূয়ের রক্তোজ্জ্বল পালক এবং তৃষিত মাটির ফলকে আমাদের বিশ্ব হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাখাইন সংস্কৃতি এভাবে নবায়িত হয়।

সাংগ্রেং কয়েকদিন ধরে স্থায়ী থাকে। ১ম দিন (আক্যানে/Aa Kya Nay), ২য় দিন (আ ক্যে নে/Aa Kyat Nay), ৩য় দিন (আচাটাক/Aa Ca Tak), ৪র্থ দিন (আ প্যেং নে/Aa Pyan Nay)। প্রথমদিকে ছাত্রছাত্রীরা পরে এলাকাভিত্তিক নারী-পুরুষেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে সারিবদ্ধভাবে নানা রকম বাদ্যযন্ত্র সহকারে বৌদ্ধবিহারে গমন করে। শোভাযাত্রায় অগ্রভাগে থাকে একজন ঘণ্টাবাদক, ছেং গ্যে/ Than Gyay নামক বিশেষ ধরনের ঘণ্টা বাজিয়ে শোভাযাত্রীদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে চলে। তারপরে কমবয়স্ক ছেলেরা মাটির তৈরি কলসীভারকে কাঁধে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে এগোতে থাকে। তার পেছনে অপেক্ষাকৃত বয়স্করা কল্পতরু (প্রাডেছা/Pra Dey Tha) বহন করে। পরে সকল বয়সের নারী পুরুষেরা বিভিন্ন দানসামগ্রী (চাল, চিনি, দুধ, কলা, নারকেল, মোমবাতি, দিয়াশলাই ইত্যাদি) বহন করে। শেষ পাদে থাকে বাদকদল। একদা নিজেদের ঐতিহ্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করলেও বর্তমানে বাদক ও যন্ত্রের অভাবে সুলভে প্রাপ্ত ঢোলবাদক বা ব্যান্ড পার্টিকে ভাড়ায় এনে ব্যবহার করা হয়। সোজা কথায় শোভাযাত্রাটি যে পাড়ার বা মহল্লা থেকে আয়োজন করা হোক না কেন উক্ত এলাকার আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলে অংশগ্রহণ করে ও উপভোগ করে। শোভাযাত্রাটি নির্দিষ্ট বৌদ্ধবিহার গিয়ে বুদ্ধমূর্তিসমূহকে বিভিন্ন সুগন্ধি মিশ্রিত জলের সাহায্যে স্নান করে। অতঃপর পুরোহিতের নিকট শীল গ্রহণ ও ত্রিরত্ন বন্দনাক্রমে দান সামগ্রী উৎসর্গ করা হয়।

অতঃপর সুগন্ধযুক্ত জল ও চন্দনপানি দিয়ে বুদ্ধের মূর্তিগুলোকে পরিষ্কার কিংবা স্নান করাতে হয়। একে রাখাইন ভাষায় 'ফারা রিসো পোওয়ে/ Fa Ra Ri Sho Powe' বলা হয়। যাকে বুদ্ধের স্নান উৎসবও বলা যায়। বিহারে অবস্থানরত পুরোহিত দায়ক ও শিষ্যরা এ সময় বুদ্ধমূর্তিকে নানা রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে পরিষ্কার করে। 'ফারা' অর্থ বুদ্ধ, রিসো' অর্থ জল তথা স্নান করা, 'পোওয়ে' অর্থ উৎসব। এ উপলক্ষে বৌদ্ধ বিহারসমূহকে আলোকসজ্জাসহ বিহারে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। যার যার সাধ্যমত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিহারে দানসামগ্রী বিতরণ করে থাকে। অবস্থাপন্ন ও বিত্তশালীরা এ সময়ে দুঃস্থ ও গরীবদেরকে সাহায্য করে থাকে, যাতে করে তারাও এসব মহতী অনুষ্ঠানে সসম্মানে অংশ নিতে পারে। বুদ্ধ যেন অহিংসা পরমধর্মের বাণীটা সবাইকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন।

www.pathagar.com

কক্সবাজারে রাখাইনদের সাংগ্রেং বা নববর্ষ উৎসবের দৃশ্য।

কক্সবাজারে রাখাইনদের নববর্ষ উৎসব সাংগ্রেং এর সমাপনী দিন বৃহস্পতিবারের দৃশ্য।

www.pathagar.com

কক্সবাজারের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রাখাইনদের বর্ষবরণ উৎসব সাংগ্রেং উপলক্ষে তরুণ-তরুণীদের আনন্দ-উল্লাস

www.pathagar.com

রাখাইনন্দের শেষ দিবসকে 'আচাটাক' বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জন্মদিন পালনের রেওয়াজ আছে। সাধারণত ইংরেজি পঞ্জিকা অনুযায়ী জন্মদিন পালন করে থাকে। তাই জন্মদিনে জন্মতারিখ ঠিক থাকলেও জন্মবার ঠিক নাও থাকতে পারে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার যে, রাখাইন সম্প্রদায়ের জন্মবার জন্মদিন কেউ কেউ পালন করলেও সবাই 'আচাটাক' দিনে অর্থাৎ নির্দিষ্ট বারে জন্মগ্রহণকারী রাখাইন নর-নারীরা জন্মদিন হিসাবে পালন করে থাকে। উদারহরণ স্বরূপ : মাম্যাচিনের জন্মবার মঙ্গলবার আর 'আচাটাক' দিনও মঙ্গলবার। তাই বছরে 'আচাটাক' হবে মাম্যাচিনসহ মঙ্গলবারে যাদের জন্ম তারা সবাই দিবসটাকে জন্মদিন হিসাবে পালন করবে। ক্ষণ পরিক্রমায় সবাইকে এ দিবস পালন করতে হয়। সে বারে জন্মিত সকলেই মাথার চুল ধৌত করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে বিশেষ প্রার্থনা ও পূজার অর্ঘ্য নিবেদন ও মিষ্টান্ন বিতরণ করতে হয় যাতে করে বিশেষ আর্শীবাদ পুষ্ট হয়ে অনাগত দিনে সুখে শান্তিতে দিনাতিপাত করতে পারে। পরলোকগতদের সদগতির জন্য পিণ্ডদান করা হয়। প্রত্যেক বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন মেন্যুতে তিতা জাতীয় সব্জি পাক করে থাকে।

এতে কেক কাটা আয়োজন না থাকলেও আয়োজনে কোনো কমতি নেই। বাড়িতে বাড়িতে তখন হরেক রকমের মিষ্টান্ন খাবারদি তৈরি করা হয়। বন্ধু-বান্ধবসহ ঘনিষ্ঠ সকলকে নিমন্ত্রণ করে এদিনে আপ্যায়ন করা হয়। আর সবার ঘরে ঘরে মিষ্টান্ন খাবার পাঠিয়ে দেয়া হয়। বলতে গেলে সবাইকে এ বিশেষ দিনে সাধ্যমত আপ্যায়ন করা সবারই সাধ থাকে। এ দিনে জন্মগ্রহণকারী সবাই ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি অনুযায়ী সর্বপ্রথম বিহারাধ্যক্ষকে মিষ্টিমুখ করান। আর পঞ্চশীল ও অষ্টশীল পালন করতে হয়। বয়স্করা উপোষথ (ওভৌ) পালন করলেও তরুণ-তরুণীরা সাংগ্রেংর আমেজে পালন করতে পারে না। যথারীতি তারা বিহারে গমন করে বুদ্ধপূজা, পুষ্পপূজা প্রদীপপূজা করে থাকে। এ সময়ে বৌদ্ধ বিহারসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে ওঠে রাখাইনদের মিলনক্ষেত্র। সকলেই পুষ্প, মোম আর অর্ঘ্য সামগ্রী নিয়ে প্রার্থনা করে পুরোনো দিনের সকল কালিমা ও ভুল থেকে অব্যাহতির জন্যে এবং অনাগত দিনে যাঁতে সুঃখ-শান্তিতে উৎকণ্ঠামুক্ত পরিবেশে বসবাস করতে পারে সে কামনা করে।

মূলত 'আচাটাক'-এর পরদিন হলো রাখাইন সম্প্রদায়ের নববর্ষের সূচনা-দিন। সাংগ্রেং উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য বিষয় হলো রাখাইন কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের পানি খেলার উৎসব (রিলং পোওয়ে/ Ri Laung Powe)। পানি খেলা উৎসব প্রধানত তিনদিন হয়। দেশে রাখাইন অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় এ উৎসব ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন তারিখে পালিত হতে দেখা যায়। এ উপলক্ষে প্রতিটি মহল্লায় বা পাড়ায় কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা স্ব-স্ব বন্ধু-বান্ধবী, সহপাঠী ও সমমনাদের সাথে সববেত হয়ে বনভোজন আয়োজন করে থাকে। তরুণীরা বিশেষ আকারে প্যাণ্ডেল (মেংডেৎ) তৈরি করে নানা ধরনের তাজা ফুল, পত্র-পল্লব দিয়ে

www.pathagar.com

প্যাণ্ডেল সাজানো হয়। প্যাণ্ডেলসমূহে একদা লাল রংয়ের কৃষ্ণচূড়ার ফুল দেখা গেলেও বর্তমানে প্রাকৃতিক কারণে কৃষ্ণচূড়ার ফুল সহজে দেখা মেলে না। মেয়েরা সজ্জিত হয়ে একই রং ও ডিজাইনের পোশাক পরিধান করে। যা দেখে তাদের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ অন্য এলাকায় প্যাণ্ডেলের তরুণীরা ঈর্ষান্বিত হয় এবং পানি খেলার জন্য আগত বিভিন্ন তরুণের দলকে সহজে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এসব মেংডেৎতে পানি রাখার জন্য বড় বড় পাত্র, ড্রাম ইত্যাদি রাখা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে ছোট ছোট নৌকা ব্যবহার করতেও দেখা যায়। সাংগ্রেং উৎসব উপলক্ষে একদা রাখাইন অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে নৌকা বাইচ, কুস্তি প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য আনন্দোৎসবসমূহও মহাসমারোহ অনুষ্ঠিত হতো। বর্তমানে এসব প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি বন্ধ হয়ে গেছে।

পুরোনো বছরের পাপ পঙ্কিলতাকে জল দিয়ে ধুয়ে মুছে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো আনন্দের বহিঃপ্রকাশই সাংগ্রেং উৎসব। এ উপলক্ষে সবাই বাড়িঘর পরিষ্কার করে, হিসাবাদি হালনাগাদ করে। গেল বছরের দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে অনাগত দিনের সুখ প্রত্যাশা করে। আনন্দ লাভের সুযোগ ও উপায় হচ্ছে এ সাংগ্রেং উৎসব। অনেকের কাছে নতুনভাবে বেঁচে থাকার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে পারে। এ সময়ে তরুণ-তরুণীদের অবাধে কথা বলার স্বাধীনতা থাকে। আর যারা এতদিন সামাজিক ও পারিবারিক বলয়ের কারণে নিজের প্রিয়জনকে কিছু বলতে চেয়েও বলার সুযোগ হয়নি তারা এ সময়ে কাঙ্ক্ষিত সুযোগটি অনায়াসে পেয়ে যায়। তরুণ-তরুণীদের এভাবে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখে এবং সর্বোপরি জলকেলির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকে উৎসবোত্তর তাদের মাঝে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারে। যারা একই পেণ্ডেলে কিছুক্ষণ জলকেলি উৎসব উপভোগ করার জন্য থেকেছে, তারা দেখে থাকবে বিভিন্ন দলের তরুণ একজন তরুণীর সাথে কথা বলেছে এবং জলকেলিতে অংশ নিয়েছে।

পাড়ায় বা মহল্লায় কিশোর, তরুণ ও বয়স্কদের আয়োজিত বনভোজন বা Cocktial Party তে আনন্দ হৈ হুল্লার দৃশ্য অবলোকন করলে দুঃখী মনও কিছুক্ষণের জন্য আনচান করে। আনন্দের আতিশ্যয্যে নেশা জাতীয় পানীয় পান করে পাশ্চাত্যের ডিসকো, ব্রেক ড্যান্স করে উপস্থিত সকলকে মাতিয়ে রাখে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট বালতি কিংবা পানি ছিটানোর নানা যন্ত্র দিয়ে পরিধেয় কাপড় ভিজিয়ে দিতে পারে। তারা রাখাইন পল্লিতে অলি গলিতে ওৎ পেতে থাকে। যখনি অভেজা লোক পাবে তখনি তারা জল ছুঁড়ে ভিজিয়ে দিয়ে আনন্দ লাভ করে। এ ব্যাপারে কেউ প্রতিবাদ করলে স্বাভাবিকভাবে ছেলেমেয়েরা দুঃখ পায়। যারা ভিজতে চায় না তারা এ উৎসবে রাখাইন পাড়া/ মহল্লায় প্রবেশ না করলে ভালো হয়।

মেংডেৎগুলোতে মেয়েরা সজ্জিত হয়ে বসে থাকে। ছেলেরা বিভিন্ন ধরনের উল্লাস ধ্বনি (লেঃ লেঃ লেঃ লেঃ মংরো মংরো) করে একটির পর একটি পেণ্ডেলে গিয়ে জলকেলিতে অংশ নেয়। তরুণের দল আসলে মেয়েরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। দলে মনের মানুষ থাকলে ব্যস্ততা একটু বাড়বে বৈকি! জলকেলিতে সাথী কে হবে এ ধরনের কোনো নিয়মনীতি নেই। মেয়েদের জন্য প্যাণ্ডেল নির্ধারিত আছে বিধায় তারা অন্য

www.pathagar.com

কোনো প্যাণ্ডেলে যেতে পারে না। তরুণেরাই নিজেদের সমঝোতার মাধ্যমে সাথী ঠিক করে নেয়। এক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সুবিধা বেশি থাকে। কেন না, কোনো ছেলে যে-কোনো মেয়েকে আমন্ত্রণ করলে মেয়েকে জলকেলিতে সাথী হতে হয়। পক্ষান্তরে কোনো মেয়ে এভাবে কোন ছেলেকে কোনোভাবে আমন্ত্রণ করতে পারে না। কার্যত ছেলেদের আহ্বানে মেয়েরা সম্মত হয় বলে ছেলেরা নিজ নিজ পছন্দমত মেয়েকে সাথী করে। এভাবে কয়েক যুগলের জলকেলির দৃশ্য সকলের নিকট উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ফাঁকে ফাঁকে তারা তাদের ব্যক্তিগত ও মনের কথা এ সময়ে ব্যক্ত করতে পারে। পরস্পর অপরিচিত হলেও পরিচয়ের সূচনাপর্ব এ সময়ে ঢুকে যায়।

এভাবে ১ম, ২য় ও ৩য় দিনে জলকেলি চলে আনুষ্ঠানিক ও সীমিত সময়ের মধ্যে। অনানুষ্ঠানিকভাবে পেণ্ডেলের বাইরেও জলকেলি হতে পারে। মোদ্দা কথা, এ উৎসবে সবারই পরিধেয় কাপড় ভিজতে হবে। শেষদিনে সাংগ্রেং উৎসব স্বাভাবিকভাবে উত্তেজনা ও আনন্দদায়ক হয়। শেষদিন বলে অনেকেই মন খারাপ করে বলে যে, আরো কয়েকদিন জলকেলি চল্‌লে মহাভারত কি অশুদ্ধ হতো! শেষদিনে জলকেলির বিদায়ক্ষণে ছেলেদের আহ্বানে মেয়েরা খুব সন্নিকটে এসে আপাদমস্তক 'মেই তাহ রী/Mai Tah Re' নামক সোহাগের জল দিয়ে ভিজিয়ে দেয়। প্রত্যুত্তরে মেয়েরাও ছেলেদেরকে ভিজিয়ে দেয়।

আইন শৃংখলা বজায় রাখার জন্য তরুণীদের পেণ্ডেলে অভিভাবকদের মধ্য হতে দু'একজনকে নিয়োগ করা হয়। কোনো আবদার, অনুযোগ, অভিযোগ থাকলে তারা নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের নিকট শরণাপন্ন হয়। এরূপ নিয়োগ লাভের ব্যক্তিদেরকে মেংডেৎ শাং/মেংডেৎ শাংমা বলে। এরাই সমস্যাদি সমাধা করে। অবশ্য সাংগ্রেং উৎসব উপভোগের জন্য বিভিন্ন পেণ্ডেলে অত্যধিক ভিড় পরিলক্ষিত হয় বিধায় পুলিশ দিয়েও পাহারার ব্যবস্থা করে থাকে। সাংগ্রেং উপলক্ষে বিশেষ সাংগ্রেংর গান (ছেং গ্যাই/ Than Gyi) রচনা করা হয় এবং প্রত্যেকে তা গাইতে শোনা যায়। তবে দুঃখের বিষয় রাখাইন শিল্পীরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত বাদ্যযন্ত্র ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সাংগ্রেং গীত বের করতে পারে না। এখানকার সাংগ্রেংর গীত পেলে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে প্রচারিত সাংগ্রেং গীতের জন্য আগ্রহ থাকত না বলে অনেকের অভিমত।

সাংগ্রেংতে জনপ্রিয় একটি গান নিম্নে তুলে ধরা হল :

লেঃ লেঃ... লেঃ লেঃ
মংরো মংরো... মংরো মংরো
পেং পাদাউশে পোওয়াংরে লা,
সাংগ্রেং ক্যালোঃ মংরো প্যরে।
মেরীশে আহলা পাঃ
মেংডেৎ থেকা চাউংলো ক্রোরে
সাংগ্রেং রি ঈরে ঈরে

www.pathagar.com

মেরীশে হ্লারে হ্লারে।
রোঃ রা গো থিং ছিং কেৎ পা
চাইংলা গো ম্রেঃ নোঃ গেঃ পা।
রোঃ রা হিমা য়াইং ক্যোঃ বা রে।
চাইংলা হিমা লুম্যোঃ হেংরে।
**অনুবাদ :**
লেঃ লেঃ ... লেঃ লেঃ
মংরো মংরে ... মংরো মংরো
রাঙা পুষ্প শোভিত এ মাসে
আত্মহারা হই সাংগ্রেংর আনন্দে।
এ শুভ দিনে তুলনাহীন তুমি,
প্যাণ্ডেলে বসে স্বাগত জানাও
সাংগ্রেংর জল হিমশীতল,
সুন্দরী তুমি অপূর্ব।
কৃষ্টিকে লালন করো,
ঐতিহ্যকে ধরে রাখো।
কৃষ্টিতেই সভ্যতার পরিচয়,
ঐতিহ্যেই জাতি পরিচয়।"[৫]

## ৩. নবান্ন

নবান্ন আসলে শস্যের উৎসব। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসেই নবান্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় পৌষ পার্বনেও নবান্ন উৎসব হয়ে থাকে। কিন্তু আবহাওয়ার কারণে কক্সবাজার জেলায় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের আগেই আমন চাষ শুরু হয় ও কার্তিক মাসের শেষে ও অগ্রহায়ণ মাসে পাকা আমন ঘরে আসে। সে কারণে কক্সবাজার জেলায় নবান্ন উৎসব দেশের অন্যান্য অঞ্চলের আগেই হয়ে থাকে। কক্সবাজার জেলার সর্বত্র সব পর্যায়ের কৃষক, জমিদার, জোতদার সকলেই হাজার বছর ধরে লোকজ এই আচার অনুষ্ঠানটি পালন করে আসছে।

এই নবান্ন উৎসব উপলক্ষ্যে কক্সবাজারসহ সারা দেশের বাঙালিদের মধ্যে পড়ে যেত ধুম। মূলত অগ্রহায়ণ মাসেই যখন নতুন সোনালি ধান ঘরে আসে তখন এই ধান মাড়াই করে ঘরে তোলা এবং নতুন ধান নিয়ে পিঠা-পুলি বানানোসহ যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতাকে নবান্ন উৎসব বলে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে বর্তমানে গ্রামের নির্দিষ্ট কিছু কৃষকের বাড়িতে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করা হয় মাত্র। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অভাব অনটনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত গরীব কৃষকদের ঘরে এ উৎসব আর বেশ একটা দেখা যায় না।

www.pathagar.com

"নবান্ন মূলত কৃষকের উৎসব। কৃষির সাথে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভবে যুক্ত, তারাও এ উৎসব পালন করতো। কোনো কোনো এলাকায় ফসল কাটার আগে বিজোড় সংখ্যক ধানের ছড়া কেটে নিয়ে ঘরের চালে বেঁধে রাখা হয়। বাকি অংশ চাল করে, নতুন চাল পিষে গুঁড়া করে পিঠা-পুলি, পায়েস রান্না করা হয়। নতুন চালের এ পিঠা-পুলি, পায়েসই নবান্ন নামে অভিহিত।"[৬] অগ্রহায়ণ মাসে ধানকাটা শেষ হলে কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ জনপদে, কৃষকের ঘরে ঘরে একসময় নবান্ন উৎসবের ধুম পড়ে যেতো। তৈরি হতো নতুন চালের নতুন নতুন পিঠা। অগ্রাহায়ণ পৌষ দু'মাস ধরে বানানো হতো ধুঁই পিঠা (পিঠাটি ধুমায়িত বলেই এ নামে অবিহিত) বা ভাঁপা পিঠা। তা ছাড়া চিতল পিঠা, রকমারি পাক্কন পিঠা, পাইস পিঠা (পাটি সাপটা), বলা পিঠা, ছাইন্না পিঠা, গুরা পিঠা, আলম পিঠা ইত্যাদিসহ প্রায় ২০/২৫ রকমের পিঠা চুলায় উঠতো। ডাকা হতো আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদের। তখন কৃষকসমাজ আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের এসব পিঠা-পুলি খাইয়ে আনন্দ পেতো। নবান্নের উৎসবে পিঠা-পুলি খাওয়াতে না পারলে কৃষক সম্প্রদায় মনে করতো তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। তারা মনে করতো তাদের নতুন বছর ভালো যাবে না। নবান্নের উৎসবে চারিদিকে আনন্দের বান ডাকতো। কক্সবাজার অঞ্চলে এই নবান্ন উৎসব আর আগের মতো উদযাপিত হয় না। কিন্তু এ উৎসব একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এখনো গ্রামের তৃণমূলীয় পর্যায়ে নবান্ন উৎসব কিছুটা হলেও তার অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে।

## ৪. ঈদ উৎসব

বর্তমানে ঈদ-উল-ফিতর আসলেই গ্রামে-গঞ্জে-শহরে শুনা যায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান–

"রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ"

ঈদ মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। সারা বিশ্বের মুসলমানেরা প্রতিবছর দুইবার এই উৎসব পালন করে থাকে। উৎসবদ্বয় হচ্ছে যত্রাক্রমে, ঈদুজ্জোহা বা ঈদ-উল-আযহা ও ঈদুলফিৎর বা ঈদ-উল-ফিতর। আরবি বর্ষ তথা হিজরি বর্ষের শওয়াল মাসের প্রথম দিন মুসলমানেরা যে উৎসব করে থাকে তাই ঈদ-উল-ফিৎর। আর জিলহজ্জ মাসের দশম তারিখ হচ্ছে ঈদ-উল-আযহা। ঈদ-উল-আযহাকে স্থানীয়ভাবে কুরবানির ঈদ বলা হয়। কুরবানি হচ্ছে আত্মত্যাগ। ত্যাগ করার উৎসবই হচ্ছে কুরবানি বা ঈদ-উল-আযহা।

**ঈদ-উল-ফিতর :** পবিত্র রমজান মাসে মুসলমানেরা রোজা রাখে। রোজা রাখা কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকা নয়। রোজার আসল অর্থ হচ্ছে নিজেকে শুদ্ধ করা। সুবেহ সাদেকের পূর্বে সেহেরি খেয়ে পুরো দিন পানাহার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নিজের আত্মাকে বিশুদ্ধ করে নেয়া। শরীর ও মনকে পাকসাফ করে নেয়া। খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা। মুসলমানদের পাঁচটি বাধ্যতামূলক করণীয় কাজের মধ্যে রোজা

www.pathagar.com

রাখা হচ্ছে তৃতীয়। সুস্থ সবল সকল মুসলমানের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে। রোজার আরেক নাম সিয়াম সাধনা। পবিত্র রমজান মাসের সিয়াম সাধনার পরেই মুসলমানদের মধ্যে আসে সেই কাঙ্ক্ষিত আনন্দ উৎসবের দিন, ঈদ-উল-ফিতর। ঈদ-উল-ফিতরই হচ্ছে মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ঈদ মানে আনন্দ। ঈদ মানে খুশি। ঈদ হচ্ছে খুশির শাশ্বত উৎসব।

"ঈদ এখন বাংলাদেশের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। মূলত মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও ধীরে ধীরে এ উৎসব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ ঈদোৎসবের চরিত্রে এনেছে নানা পরিবর্তন। ...শুধু ধার্মিক মুসলমান নয়– কোটি কোটি মানুষের রুটি-রুজি, সংগঠন, সংযোগ তৎপরতা, আনন্দ, পেশা, বহু কিছুর সঙ্গে এখন জড়িয়ে গেছে।"[৭]

*ঈদ উৎসবে দুই শিশুর কোলাকুলি*

www.pathagar.com

পূর্বেই বলেছি, মুসলমানরা দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে নেয়। দীর্ঘ একমাস পরেই মুসলমানদের কাছে শাওয়াল মাসের চাঁদ আসে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত নিয়ে। পশ্চিম আকাশে শাওয়ালের সরু চাঁদের রেখা দেখা যাওয়ার সাথে সাথেই মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। শিশু-কিশোর, যুবক-যুবা, পৌঢ়, নারী-পুরুষ সবার মুখে আনন্দের ঝিলিক লেগেই থাকে। সবার মধ্যে থাকে ব্যস্ততা। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মধ্যে আনন্দটাই যেন সবচেয়ে বেশি।

শিশু-কিশোরেরা নতুন জামা-কাপড় পরে ঈদের ময়দানে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেড়াতে পারবে। বেড়াতে যাবে নানার বাড়ি। দূর দেশে বসবাস করলে দাদার বাড়ি যাবে। খেতে পারবে পিঠা, পায়েশ, সেমাই, ফিরনি, রুটি, হালুয়াসহ রকমারি খাদ্য। ঘরের বউ-ঝিদের মধ্যেও থাকে আলাদা আনন্দ। ঈদের পরে নববধূরা বাবার বাড়িতে যেতে পারবে। বাড়ির মেয়ে তথা ঝিয়েরা শাশুড় বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে যাবে। 'ঝি' অর্থ কাজের মেয়ে হলেও কিন্তু কক্সবাজারে নিজের কন্যা বা মেয়েকে 'ঝি' বলা হয়।

দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পরেই শাওয়ালের চাঁদ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে ঘরের বউ-ঝিয়েরা হালুয়া-রুটি, পিঠা-পুলি, ফিরনি, পায়েশসহ মিষ্টান্ন দ্রব্য তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে কারণেই রাতের বেলায় জেলার পল্লিতে ঢেকির আওয়াজ ভেসে আসে। ঢেকিতে চালের গুড়ো করতে ঘরের বউ-ঝি'রা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ সকালে ঘরের গৃহকর্তাসহ পুরুষলোকেরা কিছু খেয়ে ঈদের নামায পড়তে ময়দানে বা মসজিদে বা ঈদের জামাতে যাবে। ঈদ-উল-ফিতরের নামাযে যাওয়ার আগে সকালে মিষ্টান্ন দ্রব্য খেয়ে ঈদের ময়দানে যাওয়া সুন্নত। পক্ষান্তরে ঈদ-উল-আযহার নামাযে যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া নিষিদ্ধ। যারা পশু কুরবানি করবে শুধু তাদের জন্যই খাবার নিষিদ্ধ। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ যারা পশু কুরবানি করে না তাদের জন্য ঈদের ময়দানে যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া নিষিদ্ধ নয়।

রোজা শেষ হলে ঈদের দিন শিশু-কিশোরদের আনন্দ-খুশি কে দেখে? ঈদের দিন শিশু-কিশোরেরা ভোরে কে কার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারে সেটাও ছিল প্রতিযোগিতার বিষয়। হাড়কাঁপানো শীতের ভোর হলেও পুকুরে গিয়ে গোসল সেরে নতুন জামা-কাপড় পরে ঈদ জামাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। শিশুরা দাদা, বাবা, বড়ভাইয়ের হাত ধরেই ঈদের জামাতে যায়। প্রাচীনকালে বরাবরই গ্রামে ঈদের জামাত আয়োজন করা হয় খোলা মাঠে। ঈদের আগে যদি ধান কাটা শেষ হতো তা হলো অবধারিতভাবেই ঈদের জামায়াত খোলা মাঠেই হতো। যদি বর্ষাকালে ঈদ জামায়াত করতে হয় তা হলেই মসজিদের ভেতরে হতো। শুষ্ক মওসুম হলে কৃষকেরা সোনালি ধান ঘরে তুলে নিশ্চিত। এরপরে মাঠেই ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের নামায আদায় করতে লাগানো হতো মাইক। প্রতিবেশী গ্রাম, মহল্লার লোকজনকে জামায়াতে শরিক হওয়ার আহ্বান জানানোর জন্য ঈদ জামায়াতে মাইক লাগোনো

www.pathagar.com

হতো। তার আগেই ঈদ ময়দান বা ঈদখোলাকে সাজানোর কাজ শেষ। রঙিন কাগজ কেটে, পতাকা বানিয়ে সুতাতে আটকিয়ে ঈদের মাঠকে আকর্ষণীয় করা হয়। আবার কোনো কোনো স্থানে কাঁচা ফুল, গাছের পাতা, শাখা-প্রশাখা দিয়ে ঈদের ময়দান সাজানো হতো। বিশেষ করে সোনালু, জারুল ফুল দিয়ে ঈদের ময়দান সাজাানো হতো। সোনালু, জারুল ফুলের সৌন্দর্যই আলাদা আকর্ষণ। ঈদের জামায়াত শুরুর আগে ঈমাম সাহেব বয়ান শুরু করেন। বয়ানে তিনি অন্যান্য উপদেশের পাশাপাশি ঈদের জামায়াত বড় করা এবং মুসল্লির সংখ্যা বেশি করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। ঈদের নামাযের জামায়াত বড় হলে সওয়াবও বেশি পাওয়া যায়। এটা অমুসলিমদের জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা। বিশেষ করে ঈদকে কেন্দ্র করে মুসলিমরা ধনী-গরীব, ছোট-বড় সবাই এক কাতারে সামিল হওয়া এটাই ঈদের প্রধান শিক্ষা। নামায শেষে সবাই পরস্পর কোলাকুলি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শিশু-কিশোরেরা দাদা, বাবা, জেঠাসহ সব বড়জনকেই কদমবুচি করে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে ব্যস্ত থাকে। শিশু-কিশোরেরা মা, দাদি, জেঠিসহ বড়দের কদমবুচি করে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে ঈদের ময়দান থেকে ঘরে ছুটে যায়। এরপরেই খাওয়ার পালা। এত কি আর খাওয়া যায়? মিষ্টি, পায়েস, সেমাই, রুটি, গোস্ত যার যা ইচ্ছে তা চেয়ে নিয়ে খাচ্ছে। বাড়ির চৌহদ্দিতে বেড়ানো শেষ করে শিশুরা বেরিয়ে পড়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি গিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে। প্রতিটি বাড়িতে গেলেই তো কিছু না কিছু খেতে দেয়। ঈদের দিনের আনন্দটা শুধু রোজার পরেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে বেড়ানো এবং ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা।

ঈদের আগের দিন ঘরের মহিলারা বিশেষ করে বউ-ঝিয়েরা ঘরের চৌহদ্দিতে গিয়ে গাছ থেকে মেহেদি তুলে আনে। পরে শিলপাটাতে মেহেদি পিষে রাতেই হাতে লাগানোর কাজ শুরু হয়। ঈদের পূর্বরাতেই ঘরের বউ-ঝিয়েরা নিজেদের সৌন্দর্য চর্চায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আবার কোনো কোনো স্থানে ঈদের নামাজের পর গরুর লড়াইয়ের আয়োজন থাকে। উঠতি বয়সের যুবকেরা বিকেলবেলা বা সন্ধ্যাবেলায় মল্লযুদ্ধ তথা বলীখেলার আয়োজন করে থাকে। কোথাও কোথাও থাকে গ্রামীণ মেলার আয়োজন। মেলায় শিশুদের বিনোদনের জন্য থাকে নাগরদোলার ব্যবস্থা। মহল্লার যুবকেরা বিকেলে ও জোৎস্নারাতে যথাক্রমে ডাংগুলি, দাঁড়িয়াবান্ধা, হাডুডু, ছোট ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি, তেইক্যাচরি খেলাসহ রকমারি খেলা নিয়ে মেতে থাকে। ঘরের বয়স্করা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যায়। বৌ নিয়ে স্বামী শশুরবাড়িতে বেড়াতে যায়। অনেক সময় স্ত্রীকে বাবার বাড়িতে তথা শশুরবাড়িতে রেখে স্বামী প্রবর রাতের খাবার-দাবার শেষে বাড়িতে চলে আসে। পরবর্তী সময়ে ঈদের উৎসবের সাথে রেডিও, টেলিভিশন বা সিনেমা দেখা যুক্ত হয়। ঘরের বউ নিয়ে স্বামী প্রবর ঘরের মুরব্বিদের ফাঁকি দিয়ে নববধূকে নিয়ে সিনেমা দেখতে চলে যেতো। সিনেমা দেখার সুযোগ ছিল শুধু শহরকেন্দ্রিক। গ্রামের সে সুযোগ কল্পনাও করা যেতো না। তবে প্রাচীনকালে ঈদ

www.pathagar.com

উৎসবের মধ্যে সামাজিকতা ও লৌকিকতা ছিল বেশি, যা বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

**ঈদ-উল-আযহা :** ঈদ-উল-ফিতরের পরেই মুসলমানদের অন্যতম আনন্দ উৎসবের দিন হচ্ছে ঈদ-উল-আযহা বা কুরবানির ঈদ। ঈদ-উল-আযহা মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রধান ধর্মীয় উৎসব। আরবি শব্দ 'আযহা' অর্থ আত্ম-উৎসর্গ। কুরবানি শব্দটা আমাদের কাছে সমধিক পরিচিত। ঈদ-উল-আযহা আমাদের কাছে কুরবানির ঈদ নামেই সমধিক পরিচিত ও জনপ্রিয়। 'কুরবান' ফার্সি শব্দ, যার অর্থ আত্মত্যাগ। ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত ঈসমাইল আ.কে আল্লাহ্ তা'আলার নামে কুরবানির উদ্দেশ্যে গলায় ছুরি বসিয়ে দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মহিমা বোঝার উপায় কি আমাদের আছে? আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দা হযরত ইবরাহীম আ.-এর কুরবানি কবুল করেন। হযরত জিবরাইল আ. হযরত ঈসমাইল আ.কে ছুরির নিচ থেকে সরিয়ে নিয়ে সেখানে একটি দুম্বা রেখে দেন। এরপর থেকে কুরবানি প্রবর্তন হয় এবং আর্থিক স্বচ্ছল মুসলমানের জন্য কুরবানি ফরজ করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রাণপ্রিয় সন্তানের পরিবর্তে পশু কুরবানি কবুল করেছেন সে-কারণেই আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোনো পশু জবাই করার মাধ্যমে কুরবানি চালু হয়েছে। পবিত্র ঈদ-উল-আযহা সম্পর্কে মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন মজিদের একাধিক স্থানে বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আত্মত্যাগের মহিমা প্রকাশের জন্যই·মূলত কুরবানি তথা ঈদ-উল-আযহা।

আমাদের দেশের প্রধান জন্তু গরু, মহিষ, ছাগল। আর্থিক সংগতি অনুযায়ী মানুষ কুরবানি করে থাকেন। গ্রামে ও শহরের মানুষ একটি গরু বা পশু পুরোটা কুরবানি দিতে না পারলে ভাগা করে দিয়ে থাকে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী একটি গরুতে সাতটি ভাগ কুরবানি করা যায়। তবে ছাগলে একভাগের বেশি কুরবানি যায় না। মানুষ সমাজবদ্ধ, সমাজ ছাড়া মানুষ খুব একটা নেই। সেকারণে মানুষ সমাজ গঠন করে বসবাস করে। পূর্বেই বলেছি, বর্তমানে শহুরে মানুষের মধ্যে সামাজিকতা ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তবে গ্রামে এখনো সমাজ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সমাজের সর্দারের আদেশ-নিষেধ সমাজভুক্ত মানুষ মেনে চলে। আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুযায়ী প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে নিজের কুরবানির গোশত থেকে একভাগ গোশত সমাজের মানুষকে বিলি করে দেয়ার রীতি চালু করেছে।

ঈদ উল ফিতরের ন্যায় কুরবানি ঈদ তথা ঈদ-উল-আযহার দিনটি আনন্দ-উৎসবের মধ্যে মুসলমানরা পালন করে। তবে ঈদ-উল-আযহার বিশেষত্ব হচ্ছে কুরবানির গোশত। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মুসলমানেরা কুরবানি করে প্রতিবেশী, গরিব বা মধ্যবিত্ত আত্মীয়-স্বজনকে ফেলে নিজেরা গোশত খায় না। কুরবানির গোশত নিজেরা খাওয়ার পাশাপাশি প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, সমাজের লোকজনকে সাথে

www.pathagar.com

নিয়ে খাওয়ার মধ্যেই বেশি আনন্দ। সবাইকে নিয়ে খাওয়া অর্থ সবাইকে কুরবানির গোশত দেওয়া। মুসলমান সমাজে উক্ত রীতিটি এখনো প্রচলিত আর এটাই হচ্ছে ইসলামের ও কুরবানির মহত্ব ও মর্তবা। তবে কুরবানির ঈদের আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে কুরবানির দিন বিকেল হতেই রান্না করা গোশত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ছেলে-মেয়ের শশুর বাড়ি তথা বিয়াইর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া। টিফিন কেরিয়ার বা টিফিন বক্স বা ডেকসি নিয়ে যাতায়াতের দৃশ্য চোখে পড়ে। কুরবানির গোশত আনা-নেয়া করার দৃশ্য ও রীতি-নীতি ঈদ-উল-আযহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

## ৫. শারদীয় দুর্গোৎসব

"দুর্গাপূজা হিন্দুসমাজের বড় ধর্মীয় উৎসব। একদিকে দুর্গাদেবীর পূজা, অপর দিকে সবার পরশে পবিত্র করা পর্ব। এ কারণেই এই পূজার নাম দুর্গোৎসব। এই উৎসবের মতো হিন্দু সমাজের আর কোনো উৎসবই এমন জাঁকজমকের সাথে পালিত হয় না। এ কারণে দুর্গাপূজাকে 'কলির অশ্বমেধ' বলা হয়।

দুর্গাপূজার একটি কাহিনি আছে। এই পৌরাণিক কাহিনি। শাস্ত্রে আছে – দুর্গম নামক অসুরকে বধ করায় মায়ের নাম দুর্গা। দুর্গম অসুরের কাজ ছিল জীবকে দুর্গতি দেওয়া। সেই দুর্গমকে বধ করে যিনি জীবজগতকে দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করেন, তিনিই 'মা-দুর্গা'।

*শহরের গোনাড়পাড়ার দুর্গামন্দিরে*

www.pathagar.com

দুর্গাপূজা অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বৈদিক যুগে শক্তিপূজার প্রচলন ছিল। সেই শক্তিই শ্রীদুর্গা। মহাভারতে লেখা আছে – 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে অর্জুন দুর্গাপূজা করেন।' সত্যযুগে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যা একসাথে দুর্গাপূজা করেছিলেন। এই পূজা বসন্তকালে হয়েছিল। সেই কারণে একে বাসন্তী পূজা বলা হয়।"[৮]

বাংলাদেশে দুর্গাপূজা পালিত হয় শরৎকালে। বাংলা বর্ষের আশ্বিন মাসে যে চাঁদ ওঠে, সেই চাঁদের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠীর দিন যে উৎসব হয়, তাকে বলা হয়ে থাকে 'মায়ের বোধন' বা 'দেবীর বোধন'। দেবীকে জাগানোর জন্যই মূলত ষষ্ঠীর দিনের ক্রিয়াকাণ্ড সীমাবদ্ধ থাকে। সপ্তমীর দিন জাঁকজমকের সাথে পূজা শুরু হয়। তবে অষ্টমীর দিন পূজার ধুম হয় সবচেয়ে বেশি। অষ্টমী–নবমীর মিলনক্ষণে যে পূজা হয় তাকে বলে সন্ধিপূজা। এই সন্ধিপূজাই সবচেয়ে বড় পূজা।

কক্সবাজারের হিন্দু সম্প্রদায় বিগত দুই থেকে আড়াই শত বছর ধরে দুর্গাপূজা পালন করে আসছে। কালের প্রবাহে বর্তমানে দুর্গাপূজাটি শারদীয় দুর্গোৎসবে পরিণত হয়েছে। জেলার সবচেয়ে বৃহৎ উৎসবে পরিণত হয়েছে এই দুর্গোৎসব। শুধু জেলার নয় সমগ্র দেশের বৃহৎ শারদীয় দুর্গোৎসবের রূপ নিয়েছে। মহা দশমী তথা বিজয়া দশমীর বিসর্জন উপলক্ষে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারের লাবণী পয়েন্টে অনুষ্ঠিত এই উৎসব। বিজয়া দশমীর বিসর্জন অনুষ্ঠানটি সর্বোতভাবে সার্বজনীন রূপ লাভ করে। বিসর্জন অনুষ্ঠানটি হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কিন্তু বিসর্জন উপলক্ষে সমগ্র সমুদ্রসৈকত হয়ে ওঠে সার্বজনীন। সমুদ্রসৈকতে জমায়েত হয় লাখো মানুষ। জমায়েতে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক নয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সেখানে থাকে না কোনো ভেদাভেদ। সমুদ্রসৈকতের বিসর্জন অনুষ্ঠানে স্থানীয় লোকজন ছাড়াও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিচিত্র রং-এর, বিচিত্র বর্ণের লোকজনের সমাবেশ দেখা যায়। বাংলা ভাষাভাষি ছাড়াও থাকে ইংরেজি, হিন্দিসহ বিভিন্ন ভাষার মানুষের উপস্থিতি।"[৯]

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে কক্সবাজার শহরে ১০ থেকে ১২টি পূজামণ্ডপে বসে। তৎমধ্যে কক্সবাজার পৌর শহরের স্বরস্বতী মন্দিরেই প্রধান আয়োজন হয়। পূজা অর্চনার পরে বিজয়া দশমীর দিনে সকাল থেকে মা দুর্গাকে বিদায় জানানোর জন্য শুরু হয়ে করুণ সুরে গান। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বিদায়ের পালার আয়োজন চলে। দ্বিপ্রহরে ট্রাক, মিনি ট্রাক, পিকআপ, খোলাজিপ গাড়িতে তোলা হয় দেবীকে। এই আয়োজন শুধু কক্সবাজার শহরে নয়, চলে সমগ্র জেলাব্যাপী। জেলার ৮টি উপজেলা ও ৪টি পৌর এলাকায় প্রায় তিন শতাধিক পূজামণ্ডপে চলে একই আয়োজন। জেলার বিভিন্ন উপজেলার মণ্ডপ থেকে পূজারী, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সমন্বয়ে এসব যানবাহনে দেবীকে তুলে বিসর্জনের উদ্দেশ্যে জমায়েত করা হয় কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী পয়েন্ট চত্বরে। এসময় পূজারী, দর্শনার্থী ও ভক্তবৃন্দ রং ছিটিয়ে তাদের মনের আনন্দের

www.pathagar.com

বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। লাবণী পয়েন্ট চত্বরে পূর্বেই তৈরি করা হয় সভা-মঞ্চের। বিসর্জনের জন্য দেবী দুর্গাকে সমুদ্রসৈকতে সারিবদ্ধ করে রাখা হয়। এসময় আরতির পাশাপাশি চলে দেবীর বিদায় অনুষ্ঠান। বিদায় অনুষ্ঠানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বক্তব্য পেশ করেন স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দছাড়াও জেলা পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ। রং ছিটানোকে কেন্দ্র করে জেলায় একাধিকবার দুর্ঘটনাও ঘটেছে।

**রামু উপজেলার প্রতিমা বিসর্জন উৎসব**

এটাও একটি বাঁকখালি নদীভিত্তিক হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব। আগের দিনে রামুতে চার পাঁচটি মণ্ডপে দুর্গাপূজা হতো। সেখানে মাত্র দু'একটি মাটির প্রতিমা ছাড়া বাকিগুলো হতো ঢালের প্রতিমা। পূজা শেষে দশমীর দিনে ঢালের প্রতিমাগুলো আগামী বছরের জন্য তুলে রাখা হতো এবং মাটির প্রতিমাগুলো বাঁকখালি নদীতে বিসর্জন দেয়া হতো। আগের দিনে (১৯৫২ সালের দিকেও) কোনো প্রকার স্থানীয় যানবাহন এমনকি গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ঠেলাগাড়িও রামুতে ছিল না। কাজেই দুর্গাপ্রতিমা কয়েকজন মিলে কাঁধে করে বাঁকখালি নদীতে নিয়ে আসতো। তারপর দু'একটা ভাড়া করা নৌকা একসাথে শক্ত করে বেঁধে তাতে প্রতিমাগুলো তোলা হতো। তারপর অনেকটা বৌদ্ধদের জাহাজ ভাসা উৎসবের মতো ঢোল বাদ্য বাজিয়ে নদীর বাঁকের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত বার বার টহল দিতো। দর্শকেরা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে এদৃশ্য দেখতো। এভাবে সূর্য অস্ত গেলে সন্ধ্যার সময় নদীতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন বা ডুবিয়ে দিয়ে উৎসবের শেষ করা হতো। বর্তমানে অনেকে দুর্গা প্রতিমা কক্সবাজারে নিয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দেয়। এই কারণে রামুর এ অনুষ্ঠানটি অনেকটা মৃত।"[১০]

## ৬. জন্মাষ্টমী

"বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের আর একটি বিশেষ ধর্মীয় উৎসব জন্মাষ্টমী। বিভিন্ন এলাকায় বেশ ঘটা করেই এ উৎসব পালিত হয়। কক্সবাজার জেলা-শহরেও ঘটা করে জন্মাষ্টমী পালন করা হয়। বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল হিন্দু এ উৎসবে ভক্তিতে, আনন্দে এবং আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

জন্মাষ্টমী হচ্ছে শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন এই তিথিতে। হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে এই মাস তাই অতি পবিত্র। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, এ মাসের ঐ বিশেষ দিনের উপবাসেই সাত জনমের পাপ মাফ হয়ে যায়। অন্যান্য পুণ্যদিবসে স্নান ও পূজা করলে যে ফল পাওয়া যায়, জন্মাষ্টমীর দিনে স্নান-পূজায় তার কোটি গুণ ফল মেলে। ঐ দিনে তর্পণ করলেও একশ বছরের গয়াশ্রাদ্ধের মতো পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করলে সুপুত্র, সৌভাগ্য, অতুল আনন্দ লাভ করা সম্ভব হয়। পরকালে স্বর্গে যাওয়া যায়।"[১১]

www.pathagar.com

*কক্সবাজার শহরে জন্মাষ্টমি উপলক্ষে র‍্যালি বের করা হয়*

বাংলাদেশে প্রায় সব জায়গায় কোনো না কোনোভাবে এ তিথি উদযাপিত হয় ধর্মীয় উৎসব হিসেবে। জন্মাষ্টমী উৎসবে দিনে উপবাস রাতে কৃষ্ণপূজা করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

কক্সবাজার শহরেও ব্যাপক ধর্মীয় উদ্দীপনা ও উৎসাহ নিয়ে জন্মাষ্টমী তিথি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ঢোল, করতাল, সানাই, বাঁশিসহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন রাস্তায় মিছিল করে। শ্রীকৃষ্ণের নাম-গান করতে করতে আনন্দ মিছিল বা আনন্দ শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে। তাঁদের কণ্ঠে শোনা যায় –

"কৃষ্ণ এলো এ সংসারে
আনন্দ আর ধরে নারে।"

কক্সবাজারের হিন্দু সম্প্রদায় জন্মাষ্টমী পালন উপলক্ষে প্রত্যূষে আরতি, প্রার্থনা, নামযজ্ঞ করে থাকে। শহরের ঘোনারপাড়ার কৃষ্ণানন্দ ধামে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সর্বপ্রথম ১৯৯৩ সালে শহরের বিবেকানন্দ যুব পরিষদ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে র‍্যালির আয়োজন করে। শহরের গোলাদিঘির পাড় থেকে র‍্যালি বেরিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার শহরের কৃষ্ণানন্দ ধামে পৌঁছে সমাপ্ত হয়। কৃষ্ণানন্দ ধামে পৌঁছে অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে।

"বিগত ৫০ বছর আগে থেকে কক্সবাজারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন শুরু করে। এর আগে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন প্রত্যেক বাড়িতে ঘরোয়া পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে পূজা-অর্চনা করতো। শহরের শহীদ সরণির ধীরেন্দ্র শর্মাই সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে জন্মাষ্টমী পালন শুরু করেন। তিনি তাঁর বাড়ি থেকেই জন্মাষ্টমীর আনুষ্ঠানিকতা পালন করতেন। তিনি বিগত ২০০৭ সালে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। পরবর্তীতে বিবেকানন্দ যুব পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে জন্মাষ্টমীর বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে দিবসটি পালন শুরু করে, যা এখনো অব্যাহত আছে এবং প্রতিবছর এর কলেবর বৃদ্ধি হচ্ছে।"[১২]

## ৭. মুহররম

আরবি বর্ষ বা হিজরি বর্ষের প্রথম মাস মুহররম। এই মাসটি মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র। এ মাসেই মুহররম উৎসব তথা আশুরা পালিত হয়। যে ঘটনা অনুসারে মুহররম উৎসবের সূচনা, তা খুবই করুণ। আল্লাহ্‌র নবি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা. এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসেন ইরাকের কুফা নগরীর কারবালা প্রান্তরে শহীদ হন এই মাসের দশ তারিখে। সেই দিনকে স্মরণ করে মুসলমানরা শোকে কাতর হয়ে পড়েন। মুহররমের দশম দিনটিকে মুসলমানরা শোকে কাতর হয়ে পালন করেন। এ ব্যাপারে 'আশুরা' অংশে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এখানে আর আলোচনা করা হলো না।

## ৮. শব-ই-বরাত

শব-ই-বরাত মুসলমানদের একটি অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বিশ্বের কোনো কেনো দেশের মুসলমানদের ন্যায় কক্সবাজারের মুসলমানরাও দিনব্যাপি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করে। কর্মসূচির মধ্যে থাকে নফল রোজা রাখা, রাতব্যাপি নফল নামায

www.pathagar.com

আদায় করা, পবিত্র কুরআন মজিদ থেকে পাঠ করা, তসবিহ্-তাহলিল, দোয়া-দরূদ পাঠ, ওয়াজ মাহফিল, তাফসীরের বয়ান, সম্ভব হলে ভিক্ষুককে ভিক্ষা প্রদান, ভুখা-নাঙ্গা মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ, রুটি, হালুয়া বিতরণ, পরলোকগত পিতা-মাতাসহ মুরব্বি এবং কবরবাসীর জন্য বিশেষ দোয়া, নিজের ভবিষ্যত যাতে ভালোভাবে কাটে সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ কামনা করে দোয়া প্রার্থনা করা।

আমাদের দেশে প্রচলিত শব্দার্থ অনুযায়ী 'বরাত' অর্থ 'বরাদ্দ'। প্রকৃতপক্ষে 'বরাত' ফার্সি শব্দ যার অর্থ কপাল, ভাগ্য, অদৃষ্ট। আরবি 'বর'অত্' শব্দ থেকেই শব্দটি সহজ-সরল হয়ে ফার্সি ভাষায় 'বরাত' হয়েছে।"[১৩] কক্সবাজারের লোকজন এবং মুফাসসিরগণ ফার্সি বরাত শব্দটিকে বরাদ্দ হিসেবে নিয়েছেন। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, 'ইসলাম ধর্মের বিধান মতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই শব-ই-বরাতের রাতেই প্রতিটি মানুষের জন্য আগামী একবছরের বাজেট বরাদ্দ করেন। সরকার যেভাবে দেশের ভবিষ্যতের জন্য বাজেট প্রণয়ণ করে থাকেন ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলাও মানুষের বাজেট বরাদ্দ করেন।' সেই বাজেটে যাতে নিজের ভবিষ্যৎ ভালোভাবে কাটে, কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, চাকুরিতে পদোন্নতি পায়, যারা চাকুরি খুঁজছে তারা যেন নতুন চাকুরি পেয়ে যায়, বিপদে থাকলে বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারে, চাষাবাদ ভালো হয়, ফলমুল ভাল হয় অর্থাৎ সবকিছু যেন ভালো হয় সেজন্য অহোরাত্র জেগে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। সেজন্য স্থানীয়ভাবে শব-ই-বরাতকে 'বরাতের রাত' বলা হয়। তবে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট বিধানের উল্লেখ নেই। দিবসটির জন্য জেলার প্রতিটি মুসলিম পরিবারের শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে নর-নারীরা অপেক্ষায় থাকে। অপেক্ষাটি মূলত আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যমে আগামী একবছরের ভালো বরাদ্দ পাওয়ার আশায়। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবা নির্বিশেষে সবাই এই রাতেই নামায-কালাম, তসবীহ-তাহলীল, দোয়া-দরুদ, বিশেষ মুনাজাতের মাধ্যমে রজনী পার করে দেয়। সারা রাত জেগে থেকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করে ফজর নামায আদায় করলে সবাই মনে করে যে তাদের বরাদ্দ ভালো হবে।

আরবি শব্দ 'শব-ই-বরাত'-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সৌভাগ্য রজনী। চান্দ্র শাবান মাসের চতুর্দশ দিন। পরিশ্রম করে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যমে উক্ত রজনীতে সৌভাগ্য আদায় করে নেয়ার কারণেই শব-ই-বরাতকে 'সৌভাগ্য রজনী' বলা হয়েছে।"[১৪]

স্থানীয়ভাবে শব-ই-বরাতকে 'লুডির ফাতিয়া' বা 'লুডির ফৈত্যা' বলা হয়। স্থানীয় ভাবে ফাতেহা বা ফাতিয়াকে সংক্ষিপ্ত করে 'ফৈত্যা' বলা হয়। জেলার প্রতিটি মুসলিম মহল্লা তথা গ্রাম থেকে শব-ই-বরাতের পূর্ব রাত্রেই মুহুর্মুহু ঢেকির শব্দ শ্রুত হয়। প্রতিটি পরিবারই চালের হালুয়া ও রুটি তৈরি করার জন্য ঢেকিতে চালের গুড়ো বা গুরি

www.pathagar.com

করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘরের মহিলারা বা কাজের মেয়ে বা বাড়ির হাইল্যা বা মজুর একাজে জড়িত থাকে। মহিলারা পূর্বরাতে না ঘুমিয়েই ঢেকিতে চালের গুড়ো তৈরি করে। প্রায় সারারাত জেগে থেকে চালের গুড়ো করে ভোররাতে সেহেরি খেয়ে স্বল্প সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই রুটি তৈরি থেকে শুরু করে। হালুয়া তৈরিতে লেগে যায়। আবার কোনো কোনো পরিবার শবে-ই-বরতের দু'একদিন আগেই চালের গুড়ো তৈরি করে রাখে। চালের গুড়োর সাথে নারিকেল, গুড়, বাদাম, সম্ভব হলে কিসমিস, আখরুট, পেস্তা, লবণ মেখে চুলায় দিয়ে সিদ্ধ করে ফুটিয়ে হালুয়া করা হয়। এই দিনে রুটি তৈরির ধুম পড়ে যায় এবং রুটি দিয়ে হালুয়া খাওয়া হয় বলেই স্থানীয়ভাবে শবে-ই-বরাতের ফাতেহাকে 'লুড়ির ফৈত্যা' বলা হয়। রুটিকে স্থানীয়ভাবে 'লুডি' বলে। যা 'লুড়ি পিড়া' হিসেবে কথিত।

বিগত চার পাঁচ দশক আগেও দিবসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল মহল্লায় মহল্লায় হালুয়া-রুটি-গোশত খাওয়ার উৎসব। মহল্লার মসজিদের ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধি দিনের শুরুতেই মহল্লার প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে চাল, নগদ টাকা সংগ্রহ করতেন। পরে সংগৃহীত চাল দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে রুটি বানানো হতো। সংগৃহিত নগদ টাকা দিয়ে গরু, ছাগল ক্রয় করে রান্না করা হয় অথবা বাজার থেকে গোশত ক্রয় করে রান্না করে ফাতেহা পাঠ করার পরেই শিশু-কিশোর, যুবকসহ বয়োবৃদ্ধরা সম্মিলিতভাবে ভোজনপর্বে অংশ নিতো। সবাই হালুয়া-রুটি বা রুটি গরুর গোস্ত তৃপ্তি সহকারে আহার করে ভোজনপর্ব সারে। সন্ধ্যার পরে শিশু-কিশোর যুবক নির্বিশেষে সকলেই মসজিদে গিয়ে নামাযে শরিক হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য কামনা করে। প্রাচীনকালে মসজিদে মোমবাতি জ্বালিয়ে সমগ্র মসজিদ প্রাঙ্গন ও মসজিদের ভেতরে আলোময় করতে তুলতো। তবে বর্তমানে বিদ্যুত সরবরাহ দেয়ার ফলে মোমবাতির ব্যবহার কমে গেছে। মসজিদে সারা রাত ধরে চলে নামায, শব-ই-বরাতের নামায, ওয়াজ মাহফিল, তাফসীর। অহোরাত মসজিদে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত বন্দেগী করার পরে ফজরের নামায আদায়ের মাধ্যমে শব-ই-বরাত পালন করা হতো। কিন্তু বর্তমানে গ্রামেও পূর্বের মতো শব-ই বরাত পালন উপলক্ষে হালুয়া-রুটির উৎসব দেখা যায় না। মহল্লার ইমাম সাহেব পূর্বের মতো বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাউল, টাকা সংগ্রহ করেন না। দেখা যায় না পূর্বের মতো উৎসাহ-উদ্দীপনা।"[১৫]

## ৯. আশুরা

আশুরা মুসলমানদের একটি শোকের দিন, মর্শিয়ার দিন। যদিও আশুরাকে কেউ কেউ উৎসবের দিন মনে করেন, কিন্তু তা সঠিক নয়। আরবি বর্ষ তথা হিজরি সনের প্রথম মাস মুহাররাম। মুহাররামের দশম দিবসকে আশুরা বলা হয়।

বাংলা পঞ্জিকায় বা অংকে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ গণনা করতে হয়। তেমনি ভাবে ইংরেজিতে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 গণনা করতে হয়। অনুরূপ আরবিতে গণনা করতে হয় ওয়াহিদ, ইছনাইনি, ছালাছা, আরবাহ, খামছা, সিত্তা, সাবাআহ, সামানিয়া, তিহআ ও অশ্‌রাহ্। অর্থাৎ দশ অংককে আরবিতে 'অশ্‌রাহ্' বলা হয়। আরবি 'অশ্‌রাহ্' শব্দটিই আমাদের কাছে 'আশুরা' হয়েছে।

www.pathagar.com

অনেকেই মনে করেন 'অশ্‌রাহ্' তথা মুহাররামের দশম দিবসে বিশ্বে অনেক ঘটনা ঘটেছে, যার বর্ণনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়। তবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'একটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো। আশুরার দিনে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমিন সৃষ্টি করেছেন, মুহাররামের এই দিনে আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। এই দিনে কলম সৃষ্টি করেছেন, এই দিনে আল্লাহ্ তা'আলা লাওহে মাহফুজ সৃষ্টি করেছেন, এই দিনেই আরশ সৃষ্টি করেছেন, এই দিনে তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন, এই দিনে তিনি কুরসী সৃষ্টি করেছেন, এই দিনে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, এই দিনেই তিনি হযরত জিবরাঈল আ. কে সৃষ্টি করেছেন, এই দিনে তিনি ফিরিশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন, মুহাররামের দশম দিবসে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আদি মানব হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করেছেন, এই দিনে হযরত আদম আ.কে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার দায়ে এই দিনে হযরত আদম আ. ও মা হাওয়াকে বেহেশত থেকে পৃথিবীতে ফেলে দেয়া হয়, এই দিনে সৌদি আরবের জবলে রহমান বা রহমতের পাহাড় বা আরাফাত ময়দানে হযরত আদম আ. ও হযরত বিবি হাওয়ার মধ্যে সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করেছেন, এই দিনেই হযরত ইদরিস আ.কে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন, হযরত নূহ আ.-এর কাঠের তৈরি নৌকা বা জাহাজ বা কিস্তি দীর্ঘ ছয়মাস আট দিন ধরে মহাপ্লাবনে ভাসতে ভাসতে এই দিনে জুদি পাহাড়ের চূড়ায় আটকে যায়। তৎকালীন সময়ের লোকজন আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানি করার কারণেই রজব মাসের ২ তারিখ থেকেই প্লাবন শুরু হয়ে তা মহাপ্লাবনে রূপ নেয়। সমগ্র এলাকা দীর্ঘ ছয়মাস আট দিন পানির নিচে ছিল। হযরত নূহ আ.-এর নৌকা বা জাহাজ জুদি পাহাড়ের চূড়ায় আটকে পড়ার পরেই হযরত নূহ আ.সহ জাহাজের অন্যান্যরা আস্তে আস্তে মর্তে নেমে আসেন। এই দিনেই হযরত দায়ূদ আ.-এর তাওবা কবুল করেছেন, এই দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুলাইমান আ.কে রাজত্ব প্রদান করেছেন, এই দিনেই হযরত আইউব আ.কে বিপদমুক্ত করেন এবং তাঁর রাজত্ব ফিরিয়ে দেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই দিনেই তাওরাত নাজিল করেন, এই দিনেই হযরত ইবরাহীম আ. জন্মগ্রহণ করেন এবং খলীল উপাধি লাভ করেন, এই দিনেই হযরত ইবরাহীম আ. নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এই দিনেই হযরত ইসমাঈল আ.কে কুরবানি করা হয়েছিল, এই দিনেই হযরত ইউনূস আ.কে মাছের পেট থেকে বের করেছিলেন, এই দিনেই হযরত ইউসূফ আ.কে জেলখানা থেকে বের করেছিলেন, এই দিনেই হযরত ইয়াকুব আ. দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন, এই দিনেই হযরত ইয়াকুব আ. তৎপুত্র হযরত ইউসূফ আ.-এর সাথে মিলিত হয়েছিলেন, এই দিনেই হযরত মুসা আ. তাঁর অনুসারী বনি ইসরাঈলী সম্প্রদায়ের লোকজনসহ ফেরআউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন ও ফেরআউন ও তার লোকদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। এই দিনেই হযরত ঈসা আ. জন্ম লাভ করেন ইত্যাদি। মুসলমানেরা

www.pathagar.com

বিশ্বাস করেন আল্লাহ্ তা'আলার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন মুহাররামের দশম দিবসে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস তথা কিয়ামত হবে দশম মুহাররাম। এছাড়াও আরো অনেক দুর্ঘটনার কথা জানা যায়, যা কুরআন হাদিসে সর্বোতভাবে সমর্থিত নয়। সর্বশেষ এ দিবসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা স.এর দৌহিত্র, আল্লাহ্র রাসূল সা.-এর অন্যতম খলিফা ও জামাতা হযরত আলী রা.-এর পুত্র হযরত ইমাম হোসাইন রা. ইরাকের কুফার কারবালা প্রান্তরে মর্মান্তিকভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন। বিশ্বের মুসলমানেরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সা.-এর দৌহিত্র ও হযরত আলী রা-এর পুত্র ইমাম হোসাইন রা.-এর শাহাদাতের কথা স্মরণ করে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হন। মুহাররাম মাসের চাঁদ উঠলেই সারা মুসলিম জাহানে মাতম শুনা যায়। মুহাররাম মাসের দশম দিবসে উপরে উল্লেখিত ঘটনাসমূহ ঘটে থাকলেও সবকিছুকেই চাপিয়ে কারবালার প্রান্তরে যে মর্মন্তুদ দুঃসহ ঘটনা ঘটেছিল তা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দেয়।

তবে প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, মুহাররাম মাস হচ্ছে হিজরি সালের 'হারাম' চারটি মাসের অন্যতম। এই মাসগুলো ইসলামী শরীয়তে বিশেষভাবে সম্মানিত। হারাম মাস বলতে উক্ত মাসগুলোতে ঝগড়াঝাটি বা যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা তাওবা-এ বর্ণিত হয়েছে, 'আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায় মাস বারোটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এই নিষিদ্ধ মাসগুলির মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না... ।'

এই মাসগুলো হলো যথাক্রমে মুহাররাম, রজব, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ মাস। এই মাসকে সহীহ্ হাদিসে 'আল্লাহ্র মাস' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এই মাসের নফল সিয়াম বা রোজা সর্বোত্তম নফল সিয়াম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ৬০ হিজরির ১০ মুহাররাম মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা স.-এর প্রাণ প্রিয় দৌহিত্র ও খোলাফায়ে রাশেদিনের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা.-এ পুত্র হযরত ইমাম হোসাইন রা. কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদের বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হন। পানির অভাবে তাঁর শিবিরে হাহাকার পড়ে যায়। তৃষ্ণাকাতর মহিলা ও ছোট ছোট শিশুদের আর্তনাদে হযরত ইমাম হোছাইন রা.-এর হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে গেলো। শিশু আসগরকে কোলে নিয়ে ইয়াজিদের সৈন্যদের নিকট এককাতরা পানির জন্য আকুল আবেদন জানালেন। মুহূর্তের মধ্যে একটি তীর শিশু আসগরের বক্ষভেদ করলো। হযরত ইমাম হোসাইন রা. বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে দেহে শত আঘাতের চিহ্ন নিয়ে রণক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় নিষ্ঠুর সীমার হযরত ইমাম হোছাইন রা. এর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। সারা পৃথিবী তখন শোকসাগরে ভেসে গেল। এই ঘটনা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। মুসলিম উম্মার কেউ কেউ দিনটিকে 'শোক দিবস' হিসেবে, আবার কেউ কেউ দিনটিকে 'বিজয় দিবস' হিসেবে পালন করে থাকে।"[১৬]

www.pathagar.com

কারবালা প্রান্তরের এই মর্মান্তিক ঘটনার স্মরণে এই অঞ্চলের মুসলমানেরা দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকে। দিবস উপলক্ষে হযরত ইমাম হোসাইন রা. ও তাঁর পরিবার পরিজনের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মসজিদে মসজিদে মুসল্লিদের মাঝে শিরনি বিতরণ, ওয়াজ মাহফিল, ফাতেহা ও দরূদ পাঠ, বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মুহাররামের এ দিবসকে জেলার লোকজন মুহাররামের ফাতেহা (ফাতিয়া) বলে থাকে। এখানে শোকর‍্যালি বা তাজিয়া বের করা হয়। তবে এখানে দিবস উপলক্ষে রোজা বা সিয়াম এর বিধান আছে। লোকজন মুহাররামের ৯, ১০ ও ১১ তারিখ রোজা রেখে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন এবং উপরে উল্লেখিত ঘটনাসমূহের স্মরণ করে থাকে।

## ১০. বিয়ে

মানুষ সৃষ্টি থেকে নর-নারী পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত। মূলত লিঙ্গ বৈপরীত্যের কারণে এই আর্কষণ। তাই নর-নারীর মধ্যে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ফলে প্রাচীনকাল হতে নর-নারীতে বিবাহ্ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই বিবাহ পর্ব উপলক্ষে সেই প্রাচীনকাল থেকেই পালন করা হয় বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান। কক্সবাজারেও বিবাহ্-সাদি উপলক্ষে প্রাচীনকাল থেকে যেসব রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হত নিম্ন তার কিছুটা বিবরণ দেয়া হলো:

### গায়েহলুদ

বিয়ের আগের দিন বর-কনে উভয় পক্ষের দাদা-দাদি, ভাবী, বন্ধু-বান্ধবী ও নানা-নানি বা নিকট আত্মীয়-স্বজন মিলে বরকে বরের বাড়িতে এবং কনেকে কনের বাড়িতে মেহেদী মাখিয়ে গোসল দিয়ে সাজানো হতো। বর্তমানে যেভাবে আনুষ্ঠানিকতা করা হয় পূর্বে তা করা হতো না। অনুষ্ঠানে মূলত মেহেদী রঞ্জন করা হলেও তার নামটি গায়ে হলুদ হয়ে গেছে। তবে মেহেদী মাখানোর পূর্বে কিছু পরিমাণ হলুদ নিয়ে বর-কনের হাতে, মুখে মাখানো হয়। স্থানীয়ভাবে কথিত আছে যে, শরীরে কাঁচা হলুদ মাখালে শরীরের রং হলুদের ন্যায় উজ্জ্বল হয়। সে কারণেই বর-কনের শরীরে বিয়ের আগের দিন হলুদ মাখনো হয়। বর-কনের গায়েহলুদ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানাদির। এসবের মধ্যে গান-বাজনাসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। এছাড়াও উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনসহ অতিথিদেরকে উন্নতমানের খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। অবশ্যি এর আগে বর-কনের গায়ের হলুদের জন্য কনের বাড়ির লোকজন বিশেষ করে বর-কনের ছোটভাই-ছোটবোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাবীসহ নিকটজনের মিষ্টান্নদ্রব্য ও গায়েহলুদের উপকরণ নিয়ে প্রতিপক্ষের বাড়িতে যেতে হয়। গায়ে হলুদের ফাঁকে ফাঁকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা হয়।

www.pathagar.com

পূর্বে গ্রামের বর-কনের গায়ে হলুদের বিধান ছিল না বললেই চলে। তবে বর-কনেকে গোসল দেয়া উপলক্ষে হঁওলার আসর বসতো।"[১৭]

## পাঁচকুলা বা মঙ্গলঘট বা বরণকুলা

প্রাচীনকাল থেকে কক্সবাজারের বিয়ে-শাদী ও শুভকাজের উদ্বোধন করতে মাঙ্গলিক প্রতীক মঙ্গলঘট এখানকার হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিয়ে-শাদী ও বিদেশ যাত্রা, নতুন ঘরের নির্মাণকাজ শুরু, নতুন ঘরে প্রবেশ উপলক্ষে বাড়িতে প্রবেশ (হাল্‌দার দুয়ারে) পথে স্থাপন করা হতো শুভকাজের মঙ্গল কামনায়। বাড়ির প্রবেশ পথের দু' পাশে দু'টি কলাগাছ পুঁতে তার গোড়ায় জলপূর্ণ কলসী স্থাপন করত মুখে দুটি আম্রপল্লব বা আমপাতা রেখে তার উপর দু'টি ডাব বা নারিকেল দিলে মঙ্গলঘট করা হয়। মঙ্গলঘটে ব্যবহৃত উপাদানগুলো এক একটি শুভ ধারণার প্রতীক। যেমন কলাগাছ ও আম্রপল্লব দীর্ঘায়ুর প্রতীক, জনজীবনের প্রতীক, ডাব বা নারিকেল প্রজনন শক্তির প্রতীক।

কক্সবাজার জেলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মঙ্গলঘট প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন বিরচিত 'জেবর মুলুক সামারোখ' কাব্যে তার উল্লেখ দেখা যায়–

'কুম্ভ দুই জল ভরি পন্থ দুই পাশে।
আম্র ডাল দিয়া তাতে রাখিছে হরিষে।'

বিগত শতকের তৃতীয় দশকের শুরুতে সংস্কারধর্মী আন্দোলনের ফলে কক্সবাজারের মুসলমানসমাজে বিয়ে-শাদী ও শুভকাজে মঙ্গলঘটের প্রচলন কিছুটা পরিবর্তিত আকারে এখনও দেখা যায়। এখনও কক্সবাজারের অধিকাংশ মুসলমানের বিয়ে-শাদীতে বিয়ের দিন বিয়ে-বাড়ির আঙ্গিনায় একটি পানিপূর্ণ 'ঘরা' বা 'ঘড়া' বা কলসি'র মুখে আমছুরতি বা আম-সরতী বা আমপল্লব দিয়ে মঙ্গলঘট বসানো হয়। জানা প্রয়োজন যে, কক্সবাজারের মুসলমানেরা কলসীকে ঘরা, আম্রপল্লবকে আম-ছুরতি বলে।

## বরণকুলা বা বরণডালা

প্রাচীনকাল থেকে কক্সবাজারের হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে-শাদী ও শুভ কাজে মাঙ্গলিক প্রতীকরূপে বরণকুলা বা বরণডালার বহুল প্রচলন আছে।

বরণকুলাকে স্থানীয় ভাবে পাঁচকুলা বলা হয়। কক্সবাজারে পাঁচ বা বরণকুলা হাতে নিয়ে নতুন বধু বা নতুন বরকে বরণ করা হয়। বিয়ের সময়, মেয়ে সাজানোর সময় প্রয়োজন এই পাঁচকুলা বা বরণকুলা। নতুন অতিথিকে বরণ করতে এই বরণকুলা অত্যাবশ্যক। নতুন গৃহের পত্তন বা নির্মাণকাজ শুরু উপলক্ষে 'হুত্তুর' দেয়া ও ঘরে প্রবেশ উপলক্ষে এবং বিদেশ যাত্রাকালে এবং সওদাগরেরা নববর্ষের হালখাতা উপলক্ষে পাঁচকুলা বা

www.pathagar.com

বরণকুলা বা মঙ্গলঘট স্থাপন করে। এক কথায় বলা যায়, প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি কক্সবাজারে শুভ মাঙ্গলিক প্রতীকরূপে পাঁচকুলা বা বরণকুলা অম্লান। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সংস্কারপন্থী মুসলমানদের আন্দোলনের ফলে মুসলমানসমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ পাঁচকুলা বা বরণকুলা অনৈসলামিক আচার বলে পরিত্যাগ করেছে। তবে জেলার বিয়ে-শাদীতে এখনো মাঙ্গলিক প্রতীকরূপে পাঁচকুলা বা বরণকুলার বহুল প্রচলন রয়েছে।
প্রাচীনকালে কক্সবাজারের হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সমাজে পাঁচকুলা বা বরণকুলার উপাদান অভিন্ন ছিল কিনা জানা যায় না। নিচে হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বরণকুলা উপাদানের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হল।

### হিন্দু সম্প্রদায়ের বরণকুলা

হিন্দু সম্প্রদায়ের বরণকুলা বা বরণডালার উপাদান যথাক্রমে-একমুঠো ধান বা চাউল, দু'তিন টুকরো কাঁচা হলুদ, একগুচ্ছ দুর্বা ঘাস, সিঁদুর, মুখে আম্রপল্লব দেয়া একটি জলপূর্ণ মাটির ঘটি বা কলসি, সরিষাতেলে প্রজ্জ্বলিত মাটির সেজ দীপ। এই উপাদানগুলো একখানি আল্পনা চিত্রিত নতুন কুলায় রক্ষিত হলে বরণকুলা বা বরণডালা হয়।

### মুসলমানসমাজের পাঁচকুলা বা বরণকুলার উপাদান

কক্সবাজারের মুসলমান সম্প্রদায়ের পাঁচকুলা বা বরণকুলা স্থান বিশেষে নতুন ডালা বা কুলাও ব্যবহার করে। আর তাদের পাঁচকুলা বা বরণকুলার উপাদানে সিঁদুর ছাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের বরণকুলা বা বরণডালার অনুরূপ হয়ে থাকে। তবে মধ্যযুগের কক্সবাজারের কবি নশরুল্লাহ খোন্দকারের লেখায় এখানকার মুসলমানের পাঁচকুলা বা বরণকুলার উপাদানের নাম উল্লেখ দেখা যায়-

'আর এক ডালা ভারি ভূত পূজা খানি।
ধূপ, ধান্যে, পিঠা, কলা শিলা ভরি আনি।
দামাদ কন্যার আগে আনিয়া রাখন্ত।
যুগ ধরে ধূপা দিয়া অধিক রাখন্ত। (শরীয়তনামা, পৃষ্ঠা-৯৯)

মধ্যযুগে কক্সবাজারের মুসলমানের পাঁচকুলা বা বরণকুলার ধান, হলুদ, দুর্বাঘাস, সরিষা তেলে প্রজ্জ্বলিত মাটির সেজ দীপ বা কুপি, পানিপূর্ণ মাটির ঘটি বা কলসির মুখে আম ছুরতি বা আম-সরতি এই ছয় পদ ছাড়াও ধূপ, পিঠা, কলা, শিলা এই চার পদ উপাদান অতিরিক্ত ছিল। তা থেকে মনে হয় প্রাচীনকালে কক্সবাজারের মুসলমানের বরণকুলার উপাদান এখানকার হিন্দু-বৌদ্ধ বরণকুলার উপাদানের সাথে অভিন্ন ছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মুসলমানদের পাঁচকুলা বা বরণকুলায় অনেক পরিবর্তন এসেছে।

### বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বরণকুলার উপাদান :

কক্সবাজারের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বরণকুলা বা বরণডালার উপাদানসমূহ :

www.pathagar.com

১. নতুন কুলা- একটি, ২. সাইল ধান- ১,২২৫ গ্রাম, ৩. দুর্বাঘাস- একগুচ্ছ, ৪. কাঁচা কলা- ৫টি, ৫. কাঁচা পেয়ারা-৫টি, ৬. কাঁচা হলুদ- ২ থেকে ৩ টুকরো, ৭. শিলা (ছোট পাথর)-এক টুকরো, ৮. ঘিলা- একটি, ৯. সরিষা তেলের মাটির সেজ দীপ- একটি, ১০. পানিপূর্ণ মাটির কত্তি বা বদনা-একটি, ১১. অশ্বথ পাতা- এক থোকা, ১২. বাঁশ পাতা- এক থোকা, ১৩. মুরাঝী পাতা- এক থোকা, ১৪. আম্রপল্লব-এক থোকা ও ১৫. কলাগাছের ডিক (কচিপাতা)-এক থোকা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কক্সবাজারের বিয়ে-শাদী ও শুভকাজের মাঙ্গলিক প্রতীক বরণকুলায় রক্ষিত প্রত্যেক উপাদানের এক একটি শুভ ধারণা প্রচলিত ছিল এবং সে ধারণা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিন সম্প্রদায়েরই অভিন্ন ছিল। যেমন- ১. ধান্য-খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রতীক, ২. দুর্বাঘাস-বংশধারা বৃদ্ধির প্রতীক। সে উদ্দেশ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে দুর্বাষ্টমী ব্রত পালন করে, ৩. কাঁচা কলা ও কাঁচা পেয়ারা-সবুজ ফল। সুস্বাস্থ্য ও নিরাময় জীবন ধারণের প্রতীক। ৪. কাঁচা হলুদ-সৌন্দর্যের প্রতীক। আদিম যুগে কালো বর্ণের মানুষেরা হলুদ মেখে গাত্রচর্ম উজ্জ্বল বা সুন্দর করার চেষ্টা করত। ৫. শিলা- (পাথর) দৃঢ়তার প্রতীক। মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা বড় গুণ। ৬. ঘিলা-গাম্ভীর্যের প্রতীক। ৭. সেজ দীপ-আলো অন্ধকার দূরীভূত করে। আশার প্রতীক। ৮. পানিপূর্ণ ঘট- পানির অপর নাম জীবন। ৯. আম্র পল্লব, অশ্বথ পাতা, বাঁশপাতা, মুরাঝি পাতা ও কলাগাছের ডিক (কচি পাতা) হচ্ছে সবুজ পাতা মানুষের দীর্ঘায়ুর প্রতীক।

পাঁচকুলা বা মঙ্গলঘট ও বরণকুলা উপাদান আম্র পল্লব, কলাগাছ, নারিকেল, কলা, হলুদ, দূর্বাঘাস, ধান, ঘিলা, শিলা, কলসি, ঘট, কুলা বা ডালা প্রভৃতি অনার্যদের ব্যবহার্য। তা এ অঞ্চলের জনগণ তাদের আদি পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

কক্সবাজারের বিয়ে-শাদী অনুষ্ঠান মাসের শুভা-শুভ ধারণা :

ফাল্গুনের বিয়ে আগুন।

চৈতের বিয়ে হারুগা।

জেঠের বিয়ে হেট

কাতির বিয়ে হাতি

পউষের বিয়ে পুষ্করা।

অর্থাৎ- ফাল্গুন মাসের বিয়ে হলে সে বউয়ের মেজাজ আগুনের মতো হয়। শ্বশুর পরিবারের কারো সাথে তার বনিবনাও হয় না।

চৈত্র মাসে বিয়ে হলে, সে বউ শশুর পরিবারের প্রতি অনুদার হয়। বউ তাদের কোনো জিনিসপত্র দেওয়া- থোয়ার ব্যাপারে কঞ্জুষি করে অথবা অপয়া হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বিয়ে হলে সে বউ-এর স্বভাব-আচরণ হেট বা নিম্নমানের হয়। তার কার্যকলাপের দ্বারা শ্বশুর পরিবার অপদস্থ হয়।

www.pathagar.com

কার্তিক মাসে বিয়ে হলে সে বউর স্বভাব হাতির মতো হয়। হাতি পুষতে যেমন কলা বাগানের প্রয়োজন হয় তেমনি কার্তিক মাসে বিয়ের বউ এর সব কিছু অধিক প্রয়োজন হয়।

পৌষ মাসে বিয়ে হলে সে বউ রোগাক্রান্ত হয় অথবা তার মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও মাঘ এই সাত মাসে বিয়ে-শাদী অনুষ্ঠিত হলে সে বউ স্বামী ও শ্বশুর পরিবারের পক্ষে শুভ ও মঙ্গলজনক হয়।

প্রাচীনকালে পাঁচকুলার বহুবিধ ব্যবহার ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তা সীমিত হয়ে আসছে। একই সাথে পাঁচকুলার উপকরণও কমে আসছে। বর্তমানেও বিয়েতে মেয়েকে সাজানোর সময়, গোলায় নতুন ধান ফেলার সময়, নতুন ঘরে প্রবেশের সময় এসব আচার পালন করা বাধ্যতামূলক। বর্তমানে মুসলমানসমাজে পাঁচকুলায় উপকরণ হিসেবে যেসব উপাদান নিয়ে থাকে তার একটি তালকা দেয়া হল। পাঁচকুলায় ব্যবহার্য উপাদানসমূহ হচ্ছে যথাক্রমে-১. ৭টি কাঁচা হলুদ, ২. সাতটি দুর্বাঘাসের আটি। প্রতি আটিতে ৭টি করে দুর্বাঘাস থাকতে হবে, ৩. পাইন্যা ফুলের আগা ৩টি, ৪. পানিভর্তি কলসির মুখে আমগাছের ডাল নিয়ে তৈরি করা আম সরতি ১টি, ৫. তামার পয়সা একটি, ৬. একটি ঘিলা, ৭. একটি জ্বলন্ত কুপি বা বাতি, ৮. পাঁচপোয়া বা ১,২২৫ গ্রাম চাউল বা সমপরিমাণ ধান।

**দুলা ও কনে দেখা :** বিয়ের প্রাথমিক কথাবার্তার পর কনেপক্ষ হাটবাজারে গিয়ে বিভিন্ন উপায়ে দুলা দেখতো। বিশেষ করে বর যখন বাজারে যেত তখন কনের দুলা ভাই, দাদা, নানা, কনের বড় ভাই, নিকট-আত্মীয় বড় ভাইয়েরা বর দেখে নিতো। কোনো কোনো সময় কনের নানা, দাদা, দুলাভাই বরকে চা-নাস্তাতে আপ্যায়িত করতো। বুদ্ধিমান এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলে বর কনের নিকট আত্মীয়-স্বজনকে উল্টো আপ্যায়িত করতো। এসময় বরের দুলাভাই বা বরের বন্ধু-বান্ধব সাথে থাকতো। এ সুযোগে কনেপক্ষ বরের সাথে আলাপ করে তার সম্পর্কে জেনে নিতো। তারই পাশাপাশি বরপক্ষ গ্রামের কোনো মহিলাকে কনের বাড়িতে পাঠাতো যাকে কনেপক্ষ চিনে না। এমনও দেখা গেছে বরের গ্রামের কোনো অস্বচ্ছল পুরুষ বা মহিলাকে ভিক্ষুকের বেশে কনের বাড়িতে পাঠিয়ে কনের পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নিতো। ভিক্ষুকের বেশে পুরুষ বা মহিলাকে যখন কনের বাড়ির লোকজন ভিক্ষা দিতো না তখন বরের পক্ষ সেই বাড়িতে সম্পর্ক করতো না। ভিক্ষুকের মাধ্যমে বরপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে কনের পক্ষের লোকজনের হাতখোলা নয় বা উদার মনের মানুষ নয়। এর মাধ্যমে কনের পরিবারের মানুষ সম্পর্কে এবং তাদের দান খয়রাত করার ব্যাপারে মনোভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতো বলেই সেই পরিবারের পছন্দ হলে বিয়ের প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হতো। সময় বুঝে বর নিজেও লুকিয়ে লুকিয়ে কনের বাড়ির ঝোপঝাড়ে বা পুকুরঘাটে বা নদীর তীরে বা পার্শ্ববর্তী কোনো বাড়িতে মেহমান হিসেবে বেড়াতে গিয়ে যে কোনো প্রকারে তার ভবিষ্যৎ পত্নীকে দেখে নিতো।

www.pathagar.com

**ফুলনিশান :** উভয় পক্ষের মধ্যে কনে এবং বর পছন্দ হলে বরের লোকজন কনের বাড়িতে গিয়ে নিশানা বা চিহ্ন বা বিয়ের নমুনা স্বরূপ কোনো কিছু কনেকে দিয়ে আসতো। এই নিশানার মধ্যে কনের জন্য নাকের ফুল দেয়ার বিধান চালু ছিল। যা এখনো চালু আছে। নাকের ফুল দেয়া হতো বলেই তাকে 'ফুল নিশানা' বলা হয়। এ সময় বরের বাড়িতে ভাবী বধু বা কনেকে উপলক্ষ করে চলতো রকমারি হঁওলা, নৃত্য-গীত ইত্যাদি।

**আঙ্গিনা সাজান :** কাগজের ফুল কেটে পতাকা (বানা বা বৌটা) তৈরি করে উভয় বাড়ির অন্দরমহল, বারান্দা, আঙ্গিনা এবং বাইরের মূল ফটক বা গেইট বা ঘাটায় সাজানো হতো। আবার কোনো কোনো সময় গ্রামের সোনালু, জারুল, কৃষ্ণচূড়াসহ যেকোনো রঙিন বা উজ্জ্বল গাছের ফুল নিয়ে বাড়ির চৌহদ্দি সাজানো হতো। আবার গেইট ফুল বা বেগুনভ্যালিয়া ফুল অথবা যেকোনো রঙিন ফুল দিয়ে গেইট সাজানো হতো। তবে গেইটের দুই পার্শ্বে পানিভর্তি কলসি রাখতো। কলসিতে থাকতো আম্রপল্লব।

**গায়েহলুদ বা তেলপাই :** গায়েহলুদের বিষয়টি উপরে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বিধায় এখানে বর্ণনা দেয়া হলো না।

**পানছল্লাহ বা শলা পরামর্শ :** মানুষ বরাবরই সামাজিক। আমাদের প্রতিটি গ্রামের মানুষ সমাজবদ্ধ। ফলে দেশের প্রতিটি গ্রামে রয়েছে সমাজ। এই সমাজের রয়েছে একজন সর্দার এবং একাধিক সহকারী সর্দার। বিয়ের আগের রাতে বরের বাড়িতে পাড়া প্রতিবেশী ও সমাজের লোকজন বৈরাত বা বরযাত্রী যাওয়া সম্পর্কিত বিষয়ে পানছল্লাহ বা শল্লা-পরামর্শে বসতো। একইভাবে কনের বাড়িতেও কন্যা নামিয়ে দেয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতো। এই শল্লা-পরামর্শে বসাই হচ্ছে 'পানছল্লাহ'। স্থানীয় ভাবে বলা হয় রাতের বেলা পান খেয়ে খেয়ে এই পরামর্শ করা হয় বলেই এটাকে 'পানছল্লাহ' বলা হয়। একই সাথে বলা যায়, গ্রামে রাতের বেলাতেই শুধু পানছল্লাহ করা হয়। রাতের বেলায় গ্রামের মানুষের কোনো কাজ থাকে না বলেই রাতেই পানছল্লাহ'র বৈঠক বসে। পানছল্লাহতে সমাজের লোকজনকে পান ছাড়াও চা-বিস্কুটে আপ্যায়িত করা হয়। বিস্কুট বলতে আধুনিক উপাদেয় বিস্কুট নয়। সেসময় পানছল্লাহসহ এধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে বেলা বিস্কুট বা টোস্ট (এই টোস্টকে আগে কাটা রোজ বলা হতো। কাটা রোজ বিস্কুটের পাশাপাশি ছিল ইংরেজি বর্ণ 'S' আকৃতির কুকিজ বিস্কুট) বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়িত করা হতো। পানছল্লাহ শেষে বসতো পুঁথিপাঠের আসর। আসরে সমধুর কণ্ঠে পাঠ করা হতো পুঁথি। পুঁথিপাঠের সাথে চলতো তার অর্থ বলা এবং ফাঁকে ফাঁকে চলতো চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন। এই পুঁথিপাঠের আসর চলতো সারারাত। কিছুদিন পূর্বেও পুঁথি পাঠ করতে পারে বা পুঁথির অর্থ বলতে পারে এমন লোকের কদর ছিল ব্যাপক।

**হচারগুয়া :** বিয়ের দিন সকালে বরপক্ষকে প্রয়োজনীয় পান-সুপারি ও পাক্কন পিঠাসহ বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য-সামগ্রী কনের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিতে হয়। এসময় দ্রব্য-

www.pathagar.com

সামগ্রী কনের বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হতো মূলত বৈরাতি বা বরযাত্রী কনের বাড়িতে গেলে তাদের পান-সুপারি দিতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্যই সকালেই পাঠিয়ে দেয়া হতো। বৈরাতিরা কনের বাড়িতে যথাসময়ে পান না পেলে কিন্তু বিরাট আইপের (অসম্মান বা অপমানজনক) কথা। কনের বাড়িতে সুপারি কেটে যাতে তৈরি রাখা যায় সেজন্যই পান-সুপারি সকাল বেলায় বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে পাঠানো হয়। পান সুপারিসহ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীকে যারা নিয়ে যায় তাদেরকে স্থানীয় ভাষায় হচারগুয়া বলে। স্থানীয় আঞ্চলিক শব্দ 'হচার' অর্থ খবর। বিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য অগ্রিম খবর নিয়ে যারা কনেপক্ষের বাড়িতে যায় তাদেরকে 'হচারগুয়া' বলা হয়।

**লোয়াজিমা :** কক্সবাজার জেলায় বিগত দু'এক যুগ আগেও বিয়েতে 'লোয়াজিমা' ছিল একটি অপরিহার্য অঙ্গ। লোয়াজিমার জন্য কত বিয়ে ভেঙে গেছে তার কোন সঠিক হিসেব নেই। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল বরপক্ষকে এই লোয়াজিমা দিতে হতো। কনেপক্ষের চাহিদা মতো আলাপ-আলোচনাক্রমে সমঝোতার ভিত্তিতে এই লোয়াজিমা দিতে হতো। কনেপক্ষের সমাজে (মহল্লা কমিটি) কী পরিমাণ সদস্য রয়েছে, সে অনুপাতে কনেপক্ষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর ভিত্তি করেই এই লোয়াজিমা ধার্য করা হয়। লোয়াজিমার প্রথম এবং অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে পান, সুপারি, চুন; বেলা বিস্কুট, দই, গুড় বা চিনি ও সরবত (রুহ্ আফজা বা এই জাতীয় পানীয়)। বিয়ের দিন বরযাত্রীর সাথেই এই লোয়াজিমা কনের বাড়িতে নেওয়া হয়। লোয়াজিমার সাথে আরো ধার্য থাকে কিছু নগদ অর্থ-কড়ি। এই অর্থ স্থানীয় মসজিদ, কনে বাল্যকালে যে মক্তবে পড়েছে সে মক্তবের ওস্তাদ, চুল কাটার নাপিতকে দেয় অর্থ বরপক্ষের পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর নির্ভর করেই ধার্য করা হয়। লোয়াজিমাসহ দুপুরে বৈরাতি (বরপক্ষের লোকজন) কনের বাড়িতে পৌঁছার পূর্বে গোল্দা বা গোল্ডা (পটকা বা আতশবাজি) ফাটিয়ে জানান দিতে হয়, যাতে কনেকক্ষের লোকজন বরপক্ষের লোকজনকে যথোপযুক্ত ইজ্জত-সম্মান দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে পারে। বৈরাতিকে যথাযথ সম্মান না করাও আইপের (আপত্তির বা অপমানজনক) বিষয়। বৈরাতি কনের বাড়িতে পৌঁছার পর লোয়াজিমার মালামাল কনেপক্ষের সর্দারকে হস্তান্তর করতে হতো। কনেপক্ষের সমাজের লোকজন শ্রান্ত-ক্লান্ত (তৎকালীন সময়ে বৈরাতিরা হেটেই কনেপক্ষের বাড়িতে যেতো, তখন যানবাহন ছিল না। বর্তমানে প্রান্তিক জনপদে দিনমজুরের বিয়েতেও বৈরাতিরা মাইক্রোবাস বা জিপ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং যানবাহনের আধিক্যের কারণে) বৈরাতিকে তাড়াতাড়ি শরবত (পানির সরবত), বিস্কুট, দই-এর শরবত, পান-সুপারি ইত্যাদি দিয়ে আদর-আপ্যায়ন করতো। এসব লোয়াজিমার পান, সুপারি, দই, গুড় বা চিনি সমাজের সর্দারসহ প্রতিটি পরিবারকে ভাগ করে দিতে হতো। না দেওয়াটা ছিল গর্হিত। এই ভাগ বন্টনের দায়িত্বটি অবশ্যি সমাজের সর্দারই পালন করতেন, যা তাঁর জন্য বিশেষ সম্মান ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপার। অসচ্ছল পরিবারের মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক হলে অনেক সময় এসব লোয়াজিমার পরিমাণ কম ধরা হতো। ফলে সমাজের সর্দারই লোয়াজিমার মালামালের ভাগ পেতো। সাম্প্রতিক কালে এসব লোয়াজিমার আচার-অনুষ্ঠান অনেকটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়াও পূর্বের মতো এখন কনের পিতার বাড়ি থেকে কনে নামিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ

www.pathagar.com

ক্রমশ ওঠে যাচ্ছে। পূর্বে অনেক দূর থেকে বরপক্ষের লোকজন হেঁটে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে কনের বাড়িতে আসতো বিধায় তাদেরকে ঠাণ্ডা পানীয় তথা দই-এর সরবত করে দেওয়া হতো। অবশ্যি লোয়াজিমার সাথে কনের বাড়ি থেকেও বরযাত্রীদেরকে কিছু নাস্তা দেয়া হতো। অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের পিঠা বানিয়ে দেয়া হতো। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হলে কনেপক্ষ বাড়িতে বর পক্ষের লোকজনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পিঠা বানিয়ে রাখতো। এসব পিঠার মধ্যে পাক্কন পিঠা, জালা পিঠা, আতিক্কা পিঠা, চিতল পিঠা উল্লেখযোগ্য। তবে ভাত খাওয়ানোর কোনো রেওয়াজ ছিল না। তবে বেশি দূরের বরযাত্রী হলে গরু জবাই করে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করতো। গ্রামেও এখন ক্লাবকেন্দ্রিক বিয়ে চালু হয়ে গেছে। ফলে পূর্বের মতো বরযাত্রীদের সরবত দিতে হয় না। কারণ বরপক্ষের লোকজন দ্রুত ও কম সময়ে গাড়িতে করেই ক্লাব পৌঁছে যাচ্ছে। ক্লাবে পৌঁছে খাবারের ব্যবস্থা করা হয় এবং কোমল পানীয় সরবরাহ করা হয়। এ অবস্থায় সরবতের স্থান দখল করে নিয়েছে কোমল পানীয়।

লোয়াজিমা এখন একদম বন্ধ হয়ে গেছে একথা বলার এখনো সময় আসেনি। দই-এর ব্যবহার বন্ধ, বরপক্ষকে পান, সুপারি, চুনসহ অন্যান্য মালামাল এখন আর আনতে হয় না। আলোচনাক্রমে পান, সুপারী, চুন, কোমল পানীয়ক্রয় করার জন্য টাকাটা কনেপক্ষকে নগদ গুণে দিলে প্রয়োজনীয় মালামাল তারাই বাজার থেকে ক্রয় করে থাকে। তবে পূর্বের মতো পান, সুপারি বা দই বা চিনির কিছু অংশ সমাজের সর্দার বা অন্য কাউকে দিতে হয় না।

উল্লেখ্য যে, কনের বাড়িতে হচারগুয়াকে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়। মোরগ-মুরগী বা ছাগল জবাই করে তাদের তাজিমের (সম্মানের) সাথে খাওয়ার ব্যবস্থা না করা অসম্মানজনক। তাদেরকে যথোপযুক্ত ইজ্জৎ না করলে বরের বাড়িতে গিয়ে কনেকে পস্তাতে হয়। হচারগুয়াকে ইজ্জত না করার মাশুল কনেকে প্রতিনিয়ত দিতে হয় বরের বাড়িতে। বরের বাড়িতে প্রতিনিয়ত খোঁটা দিয়ে কনে বা নববধুকে অপমান বা নির্যাতন করা হয়। এখানে বরযাত্রী বলা হলেও প্রকৃত অর্থে বৈরাতিকে বরযাত্রী বলা যাবে না। কেননা কনেকে বরের বাড়িতে তুলে নেওয়ার জন্য যে দল আগমন করে তাদের সাথে বর থাকে না।

কনে নামিয়ে দেওয়ার সাথে আরো কয়েকটি আচার অনুষ্ঠান অঙ্গা-অঙ্গিভাবে জড়িত। বিশেষ করে কনের বাড়িতে সমাজের লোকজনকে দুপুরের খাবার দিতে হয়। দুপুরের এই খাবারটাকে 'আদদৌতি' খানা বলা হয়। কনেপক্ষের সমাজের লোকজন বিকালে কনে নামিয়ে দেবে, সেজন্য তাদেরকে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বরপক্ষের লোকজন আসলে তাদের আপ্যায়ন করার প্রস্তুতি নিতে হয়। কনের বাড়ির অবস্থা বুঝে খাবারের মেনো বা তরকারির তালিকা ঠিক করা হয়।

**বৈরাত যাত্রা :** বিয়ের দিন যোহরের নামাজের পরেই সমাজের লোকজন বৈরাতি (এখানে বরযাত্রী বা বৈরাতি বলা হলেও মূলত তা বরযাত্রী নয়। যখন বরসহ যাত্রা করে তখনই বরযাত্রী। কিন্তু পূর্বে গ্রামে বরপক্ষের লোকজন কনের বাড়িতে গিয়ে কনেকে পাল্‌কিতে করে বরের বাড়িতে নামিয়ে নিয়ে আসতো। যেহেতু কনের বাড়িতে বরপক্ষের লোকজন যাত্রা করতো সে কারণেই এটাকে বরযাত্রা বলা হতো) হয়ে বউ

www.pathagar.com

(কনেকে বউ বানিয়ে আনতো) আনতে যেতো এবং কনের জন্য ধার্যকৃত অলংকারাদি, কাপড়-চোপড় প্রত্যার্পণ করে কনেকে সাজিয়ে বউ বানিয়ে পাল্কিতে করে নিতে আসতো। বরযাত্রার প্রাক্কালে সাগরে জোয়ার শুরু হয়েছে কিনা তা দেখে নিতো। মূলত জোয়ার শুরু হলেই কনের বাড়ির উদ্দেশ্যে বরযাত্রা শুরু হতো। বরযাত্রার পূর্বে জোয়ারের বিষয়টি কঠোরভাবে মেনে চলতো। জোয়ারের সাথে বরযাত্রার সম্পর্ক কী? এব্যাপারে ষাট থেকে সত্তরোর্ধ মুরুব্বিদের কাছ থেকে জানা গেছে জোয়ার শুরুর সাথে বরযাত্রার ছিল নিবিড় সম্পর্ক। আর এই সম্পর্কটা ছিল মূলত জোয়ারের সাথে বরযাত্রা বের হলে সেই বাড়িতে ভাগ্যও জোয়ারের মতো আগমন করে।

কনে সাজানো শেষ হলে রৈবাতিরা বউ বা কনেসহ বরের বাড়িতে ফিরে যেতো এবং রাতের খাবারের (ভোজ) আয়োজন বরের বাড়িতে করা হতো। কনেকে তার পিত্রালয় থেকে বরের বাড়ির উদ্দেশ্যে নামিয়ে দেয়ার পূর্বে বরপক্ষের কিছু ছেলে কনের বাড়ির চুলার ঝুটি চুরি করে নেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। চুলার ঝুটি নিয়ে যেতে পারলে তার জন্য বরের বাড়িতে থাকে উপযুক্ত পুরস্কার। গ্রামে এখনো বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বিয়ের দিন কনের বাড়ির চুলার ঝুটি নিয়ে আসতো পারলে এতে কনের বাড়ির ভাগ্য চলে আসে। সে কারণে পূর্ব থেকে বরের বাড়ির কোনো কোনো ছেলেকে কনের বাড়ির চুলার ঝুটি নিয়ে আসার দায়িত্ব দেয়া থাকে।

**দুলা কামানী ও দুলা সাজানী :** বিয়ের আগে দুলা কামানী একটি সুন্দরতম অনুষ্ঠান। দুলা মানে বর। বিয়ে পড়ার পূর্বে বরকে উঠানে একটি সাজানো মঞ্চে বসিয়ে নাপিত কর্তৃক দাড়ি গোঁফ কামানোকে দুলা কামানী বলা হয়। দুলা কামানীর জন্য পূর্বপরিচিত বা পরিবারের বা সমাজের নির্ধারিত ক্ষৌরকার বা নাপিতকে ডেকে এনে আয়োজনটি শুরু হতো। এ সময়ে পুরোদমে চলতো হঁওলা, হঁওলার সঙ্গে লোকনৃত্য। ক্ষৌরকার তার ক্ষৌরকর্ম শেষ করলে বকশিসের জন্য বসে থাকতো এবং বকশিস না পাওয়া পর্যন্ত স্থান ছাড়তো না। ক্ষৌরকর্ম শেষ হলে বরকে তার নিকট লোকজন, বিশেষ করে ভাবী, দুলাভাই, নানি, দাদি বা বন্ধু-বান্ধব মিলে গায়ে সুগন্ধিযুক্ত সাবান দিয়ে গোসল করাতে নিয়ে যেতো। এসময় মেয়েরা (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছেলেরাও হঁওলা গেয়ে থাকে) বিভিন্ন ধরনের হঁওলা গেয়ে আনন্দ-উল্লাস করতো। এই হঁওলা গীতের একটি নমুনা নিম্নে দেয়া হলো–

অজু বালা বানাওরে দাবান
অজু বালা বানাওরে ... হারয়ে হায়
অজুরঅ না চতুর্ধারে- দাবান
নন্দাইয়া বানাই দেরে অজুরে ... হায়রে হায়
গোসল বালা বানাওরে দাবান
গোসলবালা।
বানাওরে হায়রে হায়
অরে গোসলরঅ না চতুর্ধারে ... দাবান
নন্দাইদের গোসলরে হায় হায়রে।
সাজান :

www.pathagar.com

মাথারঅ না টুপি আইন্যি দাবানরে
ওঁকি দাবান রইস্যা দুলার পৈরনে।
সাধুভাই-
· সাজুক সাজুক দুলা
ঐ গোসলের ঘাড়ে
গায়েরঅ না গন্জি আইনলাম দাবানরে
অঁকি দাবান রইস্যা দুলার পৈরনে
সাজুক সাজুক দুলা সাধুভাইয়ের ঐ গোসলের ঘাড়ে।
গায়েরঅ না জামা আইন্যি দাবানরে
অঁকি রইস্যাদুলার পৈরনে
সাজুক সাজুক দুলা সাধু ভাইরে ঐ গোসলের ঘাড়ে ...
উক্ত ছত্রে লুঙ্গি, ছাতি ও আংটির কথা বলে সাজান শেষ হবে।

এভাবে হঁওলা গেয়ে দুলাকে সাজানো শেষ হয়। বর্তমানে এ সংস্কৃতি গ্রামে কদাচ দেখা গেলেও শহরে তা বিলুপ্ত। সাংস্কৃতিক উপনিবেশের ফলে শহরে বিবাহপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

**দুলা আগ-বাড়ান :** সাজিয়ে বর বেশে দুলাকে বন্ধু-বান্ধব এবং বিশেষ করে দুলাভাই বা দাদা বা নানা সম্পর্কের কেউ বিয়ে পড়াতে মৌলভির সামনে নিয়ে যাওয়াকে 'দুলা আগ-বাড়ান' বলা হয়। দুইজন সাক্ষী ও একজন উকিল ভাইয়ের (কনেপক্ষের সাথে বিয়ের কথা চালনাকারীকে উকিলভাই বলে) সহযোগিতায় মৌলভী সাহেব বা কাজী সাহেব বিয়ে পড়াবার ব্যবস্থা করেন।

**বধুবরণ :** কনেকে বধু বেশে পাল্‌কিতে করে বরের বাড়িতে আনা হতো অর্থাৎ কনেকে বধু সাজিয়ে পালকিতে চড়িয়ে বরের বাড়িতে (শশুরবাড়িতে) নিয়ে আসা হতো। নববধুকে বরণ করে নিতে এগিয়ে আসতো বরের দুলাভাই, ভাবী, নানি বা দাদি। যদি দুলাভাই ও ভাবী না থাকে তাহলে নিকট আত্মীয় দুলাভাই বা ভাবী বা প্রতিবেশী ভাবীকে ডেকে আনা হতো। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুলার বড়বোনই নববধুকে বরণ করে নিতো। নববধুকে পাল্‌কি থেকে বের করে ভাবী অথবা ভগ্নিপতি অথবা আত্মীয় জনেরা পৃথক একটি সাজানো কক্ষে নিয়ে বসাতো। এ সময় দুলার আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই বধুর চেহারা বা নববধুর নতুন মুখ দেখে নগদ অর্থ উপহার দিতো। বিয়ের পরেও পাড়া প্রতিবেশীরা বউ দেখত অনেকটা ঘটা করে। বর্তমানেও এভাবে বধুবরণ করা হয়। তবে পূর্বে নববধু পালকি থেকে নেমে বিড়ম্বনার শিকার হতো। আর তা হচ্ছে ঘরের সদর দরজায় বিছানো থাকতো শাশুড়ির শাড়ি বা গায়ের গামছা বা গায়ের শাল বা গায়ের চাদর বা বেডসিট জাতীয় চাদর। মাঁআরা (যারা পাল্‌কি বহন করে তাদেরকে মাআরা বলে) নববধুকে পাল্‌কিতে করে এনে সদর দরজায় নামাতো। নববধু পাল্‌কি থেকে নামলেই বধুবরণ করা হতো। এসময় বধুবরণ করার জন্য অপেক্ষমান সবাই দেখতো নতুন বউ পাল্‌কি থেকে নেমে কী করে? নববধু বুদ্ধিমতি কিনা তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এভাবে ঘরের সদর দরজায় কাপড় বিছানো হতো। যদি নববধু কাপড় না তুলে তার উপর দিয়ে হেঁটে ঘরে প্রবেশ করে তাহলে

www.pathagar.com

ধরে নেয়া হয় নববধু আদব-কায়দা কিছুই শিখেনি পিতার বাড়িতে। অথবা ধরে নেয়া হয় নববধু বেআক্কেল বা পাগল অথবা হাবাগোবা। কাপড়ের উপর দিয়ে হেঁটে ঘরে প্রবেশ করলে নববধুকে বরের বাড়িতে প্রতিনিয়ত কথার হুল ফুটানো হতো। বিশেষ করে বরের দাদা-দাদি, নান-নানি, শ্বশুর-শাশুড়ি, বরের বড়বোন এমনকি প্রতিবেশীরাও এসব তুলনা দিতে ছাড়তো না। কথায় কথায় নববধুকে বলবে মেয়েকে তার পিতার বাড়িতে (কনের বাড়ি) পিতা-মাতা, দাদা-দাদি বা নানা-নানি কিছুই শিখায়নি। ফলে দেখা গেছে যে, নববধু পাল্‌কি থেকে নেমেই কাপড়টি গুছিয়ে শ্বশুরবাড়িতে প্রথম পদক্ষেপ দেয়। অবশ্যি নববধু হয়ে যখন কোন মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায় তার আগেই তাকে পিতার বাড়িতে মা-দাদি-নানিরা বা ভাবীরা এসব বিষয়ে শিখিয়ে বুঝিয়ে দিতো। এসব শিখিয়ে দেয়া নববধুর পিতার বাড়ির অবশ্য করণীয়।

**দুলার প্রথম বউ দেখা বাদশাহী নজর :** দুলা অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে বাদশাহী কায়দায় প্রথম তার জীবন সঙ্গিনীকে অপরূপা বধু বেশে দেখে নিতো।

**ফুলশয্যা :** বিগত কয়েক যুগ আগে কক্সবাজারের বিভিন্ন অঞ্চলে বিয়ের তৃতীয় রাতে বর-কনের ফুলশয্যা দেয়া হতো। ভাবী, দাদি বা নানি সম্পর্কীয় কেউ নববধু ও বরের মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করতো। বরের ফুলশয্যা মূলত ফুল দিয়ে ভরিয়ে তোলা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বরের ফুলশয্যায় কাঁচা ফুল দিয়ে সাজানো হয়। পূর্বে কাঁচা ফুলের ব্যবহার ছিল না। কাঁচা ফুলের পরিবর্তে রঙ-বেরঙের কাগজ কেটে পতাকা বানিয়ে বরের ফুলশয্যা সাজানো হতো।

**সাতদিন্যা ফিরানী :** নববধু ৫ দিন বা ৭ দিন শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করার পর পিতৃগৃহে নাইয়র (বেড়াতে) যাওয়াকে ফিরানী বলে।

**জামাইর চোরা বেরানী :** নববধু পিতার বাড়িতে নাইয়র (বেড়াতে) যাওয়ার ২/৩ দিন পর দুলা কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গভীর রাতে প্রথম শাশুড় বাড়িতে বেড়াতে যায়। এসময় নতুন জামাইয়ের জন্য সামর্থ অনুযায়ী উপাদেয় খাবার তৈরি করতে হয়। বরের বাড়ির লোকজনের অজ্ঞাতে শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়াকে 'জামাইর চোরা বেরানী' বলা হয়। এ সময় জামাইকে পান খাওয়ার জন্য দেয়া হতো 'পানের বাটা'। এই পানের বাটাকে 'সিকান্দরি পানের বাটা' বলা হয়। সিকান্দরি পানের বাটার রয়েছে একটি চমৎকার সংস্কৃতি।

**সিকান্দরি বাটা :** বিগত কয়েক যুগ আগেও কক্সবাজার জেলার সর্বত্র বিবাহপর্বে বিবাহিত বর যখন প্রথমবারের মতো শশুরবাড়িতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘটা করে বেড়াতে যেতো তখন নতুন বরের সম্মানার্থে এ বাটা প্রদান করা হতো। বরের বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ভোজনপর্ব সম্পন্ন হলে শালা-শালি, ভাবী, দাদা-দাদি বা নানা-নানি নতুন জামাতার বন্ধু-বান্ধব ও জামাতার উদ্দেশ্যে সিকান্দরি বাটা পরিবেশন করে। সিকান্দরি বাটার পান খাওয়ার জন্য বিশেষ জ্ঞানের দরকার হয়। সিকান্দরি পানের বাটার বিশেষ ধরনের শ্লোক জানা না থাকলে পান খাওয়া যায় না। অর্থাৎ পান না খেয়ে শশুরবাড়ি থেকে চলে যেতে হয়। সে কারণেই নতুন জামাতা শশুরবাড়ি যাওয়ার সময় বয়োবৃদ্ধ দুলা ভাই বা নানা বা দাদাকে সাথে নিয়ে যেতো। নতুন জামাতা শশুরবাড়িতে পান খেতে না পারার অর্থ হচ্ছে শশুরবাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে চলে আসা। এর ফলে জামাতা যে মুর্খ সে

www.pathagar.com

কথাই প্রমাণ করে। শশুর পক্ষের ভাবী, দুলাভাই, দাদা-দাদি, নানা-নানি সিকান্দরি পানের বাটার সাথে প্রশ্নবাণ হানতো।

**বাটার গঠন যেভাবে :** একটি পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য চীনামটির থালার মধ্যভাগে একটি গ্লাস উপুড় করে রাখা হয়। তার চারপাশে জামাতার সম্মানে রাখা হয় টাকা, পান সুপারি, জর্দা চুন সুচারুরূপে সাজিয়ে থালাটি মোলায়েম একটি রেশমি রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। বিশেষ সংখ্যা নির্ধারিত করে বাটায় ১৬টি পান ভাজ করে রাখা হয়। এর পরে শুরু হয় প্রশ্নবাণ :

পান দিলাম থরে থরে
শতরঞ্জির পরে
পান খাও পণ্ডিত ভাই
কথা কইবা ট্যা'রে
পানগুয়া জরমিয়াছে বল কি পরকারে?
পান খাইবা বসি
কথা কইব রচি
যে ন জানে পানের আদ্য কথা
ছ'লে চাবায় হারগুয়া পাতা।
দাঁতে ধরে সাইর গুয়া
ওঁড়ে ধরে রঙ
কহ পণ্ডিত ভাই পানর বচন।
যে ন জানে গুয়ার আদ্য কথা
তে চাবায় তার বেড়ির মাথা।

বরপক্ষ উপরোক্ত প্রশ্নবাণের বচনভিত্তিতে জবাব দিয়ে কাঙ্ক্ষিত বাসনা পূরণ করতে পারবে। অন্যথায় সমূহ বিপদ সিকান্দরি বাটা নিয়ে পূর্বোক্ত প্রশ্নবচনের উত্তরের অপেক্ষায় কনেপক্ষ। জবাব দিয়ে পান পরিবেশন করবে বরপক্ষ :

ছালাম মানি আমিবসি,
কালারামে আনিল গুয়া
লক্ষণে জিজ্ঞাসিল,
দরিয়ার মোরে ওক সোয়া
হনুমানে তুলে দিল মানিকের কূলে
আশিন, কাতি ঘন বরিষা গুয়া বাতি দেবা লইল ডাক
গওর গণে গুয়া পাড়ে,
শ্রীধন কামারের লোয়া বানাইলো ছুরাতা
ছুরাতায় কাড়িয়া গুয়া, গুয়া করে খান খান
এক ভাইয়ে উড়ি বলে থাই দইয্যার পাড়
বিশ করমা সাজাই পান, দিল সভা বিদ্যমান
দাঁতে ধরে সাইর গুয়া, পানে ধরে রঙ
শুনরে পণ্ডিত ভাই পানগুয়ার বচন।

www.pathagar.com

এখানেই বাটা ভাঙা শেষ নয়। বাটায় ১৬টি পান পৃথক পৃথক ভাঁজ করা থাকে নির্দিষ্ট এককে। বরের বন্ধু-বান্ধব স্ব-স্ব পানগুয়া চিহ্নিত সহকারে গ্রহণ করার জন্য বরপক্ষ পুনরায় বলবে।

'চাইর তুর্কী হয় আর পঞ্চহিন্দুয়ান
দুই রুমী, কুফর এক, তিন মুসলমান
নেত্রায় বেদীন আর চন্দ্র মুসলমান
যুগ কুফের, যুগ মোমিন, প্রধান
সকলের শেষে আর একই বেদীন
লোকমান হাকীমও জানে একীন।

এভাবে বরপক্ষ জবাবদিহি করে উপুড় করা গ্লাসটির উপর হতে রেশমি রুমালটি নিয়ে নিমাংশে ছেকে ঢুকিয়ে গ্লাসটি তুলে ফেলবে এবং পান নিয়ে খেতে থাকবে। এখানেই শেষ সিকান্দরি বাটার। বর্তমানে এ বাটা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত। বিয়ের আসরে বা বরের সাথে 'সিকান্দরি বাটা' ভাঙার জন্য পূর্বঅভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকজনকে বিয়ের আসরে বা বরের সাথে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম চালু ছিল। একারণে গ্রামে চালু আছে 'দরকার হইলে বুরাবুরি ঢোল ভরি নিয়া পরে'।"[১৮]

**হিন্দু বিবাহ :** হিন্দুদের বিয়েতে মাঙ্গলিক প্রতীক হিসাবে পূর্বেই সাজানো হয় মঙ্গলঘট ও বরণকুলা বা বরণডালা। বাড়ির প্রবেশ পথে দু'টি কলাগাছ পুঁতে এর গোড়ায় দুটি পানি ভর্তি কলসী রাখা হয়। কলসীর ভেতর আমপাতা রেখে মঙ্গলঘট সাজানো হয়। আমপাতা রাখাকে স্থানীয়ভাবে আম ছুরতি বা আমসরতী বলা হয়। প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসেবে কলসীর উপর ডাব কিংবা নারকেল রাখার রেওয়াজ আছে। যথা নিয়মে বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন হলে অর্থাৎ বর-কনে পক্ষ পরস্পর সমঝোতায় এলে বিয়ের নির্ধারিত দিন ধার্য হয় এবং ধর্মীয় রীতি অনুসারে ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করে। বিয়ের পূর্বের আশির্বাদ অনুষ্ঠান কনের বাড়িতে সম্পন্ন হয়। হিন্দু বিবাহেও কতগুলো লৌকিক আচার প্রত্যক্ষ করা যায়। ১. বর ও কনের অধিবাস বা গায়ে হলুদ, ২. মূল বিবাহ, ৩. বাসি বিবাহ, ৪. বউভাত, ৫. দশ রাত্রি পালন, ৬. মাটি ওরানী বা বরকে শশুর বাড়ি নেয়া, ৭. বিয়াই ভাতা ইত্যাদি।

**বৌদ্ধ বিবাহ :** বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিয়েতে দুটি পদ্ধতি দেখা যায়। ক. নামন্ত বিবাহ এবং খ. চলন্ত বিবাহ। নামন্ত বিয়ে হলো ঢোলবাদ্য বাজিয়েবৈরাত যাত্রীরা বা বরযাত্রীরা কন্যাকে পাল্‌কিতে করে বরের বাড়িতে নিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা। আর চলন্ত বিয়ে হলো ঢোল বাদ্য বাজিয়ে কন্যার বাড়িতে গিয়ে বরের বিবাহকর্ম সম্পাদন করা। বৌদ্ধ বিয়ের অনুষ্ঠানে বর ও কনেপক্ষের উপস্থিতিতে বয়স্ক একজন বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করে বর-কনের সামনে রাখা মঙ্গলঘট বা কলসী হতে পানি ছিটিয়ে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা করেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের কয়েকটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানের অনুরূপ।

বৌদ্ধ বিয়েতে আরো ৪টি বিশেষ লোকাচার প্রত্যক্ষ করা যায়। ১. বর-কনের স্নান অনুষ্ঠান, ২. নতুন বধুর মাটি ওরানী, ৩. বিয়াই ভাতা ও ৪. স্বাদ ভক্ষণ বা হাদী খাওয়ান। এসব অনুষ্ঠানের কয়েকটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানের অনুরূপ।

www.pathagar.com

**রাখাইনদের বিবাহ :** রাখাইন সম্প্রদায়ের বিয়েতে রয়েছে প্রাচীন রীতি-নীতি। আর এসব রীতি-নীতির মধ্যে রয়েছে 'প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রাখাইনসমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ পাত্রী দেখা ও পছন্দ করার পর দু'পক্ষের মধ্যে বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হয়। এরপর পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠি বিচারপূর্বক জ্যোতিষির ভবিষ্যতবাণীও অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিয়ের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়। দিন-দুপুরে প্রচলিত রীতিনীতি মেনে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সমাপন করা হয়। বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাও থাকে।"[১৯]

বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রাখাইন সম্প্রদায়ের পুরুষ-সদস্যকে (সাত বছরের অধিক বয়সী) বিয়ের আগে যে-কোনো সময়ে শ্রামণ্য গ্রহণ করতে হয়। সামাজিক রীতি অনুযায়ী শ্রমণ না হলে বা ধর্মীয় এ দীক্ষা গ্রহণ না করে কেউ বিয়ে করে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করতে পারে না।

## ১১.প্রবারণা পূর্ণিমা

প্রবারণা পূর্ণিমা বৌদ্ধদের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। আকাশে ফানুস ওড়ানোর জন্য ফানুস উত্তোলন (আকাশ প্রদীপ) উৎসব নামে প্রবারণা পূর্ণিমার উৎসব সমধিক পরিচিত। রাখাইনরা এ পূর্ণিমাকে 'ওয়া ক্যোয়ে লাব্রে' নামে অভিহিত করে থাকেন। ওয়া অর্থ বর্ষাবাস, ক্যোয়ে অর্থ পূর্ণ/সমাপ্ত ও লাব্রে অর্থ পূর্ণিমা। বর্ষাবাস পূর্ণতার পরে পূর্ণিমা বিধায় এ উৎসব প্রবারণা পূর্ণিমা। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জীবিত কালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে তিন মাস বর্ষাবাস পালনের প্রথা এবং অতঃপর প্রবারণা প্রবর্তন করেন। প্রবারণায় ভিক্ষুগণ আত্মদোষ স্বীকারপূর্বক আত্মশুদ্ধি করে থাকেন। ভিক্ষুগণ এক বর্ষাবাস পালন অর্থে এক বর্ষাঋতু অতিবাহিত করা। গৌতম বুদ্ধ ৪৫ বর্ষাঋতু অতিবাহিত করেছিলেন। বর্ষাবাসের সময় বৌদ্ধ পুরোহিতরা ধর্মীয় অনুশাসনাদি যথাযথভাবে পালন করে থাকেন। এ সময়ে তাঁরা নির্দিষ্ট একটি বিহারে অবস্থান করে ধ্যান-সমাধি করেন। যে-বিহারে বর্ষাবাস করেন, সে বিহারে রাত্রি যাপন করতে হয়। অত্যাবশ্যক হলে বিহারের বাইরে গমনের প্রয়োজন হলে পরবর্তীতে যেভাবে পারে উক্ত বিহারে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটকে আছে, একদা মহামতি বুদ্ধ ধর্মীয় আবাস তাবতিংস স্বর্গ ভ্রমণ করেন এবং তথায় তিন মাসব্যাপী বর্ষাব্রত পালন করেন। বর্ষাব্রত অনুষ্ঠান সমাপনান্তে ওয়া ক্যোয়ে উদযাপনের প্রথম দিবসের রাতে মহামতি বুদ্ধ পৃথিবীতে আগমন করে সাঙ্কাশ্য নগরে অবতরণ করেন। নগরের অধিবাসীরা বুদ্ধকে উষ্ণ সম্বর্ধনা এবং মহামানবকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে সমগ্র নগরকে সুসজ্জিত করেন। বুদ্ধের আমল থেকে এ দিবসটি আলোক উৎসব হিসেবে সূচিত হয়ে আসছে। মূলত ভিক্ষু সংঘে বর্ষাব্রত শেষ অধিষ্ঠান বা উপবাসব্রত সমাপন উপলক্ষে প্রতিটি সংঘ সদস্য আত্ম? অনুশোচনা করে থাকেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ ৬ বছর বন-জঙ্গলে কঠোর তপস্যার পর বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের ঠিক দু'মাস পরে আষাঢ়ী পূর্ণিমার ঋষিপতন মৃগদাবের মনোরম তপোবনে তথাগত বুদ্ধ বর্মচক্র প্রবর্তন করেন। এ পূর্ণিমায় সমবেত ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশে যে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন সে নির্দেশের আলোকে আড়াই হাজার বছর পরেও তথাগত বুদ্ধের অনুসারীরা সে নির্দেশনা পালন করে যাচ্ছেন। প্রবারণা দু প্রকার। পূর্ব কার্তিক প্রবারণা 'পাথামা ওয়া' ও পশ্চিম

www.pathagar.com

কার্তিক প্রবারণা 'দুতিয়া ওয়া'। আষাঢ়ী পূর্ণিমার বর্ষাব্রত আরম্ভ হবার তারিখ থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত যে ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত পরিসমাপ্তি হয় তাকে পূর্ব কার্তিক প্রবারণা আর দ্বিতীয় বর্ষাবাসের পর যে প্রবারণা সম্পন্ন হয়, তাকে পশ্চিম প্রবারণা বলে। কোনো কারণে ভিক্ষুগণ পূর্ব প্রবারণা উদযাপন করতে না পারলে পশ্চিম প্রবারণা উদযাপন করতে হয়।

প্রবারণা উৎসব পালনের প্রকারভেদ এলাকাভেদে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আরাকানিজ বংশোদ্ভুত রাখাইন ও মারমা বৌদ্ধরা একরকম, বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধরা একরকম এবং চাকমা বৌদ্ধরা নিজেদের ঐতিহ্যগতভাবে প্রবারণা পূর্ণিমার উৎসব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে সাড়ম্বরে উদযাপন করে থাকে। ধর্মীয় পুরাহিতরা বিহারে উৎফুল্ল চিত্তে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। পক্ষান্তরে উপাসক-উপাসিকা (দায়ক-দায়িকা) এবং আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই এ সময় খোশমেজাজে আনন্দ উপভোগ করতে পছন্দ করেন। এ উপলক্ষে বিহারসমূহকে বর্ণিলভাবে সাজানো হয়। ধর্মীয় পতাকা, ফেস্টুন, নানা রঙিন কাপড় ও কাগজে পুরো ক্যাম্পাসে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। উৎসবের পনের দিন আগে থেকে বিহার প্রাঙ্গণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভিযান চালানো হয়। এহেন অভিযানে ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। পিতলের বুদ্ধমূর্তিসমূহকে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। কষ্টি পাথর ও সিমেন্ট দ্বারা নির্মিত বুদ্ধমূর্তিসমূহে নতুনভাবে রঙ লাগানো হয়। মূল বিহারের প্যান্ডেল নির্মাণ ছাড়াও বিহার ক্যাম্পাস সংলগ্ন সীমা বিহার (তাঝং) প্যাগোডা এবং উন্মুক্ত স্থানে এ উৎসব উদযাপনের জন্য অস্থায়ীভাবে প্যান্ডেল নির্মাণ করা হয়। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণীরা সংঘবদ্ধ হয়ে গ্রুপ ভিত্তিক এসব অস্থায়ী প্যান্ডেল নির্মাণ করে থাকে। বিহার ক্যাম্পাস বাইরে সাধারণত এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় না।

*কক্সবাজার শহরের অজ্ঞমেধা ক্যাং এ প্রবারণা ফানুস উড়ানোর দৃশ্য*

www.pathagar.com

পূর্ণিমার পূর্বদিন বিহার ও প্যান্ডেলসমূহে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এদিনকে রাখাইনরা 'ছোওয়েন টাং ক্রি নে' বলে। 'ছোওয়েন টাং' অর্থ পিণ্ডদান, আর 'ক্রি নে' অর্থ বড় দান। অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে পিণ্ডদান করাকে 'ছোওয়েন টাং ক্রি নে' বলে। বিহারে বিহারে এদিন মধ্যাহ্নভোজের মধ্যে সংঘ দান অনুষ্ঠান চলে। বিকালে ধর্মদেশনা হয়। কক্সবাজার শহরে বৈকালের দিকে শুকনো খাবার সামগ্রী (বিস্কুট, ফলমূল, চকলেট ইত্যাদি) নিয়ে বিহার/প্যান্ডেলসমূহে স্থিত বুদ্ধের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। বয়োবৃদ্ধদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নবীনরা এ অনুষ্ঠানে অধিকহারে অংশগ্রহণ করে থাকে। সন্ধ্যার দিকে বিহারে যাওয়া পূজারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। নিজেদের ঐতিহ্যগত বাহারী পোশাকে সজ্জিত হয় কেউবা পরিবারের সদস্যদের সাথে কেউবা বন্ধু-বান্ধবীর সাথে সমবেত হয়ে বিহারে/প্যান্ডেলে গমন করে। এ সময় বিহার/প্যান্ডেল থেকে ধর্মীয় ভাষণ, সংগীত, কোরাস মাইক/সাউন্ডবক্স যোগে পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত ছেলেরা বিহারে/ প্যান্ডেলে সারারাত অবস্থান করে। সমবেত হয়ে রাতে অবস্থানের কারণে তারা এ সময় আনন্দের মাত্রাকে বাড়ানোর জন্য সীমিত পরিসরে বনভোজন আয়োজন করতে দেখা যায়। এদিকে রাতে মহল্লায় মহল্লায় চলে মেয়েদের পিঠা তৈরির আয়োজন। এ পিঠা তৈরির বিশেষত্ব হল এ পিঠাতে মিষ্টি জাতীয় কোনো সামগ্রী ব্যবহার করা যায় না। ভাত থেকে প্যাগোডাকৃতি পিঠা তৈরি করে কাঁঠালগাছের পাতা দিয়ে সুন্দরভাবে মোড়ানো হয়। পূর্ণিমার দিনে প্রত্যুষে মেয়েরা দলবদ্ধভাবে বিহারে/ প্যান্ডেলে গিয়ে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে রাতভর নির্মিত পিঠা উৎসর্গ করে। টিনেজ তরুণ-তরুণীরা প্রতিবছর এ মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে।

পূর্ণিমার দিবস শুরু হবার সাথে সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। ভোরে পুষ্পপূজা, জল পূজা, মধ্যাহ্ন আহার পূজা, সংঘ দান করা হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা আয়োজন করা হয়। অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধরা সার্বক্ষণিক বিহারে অবস্থান করে উপোসথ গ্রহণ করে। মোমবাতি, আগরবাতি ও অন্যান্য সুগন্ধি জাতীয় বাতি বহন করে দলে দলে পূজারীরা বিহারে বিহারে গমন করে। কোনো কোনো বিহারে ধর্ম দেশনা হয়। সাদা লুংগি ও সাদাশার্ট পোশাক পরিধান করে উপোসথ গ্রহণকারী পুরুষ আর খয়েরি রঙের থাবিন ও সাদা ব্লাউজ পরিহিত উপোসথ গ্রহণকারী মহিলাদের সরব উপস্থিতিতে বৌদ্ধ বিহারসমূহ মুখরিত থাকে। নারী-পুরুষ উভয়ে গায়ের উপর সাদা রঙের ছোট আকারের চাদর কিংবা শাল (কো-ডাং) ব্যবহার করে। এ উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ বিভিন্ন আকৃতি এবং বিভিন্ন উচ্চতায় ফানুস বাহি (মেংহ য়িন) উত্তোলন। এক একটি ফানুস বাতির উচ্চতা সাধারণত ৫ হাত থেকে ১২ হাত পর্যন্ত হয়। পাতলা চাইনিজ কাগজ ময়দা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে ফানুস বাতি তৈরি করা হয়। ফানুস বাতি নির্মাণ এবং উত্তোলনে উপকরণ হিসেবে বাঁশের কচি, তৈলাক্ত সুতা, চিকন এলুমিনিয়াম তার ব্যবহৃত হয়। একসময় ফানুস বাতি উত্তোলনকে প্রতিযোগিতা হিসেবে গণ্য করা হতো। কোন ক্যায়াং-এ কিংবা কোন গ্রুপে কত সংখ্যক ফানুস সফলভাবে উত্তোলিত হয়েছে এবং কতদূর পর্যন্ত আকাশে ওঠে আগুনের শিখা প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় থেকেছে। সফলভাবে ফানুসবাতি উত্তোলনের জন্য তাঁতের সুতাসমূহকে ভালোভাবে কেরোসিন/

www.pathagar.com

আলকাতরার মধ্যে অনেকদিন ভিজিয়ে রাখার নিয়ম রয়েছে। প্রবারণার এক মাস পূর্ব থেকে ছেলেরা আকাশপ্রদীপের জন্য ঘরে ঘরে তাঁতের সুতা সংগ্রহ করে তেলে ভিজিয়ে রেখে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করত। কালের বিবর্তনে রাখাইন ঘরে ঘরে তাঁত কিংবা তাঁতের সুতা পাওয়া আজকাল দুষ্প্রাপ্য। ইদানীং ছেলেরা উৎসবের পূর্ব থেকে কোনো প্রস্তুতি না নিয়ে উৎসবের দু' একদিন আগে প্রস্তুত করে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, আকাশ প্রদীপের আগুনের শিখা থেকে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে আগুন বলে কথা। সংশ্লিষ্ট সকলেরই সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে বৈকি। শহরাঞ্চলের চেয়ে খাল নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে আকাশ প্রদীপ উত্তোলনের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে বেশি। আনন্দের আতিশয্যে অনেককে নানা ধরনের আতশবাজি পোড়াতে দেখা যায়। প্রবারণা পূর্ণিমার সময় মেংহ য়িন উত্তোলনের একটি ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথিতে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে অনোমা নদীর তীরে পৌঁছলে তখন তাঁর অসি দিয়ে নিজ চুল কর্তন করেন। দেবরাজ ইন্দ্রবোধি রাজপুত্র সিদ্ধার্থের কর্তিত চুল মাটি স্পর্শ করার আগের শূন্য হতে ঐ চুল তুলে নিয়ে ত্রয়োস্ত্রিংশ স্বর্গে সংরক্ষিত করেন। সিদ্ধার্থের কর্তিত চুল সংরক্ষণের জন্য দেবরাজ একটি চৈত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটি চুলামনি চৈত্য নামে অভিহিত এবং মর্ত্যের দেবতারা এখনো সেই চৈত্যের উদ্দেশ্যে আকাশ প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। ফানুস বাতি উত্তোলনের সেই চুলামনি চৈত্যেরই স্মৃতি বহন করছে বলে বলে মনে করা হয়।"[২০]

একদা বৌদ্ধদের প্রবারণা পূর্ণিমাসহ অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবে পুরো ধর্মীয় ক্যাম্পাসকে ব্যূহচক্র (প্যাঁচঘর) 'ওয়ান-গা-বা (Labyrinth) তৈরি করে মধ্যখানে এবং প্রান্তে প্রেসেট স্থাপন করা হয়। বাঁশ নির্মিত ফেন্স দিয়ে নির্ধারিত ডায়াগ্রামে সাধারণত ১০০ থেকে ১০০০ গলি পর্যন্ত ব্যূহচক্র তৈরি করা হয়। ১০০ গলি বিশিষ্ট ব্যূহচক্র তৈরি করতে বর্তমান বাজার দরে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে। প্যাঁচঘর দিয়ে এলোমেলো আকাঁবাকাঁর পথে এ গলি ও গলি দিয়ে যেতে যেতে মূল প্যান্ডেলে প্রবেশ করতে হয়। প্যাঁচঘরে কয়েক গলি পেরিয়ে মাঝপথে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া লোকের সংখ্যার কমতি নেই। ধর্মীয় ক্যাম্পাস এলাকা নানাবিধ কারণে সংকোচিত হওয়া এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে আশি দশকের পর থেকে কক্সবাজার শহরে ব্যূহচক্র চোখে পড়ে না। তবে রামু উপজেলার রাজারকূল ইউনিয়নের রামকূট মন্দিরে প্যাঁচঘরের আয়োজন করা হয়। বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও সংস্কৃতিতে ব্যূহচক্র যে বিদ্যমান রয়েছে তা নব প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ভুলতে বসবে যদি না এটি চালু না থাকে। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ব্যূহচক্র/ওয়ান-গা-বা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন রয়েছে বৈকি।

প্রবারণা পূর্ণিমার উপলক্ষে এক প্রকার বিহারাকৃতি 'প্রেসেট' ও Karawi/ Kindara নির্মাণ করে। পূর্ণিমার দিন রাতে খাল নিকটবর্তী এলাকাসমূহে লোহা/ মাটির পাতে প্রদীপ পূজা সত্যি উপভোগ করার মতো। পূর্ণিমার পরের দিন এগুলো সাগর/খালের মোহনায় ভাসিয়ে বিসর্জন উৎসব (হংসতরী ভাসানোৎসব) আয়োজন করা হয়। প্রতিটি এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন বোট নিয়ে আনন্দ হৈ হল্লার মধ্যে বঙ্গোপসাগরে এ বিসর্জন চলে। পূর্বে কক্সবাজার শহরে এ উৎসব আয়োজন করা হলেও নৌকার স্বল্পতা

www.pathagar.com

এবং আর্থিক কারণে এ উৎসব আয়োজনে ভাটা পড়েছে। ঝিলংজা, রামু ও উখিয়া অঞ্চলে বড়ুয়া বৌদ্ধরা অনুরূপভাবে প্রেসেট নির্মাণ করে নিকটবর্তী খালে ভাসিয়ে উৎসব উদযাপন করে।

**রামু উপজেলায় প্রবারণা উপলক্ষে জাহাজভাসা উৎসব**

এই উৎসবটি বাঁকখালি নদীকেন্দ্রিক এবং বৌদ্ধদের একটি প্রাচীন ধর্মীয় উৎসব হিসাবে পরিচিত। রামু অঞ্চলের রাকখাইং বা মঘদের দ্বারা এ উৎসবের সৃষ্টি এবং প্রচলন। তাদের ভাষায় এর নাম 'বোগোম্যোচ্ব'। কাজেই নৌকা বাইচের মতো একটিও পূর্বে বিভিন্ন গ্রামের রাকখাইং সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী কালে তাদের দেখাদেখি বড়ুয়ারা এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালের পর থেকে মঘের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে (দেশত্যাগের কারণে) বর্তমানে এ উৎসবটা বড়ুয়ানির্ভর। তবে দর্শক হিসাবে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের উপস্থিতি লক্ষণীয়, কাজেই সার্বজনীন।

*প্রবারণা উপলক্ষে বাঘখালি নদীতে জাহাজ ভাসানোর দৃশ্য*

www.pathagar.com

**জাহাজভাসা উৎসবের সূত্রপাত**

বুদ্ধের সময় আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাস বর্ষাকাল ছিল। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো। ফলে ভিক্ষু শ্রমণদের পক্ষে একস্থান থেকে অন্য স্থানে পরিভ্রমণ বা দেশ ভ্রমণ করা সহজ ছিল না। গ্রাম্য মেঠো পথে বা আলের উপর দিয়ে চলাচল করা ছিল কষ্টকর এবং ভিক্ষুদের পরিধানের কাপড় চোপড় কর্দমাক্ত হয়ে যেত, সম্ভবত ভিক্ষুদের বস্ত্রস্বল্পতার কারণেও বুদ্ধ নিয়ম বেঁধে দেন যে, এই তিন মাস ভিক্ষুরা দেশ পরিভ্রমণ ত্যাগ করে বর্ষাবাস ব্রত পালন করবেন। এই সময়ের মধ্যে ভিক্ষুরা নিজস্ব অবস্থানে থেকে শীল পালন, ধ্যান অনুশীলন এবং জ্ঞান চর্চা করে সময় অতিবাহিত করবেন। সেই বিধানানুসারে সারা বিশ্বের ভিক্ষুরা বর্তমানেও বর্ষাবাস ব্রত পালন করেন। পাশাপাশি গৃহীগণও উক্ত তিন মাস অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী তিথিতে লোভ-দ্বেষ-মোহ কিছুটা হলেও ত্যাগ করে উপোসথ ব্রত পালন করে কাটান এবং এ সময়ের মধ্যে পঞ্চশীল ও উপোসথ শীল যাতে ভঙ্গ না হয় সে জন্য গৃহীরা সর্বদা সতর্ক থাকেন।

সুতরাং তিনমাস ব্রত পালন শেষে আশ্বিনী পূর্ণিমা দিনে ভিক্ষুরা বর্ষাবাসব্রত প্রবারণা বা ভঙ্গ করেন। এ কারণে এ পূর্ণিমার নাম প্রবারণা পূর্ণিমা। গৃহীরাও দীর্ঘ বর্ষাবাসের কঠোর ব্রত পালন শেষ করল বলে অথবা পুরানো জীবনে ফিরে এল বলে পূর্ণিমার দিন বা পরের দিন আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। রামুতে আগের দিনে বাড়ি ঘর এবং বিহার মন্দিরে ব্যাপকভাবে মোমবাতি জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হতো। আকাশে ফানুস ওড়ানো হতো ব্যাপক হারে। অনেকে আবার বাঁকখালি নদীর (তীরে) পানির ধারে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিত। কেউবা কলাগাছের ভেলার উপর মোমবাতি জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দিত। এটাই ছিল প্রবারণার উৎসব। কেউ কেউ পূর্ণিমার রাতে গৃহস্থের ফলমূল চুরি করত। বিশ্বাস (কুসংস্কার) ছিল এ রাতে চুরি করলে পাপ হয় না। শোনা যায় এক সময় দঅং দালালের পুত্র রেঙ্গুন থেকে রামুতে বেড়াতে আসেন। তাঁরই উদ্যোগে এবং অর্থায়নে কলাগাছের ভেলায় বাতি জ্বালানোর পরিবর্তে রঙিন কাগজ ও বাঁশের চটা দিয়ে একটি জাহাজ তৈরি করে তাতে আলোকসজ্জা করে বাঁকখালিতে উৎসবের সাথে ভাসানো হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন রাকখাইংপাড়ায় জাহাজ তৈরির প্রবণতা শুরু হয়। আর এটাই জাহাজভাসা উৎসবের মূল কথা। (শ্রীকুল বিহারে অধ্যক্ষ নব্বই বছরের বর্ষিয়ান ভিক্ষু উঃ ছেকাচারা মহাস্থবির মতে) যেহেতু ধর্মীয় আমেজে এবং ধর্মীয় দিবসকে কেন্দ্র করে পালন করা হয়, সেহেতু এটা নিঃসন্দেহে ধর্মীয় উৎসবের পর্যায়ভুক্ত।

জাহাজভাসা উৎসবের অন্যকোনো ধর্মীয় ব্যাখ্যা ত্রিপিটক বা অপর কোথাও নেই। তবে অধুনা কোনো কোনো ব্যক্তি বা ভিক্ষুর ধারণা বুদ্ধ বৈশালী যাওয়ার পথে সশিষ্য নৌকায় চড়ে গঙ্গা নদী পার হয়েছিলেন। এটাকে উপলক্ষ করে এই জাহাজভাসা উৎসবের উৎপত্তি। কিন্তু বুদ্ধ অনেকবার অনেক নদী পার হয়েছিলেন, আর সেটা প্রবারণা পূর্ণিমার উৎসবের সাথে যুক্ত হওয়াটা পরিষ্কার নয়। তাছাড়া এ বক্তব্য উৎসব প্রবর্তনকারী সে প্রাচীন মানুষের মুখনিসৃত বা ধারণাপ্রসূতও নয়, কোনো জনশ্রুতিও নয়।

www.pathagar.com

### কী ভাবে জাহাজভাসা অনুষ্ঠান হয়

প্রবারণা পূর্ণিমার দিন পনের পূর্বে সারা গ্রামের ঘরে ঘরে ঢোল বাদ্য কীর্তন সহকারে চাঁদা তোলা হয়। গৃহস্থরা সামর্থ মতো চাঁদা দিয়ে থাকে, কোনো দাবি দাওয়া নাই। তারপর চাঁদার টাকায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনা হয়। অতঃপর রাত্রে বা দিনের কোনো অবসর সময়ে কর্মদক্ষ ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে প্রথমে বাঁশের চটা (কাইম) দিয়ে জাহাজের একটা কাঠামো নির্মাণ করে। পরে কাঠামোর উপর ময়দার আঠা লেপন করে তাতে পত্রিকার কাগজ বা মোটা কাগজ (গাধা কাগজ) আটকে দেওয়া হয়। সেই কাগজ শুকিয়ে উঠার পর তার উপরে আবার একই কায়দায় রঙিন কাগজ লেপটে দেওয়া হয়। স্থানে স্থানে ঝালরযুক্ত রঙিন কাগজের ফুল লাগানো হয়। জাহাজের যে অংশে যে রঙ উপযুক্ত সেখানে সে রঙের কাগজ লাগানো হয়। জাহাজ একতলা, দোতলা, তিনতলাও হতে পারে। তা নির্ভর করে উদ্যোক্তাদের পুঁজি ও মনোভাবের উপর। তারপর জাহাজ তৈরি হলে নির্দিষ্ট দিনে পড়ন্ত বেলায় তা কাঁধে বহন করে বাঁকখালি নদীতে নিয়ে যায়। পরে কয়েকটি ভাড়া করা নৌকার উপর জাহাজটি রেখে দড়ি দিয়ে শক্তভাবে নৌকার সঙ্গে বাঁধা হয়, যাতে ঐ নৌকায় নাচগান অথবা লাফালাফি করলে নৌকা বা জাহাজের ক্ষতি না হয়। তারপর ঢোল বাদ্য নিয়ে কিশোর-যুবকেরা কীর্তন গাইতে গাইতে নদীর এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে দাঁড় বেয়ে নিয়ে যায়। এভাবে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আনা একটার পর একটা জাহাজ নদীর একবাঁক থেকে অন্য বাঁকে অনবরত ঘুরাফেরা করতে থাকে। নদীর উভয় পাড়ে নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ এই জাহাজ দেখে আনন্দে মেতে ওঠে। অনেক দর্শক জাহাজে জ্বালানোর জন্য ভক্তি সহকারে মোমবাতি এগিয়ে দেয়। যারা জাহাজে অবস্থান করে তারা সন্ধ্যার সময় জাহাজে আলোকসজ্জা করে। এভাবে সন্ধ্যার কিছু সময় পর পর্যন্ত উৎসব বা মেলা চলতে থাকে। পরে দর্শকেরা চলে গেলে জাহাজটা আবার কাঁধে করে নিজ নিজ পাড়ার বিহারে নিয়ে যায়। কেউ কেউ নদীর চরেই রেখে যায়।

আগের দিনে অর্ধরাত পর্যন্ত (রাত ১১টা ১২টা) উৎসব চলত। বর্তমানে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সন্ধ্যা রাতেই উৎসবের ইতি টানা হয়। বলা বাহুল্য এখানে শুধু যে জাহাজ তৈরি করা হয় তা নয়, নামটা জাহাজভাসা হলেও জাহাজের সাথে বৈচিত্র সৃষ্টির জন্য বিহার-মন্দির, হাতি, হাঁস, ময়ুর ইত্যাদি পশু পাখির প্রতিমূর্তিও তৈরি করা হয়। নদীর তীরে কিছু কিছু পান সিগারেট, মোমবাতি ধূপকাঠি, চা নাস্তার চটি দোকানও খোলা হয়। দর্শকেরা ওখানে কিছু কিছু খায়, অথবা বাড়ির জন্য ভাজা পোড়া নাস্তা নিয়ে সন্ধ্যায় মহা আনন্দের সাথে বাড়ি ফেরে। বর্তমানে বৌদ্ধদের কাছে প্রবারণা পূর্ণিমার অনুষ্ঠানটি প্রধান উৎসবে পরিণত হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের অন্যত্র জাহাজ ভাসার প্রচলন না থাকলেও সর্বত্র বিপুলভাবে ফানুস ওড়ানো এবং আলোকসজ্জা করা হয়।"[২১]

## ১২. দানোত্তম উৎসব : কঠিন চীবর দান

বৌদ্ধ ধর্মের দানের মধ্যে কঠিন চীবর দানই দানোৎতম। প্রবারণা পূর্ণিমার (আশ্বিনী পূর্ণিমা) পর দিন থেকে পরবর্তী পূর্ণিমার (কার্তিক পূর্ণিমা) দিন অর্থাৎ ত্রিশ দিনের

www.pathagar.com

মধ্যে এ দানোৎসব আয়োজন করতে হয়। বছরে অন্য সময়ে এ উৎসব পালন করা যায় না এবং যে-কোনো বিহারে একবার মাত্র এ উৎসব আয়োজন করা যায়। যে বিহারে প্রথম বর্ষাবাস উদযাপনকারী ভিক্ষু বাস করে না, সে বিহারে এ উৎসব আয়োজন করা যায় না। কোশল রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত পাথেয়বাসী ত্রিশ জন আরণ্যক, পিণ্ডপাতিক, পাংসুকুলিক ও ত্রীচীবরিক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে গৌতম বুদ্ধ কঠিন চীবর দানের প্রবর্তন করেন। গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় প্রধান সেবিকা বিশাখা এ দানযজ্ঞের প্রবর্তন করেন। এ ধরনের দান প্রবর্তন হওয়ায় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রামণ ও শ্রামণেরীদের (মেছিলা) চীবর প্রাপ্তির সুযোগের পাশাপাশি গৃহীদের চীবর দানেও সুযোগ সৃষ্টি হয়। বুদ্ধ শাসনে যত প্রকার চীবর দান আছে, তার মধ্যে চীবর দান সর্বোত্তম দান হিসেবে স্বীকৃতি রয়েছে। যে কোন দান সম্পাদনের পূর্বে দানী ব্যক্তিকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ত্রীচীবরের যে কোন একটি এবং ভিক্ষুর পরিধেয় অন্যান্য পোষাক, ভিক্ষাপাত্র, হাতপাখা, পাদুকা, ছাতা, বই-পুস্তক, কলম-পেন্সিল, তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি দান করা যায়। ন্যূনতম পাঁচজন ভিক্ষুর সম্মুখে গিয়ে 'ইমং কঠিন চীবরং ভিক্ষুসংঘসস দেমা কঠিনং অত্থরিতুং' বলে ভিক্ষুর নিকট দানীয় বস্তু দান করতে হয়। কঠিন চীবর দানে নানাবিধ পূণ্যতা রয়েছে বিধায় প্রত্যেক বৌদ্ধকে জীবনে একবার হলেও কঠিন চীবর দান করা উচিত। এ ধরনের চীবর দান করে অর্হৎ নাগিত স্থবির নরক যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন, দেবলোকে দিব্যসুখ করেছেন, বহুবার ইন্দ্র হয়ে দেবরাজ্য শাসন করছেন। মনুষ্যলোকে জন্মিত হলেও বিত্তবান ঘরে জন্মেঅনেকবার রাজচক্রবর্তী সুখ ভোগ করেছেন। কঠিন চীবর দানের ফল সম্পর্কে গৌতম বুদ্ধ বলেন, 'কোন দাতা সকল প্রকার দানীয় বস্তু যদি শত বছর যাবত দান করেন, সে দান কঠিন চীবর দানের ষোলভাগের একভাগ হয় না। স্ত্রী বা পুরুষ কঠিন চীবর দান করলে জন্ম-জন্মান্তরে স্ত্রী-জন্ম লাভ করে না। এ চীবরলাভী ভিক্ষুগণ পাঁচ প্রকার পাপ হতে রক্ষা পায় পাঁচ প্রকার পূণ্যফল ভোগ করেন।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা কেটে বস্ত্রবয়ন, সেলাই ও রঙকরণ করে চীবর তৈরি করে চীবর দান করতে হয় বিধায় কঠিন চীবর দান কঠিন দান। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে আয়োজিত কঠিন চীবর দানোৎসবে রাখাইন মহিলারা তাঁত স্থাপন করে রাত ১২টা থেকে ভোর ৬টার মধ্যে পুরোহিতের জন্য চীবর তৈরি করে দান করে থাকে। এ চীবর প্রাচীনকালে একদিনে প্রস্তুত করে দান করা হয়। বর্তমানে দেশে এ ধরনে চীবর তথা পুরোহিতদের ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সহজলভ্য না হওয়ায় প্রতিবেশী মায়ানমার/ভারত থেকে আমদানী করতে হয়। এ ধরনের একটি চীবরের দান হয় তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা। ত্রিচীবর-সংঘাটি, উত্তরাসাঙ্গ এবং অন্তরবাসক। সংঘাটি বর্হিবাস, এটি দ্বিপুট এবং কাঁধ থেকে সারাদেহ আবৃত করে। ভিক্ষুরা বাইরে যাওয়ার সময় এটি ব্যবহার করেন। উত্তরাসঙ্গ একপুট, এটি কাঁধ থেকে সারা শরীর আবৃত করে এবং বিহারের ভেতরে বাইরে সবখানে ব্যবহৃত হয়। অন্তরবাসকে এক রকম লুঙ্গী বলা যায়। সংঘাটি, উত্তরাসাঙ্গ এবং অন্তরবাসক প্রত্যেকটি ১৫ খানি টুকরো সেলাই করে প্রস্তুত করা হয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষুসংঘকে সুন্দররূপে শরীর আবৃত রাখতে ত্রিচীবর ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বৌদ্ধ অধ্যুষিত প্রতিটি অঞ্চলে কঠিন চীবর দানোৎসব 'কাঠিন ছাং গ্রেং ত্রু পোওয়ে' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। রাজধানীর কমলাপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার, মেরুল বাড্ডা বৌদ্ধ বিহারে সাড়ম্বরে আয়োজিত কঠিন চীবর দানোৎসবে সরকার প্রধান ও রাষ্ট্র প্রধানসহ দেশি-বিদেশি ভিআইপিদের অংশ গ্রহণের প্রথা রয়েছে। রাজধানীর বাইরে চাকমা অধ্যুষিত রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় রাংগামাটি রাজবন বিহার, মারমা অধ্যুষিত বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ধাতু জেদি প্যাগোডায় এবং রাখাইন অধ্যুষিত পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলায় শহরে কেন্দ্রীয় মন্দির মহাসিংদোগ্রী ক্যাম্পাসে বৃহৎ পরিসরে এ উৎসব উদযাপনের নজির রয়েছে। বিগত ২২-২৪ মে, ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে কক্সবাজারের কেন্দ্রীয় মন্দির প্রাঙ্গনে ২৫০০ বুদ্ধাব্দ উপলক্ষে (2500th Buddha Sasana) আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি স্মরণকালের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি রয়েছে। এ অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় ৬০০ জন ধর্মীয় পুরোহিত এবং লক্ষাধিক রাখাইন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অংশগ্রহণ করে। তৎকালীন বার্মা থেকে খ্যাতনামা ধর্মীয় পুরোহিত কয়েকদিন সরকারি শিডিউলে উ নারাদা মহোথেরো'র নেতৃত্বে কয়েক পুরোহিত এ সুবৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে উৎসবকে আরো তাৎপর্যময় করে তুলেছিল। উক্ত পুরোহিতকে চট্টগ্রাম বিমান বন্দর থেকে স্টীমার যোগে বাঁকখালী নদী হয়ে ধর্মীয় শোভাযাত্রা সহকারে কেন্দ্রীয় মন্দিরে আনা হয়। এ উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে আয়োজকরা মন্দির প্রাঙ্গণে ৭ ফুট পরিধি ও ২৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি স্তম্ভ স্থাপন করে। স্তম্ভটি কেন্দ্রীয় মন্দিরের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়েছে। উৎসব শেষের দিন জাঁকজমকভাবে পিলারটি উদ্বোধন করা হয়। পিলারটি কেন্দ্রীয় মন্দির প্রাংগণে কালের নীরব সাক্ষী হিসেবে এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

সাধারণত সংঘবদ্ধভাবে বা সমিতির সভ্যদের সমন্বয়ে কঠিন চীবর দানোৎসব আয়োজন করতে দেখা যায়। কক্সবাজার শহরে কেন্দ্রীয় মন্দির মাহাসিংদোগ্রী ক্যাম্পাসে বিরাট প্যান্ডেল নির্মাণ করে এ উৎসব উদযাপন করা হয়। প্যান্ডেলকে বর্ণাঢ্য ও বর্ণিলভাবে সুন্দর করে সাজানো হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও বৌদ্ধ বিহার/ প্যান্ডেল কিংবা নিজ বসত বাড়িতে ভিক্ষু সংঘকে আমন্ত্রণ করে এ দান করা যায়।

এ উৎসবে যথারীতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়। ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে মধ্যাহ্নের মধ্যে পিণ্ডদান দেয়া হয়। নিমন্ত্রিত ভিক্ষুগণ কর্তৃক সারিবদ্ধভাবে পিণ্ড সংগ্রহ করা অনুষ্ঠানকে 'ছোওয়েন ওয়ার পোওয়ে'/ Pinda Dana বলে। রাতে ধর্ম দেশনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। কার্তিক পূর্ণিমার দিনকে শেষ দিবস হিসেবে নির্ধারণ করে তিন দিনব্যাপী কঠিন চীবর দানোৎসব উদযাপনের রেয়াজ লক্ষ্য করা যায়। কার্তিকী পূর্ণিমার তিথিতে গৌতম বুদ্ধের প্রধান শিষ্য (ধর্ম সেনাপতি) সারিপুত্র তাঁর জন্মস্থান নালন্দায় নির্বাণ লাভ করেন।

মূল চীবর দানের পূর্বে উৎসবকে শৃংখলার সাথে পালনের স্বার্থে ১জন ইন্দ্ররাজ (ছাগ্রা-মাং/ Tha Graa Maang) ৪ জন দেবরাজকে (নেৎ/ Net Thaa) আমন্ত্রণ করা হয়। দেবতার বেশে সজ্জিত পাঁচজন পুরুষ নির্ধারিত প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম মন্ত্র পাঠ করেন ইন্দ্ররাজের বেশধারী ব্যক্তি। তিনিই শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব আয়োজনে চতুর্দিকে রক্ষাকবচ হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য ৪ দেবরাজকে আমন্ত্রণ জানান।

www.pathagar.com

অতঃপর এ সময়ে পর্যায়ক্রমে পূর্বদিকে ধৃতরাষ্ট্র দেবরাজ (ধাথা রাথা) দক্ষিণ দিকে বিরুলক দেবরাজ (উইরু লাকা) পশ্চিম দিকে বিরুপাক্ষ দেবরাজ (উইরু পাকা) ও উত্তর দিকে কুবের দেবরাজ (কুওয়ে রাহু) সর্বসাধারণকে নিরাপদ ও সুখে রাখার জন্য মন্ত্র পাঠ করেন। ইন্দ্ররাজ ও চতুরপাল দেবরাজের মন্ত্রের পরই মূল চীবর দান অনুষ্ঠিত হয়। এ পুরোহিত কঠিন চীবর উৎসবে ধর্মীয় বিধিবিধান মতে প্রশ্নে-উত্তরের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে পাঠ করে শোনান। ধর্মীয় পুরোহিতদ্বয়ের ধর্মপাঠ করার পর আমন্ত্রিত প্রধান পুরোহিতের নেতৃত্বে চীবর দান অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়। চীবর লাভের পর বিনয়ের নিয়মানুসারে সীমাঘর উপস্থিত হয়ে কম্মবাচা পাঠের পর বিহারস্থ ভিক্ষুকে প্রদান করতে হয়।

রাখাইন সম্প্রদায়ের আয়োজিত প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেয়ার উদ্দেশ্যে মানব-মানবী আকৃতিসহ নানা আকৃতির লোগো তৈরি করা হয়। এসব আকৃতিতে তরুণেরা প্রবেশ করে ছেলেমেয়েদেরকে আনন্দ প্রদান করে। ভিক্ষুদের পিণ্ড সংগ্রহকালে বাদ্যবাদক দলের সাথে এরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া অনুষ্ঠান বিরতি এবং সমাপনান্তে এদের নৃত্য উপভোগের জন্য সবাই উন্মুক্ত হয়ে থাকে। এসব মানব-মানবীকে ফউছো/ফউছো মা বলে। এ পূর্ণিমার তিথিতে পুরো মাসই আকাশে মেংহয়িন (আকাশ প্রদীপ/ফানুসবাতি) উত্তোলনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য কঠিন চীবর উৎসবের সমাপনের সাথে সাথে একসাথে অনেকগুলো আকাশ প্রদীপ উত্তোলন করা হয়।

এ উৎসবে রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'জে-পোওয়ে' আয়োজন করে থাকে। এ ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কক্সবাজার অঞ্চলের লোকেরা 'ওয়াৎ-ছা নাচ', বরগুনা-পটুয়াখালী অঞ্চলের লোকেরা 'পে-ক্ষু নাচ' আবার পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা 'পাং-খু নাচ' নামে অভিহিত করে থাকেন। বাংলাদেশে রাখাইনরা মায়ানমারের আপার বর্মিদেরকে 'আউছা' নামে অবহিত করে থাকে। 'আউ-ছা' অপভ্রংশে 'ওয়াৎছা/ওয়াচ্ছা'। মজার বিষয় হল যে, শুকরের মাংস রাখাইন বৌদ্ধদের নিকট 'ওয়াৎছা' নামে পরিচিত। 'ওয়াৎ–ছা' নাচকে যদি কেউ শুকরের নৃত্যের সাথে তুলনা করে তাহলে 'ওয়াৎ-ছা' তে অংশগ্রহণকারী শিল্পী কলা-কৌশলীসহ সংশ্লিষ্টদের একটু হলেও দুঃখ পাবার কথা বটে। এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাখাইন পৌরাণিক কাহিনি, ধর্মীয় অনুশাসন, রাখাইন রাজাদের রাজত্ব কালে রাজ্য শাসন, শিকার কাহিনী ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। রাখাইনদের যে কোন নৃত্যানুষ্ঠানে সর্বপ্রথম পূজা অর্ঘ্য সংবলিত 'তারাঃ পোওয়ে আ কাঃ' দিয়ে উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করা হয়। হাসির গল্প, কৌতুক, নাটক, গান, একক নাচ, যোথ নাচ, ইত্যাদি উপভোগের জন্য হাজার হাজার সর্বস্তরের দর্শক সমাগম হয়। কক্সবাজারসহ রাখাইন অধ্যুষিত এলাকাসমূহে আশির দশকেও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় সারারাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হত। রাখাইনদের ক্রমানবতির আর্থিক সামর্থ এবং সামগ্রিক পরিবেশ পরিস্থিতির অবস্থা বিবেচনায় এনে রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে ইদানিং দেখা যায় না। অবশ্য কিছু কিছু এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন ও জনতার সহায়তায় ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত সময়ের জন্য কদাচিৎ আয়োজন করতে দেখা যায়। সামাজিক ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থের সমাজপতিরা এসব অনুষ্ঠান আয়োজন করতে উৎসাহ যাতে হারিয়ে না ফেলে

www.pathagar.com

সমাজপতিদেরকে প্রথমে সাহস যোগানো প্রয়োজন রয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা গেলে পূর্বের ন্যায় রাখাইন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন হতে পারে, এ অভিমত অনেক সাংস্কৃতিক কর্মী।

এ পূর্ণিমার রাতে তরুণ-তরুণীরা উন্মুক্তভাবে বনভোজন আয়োজন করে থাকে। রাখাইনদের প্রচলিত বিশ্বাস যে, এ পূর্ণিমার দিবসে রাতে শাক-সবজি চুরি করে খেলে শরীরে কোন প্রকার রোগ ব্যাধি হয় না। অতি উৎসাহী তরুণ-তরুণীরা এ রাতে শাক-সবজির পাশাপাশির অন্যান্য বাড়িস্থ জিনিস সুপারী, নারকেল, বিভিন্ন ফলমূল ইত্যাদি প্রদানের জন্য গৃহকর্তা/গৃহকর্ত্রীর নিকট আবদার করে। আবদার রক্ষা না করলে তারা সুযোগ করে চুরি করে নিয়ে যায়। যুগ বিবর্তনে রাখাইন ছেলেমেয়েরা গৃহস্থি জিনিসের চেয়ে নগদ অর্থের প্রতি বেশি লোভ পরিলক্ষিত হয়। হৈ হল্লা বা আনন্দ মিছিল সহকারে তারা নগদ অর্থ প্রদানের দাবি জানায়। কম দিলে তারা দুঃখ পায়। বেশি দিলে খুশিতে নেচে গেয়ে আর্শিবাদ করে, আনন্দে শ্লোগান দেয়। এভাবে তারা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে যা পায় তা গ্রহণ করে। অর্জনকৃত জিনিস বিক্রি করে ফের বনভোজন করে সম্মিলিতভাবে ফূর্তি করে মজা উপভোগ করে। এ পূর্ণিমার তিথিতে প্রায় সপ্তাহব্যাপি পাড়ায়/ মহল্লায় বনভোজন আয়োজনে হিড়িক পড়ে।"[২২]

## ১৩. রামু উপজেলার ওয়াংকাবা বা পেঁচঘর

ওয়াংকাবা বা পেঁচঘর একটি বিহার কেন্দ্রিক ধর্মীয় উৎসব বা মেলা। এ অনুষ্ঠানটিও আমাদের রামু অঞ্চলে রাকখাইং বা মঘদের সময় থেকে প্রচলিত একটি প্রাচীন উৎসব। মঘেরা পেঁচঘরকে 'ওয়াংকাবা' বলে, যার অর্থ বংকবন, বংকগিরি বা বংকপর্বত। আর ঘুরানো প্যাঁচোনো পথে তৈরি বলে বড়ুয়ারা বলে পেঁচঘর। ওয়াংকাবার পেছনের ইতিহাস হল গৌতম বুদ্ধ পূর্ব জন্মে দানবীর বেস্মান্তর নামে রাজপুত্র হয়ে (বোধিসত্ত্ব) জন্ম গ্রহণ করেন। এ জন্মে তিনি ইচ্ছে মত রাজকোষ থেকে ধন সম্পদ দান করার পর তপস্যার জন্য সংসার ত্যাগ করে বনবাসী হতে চাইলে স্ত্রী মাদ্রী এবং দুই কন্যা জালী ও কৃষ্ণা তাঁর সঙ্গে গেলেন। তাঁরা সবাই বংকগিরি বা বংকবনে গিয়ে একখানা কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিয়ে অবস্থান করতে থাকেন। বংকবনের পথটা এত বেশি ঘোরানো পেঁচানো যে বনের মধ্যখানে পৌঁছাতে অনেক কষ্ট হয়, সময়ও নষ্ট হয়। আর পথ ভুল করলে বনের মধ্যখানে বোধিসত্ত্বের কাছে পৌঁছা সম্ভব হয় না। কিন্তু তিনি যে দানবীর একথা দেশব্যাপি প্রচারিত হওয়ায় কেউ কেউ কষ্ট স্বীকার করে বনের ভেতরে গিয়েও তাঁর কাছে দান চাইল। তাঁর কাছে দানযোগ্য কোন সম্পদ না থাকায় শেষতক স্ত্রী-কন্যাকে দান করে দেন। এই হল সংক্ষেপে ওয়াংকাবা বা বংকগিরির পরিবেশগত বর্ণনা। বংকগিরির এই ঘোরানো পেঁচানো পথের অনুকরণে বংকগিরির রূপক হিসাবে এই ওয়াংকাবা বা পেঁচঘর তৈরি করা হয়।

### পেঁচঘর কিভাবে তৈরি করা হয়

প্রথমে বাঁশের চটা বা কাইম দিয়ে ৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কতগুলো ঘেরা বা টেংরা তৈরি করা হয়। তারপর দু'জন মানুষ যাতে পাশাপাশি চলাচল করতে পারে সেই বরাবর প্রস্থ ঠিক রেখে যথা সম্ভব ঘুর-পেঁচ করে নির্দিষ্ট মাপে খুঁটির সাহায্যে খাড়া করে টেংরাগুলো বেঁধে দাঁড় করে দেওয়া হয়। পেঁচঘরে দুইটা পথ রাখা হয়– যার একটি

www.pathagar.com

প্রবেশ ও অন্যটি নির্গমন পথ। অবশ্য যেকোন পথে প্রবেশ করলেও অসুবিধা হয়না। এতে বেশ উপভোগ্য একটা মানুষের গোলক ধাঁধাঁ সৃষ্টি হয়। এই পেঁচঘরের ঠিক মধ্যখানে একটি সুরম্য মন্দির তৈরি করে তাতে একটি বুদ্ধমূর্তি রাখা হয়। মূর্তির সম্মুখে একটি দানের থালা এবং মোমবাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা থাকে। মানুষ ঘুরে ঘুরে সেই বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে গিয়ে শ্রদ্ধামত কিছু দান দেন এবং মোমবাতি, ধুপকাঠি জ্বালিয়ে দিয়ে আবার ঘুরে ঘুরে নির্গমন পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এভাবে ঘুরতেই মানুষের বেশ আনন্দ এবং ধর্মীয় আবেগের উচ্ছ্বাস দেখা যায়। এ কারণে লোক সমাগমও হয় যথেষ্ট।

**ওয়াংকাবার ধর্মীয় ব্যাখ্যা**

ওয়াংকাবা বা পেঁচঘর উৎসবের পেছনে দুটি ধর্মীয় দর্শন প্রচলিত আছে। একটি হল, সঠিক পথে চললে মানুষ ওয়াংকাবার কেন্দ্রস্থল বুদ্ধমূর্তির কাছে পৌঁছার মত স্বর্গ-ব্রহ্ম বা মুক্তি লাভ করে। ভুল পথে বা অন্যায় পথে চললে ওখানে পৌঁছা অসম্ভব।

দ্বিতীয় দর্শন হচ্ছে, সংসার জীবন ওয়াংকাবার মত অত্যন্ত জটিল এবং চক্রময়। এই জটিলতাকে ধৈর্যের সাথে লঙ্ঘন করে লক্ষ্যে পৌঁছাঁতে হয়।

বৌদ্ধদের যে কোন ধর্মীয় দিবসকে কেন্দ্র করে, কয়েকদিন স্থায়ী মেলা বা উৎসব জমানোর উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ওয়াংকাবা তৈরি করা হয়। রাকখাইং বা মঘেরাই সর্বপ্রথম তাদের সময়ে এই উৎসবের প্রচলন করে। তাদের দেশ ত্যাগের পর বিভিন্ন গ্রামের বিহারে বড়ুয়ারা 'পেঁচঘর' নাম দিয়ে এই উৎসব সচল রাখে। এখনো প্রতিবছর কোথাও না কোথাও পেঁচঘর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন স্থানে এই পেঁচঘরকে আবার 'ব্যূহচক্র' নামেও অভিহিত করে। কিন্তু ব্যূহচক্রের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে বিশেষ করে ব্যূহচক্রের সঙ্গে পেঁচঘরের প্রকৃতিগত ও ভাবগত মিল নেই। লক্ষ্য, উদ্দেশ্যের সঙ্গেও দুয়ের বিস্তর অসঙ্গতি। কাজেই ব্যূহচক্র নাম যথাযথ নয়।"[২৩]

## তথ্যনির্দেশ

১. বাংলাদেশের উৎসব- খোন্দকার রিয়াজুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪০॥ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৯-১০।
২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭।
৩. অছিয়র রহমান (মরহুম), গ্রাম : উয়ালাপালং বটতলী, ইউনিয়ন : রাজাপালং ইউনিয়ন, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, বিগত ২০০৪ সালে গানের অংশটি তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। তিনি ৮০ বছর বয়সে গত ২০০৫ সালে ইন্তেকাল করেন)।
৪. বাংলা নববর্ষ কক্সবাজার অঞ্চলে : একাল-সেকাল- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪-০৪-১৯৯৬ (বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিক বিশেষ সংখ্যা)।
৫. বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়- ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা -মং বা অং (মং বা), লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা-১৪৬-১৫২।
৬. বাংলাদেশের উৎসব- খোন্দকার রিয়াজুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪০॥ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৩৯।
৭. শামসুজ্জামান খান, 'ঈদোৎসব ও তার রূপান্তর,' আধুনিক ফোকলোর চিন্তা, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্তিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা-৪৫।

www.pathagar.com

৮. বাংলাদেশের উৎসব- খোন্দকার রিয়াজুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪০॥ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৫-১৬।
৯. সোমেশ্বর চক্রবর্তী (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কক্সবাজার সরকারি কলেজ), পিতা : জ্যোতিশ্বর চক্রবর্তী, মাতা : আরতি চক্রবর্তী, বয়স : ৬৭ বছর, একরামুল হুদা চৌধুরী সড়ক, কক্সবাজার পৌরএলাকা, কক্সবাজার, তারিখ : ০৩-০৭-২০১২, সময় : সকাল-১০টা।
১০. ধনিরাম বড়ুয়া (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, হালদারকূল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়), পিতা : তেজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, মাতা : কেশীবালা বড়ুয়া, বয়স : ৬৮ বছর, গ্রাম : শ্রীধন পাড়া, ইউনিয়ন : ফতেখারকূল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৯-১২-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।
১১. বাংলাদেশের উৎসব- খোন্দকার রিয়াজুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪০॥ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২২।
১২. বিপুল সেন, পিতা : ইন্দ্র সেন, মাতা : বিন্দু রাণী সেন, বয়স : ৫৬ বছর, গোল দিঘীর পাড়া, কক্সবাজার পৌরএলাকা, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২২-১০-২০১৩, সময় : রাত- ১০ট।
১৩. বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দি উর্দু শব্দের অভিধান- সংকলন ও সম্পাদনা কাজী রফিকুল হক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৫৩।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৭।
১৫. মুহাম্মদ মোবারক আকতার, পিতা : আবদুস শুকুর, মাতা : জয়গুন বেগম, বয়স : ৬০, (উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম) স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাক, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১৯-০৫-২০১৩, সময় : সকাল ১০ টা।
১৬. আহমদুল্লাহ, পিতা : নজির আহমদ, মাতা : জয়নব বেগম, বয়স : ৬১ বছর, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, উত্তর বাহারছড়া, পৌর এলাকা, কক্সবাজার, তারিখ : ২৮-১০-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।
১৭. হাসিনা চৌধুরী লিলি, পিতা : মনিরুল হক চৌধুরী, মাতা : দিলরাজ চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, সিনিয়র শিক্ষক, কক্সবাজার কেজি এণ্ড মডেল হাইস্কুল, চৌধুরী কুঠির, এণ্ডারসন রোড়, কক্সবাজার, বয়স : ৪৮ বছর, তারিখ : ১৫-১০-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।
১৮. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-২০-৩২।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪।
২০. বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়- ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবন ধারা-মং বা অং (মং বা), লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা-১৪০-১৪১।
২১. ধনিরাম বড়ুয়া (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, হালদারকূল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়), পিতা : তেজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, মাতা : কেশীবালা বড়ুয়া, বয়স : ৬৮ বছর, গ্রাম : শ্রীধন পাড়া, ইউনিয়ন : ফতেখারকূল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৯-১২-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।
২২. বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়- ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবন ধারা-মং বা অং (মং বা), লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা-১৪৩-১৪৫।
২৩. ধনিরাম বড়ুয়া (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, হালদারকূল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়), পিতা : তেজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, মাতা : কেশীবালা বড়ুয়া, বয়স : ৬৮ বছর, গ্রাম : শ্রীধন পাড়া, ইউনিয়ন : ফতেখারকূল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৯-১২-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।

www.pathagar.com

# লোকমেলা

## ১. বিজয় উৎসব ও বিজয় মেলা

বাংলদেশের জাতীয় উৎসব 'বিজয়দিবস'। বিজয়দিবস পালিত হয় ষোলই ডিসেম্বর। বাংলাদেশের মানুষ হাসিখুশির মধ্য দিয়ে উৎসব পালন করে।

বিজয়দিবস কথাটির একটি অর্থ আছে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে নয় মাস লড়াই করে এ দেশের মানুষ ঐ দিন বিজয় লাভ করেছিল। দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পরে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদারেরা মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে দেশ শত্রুমুক্ত হয়। এভাবে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। সেই থেকে এই দিনটি আমাদের 'বিজয়দিবস'।

প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর বীর শহিদানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা বিপুল উৎসাহে বিজয়দিবসের উৎসব পালন করি। ঐদিন সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সরকারি-বেসরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, সাজানো হয় ফুল-পাতা দিয়ে, করা হয় আলোকসজ্জা। বাংলাদেশের উৎসবমালার মধ্যে বিজয়দিবস খুবই তাৎপর্যময় ও অর্থবহ। বিজয়দিবসটি যেহেতু এদেশের শহিদদের রক্তের সাথে মিশে রয়েছে সে-কারণে এই দিবসের আবেদনটিই আলাদা।

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ এবং জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার নিমিত্তে স্বাধীনতার বিজয়কে উপভোগ করতে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাস আসার পূর্বে ঘটা করে বিজয়দিবস ও বিজয় মেলা উদযাপন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিজয় মেলা উদযাপন করার এ রেওয়াজ ১৯৭২ সাল থেকেই প্রথম শুরু হয়। ৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঘটা করে দিবসটি পালনে যুদ্ধ বিধ্বস্ততার কারণে হয়ে উঠেনি, বিধায় এরপর থেকে বিজয়দিবস বিজয় মেলায় রূপ নেয়। বিজয় মেলা ডিসেম্বর মাসে বিজয়ের আনন্দকে সকলের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার একটি লোকমেলা। এ মিলন মেলা বাংলাদেশ যতদিন আছে ততদিন থাকবে।

বিজয়দিবস পালনের পাশাপাশি তাকে মেলায় রূপ দিয়ে প্রতিবছর দেশের সর্বত্র ঘটা করে উদযাপন করা হয়। মেলা বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক প্রাণের মেলা, আত্মার মেলা; স্বপ্নের মেলা। এ মেলা কারো একার নয়, গোটা বাঙালি জাতির মেলা। এ মেলা

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক, এ মেলা সভ্যিক, এ মেলা লোকজ। এ মেলা সর্বস্তরের মেলা। সুতরাং এ মেলাকে আধুনিকতার মেলা বললে সমীচীন হবে না। কারণ এ মেলার পরিপূর্ণতা দেয় এ দেশের সাধারণ জনগণ। শিক্ষিত, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশক্তি বিজয় মেলার আয়োজন করলেও মেলার প্রধান শক্তি কিন্তু সাধারণ জনগণ। সাধারণ জনগণই রাষ্ট্রের শক্তি। তাদের নিয়েই তো বিজয় মেলা। সুতরাং ৪২ বছর পূর্বে সৃষ্ট চলমান এ মেলাকে অবশ্যই লোকজ মেলা বলা যায়। এ মেলাকে উপভোগে আনতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যারা শহীদ হয়েছেন তাঁরা কেবল সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার আর রাজনৈতিক নেতা কর্মকর্তা নয়; অসংখ্য সাধারণ মানুষও।

অতএব, আমরা বিজয় মেলাকে সাধারণের মেলাও বলতে পারি। যাই হোক আমি পূর্বেই বলেছি, মেজবান মেলা, বলী খেলা ও বৈশাখী মেলা ছাড়া অন্য কোনো লোকজ মেলা আমাদের না থাকলেও বিজয় মেলা আমাদের জাতীয় মেলা এবং লোকজ মেলা। হিন্দু বলুন, মুসলমান বলুন, বৌদ্ধ বলুন জাতিগত সব সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বিয়ে-শাদি এবং ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে। এসবে প্রচুর লোক মিলন হয়। তাই বলে কি আমরা এগুলোকে মেলা বলবো? না, এগুলো হচ্ছে আনুষ্ঠানিকতা। কক্সবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র স্থানীয় 'কক্সবাজার পাবলিক ইন্সটিটিউট ও পাবলিক লাইব্রেরি' চত্বরে সেই সত্তর দশকে বিজয়দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা বিজয় মেলার। মেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ যেমন থাকে তেমনি থাকে দেশাত্ববোধক গান, নৃত্য। যেসব গান ১৯৭১ সালের দীর্ঘ ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের ও মুক্তিকামী মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতো। পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

কক্সবাজার ইন্সটিটিউট ও পাবলিক লাইব্রেরি চত্বর থেকে যে মেলার শুরু তা আজ সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। দলমত নির্বিশেষে বিজয়মেলার আয়োজন করে থাকে। মেলায় স্মৃতিচারণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গীতিনাট্য, নাটিকা যেমন পরিবেশন করা হয় তেমনি ভাবে বিভিন্ন হস্তশিল্প-কুটিরশিল্প পণ্যের বিপুল সমাহার নিয়ে স্টল খুলে। লোকজন বিজয়মেলায় মুক্তিযুদ্ধকে যেমন খুঁজে পেতে চেষ্টা করে তেমনিভাবে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় রকমারি পণ্য ক্রয় করে। এসবের মাধ্যমে বিজয়মেলা বর্তমানে সাধারণ মানুষের প্রাণের মেলা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

## ২. স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতা মেলা

ছাব্বিশে মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। বাঙালির জাতীয় জীবনের হাজার বছরের মধ্যে কিছু কিছু প্রাপ্তির মধ্যে আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস অন্যতম। এই দিনে সারা দেশের মানুষ খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে আনন্দে উদ্বেলিত। এই আনন্দের দিনেও আপনজন হারানো মানুষ কান্নার সাগরে ভাসতে থাকে। তবে আপনজন হারালেও দেশকে শত্রুমুক্ত করতে তাদের আত্মাহুতিকে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হয়। দেশব্যাপী আনন্দ-উৎসবের মাধ্যমে উদযাপিত হয় দিবসটি। এই স্বাধীনতা একদিন বা হঠাৎ করে আসেনি। এই স্বাধীনতা দিবসের পেছনে রয়েছে একটি

www.pathagar.com

ইতিহাস। ১৯৫২ সালে হয় ভাষা আন্দোলন যার সূচনা মূলত ১৯৪৮ সাল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকেরা আমাদের মায়ের ভাষা, আমাদের মুখের ভাষা বাংলা ভাষাকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। আমাদের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা কেড়ে নিয়ে চাপিয়ে দিতে চায় তাদের উর্দু ভাষাকে। এর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে সংগ্রাম দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৪৮ সালে তাদের এই প্রচেষ্টার প্রতিবাদ স্বরূপ কক্সবাজারের কৃতীসন্তান মৌলভী ফরিদ আহমদ সরকারি চাকুরি ছেড়ে দেন। ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালিরা পাকিস্তানি ক্ষমতাসীন সরকারের দল মুসলিম লীগকে পর্যুদস্ত করে। সরকারি দল নির্বাচনে হেরে গিয়ে দেশের উপর চাপিয়ে দেয় সামরিক শাসন। আন্দোলনে ছাত্রদের সাথে একাত্ম হয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালে ঘোষণা করে ৬ দফা। এতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়। ১৯৬৯ সালে শুরু হয় গণ-অভ্যুত্থান। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বিজয়ী হয়। শেখ মুজিবুর রহমান তথা বাঙালিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার জন্য পকিস্তানি স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান শুরু করে তালবাহানা। তারই ধারবাহিকতায় নিরস্ত্র বাঙালির উপর পশ্চিমা সেনাবাহিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে রাজধানী ঢাকা শহরসহ পুরো দেশ ব্ল্যাক আউট করে শুরু করে গণহত্যা। রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীসহ বড় বড় শহরের পিচঢালা কালো রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গার পানি রক্তে প্লাবিত হয়।

বাংলদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষও বসে থাকেনি। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ভোররাতে পশ্চিম পকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে পকিস্তানে নিয়ে যায়। অবশ্য তিনি যাওয়ার আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, যা ২৬ মার্চ দিনের বেলায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রচারিত হয়। স্বাধীনতার কথা দেশের মানুষ, বিশ্ববাসী জানতে পারে। রক্তের সাগরের উপর দাঁড়িয়েই বাঙালি জোয়ানেরা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। শুরু করে যুদ্ধ, পরে গেরিলাযুদ্ধ। নিরস্ত্র বাঙালি জোয়ানদের কৌশলের কাছে হার মানে পশ্চিম পাকিস্তানি অস্ত্রধারী হানাদার যোদ্ধারা। দীর্ঘ ৯ মাস চলে এই জনযুদ্ধ, গণযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, গেরিলাযুদ্ধ। আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অহংকার চূর্ণ হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। আগের ঘোষণা অনুসারে আমরা ২৬ মার্চকেই স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পাই।

১৯৭২ সাল থেকে প্রতি বছর আমরা ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ঘটা করে পালন করি। লাখো শহীদের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। একটি দেশকে বাঁচানোর জন্যে তাঁরা জীবন দিয়েছিল। জুলুম ও শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্যে ছিল তাঁদের সংগ্রাম। স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে সকল শহিদকে আমরা স্মরণ করি।

১৯৭২ সাল থেকেই স্বাধীনতা দিবসটি পালনের আনুষ্ঠানিকতাকে উৎসবে রূপ দান করা হয়েছে। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে সেই উৎসব। দেশের নিভৃত পল্লি থেকে শুরু করে রাজধানী ঢাকা দিবস উপলক্ষে একাকার হয়ে যায়। খুব ভোরে ৩১ বার

www.pathagar.com

তোপধ্বনির মধ্য দিয়েই দিবসটি শুরু হয়। যদিও মধ্যরাতে তথা দিবসের প্রথম প্রহরে রাত ১২টা এক মিনিটে শহীদ মিনারে স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদেরকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে দিবসের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। শহিদমিনারে ফুল দেওয়ার সংস্কৃতি রাজধানী ঢাকা থেকে সেই গ্রাম পর্যন্ত একাকার। এরপর সূর্য উদয়ের সাথে সাথে সরকারি-বেসরকারি-ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। আয়োজন করা হয় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা। বয়স্কাউট, গার্লস গাইড, আনসার, ভিডিপি, পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে কুচ্‌কাওয়াজ। বিকেলে আলোকসজ্জা ছাড়াও থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কথিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা মেলার আয়োজন করা হয়। কক্সবাজার শহরের পাবলিক ইনসটিটিউট ও পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় মেলা। জেলা-সদরের এই স্বাধীনতা মেলা এখন জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন পণ্য সমাহার নিয়ে স্টল সাজানো হয়। স্বাধীনতা মেলায় ব্যাপক সংখ্যক লোকজনের সমাগম দেখা যায়। শিশু-কিশোর থেকে করে তরুণ-তরুণী, যবক-যুবা, প্রৌঢ় কেউ পিছিয়ে থাকে না। স্বাধীনতা মেলা হয়ে ওঠে প্রাণের মেলা।

## ৩. বারুণী স্নান ও বারুণী মেলা

পঞ্জিকার হিসেব মতে চৈত্র মাসেই বারুণী স্নান করতে হয়। চৈত্র মাসের মধু-কৃষ্ণার ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী স্নান হয়ে থাকে। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, বারুণী স্নানের মাধ্যমে নিজের পাপ স্খলন হয় ও সাথে সাথে পূর্বপুরুষদের পাপও স্খলন হয়। গঙ্গার জলে তর্পণ করলেই সেই পাপ ধুয়ে মুছে যায়। মূলত ত্রেতা যুগেই বারুণী স্নান শুরু হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে কলি যুগকে নিষ্কণ্টক করা।

*কক্সবাজার শহরের ডায়বেটিকস পয়েন্টে বঙ্গোপসাগরে বারণী স্নানের দৃশ্য*

www.pathagar.com

বারুণী শব্দের অর্থ বারণ করা বা নিষেধ করা। ধুমশীলকে নিমাই বারণ করেছিল কিন্তু নিমাই সেই নিষেধ উপেক্ষা করে। ফলে তিনি কঠোর শাস্তি ভোগ করেন। সে কারণেই ধুমশীল তাকে মুক্ত করার জন্য নিমাই তথা মহাদেব তথা শিবের কাছে প্রার্থনা করেন।

রাবণকে বধ করার জন্য শ্রী রাম চন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। রাম কৃষ্ণ যেদিন ধরা ধামে জন্ম নিলো সেদিনই রাবণের মাথার মুকুট খসে পড়ে। এ ঘটনায় রাবণ চিন্তিত হয়ে পড়েন ও ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েন। তাই ঘটনার বিবরণ জানার জন্য রাবণ দেবজ্ঞ আহ্বান করে। দেবজ্ঞ গণনা করে শ্রী রাম চন্দ্রের জন্মের ঘটনা বর্ণনা করেন এবং রাম চন্দ্রের জন্ম হওয়ার কারণেই রাবণের মাথার মুকুট খসে পড়ে। দেবজ্ঞ রাবণকে আরো জানায় তার পাপের কারণেই এই ঘটনা ঘটে। তার পাপ মোচনের জন্য রাবণ বারুণী স্নান করেছিল।

বরুণ দেবের কন্যার নাম ছিল বারুণী। রাবণ অন্যায় করেছিল বলেই বারুণী স্নান করেছিল তিনকোটি দেবতা। তাই বারুণী স্নানের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তিনকোটি কুল আত্মীয়-স্বজন বা পূর্বপুরুষ উদ্ধার করে।

কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতের ডায়াবেটিস্ পয়েন্টে এই বারুণী স্নান অনুষ্ঠিত হয়। এই স্নানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বঙ্গোপসাগরের পানিতে দাঁড়িয়ে তর্পণ করা। সাগরের জলে দাঁড়িয়ে হাতে কুশাসন (তামা, তুলশী, তিল, হরিতকি, দুর্বা হাতে নিয়ে পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে) ভরে জল নিয়ে ফেলে দেওয়াই হচ্ছে তর্পণ। এসময় কেউ কেউ ভূইজ্যদান ও পিণ্ডদানের মাধ্যমে তর্পণ সমাপ্ত করেন।

কক্সবাজারের এই বারুণী স্নান এবং বারুণী স্নান উপলক্ষে আয়োজিত মেলার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। বিগত কয়েক যুগ পূর্ব থেকে বারুণী স্নান উপলক্ষে মেলার জৌলুস কমে গিয়েছিল। ফলে বিগত ২০০৬ সাল থেকে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি উপজেলার অদ্বৈত-অচ্যুত মিশন, বাংলাদেশ নামক সংগঠন পূজারী, ভক্ত, পুরোহিতদের খাদ্য, বস্ত্র, জল সরবরাহ করে থাকে। একই সাথে নারী পূজারী, ভক্তদের স্নান শেষ পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করে দেন। এজন্য তারা অস্থায়ী শৌচাগার নির্মাণ করেন।

বারুণী স্নান উপলক্ষে পূজারী, ভক্তদেরকে দেয়া হয় ধর্মদেশনা। এই উপলক্ষে গীতাপাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলার আয়োজন করা হয়। শহরের ডায়বেটিকস্ হাসপাতাল পয়েন্টে ঝিনুক মার্কেট সমুদ্রসৈকত সড়কে এই আয়োজন করা হয়। মেলায় বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিবিকিনি হয়।"[১]

## ৪. রথযাত্রা ও রথমেলা

"বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের আর একটি উৎসব 'রথযাত্রা'। আষাঢ় মাসে এ উৎসব পালিত হয়। এ উৎসবের সাথে 'যাত্রা' কথাটি যুক্ত হয়েছে। 'যাত্রা' বলতে সাধারণ 'গমন' বুঝায়। তবে এর বিশেষ অর্থ হচ্ছে পবিত্র তীর্থযাত্রার উৎসব। সে জন্যেই বলা যায় রথযাত্রা, স্নানযাত্রা ইত্যাদি। শাস্ত্রে আছে, সূর্যের বারো প্রকার যাত্রার একটি হলো 'রথযাত্রা'।

www.pathagar.com

কক্সবাজার শহরে রথযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি

www.pathagar.com
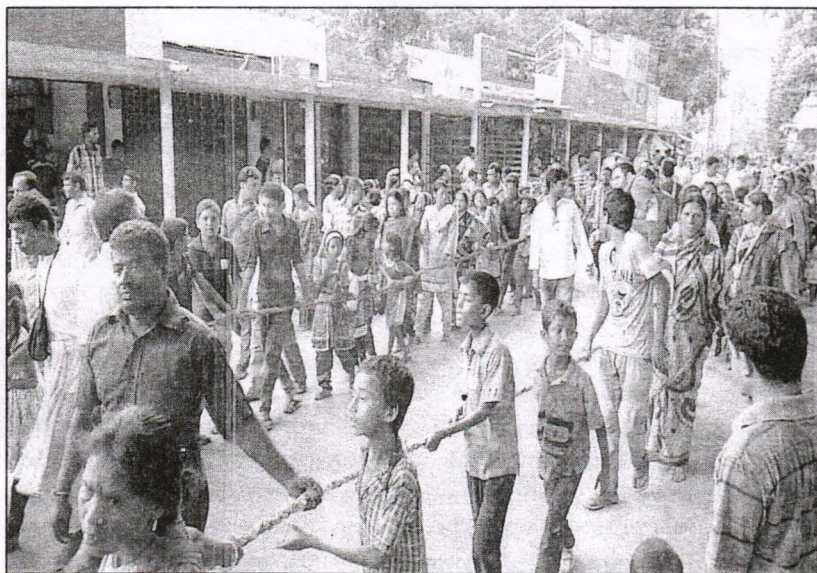
কক্সবাজার শহরে উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি

www.pathagar.com

'রথযাত্রায় দেবতা গমন করেন, ভক্তপূজারী তাঁর পিছু পিছু যান। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায়ও তাই ঘটে। এই যাত্রা উৎসব জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা থেকে শুরু হয়। শেষ হয় উল্টো রথে।

জগন্নাথের মূর্তি সম্পর্কে একটি পৌরাণিক কাহিনি রয়েছে। কথিত আছে, 'জরা' নামে এক ব্যাধের তীরের আঘাতে কৃষ্ণের মৃত্যু হয়। অর্জুন তখন কৃষ্ণের মৃতদেহ দাহ করার জন্যে জামানিক তীর্থে (পুরীতে) পাঠিয়ে দেন। কৃষ্ণের সম্পূর্ণ দেহ কিন্তু দাহ হয় না। ঐ দেহের কিছু অংশ একটি কাঠের গুড়ির স্যাথে জড়িয়ে থাকে। দাহকারীরা এ অবস্থায় কাঠসহ দেহাংশ সাগরে ফেলে দেয়। নিকটেই কিছু শবরজাতির লোক বাস করতো। শবররাজ বিশ্ববসু অতি গোপনে ঐ ভাসমান কাঠের একটি অংশ সংগ্রহ করে। তারপর গোপনে বনের মধ্যে সংরক্ষণ করে রোজ রোজ সেই কাঠের পূজো দিতে থাকে। পাঞ্জাবরাজ ইন্দ্রদ্যুম কৌশলে বিশ্ববসুর নিকট থেকে সেই কাঠ হস্তগত করেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম ঐ কাঠ দিয়ে একটি মূর্তি তৈরি করার জন্যে বিশ্বকর্মাকে আদেশ দেন। বিশ্বকর্মা বলেন, 'মূর্তি তৈরি করার সময় কেউ যেন না দেখে, দেখলে মূর্তি অপূর্ণ থাকবে।'

মূর্তি গড়া শুরু হলো। অনেক দিন গত হয়, বিশ্বকর্মা ঘর থেকে বের হন না। এমনি সময় রাজা একদিন দরজা খুলে দেখেন যে, মূর্তি অপূর্ণ। হাত পা তৈরি হয়নি। ঐ মূর্তিই জগন্নাথ নামে পরিচিত হলো। রাজা ইন্দ্রদ্যুম জগন্নাথের দেউল পুরীতে স্থাপন করলেন। রাজার আদেশে শবররা জগন্নাথ পূজার সেবক নিয়োজিত হলেন। জগন্নাথের মূর্তি সম্পর্কে এই হলো পৌরাণিক কাহিনি।"[২]

কক্সবাজারে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার ইতিহাস খুব পুরোনো নয়। ১৯৯৪ সাল থেকেই International Society for Krisnha Concern আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবাপন্ন সংঘ-ইসকন নামের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সংগঠন কক্সবাজারে সর্বপ্রথম রথযাত্রা শুরু করে। শহরের ঘোনারপাড়া এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শ্রী দামোদর মন্দির-এর উদ্যোগে স্থানীয় গোলদিঘির পাড়ে রথযাত্রা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রত্যুষে মন্দিরে গীতাপাঠ, শ্রী শ্রী জগন্নাথ ঠাকুরের পূজা-অর্চনা, সংকীর্তন, ভোগারতি, অপরাহ্নে গোলদিঘির পাড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, পরে মাংগলিক কার্যক্রম শেষে শুরু হয় রথযাত্রা। রথযাত্রায় মন্দিরের ঠাকুর, পূজারী, ভক্তবৃন্দ, সর্বস্তরের লোকজন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। রথযাত্রা উপলক্ষে তৈরি করা হয় একটি কাঠের রথ। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন যে, উক্ত রথের মাধ্যমে পূজারী, ভক্তবৃন্দ এবং রথ টানায় অংশগ্রহণকারী সকলেই স্বর্গে চলে যাবেন। শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের প্রতিকৃতি তথা মূর্তিকে বহনকারী উক্ত রথ তৈরি করতে কয়েক লাখ টাকা খরচ হয়। প্রায় ২০ ফুট উচূ, ২০ ফুট লম্বা এবং পাশে ৮ ফুট প্রশস্থ রথ কাঠ, গাড়ির চেসিস ও রথের উপর ঠাকুরের মন্দির তৈরি করা হয়। শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবকে কাপড় মোড়ানো অবস্থায় রথের উপর প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে রথ তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়। রথ টানার জন্য প্রয়োজন প্রায় দেড়শ মিটার লম্বা মোটা রশি। রথে রশি আটকিয়ে শত শত পূজারী, ভক্তবৃন্দ টেনে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। প্রায় তিনমাইল সড়ক

www.pathagar.com

অতিক্রম করে শহরের মল্লিক পাড়াস্থ কৃষ্ণমন্দিরে নিয়ে যায়। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব ঠাকুর কৃষ্ণ মন্দির তথা মামার বাড়িতে ১০দিন অবস্থানের পরে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে আবার যথাস্থানে নিয়ে আসা হয়। এ উপলক্ষে জেলায় কোনো বড় ধরনের মেলার আয়োজন করা হয় না। তবে আয়োজন থাকে ছোটখাটো মেলার। এতে বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টান্নদ্রব্য, খিচুড়ি, ফলমূল পূজারী, ভক্তবৃন্দের মাঝে বিতরণ করা হয়।"[৩]

## রামু উপজেলার রথ উৎসব

রামু উপজেলা কক্সবাজার জেলার একটি প্রাচীন জনপদ। এই জনপদে সেই প্রাচীনকাল থেকেই পালিত হয়ে আসছে রথ উৎসব বা রাঠা পোয়ে বা রঠঃ পোয়ে। রথ উৎসব হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অন্যতম ধর্মীয় উৎসব হলেও রামু উপজেলার রাকখাইং সম্প্রদায়ের লোকজন ভিন্ন আমেজ নিয়ে এই উৎসব পালন করতো।

রামুর রাকখাইং পাড়াগুলোতে প্রাচীনকালে অত্যন্ত আনন্দ উদ্দীপনার সঙ্গে রথ-উৎসব পালন করা হতো। এটা হিন্দুদের মত ধর্মীয় কোনো সুদৃশ্য রথকে টেনে টেনে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া নয়। এটা হচ্ছে দুদল প্রতিযোগীর মধ্যে রথকে টেনে নিজেদের দিকে নিয়ে এসে বিপক্ষ দলকে পরাজিত করা। কাজেই এটা মূলত 'রথটানা প্রতিযোগিতা'। রাকখাইং ভাষায় এটাকে বলে 'রাঠা পোয়ে'। এই প্রতিযোগিতা প্রতিবছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী থেকে পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত চলতো। অবশ্য এই রথমেলা কেন এবং কী উপলক্ষে করা হয় তার কোনো সামাজিক ধারণা তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে এই মাঘী পূর্ণিমাতে ভগবান বুদ্ধ আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন বলে এই রথ-মেলা করা হয় বলে অনেকের অনুমান। কিন্তু আয়ু বিসর্জনের সাথে রথের কী সম্পর্ক তা স্পষ্ট নয়।

## কীভাবে রথ তৈরি ও মেলা হয়

আনুমানিক দুহাত বা ততোধিক বর্গাকৃতির ও এক হাত উচ্চতার একটি চারপাশ ঘেরা কাঠের চৌকি বা বাক্স আকৃতির বস্তু তৈরি করে তার নিচে চার কোনায় চারটি কাঠের চাকা লাগানো হয়, যাতে বর্গাকৃতির বস্তুটি আগে-পিছে গড়িয়ে চলতে পারে। এবার বস্তুটির উপরে ঠিক মধ্যখানে একটি গর্ত করা হয়। উক্ত গর্তে চার পাঁচ হাত লম্বা ডালপাতা যুক্ত কয়েকটি কালি বাঁশের আগা ঐ গর্তে শক্ত করে ঢুকিয়ে ফুল ও রঙ্গিন পতাকা যুক্ত করা হয়। এভাবে রথ তৈরি হয়। সব কিছু এমন শক্ত ও মজবুতভাবে করা হয় যে, শত ঝাঁকাঝাকি টানাটানিতে এই রথের যেন কোনো ক্ষতি না হয় বা ভেঙে না পড়ে। রথ যেহেতু দুদিক থেকে টানা হবে, সেহেতু দুদিকে দুটা দুটা করে চারটা লম্বা (আনুমানিক ৩০ থেকে ৪০ হাত) বন্য লতা শক্ত করে বাঁধা হয়। একদিকে দুই সারি করে দুইদিকে চার সারি লোক রথ টানতে থাকে। রথের গোড়ায় ৪ থেকে ছয়জন শক্তিশালী লোক রথকে মাটির সঙ্গে চেপে রাখে, যাতে দুদিকের টানাটানিতে রথ মাটি থেকে আলগা হয়ে শূন্যে উঠে না যায়। তারপর তাদেরই একজন রথ টানায় নেতৃত্ব দেয়। সে এক একটা ধুয়া তোলে, সবাই সমস্বরে ধুয়া ধরে এবং ধুয়ার তালে তালে রথ টানতে থাকে। আর যে দল রথ টেনে নিজেদের পক্ষে নিয়ে যেতে পারে তাদের জয় হয়। এক দলের পর অন্য প্রতিযোগী দল রথ টানার জন্য রশি বা লতা ধরে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

এভাবে সকল দল রথ টানায় অংশ নেয়। এই রথোৎসব ফুটফুটে জোছনা-রাতে কোনো সোজা রাস্তায় বা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। রাত আটটা নয়টা থেকে শুরু হয়ে দু'টা তিনটা পর্যন্ত চলে। অনেক সময় সারা রাতও চলত। এই মেলার ফাঁকে ফাঁকে নানা রকম খাবার, পিঠা পায়েসের দোকান বসে। এসব দোকানে বিক্রিও হয় ভালো। কারণ, রথ টানাটানিতে প্রায় মানুষ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ত।

প্রতিযোতিায় সাধারণত দল গঠন হয়- নারী-নারী, পুরুষ-পুরুষ, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, এপাড়া-ওপাড়া, বুড়য়া-রাকখাইং ইত্যাদি বিচিত্র রকমে। এটা একটা সাধারণ মেলা। কাজেই এখানে বিজয়ীদেরকে কোনো পুরস্কার দানের ব্যবস্থা থাকে না। রামুতে এই রথমেলা হত লাওয়ের পাড়া, দক্ষিণ শ্রীকুল (লা-পেঁ-বাঙ রঙ রোয়া) লামার পাড়া (আউছাপা রোয়া) (লাওয়ের ঘোনা বা লামার ঘোনা) উখিয়ার ঘোনা গনিয়া কাটায়। অন্য এলাকায় হত কিনা সঠিক জানা যায় না।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাকখাইংরা অবস্থার ফেরে রথমেলা বন্ধ করলে পূর্ব মেরংলোয়া গ্রামে খিরন্ত বড়ুয়া নামে একজন ডাকসাইটে ব্যক্তি প্রায় সাত আট বছর রথ মেলা অনুষ্ঠান করেন। এ অনুষ্ঠানকে স্থানীয়ভাবে 'লতা টানা' বলা হতো। আর রথ বা লতা টানার সময় সবাই একযোগে ধুয়া তুলত 'খিরন্তর লতা-হেঁইও' টানরে টান-হেঁইও', লারু দের-হেঁইও' ইত্যাদি বলে। এই মেলা অনুষ্ঠিত হত পূর্ব মেরংলোয়া গ্রামের রাস্তায়। স্থানীয় রাকখাইংরাও এই মেলায় যোগদান করতো।"[৪]

## ৫. ওরস ও মেলা

মূলত মধ্যযুগ থেকে এদেশে ইসলামের সুফী মতবাদ ও মারফতি তত্ত্ব সাধনার প্রভাবে আবির্ভূত হন অনেক পীর-আওলিয়া, ফকির-দরবেশ এবং প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের উদ্যোগে বা তাদের স্মরণে অসংখ্য মাজার। ইসলামের সুফী মতবাদ অথবা মারেফত তত্ত্বের অনুসারীরাই এদেশে পীরভক্তি ও মাজার ব্যবস্থা চালু করেন। তবে সব মাজারের মর্তবা বা সম্মানবোধ একই রকমের নয়।

ওরস মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিমূলক অনুষ্ঠান। কোনো পীর দরবেশের ইন্তেকালের পর সমাধিস্থলে তার ভক্তরা দরগাহ বা মাজার শরীফ গড়ে তুলেন। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ঐ দরগাহ বা মাজার শরীফে ইচ্ছা পুরনের জন্য নানা রকম মানত করে থাকে। পীর বা দরবেশের ভক্তরা মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি কামনা করে ঐ পীরের ছওয়াব বকসে দেয়ার জন্য বার্ষিক ভোজ ও জিকির মাহফিলের আয়োজন করে থাকে। এই ভোজসভা এবং জিকির মাহফিলকে ওরস বলে। কোনো পীরের ওরসে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে থাকে। ভক্তরা ওরস করার জন্য ভক্ত ধনবানদের নিকট থেকে গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদির যোগান চায় এবং ধনবান ভক্তরা অকাতরে গরু, মহিষ দান করে। বার্ষিক একবার করে এই ওরস শরীফ হয়ে থাকে।

কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় অনেক মাজার রয়েছে। এসব মাজারের আশেকান ও ভক্ত রয়েছে। জেলার মহেশখালি উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের মধুপুর দরবার শরীফ, কুতুবদিয়া উপজেলার দরবার শরীফ, কক্সবাজার সদর উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নের বোয়ালখালির পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত ডুলা

www.pathagar.com

ফকিরের মাজার, ঈদগাঁও ইউনিয়নের শিয়াপাড়া পাহাড়ি এলাকার বারো আউলিয়ার দরগাহ, পেটান ফকিরের মাজার, ঝিলংজা ইউনিয়নের খরুলিয়া এলাকার আলাউদ্দিন শাহের মাজার, চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের শাহ ওমরের মাজার, উখিয়া উপজেলার হলদিয়াপালং ইউনিয়নের খোঁদা ফকির, রামু উপজেলার কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের মনিরঝিল গ্রামের শাহ হাকিম ফকির প্রমুখের মাজার রয়েছে। রামু উপজেলার মনিরঝিল এলাকার মাজারে কখনো ওরশ অনুষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু স্থানীয় লোকজন মানত করে শিরনি করতো। কিন্তু বিগত ৩০ বছর ধরে তাও বন্ধ।

নূরুল হক ডুলা ফকির একজন একজন সাধক পুরুষ। তাঁর সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। প্রতিবছর ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর মাজারে ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। ওরশ উপলক্ষে ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন হয় কিন্তু এখানে মাইজভাণ্ডারি গান হয় না।

শাহ উমর জেলার আরেকজন সাধক পুরুষ। চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের পাহাড়ি উপত্যকায় তাঁর মাজার। তিনি চট্টগ্রামের বারো আউলিয়ার একজন বলে কথিত। দক্ষিণ চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নোয়াখালির উমরাবাদে উমর শাহ নামে এক দরবেশ ছিলেন। চকরিয়ার শাহ উমর ও নোয়াখালির উমর শাহ অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনুমিত হয়। জনশ্রুতি রয়েছে, তিনি ইয়ামেনের বাসিন্দা এবং শাহজালাল রা.-এর সাতশ' অনুসারীর একজন ছিলেন। প্রতিবছর ২১ ফাল্গুন মাজারে ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন তাদের মনের ইচ্ছা পূরণের নিমিত্তে উক্ত মাজারে গরু, ছাগল, মোরগ-মুরগিসহ নগদ অর্থকড়ি মানত করেন। লোকজন মানত করে মাজারে যান। বার্ষিক ওরশের দিন ভক্তবৃন্দ গরু-ছাগল জবাই করে নিজেরা ভোজনপর্বে অংশ গ্রহণ করেন। তবে বার্ষিক ওরশ পূর্বের মতো জমজমাট হয় না। ভক্তরা ভাণ্ডারি গানের আয়োজন করে থাকেন। মাজার সংলগ্ন পুকুরের রয়েছে গজাল মাছ। যে মাছ চট্টগ্রাম শহরের বায়েজিদ বোস্তামি মাজারে, সিলেটে হযরত শাহজালাল রা.-এর মাজারের পুকুরে রয়েছে। শাহ ওমরের মাজারের পুকুরে গজাল মাছের সংখ্যাও অনেক বেশি ছিল, কিন্তু মাজার-কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা ও পুকুর সংস্কার না করার কারণে পুকুরটি দিন দিন ছোট আসছে ও শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। মাজারে ভক্ত-অনুরক্ত, জিয়ারতকারিদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় পুকুরে মাছের খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে মাছের সংখ্যাও কমে গেছে।"[৫]

জেলার আরেকজন কামেল পুরুষ ছিলেন আবদুল মালেক আল-কুতুবি। কুতুবদিয়া উপজেলায় তাঁর জন্ম। প্রতিবছর ৭ ফাল্গুন বা ১৯ ফেব্রুয়ারি কুতুবদিয়া দরবার শরীফে ওরশ অনুষ্ঠিত হয়।

মহেশখালি উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের মধুপুর দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন হযরত ছৈয়দ আকাম উদ্দিন। তিনি ছিলেন একজন কামেল মানুষ। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা মাদ্রাসায়ে আলিয়া পড়ালেখা করে হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্র খেলাফত লাভ করেন। মহেশখালি উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের ইউনুছখালি গ্রামের বাসিন্দা ছৈয়দ আকাম উদ্দিন পড়ালেখা শেষে কলকাতা ফিরে মধুপুর দরবার শরিফ প্রতিষ্ঠা করেন। মহেশখালি উপজেলার বড় মহেশখালি ইউনিয়নের মকবুল আলী পণ্ডিত দরবার শরীফের নাম 'মধুপুর দরবার শরীফ' নামকরণ

www.pathagar.com

করেন। পূর্বে দরবার শরীফে প্রতিবছর ১লা পৌষ ও ৫ ফাল্গুন দুই দফা ওরশ অনুষ্ঠিত হতো। মধুপুর দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ছৈয়দ আকাম উদ্দিন-এর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে ৫ ফাল্গুন ও তাঁর পুত্র ও প্রধান খলিফা শাহ মকছুদুল করিমের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে ১লা পৌষ ওরশের আয়োজন করা হতো। বর্তমানে শাহ মকছুদুল করিমের জন্ম, মৃত্যু বার্ষিকী ও তাঁর পিতার দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ছৈয়দ আকাম উদ্দিনের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে তিন দফে ওরশের আয়োজন করা হয়। তবে এই ওরশের সময় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দরবারের ভক্ত, মুরিদ ও সাগরেদগণ হিসেব করে দেখেছেন দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ছৈয়দ আকাম উদ্দিনের মৃত্যু ১ পৌষ নয়, তাঁর প্রকৃত মৃত্যু দিবস ২৯ অগ্রহায়ণ। ফলে বর্তমানে শাহ মকছুদুল করিমের জন্ম দিবস ১৭ অগ্রহায়ণ, মৃত্যু দিবস ২৯ অগ্রহায়ণ ও তাঁর পিতা দরবারের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু দিবস উপলক্ষে তিন দফে ওরশের আয়োজন করা হয়। ওরশে ভক্ত, মুরিদ, সাগরেদগণ নগদ অর্থসহ পশু দান করে থাকেন। ওরশ উপলক্ষে দরবারে মেজবান ছাড়াও মাইজভাণ্ডারি গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিন দফে ওরশ অনুষ্ঠিত হলেও দরবারের প্রতিষ্ঠাতা ২৯ অগ্রহায়ণ ও ৫ ফাল্গুন বড় করে ওরশের আয়োজন করা হয়। উক্ত ওরশদ্বয়কে স্থানীয় লোকজন ছোট দারা ও বড় দারা বলে থাকে। প্রতিষ্ঠাতা হযরত ছৈয়দ আকাম উদ্দিনের মৃত্যু বার্ষিকীকে বড় দারা ও তাঁর পুত্র ও প্রধান খলিফা শাহ মকছুদুল করিমের মৃত্যু বার্ষিকীতে ছোট দারা আয়োজিত হয়।"[৬]

কক্সবাজারে মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফেরাত কামনা করে প্রদত্ত চেহলামে ভোজ উৎসবকেও 'মেলা' বলে। উক্ত মেজবান বা মেলায় গরু, মহিষ, ছাগল বা পশু জবাই করে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ প্রতিবেশী, গরিব-দুঃখীদের খাওয়ানো হয়। স্থানীয় ভাবে প্রচলিত বিশ্বাস, এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির বিদেহী আত্ম শান্তি লাভ করবে।

## ৬. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা

"চৈতপূজার উৎসব হিন্দুসমাজের একটি বড় অনুষ্ঠান। প্রতিবছর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে এ উৎসব পালিত হয়। ঐ সপ্তাহের প্রথম দিকে উৎসব শুরু হয়, চৈত্র-সংক্রান্তির দিন শেষ হয়। এ উৎসবের অন্য নাম চড়কপূজার উৎসব।"[৭]

সৌর বৎসরের শেষের দিন চৈত্র সংক্রান্তি। একমাত্র মুসলমান ছাড়া হিন্দু, বৌদ্ধ, চাকমা ও রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব পালন করে থাকে। স্ব স্ব ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসারে মন্দির অথবা কিয়াং-এ গিয়ে পূজা করে চৈত্র মাসের শেষের দিন। হিন্দুরা এই দিনে চড়কপূজা করে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তি পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী ঋতুধর্মী উৎসব। এ সময় এলাকার ব্যবসায়ী মহল হালখাতা শুরুর উদ্যোগ নেয়। বলী খেলা, গরুর লড়াই ও বৈশাখী মেলার শুভ যাত্রা শুরু হয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিটি ঘরে ঘরে এই দিনে অন্তত পাঁচ পদের তরিতরকারি উপকরণ মিশ্রিত বিশেষ ধরনের পাঁচন, তরকারি রান্না করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের পিঠা, তিলের নাড়ু, বিন্নি ধানের খৈ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। সকাল থেকে ঘরে ঘরে চলে খাওয়ার উৎসব।

www.pathagar.com
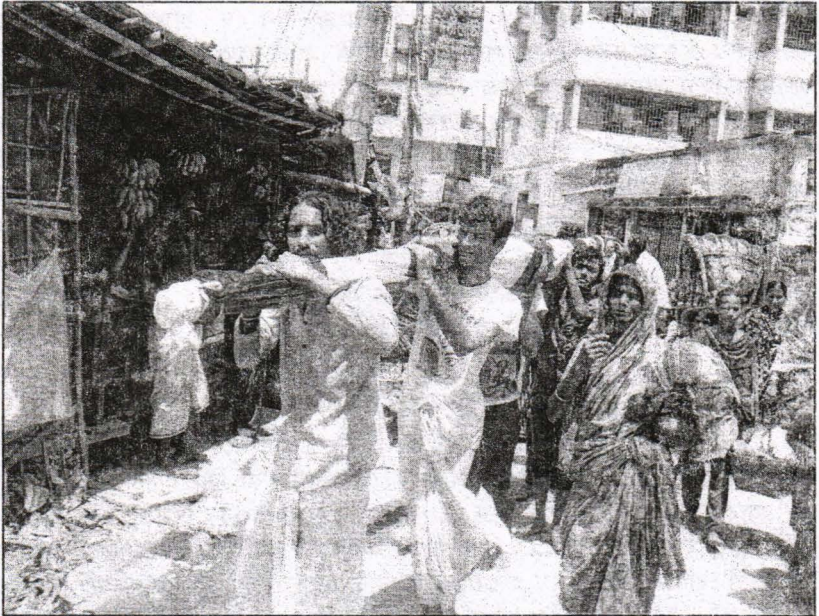
কক্সবাজার শহরে গোলদীঘির পাড়ে শিবগাছ উত্তোলনের দৃশ্য


www.pathagar.com

উৎসব আনন্দের মাধ্যমে পুরাতন বছরকে বিদায় জানানো হয়। চাকমা ও রাখাইনেরা ৩দিন ধরে চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব পালন করে থাকে। প্রাচীনকালে জেলার বেশ কয়েকটি এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন চড়কপূজা উপলক্ষে শিবগাছ বা চড়ক ঘূর্ণন-এর আয়োজন করতো। বিশেষ করে কক্সবাজার সদর উপজেলার ঈদগাঁও পালপাড়ার নিকটে ও খুরুশকুল ইউনিয়নে, রামু উপজেলার রাজারকূলে, চকরিয়া উপজেলার ফাসিয়াখালীতে চড়ক ঘূর্ণন তথা শিবগাছ তোলা হতো। এই চড়ক ঘূর্ণনকে স্থানীয় ভাবে শিবগাছ তোলা বলা হয়। তার কারণ হচ্ছে, গাছের একপ্রান্তে একটি জ্যান্ত মানুষকে বড়শি দিয়ে আটকিয়ে ঝুলানো হতো বলেই শিবগাছ তোলা বলা হয়। চড়ক ঘূর্ণন বর্তমানে জেলায় ব্যাপকভাবে আয়োজন করা হয় না, তবে সীমিত আকারে ও পারিবারিকভাবে শিবগাছ তথা চড়ক ঘূর্ণনের আয়োজন হয়ে থাকে।"[৮]

## ৭. রামু উপজেলার শিবগাছ মেলা

বর্তমানে যেখানে রামু উপজেলা কমপ্লেক্স অবস্থিত সে স্থান পূর্বে ধানের মাঠ ছিল। এই বিরাট মাঠকে মংলাঘোনার বিল বলা হতো। চৈত্র মাসে নাড়া, ঘাসবিহীন ন্যাড়া মাঠ খাঁ খাঁ করত। এখানে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে হিন্দুদের শিব গাছের মেলা বসত। মংলাঘোনা বিলের পূর্ব পাশে (বর্তমান ফিলিং স্টেশনের পূর্ব পাশে) কক্সবাজার রাস্তা ও মণ্ডলপাড়া রাস্তার কোনায় যে হাজামজা পুকুরটি আছে সেই পুকুরটিতে পূর্বে শিবগাছ রাখা হতো। সারা বছর পানির মধ্যে ঐ গাছ ডুবে থাকত। মেলার ২/৩ দিন পূর্বে ঢোল বাদ্য সহকারে পুকুর থেকে তোলা হতো। তারপর টেনে নিয়ে গিয়ে মংলা ঘোনার মাঠে মেলার নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হতো। একদিন পূর্বে গাছটি পোঁতার জন্য প্রায় ২/৩ হাত গভীর করে একটি গর্ত করা হতো। সেই সঙ্গে শিব গাছের একটি 'বালা' বানানো হতো। শিব গাছের মাথায় অপর একটি চেপটা গাছকে সমান মধ্যখানে ছিদ্র করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এটাকে স্থানীয় ভাষায় 'বালা' বলে। রামুতে এই বালা ছিবা বাঁশ, বেত ও কাঠ দিয়ে তৈরি হত। এই বালা তৈরি করত মধ্যম মেরংলোয়ার সাম্পান মাঝি পেঁচা বড়ুয়া। আনুমানিক সপ্তাহ খানেক আগে থেকে এই বালা তৈরির কাজ শুরু করত।

মেলার দিন এই বালা শিব গাছের মাথায় ঢুকিয়ে বসানো হলে অনেকটা ইংরেজি বড় হাতের টি (T) এর মতো দেখায়। বালার দুই প্রান্ত বা মাথায় দুটা রশি বাঁধা হয়। এবার অনেকে মিলে কেউ হাতে ধরে, কেউ বা মোটা বাঁশের ঠেস দিয়ে, কেউ বা কাঁধে নিয়ে, কেউবা বালার দুপাশের রশি টেনে মূল গাছকে গর্তে ঢুকিয়ে শক্ত করে মাটি চাপা দেয়, যাতে গাছটি সোজা থাকে। এবার বালার দুই রশির একটাতে মানুষ ঝুলে থাকে। অন্য রশি ধরে কয়েকজন মিলে পাক দেয়। ফলে বালাটি ঘুরতে থাকে এবং সেই সাথে ঝুলন্ত মানুষটিও ঘুরতে থাকে।

শিবগাছ উত্তোলনের পূর্ব থেকে পরে পর্যন্ত ডোমরা তাদের ঢোল শানাই চারদিকে ঘুরে ঘুরে, নেচে নেচে বাজাতে থাকে শিব গাছ খাড়া হয়ে গেলে হিন্দু নারীরা মুহুর্মুহু উলুধ্বনি দেয়। এসময় কেউ কেউ কবুতর ছেড়ে দেয়। শিব গাছের গোড়া থেকে কিছু দূরে আনুমানিক ১০ ফুট × ১০ফুট মাপের একটি স্থান চেঁছে পরিষ্কার করে গোবর দিয়ে

www.pathagar.com

লেপা হয়। সেই খোলাতে বসে ব্রাহ্মণ সংক্রান্তি পূজার আনুষ্ঠানিকতা সারেন। সাধারণত মধ্যাহ্নের পরে এই মেলা জমে উঠে। নানা স্থানের হিন্দু নর-নারীরা এসে ব্রাহ্মণের কাছে ধর্মীয় কাজকর্ম সারে এবং মেলায় কেনা-কাটা করে। তাছাড়া প্রথম থেকে নানা সম্প্রদায়ের লোকজন এসে মেলাকে লোকারণ্যে পরিণত করে। নানা প্রকার দোকানপাট বসে। তবে এসময় তরমুজ, বাংগীর বেচাকেনা বেশ ভালো জমে। সারাদিন আনন্দের পর সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার সাথে সাথে মেলার ইতি হয়। তবে সপ্তাহকাল ধরে ঐ গাছে স্থানীয় ছেলেরা চড়াচড়ি করে। সপ্তাহ পরে আবার গাছটি পূর্বের মতো ঐ পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়।

পরবর্তীকালে ঐ বিলে চৈত্র মাসেও ধানচাষ শুরু হওয়ায় মেরংলোয়া সীমা বিহারের পাশে কয়েক বছর শিব গাছ তোলা হতো। পরে রামু খিজারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠেও কয়েক বছর ঐ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নানা কারণে বর্তমানে এ মেলা বিলুপ্ত।"[৯]

## ৮. রামু উপজেলার ঠাকুর পোড়া উৎসব

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া এবং দাহ করা দুটাই প্রচলিত। সাধারণত কবর দেওয়ার খরচ কম, আর মরা পোড়ানো ব্যয়বহুল যা গরিবের পক্ষে অসম্ভব। বৌদ্ধরা প্রায় অল্প বয়সী মৃতব্যক্তিকে কবর এবং বৃদ্ধব্যক্তির শবকে পুড়িয়ে থাকে। যে-কোনো মৃতব্যক্তিকে শ্মশানে নেবার সময় এই রামু অঞ্চলের বড়ুয়াদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে মৃতের কফিনকে বাঁশ, কাঠ, রঙিন কাগজ ও কাগজের ফুল দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো হয় সামর্থানুযায়ী। তারপর শোকসভা বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ হলে মৃতব্যক্তিকে কফিনে পুরে কাঁধে নিয়ে ঢোল, জুরি, অন্যান্য বাদ্য সহকারে আনন্দ করতে করতে শ্মশানে নিয়ে যায় এবং কবর দেয় অথবা দাহ করে। এই হলো গৃহীদের জন্য ব্যবস্থা।

ভিক্ষুদের জন্যও একই ব্যবস্থা। তবে ভিক্ষুদেরকে মাটি দেবার পরিবর্তে প্রায়ই দাহ করা হয়। শ্মশানের পরিবর্তে বিহারপ্রাঙ্গণ বা বিহার সংলগ্ন খোলাস্থানে দাহ কার্য সমাপন করা হয়। কিন্তু যদি নেতৃস্থানীয় নামী দামি ভিক্ষু হন তবে তাঁকে অন্য দশজনের মতো সাধারণভাবে দাহ করা হয় না। তাঁর মৃহদেহ কফিনে বন্দী করে কয়েকমাস থেকে বছরখানেকও রেখে দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে দাহক্রিয়ার জন্য একটা রাজকীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নিজের গ্রাম, উপজেলা, জেলা, এবং তার বাইরেও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে চাঁদা এবং শ্রাদ্ধদান সংগ্রহ করা হয়। তারপর ভালো কারিগর শিল্পী দিয়ে শব পোড়ানোর জন্য বৌদ্ধ ধারণানুযায়ী স্বর্গের বিমান তুল্য একটা বড় 'আলং' (শবাধার) তৈরি করা হয়। এগুলো তৈরি করতে বেশ কয়েকমাস সময়ের প্রয়োজন। ব্যয় করার সামর্থ বা ব্যয়ের অংক অনুযায়ী এই আলং-এর গঠন, উচ্চতা, আকার প্রকার এবং সৌন্দর্য নির্ভর করে। সবকিছু তৈরি হলে উদযাপন কমিটি কর্তৃক একটা ভালো মাস, দিনক্ষণ দেখে দাহক্রিয়ার দিন ধার্য করা হয় এবং চিঠি, পোস্টার ও প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে সর্বত্র প্রচার করা হয়। এই দাহক্রিয়াকে একটা মেলার রূপ দেওয়ার জন্য প্রশাসন থেকে ৩ অথবা ৭ দিনের অনুষ্ঠান কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা হয়। অতপর নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে বড় আলং স্থাপন করা হয়। এই আলং অত্যন্ত সুন্দর নয়নাভিরাম যা দেখতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নানা স্থানের

www.pathagar.com

লোক জড়ো হয়। অতঃপর অন্য ছোট আলং-এ করে মৃত ভিক্ষুর শবাধার বা কফিন নিয়ে দলে দলে উৎসাহী লোকেরা নাচতে থাকে। এভাবে একদলের পর অন্য দল, এক গ্রামের পর অন্য গ্রামের লোক পালাক্রমে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে নাচতে থাকে আলং। এ নাচকে 'আলং নাচ' বলে। এভাবে অনুষ্ঠানের শেষ দিন পর্যন্ত আলং নাচ চলে।

এসময়ের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয় প্রতিদিন। একদিকে চলে ধর্মসভা। অন্যদিকে অনুষ্ঠান স্থলের চারপাশে রকমারি দোকানপাট বসে। বিশেষ করে খাবার ও খেলনার দোকান বেশি। এছাড়াও প্রতিদিন রাতে নাটক, নৃত্যানুষ্ঠান, যাত্রাগান, সার্কাস, পুতুলনাচ ইত্যাদি ও চলতে থাকে। অতীতে এ মেলার আর একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল বাজি পোড়ানো উৎসব। 'দড়ি বাজি' ও 'গাড়ি বাজি' প্রতিযোগিতা।

এভাবে ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এই মেলা চলে। অতঃপর মেলার শেষে দিন অপরাহ্ন অথবা সন্ধ্যাবেলায় মৃত ভিক্ষুর কফিনকে বড় আলং-এর মধ্যে স্থাপন করে লাকড়ি এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দিয়ে দাহ করা হয়। এই দাহক্রিয়ার সাথে সাথে মেলা বা উৎসবেরও সমাপ্তি ঘটে। বড়ুয়ারা ভিক্ষুকে ঠাকুর বলে। তাই ভিক্ষু পোড়ার নাম এ অঞ্চলে 'ঠাকুর পোড়া' নামে খ্যাত। এ উৎসবটিও আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে মঘদের কাছে লাভ করেছি।

## ৯.চকরিয়া ঘোড়দৌড়মেলা

১৯০৫ সালের মাঘ মাসে, চান্দ্রমাসের ১২, ১৩ ও ১৪ তারিখে বেশ জাকজমকের সাথে চকরিয়া ঘোড়দৌড় মেলা শুরু হয়। চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের কেন্দ্রস্থলে হযরত শাহ ওমর [রা.]-এর মাজারসংলগ্ন দক্ষিণের প্রায় ১২ একর আবাদি জমিতে মেলাটি বসতো। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার আরাকান সড়ক হতে ঘোড়দৌড় মেলা ময়দানের দূরত্ব প্রায় এক মাইল; কক্সবাজার জেলা-শহর থেকে ছত্রিশ মাইল। কাকারা গ্রামের জমিদার মাওলানা বদিউজ্জামান চৌধুরী এই ঐতিহাসিক ঘোড়দৌড়মেলার প্রতিষ্ঠাতা।
এককালে এই এলাকায় হিন্দুদের সূর্যখোলার মেলা [মাঘ মাসের শেষ রোববার] বেশ জমতো। কারণ তখন অন্য কোনো মেলার আয়োজন বা বিনোদনের ব্যবস্থা এ-এলাকায় ছিল না। বছরে একবার অনুষ্ঠিত উক্ত মেলায় স্থানীয় মুসলমানরা যোগদান করতো দলে দলে। 'হিন্দুদের মেলায় যোগদান করা গুনাহের কাজ—এ-কথা আলেম-ওলামারা বলতেন, কিন্তু কেউ আমল দিত না। 'বিপথগামী' মুসলমানদেরকে সূর্যখোলা মেলায় যোগদান থেকে ফিরানোর জন্য বিকল্প হিসেবে ঘোড়দৌড়মেলার আয়োজন করা হয়।

মুসলমানদেরকে ধর্মানুরাগী করা এবং ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতাই মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল। এ মেলায় ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের যথার্থ সম্মান ও বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হতো। ১৯০৫ থেকে প্রতিবছর এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। ঘোড়দৌড়মেলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সূর্যখোলা মেলা আর তেমন জমেনি।

মাওলানা বদিউজ্জামানের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মোস্তাক আহমদ চৌধুরী উক্ত মেলা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতেন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি একাই যথেষ্ট ছিলেন। বেত নিয়ে হাঁটতেন মেলার অলি-গলি। তিনি চকরিয়া হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রায় ২২ বছর ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার শহরসহ বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা পন্যসামগ্রী সহকারে মেলায় যোগ দিত। ফলে ঘোড়দৌড়মেলার শোভা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। চকরিয়া, লামা ও আলিকদম উপজেলার কিশোর-কিশোরীরা মেলায় যোগদানের উদ্দেশ্যে মাটির তৈরি ব্যাংকে সারা বছর খুচরা পয়সা জমাতো। জমানো টাকা দিয়ে মেলা থেকে কিনতো খেলনা, চড়তো দোলনায়। রঙিন পাতিল পুরে মিঠাই ধরনের নাস্তা-সামগ্রী বাড়ি নেয়াই ছিল মেলায় যোগদানকারীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মেলায় দেখা যেতো পার্বত্য-চট্টগ্রামের উপজাতীয় মারমা, মুরুং ও ত্রিপুরা নারী-পুরুষদের।

রাতে স্থানীয় মহিলারা মনোহারি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়সহ মেলা উপভোগ করার জন্য বিভিন্ন সাজে ঘোড়দৌড়মেলায় যেতো। দেখতো সিনেমা, পুতুলনাচ, সার্কাস। দলে দলে ঘুরে বেড়াতো চতুর্দিকে; এর মাঝে কিনে নিতো ব্যবহার্য পন্যসামগ্রী। এদিক-সেদিক ঘুরাঘুরিতে মহিলারা সারারাত কাটাতো। মেলার দোলনায় [নাগরদোলা] চড়া ছিল মেয়েদের অন্যতম শখ।

মেলায় অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়ার জন্য বিভিন্ন যাতায়াতপথে হাত পেতে বসে থাকতো মসজিদ-মাদ্রাসার ইমাম-শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দ; ভিক্ষার জন্য অন্ধ, খোঁড়া ও গরিব ধরনের পুরুষ-মহিলা। মেলা উপলক্ষে দ্বিগুণ বেড়ে যেতো রিকশা, গাড়ি ও নৌকার ভাড়া।

নির্ধারিত ঘোড়দৌড়মেলা-ময়দান বোরো চাষের আওতায় আসায় ১৯৭৪ সাল হতে বোরো মৌসুমের আগে অর্থাৎ পৌষ মাসেই প্রতিবছর নিয়মিত ঘোড়দৌড়মেলা অনুষ্ঠিত হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ঘোড়দৌড়-ময়দানে ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা তেমন হয়নি; শুধু পুরোনো ঐতিহ্য বহন করে যথানিয়মে মেলা বসেছে।

মেলাটি ১৯৬৭ সাল থেকে সরকারিভাবে নিলামে ডাক হয়ে আসছে। ১৯৮৫ সালে ডাক হয়েছিল ৫২ হাজার টাকা। মেলার আয় স্থানীয় স্কুল-কলেজের ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুদান হিসেবে দেয়া হতো। এজন্য কাজ করতো একটি মেলা-পরিষদ।

এ ঘোড়দৌড়মেলা অতীতের ঐতিহ্য নিয়ে প্রতিবছর এলাকাবাসীর কাছে ঘুরে ঘুরে আসবে, এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সঠিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে অশ্লীলতাসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকা- বেড়ে যাওয়ায় শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী এ মেলাটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

এই মেলা ধর্মীয় হলেও বিহারের চারপাশে রাস্তায়, খোলাস্থানে নানা প্রকার খাবার দোকান, খেলনা-চুড়ি-ফিতার দোকান বসে। কুমোরেরা মাটির তৈরি হাড়ি পাতিল, খেলনা, হাতি ঘোড়া ইত্যাদির দোকান খুলে বসে। রাতে নাটক, গানের আসর হয়। পূর্বে যাত্রা, সার্কাসও হতো। একারণে মেলা ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত চলত। এ মেলায় রামুর জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ যোগদান করে আনন্দ উপভোগ করত। বর্তমানেও এ মেলা চালু আছে। তবে ২/১ দিনের বেশি স্থায়ী হয় না।"[১০]

## ১০. রামকুট মেলা বা রাংকুট মেলা

রাংকুট বা রামকুট তীর্থধামকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে প্রতিবছর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের মেলা বসে চৈত্র মাসে বাসন্তি পূজা উপলক্ষে রাম নবমীতে। বৌদ্ধদের মেলা বসে বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে। এই মেলাগুলোতে অন্যান্য মেলার

www.pathagar.com

মতো নানা রকম দোকান পাঠ বসে। এছাড়া মাঝে মধ্যে সার্কাস, পুতুলনাচ, নাগরদোলা প্রধান আকর্ষণ হয়ে আসে। তখন এতে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে। মেলা সাধারণত ২/১ দিনে শেষ হয়। তবে মাঝে মধ্যে ৭ থেকে ১৫ দিনও স্থায়ী হয়।"[১১]

## তথ্যনির্দেশ

১. বিপুল সেন, পিতা : ইন্দ্র সেন, মাতা : বিন্দু রাণী সেন, বয়স : ৫৬ বছর, গোল দিঘীর পাড়া, কক্সবাজার পৌরএলাকা, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২২-১০-২০১৩, সময় : রাত- ১০ট।

২. বাংলাদেশের উৎসব- খোন্দকার রিয়াজুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪০৷ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২০-২১।

৩. বিপুল সেন, পিতা : ইন্দ্র সেন, মাতা : বিন্দু রাণী সেন, বয়স : ৫৬ বছর, গোল দিঘীর পাড়া, কক্সবাজার পৌরএলাকা, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২২-১০-২০১৩, সময় : রাত- ১০ট।

৪. ধনিরাম বড়ুয়া (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, হালদারকূল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়), পিতা : তেজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, মাতা : কেশীবালা বড়ুয়া, বয়স : ৬৮ বছর, গ্রাম : শ্রীধন পাড়া, ইউনিয়ন : ফতেখারকূল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৯-১২-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।

৫. মাহমুদুর রহমান মাহমুদ, পিতা : আলী হোসেন, মাতা : নুরুন্নাহার, বয়স : ৫১, গ্রাম : দক্ষিণ কাকারা, ইউনিয়ন : কাকারা, উপজেলা : চকরিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১৩-০১-২০১৩, সময় : সকাল-১১টা।

৬. কবি রুহুল কাদের বাবুল, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, কালারমারছড়া ইউনিয়ন পরিষদ, কালারমারছড়া, উপজেলা : মহেশখালী, জেলা : কক্সবাজার, বয়স : ৫৮ বছর, তারিখ : ১১-১১-২০১৩, সময় : বিকাল ৫টা।

৭. বাংলাদেশের উৎসব- খোন্দকার রিয়াজুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪০৷ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৮।

৮. বিপুল সেন, পিতা : ইন্দ্র সেন, মাতা : বিন্দু রাণী সেন, বয়স : ৫৬ বছর, গোল দিঘীর পাড়া, কক্সবাজার পৌরএলাকা, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২২-১০-২০১৩, সময় : রাত- ১০ট।

৯. ধনিরাম বড়ুয়া (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, হালদারকূল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়), পিতা : তেজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, মাতা : কেশীবালা বড়ুয়া, বয়স : ৬৮ বছর, গ্রাম : শ্রীধন পাড়া, ইউনিয়ন : ফতেখারকূল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৯-১২-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।

১০. ধনিরাম বড়ুয়া (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, হালদারকূল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়), পিতা : তেজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, মাতা : কেশীবালা বড়ুয়া, বয়স : ৬৮ বছর, গ্রাম : শ্রীধন পাড়া, ইউনিয়ন : ফতেখারকূল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৯-১২-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।

১১. 'শতবর্ষের ঐতিহ্যের অনুষঙ্গী ঘোড়দৌড়মেলা' : এস কে এইচ সব্বির আহমদ; 'কক্সবাজার বিচিত্রা', সংখ্যা ১৪, অক্টোবর ২০০৬; পৃষ্ঠা- ২৩।

www.pathagar.com

# লোকাচার

"বাঙালি হিন্দু-বৌদ্ধ বঙ্গীয় এলাকার প্রাচীন অধিবাসী। মুসলমানেরা পরে আসে এবং হিন্দু-বৌদ্ধদের অনেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়। তাই মুসলমানদের বিয়ে-শাদিতে ও অন্যান্য আচরণে বহু লৌকিক প্রথা ও সর্ব ধর্মীয় সামাজিক আচারের প্রভাব থেকে যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজে এবং মুসলমানদের কিছু অংশেও বিয়েতে মাঙ্গলিক প্রতীক হলো মঙ্গলঘট ও বরণকুলা বা ডালা। বাড়ির প্রবেশপথে দুটি কলাগাছ পুঁতে এর গোড়ায় দুটি পানিভর্তি কলসি স্থাপন করা হয় এবং কলসির ভিতর আমপাতা রেখে মঙ্গলঘট সাজানো হয়। প্রজননশক্তির প্রতীক হিসেবে কলসির উপর ডাব কিংবা নারকেল রাখার প্রথাও আছে।

বাংলা তথা ভারতীয় ইসলামে মধ্যযুগে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। মুহররম উৎসবের যে জাকজমকপূর্ণ উল্লাস তা হিন্দুদের পূজা-পার্বণের মতো। তাজিয়া নির্মাণ এবং দশম দিবসে মঞ্জিল ও মুসলমানদের পীরভক্তি, পীরের দরগায় উরস পালন, আউলিয়া দরবেশের মাজারে জিয়ারত উপলক্ষে অনুষ্ঠান ইত্যাদি হিন্দুদের তীর্থস্থানের অনুষ্ঠানের মতো পালন করা হয়। বাংলাদেশের গ্রামে অশিক্ষিত মুসলমানগণ হিন্দুদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি তর্পণের মতো মুসলমানগণ বিপদ-আপদ থেকে রক্ষায় পীরদের সাহায্য ও প্রভাব স্বীকার করে। বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলমানদের পীর ছিল জিন্দাহ্ গাজি বা কালু গাজি আর নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কালু গাজিকে বাঘের দেবতা কালু রায় হিসাবে মানে।

গ্রামের নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওলা ও শীতলা দেবীর পূজা করতো এবং তাদের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য গ্রামপ্রান্তে বা বট গাছের তলে নানা খাদ্য রেখে আসতো। মুসলমানেরাও এসব বিশ্বাস করতো এবং কুসংস্কার মানতো। অসুখ-বিসুখে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণে মুসলমানেরা সদকা দিত ও মানত করতো। মুসলমানদের বিবাহে পণপ্রথা ও যৌতুকের টাকা আদান-প্রদান হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে প্রচলিত হয়।"[১]

"প্রাচীনকাল থেকে কক্সবাজারের হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে-শাদি ও শুভ কাজে মাঙ্গলিক প্রতীকরূপে বরণকুলা বা বরণডালার বহুল প্রচলন।

বরণকুলাকে স্থানীয়ভাবে পাঁচকুলা বলা হয়। কক্সবাজারে পাঁচকুলা বা বরণকুলা হাতে নিয়ে নতুন বধু বা নতুন বরকে বরণ করা হয়। বিয়ের সময়, মেয়ে সাজানোর সময় প্রয়োজন এই পাঁচকুলা বা বরণকুলা। নতুন অতিথিকে বরণ করতে এই বরণকুলা অত্যাবশ্যক। নতুন গৃহের পত্তন বা নির্মাণকাজ শুরু উপলক্ষে 'হুত্তুর' দেয়া ও ঘরে প্রবেশ উপলক্ষে এবং বিদেশ যাত্রাকালে এবং সওদাগরেরা নববর্ষের হালখাতা উপলক্ষে পাঁচকুলা বা বরণকুলা বা মঙ্গলঘট স্থাপন করে। এককথায় বলা যায়, প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি কক্সবাজারে শুভ মাঙ্গলিক প্রতীকরূপে পাঁচকুলা বা বরণকুলা অম্লান। তবে

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক সময়ে সংস্কারপন্থী মুসলমানদের আন্দোলনের ফলে মুসলমানসমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ পাঁচকুলা বা বরণকুলা অনৈসলামিক আচার বলে পরিত্যাগ করেছে। তবে জেলার বিয়ে-শাদিতে এখনো মাঙ্গলিক প্রতীকরূপে পাঁচকুলা বা বরণকুলার বহুল প্রচলন রয়েছে।

প্রাচীনকালে কক্সবাজারের হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সমাজে পাঁচকুলা বা বরণকুলার উপাদান অভিন্ন ছিল কিনা জানা যায় না।"[২]

আবহমান বাংলার বাঙালির জাতীয় জীবনে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে উপলক্ষ করে সম্প্রদায় বা জাতিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোকউৎসব পালন করা হতো এবং এসব উৎসব প্রাচীনকাল থেকে পালিত হয়ে আসছে। প্রাচীনকাল থেকেই জেলাবাসী মওসুমভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠানগুলো অতি ঘটা করেই পালন করতো। কোনো কোনো এলাকায় এখনো কিছু কিছু লোকাচার পালিত হয় বটে, তবে তাও পালনে নিরুৎসাহিত করা হয়। বিশেষ করে একদিকে ধর্মীয় বিধি-বিধান, অন্যদিকে আকাশ-সংস্কৃতি ও তথাকথিত আধুনিকতার আগ্রাসনে এলাকার ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি বৈচিত্র্য হারাচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, কৃষিভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠান, চিকিৎসা বিষয়ক আচার-অনুষ্ঠান, স্থানীয় ভাষার ব্যবহার, লোকছড়ার ব্যবহার এখন বলতে গেলে আমাদের কাছ থেকে প্রায় নির্বাসিত। প্রাচীনকালে আমাদের সমাজে যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হতো তার মধ্যে রয়েছে – মানসিক (মানত)/ শিরনি, সাধভক্ষণ, হাদিরখানা, অন্নপ্রাসন (মুখেভাত), খৎনা বা মুসলমানি, ষষ্ঠী, আকিকা, শিশুর জন্মের পর আজাদ বা শঙ্খধ্বনি বা উলুধ্বনি, চেহলাম, পূজা-পার্বণ, ব্রতসহ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এখানে এসবের কিছুটা বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করা হলো। এসবের বাইরেও যে আচার-অনুষ্ঠান নেই তা নয়।

## ১. মানসিক (মানত)/শিরনি

মানত হচ্ছে মানসিক মনোবাসনা সিদ্ধির জন্য ছদকা ভোগ বা বলিদান কিংবা বিশেষ ইবাদত ইত্যাদি করার সংকল্প করা। আরবি শব্দ 'মিন্নত' শব্দটি কিছুটা বিকৃত হয়ে হিন্দি ভাষায় 'মন্‌নত' হয়েছে। এখান থেকেই 'মানত' শব্দটি এসেছে। স্থানীয়ভাবে 'মানত'কে 'মানস' বলা হয়। ধর্মের প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা রেখে গ্রামের মুসলিমরা সেই প্রাচীনকাল থেকে গরু, ছাগল, শিরনি মানত করে আসছে। কোনো বিপদাপদ, সংকট, সমস্যা ও অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহর ঘরে (মসজিদ) শিরনি বা ছদকা হিসেবে গরু, ছাগল জবাই করে মুসল্লিদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রকাশ্য বা মনে মনে মানত বা মানস করা হয়। আবার কেউ কেউ মসজিদে চেরাগ বা বাতি দেওয়ার মানত করে। প্রাচীনকালে গ্রামের মসজিদে কেরোসিনের খুপি দিতেও দেখা গেছে। শুধু গ্রামের মসজিদ বললে তো শেষ হয়ে গেল না। শহর-বন্দরে যেখানে বিদ্যুৎ বা পৌর কর্তৃপক্ষের বাতি জ্বলে না সেখানে কেরোসিন দিয়ে খুপি জ্বালনো হতো। স্থানীয় ভাবে কেরোসিন বা ডিজেল আসার আগে পাহাড়ের গর্জনকাঠের তেল বা খির দিয়ে খুপি জ্বালানো হতো। দিন বদলের সাথে সাথে মসজিদে চেরাগের পরিবর্তে মোমবাতি ও দিয়াশলাই দিতে দেখা যায়। আবার কেউ কেউ নিকট বা দূরবর্তী কোনো মাজারে ছদকা বা শিরনি দেওয়ার মানত করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন জান তথা প্রা‌ের বদলে প্রাণী বলি দিয়ে থাকে। মসজিদ, মন্দির বা মাজারে দিয়াশলাই-

www.pathagar.com

মোমবাতি বা অর্থ-কড়ি দিয়ে থাকে। বিপদ কেটে যাক বা নাই যাক শিরনি মানত করলে দিয়ে দিতে হয়। এ লক্ষ্যে মুসলিমরা প্রতি শুক্রবার মসজিদে মানত বা মানস করা শিরনি পাঠিয়ে থাকে। আবার কোনো বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে 'ছদকা' দেয়া হয়। ছদকা হিসেবে গরু বা ছাগল দেওয়ার রীতিও কক্সবাজারে চালু আছে যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ছদকা হিসেবে গরু বা ছাগল দিতে না পারলে অন্তত মোরগ-মুরগি দেওয়া হয়। ছদকা হিসেবে গরু বা ছাগল জবাই করে তা ফকির, মিসকিনসহ সমাজের লোকজনকে খাওয়ানো হয়। সমুদ্রে মাছ ধরা যাদের পেশা তারা এবং সমুদ্রে চলাচলকারী নৌকা-সাম্পান-জাহাজের মালিকেরা বেশি বেশি মানত করে থাকে। সমুদ্র থেকে তার নৌকা ও জাহাজ যেন ছহিছালামতে ফিরে আসে সেজন্য মানত করে থাকে। এছাড়াও যন্ত্রচালিত যানবাহনের চালক এবং সেসব যানবাহনের মালিকেরা তাদের যানবাহন নিরাপদ রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মানত করে থাকে। আরবি শব্দ ছদকা অর্থ খয়রাত, সাহায্য দান বা দান করা। কিন্তু কক্সবাজার অঞ্চলে 'ছদকা' বলতে কোনো প্রাণী জবাই করে ফকির, মিসকিন বা প্রতিবেশী বা সামাজিদের খাওয়ানো বুঝায়। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে প্রাণী জবাই করে খাওয়ানোর বিধান কোথা থেকে চালু হয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি। আবার মুসলিম-পরিবারে নতুন গাছে যেকোনো ধরনের ফল ধরলে প্রথম ফলটি মসজিদে দেওয়ার জন্যও মানত করে থাকে।"[৩]

কিছুদিন পূর্বেও সমাজের (শহুরে ও গ্রামের নির্বিশেষে সকল স্তরের) মুসলমান মায়েরা সন্তানের কল্যাণ ও শুভ কামনায় পীরের দরগায় শিরনি দেন ও মানত করেন। একইভাবে হিন্দু মায়েরাও সন্তানসহ আপনজনের মঙ্গল কামনায় কালীর দুয়ারে ধর্না দেন ও পূজাব্রত পালন করেন। আবার দেখা যায়, কোনো হিন্দু ড্রাইভার গাড়ি চালনার সময় পথের পাশে কোনো কালী মন্দির থাকলে গাড়ি থামায় ও হাত তুলে প্রণাম করে বা মন্দিরে চাঁদা বা অর্থ দেয়। ঠিক একইভাবে কোনো মুসলমান ড্রাইভার পথের পাশে পীর-দরবেশ ফকিরের মাজার বা দরগাহ দেখলে বাস থামায় ও টাকা-পয়সা দান করে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে-কোনো সম্প্রদায়ের ড্রাইভার যুগপৎ মন্দির বা দরগাহে টাকা দান করে বা সম্মান করে।"[৪]

## ২. সাধভক্ষণ/ হাদির খানা

সাধভক্ষণ মূলত হিন্দুসমাজের আচার। এই আচারের প্রচলন সেই সুদীর্ঘ কাল থেকে। সন্তানসম্ভবা নারীরা মূলত গর্ভে সন্তান নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়েন। তাই হিন্দুধর্মীয় বিধান মতে মৃত্যুপথযাত্রীকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হয়। মৃত্যুপথযাত্রী নারীকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী খাওয়ানোকেই সাধভক্ষণ বলে। সেই কারণেই গর্ভে সন্তান আসার পাঁচ/ছয় মাস পরে সন্তানসম্ভবা নারীকে তার পছন্দ বা রুচি মাফিক খাবার দেওয়া হয়। সন্তানসম্ভবা নারীকে তার পিতার বাড়ি থেকে এসব খাবার খাওয়ানো হয়। এসব খাবারের মধ্যে সাত প্রকারের ফলমূল প্রদান করা হয়। একই সাথে প্রদান করা সাত প্রকারের মিষ্টান্নদ্রব্য রয়েছে। এসব মিষ্টান্নের মধ্যে থাকে কালোজাম, সন্দেশ, মিহিদানা, আমৃতি, জিলাপি ও মিষ্টি।"[৫]

www.pathagar.com
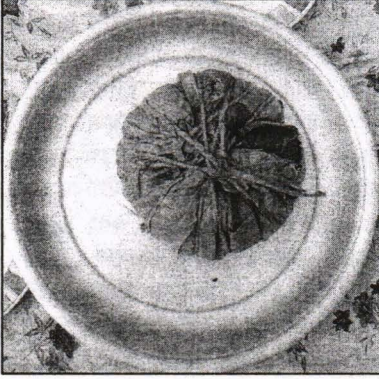
*কক্সবাজারে প্রাচীন কালে কলাপাতা দিয়ে তৈরি মুচা*

"মুসলমানসমাজে মেয়ের বিয়ের পরে কনের বাড়ি থেকে প্রায় সময়ে রকমারি খাবার তৈরি করে নতুন জামাই-এর জন্য প্রেরণ করা হয়। একই সাথে বিভিন্ন পিঠা বিশেষ করে ঋতুভিত্তিক পিঠা তৈরি করে কনের বাড়ি থেকে বরের বাড়িতে পাঠানো হয়। তবে নববধু যখন সাত মাসের গর্ভবতী হয় তখন তার জন্য পিতৃগৃহ হতে রকমারি খাবার যেমন–নানা রকম পিঠা-পুলি, কোর্মা, পোলাও, মাছের ফ্রাই, ডিম, দুরুচকুরা (মুরগির রোস্টকে কক্সবাজারে দুরুচকুরা বলে) সহ বিভিন্ন খাবার তৈরি করে নেয়া হয়। অবশ্যি এসব উপাদেয় খাবারের সাথে মরিচচুরা বা মরিচভর্তা, শুটকি ভর্তা, আমসত্ত, আচার, তেতুলের আচার, শুকনো বরই দেয়া হয়। একই সাথে কনের জন্য নেয়া হয় নতুন কাপড়-চোপড়, নারিকেল তৈল ইত্যাদি নিয়ে কনের ছোট বোন বা ছোট ভাই, ভাবী, নানি বা দাদি সকলেই আনন্দ-উল্লাস করে তালইর (কনের শাশুড় বাড়ি) বাড়িতে বেড়াতে যায়। কনের পিতৃগৃহ থেকে আনা সব খাবার থেকে একটু একটু করে অন্তঃসত্তা বধুকে খাওয়ানো হয়। কনের দাদি, নানি বা ভাবীরা মূলতঃ কনেকে এসব খাইয়ে থাকে। এভাবে গর্ভবতী কনেকে খাওয়ানকে 'হাদি খাওয়ান' বলে। এই হাদির খানা দেয়ার সময় কোন কোন বিত্তশালী পরিবারের পক্ষ থেকে বরের জন্য নতুন কাপড়-চোপড়ও দেয়া হয়।

হাদি খাওয়ান একটি লোকজ আচার হলেও গ্রামাঞ্চলে যারা অর্থশালী এবং যাদের প্রাচুর্যেরও অভাব নেই তারাই এ আচারটি বর্তমানেও চালু রেখেছে। এ আচারটি জেলার হিন্দু, বড়ুয়া এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মভেদে কিছুটা পৃথক পৃথকভাবে চালু আছে। প্রবাদ আছে, সাত মাসের গর্ভবতীকে হাদির খাওয়া খাওয়ানো না হলে সন্তান জন্ম নেয়ার পরে শিশুর মুখ থেকে লালা পড়তে থাকে। এই লালা পড়ার অর্থ হচ্ছে গর্ভে সন্তান থাকা কালে গর্ভবতী তার পছন্দের খাবার খেতে পারেনি বলেই শিশুর মুখ থেকে লালা পড়তে থাকে। ফলে সাত মাসের গর্ভবতীকে কনের বাড়ি থেকে হাদির খানা দেয়া না হলেও তার যে-কোনো আত্মীয়-স্বজন এই হাদির খাওয়ার ব্যবস্থা করে।"[৬]

www.pathagar.com

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুসলমানসমাজে সাত মাসের পোয়াতি মেয়েদেরকে তার বাবার পরিবারের পক্ষ থেকে বিশেষ ধরনের খাবার দেওয়া হয়। 'হাদির খানা' নামের এই খানাতে বিভিন্ন পদের তরকারি থাকে। এই নিয়ে এ অঞ্চলে রয়েছে লোকছড়া। যেমন–

"পাঁচঅ মাসের কালে যাদু, পঞ্চ ফুল ফোটে।
ছয়অ মাসের কালে যাদু, ওলটে পালটে।
সাতঅ মাসের কালে যাদু, হাদির খানা খায়।
আটঅ মাসের কালে যাদু, মোকামেতে যায়।"[৭]

লোকখাদ্য কেবল মানুষের জীবন ধারণের সঙ্গে যুক্ত নয়, ভৌগোলিক পরিবেশ, নানা লোকাচার এবং উৎসব-অনুষ্ঠানের সঙ্গেও এর রয়েছে গভীর সংযোগ। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও লোকবিশ্বাসের ভিত্তিতে লোকখাদ্যাভ্যাসে গড়ে উঠেছে নানা বিধিনিষেধ। কক্সবাজারে লোকখাদ্যে সমুদ্র, পাহাড়, সমতল ও নদীর প্রভাব যেমন লক্ষণীয়, তেমনি লক্ষণীয় বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রভাব।

## ৩. অন্নপ্রাশন (মুখে ভাত)

হিন্দু সম্প্রদায়ের শিশুদের মুখে প্রথম অন্ন দেয়ার আনুষ্ঠানিকতাকে অন্নপ্রাশন বলা হয়। হিন্দু-পরিবারে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুর মুখেভাত বা অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। শিশুর বয়স যখন আট থেকে দশ মাস হয় তখন অনেকটা ঘটা করে মুখে ভাত দেয়া বা অন্নপ্রাশনের আয়োজন করা হয়। ব্রাহ্মণের মাধ্যমে একটি শুভ লগ্ন দেখে শিশুর মুখে অন্ন দেয়া হয়। এ উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হয় এবং সুস্বাদু ভোজের আয়োজন করা হয়। পুত্রসন্তানের বয়স ছয় মাস এবং কন্যাসন্তানের বয়স পাঁচ অথবা আট মাস বা দশম মাস পূর্ণ হলে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্ন ভোজন করানো হয়ে থাকে। কথিত আছে, "দাঁতে ভাতে মুখে ভাত" দেওয়া শিশুর জন্য মঙ্গলজনক নয়। অর্থাৎ মুখে দাঁত গজাবার পূর্বেই শিশুর মুখে ভাত দিতে হবে।
ব্রাহ্মণের মাধ্যমে পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ ঠিক করে অন্নপ্রাশনের শুভ সময় নির্ধারণ করা হয়। কেউ বৃদ্ধির শ্রাদ্ধ করে আবার কেউ মন্দিরে গিয়ে বিষ্ণু পূজার প্রসাদ দিয়ে ভোগ দিয়ে অন্নপ্রাশন করে। মুদ্দা কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পরেই মায়ের দুধ বা দুধ পান করেই অভ্যস্ত। সন্তানের মুখের রুচি পরিবর্তনের জন্যই অন্নপ্রাশন করাতে হয়।"[৮]

## ৪. খৎনা বা মুসলমানি

মুছলমানি বা খৎনা মুসলিমসমাজের জন্য ইসলাম ধর্ম স্বীকৃত একটি আবশ্যকীয় সামাজিক আচার। ইসলামি বিধান বা রীতি অনুসারে সাধারণত ৫ থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলে বা কিশোরের লিঙ্গের অগ্রভাগ ঢেকে রাখা অংশকে কেটে ফেলে দেয়ার আনুষ্ঠানিকতাকে খৎনা বা সুন্নত কাজ বা মুসলমানি করা বলা হয়। পূর্বে এ আচারটিও আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে অত্যন্ত ঘটা করে পালিত হতো। তবে বর্তমানে পূর্বের মতো জাঁকজমকের সাথে উক্ত অনুষ্ঠানটি পালন করা হয় না। এটা অনেকটা ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের মতো। তবে মানুষের রুচি এবং আনন্দবোধের উপর ভিত্তি করে এ অনুষ্ঠানের

www.pathagar.com

পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু মূলধারার কোনো পরিবর্তন হয়নি, হবেও না। খৎনা মুসলমানদের পর্ব। এ পর্ব অন্য কোনো জাতির নেই। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যক্তিক্রমও আছে। মুসলমান ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিশুদের খৎনা করার প্রচলন দেখা যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক কারণে খৎনা করা হলে শিশুবয়সে ছেলেদের এই খৎনা (কক্সবাজারের ভাষায় মুছলমানি) করাতে হয়। যারা শিশুদের লিঙ্গের অগ্রভাগ কেটে মুসলমানি করায় তাদেরকে স্থানীয়ভাবে 'হাজাম' বলা হয়। আগে গ্রাম্য হাজামেরা খৎনা করাতো ছেলেদের। খৎনা গৃহে নিমন্ত্রিত হয়ে দুলাকে (শিশুটিকে) আতর সুগন্ধি মেখে স্নান শেষে পাঁজাকোলা করে হাজামের সামনে নিয়ে রাখা হতো। হাজাম একটি ধারালো ক্ষুরের সাহায্যে দুলার পুরুষাঙ্গের নিচের চামড়ার সামান্যটুকু কেটে দিয়ে তাতে ছাইভস্ম লাগিয়ে দিতো। শুকনো খড় পুড়িয়ে ছাইভস্ম তৈরি করা হয়। অনেক সময় বাঁশের ধারালো ছুরি তৈরি করে তা দিয়ে খৎনা করানো হতো। বাঁশের ধারালো ছুরি বলতে মূলত দা দিয়ে শিবাবাঁশ বা বরাক বাঁশের নীল চামড়াটুকু তুলে ছুরি বা ব্লেডের মতো ব্যবহার করা হতো। বাঁশের উক্ত ছুরি অত্যন্ত ধারালো। ফলে উক্ত ছুরি দিয়ে শিশুর পুরুষাঙ্গের নরম চামড়াটুকু কাটতে অসুবিধা হয় না। খৎনা করা শেষ হলে দুলাকে (যে শিশুর খৎনা করা হয় তাকে দুলা বলা হয়) অন্যত্র একটি বিছানায় শুইয়ে দেয়া হতো, যাতে সে পা দুটো ফাঁক করে এলিয়ে দুপাশের দুটো মাটির পাতিল বা বালিশের উপর ভর করে রেখে দিতো। এভাবে ৫/৭ দিন কেটে যেতো। দুলাকে বাইরে কোথাও যেতে দিতো না। দুলার বাম হাতে লোহার একটি খাডু পরিয়ে দেয়া হতো। যেন কোন অশুভ শক্তি তার উপর নজর ফেলতে না পারে। খৎনা উপলক্ষে গৃহস্থ-বাড়িতে উৎসবের ধুম পড়ে যেতো। আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশিদের দাওয়াত দেয়া হতো। অভ্যাগত অতিথিরা দুলার জন্য নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে যেতো। সামর্থ অনুসারে দুলার (শিশুর) পরিবার গরু, মহিষ অথবা ছাগল জবাই করে তৃপ্তি সহকারে অতিথিদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে। পশু জবাই করতে না পারুক ঘরে মোরগ-মুরগিতো আছেই। তাও না পারলে বাজার থেকে পরিমাণ মতো গোস্ত কিনে আনতে হবে মেহমানদের আপ্যায়ন করতে। আপ্যায়নের পাশাপাশি গুল্ডা বা গোন্দা (আতসবাজি) বা পটকা ফাটিয়ে, কলের গান অথবা হঁওলা, নাচে ভরিয়ে তুলতো বাড়ির প্রাঙ্গণ। এসবই করা হয় মূলত একটি উৎসবভাব ফুঁটে তোলার জন্য। খৎনার মূলধারা বা মূল নিয়ম ঠিক থাকলেও পরিবর্তন এসেছে খৎনার পরিবেশে। উৎসাহ উদ্দীপনাও সর্বত্র ভিন্ন রূপ নিয়েছে। এখন আর হাজাম দিয়ে খৎনা বা মুছলমানি করা হয় না। ডিগ্রিধারী চিকিৎসকরা শিশুদের খৎনা করায়। ফলে খৎনা করার পরে যাতে শিশুর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা না দেয় সে দিকে নজর রাখা হয়। পূর্বে ব্লেড বা বাঁশের ছুরি দিয়ে খৎনা করার ফলে অনেক সময় শিশুর বিভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতো। এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সারাবার জন্য যেতে হতো বৈদ্য বা কবিরাজ বা ওঝার কাছে। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত আছে খৎনা না করালে সেই শিশু মুসলমান হয় না। অর্থাৎ খৎনা করার পরে কোনো শিশু মুসলমানিত্ব লাভ করে। স্থানীয়ভাবে একটি প্রবাদ আছে, 'হাজাইম্ম্যারে ছালাম দিলে যেই, ন দিলেও হেই। যদ্দুর দরকার হেদ্দুর কাড়িব হাজাইম্মা'। শিশুর পুরুষাঙ্গের সামনের অংশের চামড়া কেটে মুছলমানি করার পূর্বে

www.pathagar.com

শিশুটিকে যখন হাজাইম্‌মার সামনে নিয়ে বসানো হয় তখন হাজাইম্‌মাকে সালাম দিতে হয়। সালাম না দেয়া আইপের (হাজইমার জন্য অপমানজনক) কথা। হাজাইমমাকে সালাম দিলে যতটুকু কাটা দরকার ততটুকু কাটবে, আর সালাম না দিলেও ততটুকু কাটবে। এই প্রবাদটি ঠাট্টার ছলে বলা হয়।"[৯]

মুসলমানি বা খৎনা করানো উপলক্ষে শিশুর বাড়িতে ভোজের আয়োজনের পাশাপাশি সমগ্র বাড়ির অভ্যন্তর ও বাইরের প্রাঙ্গণ রঙিন কাগজ ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়। কোনো বনেদি বা বিত্তশালী পরিবারে শিশুকে খৎনা করার পূর্বে পালকি বা 'থানজান' নিয়ে গ্রামের মধ্যে ভ্রমণ করানো হয়। এসময় শিশুর সাথে দাদি-নানি বা দাদা-নানা বা ছোটবোনকে রাখা হয়। শিশুর খৎনা উপলক্ষে শিশুর নানার বাড়ি থেকে সাধ্যমতো উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

## ৫. ষষ্ঠী

কোনো পরিবারে সন্তানের আগমন অত্যন্ত আনন্দের, সেই পরিবার বিত্তবান হোক বা হোক তিনি ভিক্ষুক। ভিক্ষুক হলেও সন্তান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পরে কী খাবে, কোথায় থাকবে, কীভাবে বেড়ে উঠবে এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। সন্তান জন্ম গ্রহণের ৬দিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রসূতির কাপড়-চোপড় ধৌত করা, বিছানা ও ঘর পরিষ্কার করা, শিশুর মাথা মুণ্ডন করা, প্রসূতিকে স্নান করানো আচার অনুষ্ঠানের রীতিকে বলা হয় 'ষষ্ঠী'। এছাড়াও নরসুন্দরকে দিয়ে প্রসূতির দুহাতের নখ খেউড়ি করাতে হয়। খেউড়ি হচ্ছে মূলত হাতের নখকে লৌহনির্মিত ধারালো দা বা ছুরি বা খুর দিয়ে নখকে পরিষ্কার করা। খেউড়ির পরে সাঁঝের বেলায় ষষ্ঠীর জন্য মৃত্তিকা দিয়ে ষষ্ঠী দেবতা (হাইট) তৈরি করে ১০৮টি বইল গাছের পাতা, সাথে খৈ, মুরি বা ছন আগুনে পুড়িয়ে ১০৮টি নাম রাখা হয়। নাম রাখার পরে যে নামটি সবার পছন্দ সেটিই নবজাতকের নাম ধার্য করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থশালী পরিবারের শিশুদের নাম রাখার জন্য ১০৮টি মুছি (ছোট্ট) প্রদীপ বা সমসংখ্যক মোম জ্বালানো হয়। নবজাতক মেয়ে সন্তান হলে ৬দিনেই ষষ্ঠী করতে হয়। আর নবজাতক ছেলে হলে ৭দিনে ষষ্ঠী করতে হয়। ধাত্রীকে নবজাতকের পরিবারের পক্ষ থেকে কাপড়-চোপড় এবং দক্ষিণা দিতে হয়।"[১০]

## ৬. আকিকা

আকিকা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের বিধান মতে নবজাতক শিশুর নামকরণ উপলক্ষে গরু, ছাগল বা পশু বা মোরগ-মুরগি জবাই করে ভোজ অনুষ্ঠান। আরবি শব্দ 'অক্বীক্বঃ' হতে 'আকিকা' শব্দের উদ্ভব। আকিকা শব্দের বাংলা অর্থ 'বদলা' বা 'প্রতিদান'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে একটি সন্তান দান করেছেন তার প্রতিদান বা বদলাই হচ্ছে আকিকা। ইসলাম ধর্মের নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণে ছেলে বা মেয়ে সন্তানদের ভবিষ্যত মঙ্গল কামনায় দেয়া হয় এই আকিকা। আকিকায় গরু, ছাগল, মহিষ বা পশু জবেহ করে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, ভিক্ষুকসহ সহায়-সম্বলহীন লোকজনকে

www.pathagar.com

পেটভরে খাওয়ানো হয় এবং সমাজে যারা অসহায় দরিদ্র তাদের মধ্যে আকিকার গোস্ত বন্টন করে দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, আকিকার গোস্ত পিতা-মাতা খাবার হিসেবে গ্রহণ করেন না। যদিও বলা হয় নামকরণ উপলক্ষে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নামকরণের পরেও আকিকা দেওয়া বৈধ। কেউ কেউ মনে করেন, আকিকা অনেকটা ছদকার মতো। কষ্ট সহ্য করে মাতা সন্তান প্রসব করেন। সেই সন্তানটি সুস্থ-সবল হয়ে ওঠে। সন্তান যে মাতৃগর্ভ থেকে সুস্থভাবে পৃথিবীতে আগমণ করেন সেই জন্যই সন্তানের জন্য ছদকা স্বরূপ আকিকা প্রদান করা হয়। বিত্তবান পরিবারের পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য আকিকা হিসেবে গরু, ছাগল বা পশু জবাই করা হয়। আবার যাদের পক্ষে একটি গরু বা ছাগল প্রদান করা সম্ভব হয় না তাদের ক্ষেত্রে একটি গরুকে সাত ভাগ করে একভাগ প্রদান করলে আকিকা আদায় হয়ে যাবে। গরুর ভাগ না হলে একটি ছাগল আকিকা হিসেবে জবেহ করে খাওয়ানো হলে আকিকা আদায় হয়। আকিকাতে আমন্ত্রিত অতিথিরা ভোজনপর্বে অংশগ্রহণ করে সাধ্যমতো উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। ইসলামের বিধান মতে সন্তান জন্ম গ্রহণের সপ্তম দিনেই আকিকা দিতে হয়। সন্তানের নামকরণের সাথে সাথে আকিকা আদায় করা সুন্নাত। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে না পারলে ১৪তম দিনে, আর না পারলে ২১তম দিনে আকিকা আদায় করতে হবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে জীবনের যে-কোনো সময় আকিকা প্রদান করা যাবে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব, আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সা. নবুয়াত প্রাপ্তির পরে অর্থাৎ ৪১ বছর বয়সেই উট জবাই করে নিজের আকিকা নিজেই প্রদান করেছিলেন।"[১১]

## ৭. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি

শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পরে মুসলমানসমাজে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। শিশুর ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে নাড় কাটা শেষ করে শিশুকে ঘরের বাইরে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আজান দেয়া হয়। আজান শেষ করে শিশুর কানে ফুঁ দেয়া হয়। কানে ফুঁ দেওয়ার পেছনের কারণ হচ্ছে আজানের ধ্বনি এবং আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা স.-এর নাম শিশুর কাছে পৌঁছে দেয়া। পরে শিশুর গোছল শেষে বর্ষাতি বা জুঁইর-এর উপরে শিশুকে শুইয়ে দিয়ে লাজ-লজ্জার পানি ছিটানো হয়। পানির কলসিতে সোনা-রূপা চুইয়ে, পাইন্যা ফুল ভিজিয়ে সেই পানিই শিশুকে ছিটানো হয়। এই লাজ-লজ্জার পানি ছিটানো হতো বিশেষ করে শিশুটি বড় হলে যাতে তার মধ্যে লাজ লজ্জার ভাব থাকে। বর্তমানে দেখা যায় উঠতি তরুণদের মধ্যে এই লাজ লজ্জার বিষয়টি মোটেই উঠে গেছে। ফলে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা এইসব তরুণদের বলে থাকে 'তোর পিতা-মাতা বা মুরব্বিরা তোকে লাজ লজ্জার পানি ছিটায় নি।'

বর্ষাতি বা জুঁইরের (জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা কুরুপ পাতা দিয়ে স্থানীয়ভাবে জুঁইর তৈরি করা হয়। এছাড়াও গামারি গাছের পাতা দিয়েও জুঁইর তৈরি করা যায়) উপর রেখেই শিশুর মুখে মধু দেয়া হয়। গ্রামের মানুষের মাঝে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে শিশুকে মধু না খাওয়ালে শিশু বড় হয়ে মানুষের সাথে মধুর স্বরে কথা বলবে না। কোনো শিশু বড় হয়ে মানুষের সাথে খারাপ আচার-আচরণ করলে বা কর্কশ স্বরে কথা বললে মানুষ কথায় কথায় জানতে চায় 'তোর মা-বাবা তোকে মধু খাওয়ায় নি?' তবে এই মধু

www.pathagar.com

খাওয়ানোকে নিয়ে রয়েছে ভিন্নমত। আর তা হচ্ছে, 'শিশুটি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে শিশুর মুখে গলায় ও বুকে থাকে প্রচুর পরিমাণ কফ। এইসব কফ কেটে যাওয়ার জন্য হাতের আংগুলে করে শিশুর মুখে মধু ঢুকিয়ে দিয়ে শিশুকে মধু খাওয়ানো হয়। মুসলমানদের বিশ্বাস মতে নবজাতককে জন্মের পরেই মধু খাওয়ানো ছুন্নত। কেননা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা স. এক শিশুর জন্মের পরেই একটি খেজুর দাঁতে পিষে মিষ্টি রস বের করে নবজাতককে খাইয়ে দিয়েছিলেন।
শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার এক সপ্তাহ পরে মাথার চুল ফেলে দিতে হয়। নবজাতকের মাথার চুল ফেলাকে কেন্দ্র করেও আয়োজন করা হয় আনুষ্ঠানিকতা। অনেকটা ঘটা করেই শিশুর চুল ফেলা হয়। এসব আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে রয়েছে, যেদিন শিশুর চুল ফেলা হবে সেদিন বাড়ির বা মহল্লার নির্দিষ্ট নাপিত (নরসুন্দর) (বিগত দুই দশক পূর্বেও কোনো কোনো বনেদি পরিবারে, আবার কোনো কোনো মহল্লায় ও প্রতিপাড়ায় একজন নির্দিষ্ট নাপিত রাখা হতো। প্রতি সপ্তাহে উক্ত নাপিত পরিবারে বা মহল্লায় এবং পাড়ায় গিয়ে চুল-দাড়ি কাটাসহ ক্ষৌরকর্ম করে দিতো। তবে বর্তমানে আধুনিকায়নের ফলে এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে লোকজন সেলুনে গিয়ে চুল-দাড়ি কাটার ব্যবস্থা করে।) যথাসময়ে বাড়ি আসবে। নাপিত শিশুর চুল ফেলার জন্য 'পাট' বা পিড়ি নিয়ে বসবে। নাপিত শিশুর চুল ফেলার কাজ শুরুর পূর্বেই তার বকশিসের টাকা চেয়ে নেবে। বিশেষ করে শিশুর মা-বাবার কাছ থেকে এই টাকা চেয়ে নেবে। শিশুর মা-বাবা ছাড়াও দাদা-দাদি, নানা-নানিসহ নবজাতকের নিকট আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা চেয়ে পাঠাবে। টাকা না পাওয়া পর্যন্ত শিশুর মাথার চুল ফেলবে না। আবার অনেক সময় মাথায় চুল একটু করে রেখে দিয়ে নাপিত টাকার বায়না ধরে। টাকা না পাওয়া পর্যন্ত আর চুল ফেলবে না। ফলে নাপিতের সাথে বাধ্য হয়ে সমঝোতায় যেতে হয়। নাপিতের সাথে দাদা-দাদিরাই দেন-দরবার করে যতদূর সম্ভব টাকা নাপিতের হাতে তুলে দেয়। টাকা পাওয়ার পরেই নাপিত মাথার অবশিষ্ট চুল ফেলার ব্যবস্থা করে। শিশুর চুলকে মনে করা হয় 'নাপাক' বা অপবিত্র। তাই নাপিত তার চুল কাটার খুরসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি পার্শবর্তী নদী বা ছড়া থেকে ভালো করে ধুয়ে নেবে এবং সে নিজেও গোসল সেরে বাড়ি ফিরে যাবে। নবজাতকের মাথার চুল ফেলার দিন ধার্য হলে শিশুর নানা-নানি বা অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেয়া হয়। শিশুর চুল কাটা শেষ হলে বাড়ির যাবতীয় কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে ধুঁয়ে দিতে হয়। এমনকি ঘরের ফ্লোর পর্যন্ত নতুন করে লেপার ব্যবস্থা করা হয়। একই সাথে বাড়িতে আয়োজন করা হয় ভালো খাবারের। বিত্তবান লোকজনের বাড়িতে মোরগ বা ছাগল জবাই করে আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। নবজাতকের মাথার চুল ফেলাকে 'ফুইত কামা' বলা হয়। তবে জেলার কোথাও কোথাও 'হুদ কামা' বলে। প্রকৃত অর্থে 'হুদকামা'কেই স্থানীয়ভাবে 'ফুইতকামা' বলে।

এইতো গেলো শিশুর চুল ফেলানো। এর পরে শিশুর মুখে ভাত দেয়ার জন্যও রয়েছে পৃথক অনুষ্ঠানের। মুসলমান সমাজে তেমন কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও হিন্দু সম্প্রদায় শিশুর মুখে ভাত দেয়ার জন্য আয়োজন করে থাকে আনুষ্ঠানিকতার। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'অন্নপ্রাশন'।

www.pathagar.com

শিশুর জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে রয়েছে স্থানীয়ভাবে একটি লোকগীত। [১৯৮৪ সালে গীতটি আমি কক্সবাজার সদর উপজেলার ঈদগাঁও ইউনিয়নের দক্ষিণ লরাবাগ গ্রামের কবির আহমদ পণ্ডিত (তখন বয়স ছিল ৪৫ বছর। তিনি বর্তমানেও জীবিত আছেন)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করি। কবির আহমদ পণ্ডিত নিজেও এধরনের গান সৃষ্টি করেছেন। তবে এটা তাঁর রচিত গান নয়। তিনি এই গীতটি শুনেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেয়েছেন।]

উক্ত গীতটি সংগ্রহ করার পরে আমি কবিতাটির শিরোনাম দিয়েছি 'জন্ম-বৃত্তান্ত'। কবিতাটি নিম্নে দেয়া হল :

একঅ মাসের কালে যাদু, রক্ত ফোটা ফোটা
দুইঅ মাসের কালে যাদু, হাড্ডি মাংস জোরা [১]।
তিন মাসের কালে যাদু, চামড়া দিল ছানি[২]।
চাইরঅ মাসের কালে যাদু, পরাণ দিল আনি।
পাঁচঅ মাসের কালে যাদু, পঞ্চ ফুল ফোটে।
ছয়অ মাসের কালে যাদু, ওলটে পালটে।
সাতঅ মাসের কালে যাদু, হাদির খানা খায়[৩]।
আটঅ মাসের কালে যাদু, মোকামেতে যায়।
নয়অ মাসের কালে যাদু, নয়ে দণ্ড তিথি।
দশঅ মাসের কালে যাদু, দুনিয়াতে বসতি।
দশ মাস দশ দিন, হইলরে পুরনিত[৪]।
বিষ বেদনা মারে ধইল্লরে[৫] আচমবিত।
যাদু মনি হইত মায়ে, যত পাইল দুঃখ।
দুঃখ সুখে পাষরিল,[৬] দেখি যাদুর মুখ।
একঅ কাইয়া[৭] খাই ফেলাইয়ে, ঘু আর মুতে[৮]।
আর একঅ কাইয়া খাই ফেলাইয়ে, পুষ মাঘর[৯] শীতে।
মার চাইর বাপর চাইর, আল্লার দিয়া দশ।
আঠারঅ মোকামত মধ্যে, ফিরি মহা জশ।
এন আদরের পুত-ঝি, মা বাপ ধরি মারে।
হাশরর দিন দিব তারে, ওয়াইল দুজখর মাঝে।"[১২]

শব্দার্থ : ১. জোরা= জোড়া, ২. চামড়া দিল ছানি = হাড় এবং মাংসের উপর চামড়া দিয়ে আবৃত করা, ৩. হাদির খানা খায় = সাত মাসের সন্তান সম্ভাবা নারীকে পিতৃ পরিবার থেকে বা যে কোন আত্মীয় স্বজন সাত প্রকারের অধিক তরিতরকারি দিয়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেন। এসব তরিতরকারির মধ্যে মরিচ ভর্তা, শুটকির মাছের ভর্তা, পোলাও, মোরগ-মুরগির রোস্ট, ডিম, মাছ, মাংস ভুনা, শাক-সবজি উল্লেখযোগ্য। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত আছে সাত মাসে গর্ভবতী নারীকে ইচ্ছানুযায়ী খাওয়ানো না হলে তার জন্মের পর সন্তানের মুখ থেকে লালা পড়ে। সেজন্য 'হাদির' খাবারটা খুব গুরুত্ব সহকারে গর্ভবতী মেয়েদের খাওয়ানো হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পোয়াতিকে

www.pathagar.com

গর্ভধারণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্বাদের আহার খাওয়াতে হয়। সাত মাসে যে খাবার দেয়া হয় তাকে 'সাতকরাইয়া' বলে থাকে। বলতে গেলে সাত রকমের দানা বিশেষ করে বুট, তিসি, বাদাম, শিশুদানা প্রভৃতি পোয়াতীকে খাওয়াতে হয়। এতে ঐসব খাবারের গুণ গর্ভের শিশুও ভোগ করে থাকে। সেসব খাবার থেকে গর্ভাবস্থায় উক্ত শিশু প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করে। ৪. পুরণিত = পূর্ণ হওয়া, ৫. ধইল্লরে =ধরেছে। ৬. পাষরিল = ভুলে গেল; ৭. কাইয়া = শরীর; ৮. ঘু আর মুতে = পায়খানা ও প্রস্রাব; ৯. পুষ মাঘব = পৌষ-মাঘ মাসের।

## ৮. উলু ধ্বনি

গ্রামবাংলার হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ লোকাচার উলুধ্বনি। কোনো পরিবারে কোনো শুভ বা মঙ্গলজনক খবরের সৃষ্টি হলে বা দেখা গেলে পুরোবাসী মহিলারা সমস্বরে উলুধ্বনি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। উলুধ্বনি শুভ সূচনার বহিঃপ্রকাশ। কোনো পরিবারে শিশুর জন্ম হলে কোনো বাড়িতে নতুন অতিথি আসলে উলুধ্বনি প্রকাশের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। এ ছাড়া কোন আনুষ্ঠানিকতার শুভ সূচনা করতে এ উলুধ্বনির স্ফুরণ। নববধুর শুভ পদার্পণ এবং বাসর রাতের আরম্ভে উলুধ্বনি নিয়ে শুচিতা জানানো হয়। যখনই কোনো মঙ্গলজনক নির্ঘন্টের শুভ সূচনা দেখা দেয় তখনই উচ্চারিত হয় এ মঙ্গলধ্বনি। উলুধ্বনিই হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি চিরন্তন লৌকিক লোকাচার। এতে কোনো পরিবর্তন বা রুচির বিবর্তন নেই।"[১৩]

বৌদ্ধদের জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের অনুষ্ঠানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে উৎসবগত মিল থাকলেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন বৌদ্ধগৃহে নবজাতক মেয়ে হলে তিনবার আর ছেলে হলে পাঁচবার উলুধ্বনি দেয়া হয়। দোলনায় তোলার সময় নামকরণ এবং সে সঙ্গে ভিক্ষু ডেকে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়।

## ৯. চেহলাম

**খতম পড়া :** কোনো মুসলমান মারাত্মক রোগাক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে মৃত্যুশয্যায় সময় অতিবাহিত করতে থাকলে এবং যন্ত্রণার উপশম না হলে ধর্মপ্রাণ পরিবার তার রোগ মুক্তির জন্য খতমে কুরআন পাঠ করার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এ আয়োজনে ৪/৫ জন মৌলভী অংশগ্রহণ করে খতম পাঠ করে থাকে। ছাড়া অধিক পূণ্য হাসিলের নিমিত্তে রমজান মাসে তারাবির নামাজে কুরআন খতম করা হয়, এবং নানা রোগ মুক্তির জন্য পাড়ায় পাড়ায় খতমের পানি পড়া বিতরণ করা হয়। যে-কোনো মঙ্গলময় উদ্দেশ্য চরিতার্থে মুসলমানেরা খতম পাঠের আয়োজন করে থাকে। ব্যক্তিগত পূর্ণ ও উদ্দেশ্য হাসিলেও খতম পড়া হয়ে থাকে। মৃত মানুষের আত্মার শান্তি কামনায় এবং লৌকিক উন্নতিতে শোকরিয়া আদায়ে খতম পাঠ হয়।"[১৪]

**তাহলিল পড়া :** সদ্য মৃত কোনো মুসলমান নর-নারীর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে তাহলিল পড়ানো হয়। তাহলিল পড়ার কাজে ৭-৮ জন মৌলভী বা মাওলানা বা হাফেজে কুরআন অংশ নেন এবং ২ লক্ষ চব্বিশ হাজার বা ৩

www.pathagar.com

লক্ষ চব্বিশ হাজার বার মহান স্রষ্টার নামজপ করে মৃতব্যক্তির রুহের উপর ইছালে ছওয়াব বক্সিস করা হয়। তছবিহ জপের সময় নির্ধারিত সংখ্যক ছই বা শিম বীচি গণনার কাজে লাগানো হয়। বিশেষ আজাব মুক্তির জন্যও তাহলিল পড়া হয়।

**ফাতেহা বা ফৈত্যা :** মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফেরাত কামনায় ফাতেহা দোয়া করা হয়। মৃত্যুর চারদিন প্রথম ফাতেহা ও চল্লিশ দিনের ফাতেহা ছাড়া বাৎসরিক অনেকগুলো ফাতেহা রয়েছে। ফাতেহায় যুক্ত করা হয় রকমারি ফলমূল ও সুস্বাদু খাদ্যের। ধর্ম নিঃসৃত নিয়মে ফাতেহা পাঠ ও প্রার্থনা শেষে সবাই একসঙ্গে মিলে মিশে ভুরিভোজের ব্যবস্থা করে।

**মেজবান বা মেলা :** ধর্মীয় নীতিতে গরু, ছাগল বা মহিষ ও মোরগ-মুরগি জবেহ করে পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের ডেকে মৃত্যুর চল্লিশ দিনের মধ্যে মৃতের উদ্দেশ্যে মেজবান বা মেলা দেয়া মুসলমানদের একটি ধর্মীয় আচার। মেজবান দিয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশিদেরকে পশু জবাই করে খাওয়ানোটা চেহলাম। অবশ্য চেহলামের সাথে মৃতের রুহের সদগতি কামনা করে কুরআনখানি, দরুদ পাঠ, বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সম্ভব হলে ফকির-মিছকিনকে খাওয়ানোর পাশাপাশি নগদ টাকাকড়ি দান করা হয় মৃতের বিদেহী আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে। বিত্তশালী পরিবারগুলো মেজবান বা মেলা দিয়ে থাকে। এ মেলার উদ্দেশ্যও মৃতের শান্তি কামনা। স্থানীয়ভাবে মেজবান খাওয়ানোকেই 'মেলা দেয়া' বলে। এখানে মেলা বলতে কোনো কিছুর প্রদর্শনী নয়। ধনী-গরিব সকলেই মৃতের জন্য সাধ্যমত চেহলাম দিয়ে থাকে।"[১৫]

*কক্সবাজারে মেজবানের দৃশ্য*

www.pathagar.com

## ১০. শ্রাদ্ধ

দুর্গাপূজা হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। আগে জমিদার ও বিত্তশালী পরিবার দুর্গাপূজার আয়োজন করতো। কিন্তু বর্তমানে সার্বজনীন পূজার আয়োজন হয়। স্বরস্বতী পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদিও সার্বজনীনভাবে আয়োজন করা হয়।

নাথ বা যোগী সম্প্রদায় ছাড়া অন্য হিন্দুদের শবদাহ করা হয় এবং যোগীদের সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, পত্নী, ভাই, ভ্রাতৃবধু, ভাইপো প্রভৃতি সম্পর্কের লোকজন অশৌচ পালন করেন। অশৌচের মেয়াদ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের ক্ষেত্রে ১০ দিন, কায়স্থসহ অন্যদের ক্ষেত্রে এক মাস। অবশ্য বর্তমানে পূর্ণ মেয়াদ অশৌচ কর্ম পালন করা হয়। অশৌচ পালন নিরামিষ ভোজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অশৌচ পালন শেষে মৃতের আত্মার শান্তি ও সদগতি কামনায় আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়। আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর রাতে প্রেতভোজন বা ভাত-বাড়ান হয়। এতে মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে নানা রকমের বায়ান্ন পদ, মিঠাই-মণ্ড, পিঠা-পুলি ইত্যাদি কোনো পুকুরপাড়ে বা গৃহ থেকে কিছু দূরে নির্জন স্থানে নিবেদন করা হয়। মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকাবস্থায় যা বেশি পছন্দ করতো তা প্রেতভোজনে দেয়া হয়।"[১৬]

## ১১. পূজা-পার্বণ, ব্রত

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মঙ্গলঘট, আম্রপল্লব, কলাগাছ ইত্যাদি শুভ কাজের মাঙ্গলিক প্রতীক। বিয়ে বা পূজা-অর্চনায় এগুলি ব্যবহৃত হয়। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান দুভাগে বিভক্ত- পূজা ও ব্রত। পূজা সম্পন্ন করার জন্য পুরোহিত বা পূজারী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সকল ব্রতে পূজারী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। পূজায় পুরুষদের প্রধান ভূমিকা, ব্রতে মেয়েদের। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে দুর্গাপূজা, বাসন্তী পূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, শিব চতুর্দশী, রাসযাত্রা ইত্যাদি বহু পূজার প্রচলন আছে।

**মেলা :** জেলার হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষ বিশেষ সময়ে মেলার আয়োজন করে থাকে। মেলায় লৌকিক এবং ধর্মীয় প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় মেলা হয় ফাল্গুন মাসে মহেশখালির আদিনাথে শিবচতুর্দশীর মেলা। শিব চতুর্দশী পূজা উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আদিনাথ মেলা ধর্মীয় মেলা হলেও এ মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজনের সমাগম ঘটে। নববর্ষের সময় খরুশকুলে শিব গাছের মেলা বসতো। এখন বসে না। চকরিয়ায় হিন্দুদের সূর্যখোলা মেলাও আর বসে না। নববর্ষ উপলক্ষে রামু উপজেলার রামকোট তীর্থধামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মেলা সপ্তাহব্যাপী বসতো। বর্তমানে এ মেলার জৌলুস হারিয়ে গেছে। মেলায় যাত্রা, সার্কাস, পুতুলনাচসহ অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা থাকতো। ইদানীং রকমারি আধুনিক মেলার আয়োজনে লোকমেলাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।"[১৭]

## ১২. কৃষি ভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান

**পুন্যাহ :** ব্রিটিশ শাসনামলে এ দেশে ভূ-সম্পদশালী এবং ক্ষমতাবান এক শ্রেণির মানুষের উদ্ভব ঘটে। সম্পদশালী এসব লোকেরা স্থানীয়ভাবে জমিদার নামে খ্যাত

www.pathagar.com

ছিল। জমিদারদের ছিল নায়েব, মোসাহেব, তল্পিবাহক, লাঠিয়াল বাহিনীসহ প্রজা-সাধারণ। প্রজারা বার্ষিক খাজনা দেয়ার রেওয়াজে জমি চাষ ও ভোগ-দখল করতো।

আগেকার দিনে জমিদারের জায়গা সম্পত্তি নিয়ে প্রায়শ বিরোধ দেখা দিতো। সব জমিদারেরা লালন করতো দাঙ্গাবাজ-লাঠিয়াল। লাঠিয়ালদের কাজ ছিল জমিদারের ইচ্ছানুযায়ী অপরের জায়গা দখল করা, খাজনা অনাদায়ে কথায় কথায় প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা, খাজনা আদায় করা, খাজনা অনাদায়ী প্রজাদের উপর জোর-জুলুম ও শক্তিপ্রয়োগ করে খাজনা আদায় করা। জমিদারের রোষানলে পড়লে প্রজার নিস্তার থাকতো না। খাজনা আদায় উপলক্ষে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের 'হিরক রাজার দেশে' শিরোনামের চলচ্চিত্রে উল্লেখ করেছেন–

'বাকী রাখা খাজনা মোটে ভালো কাজ না,
ভর পেট নাহি খাই রাজ কর দেয়া চাই'।

তাই বার্ষিক খাজনা পরিশোধ করতে তৎপর থাকতো প্রজারা। বছরের শেষে খাজনা আদায় করার জন্য জমিদারবাড়িতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জাঁকজমকের সাথে আয়োজন করা হতো 'পূন্যাহ'। প্রজারা নানা রকম উপহার সামগ্রী বা জমিদারের জন্য উপঢৌকন নিয়ে এই পূন্যাহতে উপস্থিত হতো। এসব উপঢৌকনের মধ্যে থাকতো বড় বড় রুই-কাতাল, শৈল, বোয়াল, মাগুর মাছ, অথবা বড় বড় ফলফলাদি নিয়ে জমিদারের মনতুষ্টির চেষ্টা করতো। এ সময় বিনয়ের সাথে প্রজারা পরিশোধ করতো জমির খাজনা। সেই খাজনা নগদ টাকা, চাল বা ধানেও পরিশোধ করা হতো। চলতো প্রজাদের নিয়ে জমিদারদের পূন্যাহ নামে উৎসব। পূন্যাহ উপলক্ষে জারি-সারি, ভাটিয়ালি গানে মুখরিত হয়ে উঠতো জমিদার বাবুর বাড়ির প্রাঙ্গণ। পূন্যাহ উপলক্ষে জমিদারবাড়িতে গানের আসরের পাশাপাশি ভোজের আয়োজন করা হতো। গরু, ছাগল বা মোরগ-মুরগি থাকে সেই ভোজের তালিকায়। যে যার পছন্দমতো খাদ্য চেয়ে নিতো। চলতো গণভোজন। তদানিন্তন কক্সবাজার জনপদে ব্রিটিশ সরকারের বদান্যতায় অনেক জমিদার-পরিবার প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। জমিদারেরা বার্ষিক খাজনা আদায়ে বাংলা পৌষ মাসের প্রথম দিকে 'পূন্যাহ'র আয়োজন করতো। মূলত অগ্রহায়ণ মাসে নতুন সোনালি ধান গোলায় উঠার পরেই পরবর্তী বছরের জন্য জমিকে কতটুকু চাষ করবে তা নির্ধারণ করার জন্য এই পূন্যাহ বা খাজনা আদায়ের রীতি-নীতি বা পূন্যাহ উৎসব।

**হালফেলানি বা হালপালানি :** হালফেলানি ছিল এতদঅঞ্চলের কৃষক-সম্প্রদায়ের আবহমান কালের একটি অপরিহার্য আচার-অনুষ্ঠান। বর্তমানে উক্ত অনুষ্ঠান পালন করা হয় না। এমনকি এই অনুষ্ঠানের নিয়ম-কানুন এবং আচার পর্যন্ত ভুলে গেছে এলাকার লোকজন, কৃষকসমাজ। প্রতিবছর আমন মওসুমের শুরুতে আষাঢ় মাসের ৭ তারিখ হালফেলানি অনুষ্ঠান করা হতো। সকল কৃষক নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। এ অনুষ্ঠানকে আবার সত্যপীরের ছিন্নি দেয়াও বলা হতো। এই 'সত্যপীর'কে গ্রামাঞ্চলে 'সত্যপুরী' বলা হয়। সত্যপীরের ছিন্নি তৈরি করার জন্য প্রয়োজন মাত্র চারটি উপাদান। এসব উপাদানগুলো হচ্ছে চালের গুড়ো, একটি পাকা কলার ছড়া, পানি এবং লবণ। কলা, চাউলের গুড়ো, পর্যাপ্ত লবণ

www.pathagar.com

এবং পানি নিয়ে ময়দার খামিলের মতো নরম করে মুষ্টিবদ্ধ করে এই ছিন্নি তৈরি করা হয়। যদিও এটাকে ছিন্নি বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য ছিন্নির সঙ্গে সত্যপীরের ছিন্নির আঙ্গিক পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য ছিন্নি তৈরির প্রণালী অনুযায়ী দেখতে পায়েসের মতো, এক কথায় পায়েসই। কিন্তু সত্যপীরের ছিন্নি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তৈরি করা হয়। যা দেখতে সাম্প্রতিক কালের 'বরা' পিঠার ন্যায়। এই পিঠাই সত্যপীরের ছিন্নি, যা ছেলে, বুড়োসহ সর্বস্তরের মানুষ-জনের মধ্যে বিলি বন্টন করা হয়। কারো কারো মতে এই সত্যপীরের ছিন্নি পাকা কাঠাল ও পাকা আমের রস মাখিয়ে খাওয়া হয়। তবে শেষোক্ত বক্তব্যের সাথে খুব বেশি সমর্থন পাওয়া যায়নি।

আমার মতে এই পিঠা নয়, প্রকৃতপক্ষে পুরো আনুষ্ঠানিকতাটাই হালফেলানি বা সত্যপীরের ছিন্নি। এই অনুষ্ঠানের অন্যান্য পর্বের মধ্যে রয়েছে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পরে জমিতে চাষ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কৃষক মাঠে লাঙ্গল-জোয়াল এবং গরু নিয়ে যেত। এর পরে নির্দিষ্ট জমির দুই অঁওচা (গরুকে আয়তাকার বা বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে জমি চাষ দেওয়ার নাম অঁওচা) জমি চাষ করে গরু ছেড়ে দিতো। দুই অঁওচার প্রতি অঁওচায় ৭টি করে মোট ১৪টি ভঁ-র (লাঙ্গলের ফলা দিয়ে জমি ফালা ফালা করার নাম হচ্ছে ভঁঅর) রয়েছে। আমন ধান উৎপাদনের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে বীজতলা (জালা বিচানা) তৈরি করতে হয়। জমিতে বীজতলা তৈরির পূর্বেও একটি ছোট্ট আচার রয়েছে। উক্ত আচার হচ্ছে, একটি পাটগাছের চারা, একটি কালা কচুর চারা, একটি কলমি শাকের ডাটা বা ডগা বা শাখা নিয়ে নির্দিষ্ট জমির অগ্নিকোণায় রোপণ করতে হবে। এসব রোপণ করার পর জমিতে ধানের বীজ ছিটানো হয়। (উখিয়া উপজেলার কবি-নাট্যকার, লোক-গবেষক মাষ্টার শাহ আলম তাঁর কক্সবাজারের লোকজ আচার অনুষ্ঠান' শীর্ষক প্রবন্ধে উখিয়াতে জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ তারিখ হালফেলানি করা হয় বলে উল্লেখ করেছেন)। সত্যপীরের ছিন্নির তাৎপর্য সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতি হচ্ছে, ওহুদের যুদ্ধে শত্রুর হামলায় হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (স.) এর একটি দন্ত মোবারক শাহাদাৎ বরণ করেন। হযরত ওয়াইজ করণি (র.) এ ঘটনায় খুব বেশি মর্মাহত হন। হযরত ওয়াইজ করণি (র.) রসুল প্রেমের আত্মত্যাগ স্বরূপ তাঁর নিজের একটি একটি করে সমস্ত দাঁত ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি সুনির্দিষ্ট করে জানতেন না রসুল করিম (সঃ) এর কোন দাঁতটি যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ফলে তিনি একটি একটি করে সমস্ত দাঁত ফেলে দিয়েছিলেন। হযরত ওয়াইজ করণি (রঃ) এর সম্মানে এবং তিনি যাতে খেতে পারেন সে জন্য কক্সবাজার অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সত্যপীরের ছিন্নি প্রদানের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। আর হযরত ওয়াইজ করণি (র.) হচ্ছেন আমাদের সেই সত্যপীর। জনশ্রুতি আছে, সত্যপীরের ছিন্নি দেওয়া না হলে কৃষক ভালো ফসল থেকে বঞ্চিত হবে।

এ চাষকর্মকে উপজীব্য করে গ্রাম্য পণ্ডিতেরা রচনা করেছেন নিম্নরূপ শ্লোক বা ছড়া বা ধাঁধা।

এক.
হরা, তি তি বব্ব
এ তিন কথার অর্থ 'ক'।
উঃ বাম, ডান, সোজা।

www.pathagar.com

দুই.
হাড়ের ঘোর ঘোর
ফাঁড়ের মেড়ি
ছ' চোখ তিন ফড়ি।
উঃ মানুষ ও গরু।
তিন.
ফুঁড়ের ডেম
ন' মেলের পাতা
সেই কিচ্ছা ভাঙ্গি না পাইল্যে
জনমভর গাধা।
উঃ গরুর শিং।

এ অঞ্চলে অনুরূপ আরও অনেক শ্লোক ও ধাঁধা আছে। যাই হোক 'হালফালানি' এ লোকজ আচার অনুষ্ঠানটি বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। এর কারণ হিসাবে জানা যায়, আধুনিক কালের ট্রাক্টর সর্বত্র চাষাবাদে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং স্বল্প মেয়াদি ধান শস্যের চাষের ফলে বৎসরে তিন খুন্দ (তিন ফসলা) চাষ অব্যাহত থাকাই এর একমাত্র কারণ। তবে গ্রামীণ জনপদে কোথাও কোথাও এর আংশিক কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করা যায়।"[১৮]

**ধান হুরানি :** কৃষিভিত্তিক আকর্ষণীয় লোকজ আচার হচ্ছে 'ধান হুরানি' বা 'ধান মাড়াই' করা। নতুন ধান মাড়াই করার জন্য একটি সমতল জায়গা বেছে নেয়া হয় এবং উক্ত জায়গাটি গরুর কাঁচা গোবর ও মাটি মিশিয়ে লেপ দিয়ে শুকানো হতো। গোবর ও মাটি মিশিয়ে ধান মাড়াইয়ের 'খলা' লেপার ব্যবস্থা করলে উক্ত খলা গরু-মহিষ হাঁটাহাঁটি করলেও আর ফাটে না বা নষ্ট হয় না। তারপর বিস্তৃত খোলা জায়গায় বা গৃহস্থের উঠান-প্রাঙ্গণে জমি থেকে পাকাধান কেটে এনে হুরানি বা মাড়াইয়ের জন্য 'ধান খলায়' মওজুত করা হয়। বৃত্তাকার জায়গার মধ্যখানে একটি মইয়া (খুঁটি) পোতা হতো। 'মইয়া' হচ্ছে মূলত ধান মাড়াইয়ের মাঠে ঠিক মধ্যখানে পুঁতে রাখা একটি গাছের খুঁটি। মইয়ার কাজ হচ্ছে ধান মাড়াই করার জন্য গরু-মহিষ রশি দিয়ে পর পর বাঁধার (অনেকটা ফুলের মালা গাথার মতো) বা আটকিয়ে রাখার পরে 'মইয়া'র সাথে বেঁধে রাখা যাতে গরু-মহিষ ইচ্ছে করলে পালাতে না পারে। 'মইয়া' হচ্ছে ধান মাড়াইয়ের যে স্থান তার মধ্যস্থলে একটি খুঁটি পুঁতে রাখা। গরুর গলার রশিটা যাতে উক্ত খুঁটির সাথে বাঁধা যায়। এতে করে গরুর পাল ইচ্ছে করলেও ধানের খলা থেকে পালাতে না পারে। বৃত্তাকার জায়গার চারিদিকে সমপরিমাণে ধানের 'তারা' বা আঁটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়া হয়। তারপর ২-৩ টি থেকে শুরু করে ৭-৮ টি গরু-মহিষের গলায় পর পর দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। পরে 'মইয়া'র সঙ্গে বেঁধে ধান মাড়াই আরম্ভ করা হয়। যাদের বাড়িতে গরু-মহিষ বেশি, তারা গরু-মহিষের সারিও দুটি করে থাকে। পরে ধান মাড়াইয়ের জন্য গরু-মহিষ নিয়ে বৃত্তাকার জায়গাটি বার বার ঘুরতে হয়। গরু-মহিষকে হ-র, বব্ব, তি তি, বইল বইল দিয়ে ঘোরাবার জন্য গরু মহিষের সারির পেছনে এক একজন বেত উঁচিয়ে গরু-মহিষ নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করতো। তাড়াতাড়ি ধানগাছ বা খড়ের ধান ঝরে যাওয়ার জন্য লাঠি নিয়ে পিটাতে হয়। ধান ঝরে যাওয়ার

www.pathagar.com

জন্য যে লাঠি ব্যবহার করা হয় তাকে স্থানীয়ভাবে ধান বাইজ্যানি বলা হয়। আবার 'কচ্ছা' দিয়ে খড়ের গাদা ওলট-পালট করে দিতে হয়। অন্যথায় নিচের খড়ে ধান থেকে যায়। কচ্ছা হচ্ছে কাঠের তৈরি একটি লাঠি, যার অগ্রভাগ বাঁকা, এই বাঁকা অংশের অগ্রভাগ দা দিয়ে সুঁচালো করে দিতে হয়। যাতে সহজেই খড়ের গাদার ভেতরে ঢুকিয়ে খড় ওলট-পালট করা যায়। গরু-মহিষের অনবরত হাঁটাহাঁটি, খড়ের উপর লাঠির মহুর্মুহু আঘাত, কচ্ছার সাহায্যে ওলট-পালট এর মাধ্যমে তাড়াতাড়ি খড় বা নাড়া থেকে ধান পৃথক হয়ে পড়ে যায়।

ধান মাড়াইকালে গরু-মহিষের পেছনে হাঁটার সময় মধ্যে মধ্যে গেয়ে উঠে-

হাঁড়ি দেরে মইয়র বলদ
হাঁড়ি দেরে তুই
খারা খারা ধান ঝরিলে
এ্যরি দিয়ুম মুই ...
বইল বইল বইল ...

এভাবে ধান হুরানি বা ধান মাড়াই হয়ে থাকে। বর্তমানে গ্রামে চারণভূমি কমে যাওয়ায় গরু-মহিষের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। গরু-মহিষের সংখ্যা কমে যাওয়ায় কৃষকরা ট্রাক্টরের উপর নির্ভর হয়ে পড়ছে। দিন যতই যাচ্ছে প্রত্যেক কৃষকের ট্রাক্টরের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। প্রত্যেক কৃষক ট্রাক্টর কিনতে না পারলেও গ্রামের কোনো বিত্তবান কৃষক ট্রাক্টর কিনে আনলেও অন্যরা সে ট্রাক্টর ভাড়ায় নিয়ে ধান মাড়াই বা জমি চাষে ব্যবহার করছে। তবে গরু-মহিষ এখনো যাদের আছে তারা গরু-মহিষ দিয়ে হাজার বছর ধরে চলে আসা পূর্বপূরুষের প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী ধান মাড়াই করছে।"[১৯]

## তথ্যনির্দেশ

১. সুলতান আহমেদ, 'বাংলার গ্রামজীবন, লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি', সমুদ্র সংলাপ, দ্বাদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, পঞ্চদশ সংকলন, এপ্রিল ২০১৩, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, কক্সবাজার, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭।

২. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-২০-২১।

৩. মাওলানা আতাউল্লাহ বুখারী, পিতা : আবদুল গণি, মাতা : হানিফা বিবি, বয়স : ৩৫ বছর, গ্রাম : আধারঘোনা, ইউনিয়ন : কালারমারছড়া, উপজেলা : মহেশখালী, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১৮-০৯-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।

৪. বিপুল সেন, পিতা : ইন্দ্র সেন, মাতা : বিন্দু রাণী সেন, বয়স : ৫৬ বছর, গোল দিঘীর পাড়া, কক্সবাজার পৌরএলাকা, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২২-১০-২০১৩, সময় : রাত- ১০ট।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-৩২-৩৩।

৭. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-৬০-৬১।

www.pathagar.com

৮. বিপুল সেন, পিতা : ইন্দ্র সেন, মাতা : বিন্দু রাণী সেন, বয়স : ৫৬ বছর, গোল দিঘীর পাড়া, কক্সবাজার পৌরএলাকা, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২২-১০-২০১৩, সময় : রাত- ১০ট।
৯. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৭।
১০. বিপুল সেন, পিতা : ইন্দ্র সেন, মাতা : বিন্দু রাণী সেন, বয়স : ৫৬ বছর, গোল দিঘির পাড়া, কক্সবাজার পৌরএলাকা, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২২-১০-২০১৩, সময় : রাত- ১০ট।
১১. মাওলানা আতাউল্লাহ বুখারী, পিতা : আবদুল গণি, মাতা : হানিফা বিবি, বয়স : ৩৫ বছর, গ্রাম : আধারঘোনা, ইউনিয়ন : কালারমারছড়া, উপজেলা : মহেশখালী, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১৮-০৯-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।
১২. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-৫৯-৬১।
১৩. বিপুল সেন, পিতা : ইন্দ্র সেন, মাতা : বিন্দু রাণী সেন, বয়স : ৫৬ বছর, গোল দিঘি পাড়া, কক্সবাজার পৌরএলাকা, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২২-১০-২০১৩, সময় : রাত- ১০ট।
১৪. শামসুল হক শারেক, পিতা : আসাদ আলী, মাতা : আলকিছ খাতুন, বয়স : ৫৮, গ্রাম : গয়ালমারা, ইউনিয়ন : রত্নাপালং, উপজেলা : মহেশখালী, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৮-০৮-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।
১৫. এমতাজ আহমদ, পিতা : আবদুস শুকুর, মাতা : জয়গুন বিবি, বয়স : ৭৮ বছর, গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাক, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১২-০৩-২০১৩, সময় : সকাল -১০টা।
১৬. রাজবিহারী চৌধুরী, পিতা : যতীন্দ্রলাল চৌধুরী, মাতা : পর্ণা চৌধুরী, বয়স : ৬৭ বছর, মেহেরভিলা, (৩য় তলা), উত্তরা লেন, লালদিঘির উত্তরপাড়, কক্সবাজার পৌর এলাকা, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৩-১০-২০১৩, সময় : সকাল -৯টা।
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-৪০-৪২।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭।

www.pathagar.com

# লোকখাদ্য

দাঁতের সঙ্গে আঁতের যে সম্পর্ক লোকসংস্কৃতির সঙ্গে লোকজীবনেরও রয়েছে ঠিক তেমনি সম্পর্ক। গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এরই ধারাবাহিকতায় লোকজীবনের আদল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে লোকখাদ্য। তাই যে-কোনো অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির স্বরূপ নিরূপণ করতে হলে সে অঞ্চলের মানুষের লোকখাদ্যের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করা অপরিহার্য।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষের খাদ্যসংস্থান প্রক্রিয়া ছিল দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত : ১. সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও ২. উৎপাদন প্রক্রিয়া। আদিমকাল থেকে লোকজীবনে খাদ্য সংস্থান প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ভিত্তি ছিল সংগ্রহ কৌশল নির্ভর। এই সংগ্রহ কৌশল ছিল প্রধানত তিন রকম : ক. বনাঞ্চল থেকে ফলমূল সংগ্রহ, খ. বনের পশুপাখি শিকার, এবং গ. জলাশয় থেকে মাছ শিকার। সংগ্রহ ও শিকার ব্যবস্থায় প্রথম প্রথম প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত খাদ্য সরাসরি ভোগে লাগানো হতো। পরে আগুন, পশুপালন, কৃষি, লোকপ্রযুক্তি ইত্যাদি আবিষ্কারের পর মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে শেখে। এর ফলে লোক-খাদ্যাভ্যাসে লক্ষণীয় পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য সূচিত হয়। এভাবে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের এক ধরনের খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে। আধুনিক কালে শিল্প উৎপাদন ও নগরায়নের ফলে মানুষের খাদ্যাভ্যাসে আবার আর এক দফা পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রাক শিল্প উৎপাদন ও প্রাক নগরায়ন পর্বে লোকজীবনে যে খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠেছিল তাকেই মোটামুটিভাবে লোকখাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা চলে।

কক্সবাজার জেলার খাদ্যাভ্যাসে আরাকানি প্রভাব লক্ষণীয়। এটা অবাক করার মতো নয়। কারণ প্রাচীনকালে সমগ্র কক্সবাজার জেলা আরাকানের অধীন ছিল। ফলে এখানকার খাদ্যতালিকায় আরাকানি মুসলিম বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনদের বিভিন্ন খাদ্য চলে এসেছে।

সুপ্রাচীন কালে কক্সবাজারের অধিবাসীদের লোকখাদ্যের একটা বড় অংশ আসত বনাঞ্চল থেকে ফলমূল সংগ্রহের মাধ্যমে। বিভিন্ন ঋতুতে তারা যেসব ফল সংগ্রহ করে খেতো সেগুলির মধ্যে ছিল : আম, উরি আম (পাহাড়ি আম), আইট্টা কেলা (বিচিকলা), কাট্টলি কেলা (কাঁঠালি কলা) সাম্প্রতিক সময়ে এই কলাটিকে স্থানীয়ভাবে বাআলিকলা বা বাংলাকলাও বলা হয়, গারাইং কেলা (সাগর কলা), চিনিচাম্বা কেলা (চিনি চাপা), চাম্বাকেলা (চাপা কলা), কান্নাল বা মিডা জাইর (বাতাবি লেবু), তুরুনজা (জাম্বুরা), ক'চি জাইর (কাগজি লেবু), কাট্টল (কাঁঠাল), কওরা (কামরাঙা), গোঁয়াচি বা গইয়াম (পেয়ারা), আরাগোলা বা আমড়াগোটা (আমড়া), এনাশ (আনারস), লেচু (লিচু), চাইলদা বা চাইল্যা (চালতা), তেতই (তেঁতুল), নাইরকল বা নাইজ্জল (নারকেল), বত্তা বা ডেউয়া (পাহাড়ি ফল), মনগুলা (পাহাড়ি ফল), হিয়রি (পানিফল),

www.pathagar.com

জলপাই, অলতি বা অলমতি (আমলকি), কা গোলা, হারপাড়া গোলা, ভাককুমগোলা, লটকনগোলা, পাইন্যাগোলা, মাইল্‌লম, কিউর, বেল, কৎবেল, বাকি (বাংগি), তরমুচ (তরমুজ), ছইকিউর (মাটির নিচে উৎপন্ন হয়। মিষ্টি আলুর ন্যায় দেখতে। বাইরের চামড়া ফেলে খেতে হয়। তবে ছইকিউর খেতে ঠাণ্ডা) ইত্যাদি।"[১]

বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত শাকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : চৈর খাটটা, রাই হাক (রাইপাতা শাক), হরই হাক (সরিষাপাতা শাক), কচু হাক, আদা গুনগুনি বা মামিনাহাক (থানকুনি পাতা), ঢেই হাক, বাততুয়া হাক, হিজলি হাক, শেজেনা হাক (শেজনাডাটা গাছের পাতা), হলাফুল (শাপলাফুল), হনসা হাক, মনসা হাক, গিরমিতিতা হাক (একপ্রকার তিতাশাক), পুরমিতিতা হাক, তারাইশ হাক, কাউয়ারজাই হাক, হঅরি হাক (মিস্টি কুমড়া), কেলাপাতা হাক (দেখতে হলুদ পাতার ন্যায়। এই কেলাপাতা হাক মূলত পাহাড় বা পাহাড়ের ঢালুতে উৎপন্ন হয়), মাদার হাক (বড় মাদার তথা পাইন্যামাদার গাছের কোমল পাতা সীমবিচি দিয়ে পরিমাণ মত লবণও আন্যান্য উপাদান দিয়ে রান্না করে খাওয়া হত। মাদারপাতা হাক খেতে অত্যন্ত উপাদেয়। এই মাদারপাতা শাক সুতাক্রিমির মহৌষধ), করলা হাক (কাকরুল পাতা শাক), আলুপাতা হাক, লিয়ারা হাক (লিয়ারা ছোট ছোট পাট গাছের ন্যায় দেখতে। এসব গাছ তরকারি হিসেবেও খাওয়া যায়), তিতাকরলা পাতা হাক ইত্যাদি। উল্লেখ্য, স্থানীয়ভাবে শাককে 'হাক' বলা হয়। যেমন-'শালা'কে 'হালা' বলা হয়।

*কক্সবাজার শহরে ভাপা পিঠা তৈরি করা হচ্ছে*

www.pathagar.com

কক্সবাজার শহরে ভাপা পিঠা তৈরি করা হচ্ছে

www.pathagar.com
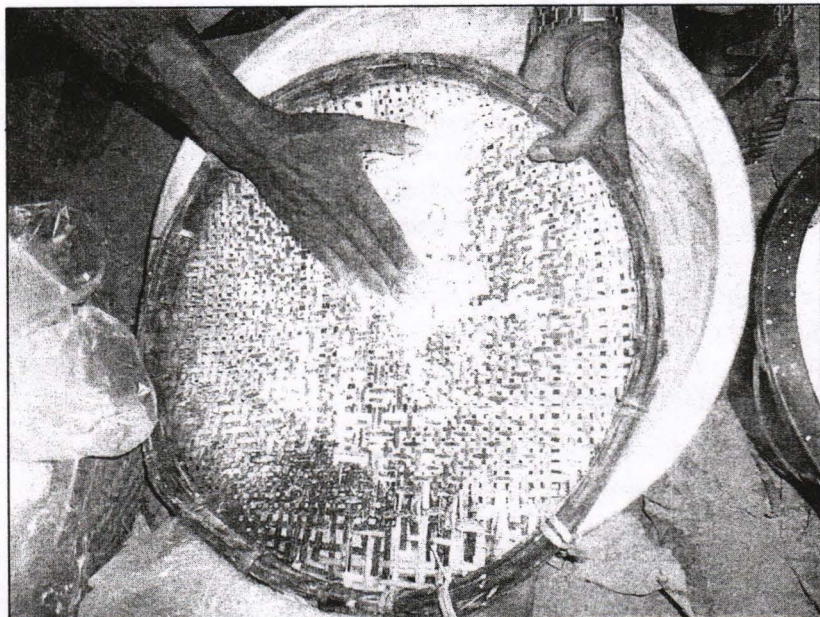
আর সবজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সবজি হিসেবে পাতা ছাড়া সমগ্র কলাগাছ খাওয়া হয়। সমগ্র কলাগাছ বলতে কলাগাছের বিভিন্ন অংশকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- কলার বৌলি, কলাগাছের মুরি, কচি কলাগাছ, কলার থুর (কলার থুড়) সবজি ও তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে চাপা কলা ও সাগর কলা খাওয়া যায় না। চাপা কলা ও সাগর কলা তেতো বিধায় তা খেতে বিস্বাদ লাগে। কলা গাছের বৌলি বা কলাগাছের শাস বা কলাগাছের মাঝখানের কচি নরম অংশ। কলার মুড়ি, কলার বৌলি এবং কচি কলাগাছ চিংড়ি এবং বিচি দিয়ে রান্না করে খাওয়া হয়। বিশেষ করে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে কক্সবাজার অঞ্চলে তরকারির সংকট দেখা দিলে কলাগাছের তরকারির উপর মানুষ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এছাড়াও বাঁশপুরুল (বাঁশকরুল), বন কাশ (ঢেড়শের ন্যায় দেখতে ও খেতে। তবে ঢেড়শের ন্যায় লম্বা হয় না। ঢেড়শ আকারে লম্বা কিন্তু বন কাশ ঢেড়শের ন্যায় লম্বা নয়) নালসা, টিয়াটুই, তারা তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এ ছাড়া তরকারি হিসেবে এখানকার অধিবাসীরা ব্যবহার করত কঁইন্দা বা কইডা (চিচিঙ্গা), কচু (কচুর পাতা, কচুর পোয়া বা কচুর ফুল শাক হিসেবে এবং কচুর ছরা, কচুর ব (কচুর লতি) তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়), হঅরি বা হ'রি (মিস্টি কুমড়া), কোঁয়ারা বা চাল কোঁঅরা (চাল কুমড়া), ছই (শিম), জাইত কদু (লাউ), তিতা করলা (তিত করল), কাকরল (কাকরুল), ছোট মূলা, কইয়া (পেঁপে), লটনকৈয়া, কওরা ছই (লম্বা সীম), বরকডি ছই (বরবটি), ফেলু (ফেলন ডাল জাতীয় সীম), বাইয়ন (বেগুন), ফল (শসা), ভেটবাইয়ন (একপ্রকারের ছোট বেগুন, যা ভর্তা তৈরি করে খাওয়া হয়), যিআঁ বা ঝিয়া (ঝিঙে), পুরুইল (ধুন্দুল), মটরশুটি, চিনার, টাইয়ন (টমেটো), অরল বা অরঅল একটি ডাল জাতীয় খাবার (অড়হর), কিয়ারাগুলা ইত্যাদি।"[২]

স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন শাক-সবজি এবং তরিতরকারি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে লোকছড়া, লোক ধাঁধাসহ বিভিন্ন লোকসাহিত্য। উদাহারণ হিসেবে একটি ধাঁধা দেখানো হলো–

যত্‌তন গরি রুইলে ঝারে, হাজিলাতে বায়  
বুরা অত্তে নখায় যারে, পোয়া অত্তে খায়।  
দশ্‌অ শিরঅ এক মুণ্ড, না হয় রাবণ  
ভাল মতন পাক করিলে অমূল্য বেজন। উত্তর ঃ ঝিঙ্গে।"[৩]

আর মশলার মধ্যে ছিল প্রধানত হলইদ (হলুদ), পিয়াইচ বা পিয়াচ (পেঁয়াজ), ভুইট্যাবয়র বা বঅরপাতা (ধনে), কলকইট্টা বঅরপাতা, মিডাজিরা, রউন (রসুন), আদা ইত্যাদি। গুটগুইট্যা মরিচ নামে ঝালহীন এক ধরনের মরিচ রান্নায় ব্যবহৃত হতো।

•

এখানকার অধিবাসীরা খাদ্যের প্রয়োজনে বন থেকে বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ, বুনো ছাগল, বুনো গরু, গয়াল, বুনো মহিষ, হুয়র (কালো হরিণ বা শুকর) ইত্যাদি পশু শিকার করত। খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো এগুলির মাংস। পরে গৃহপালিত গরু, ছাগল, মোষের মাংসও খাদ্য তালিকায় যোগ হয়।

www.pathagar.com
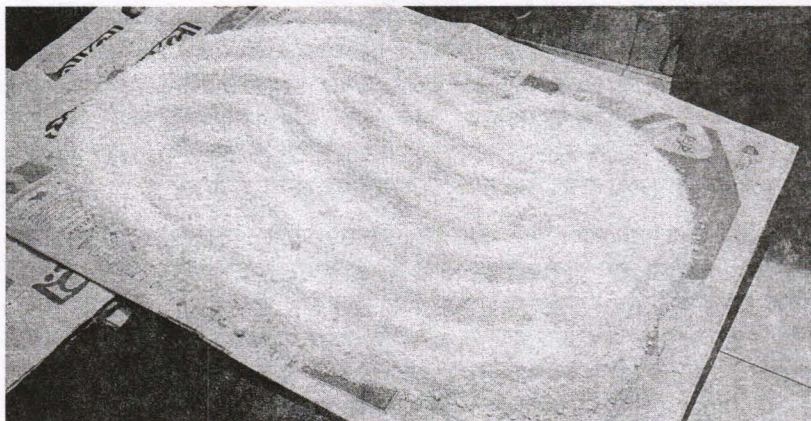
*কক্সবাজারে বিন্নিচালের গুড়ো দিয়ে তৈরি দুপ পাইশ পিঠা*

www.pathagar.com

লম্বা টানা জাল বসিয়ে জঙ্গল থেকে হরিণ ও কালো হরিণ শিকার করা হয়। বিশেষ করে গভীর জঙ্গলে দুই গাছের ফাঁকে হরিণ ধরার জন্য এই সব জাল বসানো হয়। হরিণ শিকারকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে প্রবাদ রয়েছে। যেমন- "জালত হরিণ বাঝিলে আঁরাইল্যা-পারাইল্যা ওঝায়, আর কালা হরিণ বাঝিলে কনঅ কিয়ে ন ওঝায়"। অর্থাৎ "জালে হরিণ ধরা পড়লে প্রতিবেশিরা এগিয়ে আসে ভাগ নেয়ার জন্য। আর যদি কালো হরিণ ধরা পড়ে তবে কেই আসে না।"[৪]

পাখি শিকার ছিল লোকখাদ্যের আর একটি উৎস। সেকালে বনজঙ্গল থেকে বনমোরগ, বুনো পাখি ও বুনো হাঁস শিকার করার রীতি ছিল। তাছাড়া তালের শিরা, গর্জনের আটা, কাঠাল গাছের আটা, আম গাছের আটা দিয়ে তৈরি ফাঁদ জাল দিয়ে পাখি শিকার করা হতো। পাখি শিকারের জন্য আর এক ধরনের জাল ব্যবহার করা হতো। এর নাম ছিল 'ডোক জাল'। এ জাল দিয়ে কুরা ডউক (ডাহুক), পানিখরি (পানকৌড়ি), কইতর (কবুতর), বোগা বা বগা (বক), চেগা, ভাডইয়া (কেয়েল), পিয়াইজজ্যা (চড়ুই), ইত্যাদি ধরা হতো। এ ছাড়া কানটা (গুল্লাছুট), ফুদনি (বাঁশের তৈরি চুঙ্গা), চিলকান্টা (তীরধনুক), গুলাল বা গুলতি দিয়ে কঅল (ঘুঘু), ময়না, চড়ুই, বোগা (বক), গাছ খুইট্টানি (কাঠঠোকরা), মে-তারা বা মাইচ্যাতারা বা মাইচ্যারানা (মাছরাঙা), শাইর (ময়না), ভাউত্তাচনা (ধানশালিক), গুইজ্জাচনা (গুবরে চনা থেকে গুইজজাচনা হয়েছে। শালিক ঠোঁট দিয়ে গোবরের পোকা খেয়ে থাকে বলেই শালিকের এই নাম), মনা (গাংশালিক), হাককুচড়নি (হলুদ পাখি বা অতিথি পাখি বা কুটুম্ব পাখি), কানি বোগা (কানি বক), ধলিবগা (সারস, ধলি বক), কাচিচুরা (সারস), কোড়া পাখি (হাঁসের মতো দেখতে এক রকম পাখি) শিকার করে খাওয়া হতো। সুস্বাদু বলেই পাখির মাংস ছিল আকর্ষণীয় খাদ্য।"[৫]

সেকালে কক্সবাজারের অধিবাসীদের লোকখাদ্যের আর একটি বড় উৎস ছিল জলাশয় বা সমুদ্র থেকে মাছ শিকার। মাছ ধরার জন্যে তারা বড়শি, জাল, চাঁই, ফলঅ, টেঁঠা, ইত্যাদি ব্যবহার করত। জালের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, টাইয়া জাল, চাক জাল, টানা জাল, ঝাই জাল (ঝাকিজাল) ও ডুব জাল। এছাড়াও সাগরে বা নদীতে 'জাগ' দিয়ে ধরা হয় মাছ। ('জাগ' হচ্ছে নদী বা সাগরের উপকূলের নিকটে গাছ ও বাঁশের শাখা প্রশাখার ঝাট ফেলে মাছের আশ্রম তৈরি করা। পরে টানা জাল দিয়ে ঘিরে 'জাগ'-এর ভেতরে আশ্রয় নেয়া মাছ ধরা হয়)। আবার কোথাও কোথাও 'বারা' দিয়েও মাছ ধরা হয়। ('বারা' হচ্ছে বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি দেখতে লম্বা মাদুরের মতো)। মাছের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ইছা মাছের কথা। সাগরে ও মিষ্টি পানিতে প্রায় ৩৫ প্রজাতির ইছা মাছ ছিল। এসব মাছের মধ্যে ছিল : করইল্যা ইছা, করকইজ্জা ইছা, কেডা ইছা, গোদা ইছা, ছোঁয়া ইছা (বাগদা চিংড়ি), জুইন্না ইছা, টোরা ইছা, পইয্যা ইছা, চাগা ইছা, কালাইছা (টাইগার শ্রিম্প বা গলদা চিংড়ি), ইত্যাদি। অন্যান্য মাছের মধ্যে ওনদুরা বাইলা (বেলে মাছ বিশেষ), কই মাছ, টুইরমাছ (মাগুর), কালিঘনি (কালিবাউশ), কালিবঅরা, কেঁড়া বাতাসি (তিনকাঁটাওয়ালা ছোট মাছ), খইয়া পাতারি (খয়রা বা খলিসা), গরি বা টাই (টাকি), গুইলদা বা গুইল্যা (টেংরা), ছিয়লা মাছ, চিঅলি (চাপিলা), পুঁটি, ধাতুপুড়ি, বাইশকাইট্টা পুড়ি, গোলপুড়ি, মইল্যাপুড়ি, তিত পুঁড়ি
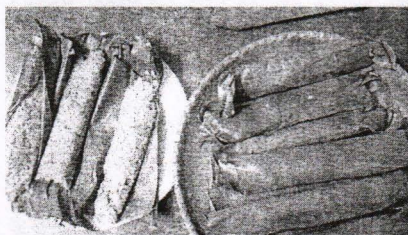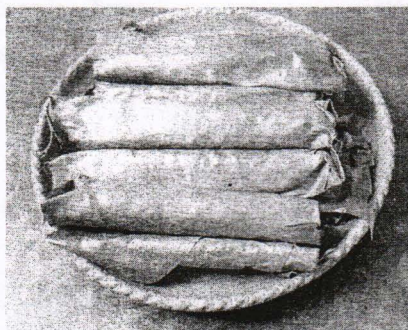
www.pathagar.com

*উপরের ছবির এই পিঠাকে কক্সবাজারে বলা হয় আতিক্কা পিঠা। বিন্নি চালের গুড়ো, গুড়, কলা, নারকেলসহ এই পিঠা তৈরি করা হয়*

www.pathagar.com

*উপরের ছবির এই পিঠাকে কক্সবাজারে বলা হয় আতিক্কা পিঠা। বিন্নি চালের গুড়ো, গুড়, কলা, নারকেলসহ এই পিঠা তৈরি করা হয়*

www.pathagar.com
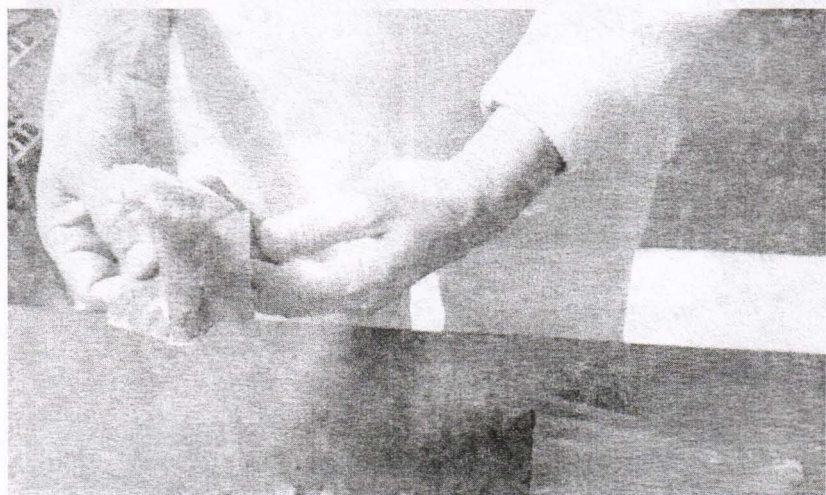
মইল্যাপুড়ি, তিত পুঁডি (ছোট পুটি), দাইরকা (ডানকানা), পৌঅলা (পাবদা), বোয়ালমাছ, বাআলামাছ বা ফাঁঅস (পাঙ্গাস), ফলি (ফলই), বাইলা কুরকুরি (বেলে মাছের পোনা), বাইম, ভেদামাছ, ঘগমাছ, দাতিনা মাছ, বাড়ামাছ, খরুলমাছ, ছুরিমাছ, মাইট্টমাছ (টোনা), কোরালমাছ (ভেটকি), মইল্ল্যা (মলা), রুইতমাছ (রুই), কাতালমাছ, মাআল মাছ (মৃগেল), হরকোডা (সরপুঁটি), হৈল (শোল), পুইয়ামাছ (পুই), তেলাপিয়ামাছ, শিংমাছ, কইরমাছ (সাগরের মাছ। ক্যাটফিস প্রজাতির মাছ) ইত্যাদি।"[৬]

সমুদ্র মেখলা বলে চট্টগ্রামের লোকখাদ্যে সামুদ্রিক মাছও বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে ইছা, লইট্ট্যা, ছুরি, রিস্যা (তপসে), লাক্ষা, পোপা, ঘুইজ্যা (কেটফিস প্রজাতির মাছ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে সাগর উত্তাল থাকে সে কারণে সাগর থেকে মাছ ধরা সম্ভব হয় না। এসময় জীবন্ত মাছের আকালের সময়ে চট্টগ্রামবাসীরা নানা ধরনের ফুউনি/হুউনি বা শুটকি মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। ইছা, লইট্ট্যা, ছুরি, ফাইস্যা, বাটা, রিস্যা (তপসে), লাক্ষা, পোপা, রুপচান্দা, ঘুইজ্যা, পুটিসহ সাগরের বিভিন্ন প্রজাতির মাছের শুটকি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। শুটকির সঙ্গে সিমের বিচি, বেগুন, মুলা তরকারি জনপ্রিয় খাদ্য। চাটগাঁবাসী শুটকির তরকারিতে বেশি ঝাল খেতে ভালোবাসে। তাই এই রান্নায় বেশি করে মরিচ ব্যবহৃত হয়।

মাছ আগুনে সেঁকে এক ধরনের শুটকি করা হয়। এর নাম ফাতরা শুটকি। তা পান্তা ভাত দিয়ে খাওয়া হয়। হলুদ-মশলা মেখে রোদে শুকানো মাছ পরিচিত ছিল ফুয়ানা মাছ হিসেবে। এটাও বেশ জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া মৌরলা, পুঁটি ইত্যাদি মাছ তেলে ভুনে খাওয়ার চল ছিল। নোনতা মাছও খাওয়া হতো। বিশেষ করে ইলিশ মাছকে লবণ দিয়ে খাবার হিসেবে ব্যবহার করার প্রচলন কক্সবাজারেই বেশি। বোধহয় এই সংস্কৃতি আরাকান থেকেই এ অঞ্চলে সংক্রমিত হয়েছে। বর্ষাকালে যখন মাছের আকাল দেখা দেয় তখনই নুনতা ইলিশের প্রচলন ও ব্যবহার শুরু হয়। মৎস্য মওসুমে ইলিশকে লম্বালম্বি করে কেটে পেটের ময়লা ফেলে দিয়ে লবণ মাখানো হয়। পরে বর্ষাকালে তা খাওয়ার জন্য বাজারে বিকিকিনি করা হয়। শিম বিচি দিয়ে নুনতা বা নোনাইয়া ইলিশ মাছ খুবই উপাদেয় খাবার হয়। অবশ্য বর্তমানেও এই নোনাইয়া ইলিশের প্রচুর কদর আছে। রান্না ছাড়াও গরম ভাতের উপর দিয়ে এই মাছ খাওয়ারও বিধান চালু রয়েছে। মাছটি কেটে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে মিষ্টি কুমড়োর পাতা মুড়িয়ে চুলায় ভাতের ডেকসি থাকতেই মাছটি ভাতের উপরে রেখে দিলে তা খাওয়ার উপযুক্ত হয়। এর মাধ্যমে পুরো ডেকসির ভাতের মধ্যে মাছের ফ্লেবার মিশে যায়।"[৭]

উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চইল বা চাল। সেকালে চট্টগ্রামে বহু জাতের ধান উৎপাদিত হতো। এক হিসেবে দেখা গেছে, প্রাচীনকালে কক্সবাজার অঞ্চলে ১৫৪ প্রজাতির ধানের চাষ হতো। যেমনি ছিল সুগন্ধি চাল, চিকন চাল, তেমনি ছিল মোটা চাউল, ছিল সুগন্ধিযুক্ত লালবিন্নি চাল, কালোবিন্নি চাল ও সাদা বিন্নি চাল।

www.pathagar.com

তা থেকে ধারণা করা যায় চাল ও চাল থেকে তৈরি নানা রকম খাদ্য যেমন উরুম (মুড়ি), খই, লারু, করই (চাউল ভাজা), মোয়া ইত্যাদি ছিল চট্টগ্রামবাসীর প্রধান খাদ্য। এছাড়া উৎপাদিত অন্যান্য খাদ্যশস্যের মধ্যে ছিল অরল (অড়হর), কলই (মাসকলাই), কলব্ব (খেসারি), বরকড়ি ছই (বরবটি), পেলন বা ফেলু (ফেলন ডাল জাতীয় খাদ্য), মোসর (মশুর) ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ডাল।

সেকালে গরিব পরিবারের দৈনন্দিন সাধারণ খাবারের মধ্যে ছিল পানতা ভাত, মাছ কিংবা শুটকির তরকারি, ডাল আর শুকনো মরিচ, মরিচচুরা বা মরিচচূর্ণ বা মরিচভর্তা (শুকনো মরিচ পুড়িয়ে তার সাথে পিয়াজ, লবণ, সরিষার তৈল, ধনে পাতা দিয়ে মরিচচুরা বা মরিচের ভর্তা তৈরি করা হয়। ভত্তা-ভাজিও এদের খাদ্য তালিকায় স্থান পেত।)

সাধারণ গৃহস্থের দৈনন্দিন সাধারণ খাবারের তালিকায় থাকত ভাত, মাছ, ডাল ও শাক-সবজির তরকারি। এছাড়া দোমাছা বা এক সঙ্গে রান্না করা মাছ ও শুটকির সালোন বা তরকারি খুবই পছন্দনীয় খাবার ছিল।

অন্যদিকে, সচ্ছল পরিবারের দৈনন্দিন সাধারণ খাবারের তালিকায় থাকত ভাত, চার-পাঁচ রকমের সালন বা তরকারি এবং দুধ-কলা, দই কিংবা খাট্টা (টক)। মাছের তরকারি ছিল নিত্যদিনের খাবারের অপরিহার্য অংশ। মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল অতিথি-আগমনে কিংবা উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। মোগল প্রভাবে সচ্ছল ও বিত্তশালী পরিবারে দুরুচ-পোলাও, কোরমা-পোলাও, জর্দা ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে প্রচলিত হয়। পিয়াজ, রসুন ও মশলা প্রথম প্রচলিত হয় বিত্তশালী পরিবারে। ক্রমে তা সাধারণ পরিবারে বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাদ্য তালিকাভুক্ত হতে থাকে।

তবে সাধারণ ও সম্পন্ন পরিবারের খাবার তালিকায় একটি বিশেষ ধরনের খাবারের পদ থাকতো আর তা হচ্ছে 'কাজি' (যা দেখতে শরবতের ন্যায়)। খুবই অল্প খরচেই এই 'কাজি' তৈরি করা সম্ভব। আমের কাজি, রসুন কাজি। কাঁচা আমের কাজি সবচেয়ে উপাদেয় খাবার। বোশেখ বা জেঠ মাসেই বিশেষ করে কাঁচা আমের মওসুমেই আমের কাজি করা সম্ভব। কাঁচা আমকে একটু করে আগুনে পুড়িয়ে সাথে রসুন পুড়িয়ে লবণ মেখে একটু সরিষার তেল দিতে পারলে ভাল হয়ে যায় আমের কাজি। একই ভাবে রসুনকে পুড়িয়ে পরিষ্কার পানিতে গুলিয়ে তার সাথে পরিমাণ মত লবণ, সরিষার তেল দিলে রসুনের কাজি হয়ে যায়। একই সাথে আমসত্ত দিয়েও 'কাজি' করা যায়। পাশাপাশি তেঁতুল দিয়েও একই পদ্ধতিতে 'কাজি' করা হয়। বর্তমানেও আরাকানে এই 'কাজি'র প্রচলন রয়েছে। আরাকানের মগ, মুসলমান এবং রাখাইন সম্প্রদায়ের দুপুর ও রাতের খাবারের তালিকায় এখনও এই 'কাজি' বা টকের শরবত এক নম্বরেই আছে।"[৮]

সেকালে প্রায় সব ধরনের পরিবারে দুধ-দই নিত্যদিনের খাবারের অঙ্গ ছিল। প্রকৃত অর্থেই দুধে-ভাতে বাঙালি এই প্রবাদ এখানে পুরোপুরি বাস্তব ছিল।

নাশতা জাতীয় খাবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উরুম (মুড়ি), ওড়া (মুড়কি জাতীয় খাদ্য), চালের করই-এর লাড়ু (নাড়ু), খৈঅর লাড়ু (খইয়ের নাড়ু) ইত্যাদি। নাশতা

www.pathagar.com

হিসেবে রান্না করা শিমদানা সাথে গুড় মেখে খাওয়া যায়। এছাড়াও আলু দিয়ে মেখে খই খাওয়ার প্রচলনও ছিল।

সাধারণ ও গরিব পরিবারে সকালের খাবার হিসেবে সেকালে পান্তা ভাত ও ফাতরা শুটকির ব্যবহার ছিল। তার সঙ্গে তেলে ভাজা বা আগুনে পোড়ানো শুকনো মরিচ ছিল অপরিহার্য।

সকালের নাশতা হিসেবে মধুভাতও ছিল পছন্দনীয় খাবার। তবে মধুভাত নিয়মিত খাওয়া হতো না। কারণ মধুভাত করতে সময় এবং খরচের বিষয় ছিল। অতিথি আগমন এবং ঘরে জামাতা বা বেয়াইর বাড়ির লোকজন আসলেই অবশ্যি মধুভাত করা আবশ্যক। মেয়ের শাশুড় বাড়িতে বছরে অন্তত একবার মধুভাত দেওয়া বাধ্যতামূলক।

কক্সবাজার অঞ্চলে মধুভাত তৈরির পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মধু ভাত করতে হয় বিন্নি চাল দিয়ে। মধু ভাতের সাথে চিনি, গুড় বা খেজুর গুড়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মধুভাতের প্রধান উপকরণ হচ্ছে জালাচাল বা জালাচাউল। এই জালাচাউলই চিনি, গুড় বা খেজুর গুড়ের বিকল্প। জালাচাউল থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণের মিষ্টি বের হয়। (জালাচাউল করার জন্য বীজধানকে কমপক্ষে তিন বা চারদিন ভিজিয়ে রাখতে হয়। ধানে যখন অংকুর উদগম হতে থাকে তখন পুকুর থেকে বীজধান তুলে রোদে দিয়ে শুকনো হয়। ধান একদম শুকিয়ে গেলে ঢেঁকিতে ছেটে চাল বের করতে হয়। ঢেঁকি ছাটাই করার পরে যে চাল বের হয় তা খুবই মিষ্টি। ফলে ওখানে আর চিনি বা গুড় বা খেজুরগুড় লাগে না।) আগের দিন সন্ধ্যা বা রাতে বিন্নি চাউল রান্না করতে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে রান্না করা ভাত পরিষ্কার খাবার পানিতে ছেড়ে দিতে হয় এবং পরে উক্ত পানিতে মিশানো ভাতে পরিমাণ মত 'জালাচাল' মিশিয়ে নিতে হয়। পরে উক্ত জালাচাল মিশ্রিত ভাতে নারিকেল মিশিয়ে নিলে মধুভাত তৈরি হয়ে গেল। এর মধ্য দিয়ে মধুভাত খাবারের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। মধুভাত প্রস্তুত হওয়ার পরে খাবারের জন্য পরিবেশন করা হয়। বিন্নি চালের মধুভাত বিধায় তা খাবারে এক ধরনের মাদকতা আসে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে 'জালাচাল'-এর অভাবে চিনি বা দুধ মধুভাতে ব্যবহার করা হয়। শুধু কি তাই! সাম্প্রতিক সময়ে এই মধুভাতই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম মধুভাত কী জিনিস হয়তো-বা দেখবেই না।"[৯]

গুড় ও নারকেল সহযোগে বিন্নি ভাত ও কাঁকন চালের ভাতও খাওয়া হতো সকালের নাশতা হিসেবে। সাধারণ ও গরিব পরিবারে খেজুর রস দিয়ে কিংবা সুরুয়া বা ঝোল দিয়ে জাউভাত খাওয়ার রীতি ছিল।

এছাড়াও বাঁশের চোঙ্গাতে রান্না করা বিন্নি ভাতও সকালের নাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানেও শীতকালে কক্সবাজার শহরে বাঁশের চোঙ্গার বিন্নি ভাত বিকিকিনি হয়। বিশেষ করে জেলার রাখাইন অধ্যুষিত এলাকায় বাঁশের চোঙ্গায় বিন্নি ভাত বিক্রির প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে বার্মার আরাকান প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় বাঁশের চোঙ্গার বিন্নি ভাতের প্রচলন রয়েছে।"[১০]

সকাল-বিকালের নাশতা হিসেবে নানা রকম শুকনো খাবারের প্রচলন ছিল চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : করই (চালবাজা), করই বা কড়ইর লারু (নাড়ু), বাতাসা, গজা ইত্যাদি। শীতকালে সকালে-বিকালে নাশতা

www.pathagar.com

হিসাবে হুরুম (মুড়ি), লারু (নাড়ু), মুড়কি, মোয়া ও খইয়ের চল ছিল। মুড়ি খাওয়া হতো গুড় অথবা নারকেল দিয়ে। তেল-মরিচ মাখানো ঝালমুড়ির প্রচলন শুরু হয়েছে বেশি দিন হয় নি।

এ ছাড়াও প্রচলন ছিল নানা রকম মিষ্টি খাবারের। যেমন : লারু (নাড়ু), নাইরকল্লা লারু (নারকেলের নাড়ু), খউলা (মোয়া), শিরনি, বাতাসা, গুড়ের জিলাপি, হাল্ল (হালুয়া) ইত্যাদি। মিষ্টি খাবারের মধ্যে ক্রমে খাজা, লবঙ্গ, ছক্কার দানা, গজা ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পিঠা কক্সবাজার জেলাবাসীর অন্যতম প্রিয় লোকখাদ্য। উৎসব-অনুষ্ঠানে এখানে নানা রকমের পিঠার প্রচলন দেখা যায়। যেমন : কাঠইল্যা পিডা (কাঁঠালে রস দিয়ে তৈরি এক ধরনের পিঠা), কেলা পিডা (চালের আটা ও কলা দিয়ে তৈরি), তালর পিডা, চিতই বা চিতল পিডা, চুঁয়া পিডা (বাঁশের চোঙায় তৈরি পিঠা), পাক্কন পিডা (তেলে ভাজা পিঠা। তবে পাক্কন পিঠা তৈরিতে চালের গুড়োর সাথে কলা, নারিকেল দিতে হয়। কেউ কেউ কালিজিরা, মিষ্টিজিরাও দিয়ে থাকে। এতে করে পিঠার মধ্যে একটা খুবই মিষ্টি সুগন্ধি আসে। কলার পরিমাণ বেশি হলে তেলে ভাজার সময় পিঠা ফুলে উঠে), একাধিক রকমের পাক্কন পিড়া রয়েছে। এসব পাক্কনের মধ্যে রয়েছে বিয়াসা পাক্কন, হাজেরা পাক্কন, তিল পিঠা, ধুপ পাঁইস, ক্ষীর ফুলি, জালা পিডা, আতিক্যা পিড়া (নারিকেল কেটে কুচি কুচি করে, পাকা কলার সাথে বিন্নি চাউল মিশিয়ে আতিক্যা পিঠা তৈরি করা হয়। আতিক্যা পিঠা তৈরিতে একটি বিশেষ কৌশল রয়েছে। গরম পানির ভাপ বা স্টিম দিয়েই আতিক্যা পিঠা তৈরি করতে হয়। পানি ভর্তি ডেকসির উপরে ছিদ্রযুক্ত মাটির পাতিলে আতিক্যা পিঠা রেখে গরম পানির ভাপ দিয়ে আতিক্যা পিঠা তৈরি করা হয়। আতিক্যা পিঠা কলা বরক বা কলা পাতা দিয়ে মুড়িয়ে তৈরি করা হয়), পুলি পিড়া, নাইরকল পুলি পিড়া, লেদা পুলি, পাইচ পিডা (পাটিসাপটা), হাতঝাড়া পিডা, ধুঁই পিডা বা ধুপি পিঠা (ভাপাপিঠা), চুটকি পিডা, গুরা পিডা, বলা পিড়া, ছাইন্যা পিডা, খিরমিজ্জা ভাত, পুয়া পিডা (তেলে ভাজা পিঠা), তিন-কোনা গড়গড়া পিডা ইত্যাদি।"[১১]

এই পিঠা পুলি তৈরিকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, লোকছড়া, লোকগল্প, লোকধাঁধাসহ হরেক রকমের লোকসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যেতে পারে একটি ধাঁধা-

প্রশ্ন: ছুৎ ছাৎ তের, পাতত্ কিয়া তিন।

উত্তর: খারে ভাইয়া খা, আরো তিন্নান্ দিম্।

বর্ণনা : ঘরে স্ত্রী পিঠা তৈরি করছে। স্বামী খেতে বসেছে। স্ত্রী স্বামীকে মাত্র তিনটি পিঠা খেতে প্লেট দিলো। তখন স্বামী স্ত্রীকে ছন্দের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করছে 'ছুৎ ছাৎ করে পিঠা তৈরি করেছো তেরোটি' কিন্তু আমাকে দিলা মাত্র তিনটি কেন? স্ত্রী স্বামীর প্রশ্ন বুঝতে পেরে স্বামীকে উত্তর দিচ্ছে, 'ভাইয়া খেতে থাকো তোমাকে আরো তিনটি দেব'।"[১২]

www.pathagar.com

একই ভাবে স্বামী বিরহী নারীর পিঠা তৈরি ও প্রিয় স্বামীর অপেক্ষমান অবস্থায় নারীর বিরহকে লোকসংগীতের রূপ দিয়ে গায়েন গেয়েছেন এভাবে-

"আইজ্যা মন খুশি ভাইয়াইনলে, দিল খুশি
পিড়া খলা বানারলে বইনে চুল্‌লিন এরি দি
হায় হায়রে মর ...
অভইনরে ---
খসম রইয়ে পরবাস, আইবো বলি পাইয়ে আশ
তালর পিড়া বানার ভৈইনে- আইস্যে ভাঁদ মাস
হায় হায়রে মর ...
অভইনরে ---
ভাঁদ মাইস্যা পঁঅনা তাল, রসে ভরা দেইতে লাল
তালর পিঁড়া খাইতে মিড়া ন ফিল্‌লঅ কুয়াল
হায় হায়রে মর ...
অভইনরে ---
বন্ধু আমার আইল না, তালর পিঁড়া খাইল না
চিক্কাত তুলি রাইখ্যাম পিড়া- ক' দিন জানি না"
হায় হায়রে মর ..."[১৩]

শবে কদর, শবে বরাত ও কুরবানি ঈদে মুসলিম পরিবারে লুডি পিডা বা চালের রুটি গোস্তের তরকারি অথবা হালুয়া সহযোগে খাওয়ার প্রচলন ছিল।

মাংস জাতীয় খাবারের মধ্যে সচ্ছল পরিবারে মাঝে মাঝে খাদ্য হিসেবে কুরার (মোরগ/মুরগি) গোস্ত ব্যবহৃত হতো। বিয়ের সময় ও বিয়ের পর জামাইকে রাতা কুরা (মোরগ) ও পুরুষ হাঁসের মাংস খাওয়ানোর রীতি ছিল। ডিম পাওয়ার জন্য সাধারণত মুরগি ও মাদি হাঁস জবাই করা হতো না।

দুধের তৈরি খাবারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো গরু, ছাগল ও মোষের দুধ ও দই। দুধের তৈরি খাবারের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল ক্ষীরের মোয়া, শিরনি ইত্যাদি। এছাড়া দুধের তৈরি ঘি, মাখন, মলাই (ছানা) ছিল উল্লেখযোগ্য খাদ্য।

পানীয় হিসেবে দুধ তো ছিলই। এ ছাড়া পানীয়ের মধ্যে গুড়ের শরবত, গুড় ও দই মিশিয়ে তৈরি দই-শরবত উল্লেখযোগ্য। গুড় ও দই মিশিয়ে তৈরি করা শরবত বিয়ের বৈরাতিদের খাওনোর প্রচলন ছিল বেশি। গরমের দিনে পথযাত্রার ক্লান্তি দূর করতে কচির (লেবুর) শরবত, তেঁতই (তেঁতুল) শরবতের চল ছিল।"[১৪]

আরাকানি প্রভাবে কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করা মাছ-মাংস-শুটকি একসময় চট্টগ্রামবাসীর প্রিয় খাবার হয়ে ওঠে। বর্তমানে সৌদি আরবের মক্কা মোকাররমায় রোহিঙ্গা মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় কাচা মরিচের তরকারির ব্যবহার দেখা যায়।

কক্সবাজর অঞ্চলে ধর্মীয় সম্প্রদায় ভেদে খাদ্যের ব্যাপারে কিছু বিধি-নিষেধ ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন কিয়ারা বা কিঁআরা (কাঁকড়া), কচ্ছপ, চেউয়া (চিংড়ির মতো দেখতে লাল রংয়ের সামুদ্রিক মাছ), হ'র বা হঅর (হাঙ্গর), পাতা মাছ,

www.pathagar.com

হউছ মাছ (করাত মাছ) খাদ্য হিসেবে গণ্য করলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে খাদ্য হিসাবে তা গ্রহণ করা নিষেধ। সেকালে বর্ণ হিন্দুরা মোরগ-মুরগি খেত না। ধর্মীয় কারণে গরুর মাংস খাওয়া তাদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। সেকালে হিন্দুসমাজে ধর্মীয় ছুৎবাই ছিল প্রখর। মুসলমানের হাতে রান্না করা ভাত, রুটি খাওয়ার ব্যাপারেও তাদের বিধিনিষেধ ছিল। বর্তমানে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজন কাঁকড়া খাবারের তালিকায় গ্রহণ করেছেন। কাঁকড়াকে চিংড়ির ন্যায় ফ্রাই করে এবং সুপ হিসেবে খাওয়ার প্রচলন দেখা যায়। হউছ মাছ বা করাত মাছও কাটলেট করে খেতে দেখা যাচ্ছে।"[১৫]

কক্সবাজার জেলার সর্বত্র বিভিন্ন লোক-উৎসব-অনুষ্ঠানের খাদ্যতালিকায় বেশ কিছু লোকখাদ্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এসব লোকখাদ্যের মধ্যে রয়েছে মুসলিম বিয়ে, জামাইভাতা, বেয়াইভাতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গরুর মাংস ও ভাত খাওয়ার চল ছিল। সম্মানী অতিথিদের জন্যে দুরুচ কুরা বা পুরো মুরগির রোস্টের ব্যবস্থা হতো। (কোমল বা অল্প বয়সের মোরগ বা মুরগি নিয়েই দুরুচ করা তৈরি করা হয়। দুরুচ কুরার প্রচলন এখনো আছে)। সঙ্গে পোলাও। একে বলা হতো দুরুচ-পোলাও। প্রক্রিয়া-করা আস্ত মুরগি সিদ্ধ করে নিয়ে মরিচ-মশলা মাখিয়ে আগুনে সেঁকে নিয়ে তারপর তেলে বা ঘিয়ে ভেজে নিলে তৈরি হয় দুরুচ কুরা। তা খাওয়া হতো ভাত বা পোলাওয়ের সঙ্গে। পুরো মাছ ভুনাও অতিথি আপ্যায়নে ব্যবহৃত হতো।

লোকখাবার নিয়ে কক্সবাজার অঞ্চলে লোকছড়াও প্রচলিত রয়েছে। যেমন- 'দুরুছকুরা মুচরা, জামাইর কথা দুছরা।'

আবার অনেক সময় ঠাট্টা মশকরা করে ছড়া আওড়ানো হয় এভাবে, 'বিয়াই আইলে খিয়াই কথা, জামাই আইলে বাক্কা রাতা'।"[১৬]

মরিচ ও মশলা সহযোগে রান্না করা গোস্তের ঝাল তরকারি খাওয়া হতো ভাত বা পোলাওয়ের সঙ্গে। মানী অতিথিদের জন্যে কখনো কখনো দেওয়া হতো কুরার 'মোচম্মান' বা মুরগি-মুসল্লাম। মোচম্মান হল মরিচ ছাড়া অন্যান্য মশলা এবং দধি-দুধ সহযোগে রান্না করা শুরকা বা ঝোলসহ আস্ত মুরগি। মোচম্মানের সঙ্গে ডিম ও দোপেয়াজা দেওয়া হতো।

কক্সবাজার জেলাবাসী মুসলমানরা বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে শত শত বা হাজার হাজার অতিথির জন্যে যে খাবারের আয়োজন করে থাকেন তা মেজ্জান বা মেজবান নামে পরিচিত। এ ধরনের মেজ্জান বা মেজবানের আয়োজন করা হয় নবজাত শিশুর আকিকা, মেয়েদের কান ছেঁদানো, ছেলেদের খতনা, ওরস, বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে। তবে কোনো মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গল ইত্যাদি উপলক্ষে ফৈত্যা, বা 'মেলা' বা 'চালিশা' বা জেয়াফত দেওয়া হয়। ইছালে সওয়াবকে স্থানীয়ভাবে ফাতেহা পড়ানো বলা হয়, আর সে কারণেই ফাতেহা পাঠকে সংক্ষিপ্ত করে ফৈত্যা বলা হয়। এই জেয়াফত অনুষ্ঠানের উপরে উল্লেখিত মতে গরু, ছাগল, মহিষ বা গয়াল জবাই করে মেহমান খাওয়ানোর বিধান এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের অনুষ্ঠানের বিশেষ খাদ্যতালিকায় সাদাভাতের সঙ্গে সাধারণত তিন ধরনের তরকারি পরিবেশিত হয় : ১. কড়া মরিচ ও মশলা সহযোগে রান্না করা ঝাল গোস্ত, ২. কম ঝাল, মশলা ও টক

www.pathagar.com

সহযোগে রান্না করা গরুর নলার শুরুয়া, ৩. ঢেঁকিতে গুড়ো করা মাসকলাই দিয়ে রান্না করা ডাল. ৪. হারাকাজি। কক্সবাজার অঞ্চলে মেজবান বা অন্য উৎসবে খাবার তালিকায় 'হারাকাজি' নামের একপ্রকারের লোকখাবার দেখা যেত। পাকা শসার বাকল, গরুর হাড়, কিছু কিছু মাংসের সমন্বয়ে 'হারাকাজি' রান্না করা ছিল। পরিমাণ মতো পিয়াজ, মরিচ ও মশলা, লবণ মিশিয়ে রান্না করা খাবারের নাম 'হারাকাজি'। সে সময় 'ডাল'-এর পরিবর্তে এই হারাকাজি ছিল খুবই জনপ্রিয় খাবার। এটা খেতে অত্যন্ত উপাদেয়।

বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে আয়োজিত মেজবান, ওরস-এ এই 'হারাকাজি'র ব্যবহার ছিল বেশি। মাংসের পরে 'হারাকাজি' দিয়েই খেতে হতো দ্বিতীয়বারের ভাত। প্রাচীনকালে মেজবানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মাটির সানকিতে করে খাবার দেয়া হতো। লম্বা পাটি, মাদুরা বা চাটাই বিছিয়ে খাবার পরিবেশন করা হতো। সেটা ধনী-গরিব সবার জন্যই। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাছের পাতার উপর খেতেও দেখা গেছে। বর্তমানের মতো ডেকোরেশন ছিল না। ছিল না খাবারের জন্য লম্বা টেবিল-চেয়ারের ব্যবহার।"[১৭]

উৎসব-অনুষ্ঠানের উপাদান হিসেবেও লোকখাদ্যেরও প্রচুর ব্যবহার ছিল। যেমন : পান-তেল দেওয়া, কান ছেদানি, হাদি খাওয়ান প্রভৃতি মেয়েলি অনুষ্ঠান উপলক্ষে পান, সুপারি, খদ (খয়ের), চুন, সাদাপাতা, নারকেল তেল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সেকালে বিয়ের নিমন্ত্রণ করা হতো পান-সুপারি দিয়ে। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিয়েতে বাড়ির দরজায় যে মঙ্গলঘট বসানো হতো তাতে ডাব বা নারিকেল ব্যবহৃত হতো। মুসলিম বিয়েতে দুলা সাজানো উপলক্ষে পাঁচ কুলা ধানের চাল দিয়ে শিরনি রেঁধে পরিবেশন করা হতো।

বরপক্ষকে অভ্যর্থনা জানানো হতো পান-মিঠা দিয়ে আর দুলাকে অভ্যর্থনা জানানো হতো পান, সুপারি, মিড়া বা গুড় ও শরবত দিয়ে। বউ-জোড়নি অনুষ্ঠানেও পান-মিঠা দেওয়ার চল ছিল। হিন্দু বিয়েতে দধিমঙ্গল অনুষ্ঠানে বর-কনেকে দই দিয়ে ভাত খাওয়ানো হতো। এ সম্প্রদায়ের বিয়েতে চৌদোলায় চড়ে বর যাত্রা শুরু করলে খই ছুঁড়ে সম্মান দেখানো হতো। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শুভ কাজে বরণকুলায় স্বাস্থ্য ও সজীবতার প্রতীক হিসেবে কাঁচকলা ও কাঁচা পেয়ারা এবং সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে কাঁচা হলুদ ব্যবহার করা হতো।

হিন্দু ও বৌদ্ধদের বরণকুলার অন্যতম উপাদান ছিল ধান ও সরিষার তেল। অন্যদিকে মুসলমানসমাজে বরণকুলার অন্যতম উপাদান ছিল পিঠা। মুসলিম বিয়েতে সালামি হিসেবে পান, সুপারি ও বাতাসার প্রচলন ছিল। বর ও বরযাত্রীরা বিয়ের আসরে আসন নিলে পান-গুড় (পান ও মিষ্টি) দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হতো। হিন্দু বিয়েতে বধূবরণে চাল, টাকি মাছ, মিঠা ভাত, দুধ, কলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। বর-বধূর অধিবাস ভঙ্গ করা হতো তাদের কলার থোর ও কলমি শাকের তরকারি খাইয়ে। বিয়ের দিন গণক, নাপিত, ধোপা প্রমুখকে যে উপহার দেওয়ার রীতি কক্সবাজারে প্রচলিত তাতে অন্যান্য উপহারের সঙ্গে চাল ও ডাল দেওয়া হতো।"[১৮]

www.pathagar.com

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাত মাসের পোয়াতি মেয়েদেরকে তার বাবার পরিবারের পক্ষ থেকে বিশেষ ধরনের খাবার দেওয়া হয়। 'হাদির খানা' নামের এই খানাতে বিভিন্ন পদের তরকারি থাকে। এই নিয়ে এ অঞ্চলে রয়েছে লোকছড়া। যেমন-

"সাতঅ মাসের কালে যাদু, হাদির খানা খায়।

আটঅ মাসের কালে যাদু, মোকামেতে যায়।"

মেয়ের বিয়ের পরে কনের বাড়ি থেকে প্রায় সময়ে রকমারি খাবার তৈরি করে নতুন জামাই-এর জন্য প্রেরণ করা হয়। একই সাথে বিভিন্ন পিঠা বিশেষ করে ঋতু ভিত্তিক পিঠা তৈরি করে কনের বাড়ি থেকে বরের বাড়িতে পাঠানো হয়। তবে নববধু যখন সাত মাসের গর্ভবতী হয় তখন তার জন্য পিতৃ গৃহ হতে রকমারি খাবার যেমন–নানা রকম পিঠা-পুলি, কোর্মা, পোলাও, মাছের ফ্রাই, ডিম, দুরুচকুরার (মুরগির রোস্টকে কক্সবাজারে দুরুচকুরা বলে) পাশাপাশি আলুভত্তা, বেগুনভত্তা, শুটকিভত্তা, মরিচচুরা বা মরিচভর্তা, আমসত্ত, আচারসহ বিভিন্ন খাবার তৈরি করে নেয়া হয়। কনের পিতৃগৃহ থেকে আনা সব খাবার থেকে একটু একটু করে অন্তঃসত্তা বধুকে খাওয়ানো হয়। কনের দাদি, নানি বা ভাবীরা মূলত কনেকে এসব খাইয়ে থাকে। এ ভাবে গর্ভবতী কনেকে খাওয়ানকে 'হাদি খাওয়ান' বলে।"[১৯]

হাদি খাওয়ান একটি লোকজ আচার হলেও গ্রামাঞ্চলে যারা অর্থশালী এবং যাদের প্রাচুর্যেরও অভাব নেই তারাই এ আচারটি বর্তমানেও চালু রেখেছে। এ আচারটি জেলার হিন্দু, বড়ুয়া এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মভেদে কিছুটা পৃথক পৃথকভাবে চালু আছে।

লোকখাদ্য কেবল মানুষের জীবন ধারণের সঙ্গে যুক্ত নয়, ভৌগোলিক পরিবেশ, নানা লোকাচার এবং উৎসব-অনুষ্ঠানের সঙ্গেও এর রয়েছে গভীর সংযোগ। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও লোকবিশ্বাসের ভিত্তিতে লোকখাদ্যাভ্যাসে গড়ে উঠেছে নানা বিধিনিষেধ। কক্সবাজারে লোকখাদ্যে সমুদ্র, পাহাড়, সমতল ও নদীর প্রভাব যেমন লক্ষণীয়, তেমনি লক্ষণীয় বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রভাব।

বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন ও আধুনিকতার প্রভাবে কক্সবাজারে লোকখাদ্য ক্রমেই হারিয়ে যেতে বসেছে। বিদেশি খাবারের দিকে আমাদের আকর্ষণ বাড়ছে। ঘরে ঘরে চিপস, নুডুলস, চানাচুর, ফাস্ট ফুড, বিভিন্ন ধরনের সুপ, কনফেকশনারি-খাদ্যের আধিপত্য তৈরি হয়েছে।

উৎসব-অনুষ্ঠানে জায়গা করে নিয়েছে ফ্রায়েড রাইস, কাচ্চি বিরিয়ানি, ফ্রুট সালাদ ইত্যাদি। শহর ছাড়িয়ে সুদূর পল্লিগ্রামেও লেগেছে তার হাওয়া। ফলে লোকখাদ্য এখন অস্তিত্বের সংকটে আবর্তিত। তবে আশার কথা, ঐতিহ্যের টানে এবং ফাস্টফুডসহ আধুনিক অনেক খাবার স্বাস্থ্যের জন্যে হুমকি বলে বিবেচিত হওয়ায় আবার নতুন করে লোকখাদ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ বাড়ছে।

www.pathagar.com

*কক্সবাজারে বলা পিঠা বানানোর দৃশ্য। চাল, আটা অথবা ময়দার গুড়ো, গুড় অথবা খেজুর রস ও নারকেল দিয়ে এই পিঠা তৈরি করা হয়।*

www.pathagar.com

প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের রান্নায় ছিল ডাল, মাছ আর শাক সবজির তরকারি। দুধ, দই ইত্যাদি নিত্য আহার্যের মধ্যে ছিল। সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে চার-পাঁচ রকমের তরকারি রান্না করা হতো। বিশেষ পরবে বা অতিথি আপ্যায়নে মাংস রান্না হতো।

গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া দিনমজুর ও চাষিরা প্রায়ই দুপুরের খাবার জমির পাশে আলের উপর বা জমির নিকটবর্তী গাছের ছায়ায় বসে খেতেন। তাদের খাবারের মধ্যে পান্তাভাত, শুটকির তরকারি, ডাল, শুকনো মরিচ ইত্যাদি প্রচলন ছিল।

উৎসব, অনুষ্ঠানও নববর্ষে নানা খাদ্যসামগ্রী ও পিঠা তৈরির প্রচলন ছিল। বিনি ধানের খই, চিড়া, মুড়ি, মোয়া, নারকেলের সন্দেশ, তালের পিড়া, ছইপাক্কন, লেদা পুলি, হাতঝারা পিড়া, আন্তসা পাক্কন, ছাঁচ পাক্কন, বিনিভাত, মধুভাত, চুটকি ও গুরা পিড়া, কড়ই (চালভাজা), কড়ইয়ের লাড়ু, খইয়ের মোয়া, চিতল পিড়া, ভাপাপিঠা বা ধুঁই পিড়া, পাটিসাপটা ইত্যাদি জনপ্রিয় ছিল।

**কক্সবাজারের মিডা বা গুড়**

মিডা বা গুড় কক্সবাজারের আরো একটি লোকখাদ্য। মিডা বা গুড় তৈরি হয় মূলত আখ বা ইক্ষু হতে। আখকে স্থানীয়ভাবে 'কুইশ্‌শুইল' বলা হয়। কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে 'কুইরশিয়াল'ও বলে। কেন যে কুইরশিয়াল হয়েছে তা বলা যাচ্ছে না। তবে আঁখ শিয়ালের খুবই প্রিয় খাবার। আখের ভেতরে মিষ্টি রস আছে বলেই শিয়াল আঁখ খেতে বেশি আগ্রহী। যার ফলে গেরস্থ আখ চাষীরা শিয়ালের হামলা থেকে আঁখ রক্ষার জন্য আখক্ষেতে কুকুর বেঁধে রাখার দৃষ্টান্ত কক্সবাজারের ছিল। আঁখ নিয়ে কক্সবাজার অঞ্চলে লোক ধাঁধাও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন-

"আল্লাহ্‌র কি কুদরত
লাডির ভুতরে শরবত। উত্তর : আঁখ, ইক্ষু।"[২০]
"আগা লল্‌লইস্‌সা পাতা খসখইস্‌সা
খাদে মাইয়নি রাক্‌কইস্‌সা। উত্তর : আঁখ, ইক্ষু।"[২১]

বিগত কয়েক দশক আগেও কক্সবাজারের বিভিন্ন গ্রামে আঁখের রস থেকে স্থানীয়ভাবে কথিত মিডা বা গুড় তৈরি করা হতো। গুড় তৈরি করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অস্থায়ীভাবে ঘর নির্মাণ করা হতো। এই অস্থায়ী ঘরের সাথে লাগোয়া খনন করা হতো গর্ত। চুলায় আগুন জ্বালিয়ে রস ফোটাবার জন্য প্রায় ১০ থেকে ১৫ ফুট ব্যাসের গর্ত তৈরি করা হতো। আঁখের রস ফোটাবার জন্য প্রায় একই সাইজের গোলাকার কড়াই পূর্বেই বাজার থেকে কিনে আনতে হতো। এসব কড়াই বাজারের কামারকে পূর্বেই ফরমায়েশ করে তৈরি করে রাখা হতো। পরে আঁখ মাড়াই করে তার রস কড়াইয়ে দিয়ে আগুনে ফুটিয়ে গুড় তৈরি করা হতো। রাতের বেলায় আঁখের রস থেকে গুড় তৈরির খবর অনেক দূর থেকে জানা যেতো। রাতের বেলায় আঁখের রস ফুটিয়ে গুড় করতে গেলে অসম্ভব মিষ্টি একটি ঘ্রাণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো; এতে করে সহজেই বলা যেতো ওখানে গুড় তৈরি করা হচ্ছে। বর্তমানে জেলার চকরিয়া ও রামু উপজেলার কোথাও কোথাও আঁখের চাষ হলেও তা থেকে গুড় তৈরি করা হয় না।

www.pathagar.com
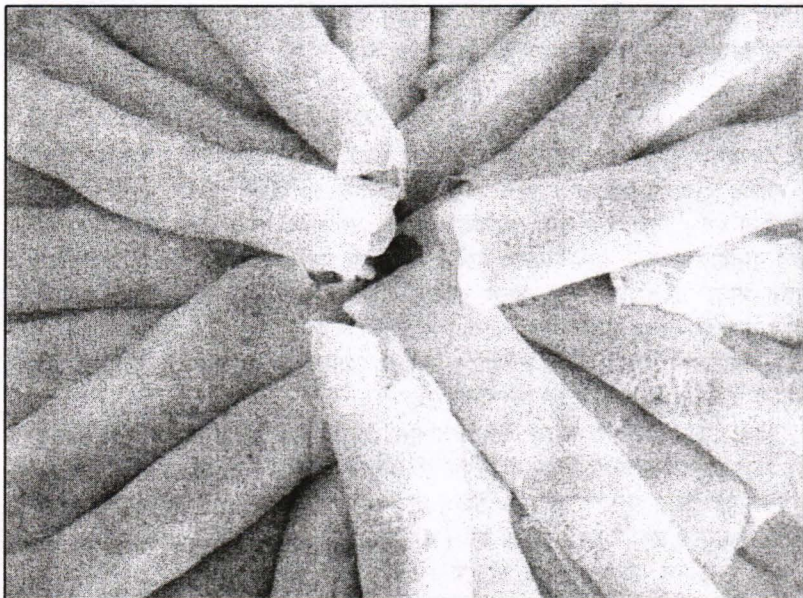
*কক্সবাজারে গ্রামে এখনো পাটিশাপটা (স্থানীয় ভাবে পাইচ পিঠা বলা হয়) ও নকশী পিঠা তৈরি করার দৃশ্য দেখা যায়।*

www.pathagar.com

বর্তমানে আঁখ শুধু বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য চাষ করা হচ্ছে। যার ফলে বর্তমানে গুড় তৈরির ঘ্রাণ আর ইচ্ছে করলেও পাওয়া যাবে না।"[২২]

### নাপ্পি বা হিদল

নাপ্পি বা হিদল রাখাইন সম্প্রদায়ের অন্যতম খাদ্য। জেলার প্রতিটি রাখাইনপল্লিতেই এই নাপ্পির ব্যবহার রয়েছে। তবে সমুদ্র উপকূলীয় রাখাইনপল্লিতেই নাপ্পি বা হিদল তৈরি করা হয়। সেই আদিকাল থেকেই রাখাইন সম্প্রদায় নাপ্পি তৈরি করে। বর্তমানে নাপ্পির ব্যবহার শুধুমাত্র রাখাইনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির খাদ্য তালিকার প্রথম স্থানে রয়েছে নাপ্পি। ফলে এই নাপ্পি তৈরি বর্তমানে জেলার রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি শিল্প হিসেবে পরিণত হয়েছে। কক্সবাজারের বিভিন্ন উপজেলায় তৈরি নাপ্পি বর্তমানে পার্বত্য বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়িসহ রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে বিপণন হচ্ছে।

"কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলাধীন চৌফলদণ্ডি, মহেশখালি উপজেলাধীন মুদিরছড়া, টেকনাফ উপজেলাধীন হ্নীলা চৌধুরীপাড়া এলাকায় জেলার কিছু সংখ্যক রাখাইন নাপ্পি তৈরি পেশার সাথে জড়িত। বঙ্গোপসাগর থেকে ছোট ছোট চিংড়ি মাছের প্রজাতি সংগ্রহ ও ক্রয় করে শুকানো হয়। শুকানো মাছ ঢাঁক-ঢেঁকি ও অন্যান্য যন্ত্র দিয়ে মণ্ড করে কিছুদিন রেখে বিশেষ নিয়মে নাপ্পি তৈরি করা হয়। নাপ্পি শুকানোর গন্ধ অনেকের কাছে বিরক্তিকর ও অসহ্য হলেও পেটের টানে যারা এসব ব্যবসা করছে তাদের কাছে এধরনের গন্ধ আশীর্বাদ স্বরূপ।

*কক্সবাজারের চৌফলদণ্ডিতে রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজখাদ্য নাপ্পি তৈরির দৃশ্য*

www.pathagar.com

কেননা মাছ পাওয়া না গেলে বেকার হয়ে ঘরে বসে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ থাকে না। তাছাড়া বর্তমানে অনেক বাঙালি ব্যবসায়ী নাপ্পির পেশায় জড়িত হওয়ায় রাখাইনদের মাথাব্যথার উপক্রম হয়েছে। শুকনো মাছ দিয়ে ছাইরঙের নাপ্পি বা হিদল তৈরি করা হয়।

রাখাইন জনগণ বিভিন্ন তরকারিকে অধিকতর সুস্বাদু করার জন্য তরকারি ও অন্য প্রয়োজনী খাবার সামগ্রীতে নাপ্পি ব্যবহার করে। কক্সবাজার অঞ্চলে তৈরি নাপ্পির পার্বত্য জেলাসমূহে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। নাপ্পি ব্যবসা করে অনেকে বৃহৎ অট্টালিকা করেছে এমন রাখাইন ব্যবসায়ীও রয়েছে। প্রতি কেজি নাপ্পি একসময়ে ৫-১০ টাকা হলেও বর্তমানে এর দাম ৮০-১০০ টাকা। দামের কারণে অনেকে নাপ্পি খেতে পরে না। নাপ্পি ব্যবসায়িদেরকে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা গেলে জাতীয় অর্থনীতিতেও তারা অবদান রাখতে পারবে।"[২০]

বর্তমানে নাপ্পি তৈরির কাজে জেলার প্রায় এক হাজারের অধিক পরিবার জড়িত। মূলত শুষ্ক মওসুমেই এই নাপ্পি তৈরি করা হয়। সূর্যের আলোতেই নাপ্পির প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ফলে বর্ষাকালে নাপ্পি তৈরি সম্ভব নয়। জেলার কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদণ্ডি ইউনিয়নের পশ্চিম রাখাইনপাড়ায় (স্থানীয়ভাবে পশ্চিম মগপাড়া নামেই খ্যাত) শুষ্ক মওসুমে চলাচল করলেই বুঝা যায় ওখানে নাপ্পি তৈরি করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে জনপদের লোকজনকে জানমাল রক্ষার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড যে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করেছে উক্ত ভেড়িবাঁধের উপরেই নাপ্পি তৈরি করে শুকানো হয়। এতে করে ওখান থেকে চলাচলের সময় নাপ্পির উৎকট গন্ধে চলাচল করা দায়।

## তথ্যনির্দেশ

১. প্রফেসর মুফীদুল আলম, বয়স : ৭২, সভাপতি, সঙ্গীতায়তন পরিচালনা কমিটি, লালদিঘির পশ্চিম পাড়, কক্সবাজার। তারিখ : ২০-০৬-২০১২, সময় : সন্ধ্যা : ৬টা।
২. ছাবের আহমদ, পিতা : ফরুখ আহমদ, মাতা : ধলু বিবি, বয়স : ৫৯ বছর, গ্রাম : পশ্চিম উমখালী, ইউনিয়ন : দক্ষিণ মিঠাছড়ি, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১৭-১০-২০১৩, সময় : সকাল : ১০টা।
৩. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-৭২।
৪. কবি সুলতান আহমদ, পিতা : আলী আহমদ, মাতা : জরিনা খাতুন, বয়স : ৬২, গ্রাম : বালুখালী, ইউনিয়ন : পালংখালী, উপজেলা : উখিয়া, সিনিয়র আইনজীবী, কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালত, কক্সবাজার, তারিখ : ১৪-০৪-২০১২, সময় : বিকাল-৫টা।
৫. এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী, পিতা : শমসের আলম চৌধুরী, মাতা : নূরুন নাহার চৌধুরী, বয়স : ৬০ বছর, গ্রাম : কোটবাজার, ইউনিয়ন : রত্নাপালং, উপজেলা : উখিয়া, সিনিয়র আইনজীবী, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, কক্সবাজার, তারিখ : ১৬-০৭-২০১৩, সময় : বিকাল-৫টা।
৬. কবি খালেদ মাহাবুব মোর্শেদ, পিতা : সাইফুল্লাহ খালেদ, মাতা : মাহবুবা খানম, বয়স : ৪১ বছর, সিনিয়র শিক্ষক, মহেশখালী আইল্যাণ্ড হাইস্কুল, মহেশখালী, জেলা : কক্সবাজার, (জন্ম-কুতুবদিয়া উপজেলায়) তারিখ : ১৯-০৭-২০১৩, সময় : সকাল : সাড়ে ৯টা।
৭. কবি রুহুল কাদের বাবুল, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রাক্তন

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান, কালারমারছড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা : মহেশখালী, জেলা : কক্সবাজার, বয়স : ৫৮বছর, তারিখ : ২১০৩-২০১৩, সময় : বিকাল : ৫টা।

৮. কবি আবুল কালাম আজাদ, পিতা : মোজাফ্ফর আহমদ, বয়স : ৭২ বছর, টেকপাড়া, কক্সবাজার পৌরএলাকা, সিনিয়র আইনজীবী, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, কক্সবাজার, তারিখ : ২২-০৫-২০১৩, সময় : সন্ধ্যা-৭টা।

৯. দিলদার বেগম (সম্প্রতি প্রয়াত), স্বামী : মমতাজ উদ্দিন আহমদ, গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাক, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার, জেলা : কক্সবাজার, তরিখ : ১১-১১-২০১১, সময় : সকাল : সকাল ১০টা।

১০. ডা. মায়ে নু, স্বামী : ডা. পুচে নু, শিক্ষক, কক্সবাজর মেডিকেল কলেজ, বয়স : ৫২ বছর, স্থায়ী ঠিকানা : পূর্ব বাজারঘাটা, কক্সবাজার পৌর এলাক্কা, কক্সবাজার, তারিখ : ২৩-০৩-২০১২, সময় : সকাল-সাড়ে ৯টা।

১১. জাহানারা বেগম, পিতা : সুলতান আহমদ, মাতা : আলতাজ বেগম, বয়স : ৫৬ বছর, গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাক, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৫-০৯-২০১২, সময় : সকাল-১০টা।

১২. ছমুদা বেগম, স্বামী : মোহাম্মদ আলী, বয়স : ৬৫ বছর, গ্রাম : পালাকাটা, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৮-০৬-২০১২, সময় : সকাল ১০টা।

১৩. সিরাজুল হক, পিতা : শাহাব মিয়া, মাতা : নীলা খাতুন, বয়স : ৬৩ বছর, গ্রাম : উয়ালাপালং ঘিলাতলী, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার। তারিখ : ০১-১০-২০১১, সময়- সকাল সাড়ে ৯টা।

১৪. কবি জয়নাল আবেদীন মুকুল, পিতা : এডভোকেট মোমতাজুল হক, মাতা : রেজিয়া বেগম, বয়স : ৫৫, বাজারঘাটা, প্রধান সড়ক, কক্সবাজর পৌরএলাকা, কক্সবাজার, তারিখ : ২৮-০৩-২০১২, সময় : সকাল সাড়ে ৯টা।

১৫. কবি আবুল কালাম আজাদ, পিতা : মোজাফ্ফর আহমদ, বয়স : ৭২ বছর, টেকপাড়া, কক্সবাজার পৌরএলাকা, সিনিয়র আইনজীবী, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, কক্সবাজার, তারিখ : ২২-০৫-২০১৩, সময় : সন্ধ্যা-৭টা।

১৬. ছমুদা বেগম, স্বামী : মোহাম্মদ আলী, বয়স : ৬৫ বছর, গ্রাম : পালাকাটা, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৮-০৬-২০১২, সময় : সকাল ১০টা।

১৭. ডা. কবির আহমদ হোমিওপ্যাথ, পিতা : আবদুর রশিদ, বয়স : ৮৪ বছর, টেকপাড়া, পৌরএলাকা, কক্সবাজার, তারিখ : ২২-০৯-২০১৩, সময় : সকাল : ১০টা।

১৮. প্রফেসর মোশতাক আহমদ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রামু ডিগ্রি কলেজ, রামু, কক্সবাজার, বয়স : ৭৫ বছর, তারিখ : ১৭-১০-২০১২, সময় : সকাল : ১০টা।

১৯. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-৬১।

২০. কক্সবাজারের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-১৫০।

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬০।

২২. সুলতান আহমদ মনিরী (অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, মনিরঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়), পিতা : আলহাজ্ব আবদুল হাসিম, মাতা : রজিমা খাতুন, বয়স : ৬৫ বছর, গ্রাম : মনিরঝিল, ইউনিয়ন : কাউরখোপ, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৭-০৭-২০১২, সময় : সকাল-সাড়ে ৯টা।

২৩. বাংলাদেশের রাখাইন- ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা-মং বা অং (মং বা), প্রকাশক : লেখক, প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭।

www.pathagar.com

# লোকনাট্য ও লোকনৃত্য

## ক. লোকনাট্য

লোকনাট্য পরিবেশনায় থাকে গীত, নৃত্য ও অভিনয়। নিরক্ষর সাধারণ মানুষ লোক নাট্যের ভিতর থেকে নিজেদের নানাভাবে নতুন করে আবিষ্কার করে। পরিবেশনকালে একই সময়ে আনন্দ ও জীবনদর্শনকে খুঁজে পায়। "গ্রামীণ-বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত পুরাণ, বিশ্বাস, রূপকথা, উপকথা, ধর্মীয় চরিত্র বা সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রকে অবলম্বন করে যেসব নাটকীয় আখ্যান বাড়ির উঠানে, মন্দিরের প্রাঙ্গণে বা খোলা আকাশের নিচে দর্শকদের উপস্থিতিতে গ্রামের মানুষেরাই অভিনয় আকারে উপস্থাপন করে থাকে নাট্যকলা ও ফোকলোর বিশেষজ্ঞদের বিচারে সে-সকল পরিবেশনাসমূহকে লোকনাট্য বলা হয়।"[১]

লোকনাটক পরিবেশন হয়ে থাকে বিভিন্ন উপলক্ষে। বিশেষ করে সনাতনী পদ্ধতিতে চিকিৎসাব্যবস্থায় দৈত্য-দেও তাড়ানো, জ্বীন হাজির করে অসুখ-বিসুখ সারানোর ক্ষেত্রে। স্থানীয় লোকজনের মাঝে অনাদিকাল থেকে প্রচলিত বিশ্বাস বহমান যে, জ্বীনের আছর (ভর করা) করার ফলে মানুষ পাগল হয়। ফলে উক্ত দুষ্ট জ্বীনকে হাজির করার মাধ্যমে তাকে বোতলে ভরে মাটির ভেতরে পুঁতে ফেলার মাধ্যমে পাগলরোগ সারানো হয়। একারণেই পাগলের লোকচিকিৎসা হচ্ছে 'গাছা' বসিয়ে জ্বীন-ভূতকে হাজির করে রোগ সারানো। গাছা শুরুতেই মা মগিনীকে হাজির করার জন্য সুরের লহরি ছুটিয়ে শারীরিক কসরত শুরু করে এবং মাকে আহ্বান জানাবে এভাবে– "আয়রে মা মগিনী আয়রে আয়" বলে। কথিত মাকে বশে আনা গেলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। তাই কাব্যের নন্দিত ছন্দে গ্রামীণ আদি সুরের মোহিনী ঝংকারে মাকে আহ্বান করা হয়, যেন ধরা দেন। এ হলো মানুষের আদি অবস্থার ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক-এর অবশিষ্টাংশ। গাছার কার্যক্রম চলার সময় গাছা ও বৈদ্য পরস্পর কথোপকথনের মাধ্যমে এক বিচিত্র কল্পকাহিনির জন্ম দেয়। যা উপস্থিত মানুষকে একেবারে কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যায় এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো অভিভুত করে রাখে। মোহাচ্ছন্ন মানুষ বৈদ্যের তান্ত্রিক তালে তালে বিভোর হয়ে যায়। একসময় ভূত, প্রেত, জ্বীন বা পরী বৈদ্যের চালানে ও বানে আত্মসমর্পণ করে। বৈদ্য এ দুষ্টচক্রকে বোতলে বন্দি করে তা মাটিতে পুঁতে ফেলে। তারপর পানিপড়া (মন্ত্রপড়া পানি) অথবা তাবিজ দিয়ে জ্বীনভুতে পাওয়া রোগীকে সুস্থ করে তোলে। এভাবে গাছার কার্যক্রমের অবসান ঘটে। গাছা ডাল গেয়ে (নৃত্যের মাধ্যমে গান গাওয়া হচ্ছে ডাল গাওয়া), নৃত্য করে, অভিনয় করে, বৈদ্যের সাথে কথোপকথন করার মাধ্যমে কথিত জ্বীন হাজির করে। পাগলের চিকিৎসা বা হারানো দ্রব্য-সামগ্রী খুঁজে আনার জন্য যে জ্বীনকে হাজির করার

www.pathagar.com

যে পদ্ধতিতে লোকনাটক পরিবেশিত হয় সে পালাগুলো হয়ে থাকে লৌকিক পীর ও দেবতার মহাত্ম্য প্রকাশক বহুবিধ নাট্যাখ্যান বা গানের পালা।

লোকনাটকের বয়াতি, দোহার বা শিল্পী এবং দর্শক নিরক্ষর সাধারণ মানুষ। গুরু পরম্পরায় স্মৃতিনির্ভর পালাগুলো মুখে মুখেই প্রচার হয়ে আসছে।

## ১. যাত্রা

কক্সবাজার জেলার যাত্রা পরিবেশনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের নয়। আর কক্সবাজারে নিজস্ব কোনো যাত্রার দলও নেই। দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কক্সবাজারে এসেই যাত্রা পরিবেশন করতো, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

## ২. পালাগান

পালগান, জারিগান, কবিগান প্রায় একই ধরনের। পালা অর্থ কিসসা বা কাহিনি। কোনো কাহিনি বা কিসসার উপর ভিত্তি করেই পালাগান রচিত বা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আনুষ্ঠানিকভাবেই এসব পালাগান, জারিগান, কবিগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। দর্শকের প্রতিক্রিয়া ছাড়া পালাগান, জারিগান, কবিগান অর্থহীন। কক্সবাজারসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের পালাগানের মধ্যে নিজাম ডাকাতের পালা, মলকা বানুর হঁওলা, পরীবানুর হঁওলা, সুজা তনয়ার বিলাপ, হাতী খেদা, নছর মালুম, আমির সওদাগর-ভেলুয়া সুন্দরির কাহিনি, পোজলা বিবির পালা উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামের বোয়ালখালি উপজেলার কৃতীসন্তান আশুতোষ চৌধুরী বৃহত্তর চট্টগ্রামের পালাগানগুলো সংগ্রহ করেছেন। তিনি জীবনের ঝুকি নিয়েই এসব পালা সংগ্রহ করেছেন। এব্যাপারে আমরা বাংলা একাডেমি প্রকাশিত '*আশুতোষ চৌধুরীর রচনা ও সংগ্রহ-সম্ভার* মোমেন চৌধুরী সম্পাদিত গ্রন্থে জানতে পারি। আশুতোষ চৌধুরীর সংগ্রহ আমাদের তথা বৃহত্তর চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক দলিলরূপে স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকবে।

"মুদ্রাযন্ত্র কর্তৃক এই গানটির বিশেষরূপে প্রচার হওয়াতে আদত গানটি (ভেলুয়া) সুদুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আমাদের অসীম অধ্যাবসায়শীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কিছুতেই হটিয়া পড়িবার লোক নহেন। তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের এই পালাটি উদ্ধার করিয়াছেন এইজন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। চাটগাঁয়ের এ. বি রেলওয়ে পাহাড়তলী স্টেশনের নিকট ভেলুয়ার দীঘির ধারে বসিয়া সমস্ত নিকটবর্তী পল্লীগুলির মধ্যে ভেলুয়ার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিরসে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। কত নরনারী তাঁহাকে ভেলুয়ার কাহিনী সম্বন্ধে অদ্ভুত ও অপূর্ব গল্প শুনাইয়াছে। ...আশুবাবু সরল কৃষকদের মুখে এইরূপ নানা উপাখ্যান শুনিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন। কিন্তু কোথায় আদত পালাটি পাইবেন সেই ভাবনায় তাহার দিবারাত্র চোখে ঘুম ছিল না। তিনি আমাকে লিখিয়েছেন, 'এমনও দিন গিয়াছে যে আমি সারাদিন পল্লীতে পল্লীতে অভুক্ত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।" কিন্তু কোনো সন্ধান মিলে নাই। অবশেষে পুলিশ স্টেশন রাজউানের অধীন কাগোয়ান গ্রামের জেবল হোসেন (১৯৮৫ সালে চট্টগ্রামে বাংলা একাডেমীর একটি ফোকলোর টিম ফিল্ডওয়ার্কে গিয়ে জেবল হোসেন পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জেবল হোসেন পণ্ডিত ছিলেন

www.pathagar.com

পুথির একজন দক্ষ ব্যাখ্যাকার) নামক একটি লোকের নিকট তিনি পালাগানটির কতকটা অংশ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পরে চট্টগ্রাম জেলার লাম্বুর ঘাটের ইসমাইল নামক জনৈক সাম্পানের মাঝির নিকট হইতে আরও কিছু সংগৃহীত হইল। এই আদত গানগুলি কবিত্ব ও করুণ রসের উৎস। কিন্তু এগুলি অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়াও তাঁহার তৃষ্ণা মিটিল না।... এই সময় তিনি শুনিতে পাইলেন রাঙ্গুনিয়া থানার অধীন পোমরা গ্রামে এক বৃদ্ধ মুসলমান গায়ক পালাগানটির সন্ধান জানে।... এই গায়কের নাম ওমর বৈদ্য। তাহার বয়স সত্তরের উপরে। যদিও সে সম্পূর্ণ নিরক্ষর (চট্টগ্রামে এদের 'মুখপণ্ডিত' বলে), তাঁহার মস্তিষ্ক পালাগানের এক বৃহৎ আড়ৎ। সে এত পালাগান মুখে মুখে বলিয়া যাইতে পারে যে, এই অদ্ভুত লোকটির ক্ষমতা দেখিয়া আশুবাবুর বিস্ময়ের শেষ রহিল না। দন্তচিকিৎসা সে একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন তাহার একমাত্র বন্ধু, মনের কথা বলিবার সামগ্রী এবং সহায় ও সম্পত্তি তাহার সারেঙ্গটি। সে অতি দরিদ্র, জীর্ণ শীর্ণ লতাবেষ্টিত এক কুঁড়েঘরে বাস করে। তাহার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর গলায় কতকগুলি কাচের মালা ও হাতে কাচের চুড়ী, কিন্তু সে তাহার সারেঙ্গটির কানগুলি রূপায় বাঁধাইয়া দিয়াছে।... সে সেই সময় (বাল্যে) তাহার গুরু ইয়াসিন আলির নিকট পালাগান গাহিতে শিখিয়াছিল।... আশুবাবু লিখিয়াছেন, "১৯২৬ সালের ১৮ই অক্টোবর আমি সন্ধ্যা ৬টা হইতে পরদিন বেলা ১২ টা পর্যন্ত এই আঠার ঘণ্টা কাল, তাহার মুখে ভেলুয়ার গান শুনিয়াছিলাম। যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা বা নিদ্রার বোধ ছিল না। মাঝে মাঝে যখন স্ত্রী বিরহে অর্দ্ধোন্মাদ আমির সওদাগরের দুঃখ সে গাহিয়া নিজে চোখের জল ফেলিত তখন কাহারও চক্ষু অনার্দ্র থাকিত না। সেই দীর্ঘ রজনীটি একটি স্বর্গীয় সঙ্গীতের কুহকে আমাদের নিকট কয়েক মুহূর্তের ন্যায় স্বল্পস্থায়ী বোধ হইয়াছিল।" (পূর্ববঙ্গ গীতিকা ৩য় খণ্ড: ২য় সংখ্যা ১৯৩০। পৃষ্ঠা ৭৫-৭৭)"[২]

পালাগান পরিবেশনের আগে প্রাচীনকাল থেকে কবিরা বন্দনাগীত দিয়ে শুরু করেন। জারিগান, কবিগান, পথকবিতা বা ভাটগান বা চারণ কবিতা পাঠ করার সময় বন্দনা করতে হয়। প্রাচীনকাল থেকে কবিদের মধ্যে যা চলে আসছে তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। "আমাদের প্রাচীন কবিদের মধ্যে হিন্দুরা গ্রন্থসূচনায় দেবদেবীকে এবং মুসলমানেরা পীর-পয়গম্বরকে বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ বন্দনা-গীতিতে তাঁহাদের ধর্মভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তাঁহারা নিজেদের শক্তি অপেক্ষা দৈবশক্তির উপর বেশি করিয়া নির্ভর করিতেন। আবার কোনো কোনো কবি পূর্ববর্তীর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বাংলা কাব্যে সাহিত্যের যুগ প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তের আমল পর্যন্ত এ রীতির ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে না। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে কবি সরস্বতী দেবীকে আহবান করিয়া বলিয়াছেন–

বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভূজে
ভারতী! যে মতি মাতঃ বসিলা আসিয়া
বাল্মিকীর রসনায়, পদ্মাসনে যেন।
০ ০ ০ ০ ০

www.pathagar.com

তেমনি দাসেরে আসি দয়া কর সতি

০ ০ ০ ০

নরাধম আছিল যে নর, নরকূল
চৌর্য রত, হইল তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়। হে বরদে! তব বরে চোর
রত্নাকর, কাব্য রত্নাকর কবি।"
আবার কবি অন্যত্র এভাবে বন্দনা শুরু করে–
"প্রথমে বন্দনা করলাম আল্লাজির চরণে
দ্বিতীয় বন্দনা রইলো গো-নবীজির চরণে॥"

চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি বিখ্যাত পালা 'ভেলুয়া'। কক্সবাজারের মহেশখালি উপজেলার মহেশখালি চ্যানেল সংলগ্ন বর্তমান শাপলাপুর ইউনিয়নের আমির সওদাগর তথা আমির সাধু পালার প্রাণপুরুষ। মহেশখালি চ্যানেলে শাপলাপুর ইউনিয়ন সংলগ্ন জে এম ঘাট (জলিয়ারমার ঘাট) একটি প্রাচীন নৌ-বন্দর। শাপলাপুর ইউনিয়ন পূর্বে দ্বীপ-উপজেলা মহেশখালির কালারমারছড়া ইউনিয়নের আওতাধীন একটি অংশ ছিল মাত্র। পরবর্তীতে ভৌগলিক কারণেই শাপলাপুরকে নিয়ে পৃথক ইউনিয়ন গঠন করা হয়। চট্টগ্রামের বোয়ালখালি উপজেলার আশুতোষ চৌধুরী উক্ত পালাটি সংগ্রহ করেন। পালাটি নিম্নে উদ্বৃত করা হলো :

**ভেলুয়া**

চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ভেলুয়ার গানে পল্লিবাসীদের প্রাণের কথা। এই গান শুনিয়া এখনও শত শত নরনারীর হৃদয় বেদনাতুর হইয়া উঠে এবং তাহাদের নয়ন পলব হইতে নিরন্তর কতশত অশ্রুবিন্দু এই কাব্যের উপর নিপতিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। পল্লিসাহিত্য প্রকাশকদের চার পাঁচটি বিভিন্ন সংস্করণের ভেলুয়া পুথি আমরা পাইয়াছি। তন্মধ্যে হামিদুলা প্রণীত ভেলুয়ার পুথিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। ঢাকা শহরের অন্তর্গত চুরিহাট্টার হামিদিয়া প্রেস হইতে মহম্মদ আলী নামক এক ব্যক্তির দ্বারা ইহার আরেকটি ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। নয়াপাড়া গ্রামনিবাসী মকবুল আহমদ সম্পাদিত ভেলুয়ার পুথি চট্টগ্রামে এবং নোয়াখালী অঞ্চলে সমধিক প্রচলিত। ইহাও তেমন বৃহৎ ব্যাপার নহে। হামিদুল্লার ভেলুয়ার পুথি সম্প্রতি দুস্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই তিনজন গাথা সাহিত্য প্রচারক ভেলুয়ার পালা সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা করিতে মূলত ইহার আখ্যানবস্তু অভিন্ন। ভেলুয়ার পালা বিষয়ে গবেষণা করিতে হইলে কেবলমাত্র প্রকাশিত পুথিগুলি আঁকড়াইয়া না ধরিয়া এখনও সুদূর পল্লিগ্রামে ভেলুয়ার যেসব পালাগায়ক রহিয়াছে, তাহাদের গানের উপর সর্বাধিক নির্ভর করিতে হইবে। এই সকল গায়কের বর্ণনার সহিত উপরোক্ত পুথিগুলির তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে। যাঁহারা পুথির আকারে পল্লির গাথাসাহিত্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আমরা একটা সাধারণ ত্রুটি দেখিয়া থাকি অর্থাৎ তাঁহারা যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহাতে নিজের কিছু না কিছু কারিগরি না দেখাইয়া ছাড়েন নাই। এমন কি অনেকেই স্বীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে গিয়া নানা অবান্তর কথা ও আবর্জনারাশি পল্লি সাহিত্যে

www.pathagar.com

জুড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং ঐ পুথিগুলিতে আমরা কৃষক কবির সরল হৃদয়ের মাধুর্য এবং গ্রাম্য রচনাভঙ্গির সৌন্দর্য মোটেই দেখিতে পাই না। আমাদের চাষী ও মাঝিমাল্লার ভাটিয়ালী গীতগুলিও অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা এরূপে রূপান্তরিত হইয়া উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে। সেজন্য এ সকল গান নিবিড় রসধারায় পরিণত হইয়া এখন আর তেমন উপভোগ্য হইতেছে না।

প্রায় দশ বৎসর হইল, পোমরা গ্রামনিবাসী ওমর বৈদ্য নামক একজন গায়কের মুখ হইতে আমি ভেলুয়ার করুণ কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই পালাগানটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। পালা গায়ক ওমর একেবারে নিরক্ষর হইলেও এ বিষয়ে একজন পারঙ্গম ব্যক্তি। সে মুখে মুখে এত গান গাহিতে পারে যে, মনে হয় তাহার মস্তিষ্ক যেন পালাগানের একটি বৃহৎ আড়ৎ। আমি ইহার বাল্য ও যৌবনের ইতিহাস শুনিয়াছি, শৈশবে ওমর গাজীর দলে নাচিত। শৈশবে তাহার কোঁকড়ান কোঁকড়ান দীর্ঘ চুল গ্রীবা বাহিয়া স্কন্ধের উপর পড়িত এবং তাহার মুখখানিতে বালিকার ন্যায় কমনীয়তা ছিল। সে তাহার ওস্তাদ সুপ্রসিদ্ধ গায়েন ইয়াসিন আলীর নিকট হইতে এই ভেলুয়ার পালা শিখিয়াছিল। ভেলুয়ার পুথির মধ্যে যে সকল অবাস্তব ও উদ্ভট কল্প-কাহিনী বিদ্যমান রহিয়াছে ওমরের গান সেরূপ নহে, ইহা অনেক বাস্তবসম্মত। ওমরের বর্ণনায় ভেলুয়া চরিত্রে অবিচলিত ধৈর্য্য, অপূর্ব দুঃখ সহনক্ষমতা, ভুবনবিজয়ী প্রেম ও সংযম আমাদের অভিভূত করিয়াছে। এই নারীচিত্র অমর বর্ণে উজ্জ্বল। শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ্গ হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত আরেকটি ভেলুয়ার পালা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয় ও কাব্যকথায় ইহা পূর্বোক্ত অন্যান্য সংগ্রহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। চন্দ্রকুমার বাবুর ভেলুয়া হিন্দু রমণী এবং ইহার লীলাক্ষেত্র শঙ্খপুর, কাঞ্চন নগর প্রভৃতি গ্রাম শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত। আমার এবং চন্দ্রকুমারবাবুর সংগৃহীত উভয় পালার ভূমিকা লিখিতে যাইয়া ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন চট্টগ্রামেই ভেলুয়ার লীলাক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং আমার সংগৃহীত পালাটিরই ঐতিহাসিক মূল্য দিয়াছেন।

হামিদুল্লা খাঁ প্রণীত 'তারিখ ই হামিদী' নামক চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ফার্সী ইতিহাস গ্রন্থে 'ভেলুয়ার গীত' বর্ণিত ঘটনায় উল্লেখিত আছে, কাব্যোক্ত ঘটনা হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের সময়ে ষোড়শ শতাব্দীতে সংঘটিত হইয়াছিল।

সুদূর পল্লিগ্রামে একসময় ভেলুয়ার পালাটি মুসলমান কৃষক রমণী কর্তৃক বিবাহবাসরে গীত হইত। এই জাতীয় গান হাঁওলা নামে পরিচিত। এখনও ভেলুয়ার গান বিচিত্র অবয়বে বিভিন্ন পলি অঞ্চলে প্রচলিত রহিয়াছে।

আমরা পল্লিগায়কের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। গায়ক মহেশখালি দ্বীপের অন্তর্গত শাফলাপুর বন্দর এবং তথাকার প্রসিদ্ধ মানিক সদাগরের কাহিনি বর্ণনা করিতেছে–

আচানক[১] মুলুক সেই রে শাফলা বন্দর
তারে পরছিমে সদাই গরজে সাইগর॥
ঘাটের মাঝে বাঁধা থাকে হরেক রকম ডিঙ্গা।

মাঝিমালা গহিন রাইতে ফুকারি যায় শিঙা॥
দোকানী পশারী কতো কারে কনে চিনে
কেহ বেচে নানান জিনিষ কেহ আবার কিনে॥
পন্থে ঘাটে চলে মানুষ হাজারে হাজার
নুকা নারা কত আছে নাইরে শুমার॥
বৈদেশী বন্দর হৈতে লৈয়া মালামাল
হুংকারি জাহাজ আসে তুলি জুইতর[২] পাল॥
শাফলা বন্দরের মালিক মাণিক সদাইগর
ধনদৌলতে পুন্ন যে তান[৩] গুদাম কোটাঘর।

এই সদাগরের সর্বগুণান্বিত রূপবান পুত্র আমির সাধু একদিন পক্ষী-শিকারে সমুদ্রতীরে যাইবার সঙ্কল্প করিল। অমঙ্গল আশঙ্কায় স্নেহময়ী মাতা বাধা দিলেন, কিন্তু পিতা মাণিক সদাগর পুত্রের শিকারযাত্রায় বাধা দিলেন না। কেবলমাত্র মাঝি গৌরলধরকে বলিলেন, 'তোমরা সমুদ্রের কিনারা বাহিয়া যাইও এবং বাতাস আসিলে সাবধান হইও।' মাঝি গৌরলধর সমুদ্রের কিনারা বাহিয়া চলিল। তরুণ যুবক নিজেই হাল ধরিল। তখন ফাল্গুনের উতলা বাতাস, উন্মত্ত তরঙ্গে সমুদ্র তখন ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। সেই সমুদ্রের তরঙ্গ ভেঙ্গে নাচিতে নাচিতে ডিঙ্গা উল্কাবেগে ছুটিল।

ছুটিতে ছুটিতে ডিঙ্গা মাঝ দরিয়ায় পৈল
ঢেউএর উপরে ডিঙা নাচিতে লাগিল॥
মানুষে কি বুঝে ভাইরে আলার কেরামত[৪]
মাঝ দরিয়ার মাঝে ডিঙ্কা হারাইল পথ॥
হু হু করি ছুড়িল বাতাস পালৎ পৈল টান
পরিচয় না রৈল রে ভাডা কি উজান॥
এক ঢেউএ উড়েরে ডিঙা আকাশ বরবার
আর ঢেউএ যায়রে ডিঙা পাতালর ভিতর॥
উতর দক্ষিণ পুগ পরছিস হৈল ভিনাভিন[৫]
কন দিগরথুন কন দিগে যায় কিচ্ছু ন রৈল চিন॥
ঘুরিতে লাগিল ডিঙা কি কহিব আর
গৌরলধরর মাথাৎ যেন পড়িল ঠাডার॥

পিতৃআজ্ঞা এবং গৌরলধরের নিষেধবাণী অবহেলা করাতে আমির তখন অনুতপ্ত হইয়াছে।

থরথর কাঁপে আমির সাইগরের ডাকে
ডিঙ্গা যে ঘুরের যেন কুমারের চাকে॥
আমির সাধু বলে, "এবার পৌঁছিলে মোকামে
হাজার টাকার ছিন্নি দিয়ম গাজী কালুর নামে॥"
খালাসী টেণ্ডল ডাকে 'বদর' 'বদর'
দড়মতে[৬] ছুয়ান ধৈল মাঝি গৌরলধর॥
আলারে ভাবিয়া দিল উতরমিক্যা[৭] পাড়ি

কড়মড় শব্দ করের পালর বাঁশবাড়ী[৮]।
পঙ্খীর মত ডিঙা উড়িয়া চলিল
একদিন পরে তারা কূলর দেখা পাইল॥

এবার তাহারা দেয়াঙ্গের পাহাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। পরদিন আমিন এবং গৌরলধর শিকারে চলিল। তাহারা দেখিতে পাইল নদীর কূলে ফুলের বাগান। এবং গাছের উপর এক ঝাঁক কবুতর বসিয়া আছে। তাহার মধ্যে একটি কবুতর বড়ই অপূর্ব, মানুষের মতন কথা কহিতে পারে। এবং মুখে মুখে 'কলেমা' অর্থাৎ 'লা এলাহা ইল্লাল-াহ' কোরানের এই বাণী উচ্চারণ করিতে পারে।

শুনিয়া কৈতরের মুখে কোরানের বাণী
আমির সাধু ভাবে তারে কেম্নে ধরি আনি!
বড়ই সেয়ানা কৈতর যায়রে উড়ি উড়ি
তাহারে ধরিতে সাধুর চিন্তা হৈল ভারি॥
গৌরলধর গাছে গাছে লাসা[৯] লাগাইল
ডিঙ্গা হৈতে জাল আনি যত্তনে পাতিল।
গাছের আড়ালে সাধু রৈল লুকাইয়া
হরান হৈয়ারে কৈতর চলিল উড়িয়া॥
তড়াতড়ি আমির সাধু কি কাম করিল
কামটার[১০] মাঝে গুলি খেচি[১১] সেই কৈতর মারিল॥

এখানেই আখ্যায়িকাটির নূতন দৃশ্যপট উন্মোচিত হইল। এই পালার নায়িকা ভেলুয়া এই কবুতরের অধিকারিনী।

টঙ্গীর মাঝে বসি ছিল ভেলুয়া সোন্দরী
তেঁইর বুগে পৈল কৈতর ধড়ফড় ধড়ফড় করি॥
কৈন্যার কাঁদন শুনি দাসী বাঁদীগণ
টঙ্গীর উরে আসি দিল দরশন॥

ভেলুয়ার পিতা মনুহর তেলইন্যা নগরের ধনী সদাগর ছিলেন। তিনি সাতটি পুত্র এবং এক কন্যা ও স্ত্রী মনাই সুন্দরীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ভেলুয়ার রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া গায়ক বলিতেছে–

সাত ভাইয়র ভৈন ভেলুয়া পরমা সোন্দরী
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকুলের পরী॥
কাছে গেলে দেখা যায়রে সোনার পত্তিমা
সোন্দর লাখে ভেলুয়ার চোখের ভঙ্গিমা॥
আঙ্খির তারা যে কৈন্যার অতি মনোহর
পদ্মা ফুলর মাঝে যেন রসিক ভোমর॥
ভাল পুষ্প পাই ভোমরা মধু করে পান
সোন্দর লাগেরে কৈন্যার বাঁকা দুনয়ান॥
হাসিতে বিজলী ঝরে অতি চমৎকার
চাচর চিকন কেশ পায়ে পড়ে তার॥

www.pathagar.com

হস্ত সোন্দর পদ সোন্দর যেন কুন্দর শলা
গায়ের রঙ যেন তার চিনি চাম্পা কলা॥
চান্নির মতন মুখ করে ঝলমল
রাঙ্গা ঠোঁট যেন তার তেলাকুচি ফল॥
বার বচ্ছর হৈয়ে কৈন্যার তের নাহি পুরে
একাশ্বরী থাকে কৈন্যা জোড় মন্দিরের ঘরে॥

ভেলুয়া টঙ্গীর উপর বসিয়া যখন আরামে দিন কাটাইতেছিল, তখন আমির সাধু, তাহার অতি প্রিয় কবুতরটা মারিয়া ফেলিল। ভেলুয়ার সাত ভাই এই খবর পাইয়া সমুদ্রের কিনারে ছুটিয়া আসিল। আমির সাধুর সহিত দেখা হইলে তাহারা কবুতর মারিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা আমির সাধুকে বন্দী করিল। গৌরলধর এবং অন্যান্য মাঝিমাল্লারা কেহই বাধা দিতে পারিল না। ইহারা আমির সাধুকে বন্দীখানায় আনিয়া তাহার বুকে সাতমন ওজনের একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর চাপা দিয়া রাখিল।

দুঃখ যে হৈল কত আমির সাধুর
পাষাণের ভারে তার সিনা হয় চূর॥
অকান্দনা কান্দের সাধু চৈক্ষে বহে পানি
কোথায় রৈল পিতারে তার দুলভ জননী॥
তার দুঃখ দেখিয়ারে পানিৎ কান্দি মাছ
বনর পশু পঙ্খী কান্দে আর বিরিক্ষ গাছ॥
তাহার কান্দনে বুগর পাষাণ গলি যায়
রাও ধরি কান্দের[১২] সাধু করি হায়রে হায়॥

এই কান্না শুনিয়া ভেলুয়ার জননী মনাই সুন্দরীর হৃদয় বিগলিত হইল। আমির তখন তাহার মাতাপিতার নাম লইয়া কাঁদিতেছিল-

কোথায় বৈলা বাপজান মানিক সদাইগর
এমন নিদানর কালে[১৩] না লৈলা খবর॥
কোথায় আমার মা জননী সোনাই সোন্দরী
এমন নিদানর কালে রহিলা পাশরি॥

মানিক সদাগর এবং সোনাই সুন্দরীর নাম শুনিয়া ভেলুয়া জননী বিচলিত হইলেন।

ধীরে ধীরে আসি বুড়ী দেখিবারে পায়
সোনার বরণ যাদু ভূমিতে গড়ায়॥
তার কাছে যাইয়া বুড়ী পুছিল খবর
"কার বেটা যাদু তুমি কন্ দেশে ঘর।"

আমির যথাযথ পরিচয় প্রদান করিল। এখানে আরেক দৃশ্যপটের অবতারণা—

পরিচয় শুনি বুড়ী কাঁদিয়া উঠিল
সাত পুতরে ডাক দিয়া কহিতে লাগিল
"ফেলাইয়া দাওরে যাদুর বুগর পাষাণ
তোমরা লৈলা আমার ভৈনপুতর পরাণ॥"

www.pathagar.com

সাতমনি পাথর তারা দিল রে লামাই
বুড়ী যাইয়া ভৈনপুতরে ধরিল বেড়াই॥

আমিরের পরিচয় পাইয়া ভেলুয়ার সাত ভাই খুব লজ্জিত হইল। এবং তৎক্ষণাৎ আমিরকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাহার বুক হইতে সাতমন ওজনের প্রকাণ্ড প্রস্তরখানি তুলিয়া লইল। বলা বাহুল্য যে, নব পরিচয় প্রাপ্ত মাসীর বাড়িতে আমিরের অভ্যর্থনার ত্রুটি রহিল না।

ঐদিকে করিল কিবা ভেলুয়ার মাতা
সাতপুতরে ডাকিয়ারে কৈত লাগিল্ কথা॥
"পরাণের পুত তোমরা শুন মন দিয়া
সোন্দরী ভেলুয়া কৈন্যা তারে দিয়ম বিয়া॥
ভৈনের সঙ্গে সত্যে বাঁধা আছি ছোডকালে
তেইর পুতরে বিয়া দিয়ম আমার বেটী হৈলে॥"

ভেলুয়ার সাত ভাই মাতার এই সত্য রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তাহারা দেখিল যে এই আমিরই ভেলুয়ার যোগ্য বর। ধুমধামের সহিত শুভক্ষণে আমির ও ভেলুয়ার বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহে পাড়া প্রতিবেশীর ভুরি ভোজনের ত্রুটি হইল না।

বিয়া শাদী গত রে হৈল শুন সভাজন
দেশে যাইতে আমির সাধু কৈল আয়োজন॥
সাত ভাইয়ের বৌ আসিয়া সাজায় ভেলুয়ারে
দাঁতে মিস্কি নাকে নথ পরাইল তারে॥
আঁচুরি বিচুরি চুল কৈল লড়া লড়া
তার উয়রদি তুলি দিল মণি মুক্তার ছড়া॥
গলাতে পরাইয়া দিল সোনার হাঁছুলি
নাকৎ দিল করম ফুল কানৎ দিল কলি॥
তোরল তারল[১৪] পিন্ধে দোছরা বাজুবন
দোন হাতৎ পরাই দিল সোনার কাঙ্কন॥
চুলেতে মাখিয়া দিল আতরের পানি
মাথার উয়রে দিল সীতার[১৫] ঢাকনি॥
ঘুংঘুরু পরাই দিল দোন পায়ের মাঝে
সোন্দরী ভেলুয়া সাজিল অপরূপ সাজে॥
সাজিয়া মাজিয়া কৈন্যা ধীরে বাড়াই পা
ঝন ঝন ঝুন ঝুন শুনা যায়রে অলঙ্কারের রা॥

যথাসময়ে আমির ভেলুয়াকে লইয়া শাফলা বন্দরে আসিল। এই বিবাহে তাহার মাতাপিতার আনন্দের সীমা রহিল না। পাড়া প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজন সকলেই নববধুকে দেখিয়া তাহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু আমিরের বড় ভগিনী বিভলা ভেলুয়ার প্রশংসা সহ্য করিতে পারিল না। গায়ক বিভলার রূপ ও স্বভাব বর্ণনা করিতেছে–

আমির সাধুর বড় ভৈন বিভলা তেইর নাম

www.pathagar.com

গোস্ত নাম সারা অঙ্গে অস্থি বেড়ায় চাম॥
পাণ্ডুবর্ণ দেহখানি রক্ত নাহি তায়
পুরুষের মত কেশ হাতে আর পায়॥
যৈবন জোয়ার তবু গাঙ্গে আসে নাই
ডালিম্বের গাছে হায় ফল ধরে নাই॥
ডাঙ্গর ডাঙ্গর চোখ করে ঝলমল
নারীর ছুরত নাই বিভলার অঙ্গে॥
আষাঢ়ের মেওলার মত[১৬] মুখখানি তার
সেই মুখে বাণী যেন তিতা চিরতার॥
এক কথা টানি টুনি দশকথা করে
দাসী বাঁদী কাঁপে সদাই বিভলার ডরে॥
বিষে ভরা সারা পেট রিষে[১৭] ভরা হিয়া
কন কেহ ন করিল এ নারীরে বিয়া॥
তবুও মা বাপের ধরে বড়ই কদর
শত দোষের মাঝে পায়রে মায়ের আদর॥

ভেলুয়া ননদিনী বিভলার চোখে কুটা হইয়া রহিল। ননদিনীর কীর্তি আমাদের সাহিত্যের অনেকাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। এই পালাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ননদিনী ভ্রাতার নামে স্ত্রৈণ আখ্যা দিয়া তাকে বাণিজ্য পাঠাইয়া দিতে মাতাকে পরামর্শ দিল। মাতা তাই একদিন আমিরকে নিরালায় ডাকিয়া বলিল–

"শুন শুন আমার কথা জানাইয়া যাই
এক্কিবারে তল পৈল[১৮] হোঁসগোঁস নাই॥
কণ্ডে গেয়ে নুকানারা[১৯] নাইরে সমাচার
ঘাটে ঘাটে যত মাল হৈলরে ছারখার॥
বাদশার ধন ফুরাই যায়রে বসি বসি খাইলে
সংসার নষ্ট হয়রে বৌওর বশ্যা হৈলে॥
ইজ্জৎ আবরু খাইলা, খাইলা সদাইগরি
ঘরর মাঝে বসি রৈও বৌতও আঁচল ধরি॥

মায়ের নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়া পরদিন সকালে আমির বাণিজ্যার্থে উজানি নগরে যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।

সোন্দরী ভেলুয়া সেদিন করিল কি কাম
খোরমা খাজুর লৈল কিসমিস বাদাম
দুধ কলা চৈল লৈল, আর লৈল চিনি
খিরসা রাঁধিল ভালা দিয়া ডাবর পানি॥
বাছনে লৈয়া[২০] খিরসা বসিল দুয়ারে
সন্ধ্যাবেলা আমির সাধু পরবেশিল ঘরে॥
চৌখ দুটি ফুলা সাধুর মুখ যে বেজার
ভেলুয়া অবাক হৈয়া চাহে বারে বার॥

www.pathagar.com

আমির সাধু উডি বলে, "শুনরে রূপসী।
আর কতকাল থাইক্যম ঘরর মাঝে বসি॥
রুজি নাই রোজগার নাই কপালেতে পিছা[২১]
ধনদৌলত ন থাকিলে দুনিয়াই মিছা॥
মাতা বলো পিতা বলো হাউসের স্তিরি
গিরাৎ পৈছা[২২] না থাকিলে কেহ্ ন চায় ফিরি॥
মায়ে দিল ঝাঁডা পিছা ভৈনে দিল তাপ
ঘরৎ থাকা দায় হৈল নছিব খারাপ॥"

মিলন রজনী শেষ হইল। পরদিন আমির ডিঙা লইয়া বাণিজ্যে যাত্রা করিল। তখন মাঘ মাস। চারিদিকে গাঢ় কুয়াশা। আমিরের ডিঙাখানি দিক হারাইয়া ফেলিল এবং চারিদিক ঘুরিতে ঘুরিতে আবার শাফলাপুর বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই না নিশিতে আমির কিনা কাম করে
ঘাটে উডি চলি আইল ভেলুয়ার ঘরে॥
কি বলিব ভেলুয়ার দুখের কাহিনী
চারিদিন ছোঁয় নাই ভাত আর পানি॥
সারাদিন কান্দি কৈন্যা ঘুমায় অচেতনে
আমির সদাইগরের মুখ দেখিছে স্বপ্পনে॥
এম্নিকালে আমির সাধুর মনে বড় ডর
এক দুই তিন ডাকে না পাইল উত্তর॥
চাইর ডাকর মাঝে কৈন্যা চেতন পাইল
চোগ কছালিয়া পরে উডিয়া বসিল॥
সাধুর আবাজ শুনি ভেলুয়া সোন্দরী
কোঠার কেবার[২৩] খুলি দিল তড়াতড়ি॥
ভেলুয়ারে দেখি সাধু হৈল পাকল
কূলর মাছ পাইল যেন পানির লাগল্॥
দোনজনে কোলাকুলি গলাগলি করে
চাইর চোগর পানি তারার অঝোরেতে ঝরে॥
ভেলুয়ার চোগর পানি দরেয়ার পানি
ভাসাইয়া দিল সাধুর ভাঙা বুক খানি॥

ভেলুয়া বলিল, 'বাণিজ্যে যাইবার দরকার নাই। এখানে থাকিয়া সামান্য উপার্জ্জন করিলেও আমাদের পক্ষে জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট হইবে।'

আমির বলিল, "শুন কৈন্যা, শুনে আমার বাণী
মা বাপের রোষে কেম্নে ঘরে থাকি আমি!
বাপের ধনে এখন আমার নাইরে অধিকার
নিজে কামাই ন করিলে পরাণে ধিক্কার॥
রুজি ন করি কেম্নে খাইব বাপের ভাত
মুখেতে গরাস দিতে কাঁপে যেন হাত॥"

www.pathagar.com

ভেলুয়া তখন আমিরের দুই পায়ে হাত রাখিয়া বলিল–
আমারে ছাড়িয়া সাধু না যাইও তুমি
হাতের বাজু বেচিয়ারে খাবাইয়ম আমি॥
ন যাইও ন যাইও সাধু কহি বারে বারে
বেচিয়া খাবাইয়ম আমার সপ্তছড়ির হার॥
বৈদেশে বৈপাকে যাইতে আমি করি মানা
বেচিয়া খাবাইয়ম আমি গলার সোনাদানা॥
ন যাইও ন যাইও সাধু আমার প্রাণের ধন
তোমার জন্য বেচিব রে সোনার কাঙ্কন॥
তুমি ত আমার সাধু আশকের পাকল
বেচিব হাঁছুলি আর কানের শিকল॥
না যাইও ন যাইও সাধু ছাড়ি আমার ঘর
পিন্ধনের শাড়ী বেচ্যম সোনালী চাদর॥
তারপরে ভিক্ষা মাঙ্গি খাবাইয়ম তোমারে
না যাইও ন যাইও সাধু বৈদেশে বন্দরে॥

এতদ্‌সত্ত্বেও আমির তাহার কথায় সম্মত হইতে পারিল না। সামান্য খোরমা ও বাদাম খাইয়া সে শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে তাহার ভালো ঘুম হইল না–

তুলাগাছে কুড়গ্যাল ডাকে শুনিয়া আমির
রাত্রি পোহাইল বুলি হৈল ঘরের বাহির॥
পুগ আকাশ লাল হৈয়াছে পাইখ পহলে[২৪] গায়
তেল ফুরান্যা বাত্তির মতো তারা নিবি যায়॥

আমির আর অপেক্ষা করিল না। ঘাটে আসিয়া মাঝিমাল্লাদের জাগাইয়া তুলিল। যথাসময়ে তাহার ডিঙাখানি সমুদ্রের উপর দিয়া উজানী নগরের দিকে রওনা হইল।

এদিকে হৈল কিবা শুন বিবরণ
কেবার খুলি রাখি সাধু কৈরাছে গমন॥
সোন্দরী ভেলুয়া ছিল নিন্দ্রায় কাতর
যাইবার কালে আমির সাধু ন পাইল খবর॥

ঘরের দ্বার খোলা রাখাতেই যত অনর্থ বাঁধিয়া গেল। প্রভাতে বিভলা আসিয়া দেখিল যে, ভেলুয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। সে তাহার মাতাকে ডাকিয়া আনিল এবং ভ্রাতুবধুর চরিত্র সম্বন্ধে এক কদর্য কাহিনীর অবতারণা করিল–

জাগিল ভেলুয়া তখন ঢুলঢুল আঁখি
চমকি উডিল ছাম্নে বিভলারে দেখি॥
কি কাম করিল হায়রে বিভলা তখন
বলিতে লাগিলা কথা করিয়া গর্জন॥
"মজাইলে মা বাপরে মজাইলে কুল
একখান একখান করিয়ারে হারগ্যম[২৫] তোর চুল॥
বাণিজ্যেতে গেলা ভাই মোর চারিদিন হৈল

www.pathagar.com

কালুকা রাতুয়া তোরে কন রসিকে পাইল!
সারারাত্র মজা করিস নূতন বধু[২৬] পাই
তে কারণে ফজরেতে হোঁস গোঁস নাই॥"
ভেলুয়া কহিল কাঁদি মাথা নোয়াইয়া
"সোয়ামী মোর আইসাছিল কালুয়া রাতুয়া॥
কোরান দেও কিতাব দেও খোদার নামে কই
এক সোয়ামী বিনে আমি আর ন জানি দুই॥"

কেহই ভেলুয়ার কথা বিশ্বাস করিল না। এখান হইতে নায়িকার জীবনে দুঃখের সূত্রপাত হইল।

বিভলা কহিল, "তাইরে গাড়িয়া ময়দানে
ফয়লা কুকুর লাগাই দি মারহ পরাণে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া তখন শ্বাশুড়ী সোনাই
ভেলুয়ারে রাইখলো ঘরে কামুলী[২৭] বানাই॥
দাসীর কাম করি ভেলুয়া খায় দুই বেলা
যাতনা দিলরে কত ননদী বিভলা॥
বাহুর বাজু খুলি নিল আর গলার হার
অগ্নি পাটর শাড়ীখানা কাড়ি নিল তার॥
হাতের কাঙ্কন নিল গলার হাঁছুলি
কানের শিকল নাগর নথ নিল সক্কল খুলি॥
ফজলে উডিয়া ভেলুয়া গোবর লেপার
উডান ফুরিতে যায়[২৮] তারপরে হায়
ঘর দোয়ার ফুরে পোঁছে আনে নন্দীর পানি
সোনার অঙ্গ ঢাকে কৈন্যা দিয়া ছিঁড়া কানি॥
একদিন বিভলা যে কি কাম করিল
সাড়ে তিনসের মরিচ আনি বাডিবারে দিল॥
ভেলুয়া কাঁদিল হায়রে মাথা থাবাইয়া
সাড়ে তিনসের মরিচ বাডিল্ চোগর পানি দিয়া॥

ভেলুয়া এরূপ শত সহস্র অত্যাচার নীরবে সহিতেছিল। গোপনে অশ্রু বিসর্জন এবং অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ভিন্ন তাহার আর কিছু করণীয় ছিল না। একদিন দ্বিপ্রহরে বিভলা তাহাকে জল আনিতে ঘাটে পাঠাইল—

ঘাটেতে আসিয়া নারী কাঁদিয়া উঠিল
"আমারে ছাড়িয়া সাধু কোন পন্থে গেল॥
সাত ভাইয়ের ভৈন আমি মাডিৎ নৈদ্দাম পা[২৯]
সোনালী চাদ্দর দিয়া ঢাকি রাইখতাম গা॥
চাঁন সুরুষ দেখে নাই আমার বদন
ননন্দী পাঠাইলা একা জলের কারণ॥"
এই না ভাবিয়া কৈন্যা কি কাম করিল

www.pathagar.com

কলসী রাখিয়া ঘাটে জলেতে নামিল॥
করিব কি ভেলুয়ার চুলের বাখান
মাথা ভরা চুল রে তার পায়ের সমান॥
চুলের ভারেতে কৈন্যা উডিতে না পারে
ননন্দী যেন চুলৎ ধরি টানিছে তাহারে॥
কষ্টে সিষ্টে কূলৎ উডি ভেলুয়া সোন্দরী
চুল শুকাইতে দিল ঘাটে হৈয়া একাশ্বরী[৩০]।

এ সময়ে ভোলা নামক এক সদাগরের পালতোলা ডিঙাখানি শাফলাপুর বন্দরের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল–

ঘাটেতে উডিয়া ভোলা দিষ্টি করে চায়
পরীব মতন কৈন্যা যেন ঘাটে দেখা যায়॥
এক চান্নি[৩১] উডে জানি আচমানের উপরে
আজু কেন দেখি চান দরিয়ার কিনারে॥
কৈন্যারে দেখিয়া ভোলা পাকল হৈল
মাঝি মালা ডাকিয়ারে ছলা[৩২] যে করিল॥

তারপর ভোলার ইঙ্গিতে মাঝি মালারা আসিয়া ভেলুয়ারে অপহরণ করিল–

নছিবের দুখ্য হায়রে খণ্ডন কে করে
ভেলুয়ারে লুডি লৈল ভোলা সদাইগরে॥
চঞ্চলা চপলা ডিঙ্গা হুঙ্কারিয়া যায়।
ডিঙ্গাৎ পড়িয়া কৈন্যা করে হায়রে হায়॥
কুডিতে কুডিতে মাথা ফাডিল কপাল
বেবাম দরিয়ায়[৩৩] কৈন্যা দিতে চায় ফাল॥
ধরিয়া রাখিল তেইরে[৩৪] যত মাঝি মালা
নছিবেতে এত দূখ্য লিখিয়াছে আলা॥

অন্য উপায় না দেখিয়া সে তখন বিরাট সমুদ্রের চতুর্দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"গাঙ্গের কৈতর উড়ি তুমি যাওরে যথাতথা
বন্ধের লাগৎ পাইলে কইও আমার কথা॥
শুন শুন তুমি ওরে সাইগরের পানি
বন্ধুর কাছে কইও তুমি আমার দুখ্যের বাণী॥
নাচিছ সাইগরের ঢেউ তোমারেও বলি
বন্ধুর সঙ্গে আর না হৈল আমার কোলাকুলি॥
দহিনালী হাওয়া তুমি কন বা দেশে যাও
দুখ্যের কথা কইও যদি বন্ধের লাগৎ পাও॥

এদিকে ভোলা একদৃষ্টে ভেলুয়ার মুখের দিকে চাহিয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। সে তখন কামান্ধ–

ভোলা বলে, "সোন্দর কৈন্যা শুনরে খবর
তোমারে লৈয়া যাইয়্যম কাঊলী নগর॥

www.pathagar.com

দালান কোঠা আছে আমার আছে রঙ মাহাল
নিকা হৈলে আমার সঙ্গে সুখে যাইব কাল॥
ফুলে ভরা মধু তুমি থাক একাশ্বরী
সোনার পালঙ্কে তুমি শুইবা সোন্দরী॥
এমন যৈবন তোমার যায়রে অকারণ
বড় সুখ্যে থাকিবারে রাখ আমার মন॥"

ভোলার এই কথা শুনিয়া ভেলুয়া কাঁদিতে লাগিল। চোক্ষের জলে তাহার বুক ভিজিয়া গেল। শেষে আমির সাধুকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল–

"কোথায় এখন আমির সাধু আমার প্রাণধন
কেন না হৈল হায়রে আমার মরণ॥"

ভোলা বলিল– "আমির সাধুর কথা ভাবিয়া লাভ কি? মাছিলি বন্দরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" কিন্তু ভেলুয়া তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। সে মনে মনে বলিতে লাগিল–

"কন অমঙ্গল যদি হৈত সাধুর
মলিন হৈতরে মোর শিরের সিঁন্দুর॥
বুগর মাঝে দুপ দুপ কৈত্তরে পরাণ
অমঙ্গল হৈলেরে মোর কাঁপিত নয়ান॥"

সতীত্বের মহিমায় ভেলুয়ার মন দুর্বল হইল না। ভোলা পুনরায় প্রলোভন দেখাইতে আসিলে ভেলুয়া বলিল–

জোয়া ফুলের[৩৫] মত কৈন্যার আঙ্খি হৈল লাল
"আমারে লুডিয়া লুচ্চা ঘটাইলি জঞ্জাল॥
ঘরর ভিডাৎ আর তোর ন জ্বলিব বাতি
তোর ধন দৌলতে আমি পায়ে মারি লাথি॥"

ভোলা ছাড়িবার পাত্র নহে। মধ্যরাত্রিতে সে পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ভেলুয়ার দিকে অগ্রসর হইল–

ডিঙ্গাখানি বাঁধা হৈয়ে চরের কিনারে
মাঝি মালা ঘুমাইতেছে নাগে ডাক ছাড়ে॥
ধীরে ধীরে আসে ভোলা ধীরে বাড়ায় পা
চমকি চমকি হায়রে উডের তার গা॥
আঁয়াস পাতাল ভাবি কৈন্যা চৌক্ষে নাইরে ঘুম
ভোলার বজ্জাতি তাহার হৈল মালুম॥
এমিকালে ভোলারে দেখি বড় ডর পাইল
বাঘের কামড়ে যেন হরিণী পড়িল॥

এইরূপ সঙ্কট সময়ে এই অসহায়া রমণীর আত্মরক্ষার শক্তি দেখিয়া তাহাকে সমুদ্র মন্থন লব্ধ কমলার ন্যায় আমাদের মনে হইয়াছে। দৃঢ় কণ্ঠে সে বলিল–

"পরপুরুষ তুমি এখন ন ছুইও মোরে
যাহা চাও তাহা দিব নিকা হৈলে পরে॥
খুশী হৈয়া দুষ্ট ভোলা দাড়িৎ হাত বুলায়

www.pathagar.com

ঘন ঘন ভেলুয়ার মুখের মিক্কা চায়॥
ভোলা বলিল–
"বল বল বিবিজান নিকলি যার জান[৩৬]।
হাতে লাগৎ পাইয়ম্ কখন আচ্মানের চান্॥"
ভেলুয়া কহিল "এখন কেমন করে কই
খোদার খছম করে আগে পছিম মিক্যা হই॥
আমার কথা রাইখবা বলি করহ খছম
তারপরে তোমার কাছে মন খুলি দিয়ম॥
ভোলা বলে, "আমি তোমার হৈলাম গোলাম
তুমি যাহা বল আমি করিব সে কাম॥"

এইখানেই নারীত্বের জয় হইল। ভোলা পশ্চিমমুখী হইয়া ভেলুয়ার কথামতো শপথ করিল–

ধীরে ধীরে বলে কৈন্যা, "শুন সদাইগর
আমার কাছে ন আসিয়া ছ মাসের ভিতর॥
এহার অন্যথা হৈলে করি বিষপান
নিরচয় নিরচয় আমি তেজিব পরাণ॥
শুন শুন সদাইগর তোমারে যে কই
ইদ্দত পালিব কমাস খোদার নাম লই॥"

তালাক দেওয়ার পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর নূতন-স্বামী গ্রহণ করা পর্যন্ত স্ত্রীলোকের যে সময় কাটিয়া যায় তাহার নাম ইদ্দতকাল। স্বামীর মৃত্যুর পর চারি মাস দশ দিন এবং তালাকের পর তিন মাস তেরোদিন এইরূপে ইদ্দত পালন করিতে হয়। ভেলুয়া ইদ্দতের দোহাই দিয়ে ভোলার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিল। এখন আমির সাধু সম্বন্ধে কিছু বলিব। উজানী নগরে বাণিজ্য করিয়া তাহার বহু টাকা লাভ হইয়াছে। সে ভেলুয়ার জন্য নানাবিধ অলঙ্কার গড়াইয়াছে। এক বৎসর পরে মাল বোঝাই ডিঙ্গি লইয়া শাপলাপুর বন্দরের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর–

পরথমে যাইয়া সাধু করিল কি কাম
মা বাপর চরণেতে জানাইল ছালাম॥
মুখে কারো কথা নাই চোখে জল্‌জলা[৩৭]
হেনকালে আসি তথায় বলিল বিভলা॥
"আইলা আমার সাধু ভাইরে এক বছর পরে
হারামী ভেলুয়া এখন নাই আর ঘরে॥
ভালা কৈন্যা বিয়া করি সুগে কর বাস
ভেলুয়া থাকিলে এখন হৈত সর্বনাশ॥"

আমির কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ভেলুয়া কোথায়?"

বিভলা বলিল, সাধু শান্ত কর মন।
তিনদিন আগে তেইর হৈয়াছে মরণ॥"

www.pathagar.com

এই কথা শুনি সাধু করে ধড়ফড় ।
আচমান ভাঙ্গি পৈল যেন মাথার উপর॥

আমির চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল,

"কিসের ধন কিসের দৌলত কিসের সদাইগরি
কণ্ডে[৩৮] গেলগৈ আমার সাধের ভেলুয়া সোন্দরী॥
নয়ান ভরিয়া আমি দেখি নাই হায়
কণ্ডে গেলগৈ সোন্দরী মোর জান নিকলি যায়॥"

আমির বিভলাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আমার ভেলুয়ার কবর দেওয়া হইয়াছে। বিভলা বলিল, প্রতিবেশীরা ঐ সমুদ্রের ধারে তোমার ভেলুয়াকে মাটিচাপা দিয়া রাখিয়া আসিয়াছে।'

ধাইয়া চলিল তথায় আমির সদাইগর
সাইগরের কিনারে দেখিল নূতন কয়বর॥
কয়বরের উপরে সাধু যায় গড়াগড়ি
মাডি ভিজি গেলগৈ তার ছোগর পানি পড়ি॥

আমির সদাগরের মনে সন্দেহ দেখা দিল। সে বিভলার কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এইরূপে কাঁদি সাধু কি কাম করিল
কয়বরের মাডি তখন কুড়িতে লাগিল॥
কতদূর কুড়িয়ারে চোক্ষু করে থির
কয়বরতে কালাকুত্তা দেখিল আমির॥

মাতা ও ভগ্নীর অকরুণ ব্যবহারে আমিরের সংসারের প্রতি আর আগ্রহ রহিল না। তখন

ধন দৌলত ছাড়ি সাধু পথের ফকির হৈল
জরির টুপি রেশমী লুঙ্গি ছাড়িল আমির।
বাড়ীঘর ছাড়িয়ারে হইল ফকির॥
চলিল পাগলা ফকির কান্দিয়া কান্দিয়া।
নন্দী নালা পার হৈয়া আইল চকরিয়া॥
সেই ত মুলকে কত জঙ্গলা পাহাড়
ঘুরিয়া ফিরিয়া ফকির শঙ্খ হৈল পার॥
'ছির মাইর' কূলে বসি সাধু ছাড়ে চোগর পানি
আমারে ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া পঙ্খিনী॥
কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলা ঘুরি ঘুরি যায়
কাঁইচা নধীর পারে আইল কুড়াল্যা মুড়ায়॥
চোগৎ আর পানি নাইরে মাথা তার খরাপ
কি বুঝি পাগলা ফকির খালৎ দিল ঝাঁপ॥

www.pathagar.com

ভীষণ জোয়ার খালর মাঝে থিয়াই[৩৯] নাইরে পানি
উতর মিক্যা পাগলারে হোতে[৪০] লই যার টানি॥
পার হৈল কাউখালির পাক, পড়ি নানান দুখে
হাঁজে আইল আমির ফকির ইছামতির মুখে॥
ইছামতীর মুখে আসি কি কাম করিল
শীতে থরথর কাঁপি রাগন্যা চলিল॥
রাগন্যা চাকলার মাঝে সৈদনগর গেরাম
গুনীন্ এক আছে তথায় টোনা বারুই নাম॥

টোনা বারুই একজন অদ্ভুত গুণী লোক। সে আশ্চর্য রকমের সারিন্দা বাজাইতে পারিত। গায়েন তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

টোনা বারুইর কথা কি করি বাখান
সারিন্দা বাজাইতে লাগলে গাঙ্গে বহে উজান॥
বনের বাঘ বশ হয় কাঁদে যে হরিণী
সাপর মাথা নোয়াই থাকে এমন সে গুণী॥
ফকির আসিয়া তার শাহারিদ[৪১] হৈল
নছিবের[৪২] যতদুঃখ সক্কলি জানাইল॥
টোনা বারুই বলে, "ফকির শুন মন দিয়া
সারিন্দা শিখিলে যাইব দুঃখ পাশরিয়া॥

টোনা বারুই আমির সাধুকে খুব ভালো করিয়া সারিন্দা বাজান শিখাইল এবং আশ্চর্য একটি সারিন্দা প্রস্তুত করিয়া দিল।

এম্নি গুণের গুনীন টোনা কি বলিব আর
"ভেলুয়া "ভেলুয়া ডাকে সারিন্দার তার।
সারিন্দা বাজায় ফকিরা চোগর পানি ছাড়ি
পেটে নাই দানাপানি ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
ঝড়ে ভিজে রৈদে পোড়ে শীতে কাঁপে গা
পরছিমের পন্থে আইল পাগলা ফকিরা॥
নানান গেরামে ঘুরি ফৈত্যাবাজে আইল
মুড়ার গোড়াৎ ঘুরি ঘুরি খুলসীর ঢালা পাইল॥
ঢালার পরছিম কুলে কাট্টলি নগর
বেশুমার দেখিল তাতে কোটা কোটা ঘর॥

এদিকে ভোলা সদাগরের বাড়িতে ভেলুয়ার ছয়মাস কাটিয়াছে। শত সহস্র প্রলোভনেও সে তাহার মন টলাইতে পারে নাই। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে ভোলা করিল কি–

গাছর আগাৎ রৈদ পরিল লাহা লাহা বেল[৪৩]
হেন কালে দুষ্ট ভোলা ভেউল্যার ঘরৎ গেল॥
মুখেতে সুগন্ধি পান দাড়িতে আতর
ধীরে ধীরে আসি ভোলা পশিল আন্দর॥

www.pathagar.com

ভোলা বিনয় সহকারে ভেলুয়াকে বলিল, "ছয়মাস গত হইয়াছে এখন তোমার প্রতিশ্রুতি স্মরণ কর।

ভেলুয়া কহিল, "আমার মন কেমন করে
মাপ কর সদাইগর মাপ কর মোরে॥"
ভোলা বলে, "তোমার কাছে আমি মাপ চাই
ফায়দা[৪৪] কি হবে আর আমারে ভারাই[৪৫] ॥
এম্নিকালে সেই ফকিরা ছিঁড়া কানি পিঁধা
বাহিরে "ভেলুয়া" বুলি বাজাইল সারিন্দা॥
সোন্দরী ভেলুয়া শুনি চমকক্যা হৈল[৪৬]
হাসিয়ারে লুচ্চা ভোলা কহিতে লাগিল॥
"দেলখোশ কর আমার মাগি এই ভিখ্
কালুয়া নিকার দিন করিয়াছি ঠিক॥'
আবার "ভেলুয়া" বুলি বাজিল সারাং
অধীর হৈল হায়রে ভেলুয়ার পরাণ॥
ভোলা বলে, "কহ বিবি হৈলো এখন রাজী
খোতবা পরিবা কাইল আইলে সরার কাজী॥

ভেলুয়া সদাগরের কথায় মনোযোগ দিতে পারিল না। ফকিরের সারিন্দা নিক্কনে সে মুগ্ধ হইতেছিল–

ঠাহর করি চাহি ভেলুয়া চিনিতে পারিল
দোন চোগর পানি তার টলমল হইল॥
ভেলুয়ার অনুরোধে ভোলা সদাইগর
ফকিরারে থাকিবারে দিলা এক ঘর॥

এখানে নায়িকার ক্ষণিক মিলন আমাদের মনকে কিছু পরিমাণ সান্ত্বনা দান করিয়াছে।

ভাতপানি খাই ফকিরা করিল শয়ন
চোগর নাই ঘুম তার মন উচাটন
রাত্র নিশাকালে ভেউল্যা কি কাম করিল
ফকিরার দুয়ারে যাই হাজির হইল॥
কেবারেতে টুকি দিল সাড়া শব্দ নাই।
ভেলুয়া ভাবিল সাধু পড়িছে ঘুমাই॥
"দুয়ার খুলি দাওনা" বৈলে আবার দিল নাড়া
ধীরে ধীরে উডি আইলো পাগলা ফকিরা॥
"সাধু সাধু" বলি ভেউল্যা বুগে লৈল টানি
অঝোরে ঝরিতে লাগিল দুই নয়নের পানি॥
লোটন কৈতরের মতো ধরিল বেড়াই
চারি চোগে পানির হোতু মুখে কথা নাই॥
সুখে দুখে ফকিরার কাঁপিল সর্ব গা

www.pathagar.com

ভেলুয়ার মুখ চাহি করি রহিল হা॥
সরমিন্দা হৈয়া[৪৭] তখন ভেলুয়া সোন্দরী
ছালাম জানাইল সাধুর দোন পায়ৎ ধরি॥
ভেলুয়া একে একে তাহার সমস্ত অবস্থা জানাইয়া পরিশেষে বলিল,
ছয়মাস কাটইয়াছি দুষ্ট ভোলার ঘরে
নানান্ ছলনা দিয়া বুঝাইয়াছি তারে॥
তোমার বলিতে আমার বুগ ফাডি যার
নিকার দিন ঠিক কৈরাছে কালি শুক্রবার॥
আমির বলিল,
"দোজগের মত আমি দেখিল দুন্যাই
পাগলা সাজিয়া তাই ফকিরি কামাই॥"
ভেলুয়া বলিল, "চল আমরা পলাইয়া যাই। এই ভোলা ভয়ানক ক্ষমতাশালী। শেষে বিপদ হইবে।"
আমির সাধু বলে, "আমি চোরার পোলা নই
যাইতাম ন ভোলার মতন চুরি করি লই॥
কাউয়া করে কলরব কুকিলার কুশরে[৪৮]।
উপায় না দেখি ভেউল্যা চলি গেল ঘরে॥
ইহার পর আখ্যায়িকার নূতন পট উন্মোচিত হইল। এই পটে ষোড়শ শতাব্দীর বিচার দেখিয়া তৎকালীন রাজনৈতিক ও সমাজব্যবস্থার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়।
সেই দেশে বিচার করে বুড়া মুনাপ কাজী
ফজলে ফকিরা তানে দিল এক আর্জি॥
গেদ্দায়[৪৯] বসিয়ে কাজী মুখে বোঁজর নল[৫০]
পাইক পেয়াদা আশে পাশে দাঁড়াইছে সকল॥
ছালাম করিয়া ফকির বলে মাথা কুডি।
আমার ভেউল্যারে আইন্যে দুষ্ট ভোলা লুডি॥
আর্জি পাইয়া মুনাপ কাজীর রাগ হৈল ভারি
ভোলারে ধরিয়া আইন্তে পরনা কৈল জারি॥
পাইক পেয়াদা ধরি লই আইল ভোলা সদাইগরে
মুখর ধুমা ছাড়ি কাজী তাহারে পুছারে[৫১]
ফকিরার বঁধুরে তুমি আইনাছ লুডিয়া
এখন নাকি জোর জুলুমে তেইরে কর বিয়া॥
ভোলা বলে, ঝুটা কথা ফকিরা পাগল
তাঁর বঁধু কণ্ডে আমি পাইলাম লাগল॥
ঘরে ঘরে যাইয়া বেডা সারিন্দা বাজায়
সোন্দর বঁধু দেখিলে তারে ফুস্যায়[৫২]।
নারীঘটিত মোকদ্দমাটি হাতে পাইয়া কাজী সাহেব নানা কথা ভাবিতে লাগিল,

www.pathagar.com

নব্বই বছর বয়স কাজীর শ'তর বাকী দশ
মাড়ির মাঝে দাঁত নাই তবু মুখে রস॥
কয়বরের মাঝে হৈছে বিছানা তৈয়ার
তবুঅ স্বভাবের দোষ ঘুচিল না তার॥
"মধুভরা ফুল আলা মিলাইল আজি"
খানিকক্ষণ ভাবি চিন্তি কহিলেন কাজী॥
শুন শুন শুন ওরে ভোলা সদাইগর
বিবিরে লৈয়া আস আমার গোচর॥
তোমার বধু হৈলে তুমি পাইবে হদে হদে[৫৩]
ফকিরারে দিয়ম আমি সাত বছর কয়েদে॥

কাজীর কথা শুনিয়া ভোলা সদাগর বাড়ীতে আসিল। এবং ভেলুয়াকে নানা কথা শিখাইয়া দিল। তারপর

পালকির মাঝে করি তবে ভোলা সদাইগর
ভেলুয়ারে লৈ আসিল মুনাপ কাজীর ঘর॥
পালকি হৈতে বাহির হৈল বিজলীর কণা
ভেলুয়ারে দেখি কাজীর হৈল ভাবনা॥
কাজী বলে, "কহ বিবি ছাড়িয়া শরম
দোনজনর মাঝে তোমার কে হয় খছম॥
ভেলুয়া কহিল হুজুর করি নিবেদন
পাগলা ফকিরা আমার সোয়ামী প্রাণধন॥
ভোলারে গজ্জিয়া কাজী দিলরে ধাবাই[৫৪]
কৈত লাগিল্ নানান্ কথা ফকিরারে ডা-ই[৫৫] ॥
তোমার যোগ্য নয় এ বিবি তোমার যোগ্য নয়
কুত্তার পেডে ঘিয়র ভাত বদ হজম হয়॥
সারিন্দা ফকিরা তুমি শোন মোর কথা
ভোম্‌রা খায় ফুলর মধু পোগে[৫৬] খায় পাতা॥
তোমার যোগ্য নহে ভেলুয়া কহিলাম সার
আর এক জনে লুডি লৈলে আসিবা আবার॥
তোমার লাগি বারে বারে কে করে হাঙ্গাম
পত্তি দিন এজলাসে আছে আমার কাম॥
আমার ঘরে থাকুক বিবি সুগে খাইব ভাত
সোনার পালঙ্ক মাঝে শুইব দিনরাত॥"

কাজী যখন এই রায় প্রকাশ করিল তখন আমির সাধু সত্য সত্যই পাগলের মতো অস্থির হইয়া উঠিল।

কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে ফকির বুগৎ মারে কিল
পাথরের মত দড় মুনাপ কাজীর দিল্॥
পাইক পেয়াদা মুনাপ কাজীর ইশারা পাইয়া

www.pathagar.com

ধাবাই দিল ফকিরারে ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া॥
নছিবের দুখ্য হায়রে কে খণ্ডাইতে পারে
কাঁন্দিতে লাগিল ভেলুয়া মুনাপ কাজীর ঘরে॥
দানা পানি ন খাইল লৈল বিছানা
বিমারে পড়িয়া কৈন্যা হৈল অফ্‌সানা[৫৭]॥

পরিশেষে আমির কাঁদিতে কাঁদিতে শাফলাপুর বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার পিতা মানিক সদাগরকে যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত করাইল। মাকে এসব ঘটনা জানাইতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল।

মানিক সদাইগর শুনি বলে গৌরলধরে।
চৌদ্দ কাহন ডিঙ্গা আমার জলদি সাজা ওরে॥
সেনা সৈন্য লাঠিয়াল সব চলি যাও
কাউলিংনগর তোমরা সাইগরে ভাসাও॥

শাফলাপুর বন্দর হইতে সেনা সৈন্য বরকন্দাজ লাঠিয়াল সব সাজিয়া লইল। পালাগায়কেরা এখানে দশহাজার সৈন্য উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এতটুকু বিশ্বাস করিতে পারি না। মোটের উপর শাফলাবন্দর হইতে বহু সৈন্য ডিঙ্গি করিয়া রওনা হইল।

হু হু করি ছুড়িল পালে দিল ডাক
তিনদিনে আইল তারা কাউলির বাঁক॥
ঘাটেতে আসিয়া আমির মারিল কামান
বিজলি ঠাডার যেন ভাঙিল আচ্‌মান॥

এই বিয়োগাত্মক অশ্রুপূর্ব আখ্যায়িকার পরিশেষে আমরা একটি যুদ্ধের বর্ণনা দেখিতে পাই। আমির সাধু যখন সসৈন্যে কাউলি নগরে উপস্থিত হইল তখন মুনাপ কাজী ভয়ে অস্থির।

শুন শুন কিছু কথা মুনাপ কাজীর
ভয় পাইয়া ভোলার বাড়ীৎ হৈল হাজির॥
কাজী বলে, "শোন ভোলা, তোমার কাছে কই
বড় দুঃখ পাইলাম আমি ভেলুয়ারে লই॥
আচমানের পরী কৈন্যা নূতন যৈবন
আমার লাগিয়া তেরি ন ভিজিল মন॥
তোমার উপরে ভেউল্যার পৈরাছে নজর
এই কৈন্যা লৈয়া তুমি সুগে কর ঘর॥"
কাজীর কথায় ভোলা হাসে মনে মনে
সোন্দরী ভেলুয়ার নজর পৈল এতদিনে॥
কাজী বলে সোন্দরীর অস্থি চর্মসার
বিরামে[৫৮] পড়িয়া তোমায় ডাকে বারেবার॥
ভোলার এবং কাজীর এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়
ঘাটেতে পড়িল আবার কামানের ডাক

www.pathagar.com

নাকাড়া টিকাড়া আর বাজিতেছে ঢাক॥
কাজী বলে, "হুনো ভোলা, পাইলাম খবর
ভেলুয়ারে নিত আইস্যে আমির সদাইগর॥"
এই কথা শুনি ভোলা খানিক ভাবিল
লাঠিয়াল বরকন্দাজে সাজিতে কহিল॥
সাজিতে কহিল কাজীর পাইক পেয়াদা সব
কাউলি নগরে পৈল "সাজ" "সাজ" রব॥
কোমরেতে বাঁধি কিরিচ হাতে লৈয়া ঢাল
কাউলি নগরে সাজে যত কোতোয়াল॥
হাজারে হাজারে সৈন্য সজিয়া আসিল
কাউলি নগরে হায়রে লড়াই শুরু হৈল॥
ঢাক ঢোল দগরতে কান যায় ফাড়ি
লড়াইর ধমকে কাঁপে কাউলির মাড়ি॥
আমির সাধুর সৈন্য ছুড়ে করি "মার" "মার"
বন্দুকের ধুমায় দেশ হৈল অন্ধকার॥
আমির সাধু মারে কামান গোলা ছুড়ি যার
কিবা রাত্র কিবা দিন চিহ্ন নাহি তার॥
বহুৎ মানুষ মারা পৈল কাউলি নগরে
কাঁদাকাটির রোল পরিল গরীব দুইখ্যার ঘরে॥
কার গেলর হাত কাটা কার পদ নাই
কতজন মরার ভিতর রৈল লুকাই॥
সাইগরের জল হায়রে করেরে টলমল
আলার মুলুক যেন পড়ি যায় তল॥
এই মতে সাত দিন গুজরিয়া গেল
ভোলা আর কাজীর সৈন্য রণে ভঙ্গ দিল॥

বিজয়ী আমির প্রথমেই ভোলার শাস্তি বিধান করিবার জন্য তাহাকে ধরিয়া আনিতে হুকুম করিল। হুকুম পাইবা মাত্র চারিদিকে লোকজন ছুটিল।

ভোলারে ধরিয়া আইনলো করিয়া সন্ধান
আমির সাধু দুষমনের লৈল গর্দ্দান॥

ভোলার স্কন্ধচ্যুত মস্তক দেখিয়া মুনাপ কাজীর অবস্থা কাহিল হইল।

নোগর গোড়াৎ[৫৯] পরাণ কাজীর করে ধড়ফড়
থাপ্পড় মারিল তারে মাঝি গৌরলধর॥
জমিনের উপরে কাজী পড়িল পাক্কাই[৬০]
মড়ার মত রৈল হায়রে হোঁসগোঁস নাই॥

আমির সাধু তারপর ধৈর্য্যহারা হইল। সে কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না।

লাঠিয়াল আর বরকন্দাজে ডাকি সাধু বলে
এক কাম কর এখন তোমরা সকলে॥

www.pathagar.com

দূরন্ত দুর্জ্জন ভোলা হত্তুর[৬১] আমার
বাড়ী ঘর ভাঙ্গি তার কর ছারখার॥
তিষ্টা না মিটিল আমার লৈয়া বেটার জান
ভোলার ভিটাৎ রাইখতাম চাই একটা নিশান[৬২]
কাটিয়া কাটিয়া পুনী[৬৩] সেই ভিডার মাঝার
ভেলুয়ার দীঘি বুলি নাম রাখিবা তার॥

এই সময়ে ভেলুয়ার দীঘি খনিত হইল। ইহাই সেই অশ্রুময় অতীত ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন। এই পালার শেষ দৃশ্য আরও করুণ।

ভেলুয়া কাজীর ঘরে বিরামে পড়িল
সোনার অঙ্গ মৈলান হৈয়া হাড়েতে মিলাইল॥
মনের আগুনে জলি খানা দিল ছাড়ি
কখন হাসে কখন কাঁদে মাথাৎ থাবা মারি॥
কখন বকে কখন আবার বারমাসী গায়
পাকল হৈল হায়রে নানান চিন্তায়॥
এই অবস্থায় তখন আমির সদাইগর
ভেলুয়ারে লৈ আইলো ডিঙ্গার উপর॥
"কার লাগি করিলামরে বিশম লড়াই
কলিকার মাঝে আমার ফুল যার শুকাই॥
ভাঙ্গিনের ঘর আলা নাহি দিতে ছানি
পহির শুকাইয়া যায় ন উডিতে পানি॥"
হাতে ধরি ভেলুয়ারে কাঁদিছে আমির
মুখে কথা নাহি কৈন্যার দোন চৌখ থির॥
যুদ্ধ জিনি আসি সাধু শাফ্‌লা বন্দরে
খুসী হৈয়া বাপ্ মা রোশনাই করে॥
সধবা বিধবা আর পাড়ার যত নারী
ধাইয়া আসিল তারা সদাইগরের বাড়ী॥
হাঁহলা[৬৪] গাহিছে কেহ, কেহ দে জোঁয়ার[৬৫]
ঘাটে বাজে ঢাক ঢোল নহবৎ আর॥
বন্দরের লোকজন দেখে খাড়া হই
ঘাটে আইলো চৌদ্দ ডিঙ্গা মরা কৈন্যা লই॥
সাইগরের পারে দিল ভেলুয়ার কয়বর
তার কিনারে সাধু ঘুরে আট পহর॥
পেডে ক্ষুধা নাই তার মুখে নাই বাণী
কলিজাতে লৌ নাই চৌখে নাই পানি॥
সেই না নিশিথে আমির কয়বরেতে দেখে
সাত পরী আসিয়ারে ভেলুয়ারে ডাকে॥
উডলি উডলি কৈন্যা ছাড়িয়া কয়বর
পরীর সঙ্গে উড়কা দিল আচ্‌মানের উয়র॥"[৩]

www.pathagar.com

**শব্দার্থ**

১. আচানক– আশ্চর্য, ২. জুইতর– মজবুত, ৩. তান– তার, ৪. কেরামত– লীলা-খেলা, ৫. ভিনাভিন – একাকার, ৬. দড়মতে– শক্ত করে, ৭. উতর মিক্যা– উত্তর দিকে, ৮. বাঁশবাড়ী– যে বাঁশে পাল বাঁধা হয়, ৯. লাসা– আঠা, ১০. কাম্‌টা– গুলতি, ১১. খেচি– জোরে নিক্ষেপ করে, ১২. রাও ধরি কান্দের– উচ্চৈস্বরে কাঁদা, ১৩. নিদানর কালে– দুর্দিনে, দুঃসময়ে, ১৪. তোরল তারল– বাহুর অলঙ্কার, ১৫. সীতা– সিঁথি, ১৬. মেওলার মত– মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতো, ১৭. রিষে– ঈর্ষায়, ১৮. তল পৈল্ল– ডুবে গেল, ১৯. নুকানারা– নৌকা ইত্যাদি, ২০. বাছনে–বাসন, পাত্র, ২১. পিছা– ঝাঁটা, ২২. গিরাৎ পৈছা– গাটে পয়সা বা অর্থকড়ি, ২৩. কেবার– দরজা, ২৪. পাইখ পহলে– পাখ পাখালি, পশুপাখি, ২৫. হারগ্যাম– ফেড়ে ফেলা, ছিঁড়ে ফেলা, উপড়ে ফেলবো, ২৬. নূতন বধূ– প্রেমিক, উপপতি, ২৭. কামুলী– দাসী কাজের ঝি, ২৮. ফুরিতে যায়- ঝাড়ু দিতে যায়, ২৯. মাড়িৎ নৈন্দাম পা– মাটিতে পা দিতাম না, ৩০. একাশ্বরী–একাকিনী, ৩১. চান্নি– চাঁদ, ৩২. ছল্লা– শলা পরামর্শ, ৩৩. বেবাম দরিয়ায়– অকূলসাগরে, ৩৪. তেইরে– তাকে, ৩৫. জোয়া ফুলের– জবা ফুলের, ৩৬. নিকলি যার জান– প্রাণ বের হয়ে যায়, ৩৭. জল জলা–অশ্রুভারাক্রান্ত, ৩৮. কণ্ডে– কোথায়, ৩৯. থিয়াই– দাঁড়িয়ে, স্থির নেই, ৪০. হোতে– স্রোতে, ৪১. শাহরিদ– শাগরিদ, শিষ্য, ৪২. নছিবের– কপালের, ভাগ্যের, ৪৩. লাহা লাহা বেল– পড়ন্ত বিকেল, সন্ধ্যার পূর্বে, ৪৪. ফায়দা– ফল লাভ, ৪৫. ভারাই– ছলনা করে, ৪৬. চকমক্যা হৈল– চঞ্চল হল, ৪৭. সরমিন্দা হৈয়া– লজ্জিত হয়ে, ৪৮. কুশরে– কুহু স্বরে, ৪৯. গেদ্দায়–গদিতে, ৫০. বোঁজর নল– হুকার নল, ৫১. পুছারে – জিজ্ঞাসা করে, ৫২. ফুস্যায়– ফুসলায়, ৫৩. হদে হদে– ঠিক ঠিক, ৫৪. ধাবাই– তাড়িয়ে, ৫৫. ডা-ই– ডেকে, ৫৬. পোগে– পোকায়, ৫৭. অফ্‌সানা– কাহিল, ৫৮. বিরামে– অসুখে, ৫৯. নোগর গোরাৎ– নখাগ্রে, ৬০. পাক্কাই– পাক খেয়ে, ঘুরে, ৬১. হত্তুর–শত্রু, ৬২. নিশান– চিহ্ন, ৬৩. পুণী– পুষ্করিণী, দীঘি, ৬৪. হাঁহলা– বিয়ের গান, ৬৫. জোঁয়ার–উলুধ্বনি, জোঁকার।

**উখিয়া উপজেলার পালা**

এ গানে গায়ক এবং গায়িকা সমঝোতার ভিত্তিতে দুটি পরস্পর বোধি যেমন তিতা-মিঠা, দুঃখ-সুখ বিষয় নির্বাচন করে একজন সুখ, আর একজন দুঃখ নেয়। দুজনই গান গেয়ে গানের মাধ্যমে সওয়াল-জওয়াব করে থাকে। গানের মাধ্যমে যেভাবে প্রশ্ন করা হয় গায়িকা কণ্ঠে তা নিম্নরূপ :

**বিষয় :- শরিয়ত ও মারফত**

**গায়িকা**

স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদী (২)
সব জায়গা তার মান যে পাইল
যে পাইল মারফতের বিধান (২)
ঘর বাড়ি তার নাইরে প্রয়োজন
খাটপালং আর বালাখানা চাইনা সে কখন জাতের সাথে জাত মিশাইয়া (৩)

www.pathagar.com

ভাবতেছো সুবহান যে পাইলো মারফতের বিধান
গুরুরূপে যে করেছে ধ্যান
কোনখান মানে না যে কার্য বর্তমান
বেহেশত দোযখ তার কাছে।
সকল এক সমান ভাইরে মারফতের বিধান
গুরুর রূপে যে দিয়েছে মন
কোন মন মানে না তার কার্য সর্বক্ষণ
বেহেশত চাইনা দোযখ চাইনা চাই গো নিরঞ্জন
হায়রে হামেদ বলে শোনরে জলিল
মনছুর তার পাইলরে প্রমাণ। ঐ

আমার প্রশ্ন এই, শরিয়ত প্রথম আল্লাহ তা'য়ালা কার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রকাশ করলেন? শরিয়তের স্তর কয়টি? কুরআন অনুসারে আল্লাহ তা'য়ালা শরিয়তের নবী কা'কে ঘোষণা করেছেন? এই আমার প্রথম প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা রইল।

গায়ক (গান ধরে) আগে শরিয়ত জানিয়ে করিও ফকিরী
ছুঁইবে না যাইবে (২)
শরিয়ত ছাড়িয়া মারফতে গেলে (২)
ঘুরাই তারে শয়তানে (ঐ)
গাছের গোড়া শরিয়ত হয়
তরিয়তে ডালপালা ছেড়ে পাতা হাকিকত রয়
মারফতে ফুল ফুইটাছে ফুল পাইবা কি
তুমি গাছ নিলে (ঐ)
রাস্তা যেমন জানো শরিয়ত
তরিকতে লাইন বসাইছে তার ইঞ্জিন হাকিকত
মারফতে মোকাম হইল যাইবারে কি রাস্তায়
ফকিরে গো হাদিস অলিদ নাই
একশা পেকশা চেকবিহনে কি আছে বড়াই
হাকিলে তুমি (২) দেখাইও তাই
দেখবে সবার কষ্টরে
ঘোড়ার ডিম্ব চিরা লোকে কয়
নামের বেলায় আছে ঐ ডিম
কাজের বেলায় নয়
তেমনি তোমার মারফত হয়
ভেবে বলছে দেওয়ানে (ঐ)।"[৪]

**উত্তর :** সর্বপ্রথম শরিয়ত ছিল আরশ মহল্লায় যেখানে নিজে মওলা কলমকে হুকুম দিয়েছেন, কলম লিখ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ স.। আস্তে আস্তে সেটা পৃথিবীতে হযরত আদম হতে ক্রমান্বয়ে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর শেষ

www.pathagar.com

পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ স. যাঁকে সীলমোহর দিয়ে পাকাপোক্তভাবে শরিয়তকে প্রচার করে রেখেছেন।

শরিয়তের পাঁচটি স্তর ১. শরিয়ত বেগায়েব এধ্যান, ২. কুরআন ও হাদিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, ৩. মাতাপিতার খেদমত করা, ৪. সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা ও ৫. হাশর এবং কেয়ামতকে বিশ্বাস করা।

অনুরূপভাবে উত্তর শেষে মারফতের উপর প্রশ্ন রেখে গায়ক বিশ্রাম নেবে এবং গায়িকা যথাযথভাবে মারফত সম্পর্কিত সওয়ালের জওয়াব দিয়ে পুনরায় গানে চলে যাবেন এবং গান শেষে আবার প্রশ্ন রাখার পালা চলতে থাকবে। এভাবে শেষ হয় পালাগান।

## খ. লোকনৃত্য

লোকনৃত্যের উদ্ভব সেই প্রাচীনকাল থেকেই। বিয়ে-শাদীসহ আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে মানুষ নিজের মনের অজান্তেই নৃত্য করে থাকে। কক্সবাজার অঞ্চলের লোকনৃত্য মূলত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে ভিত্তি করেই আগমন ঘটেছে। বিশেষ করে সনাতনধর্মাবলম্বীরা পূজা উপলক্ষে নৃত্য প্রদর্শন করার সংস্কৃতি চালু করেছে। লোকনৃত্যশিল্পীরা গুরু পরম্পরায় দেখে দেখে নেচে নেচে শিখে নিয়ে পরিবেশন করে থাকে। এর মধ্যে মুদ্রাগত তাল, লয়, ছন্দের অমিল থাকতে পারে তাতে কিছু যায় আসে না। আধুনিক নৃত্যশিল্পের ন্যায় লোকনৃত্য প্রদর্শন করা বা কৃত্রিম ভূমিকা প্রদর্শনের সুযোগ নেই। লোকনৃত্যে দেহের অঙ্গভঙ্গি নিজস্ব খেয়াল-খুশিমতো গতি সঞ্চার করে প্রকাশমান। লোকনৃত্যগুলো গান সহযোগে একক ও দলগতভাবে পরিবেশিত হয়। এই নৃত্যে লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অংশগ্রহণ করে থাকে। নিজেরা অংশগ্রহণ করে যেমন আনন্দ পায় তেমনি দর্শকশ্রোতাবৃন্দকের আনন্দ দান করে থাকে। লোকনৃত্যের জন্য পৃথক কোনো মঞ্চ তৈরি করতে হয় না। মাঠে, বাড়ির আঙিনায় খোলা জায়গায় বা বাড়ির অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র পরিসরে লোকনৃত্যের আসর বসতে পারে। কক্সবাজার অঞ্চলে গ্রামীণ জনপদে এখনো লোকনৃত্য দৃশ্যমান। বিশেষ করে বর্ষাকালে জমিতে আমন বীজ বুননের সময়, গ্রামের বাড়িতে বিয়ে-শাদী, গায়ে হলুদ, কান ছেদার অনুষ্ঠানে মহিলারা নৃত্যের মাধ্যমে হাঁওলা পরিবেশন করে থাকে। কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায় নৃত্যকে তাদের আনন্দ-উৎসব পালনের অন্যতম অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছে। রাখাইন সম্প্রদায়ের কোনো পূজনীয় ব্যক্তি মারা গেলে নৃত্য পরিবেশন করেই তাকে দাহ করা বা তার শেষকৃত্য করা হয়। রাখাইন সম্প্রদায়ের এই দাহ অনুষ্ঠানটিই মূলত একটি লোকনাট্য।

### জেলা সদরের লোকনৃত্য

লোকজ কোনো কাহিনি অথবা লোকজ কোনো ভাবানুভূতি নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করাকেই বলা হয় লোকনৃত্য। কিন্তু নৃত্যের সাথে অবশ্যই সংগীতের সুর ও তাল থাকা অপরিহার্য বলেই লোকনৃত্যকে লোকগীতিনৃত্য বলাই ভালো। লোকনাট্যের সাথেও লোকনৃত্যের রয়েছে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক, যে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব নয়। মধ্যযুগে

www.pathagar.com

ও ব্রিটিশ আমলে জেলার নৃত্যচর্চা ছিল মূলত স্থানীয় রাজা-জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানে তাদের প্রয়োজনে তাদের কাচারিপ্রাঙ্গণে আয়োজন করা হতো। প্রাচীনকালে কক্সবাজার অঞ্চলে কোনো মহিলা প্রকাশ্যে পুরুষের সামনে এসে নৃত্যে অংশগ্রহণ করতো না। ছেলেরাই মুখে মেকআপ (পাউডার-স্নো, লিপিস্টিকের মধ্যে মেকআপ সীমাবদ্ধ ছিল।) নিয়ে শাড়ি পরিধান করে মহিলা সেজে নৃত্য পরিবেশন করে রাজা-জমিদারদের মনোরঞ্জন করতো। একই সাথে এ ধরনের আয়োজনে নাউট্টা ছেলেরা (লেটোরদলের ছেলেকে স্থানীয়ভাবে নাউট্টা পোয়া বলা হয় বা নাচিয়ে ছেলেদেরকেও নাউট্টা বলা হতো।) মহিলাদের মতো নেচেগেয়ে রাজা-জমিদার ও উপস্থিত লোকজনের মনোরঞ্জন করতো। বিয়ে-শাদি, শিশুকন্যার কর্ণছেদন উপলক্ষে, শিশুপুত্রের খৎনা উপলক্ষে মহিলারা বাড়ির অভ্যন্তরে হঁওলা (মেয়েলিগীত) গেয়ে নেচে নেচে উপস্থিত নারী দর্শকদের মনোরঞ্জন ও আনন্দ প্রদান করতো। ক্রমেই নর্তকীরা বাড়ির অভ্যন্তর থেকে বাইরে আসতে শুরু করে। বিয়ে-শাদি, শিশুর খৎনা বা শিশুকন্যার কর্ণছেদন উপলক্ষে মহিলাদের নৃত্য বা নৃত্যগীত তথা হঁওলার সাথে নৃত্য করার সংস্কৃতি সেই প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল।

*কক্সবাজার অঞ্চলের লোকনৃত্যের দৃশ্য*

পরবর্তীকালে অর্থের বিনিময়ে বা সম্মানীর বিনিময়ে নর্তকীরা হঁওলা গেয়ে নেচে পরিবারের অভ্যন্তরের মঞ্চ মাতিয়ে রাখতেন। মহিলারা ক্রমেই পরিবারের বাইরে তথা বসতবাড়ির আঙ্গিনায় আসতে শুরু করেন। দেশ বিভাগের পরে অর্থাৎ ১৯৫০ সালের পরে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কক্সবাজার একটি রক্ষণশীল এলাকা হিসেবে

www.pathagar.com

মহিলারা নৃত্যগীত তথা হঁওলা নৃত্য পরিবেশন করার জন্য বাড়ির বাইরে আসার বিষয়টি লক্ষণীয়। অবশ্যি এসময় নাউট্টা ছেলেরাও মহিলাদের সমান তালে নৃত্য পরিবেশন করতো। এসব নাচিয়ে ছেলেদের মর্যাদা ছিল একটু ভিন্ন রকমের। তবে মহিলারা বাড়ির অভ্যন্তরে নৃত্য পরিবেশন করলেও নাউট্টা ছেলেরা গাজীর গীত, হঁওলা, ভাইট্টাইল্যাগীত, নাউট্টার নাচে অংশ গ্রহণ করতো প্রকাশ্যে। গাজীর গীত, ভাইট্টাইল্যাগীত, হঁওলা, নাউট্টার গীত অনুষ্ঠিত হতো মূলত রাতের বেলায়। আষাঢ় মাস থেকে শুরু করে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়ে কৃষকেরা চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। ভাদ্র মাসে আমন ধান রোপনের কাজ শেষ হলে কৃষকের অজস্র অবসর সময় কাটাবার উপলক্ষ থাকতো না। টানা তিন মাস কর্মক্লান্ত সময় অতিক্রান্ত করে বিনোদনের লক্ষ্যে তারা নাচ-গানের আয়োজন করতো। নাউট্টা ছেলেদের এসব নাচ-গান ও আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হতো রাতের বেলায়। বিশেষ করে ভাদ্র থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত সময়ে জোৎস্নারাতে এসব আয়োজন হতো। নাচ-গানের এসব আয়োজনগুলো হতো মূলত লোকালয়ের বেশ বাইরে। যাতে রাতের বেলায় এলাকাবাসীর রাতের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। এধরনের আয়োজনে প্রতিযোগিতাও হতো।

*কক্সবাজার অঞ্চলের লোকনৃত্যের দৃশ্য*

*কক্সবাজার লোকসাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ১৯৮৭ সালে আয়োজিত লোকসংগীত উৎসবে রামু ও ঈদ এলাকার শিল্পীরা*

www.pathagar.com

নাউট্টা ছেলেদের মধ্যে হতো প্রতিযোগিতা। যে ভালো নাচতে পারে ও গাইতে পারে সেই শ্রেষ্ঠ হতো। উপস্থিত কিছু সমজদার শ্রোতা তাদের নাচ ও গানের বিচার করতো। নাউট্টা ছেলেরা আসরে যখন নেচে গেয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতো তখন অনেক দর্শক উৎসাহের আবেগ রাখতে না পেরে নাউট্টা ছেলেকে নগদ টাকা-কড়ি উপহার দিতো।

এ প্রসঙ্গে নূরুল আজিজ চৌধুরী লিখিত *'সাগরপাড়ের কথকতা'* গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি, "সেকালে সিনেমা, টেলিভিশন ছিল না। সুতরাং বিনোদনের কিছুই ছিল না। শহরে থিয়েটার থাকলেও গ্রামাঞ্চলে তাও ছিল না। বড় বড় নবাব, মহারাজ, জমিদারবাড়িতে বাঈজী নাচের আসরের প্রচলন থাকলেও এদিকে অর্থাৎ বৃহৎ বাংলা প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সেটা ছিল না। তবে জমিদার, মাতব্বর, সিকদারবাড়িতে বিকল্প নাচের আসর হতো। বিশেষ করে শীতকালে। স্থানীয় ভাষায় সুদিনে। স্থানীয় ছোট ছোট জমিদারদের বাঈজী নাচের আসর বসানোর সামর্থ থাকলেও সুযোগ ছিল না। তার বিকল্প হিসেবে কচি সুদর্শন বালকদের মেয়ে সাজিয়ে নাচের আসরের আয়োজন করা হতো। যারা নাচে তাদের বলা হত- নাটুয়া (নাউট্যা)। সেই জন্য এই নাচের আসরের নাম হয়েছে নাটুয়ার নাচ বা নাওট্টার গীত (লেটোর দল)। যারা এই গীত বা নাচের দল গঠন করে গ্রামের দরিদ্র সুদর্শন বালকদের নাচগান শিখিয়ে নাচের উপযোগী করে তোলে সেই সব ওস্তাদদের 'গাইন' বলা হয়। বৃটিশ শাসনামলে কক্সবাজার অঞ্চলে জমিদার, মাতব্বর, সিকদার প্রভৃতি সামন্তপ্রভুরা এই সব গাজির গীত বা নাচের পৃষ্ঠপোষক ছিল। প্রয়াত জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদও সিলেট অঞ্চলের নাটুয়া (ঘেটু) দের জীবন নিয়ে "ঘেটুপুত্র কমলা" নামে চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, চট্টগ্রামের মতো সিলেট অঞ্চলেও নাটুয়ার নাচ প্রচলিত ছিল। সেটাকে তারা বলত ঘেটুর নাচ। আমার শৈশবে অর্থাৎ ছোটবেলায় নানাবাড়ি পি, এম, খালী জমিদার বাড়িতে এই নাটুয়ার নাচের আসর বা গাজির গীত অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। যেহেতু আমার নানাদের পরিবার জমিদার ছিল। তাঁরা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এইসব নৃত্য-গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে অর্থাৎ ৪৭ সনের দেশ ভাগের পরও এসব আসরের রমরমা অবস্থা ছিল নানাবাড়িতে। তবে মধ্য ষাট দশকে এসব আসর অনুষ্ঠানে ভাটা পড়ে অনেকটা অর্থনৈতিক কারণে। নানাবাড়ির কাছারিঘরের প্রধান হলগৃহে এই নাচের আসর হতো। মহেশখালি, রাজাখালি, বাঁশখালি থেকে বিভিন্ন গাইন (গায়েন)রা আসতো তাদের দল নিয়ে শীত মওসুমে। যারা আসতো তাদের মধ্যে আমার দেখা গাইন দলের নাম মনে আছে সেগুলির মধ্যে একটি "ফয়েজুর রহমান গাইনের দল", অপরটি "মোহন বাঁশির দল"। অন্যগুলির নাম মনে নেই। তারা বেশির ভাগ শীতকাল কিংবা ফাল্গুন মাসে আসতো। কারণ, নবান্ন বা ফসল কাটার পর গ্রামের মানুষের হাতে ধানবেচা কাঁচা টাকা থাকতো। সুতারাং বিলাস-আমোদের জন্য টাকা খরচ করার ইচ্ছা মানসিকভাবে তৈরি থাকতো। রাতে গাজির গীত বা নাটুয়া নাচের আসরে উপস্থিত হয়ে নৃত্যরত নাটুয়াদের টাকা বখশিস করতো। তবে বখশিসদাতাদের সামনে স্পেশালভাবে নাচতে

www.pathagar.com

হতো। অনেকে দেশি মদ বা তাড়ি খেয়ে আসতো। হাতে থাকতো টর্চ লাইট। এটা তাদের নিত্যসঙ্গী ছিল। কারণ, রাতে বাড়ি থেকে আসা-যাওয়ার সময় অন্ধকারে পথ চলার জন্য টর্চের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি এইসব টর্চের আলো গাজির গীতে নৃত্যরত নাটুয়াদের মুখে নিক্ষেপ করে এক ধরনের আনন্দ লাভ করতো। ভোররাত পর্যন্ত এইসব নাচের আসর চলতো। এইসব নাচগানে সহযোগী ছিল- একজন হারমোনিয়াম বাদক, অপরজন ঢোল বাদক। তবে সেখানে তবলা ব্যবহার হতে দেখা যায়নি। দলের প্রধান অর্থাৎ গাইন (গায়েন) হারমোনিয়াম বাজাতেন। তিনিই দলের ওস্তাদ বা গুরু। নৃত্য শুরুর আগে দর্শকদের সামনে নাটুয়া বালকরা মেকআপের প্রস্তুতি বা সাজতে বসতেন। তাদের সামনে থাকতো একটি ছোট টিনের বাক্স। আধুনিক ভাষায় মেকআপ বক্স বলা যায়। সেখানে থাকতো রূপসজ্জার মালপত্র স্নো, পাউডার, লিপস্টিকসহ একটি আয়না। নাটুয়া বালকদের রূপসজ্জা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ দলের প্রধান বা ওস্তাদ যাদের গাইন বলা হয়, তিনি লম্বা ওভার কোট গায়ে, মাথায় পাগড়ি বেধে বন্দনাসংগীত গাইতেন। গাইন বয়স্ক লোক বিধায় অনেকটা হেঁড়ে গলায় গাইতেন। গাইন সাহেবের গানে পীর আউলিয়া থেকে শুরু করে হিন্দু ধর্মের রাধা-কৃষ্ণসহ দেশের কর্ণধার বা নেতাদের নাম স্মরণ করতেন। সবশেষে এই গাজির গীত বা নাটুয়া নাচের পৃষ্ঠপোষক জমিদার-মাতব্বরের নাম স্মরণ করে তাঁর জন্য প্রশংসাসূচক বাক্যে বন্দনাসঙ্গীত গেয়ে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষ করতেন। ততক্ষণে নাটুয়া বালকদের মেকআপ শেষ হয়ে নাচের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। এরপর শুরু হত নাটুয়াদের নাচ। আমার বৃদ্ধ নানা (নূর মোহাম্মদ চৌধুরী) বড় ইজি চেয়ারে বসে হেলান দিয়ে নাচগান উপভোগ করতেন। বয়সের কারণে বেশিক্ষণ থাকতেন না। ঘুমাবার জন্য চলে যেতেন বাড়ির শয়নকক্ষে। উনার পুত্ররা অর্থাৎ আমার মামারা বাবার চেয়ারের অনেকটা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে নাটুয়ার নাচ দেখতেন। আমার মা, খালা, মামিসহ গোষ্ঠীর অন্যান্য মহিলারা কাছারিগৃহের বাহির থেকে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে এইসব নাচগান উপভোগ করতেন। আমরা অর্থাৎ আমি আমার মামাতো ভাইসহ গোষ্ঠীর অন্যান্য বালকদের সঙ্গে নানার চেয়ারের পাশে বড় টেবিলের নিচে চাটাইয়ে বসে এইসব নাচগানের দর্শক হতাম। জমিদারবাড়ির বাহির থেকে আসা দর্শকরা বেঞ্চ কিংবা চাটাইয়ের উপর বসে এইসব নাচগান উপভোগ করতো। আমরা কিন্তু কোনো রাত পূর্ণ আসর উপভোগ করতে পারি নি। রাত গভীর হলে নিজেদের অজান্তে চাটাইয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। নানার বাড়ির জোয়ান হাইল্যা (মজুর) রা আমাদের ঘুমন্ত শরীরকে টেবিলের নিচ থেকে বের করে কাঁধে নিয়ে যার যার বিছানায় শুইয়ে দিত। গাজির গানের আসরে ঘুমিয়ে পড়লেও সকালে নানা বাড়ির বিছানায় নিজেদের আবিষ্কার করতাম। এইসব নাটুয়ারা বেশির ভাগ হিন্দু সমাজের শুদ্র বা ডোম সম্প্রদায়ের ছেলেরা থাকতো। ৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর গরিব মুসলমান ঘরের ছেলেরাও নাটুয়া সাজতে এগিয়ে আসে। তৎমধ্যে উখিয়ার ওয়ালাপালঙের 'সুলতান্যা নাটুয়া'র নাম মনে আছে। আমার শৈশবে নানার বাড়িতে এইসব নাটুয়ার দল প্রায় একমাস অবস্থান করতে দেখেছি। তারা যখন প্রথম দিন আসতো নানাবাড়ির

www.pathagar.com

কাছারিঘরের একটি কক্ষে থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হতো। অন্দর বাড়ি থেকে তাদের জন্য চাউল, তেল, মরিচ, মসলা এবং একটি মুরগি দিত প্রথম দিন আহারের জন্য। কাছারির সামনে উঠানে হতো রান্না-বান্না। যাত্রাদলের মতো দিনে তারা ঘুমাতো আর সারারাত নাচগান করতো। এইসব ছিল তখনকার দিনের গ্রাম্য মানুষের আমোদ-প্রমোদ বিলাস। শুনেছি, বৃটিশ শাসনামলে স্টিমার যোগে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামে আসা-যাওয়ার সময় দীর্ঘ ভ্রমণকালীন একঘেয়েমি কাটানোর জন্য চকরিয়ার প্রভাবশালী জমিদারগন স্টিমারের ডেকে নাটুয়ার নাচ বা গাজির গীতের আসরের ব্যবস্থা করতেন। স্টিমার কর্তৃপক্ষ এতে তেমন বাধা দিতেন না। আমার শৈশবে অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালের দিকে নানার বাড়ির কাছারির উঠানে (পশ্চিম পাশে) কবির গানের আসর বসতে দেখেছি। গানের বিষয়বস্তু ছিল- নর ও নারী। মায়ের মুখে শুনেছি জমিদারি আমলে শীতকালে (সুদিনে) জোয়ারি খাল বেয়ে মুশ্যানী পাড়ার ঘাটে এসে নোঙর করতো যাত্রাদলের নৌকা। নৌকায় তাদের মালপত্র অন্যান্য সরঞ্জামসহ শিল্পীরা থাকতো। তারা নানাবাড়িতে প্রায় একমাস না হলেও পনেরো-বিশদিন যাত্রা আসর বসাতো। নানাবাড়ির দক্ষিণ পাশের বিলে ফসল কাটা জমিতে যাত্রার প্যান্ডেল তৈরি হতো। মায়ের কাছে আরও জেনেছি- নিমাই সন্ন্যাসী, ভাওয়াল সন্ন্যাসী, লায়লা মজনু এইসব যাত্রাপালা হতো। আগে যখন জমিদারি রমরমা ছিল অর্থাৎ জমিদার হাব্বান আলী চৌধুরীর সময় জমিদারি পুন্যাহ উপলক্ষে পনেরো থেকে একমাসব্যাপী বলিখেলা হতো। বার্মার আরাকান থেকে রোহিঙ্গা বলী, মগ বলীরা আসতো। সেই সঙ্গে যাত্রাগান, কবিগান, গাজির গীত বা নাটুয়া গানের আসর হতো। শতশত, হাজার হাজার মানুষের খাওয়া-দাওয়া হতো। এইসব বিশাল অঙ্কের খরচ আসতো জমিদারবাড়ি থেকে। এইসব বিলাসিতা- অপচয়ের কারণে এই জমিদার পরিবারের পরবর্তী বংশধরগণ আর্থিক ভাবে খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হন। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে আয়-রোজগারে ভাটা পড়ে। সুতারাং সেইসব বিলাস-উৎসবেও ভাটা পড়ে। পরবর্তীতে যাত্রাদলের আগামন বন্ধ হয়ে গেল। বিগত শতাব্দির পঞ্চাশ দশকেও আমি গাজির গীত বা নাটুয়ার নাচের অনুষ্ঠান আয়োজন হতে দেখেছি। পরবর্তীতে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। যুগের পরিবর্তনে মানুষের মনের জগতেও পরিবর্তন আসে। এখন সেই জায়গা দখল করে আছে টেলিভিশন-ভিডিও'র অনুষ্ঠান।"[৫]

কৃষক তথা চাষা-মজুর, কামলারদল নাচ-গানের মাধ্যমে আনন্দ উৎসব করে কয়েকটি দিন অতিবাহিত করতো। এর পরে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া বা আরাকানে শ্রম বিনিয়োগ করার জন্য চলে যেতো। এপ্রসঙ্গে কক্সবাজার সদর উপজেলার লোককবি আবদুল করিম বরকেতা গাইন বর্ণনা করেছেন এভাবে-

"পলকা মারি রুয়ের ধান
ন বাচিব হাইল্যার জান,
ভাতর মোচা বাঁধি দ-রে
রাউন্যাতে যাম।
রাউন্যারঅ টিয়া লই

www.pathagar.com

ঘরে বসি খাউয়ুম বই,
আশিন মাইস্যা যেন তেন
রোয়াং যাইয়ুম বই।
রোসাঙ্গেরঅ ধান কাড়ি
হাতর চাম ভাই যার ফাঁড়ি,
আইক্যাবতুন কিনের ভাইরে
রেশমি শারি।
রেশম শারি মাদুলি
কিনের ভাইরে কি গরি
ঘরত মাঝে খাইত ভাত নাই
আইন্য কি বুলি।"[৬]

"১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে কক্সবাজার শহরের সংস্কৃতিসেবী ও সংগীতপ্রেমীরা পদ্ধতিগত সংগীত শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৫৯ সালে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডি এফ ও) জনাব আবদুল আলীম কক্সবাজারের সংস্কৃতিসেবীদের একটি সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহ দেন। তখন পদ্ধতিগত সংগীত শিক্ষায় তালিমপ্রাপ্ত শিক্ষক বলতে শহরে ছিলেন জনাব স ম আবু বকর ছিদ্দিকী। জনাব আবদুল আলীম ও জনাব আবু বকর ছিদ্দিকী-এ দুজনের মেলবন্ধনে এগিয়ে এলেন অন্যান্য সংগীতপ্রেমীরা। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'সংগীতায়তন' -কক্সবাজারের প্রথম শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয় তিনি সরকারি জায়গার উপর বাঁশের বেড়া ও শনের ছাউনির ঘর তোলারও ব্যবস্থা করে দেন। স্থানটা ছিল বর্তমান কক্সবাজার প্রেসক্লাবের পাশাপাশি একটি জায়গা। এর পূর্বে গঠিত হয়েছে সংগীতায়তনের প্রথম পরিচালনা পরিষদ : সভাপতি জনাব আবদুল আলীম, সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন তখনকার কক্সবাজার সংস্কৃতি অঙ্গনে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব, নাট্যাভিনেতা জনাব নূরুল হুদা চৌধুরী।

মিহির লালা- যিনি বর্তমানে পূর্ববাংলার প্রথম সংগীতশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামস্থ 'আর্য সংগীত'র অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ বেতার-এর অবসরপ্রাপ্ত সংগীত প্রযোজক ধর্মদর্শী বড়ুয়াসহ দেশবরেণ্য অনেক সংগীত সাধক এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে সংগীতায়তনের উদ্যোগে ১৯৭২ সালে- বাংলা ১৩৮১-এ কক্সবাজারে পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয় যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

এই সংগীতায়তনকে কেন্দ্র করেই জেলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে নৃত্য, গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হওয়া শুরু হয়।"[৭]

"দেশ বিভাগের পর কক্সবাজারের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কিছুটা প্রাণ সঞ্চারিত হয়। মনমোহন সেন, ওয়াহিদুল আলম, মকবুল আহমদ, আবদুর রহিম চৌধুরী, বজল আহমদ, সুরেশ চন্দ্র সেন, মনীন্দ্র লাল চৌধুরী, মোজাম্মেল হক চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ইন্দ্র কুমার সেন, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যসহ আরো অনেকেই ছিলেন সেই সময়কালের নিবেদিতপ্রাণ সাংস্কৃতিক যোদ্ধা। উল্লেখিত সময়ে কক্সবাজারের সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

অঙ্গনের প্রাণকেন্দ্র কক্সবাজার ইন্সটিটিউট ও পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন এডভোকেট জ্যোতিস্বর চক্রবর্তী। তৎকালের মহকুমা প্রশাসক আবুল খায়ের-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কাচারী পাহাড় ময়দানে মঞ্চায়িত হয়েছিল নাটক 'মহারাজ নন্দকুমার'। দেব প্রসাধ ভট্টাচার্য, ওবাইদুল হাকিম, নজিবর রহমান, এডভোকেট নলিনী দত্ত, প্রবোদ কুমার রক্ষিত, নিরোদ বরণ চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র নাশ মজুমদার নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন। সে সময় মনিকাঞ্চন, আওরঙ্গজেব, কঙ্কাবতীর ঘাট, মেঘে ঢাকা তারা প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। কক্সবাজার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ছয় দশকের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ওস্তাদ আবু বকর সিদ্দিকী ১৯৪৯ সালে এ অঙ্গনে তাঁর পদচারণা। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কক্সবাজারের মহকুমা প্রশাসক হিসেবে জনাব এ, কে, এম জাকারিয়া দায়িত্ব পালন কালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সাংস্কৃতিক ভুবন আবার প্রাণের ছোঁয়া পায়। উল্লেখিত সময়কালের স্মরণীয় মঞ্চায়ন ছিল টিপু সুলতান, নবাব সিরাজদৌল্লা, সিরাজের স্বপ্ন, মীর কাশেম, জাহাঙ্গীর, চন্দ্রগুপ্ত, ফিরোজ শাহ, সাধক রামপ্রসাদ, রাজা হরিষচন্দ্র, নিমাই সন্যাস, মার্চেন্ট অব ভেনিস, শাহজাহান, ঝিলিমিলি, বিশ বছর আগে ইত্যাদি। এ সকল মঞ্চায়নের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ফরিদ আহমদ, ওস্তাদ আবু বকর সিদ্দিকী, জ্যোতিশ্বর চক্রবর্তী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নজিবর রহমান, ওবাইদুল হাকিম, বজল আহমদ, নিরোদ বরণ চক্রবর্তী, ইন্দ্র কুমার সেন, মকবুল আহমদ, দুলাল পাল, অমরেন্দ্র নাথ মজুমদার, আবদুল হাকিম, প্রবোধ কুমার রক্ষিত, মনতোষ কুমার চৌধুরী, সুরেশ চন্দ্র সেন প্রমুখ। "সংগীত সমিতি" নামের পাবলিক ইন্সটিটিউটের একটি সহযোগী সাংস্কৃতিক সংস্থার পত্তন হয়েছির ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে।"[৮]

শহরের প্রাক্তন আইবপি সড়ক বর্তমান বঙ্গবন্ধু সড়কস্থ বাবু অনঙ্গ চৌধুরীর বসতবাড়ি (যা বর্তমানে ইউনাইটেড বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত) প্রাঙ্গনে যাত্রা মঞ্চস্থ হতো। বিশেষ করে শারদীয় দুর্গোৎসবের বিজয়া দশমীর দিন থেকেই যাত্রানুষ্ঠান শুরু হতো। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে যাত্রার বিভিন্ন নারী-চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করতো। এসব নারী চরিত্রে বাদল চক্রবর্তী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুশীল ব্রহ্মচারীসহ অনেকেই অভিনয় করতেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সর্বপ্রথম নারী চরিত্রে অভিনয় করার জন্য একমাত্র মহিলা শহরের বদরমোকাম এলাকার খালেদা বিলকিস বানু (বর্তমানে প্রয়াত) এগিয়ে আসেন। খালেদা বিলকিস বানুর দেখানো পথ ধরে শহরের সাজু, শিপ্রা চক্রবর্তী এগিয়ে আসেন।"[৯]

দেশ ভাগের পরেই কক্সবাজার মহকুমা সদরের পাশাপাশি রামু উপজেলা সদরে ও কক্সবাজার সদর উপজেলার ঈদগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রিক নাটক মঞ্চায়ন হতে থাকে। ঈদগাঁওতে নবাব সিরাজদৌল্লা, টিপু সুলতান, মীর কাশেম, শাহজাহানসহ বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকে। এসব নাটকে অরবিন্দু দে প্রকাশ বাদল, গোপালকৃষ্ণ শর্মা, শফিক আহমদ, মোজাম্মেল হক ফরাজী, ছৈয়দুল আলম চৌধুরী, সিরাজুল হক, জাকের হোছাইন, জাফর আলম, রাজা মিয়া, আমান উল্লাহ, আহমদ হোছাইন, আকতার কামাল, মুহম্মদ নূরুল ইসলামসহ অনেকেই বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে দর্শক মন জয় করেছেন।"[১০]

www.pathagar.com

নবাব সিরাজদৌল্লা, টিপু সুলতান, মীর কাশেম, শাহজাহান, সোনার বাংলা, হসপিটাল, সিদ্ধার্থ, অংগুলিমালসহ বিভিন্ন মঞ্চ সফল নাটক রামু উপজেলা সদরের রামু খিজারী উচ্চ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে মঞ্চস্থ হতে থাকে। এসব নাটকে দীনেশ চন্দ্র বড়ুয়া, ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়া, অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, সনসথ বড়ুয়া, শিশির বড়ুয়া, সুধীর বড়ুয়া, ওবাইদুল হক, নূরুল ইসলাম বাচ্চু মিয়া, ধনিরাম বড়ুয়া, মানিক চক্রবর্তী, ক্ষিরোদ চক্রবর্তী, গুরুপদ দে প্রমুখ অভিনয় করতেন। স্বধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে নূরুল ইসলাম বাচ্চু মিয়া ও মনমথ বড়ুয়ারা নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রামু সদরে নারী চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সর্বপ্রথম পারুল বড়ুয়া, সবিতা বড়ুয়া, গীতা বড়ুয়া এগিয়ে আসেন। তাদের পথ ধরে পরে অনেকেই এগিয়ে আসেন। তবে বর্তমানে নাটক বা যাত্রা নাটক মঞ্চায়নে ভাটা পড়েছে।"[১১]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে নাট্যাঙ্গনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। তরুণ ও প্রতিশ্রুতিবান যুবকেরা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আবির্ভূত হয়। এদের হাতেই প্রথম যে সংগঠনটি গড়ে উঠে সেটি হল 'পিনাক শিল্পী গোষ্ঠী'। এরপরে কক্সবাজারের প্রথম গ্রুপ থিয়েটার 'ব্যতিক্রম', 'রং বেরং নাট্য সম্প্রদায়', 'ঝংকার শিল্পী গোষ্ঠী', 'গাঙচিল', 'এক পা সামনে', 'ঝিনুক শিল্পী গোষ্ঠী', 'সমকাল নাট্য ও সাহিত্য সম্প্রদায়', 'সপ্তরূপা', 'পূর্বাচল' ও সনাতন নাট্য গোষ্ঠী প্রভৃতি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিপুল সেন ও বাবুল পালের সমন্বয়ে সনাতন নাট্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে জেলায় সর্বপ্রথম যাত্রাপাল শুরু হয়। জেলা সদরের বাইরে রামু গড়ে উঠে দুর্বার শিল্পী গোষ্ঠী। দুর্বার শিল্পী গোষ্ঠী কক্সবাজার জেলার গণ্ডি পেরিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাাকয় গিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

## নৃত্য

রাখাইনদের জীবনচক্রে এবং সামাজিকতার সকল পর্বে নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। কোন পূজনীয় গুণীজনের মৃত্যুতে শবদেহকে বহন করে নৃত্যের মাধ্যমে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে। এসব নৃত্যের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি বর্ণনা করা হল :

**১। বৌদ্ধ পূজনীয় নৃত্য** : প্রদীপ হাতে রাখাইন তরুণীরা দলবদ্ধ হয়ে এ নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। আরাকানরাজ মাঙ বাগ্রীর আমল হতে এ নৃত্য প্রচলন হয়ে আসছে।

**২। নেৎ নৃত্য** : বুদ্ধের পূর্বযুগে আরাকানবাসীরা বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করত। এ ধারাকে অনুসরণ ও লালন-পালন করে রাখাইনরা দ্বীপ-দেবতা, পাড়া-দেবতা, গ্রাম-দেবতা, নগর-দেবতা, গৃহ-দেবতা ইত্যাদিকে এখনো পূজা অর্চনা করে থাকে। একদা প্রত্যেক এলাকায় বর্ষারম্ভে দেবতাদেরকে তুষ্ট করার জন্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।

**৩। সেইং ডেইং নৃত্য, আজিং জিকে নৃত্য, আরাছামাংগী নৃত্য, হেং নৃত্য, য়েইং নৃত্য, সাং গ্রেং নৃত্য, রাঠা ছোয়ে হেং নৃত্য** : রাখাইন তরুণীরা দলবদ্ধ হয়ে আধুনিক ব্যালে নৃত্যের ন্যায় এ নৃত্যসমূহ পরিবেশন করে থাকে। এ নৃত্যের বিভিন্ন

www.pathagar.com

মুদ্রায় রাখাইনদের সমাজজীবনের জন্ম, বাল্যকার ও বয়ঃপ্রাপ্তি, বিভিন্ন খেলাধুলা, উৎসব পার্বণসমূহকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়।

**৪। কিং নারা নৃত্য, টোঃ নৃত্য, ছেং টাউপোঃ নৃত্য, সে ছাড়াউ ক্রি ম্যা নৃত্য, র ও ছে নৃত্য :** খ্রিষ্টীয় ৯০১ অব্দ হতে এ সমস্ত নৃত্য প্রচলন হয়ে আসছে। বাঁশ বেত প্রভৃতি কাঠামোর উপর কাপড় পেঁচিয়ে বিভিন্ন কাল্পনিক মূর্তি তৈরি পূর্বক এর ভিতরে মানুষ প্রবেশ করে নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

**৫। নাগ নৃত্য :** ধর্মীয় উৎসবাদি বিশেষ করে বহুচক্র (ওয়াং-গাবা) উৎসবে এ নৃত্য পরিবেশন করা হয়। নাগের মাথা তৈরি করে তার পিছনে কাপড়ের দীর্ঘ লেজ জুড়ে দেয়া হয়। ধর্মীয় শোভাযাত্রার পুরোভাগে অবস্থান করে নাগের মাথা ও লেজ বহন করে প্রায় ১০-১৫ জন তরুণ এ নৃত্য পরিবেশন করে। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে বিশেষ ধরনের ঘণ্টাবাদক ঋষিবেশধারী এক যুবক থাকে।

**৬। পাংখু নৃত্য :** আরাকানে পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীরা এ নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনির উপর ভিত্তি করে এ গীতিনৃত্য পরিবেশিত হয়।

**৭। ঙাচে নৃত্য :** রাখাইন ইতিহাসকে বর্ণিত করে একক অভিনয়ের মাধ্যমে এ নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

**৮। ডুং নৃত্য, ছেইং নৃত্য :** ধর্মীয় পুরোহিত মৃত্যুবরণ করলে প্রয়াতকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন স্বরূপ শবদেহকে কাঁধে নিয়ে তরুণ-তরুণীরা এ নৃত্য পরিবেশন করে থাকে।

আরাকানে ১৬শ শতকে লিখিত সাইথং প্যাগোডায় খোদিত দেয়ালচিত্রে আরও অনেক ধরনের নৃত্য প্রচলনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

## সংগীত

রাখাইন সংগীতে বিভিন্ন ধারা বর্তমান। মূল শাস্ত্রীয় ধারায় পরিপূর্ণ সংগীতসমূহের চর্চা বর্তমানে নেই বললে চলে। এসাং, ছা সাং, ছা চলে, প্রোয়ে, সো লাই, রাড়ু, লাংকা, হেং চলে, ছেং সংগীতসমূহ এসব শ্রেণিভুক্ত। প্রচলিত লোক সংগীতের মধ্যে ছেং সে ক্রী, নেৎ সাং, ডুং সাং, ছা সাংসমূহ উল্লেখযোগ্য।

নিচে রাখাইনদের একটি জনপ্রিয় সংগীত দেয়া হল :

রাখাইং রাখাইং, রাখাইং আকাহ সিং ধাইং হ্লা
লাউ খউ ছা লো তিরা পারে
আ থু কা গে হ্লা পারে
বুশে আকে সিং ধাইং হ্লাপারে।
লেৎ লেৎ লেৎ আলুরো লেৎ
লাভাঃ তাপ্রাং সাং শেনা
কেজেৎ খি কেৎমে।

www.pathagar.com

আ থু আ থু পং ফো
ধো ধো ধোঃ চাই কেং মে।

রাখাইং লুসে কেজেৎ টে
ও রাউমারো আক্যেং রো খ-পা রে।

**অনুবাদ**
রাখাইন রাখাইন, রাখাইন নাচ অপূর্ব সুন্দর
ব্যথা ভরা হাততালিতে
নাচলে কাকে সুন্দর দেখায়?
শিশু নাচলে সুন্দর দেখায়।

এসো এসো সবাই এসো
ভরা জোৎস্না রাতে জোৎস্নাতে
খেলতি চলি।

কে কে যাবে চলো
ঘিলা বিচি খেলতে চলো।
রাখাইন শিশু খেলছে
ও বৌদিগো মোদের আনন্দ লাগছে।"[১২]

## তথ্যনির্দেশ

১. ভূমিকা, লোকনাটক, বাংলা একাডেমি, ফোকলোর সংগ্রহমালা (সম্পাদক) শাহিদা খাতুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০১০।
২. ভূমিকা, আশুতোষ চৌধুরীর রচনা ও সংগ্রহ-সম্ভার- মোমেন চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮৮, পৃষ্ঠা : [বার-তের]।
৩. আশুতোষ চৌধুরীর রচনা ও সংগ্রহ-সম্ভার- মোমেন চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮৮, পৃষ্ঠা :১১৭-১৪৬।
৪. সিরাজুল হক, পিতা : শাহাব মিয়া, মাতা : নীলা খাতুন, বয়স : ৬৩ বছর, গ্রাম : উয়ালাপালং ঘিলাতলী, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার। তারিখ : ০১-১০-২০১১, সময়- সকাল সাড়ে ৯টা।
৫. সাগর পাড়ের কতকথা- নূরুল আজিজ চৌধুরী, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, কক্সবাজার, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা-১০০-১০২।
৬. বরকেতা গাইন-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, কক্সবাজার, প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৭।
৭. অধ্যাপক মুফীদুল আলম, সভাপতি, সঙ্গীতায়তন, বঙ্গবন্ধু সড়ক পশ্চিম, কক্সবাজার, বয়স : ৭১ বছর, তারিখ : ১৪-০৪-২০১৩, সকাল- সাড়ে ১০ট।

www.pathagar.com

৮. 'সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড'- হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, -কক্সবাজারের ইতিহাস-সম্পাদিত, প্রকাশক-কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রকাশ : ৩০ জুন, ১৯৯০ সাল। পৃষ্ঠা-১০৯।
৯. বিপুল সেন, পিতা : ইন্দ্র সেন, মাতা : বিন্দু রাণী সেন, বয়স : ৫৬ বছর, গোল দিঘীর পাড়া, কক্সবাজার পৌরএলাকা, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২২-১০-২০১৩, সময় : রাত- ১০ট।
১০. শফিক আহমদ, সিনিয়র শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), ঈদগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, বয়স : ৭২, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৯-০৯-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।
১১. ধনিরাম বড়ুয়া (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, হালদারকূল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়), পিতা : তেজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, মাতা : কেশীবালা বড়ুয়া, বয়স : ৬৮ বছর, গ্রাম : শ্রীধন পাড়া, ইউনিয়ন : ফতেখারকূল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৯-১২-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।
১২. বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায় : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা-মং বা অং (মং বা), লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ। পৃষ্ঠা-১১৩-১১৪।

www.pathagar.com

# লোকপেশাজীবী গ্রুপ

কক্সবাজার বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত জেলা। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে বিশাল দিগন্ত বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর ও পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে ঘনজঙ্গলে আচ্ছাদিত বনাঞ্চল। জেলার অন্যতম প্রধান নদীসমূহ হচ্ছে মাতামুহুরি, বাঁকখালি ও আন্তর্জাতিক নদী নাফ। জেলার পূর্বপার্শ্বস্থ বান্দরবান পার্বত্য জেলার পাহাড় ও বনভূমিসহ জেলার আওতাধীন পাহাড়-পর্বত থেকে স্রোতবাহী পলি জমতে জমতে জেগে ওঠেছে অনেক চর, ডিয়া বা দ্বীপ। এ কারণেই জেলায় সৃষ্টি হয়েছে বেশ কয়েকটি দ্বীপ। দ্বীপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কুতুবদিয়া, সোনাদিয়া, মাতারবাড়ি, ধলঘাটা। জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিন বা নারিকেল জিনজিরা দেশি-বিদেশি ভ্রমণ পিপাসুদের প্রধান আকর্ষণ। মহেশখালি উপজেলা মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ হলেও তা পলিবাহিত নয়। এককালে দ্বীপটি কক্সবাজারের মূল ভূ-খণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল। কক্সবাজারের আটটি উপজেলার মধ্যে দ্বীপ-উপজেলা কুতুবদিয়া ছাড়া অবশিষ্ট সাতটি উপজেলায় কিছু না কিছু টিলা, পাহাড় বা উঁচু ভূমির সমন্বয়ে গঠিত। সবগুলো উপজেলার মধ্যে বৈচিত্র রয়েছে মহেশখালিতে। মহেশখালি উপজেলাটি একটি দ্বীপ হলেও সেখানেও রয়েছে পাহাড়, টিলা এবং উঁচুভূমির সমন্বয়।

মাতামুহুরি, বাঁকখালি, নাফনদী শুধু নয় জেলায় রয়েছে আরো অসংখ্য ছোট-বড় নদ-নদী, খাল, ছরা। পরিবেশগত কারণেই জেলার মানুষের পেশাও বিচিত্র। পাহাড়ি এলাকায় মানুষ যেমন কাঠ কাটতে, শিকার করতে অভ্যস্ত, তেমনিভাবে নদ-নদীর তীরের, সমুদ্র-উপকূলীয় মানুষ নদ-নদী ও সাগরে গিয়ে মাছ শিকারে অভ্যস্ত। এসব লোকজন তাদের পরিবেশ পরিস্থিতির উপরই নির্ভর করে তাদের পেশা বেছে নিয়েছে। শত শত বছর আগে স্থানীয় লোকজন পাহাড় এবং সামুদ্রিক সম্পদকেই তাদের জীবিকার মাধ্যম হিসেবে নিয়েছিলেন। জেলার বেশিরভাগ এলাকা পাহাড়, বনাঞ্চল,' নদ-নদী ও সমুদ্রের পানিতে প্লাবিত ছিল বিধায় কৃষিজীবী হওয়ার অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পায়নি। কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি, ওঝা, কলু, জেলে, ঘরামি, কৈয়াল, ছৈয়াল, বারৈ, কাহার (মাআরা) ইত্যাদি গ্রুপের মানুষের উদ্ভব হয়। পেশাভিত্তিক মানুষ বৈশাখী মেলা, বারুণী মেলা, ঈদ-পার্বণ, চৈত্রসংক্রান্তির মেলা, রথমেলাসহ বিভিন্ন মেলায় তৈরি পণ্য বিকিকিনি করার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকতো। একপর্যায়ে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাই এখানকার মানুষের জীবিকার প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠে। তবে সমুদ্র উপকূলীয় মানুষসহ জেলে সম্প্রদায়ের অন্যতম ও প্রধান পেশা মৎস্য শিকার। বর্তমানে দিন ও সময়ের পরিবর্তনের ফলে জেলে সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষের পেশার সাথে সংস্পৃক্ত থাকতে পারছে না। জেলার প্রধান মুসলমান সম্প্রদায়ের বনেদি

www.pathagar.com

লোকজনই মৎস্য শিকারকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এসব লোকজন ইঞ্জিনচালিত নৌকা (যাকে মেকেনাইজড্ বোট বলা হয়) নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ শিকার করছে। কেউ কেউ নিজে সাগরে গিয়ে মাছ ধরছে। আবার কেউ কেউ মাঝি-মাল্লা নিয়োগ করে মৎস্য ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এসব লোকজন নৌকা তৈরি করে, নৌকায় ইঞ্জিন সংযোগ করে, মাছ ধরার জাল দিয়ে সাগর থেকে মাছ ধরলেও তাঁরা নিজেরা মৎস্য শিকার করেন না বরঞ্চ তাঁরা একে ব্যবসা হিসেবেই নিয়েছেন।

"চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সময় থেকে কোম্পানির এলাকায় আরাকানীদের বসতি দান কোম্পানির একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি ছিল। কোম্পানি দেখে যে কক্সবাজার এলাকা জনবসতিহীন এবং চাষাবাদ বিহীন। ইহার ঐতিহাসিক কারণ এই যে, মুঘল আমলে পর্তুগিজ এবং আরাকানি মগ দস্যুদের অত্যাচার এবং লুটতরাজের ফলে এই এলাকায় জনবসতি এবং চাষাবাদ সর্বদা বিঘ্নিত হতো। তাই কোম্পানি প্রথম থেকেই এই এলাকাকে জনবহুল এবং চাষযোগ্য করার নীতি গ্রহণ করে। আরাকানের উদ্বাস্তুরা কোম্পানির এই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। কোম্পানি উদ্বাস্তুদের সাহায্য করে মানবতার কারণে, কিন্তু তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এলাকাকে জনবহুল এবং চাষযোগ্য করে তোলা। ফলে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি হয়। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে আরাকানি উদ্বাস্তুদের কক্সবাজার আগমন কোম্পানি একটি সাময়িক ঘটনা রূপে গ্রহণ করে। কলকাতার সুপ্রিম কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে চট্টগ্রামস্থ কোম্পানির কর্মকর্তারা উদ্বাস্তুদের রামু এবং তার আশেপাশে পার্বত্য এলাকায় বসতি দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অগণিত উদ্বাস্তু এবং আশ্রয় গ্রহণকারী আসার ফলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আরাকানি বিদ্রোহী সরদারদের উপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরও জটিলতর করে তোলে। বিদ্রোহী সরদারেরা মাঝে মাঝে আরাকান আক্রমণ করে লুঠতরাজে লিপ্ত হয়। এমনকি কখনও কখনও তারা কোম্পানির এলাকায়ও লুঠতরাজ করত। প্রকৃতপক্ষে আরাকানি মগদের লুঠতরাজ তাদের জাতীয় চরিত্রের একটি কলঙ্কময় অধ্যায়। চট্টগ্রামের কালেকটর কলকাতার গভর্নর জেনারেলকে জানান যে নবাগত আরাকানি উদ্বাস্তুদের কোম্পানি এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের কোনো ইচ্ছা নেই; ইতিপূর্বে প্রদত্ত মহেশখালিতে ভূমি চাষের সুযোগ তারা প্রত্যাখ্যান করে নাফ-নদীর নিকটস্থ পাহাড় জঙ্গলে চলে গেছে, যাতে তারা উভয় দেশে লুঠতরাজ করতে পারে।"[১]

"আরাকানী উদ্বাস্তুদের মধ্যে চাষি ছাড়া ও বিভিন্ন পেশাজীবী, যেমন কারিগর, দোকানি, জেলে ইত্যাদিও ছিল। তাদের পুনর্বাসন এবং জীবিকার ব্যবস্থাও করা হয় এবং তাদের স্ব স্ব পেশায় নিযুক্ত করে পূর্ববর্তী শর্তে ও হারে অগ্রিম দেওয়া হয়। উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আগত তাদের ধর্মযাজক বা ফুংগীদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়। ক্যাপ্টেন কক্স মনে করেন যে এইরূপ ব্যবস্থার ফলে মানবিক দায়িত্ব পালন করা হবে, দুর্বলেরা ধীরে ধীরে শ্রমজীবী হয়ে উঠবে, তাদের অলসতা দূর হবে এবং তাদের যৌথ উদ্যোগে দেশ ও জনগণের উন্নতি হবে। উদ্বাস্তুদের ব্যক্তিগত জীবনে তাদের নিজস্ব আইন ও প্রথাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তবে শর্ত দেওয়া হয় যে ঐ আইন ও প্রথাগুলি মানবিক হবে এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। রামু থেকে

www.pathagar.com

উখিয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বসতির সুযোগ সুবিধার জন্য কয়েকটি আদর্শ পরিকল্পনাও দেওয়া হয়; এই পরিকল্পনাগুলি হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পুকুর ও হাটবাজার প্রতিষ্ঠা করা। বাঁকখালি, রেজু ও নাফ নদীর তীরে জেলেদের বসতি দেওয়া হয় এবং বনভূমি ও জঙ্গল পরিষ্কার করার সুবিধার্থে উদ্বাস্তুদের ২০০ কুঠার, ১০০ কাঁটারি, ১২টি বড় কাঁচি, ২০টি করাত, ৫৬টি ছুঁচালু কুঠার, ১০০টি কোদাল ও ৪টি বড় শান পাথর সরবরাহ করারও ব্যবস্থা করা হয়।[২]

নূতন আবাদকৃত জমি নোয়াবাদ নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম কক্সবাজারের ইতিহাসে নোয়াবাদ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। কোম্পানির এই নীতির ফলে অনেক পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ জমি আবাদ হয়ে যায়। কোম্পানির ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষণার ফলে নোয়াবাদ জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং বৃহত্তম জমিদারি "জয়নগর জমিদারি বা জয়নগর এষ্টেট" নামে পরিচিত লাভ করে। জয়নগর জমিদারির ইতিহাস বড়ই বিভ্রান্তি কর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চট্টগ্রামের দিওয়ান ছিলেন গোকুল চন্দ্র ঘোষাল। তিনি তাঁর ভাইপো জয় নারায়ণ ঘোষালের জন্য বেনামে এই জমিদারির গোড়াপত্তন করেন। জয় নারায়ণ জমিদার সকল পতিত জমি আবাদের জন্য সনদ পান বলে দাবি করেন এবং কোনো জমিদারকে তাঁর বিনানুমতিতে পতিত জমি আবাদ করার অধিকার দেওয়া যেতে পারে না বলে দাবি করেন। ফলে পতিত জমি আবাদে কিছু বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। যাই হউক, যেই সনদের বলে জয় নারায়ণ জমিদারি প্রতিষ্ঠিত তা জাল এবং ভুয়া বলে আধুনিক পন্ডিতেরা মনে করেন এবং ১৭৯৬-৯৮ সালে বিশেষ তদন্তের ফলশ্রুতিতে ঘোষালদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি সরকারের খাস করা হয়। জয়নগর জমিদারির একচেটিয়া অধিকারের ফলে পতিত জমি আবাদের ব্যাপারে অনেক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। ১৭৬৪-৬৭ সালের জরিপে দেখা যায় যে, জয়নগর জমিদারির মোট আয়তন ৩৫০১ দ্রোণ, এর পতিত জমি ২৮০৮ দ্রোণ এবং আবাদী জমি ৬৯২ দ্রোণ। ১৭৭১ সালে এই জমিদারির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫৭০ দ্রোণ যার মধ্যে ৫০০৩ দ্রোণ পতিত এবং ১৫৬৬ দ্রোণ আবাদী জমি। অথচ ১৭৬৭ সালের হিসাব মতে চট্টগ্রামের মোট জমি ছিল ১৫,৯৪,৮১৬ একর তার মধ্যে ৩,৯০,২৮২ একর জরিপ করা হয়। অতএব দেখা যায় জয়নগর জমিদার আবাদ কাজে বেশি কিছু করেনি। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কক্সবাজারে কতটুকু জমি আবাদ করা হয়? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। তবে কক্সবাজারের কিছু জমিদারির উল্লেখ পাওয়া যায়।"[৩]

এত দীর্ঘ আলোচনা মূলত প্রাচীনকালে কক্সবাজারের জমির চরিত্র কী রকম ছিল তা দেখা ও এলাকার পেশাজীবীদের একটি বিবরণ উপস্থাপন করা।

পরবর্তী পর্যায়ে চাষাবাদের জমি সৃষ্টি ও এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরেই লোকজন কৃষির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। ফলে কৃষি ক্রমে নিজের প্রয়োজন ছাড়িয়ে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষি থেকে উৎপাদিত পণ্যই অর্থনৈতিক আয়ের অন্যতম উপায় হয়ে ওঠে।

লোকজন কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়ার পরেই পর্যায়ক্রমে কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট উপকরণাদি উদ্ভাবনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে লাঙ্গল, জোয়াল, মই, লম্বা দা,

www.pathagar.com

কাস্তে, কোদাল, নিড়ানি, খুরপি, কাঁচি (ধান কাটার), ঢেঁকি, ধানমাড়াইয়ের কল তথা ডলইন, গরুর মুখবন্ধ বা কইরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম তৈরির ব্যাপারে মনোনিবেশ করে। একই সাথে নিজস্ব আবাসস্থলে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি তথা দা, ছুরি, খুন্তি, কুড়াল ও গৃহনির্মাণসামগ্রী তৈরি শুরু করে। জেলার কৃষকেরাই অর্থনীতিতে অগ্রসর ভূমিকা পালন করে।

কুমার, রুদ্র সম্প্রদায়ের লোকজন কক্সবাজার জেলায় পেশাজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদির প্রয়োজন মিটাতে কুমার সম্প্রদায় এগিয়ে আসে। তারা মানুষের চাহিদা অনুযায়ী হাড়ি-পাতিল, বরুনা (ঢাকনা), কলস, তেলইন, আইল্যা (মালসা), সানকি, কন্দা (পেয়ালা), বসি, পানির মগ, ঠুলি, খেলনা পুতুল, হুকা, ঘটি, বদনা, কন্তি, গজি, হাত্তুয়াসহ রকমারি সামগ্রী তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার প্রয়াস চালাতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দিন পরিবর্তণের কারণে কুমার সম্প্রদায়ের পেশা দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। অনেকেই পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে গেছেন। এটা সকল পেশার মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন ঘরামি, কলু, তাঁতি, কামার, কুমার, জোলা, কাহার (মাআরা), তেলি, বারৈসহ সকল পেশার মানুষই তাদের পেশা পরিবর্তন করছে। পেশায় টিকে থাকতে না পেরে অনেকেই বেকার জীবন যাপন করছে। জেলার কামার তথা কর্মকার সম্প্রদায়ও ধুঁকে ধুঁকে তাদের পেশায় টিকে আছে। তবে সিংহভাগ মানুষ ইতোমধ্যে পেশা ত্যাগ করেছে। যারাও বা টিকে আছে তাদের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়। তারা মোটামুটিভাবে পেশাটাকে টিকিয়ে রেখেছে। কামারেরা দা, খন্তি, ছুরি, কোদাল, সাবাল, ছেল, বল্লম, যাতা বা ছুরাতা, লাঙ্গলের ফাল, কাচি, খুরপি, নিড়ানিসহ মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করছে।

কক্সবাজারের পরিবেশের কারণেই এখানে ছুতার বা কাঠমিস্ত্রীরা সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন। বিশেষ করে কক্সবাজারের বেশিরভাগ এলাকা মূল্যবান বৃক্ষসম্পদে ভরপুর সে-কারণেই এই কাঠমিস্ত্রি তথা ছুতারের সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছেন। একই সাথে তাদের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের কাজের গুণগতমান। কক্সবাজারের রামু, উখিয়া, চকরিয়া, কক্সবাজার সদর উপজেলার বিভিন্ন ফার্নিসারের দোকানে গেলে তা চোখে পড়ে। প্রতিটি ছোট-বড় ফার্নিসরের দোকানে কাঠের তৈরি খাট, আলনা, ড্রেসিং টেবল, আলমিরা, ওভারড্রোভ, আলনাসহ রকমারি আসবাবপত্র রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছে।

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি অধ্যায়ে জেলার বিভিন্ন লোকশিল্প নিয়ে আলোচনাক্রমে বিভিন্ন পেশাজীবীদের কথা এসে গেছে। তবু বৃহৎ পরিসরে দারুশিল্পের সাথে জড়িত ছুতার তথা কাঠমিস্ত্রি (নৌকা তৈরির মিস্ত্রিসহ), তাঁতশিল্পী, জেলে সম্প্রদায় ও জাল বুননের সাথে জড়িতদের কথা বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

প্রাচীনকালে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকজন নির্দিষ্ট পেশায় জড়িত ছিল কিন্তু বর্তমানে যুগের পরিবর্তনের ফলে সেই নির্দিষ্ট ছক এখন অতীত। নির্দিষ্ট ছক বলতে

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট পেশার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে জেলার নিম্নবিত্ত কিছু কিছু পরিবারের একমাত্র পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে চালুন, কুলা, লাই, ডুল, ঢোল, বেড়া, চাইসহ বাঁশ ও বেতজাত দ্রব্য পরিবারের ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি করা। রামু উপজেলার ফতেখারকুল, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, চাকমারকুল ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে লাই (টুকরি), চালুন ও কুলা বানানো হয়। চালুন বানানোর কারণে গ্রমের নাম হয়েছে চালুইন্যাপাড়া (দ্রবঃ বস্তুগত লোকসংস্কৃতি অধ্যায়)।

জেলায় বাঁশ-কাঠের ঘর তৈরি করার জন্য যারা নিয়োজিত তাদেরকে স্থানীয়ভাবে 'ওঝা' (ঘরামি) বলা হয়। যারা বিয়ের পালকি, থানজাম বহন করে তাদেরকে স্থানীয় ভাবে 'মাআরা' (কাহার) বলা হয়। 'কাহার' সম্প্রদায় একটি পেশাভিত্তিক গ্রুপের নাম হলেও তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় ও ক্লাব ভিত্তিক বিয়ে প্রচলনের ফলে 'কাহার' সম্প্রদায়ের পেশা বলতে গেলে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ক্লাব ভিত্তিক বিয়ের ফলে 'শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত' গাড়িতে করেই বর-কনেকে পরিবহন করা হয়।

পুঁথিগত বিদ্যায় ঘোষ সম্প্রদায়ের লোকজনই মিস্টান্নদ্রব্য তৈরিতে জড়িত। তবে কক্সবাজারের ক্ষেত্রে মিস্টান্নদ্রব্য তৈরিতে শুধুমাত্র ঘোষ সম্প্রদায় জড়িত নয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক লোকজনই বর্তমানে এই পেশায় জড়িত। শুধু মিষ্টি ছাড়া গুড়, চিনি, ময়দা দিয়ে তৈরি করেন বাতাসা, খাজা, গজা, জিলাপি, খোরমাসহ রকমারি খাদ্যদ্রব্য। তবে এসব দ্রব্যাদি তৈরিতে জড়িতদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এই বাতাসা নিয়েও কক্সবাজারে লোকছড়া সৃষ্টি হয়েছে। যেমন-

"অঁমা অঁমা বুবুর জামাই আইস্যে
পইরর পারত বইস্যে
কি কি আইন্যে চাইয়ম বৈ
ঢাকত যাই বইয়ম বৈ।
এক পাতিলা বাতাসা
তার বাতাসা তারে দে
তারে আরো কদ্দুর বারাই দে।"[৪]

ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও কক্সবাজারের মিষ্টান্নদ্রব্যাদি তৈরিতে নিয়োজিত রয়েছে একটি গ্রুপ। তার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি রয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজন। কক্সবাজার জেলা সদরের 'বৈশাখী' ও পালের দোকানের মিষ্টি তথা 'জেকপস্'-এর মিষ্টির রয়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। অপরদিকে উখিয়া উপজেলার নূরুর মিষ্টির একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য দখল করে নিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নূরুর মিষ্টি তৈরি শুরু হয়েছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই নূরুর মিষ্টির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

"উখিয়ার মিষ্টি বর্তমানে কক্সবাজার জেলায় একটি আদালা স্থান করে নিতে পেরেছে। বিগত দুই দশক আগেও মিষ্টি উখিয়াতে এত জনপ্রিয় ছিল না। শুরুতে

www.pathagar.com

উখিয়া উপজেলা-সদরের দোকানগুলোতে প্রতিদিন ১০ কেজি মিষ্টি বিক্রি করা ভাগ্যের ব্যাপার ছিল ; কিন্তু বর্তমানে উখিয়া উপজেলার ৪টি দোকান থেকে দৈনিক পাঁচ মণ বা প্রায় ২০০ কেজি মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে। পর্যটকদের বদৌলতে উখিয়ার মিষ্টি দেশের রাজধানী ঢাকাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যাচ্ছে।
উখিয়ার মিষ্টির পেছনে রয়েছে একটি ছোট্ট ইতিহাস। এই মিষ্টির পেছনে রয়েছে একজন কৃষিপ্রেমী ত্যাগী মহিলার অবদান। তিনি হচ্ছে মিসেস জাহানারা ইসলাম। ভোলার মেয়ে কক্সবাজারের উখিয়ায় গৃহবধু হয়ে এসে উখিয়ায় ঘটিয়েছেন কৃষিবিপ্লব। বিশেষ করে গরুর খামার, কৃষি খামার করে ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পেয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রিয় পুরস্কার। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের পরে তিনি উখিয়ার পালংখালিতে গড়ে তোলেন তাঁর 'মডার্ন ডেইরি এন্ড পোল্ট্রি ফার্ম'। তাঁর ডেইরি ফার্ম থেকে দৈনিক ৯০ লিটার গরুর দুধ পাওয়া যেত। এত দুধ বিপণনের ব্যবস্থা উখিয়াতে তো নয়ই এমন কি কক্সবাজারেও ছিল না। ফলে তিনি দুধ উৎপাদনের সাথে সাথে বিপণনের দিকে নজর দেন। তিনি নিজে কক্সবাজারে তার বাসা সংলগ্ন দোকানে মিষ্টি তৈরি এবং গরম দুধ বিক্রি শুরু করেন। পরে উখিয়া সদরের 'নূর হোটেল'-এ মিষ্টি তৈরির জন্য দোকানের মালিক নূরুল ইসলামকে উদ্বুদ্ধ করেন। মিসেস জাহানারা ইসলামের উৎসাহ পেয়ে দোকানে মিষ্টি এবং গরুর গরম দুধ বিক্রি শুরু করেন। নূর হোটেলের মালিক নূরুল ইসলাম মিসেস জাহানারা ইসলাম নূর হোটেল কর্তৃপক্ষকে তাঁর নিজস্ব পাচক দিয়ে মিষ্টি তৈরিতে সহায়তা করেন। প্রথম প্রথম উখিয়াতে মিষ্টির বিপণন তেমন সুবিধাজনক না হলেও ক্রমে তা জমে উঠে এবং ব্যবসার প্রসার ঘটে। বর্তমানে উখিয়ার মিষ্টি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। নূর হোটেলে সর্বপ্রথম মিষ্টি তৈরি ও বিক্রি শুরু হয় বলে এই মিষ্টির নাম উখিয়ার 'নূরুর দোকানের মিষ্টি' নামে খ্যাতি লাভ করেছে। বর্তমানে নূরুর দোকানের পাশাপাশি আরো কয়েকটি রেস্টুরেন্টও এগিয়ে এসেছে মিষ্টিন্ন তৈরি এবং বিপণনে।"[৫]

উখিয়ার নূরুর দোকানের মিষ্টিগুলো স্পঞ্জ-এর মতো বিধায় তাকে লোকজন স্পঞ্জ মিষ্টি বলে থাকে।

## ১. মিস্ত্রি/ছুতার

কাঠ কেটে পালিশ করে যাঁরা বিভিন্ন আসবাবপত্রসহ নিত্য ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করেন তাঁরাই ছুতার। ছুতারদের যদিও সূত্রধরও বলা হয়। কিন্তু কক্সবাজার অঞ্চলে সূত্রধর বা ছুতারকে মিস্ত্রিই বলে। সূত্রধর বলতে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি গ্রুপকেই বুঝাতো কিন্তু বলতে গেলে কক্সবাজারের প্রায় শতভাগ সূত্রধর তথা ছুতার বা মিস্ত্রি মুসলমান। কক্সবাজারে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ছুতারের পেশায় নেই বললেই চলে। কৃষিকাজের যাবতীয় উপকরণ বিশেষ করে লাঙ্গল, জোয়াল, মই, ধান মাড়াইকল তথা 'ডলইন', ঢেঁকি ছুতারেরাই তৈরি করতো। কিন্তু বর্তমানে লাঙ্গল, জোয়াল, মই, ডলইন, ঢেঁকি তৈরির কাজ বলতে গেলে প্রায় বন্ধ। কলের লাঙ্গলের প্রভাবে প্রাচীনকালের কৃষিকাজের প্রধান যন্ত্র লাঙ্গল, জোয়াল, মই, ডলইন, ঢেকি তৈরির কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। লোকজন কলের লাঙ্গলের উপর নির্ভরশীল হয়ে বর্তমানে গরু

www.pathagar.com

পোষা পর্যন্ত বন্ধ করে দিচ্ছে। পূর্বে জেলার প্রতিটি বাড়িতে লাঙ্গল, জোয়াল, মই, ঢেঁকি, ধান মাড়াইয়ের জন্য 'ডলইন' দেখা যেতো। কিন্তু বর্তমানে তা প্রায় বন্ধ। বর্তমানে জেলার কোথাও প্রাচীনকালের (Traditional/Manual Paddy crasing mills) ধান মাড়াইকল তথা 'ডলইন' চোখে পড়ে না। ছুতার তথা কাঠমিস্ত্রিদের মধ্যেই 'ডলইন' বানানো বা ডলইন তৈরির একটি পৃথক গ্রুপ ছিল। 'ডলইন' তৈরির কাজটি একটু কঠিন বৈকি, ফলে ছুতারেরা এই পেশায় আসতো না। বর্তমানের পেশা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তাদের বর্তমান প্রজন্ম 'ডলইন' তৈরির প্রক্রিয়াই ভুলে গেছে। তবে ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য আমি (প্রধান সমম্বয়কারী) বিগত চার বছর পূর্বে একটি 'ডলইন' তৈরি করে রেখেছি। পূর্বে জেলার ক্ষুদ্র কৃষকসহ জমিদার বিত্তবানদের ঘরে ঘরে ধানভানার কল তথা ডলইন ও ঢেঁকি ছিল অপরিহার্য। জমিদার ও বিত্তবানদের ঘরে ধানভানার কল তথা ডলইন ও ঢেঁকির জন্য পৃথক ঘর থাকতো।
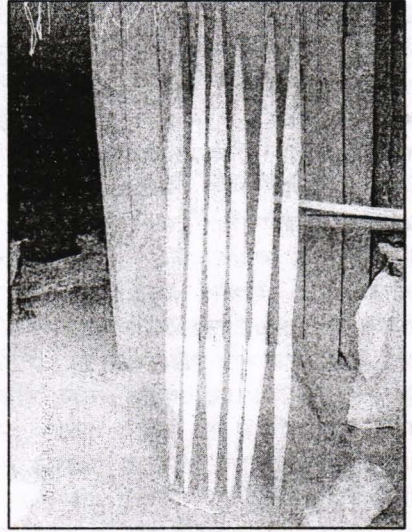
*মাঠ থেকে পাকাধান বহন করার জন্য স্থানীয়ভাবে কথিত ফুঁইচা তৈরি করা হচ্ছে*

বর্তমানে জেলা থেকে ধান মাড়াইকল 'ডলইন' যেমন বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনুরূপভাবে ঢেঁকিও বিলুপ্তির পথে। হয়তোবা কোনো কোনো গ্রামের কোনো বিত্তশালীর বাড়িতে ঢেঁকির দেখা মিলতে পারে। তবে বর্তমানে নতুন করে ঢেঁকি তৈরি করে না। এসব কারণেই ছুতারের আদি পেশা বন্ধ। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে আধুনিক আসবাবপত্র তৈরি করতে পারদর্শীরাই পূর্বপুরুষের পেশায় টিকে আছে। আগেকার দিনে জেলার প্রতিটি গ্রামে যেখানে ছুতারের বাড়ি পাওয়া যেতো বর্তমানে সেটা আর নেই। প্রায় গ্রামেই ছুতারের দেখা মিলে না। হয়তোবা ভিন্ন গ্রামের ছুতারকে ডেকে নিজেদের বাড়ির কাজ করাতে হয়। অনুরূপভাবে বাঁশের বা কাঠের বাড়ি তৈরিতে জড়িত ঘরামিদের অবস্থাও

www.pathagar.com

তাই। প্রতিবেশী কোনো গ্রাম থেকে ঘরামি তথা ওঝাকে ডেকে নিয়েই বসতবাড়ি নির্মাণ করতে হয়।

জেলার উপকূলীয় জনগণের পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম ছিল নৌকা। তাই জলযানের ব্যবহার কক্সবাজারের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের সাথে ওৎপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। জেলায় রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় নদ-নদীসহ বঙ্গোপসাগর। সে কারণেই জেলার উপকূলের মানুষের কাছে সবচেয়ে পরিচিত যানের মধ্যে জলযানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। প্রাচীনকালে জনগণের পরিবহনের জন্য গাড়ি ছিল না। তাই নৌকার ছিল পরিবহনের একচ্ছত্র আধিপত্য। আধুনিক যানবাহনের প্রচলনের আগে আমাদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল নৌকা। মালামাল ও যাত্রী পরিবহনের সহজ মাধ্যম ছিল বিভিন্ন রকমের নৌকা। তাই যুগে যুগে জেলার মানুষ ও অর্থনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিভিন্ন রকমের নানা নামের নৌকা। কক্সবাজারে নৌকা তৈরির গাছ সহজলভ্য ছিল বিধায় ছুতারেরাও নৌকা তৈরিতেও ছিল পারদর্শী। প্রাচীনকালে কক্সবাজারে বিভিন্ন ধরনের নৌকা তৈরি করা হতো। এসব নৌকার মধ্যে ছিল বাছারি, কোষা, গণ্ডি, লক্ষ্মী বিলাস, টালাই, বজরা, পানসি, ঘাসী, বালামী, জালিবোট, জেলে নৌকা, খেয়ানৌকা, দাড়টানা নৌকা, গদু নৌকা, ডিঙ্গি নৌকা, ফারিরবোট। দিন পরিবর্তনের সাথে সাথে হারিয়ে যাচ্ছে এসব নৌকা। বর্তমানে এসব নৌকার জায়গা দখল করে নিচ্ছে যন্ত্রচালিত নৌকা। নদী ও সাগরে যান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা ও ব্যবহার বেড়েছে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী নৌকা এখন আর চোখে পড়ে না। তবে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য নৌকার কমতি নেই। গভীর সমুদ্রে ও উপকূলের কাছাকাছি মাছ ধরার নৌকাগুলোতে ইঞ্জিন সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে এসব ইঞ্জিনচালিত নৌকা বঙ্গোপসাগরের প্রায় দুই থেকে আড়াই'শ কিলোমিটার দূরে গিয়েও মাছ ধরে। তবে সব নৌকা এতো দূরে যেতে পারে না। যেসব নৌকায় ৭০ থেকে ১২০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন সংযুক্ত করা হয় শুধুমাত্র সেসব নৌকাই দুইশো থেকে আড়াইশো কিলোমিটার গভীর সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরতে পারে। অন্যান্য নৌকাগুলো সাগরের উপকূলে মাছ ধরে। আবার কোনো নৌকা শুধু সাগরে বড়শি ফেলেই মাছ ধরে। এসব নৌকাকে বড়শি নৌকা বলা হয়। সাগরে মাছ ধরার সবধরনের নৌকাই মিস্ত্রিরা তৈরি করে। তবে যেসব মিস্ত্রি বা ছুতার আধুনিক আসবাবপত্র তৈরি করে তারা বর্তমানে নৌকা করে না। আর যারা নৌকা তৈরি করে তারাও আধুনিক আসবাবপত্রের কাজ করে না। সাগরে মাছ ধরার নৌকাগুলো বিশেষ বিশেষ বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন নদীর মোহনায় তৈরি করা হয়, যাতে করে সহজেই সাগরে নামিয়ে ফেলা যায়। তাছাড়াও এসব নৌকা অনেকটা বনবিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তৈরি করা হয়। একটি নৌকা তৈরি করতে শত শত ঘনফুট কাঠ প্রয়োজন। এসব কাঠের একমাত্র উৎস্য সরকারি বনাঞ্চল। সরকারি বনাঞ্চল থেকে চুরি করেই নৌকা তৈরি করা হয়। যাক সেসব কথা। নৌকা তৈরির উপকরণের মধ্যে কাঠ ছাড়া রয়েছে প্রয়োজন খন্তি পেরেকসহ (সাইজে মোটা ও বেশ লম্বা) বিভিন্ন আকারের ও সাইজের পেরেক, করাত, গদু দা, বাইশ, মাত্তুল বা হেমার, রেত, কুড়াল, বাডইল, বুরুং, গাঁনি সুতা (বিশেষ ধরনের সুতা) এবং সর্বশেষে প্রয়োজন মাটিয়া তৈল বা আলকাতরা। জেলার সমগ্র

www.pathagar.com

বনাঞ্চল নৌশিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী পার্বত্য বান্দরবান জেলার বনাঞ্চল থেকেও বৃক্ষ সংগ্রহ করা হয়। নৌকা তৈরির জন্য মূল্যবান ও শক্ত কাঠ বেশি প্রয়োজন যা তাড়াতাড়ি গাছে পচন না ধরে বা নষ্ট না হয়। জেলার প্রতিটি উপজেলায় নৌকা তৈরি করা হয়। কুতুবদিয়া উপজেলায় পাহাড় বা বনাঞ্চল না থাকলেও জেলার অন্যান্য এলাকা থেকে নৌকা তৈরির প্রয়োজনীয় বৃক্ষ সংগ্রহ করা হয়।

দুইশত বছর পূর্বেও যে এলাকায় নৌকা তৈরি করা হতো তার বিবরণ আমরা দেখতে পাই ফ্রান্সিস বুখানন-এর ভ্রমণকাহিনিতে। তিনি ১৭৯৮ সালের ২৮ মার্চ জেলার খুরুশকুল হয়ে মহেশখালি যাওয়ার পথে বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, "সকাল আটটা নাগাদ আমি ক্রুজকূল বা জোয়ারিয়া নদীর মুখে এসে উপনীত হলাম; সেখানে বিস্তৃত রাখাইন পল্লিনিবাস লক্ষ করলাম। লোকদের জীবননির্বাহ হয় কয়েকটি উপায়ে; মাছ ধরা, নৌকো তৈরি, মাদুর তৈরি, বাঁশ কাটা, মুটে মাঝির কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে। তাদের রমণীরা মোটা কাপড় তৈরি করে।"[৬]

(বি দ্র :-৬ নম্বর টিকায় বর্ণিত ক্রুজকূল হচ্ছে বর্তমানের খুরুশকূল ইউনিয়ন। যার অবস্থান কক্সবাজার শহরের উত্তরপার্শ্বে। ফ্রান্সিস বুকাননের উচ্চারণের কারণেই ক্রুজকূল হয়েছে)।

এসব কাঠকে প্রয়োজনমতে বিভিন্ন আকারের তক্তা ও তিন ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি সাইজের বিম তৈরি করে চিরাই করতে হয়। এরপরে প্রয়োজনমতো পেরেক কিনে নিতে হবে। চিরাই করা বিমগুলো নিয়ে নৌকার ফ্রেম তৈরি করে নিতে হবে। ফ্রেম তৈরি করার পরে ফ্রেমের বাইর থেকে তক্তাগুলো লাগাতে হবে। তক্তাগুলো একটার সাথে আরেকটি সংযুক্ত করে পেরেক দিয়ে ভালোভাবে আটকাতে হবে। এভাবে নৌকা তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়। পরে নৌকাটিকে উল্টিয়ে তক্তার জোড়ার ফাঁকে ফাঁকে গাঁনি সুতা আটকাতে হবে। সুতাগুলো এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে কোনো ধরনের ছিদ্র না থাকে। সাগর বা নদীতে নৌকা চলাচলের সময় যেনো ভেতরে পানি প্রবেশ করতে না পারে। গাঁনি সুতা আটকানোর পরেই নৌকার নিচে আলকাতরা লেপে দিতে হবে। আলকাতরা লেপে দেওয়ার পরেই ভালোভাবে রোদে শুকাতে হবে। রোদে শুকানোর পরে তক্তার জোড়ার মধ্যে যদি ফাঁক দেখা যায় তাহলে আবার গাঁনি সুতা দিয়ে ছিদ্র আটকাতে হবে। এভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ নৌকা তৈরি করা হয়। পরে নৌকাতে ইঞ্জিন সংযুক্ত করতে হয়। ইঞ্জিনগুলো নৌকার সাইজ অনুযায়ী হয়ে থাকে। বিশেষ করে ছোট থেকে বড় নৌকার জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচ অশ্বশক্তি থেকে একশো বা দেড়শো অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিন সংযুক্ত করা হয়। তবে ছোট ছোট ছিপ দ্বারা টানা নৌকাতে ইঞ্জিন সংযুক্ত করা হয় না।

প্রাকৃতিক কারণেই কক্সবাজারে দারু বা কারুশিল্প সমৃদ্ধি লাভ করেছে। জেলার অধিকাংশ এলাকায় বনজসম্পদ বিদ্যমান। পূর্বে যদিও কক্সবাজার বনজসম্পদে ভরপুর ছিল কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সেই বনজসম্পদে ভাটা পড়েছে। বিশেষ করে অপরিকল্পিতভাবে বনাঞ্চল থেকে অবাধে বৃক্ষনিধনের ফলে বনজ সম্পদের সংকট সৃষ্টি

www.pathagar.com

হচ্ছে। বর্তমানে জেলার বনজসম্পদে ভাটা পড়ায় প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে কাঠ আমদানি করতে হচ্ছে। কাঠ প্রাপ্তির সুবাদে জেলার যে-কোনো জায়গায় ব্যক্তিগতভাবে গড়ে উঠেছে ফার্নিচারস মার্ট। এসব ফার্নিসার মার্টে আসবাবপত্র তৈরি করা হচ্ছে সেই প্রাচীন আমলের ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে। বৈধ ও অবৈধ এসব ফার্নিচারস মার্টে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে কাঠের ফুলের টব, টেবিল, চেয়ার, আলনা, খাট, হাইবেঞ্চ, লুবেঞ্চ, টুল, সোফা, আলমিরা, সিন্দুক, ড্রেসিং টেবিল থেকে শুরু করে হরেক রকমের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং গৃহনির্মাণ ও গৃহ সাজানোর মনোরম সব সামগ্রী। কাঠশিল্প সহজলভ্য বিধায় এখানকার আসবাবপত্র তৈরির কারখানাগুলো অবিরাম আসবাবপত্র তৈরি করে যাচ্ছে। এর ফলে এখানকার মানুষের ঘরে ঘরে নানা রকমের আসবাবপত্র দেখা যায়। এছাড়া এ জেলায় কর্মরত সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি রয়েছেন তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী ফার্নিচার মার্ট থেকে ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছেন। কিছুদিন আগেও বাড়িতে কাঠের রকমারি নকশা করা ঝালর ব্যবহার করা হতো। বিশেষ করে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাঠের উপর নকশা কেটে এসব ঝালর তৈরি করা হতো। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এসব ঝালর তৈরি এবং বাড়িতে এসব ঝালর লাগানো বন্ধ হয়ে গেছে। তবে কোনো কোনা ধনশালী জমিদার এবং অর্থশালী মানুষ দালান নির্মাণ করে তাতেও কাঠের রকমারি নকশা ব্যবহার করে ঘরকে আরো আকর্ষণীয় ও খানদানি করার প্রয়াস চালায়। যাই হোক, এই শিল্প জেলার সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। এই শিল্পের সাথে কয়েক হাজার শ্রমিক জড়িত।

এই শিল্পের জন্য প্রয়োজন কাঁচামাল হিসেবে চাহিদামত কাঠ এবং প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, পেরেক, প্রয়োজনীয় রং, মসৃণ করার জন্য সিরিজ ক্বাগজ, পাতলা নেকড়ে জাতীয় কাপড়। কাঠ সংগ্রহ করার পরেই প্রয়োজন অনুসারে স'মিলে কাঠ সাইজ করে চিরাই করে নিতে হয়। পরে আসবাবপত্র অনুসারে হাতকরাত দিয়ে কাঠ কেটে নিতে সাইজ করতে হয়। এরপরে রন্দা দিয়ে কাঠগুলো মসৃণ করে নিতে হয়। মসৃণ করার পরে কাঠের প্রান্তে গাতা করতে হবে। এর পরেই কাঠগুলো পরস্পর গেঁথে নির্দিষ্ট আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। আসবাবপত্র তৈরির পরেই রং করা হয়। রং করার আগে কাঠে সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষে ঘষে কাঠগুলো আরো মসৃণ ও চকচকে করে তোলা হয় যাতে সহজেই ক্রেতা বা গ্রাহকের পছন্দ হয়। কক্সবাজারের রামু চৌমুহনী, কক্সবাজার সদর উপজেলার ঈদগাঁও এলাকায় গড়ে উঠা বিভিন্ন আসবাবপত্রের দোকান থেকে রাজধানী ঢাকা, বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে চালান হয়।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে কাঠের মূল্য বৃদ্ধির ফলে মানুষের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও মানুষ কাঠের তৈরি আসবাবপত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। মানুষের চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে মেলামাইন কোম্পানি এসব সামগ্রী বাজারে ছাড়ছে। ফলে মানুষ স্বল্পমূল্যে এসব প্লাস্টিকের আসবাবপত্র ও বাড়িতে ব্যবহারের সামগ্রী কিনে নিচ্ছে। প্লাস্টিকের এসব আসবাবপত্রের মধ্যে বসার চেয়ার, টেবিল, টুল, পিঁড়ি, র‍্যাক, ওয়ারড্রব, দরজা প্রভৃতি। প্লাস্টিকের এসব আসবাবপত্র সহজলভ্য হওয়ায় ছুতারদের কর্মক্ষেত্র ছোট হয়ে আসছে।"[৭]

www.pathagar.com

দিন যতই যাচ্ছে গ্রাম হচ্ছে নগরায়ন। এর ফলে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গ্রামেই তৈরি হচ্ছে ইট-সুরকির দালান, দোতলা, তেতলা, চারতলা, পাঁচতলা বা আরো বেশি তলা বিশিষ্ট দালান-কোঠা। ফলে গ্রামের ছুতারেরা তাদের পেশা বদল করতে বাধ্য হচ্ছে। বয়সে নবীন ছুতারেরা কাঠের আসবাবপত্র তৈরির বদলে, কাঠের বা খড়ের ঘরের পরিবর্তে ইট-সুরকির দালান তৈরির সাথে নিজেকে যুক্ত করছে।

## ২. কলু

কলু বা তেলি বা তৈলকারের হাতে ঘানিগাছে তৈরি সরিষার তেল কুটিরশিল্পের একটি অন্যতম খাত। যারা সরিষা বা অন্য কোনো বিচি ঘানিতে পিষে তেল বের করে তাদেরকে স্থানীয়ভাবে 'তেলি' বলা হয়। তবে কোনো কোনো এলাকায় যারা গরু-ছাগলসহ পশুর চামড়া খসানোর কাজ করে তাদেরকেও তেলি বলে। আবার কোনো কোনো এলাকায় একই সম্প্রদায়ের লোক এই দুটোই কাজ অর্থাৎ ঘানি থেকে তেল বের করে, আর চামড়া খসানোর কাজ করে থাকে তাদেরকে তেলি বলা হয়। তবে তেল নিয়ে ব্যবসা, বিচি থেকে তেল করে বলেই তাদেরকে তেলি বলা হয়। কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় গরু দিয়েই ঘানি টানানো হতো। টাকার অভাবে গরু কিনতে না পারলে বা গরু অসুস্থ হয়ে গেলে মানুষ ঘানি টানতো। চোখ বাঁধা অবস্থায় গরু দীর্ঘসময় ঘানি টানতে পারে। বিশেষ করে গরু এক জায়গাতে দীর্ঘসময় ধরে হাঁটতে থাকে বা ঘুরতে থাকে বিধায় গরুর চোখ বেঁধে দেয়া হয়। যাতে গরু বুঝতে না পারে যে, সে এক জায়গাতেই হাটছে। একটানা খাটুনির ফলেই ঘানি টানার গরুকে 'কলুর বলদ' বলা হয়।

ঘানি থেকে তেল বের করার অন্যতম উপকরণ সরিষা। সরিষা ভেঙে পিষে তা থেকে তেল বের করা হয় তার পরিমাণ খুবই কম। সরিষা পিঁষে যেসব তেল বের করা হয় তা তেলি বা কলুরা হাট-বাজারে বা মহাজনের দোকানে বা গ্রামে সাধারণ ভোক্তার কাছে বিক্রি করতো। তবে বর্তমানে জেলার কোথাও ঘানিতে তেল বের করা করা হয় না। ঘানির যেমন অভাব রয়েছে তেমনিভাবে তার অন্যতম কাঁচামাল সরিষা, তিল বা অন্যকোনো বিচি সহজলভ্য নয়। পূর্বে জেলার বিভিন্ন গ্রামে ব্যাপকভাবে সরিষার চাষ হতো। কিন্তু বর্তমানে সরিষা বা অন্যকোনো তৈল জাতীয় বিচির চাষ বলতে গেলে বন্ধ। সরিষা বা অন্যকোনো তৈল জাতীয় বিচির চাষ হয় শুষ্ক মওসুমে। পূর্বে আমন ধান ঘরে উঠে যাওয়ার পরে জমি পতিত থাকতো। শুষ্ক মওসুমে বলতে গেলে শীতকালীন শাকসবজিসহ তৈলজাতীয় শষ্যের চাষ হতো। কিন্তু বর্তমানে মানুষের খাদ্যচাহিদা পূরনের জন্য জমি থেকে আমন ধান উঠার সাথে সাথে জমিতে সেচের পানি তোলা হয়। এতে করে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শীতকালীন শাকসবজিসহ তৈল জাতীয় শষ্য চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সমগ্র জেলায় বর্তমানে ঘানিতে তেল পিষার কাজ বন্ধ।"[৮]

ঐতিহ্য-নির্ভর এই পেশাজীবী মানুষগুলো শুরু থেকেই সামাজিক বৈষম্যে বেড়ে উঠেছে। ফলে তাদের সামাজিকভাবে মর্যাদা আগে থেকেই ছিল না পেশাগত কারণে,

www.pathagar.com

আর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ছিল না ছোট-খাট শিল্পের আওতায় শ্রম দেয়ার ফলে। এই পেশার মানুষেরা শুধু সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে পশ্চাৎপদ নন, এখনও পশ্চাৎপদ রয়েছেন তাঁদের পেশার ও গোত্রের নামের কারণে। সমাজে কলু বা তেলি সম্প্রদায়ের সাথে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের লোকজন বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপন করে না। যার ফলে তাদেরকে জেলার বা জেলার বাইরের অন্য কোনো কলু বা তেলি সম্প্রদায় খোঁজে তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হতো। বর্তমনে তাদের পেশা বলতে গেলে বন্ধ। ফলে তাদের সামাজিক বৈষম্য কেটে যাচ্ছে। তেলি সম্প্রদায়ের লোকজন অন্যত্র গিয়ে বসতি গড়ে তুলছে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করছে।

## ৩. তাঁতি

যাঁরা শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, গামছা, দৈরমান (কোমরবন্ধ বা জারি), ব্যাগসহ অন্যান্য ব্যবহার্য কাপড়-চোপড় হস্তচালিত যন্ত্রে তৈরি করেন তাঁদেরকে তাঁতি বলা হয়। মানুষ একসময় বনে-জঙ্গলে বাস করতো। গাছ-গাছালির লতা-পাতা, পশুর চামড়া, পাখির পালক দিয়ে তারা লজ্জা নিবারণ করতো। কালক্রমে সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ কাপড় পরতে শিখেছে। পোশাক মানুষকে সভ্য করে তুলেছে। তবে এখনো আমাদের দেশে এমন কিছু মানুষ আছে যারা কাপড় পরে না। তারা হচ্ছে দেশের একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী 'মুরং'। মুরং সম্প্রদায়ের অনেকেই কাপড় পরে, পড়ালেখা করে সভ্য সমাজের সাথে যুক্ত হয়েছে। পোশাকের এই সভ্যতা সৃষ্টিতে তাঁতিদের ভূমিকা অনন্য। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের তাঁত রয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এসব তাঁতের মধ্যে জামদানি তাঁত, রেশমি তাঁত, মণিপুরী তাঁত, রেশম তাঁত প্রভৃতি।

তাঁতশিল্প কক্সবাজার জেলার একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। প্রাচীনকালে এই শিল্পের সাথে জেলার বিভিন্ন জনপদের হাজার হাজার মানুষ জড়িত ছিল। মূলত এই শিল্পই ছিল তাদের জীবিকার একমাত্র উপায়। কিন্তু দিনের পরিবর্তনে হস্তশিল্পে এখন দুর্দিন।

বলতে গেলে বর্তমানে এই শিল্প প্রায় বন্ধ। জেলার কক্সবাজার সদর, রামু, মহেশখালি ও চকরিয়া উপজেলায় সীমিত পরিসরে রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শিল্প জিইয়ে রয়েছে। প্রাচীনকালে জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলায় হস্তশিল্প ছিল। হস্তশিল্পে তৈরিপোশাক পরিধান করা হতো।

বিশেষ করে গায়ের চাদর, লুঙ্গি, মেয়েদের থামি, গামছা বা মাথার কাপড়, শরীর মোছার গামছা, নারী-পুরুষের কোমরবন্ধসহ রকমারি কাপড় স্থানীয় তাঁতশিল্পে তৈরি করা হতো। আর এই তাঁতশিল্পের সাথে হিন্দু, মুসলমান ও রাখাইনরা জড়িত ছিল। তবে তাঁতশিল্পে রাখাইনদের সংখ্যাই বেশি ছিল। তাঁতশিল্পের কারণেই রাখাইনদের বাড়ির নির্মাণশৈলী অন্য সম্প্রদায়ের বসতবাড়ি থেকে পৃথক। রাখাইন সম্প্রদায়ের দু'তলা বাঁশ-কাঠের বসতবাড়ির নিচে খোলা থাকে। যাকে স্থানীয়ভাবে 'মাচাং ঘর' বলা হয়।

www.pathagar.com
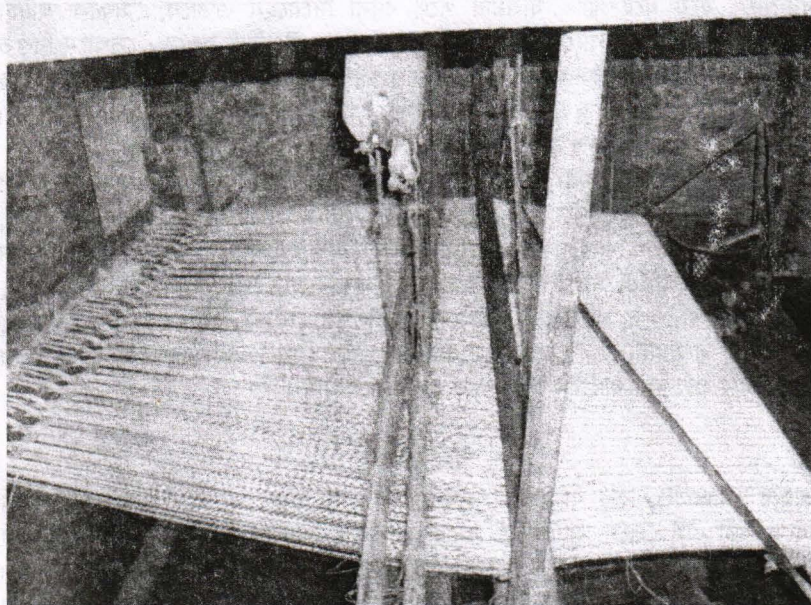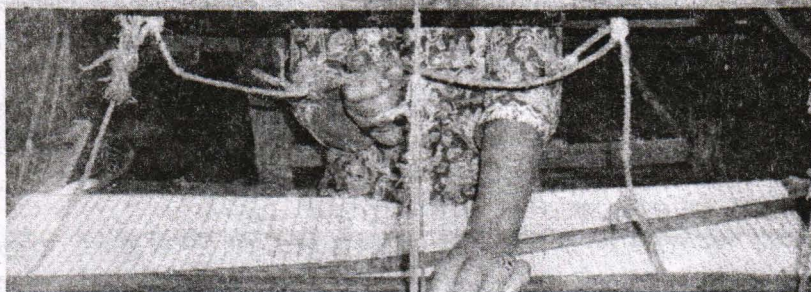
মহেশখালিতে রাখাইন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহি তাঁত শিল্প এখনও টিকে আছে


www.pathagar.com

বর্তমানেও তাদের মাচাং ঘর নির্মিত হতে দেখা যায়। তবে তার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাঁতশিল্প স্থাপনের লক্ষ্যেই দোতলা তথা মাচাং ঘরের নিচে খোলা রাখা হয়। জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ রাখাইনদের জীবিকা এই শিল্পের উপরই নির্ভরশীল ছিল। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাখাইনদের তৈরি কাপড়-চোপড় পার্শ্ববর্তী বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িসহ রাজধানী ঢাকায় বাজারজাত করা হতো। তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে এই শিল্পে ধস নেমেছে। বর্তমানে জেলার সদর উপজেলার খুরুস্কুল, চৌফলদণ্ডি, কক্সবাজার শহর, রামু উপজেলার পানেরছরা, মহেশখালি উপজেলা সদরের পৌর এলাকার রাখাইনপাড়া, চকরিয়া উপজেলার হারবাং এলাকায় রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত আকারে এই শিল্প টিকে আছে। তবে আগের মতো ব্যাপকভাবে কাপড় তৈরি হয় না। বর্তমানে বলতে গেলে কিছু আধুনিক লুঙ্গি, শীতবস্ত্র, থলে ইত্যাদি বুনন করে। বন্ধ হয়ে গেছে সেই চাঁদের বুড়ির 'চরকা'। চরকা দিয়ে তুলা থেকে সুতা তৈরি করে কাপড় বুনন পদ্ধতি বর্তমানে একদম বন্ধ। তবে বাজার থেকে সুতা কিনেই এই শিল্পের সাথে টিকে আছে। কক্সবাজার শহরের বার্মিজ মার্কেটে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কোনো কোনো পণ্য বিক্রি হয়। তবে বার্মিজ পণ্য হিসেবে বিক্রিত বেশির ভাগ বস্ত্রসামগ্রী প্রতিবেশী বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, চীন দেশের পণ্য।"[৯]

দুইশত বছর পূর্বেও যে এলাকায় নৌকা তৈরি করা হতো তার বিবরণ আমরা দেখতে পাই ফ্রান্সিস বুখানন-এর ভ্রমণকাহিনিতে। তিনি ১৭৯৮ সালের ২৮ মার্চ জেলার খুরুশকুল হয়ে মহেশখালি যাওয়ার পথে বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, "সকাল আটটা নাগাদ আমি ক্রুজকূল বা জোয়ারিয়া নদীর মুখে এসে উপনীত হলাম ; সেখানে বিস্তৃত রাখাইন পল্লিনিবাস লক্ষ করলাম। লোকদের জীবননির্বাহ হয় কয়েকটি উপায়ে ; মাছ ধরা, নৌকো তৈরি, মাদুর তৈরি, বাঁশ কাটা, মুটে মাঝির কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে। তাদের রমণীরা মোটা কাপড় তৈরি করে।"[১০]

তাঁত শিল্পের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সুতা, রং, তাঁতশিল্পের যন্ত্রপাতি। সুতা সংগ্রহের পরেই প্রয়োজনীয় রং দিয়ে তা শুকানো হয়। রোদে শুকানোর পরেই নির্দিষ্ট লুঙ্গি, স্কার্ফ, থলি বা ব্যাগ, গায়ের চাদর তৈরি করা হয়। কক্সবাজারের মহেশখালির রাখাইন পাড়ার কথিত বার্মিজ ব্যাগ, গায়ের চাদর, লুঙ্গি কক্সবাজার থেকে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বরিশাল, পটুয়াখালি, বরগুনা, জামালপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রামে সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রাখাইনপল্লি থেকে ব্যাগ নিয়ে যায়।

## ৪. জেলে

কাহার (মাআরা), কলু বা তেলি সম্প্রদায়ের ন্যায় শুরু থেকেই সামাজিক বৈষম্যে বেড়ে ওঠা এই জেলে বা কৈবর্ত সমাজ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জীবনপদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বেড়ে উঠছে। জেলেসমাজের সবাই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয়। তাই সামর্থ অনুযায়ী তারা তাদের নৌকা ও জাল সংগ্রহ বা তৈরি করে মাছ ধরার মাধ্যমে জীবিকার জন্য যুদ্ধ করছে। তাদের অনেকেই দ্রুতগামী ও বেশি অশ্বশক্তি

www.pathagar.com

সম্পন্ন ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরছে, আবার কেউ সাগরের উপকূলে ছোট ও স্বল্প শক্তিসম্পন্ন নৌকা নিয়ে মাছ, আবার কেউ দাড়টানা বা পাল তোলা নৌকা নিয়ে বঙ্গোপসাগর ও নদীর মোহনায় বা নদীতে মাছ ধরছে। আবার কেউ কেউ সমুদ্রের উপকূলে টানাজাল, চাকজাল, বারাজাল দিয়ে মাছ ধরছে। কেউ কেউ বড়শি দিয়ে মাছ ধরছে।

প্রাচীনকালে জেলেরা সমুদ্রের, মাছের তিথি, মওসুম মেনে মাছ শিকার করতো। বিশেষ করে ডিম ছাড়ার সময় জেলেরা সঙ্গবদ্ধভাবে মাছ ধরা বন্ধ রাখতো। বছরের কোন কোন সময়, কোন কোন তিথিতে মাছ ডিম ছাড়ে তা জেলেদের নখদর্পণে ছিল। ফলে সে-সময় সাগরে মাছের আকাল ছিল না। জালে অতিরিক্ত মাছ ধরা পড়লে জেলেরা তা শুকিয়ে রাখতো। এসব শুকানো মাছ বর্ষা মওসুমে বা যে মওসুমে মাছ শিকার বন্ধ সে সময় বাজারে বিক্রি করতো। আবার জেলে অতিরিক্ত ইলিশ মাছ ধরা পড়লে তাতে লবণ দিয়ে রাখতো। বর্ষা মওসুমে এসব নোনতা ইলিশ মাছ বাজারে বিক্রি করতো। জেলেরা নির্দিষ্ট রুটিন মেনে সাগর ও নদী থেকে মাছ শিকার ও তা বিপণন করতো। এতে করে ভোক্তাসাধারণের কোনো সমস্যা হতো না। জেলেরা নিজেরাই নিজেদের জাল তৈরি করতো, তাও সুতা দিয়ে। এসব জাল তথা সুতা যাতে দ্রুত নষ্ট বা পচে না যায় সে জন্য এক প্রকারের রঙ দেয়া হতো। গাব গাছের কষ গাঢ় কালো ধারণ করে। তাই জেলেরা জালে গাব গাছের কষ দিয়ে জালকে কালো রং-এর করে। জেলোর জাল তৈরি করে গাব গাছের কষে চুবিয়ে রাখলে তা খুব অল্প সময়ে কালো রঙ ধারণ করে। এতে জালে দ্রুত পচন ধরে না।

কিন্তু বর্তমানে সুতা দিয়ে জাল তৈরি করা হয় না। বর্তমানে নাইলনের সুতা দিয়ে জাল তৈরি করা হয়। এতে গাব গাছের বা অন্যকোনো রঙ দিতে হয় না। এছাড়াও বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় কারেন্ট জাল। এসব জালের কাছে গেলেই মাছ জালে আটকা পড়ে। কারেন্ট জাল সর্বপ্রথম থাইল্যান্ডে তৈরি হতো। চোরাইপথে এসব কারেন্ট জাল বাংলাদেশে আসে। কারেন্ট জালের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে বাংলাদেশে সরকার তা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু চোরাইপথে ঠিকই তা বাংলাদেশে আসছে এবং সম্ভ্রান্ত ও বনেদি জেলেরা তা ব্যবহার করছে। এছাড়াও বাংলাদেশেও রাজধানী ঢাকার আশেপাশের এলাকায় এসব নিষিদ্ধ জাল তৈরি হচ্ছে।

প্রাচীনকালে কক্সবাজারে হিন্দু সম্প্রদায়ের কৈবর্ত ও রাখাইন সম্প্রদায়ের কিছু লোক মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। দুইশত বছর পূর্বেও যে এলাকায় নৌকা তৈরি করা হতো, সাগর থেকে মাছ ধরা হতো তার বিবরণ আমরা দেখতে পাই ফ্রান্সিস বুখানন-এর ভ্রমণকাহিনিতে। তিনি ১৭৯৮ সালের ২৮ মার্চ জেলার খুরুশকুল হয়ে মহেশখালি যাওয়ার পথে বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, "সকাল আটটা নাগাদ আমি ক্রুজকূল বা জোয়ারিয়া নদীর মুখে এসে উপনীত হলাম ; সেখানে বিস্তৃত রাখাইন পল্লীনিবাস লক্ষ করলাম। লোকদের জীবননির্বাহ হয় কয়েকটি উপায়ে ; মাছ ধরা, নৌকো তৈরি, মাদুর তৈরি, বাঁশ কাটা, মুটে মাঝির কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে। তাদের রমণীরা মোটা কাপড় তৈরি করে। এরা ধান চাষ করে না, এবং কোনো করও দেয় না ; কিন্তু তারা অভিযোগ করে এই বলে যে, জমিদারেরা বিনামজুরিতে তাদের খাটাতে চায়। তবে যেহেতু ট্যাক্স নেই, সেজন্যে বার্মা সরকারের অধীন জীবনযাপনের তুলনায়

www.pathagar.com

তারা এখানে নিরপাদে আছে। গ্রামের উল্টোদিকে সমগ্র তটভূমিতে মাছ ধরার জন্যে খুঁটি পুঁতে পুঁতে খাঁচা তৈরি করা আছে।"[১১]

কক্সবাজার সমুদ্র-উপকূলীয় জেলা। জেলার প্রতিটি উপজেলায় কিছু না কিছু সমুদ্র সংযোগ রয়েছে। মহেশখালি ও কুতুবদিয়া দুটি পৃথক দ্বীপ হওয়ার কারণে এখানে মৎস্যজীবীর সংখ্যা বেশি। মৎস্যজীবীদের মৎস্য শিকারের অন্যতম হাতিয়ার জাল। যা দিয়ে সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ করা হয়। মাছ ধরার জালের মধ্যে রয়েছে হরেক রকমের, প্রকারের এবং আকারের জাল। এসব জালের মধ্যে রয়েছে ঝাকি জাল, ফাইস্যা জাল, ইলিশ জাল, বাডা জাল, টানা জাল, চাক জালসহ রকমারি জাল। কথিত জালগুলো পৃথক পৃথক মৎস্য শিকারে ব্যবহার করা হয়। জাল ছাড়াও সাগরে বড়শি দিয়েও মাছ ধরা যায়। এটি সমুদ্র উপকূলীয় জেলা হিসেবে এখানে জালের প্রভাব ব্যাপক। সমুদ্র থেকে মাছ শিকারের প্রয়োজনেই জাল বুননশিল্প একটি অস্বীকৃত শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। জেলার উপকূলীয় এলাকায় যেখানেই সাগর থেকে মৎস্য শিকারের নৌকা রয়েছে সেখানেই মাছ শিকারের জালের প্রয়োজনেই জাল বুনন করা হয়। তবে জালের প্রধান কাঁচামাল সুতা। পূর্বে সুতা দিয়েই জাল তৈরি করা হতো। সুতার জাল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই মৎস্যজীবীরা ক্ষণস্থায়ী জালের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী জালের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। নাইলনের জাল দীর্ঘস্থায়ী। নাইলনের জাল দীর্ঘস্থায়ী বলেই মৎস্যজীবীরা সুতার জাল ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। এই নাইলনের জালের প্রধান কাঁচামাল নাইলন সুতা বিদেশনির্ভরশীল। জাল বুননের কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও জড়িত। তবে নারীরা স্বল্প পরিসরের ঝাকি জাল ও বাডা জাল তৈরিতে জড়িত। গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারের জন্য মূলত ব্যবহৃত হয় ইলিশ জাল, টানা জাল, চাক জাল, বিহন্দি জাল, লাউক্যা জাল, ফাইস্যা জালের পরিমাণ বেশি বিধায় এসব জাল পুরুষেরাই তৈরি করে। স্থানীয়ভাবে জাল বুনন চাহিদা মিটাতে পারে না বিধায় জেলার বাইর থেকে জাল কিনে আনতে হয়। স্থানীয়ভাবে কাঁচা মালের চাহিদা পূরণ করা গেলে এখানেই শিল্পটি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

প্রাচীনকালের ধারাবাহিকতায় কৈবর্ত ও রাখাইন সম্প্রদায়ের কিছু লোক মৎস্য শিকারকে জীবিকানির্বাহের অন্যতম পেশা হিসেবে গ্রহণ করার কথা। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে এসব কৈবর্ত ও রাখাইন সম্প্রদায়ের সিংহভাগ মানুষ আর সেই বাপ-দাদার পেশায় জড়িত নেই। বলা যেতে পারে প্রতিযোগিতায় তারা টিকে থাকতে পারছে না। বর্তমানে জেলার সিংহভাগ মৎস্যশিকারি ও মৎস্যব্যবসায়ীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। বড়ো বড়ো দ্রুতগতি সম্পন্ন ইঞ্জিনচালিত নৌকা তথা স্থানীয়ভাবে কথিত 'ট্রলার' নিয়ে মুসমলমান জেলেরা সাগর থেকে মাছ শিকার করছে। জেলেদের মতো এসব মুসলমান জেলে তথা মৎস্যশিকারি বা মৎস্য ব্যবসায়ী কোনো মওসুমে সাগর তথা নদ-নদী থেকে মাছ ধরা বন্ধ রাখে না। নদ-নদী, গভীর সমুদ্র, সাগরের উপকূলে নির্বিচারে মাছ শিকারের ফলে সাগরে মাছের সংকট সৃষ্টি হয়। ডিম দেয়ার সময়ও সাগরের এসব মৎস্যজীবী মাছ শিকারে পিছপা হয় না। সেকারণেই সরকার বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ধরার বন্ধ রাখার জন্য আইন প্রণয়ন করেছে। প্রশাসন থেকে শুরু করে আইন-শৃংখলারক্ষাকারী বাহিনী সরকারের আইন কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে হয়। নিষিদ্ধ সময়ে আইন-শৃংখলারক্ষাকারী বাহিনীকে বিভিন্ন মৎস্য আড়তে, মৎস্য অবতরণকেন্দ্রে, নৌকায় করে দায়িত্ব পালন করতে হয়। অসৎ, অদূরদর্শী মৎস্যজীবীদের লোভের কারণেই আইন-শৃংখলারক্ষাকারী বাহিনীকে এভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

এদিকে জেলার বঙ্গোপসাগর ছাড়া জেলে মাছ ধরার আর কোনো উন্মুক্ত জলাশয় নেই। উপকূলের প্রতিটি জলাভূমি, খাল-নদ-নদী, মৎস্যপ্রজননক্ষেত্র জোতদার, জমিদার, প্রভাবশালীদের দখলে। সরকারের কাছ এসব লোকজন জলাভূমি, খাল-নদী ইজারার নামে দখলে রেখেছে। কেউ বা মৎস্য চাষের জন্য সরকারের কাছ থেকে দীর্ঘ মেয়াদি ইজারা নিয়েছে। এসব ইজারাদরের নিজেরা মৎস্যচাষ করে না। তারা উপভাড়া দিয়ে সুবিধা ভোগ করছে। আদিকাল থেকে জেলের হাতে জাল থাকলেও বর্তমানে জলাভূমি, খাল-নদ-নদীতে তাদের কোনো অধিকার নেই। ফলে জেলেদের মৎস্য শিকারের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে গেছে। এসব জলাভূমি ও খাল-নদ-নদীর দখল নিয়ে, মাছ ধরা নিয়ে অনেক প্রাণহানি হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সুরাহা হয়নি। যার ফলে যে ক্ষুদ্র সংখ্যক কৈবর্ত সম্প্রদায় বেঁচে আছে তারা তাদের অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে। রাখাইন সম্প্রদায়ের মৎস্যশিকারিরা আগেই মৎস্যশিকার থেকে সরে পড়েছে।

জেলেদের যদি মৎস্য চাষের জন্য উৎসাহিত করা হয়, মৎস্য চাষ উপযোগী জায়গা প্রদান করা হয়, জলাভূমি, খাল-নদ-নদী উন্মুক্ত রাখা হয়, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয় তা হলে জেলেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশায় টিকে থাকতে পারবে। সম্ভব তাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

## ৫. কামার

পৃথিবীতে লোহাকে পিটিয়ে বর্ম তৈরি করার দৃষ্টান্ত অনেক পুরোনো। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা সাবা'র ১০ ও ১১ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেছেন এভাবে, "আর আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছি (এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছি) যে, পূর্ণমাপের বর্ম তৈরি করো এবং বুনন করার ক্ষেত্রে যথাযথ পরিমাণ রক্ষা করো।" একই সাথে পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা আল-আম্বিয়া'র ৮০ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেছেন এভাবে, "আর আমি তাকে তোমাদের উপকারার্থে বর্ম নির্মাণ শিল্প শিখিয়েছিলাম, যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত থেকে রক্ষা করে, তাহলে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে ?"

এ প্রসঙ্গে তাফসীরকার ও মুফাস্‌ছিরগণ বর্ণনা করেছেন এভাবে, "এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ হযরত দাউদকে লোহা ব্যবহার করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। বিশেষ করে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বর্ম নির্মাণের কায়দা-কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ আয়াতের অর্থের ওপর যে আলোকপাত হয় তা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে লৌহ যুগ (Iron age) শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব ১২০০ ও ১০০০ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে। আর এটিই ছিল হযরত দাউদ আ.-এর যুগ। প্রথম দিকে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের হিত্তী (Hittites) জাতি লোহা ব্যবহার করে। ২০০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এ জাতির উত্থান দেখা যায়।

www.pathagar.com

তারা লোহা গলাবার ও নির্মাণের একটা জটিল পদ্ধতি জানতো। সারা দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে তারা একে কঠোরভাবে গোপন রাখে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে যে লোহা তৈরি হতো তা সোনা রুপার মতো এত বেশি মূল্যবান হতো যে, তা সাধারণ কাজে ব্যবহার করা যেত না। পরে ফিলিস্তিনিরা এ পদ্ধতি জেনে নেয় এবং তারাও একে গোপন রাখে। তালূতের রাজত্বের পূর্বে হিত্তী ও ফিলিস্তিনিরা বনি ইসরাঈলকে যেভাবে উপর্যুপরি পরাজিত করে ফিলিস্তিন থেকে প্রায় বেদখল করে দিয়েছিল বাইবেলের বর্ণনা মতে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, তারা লোহার রথ ব্যবহার করতো এবং তাদের কাছে লোহার তৈরি অন্যান্য অস্ত্রও থাকতো। (যিহোশূয় ১৭ ঃ ১৬, বিচারকর্তৃগণ ১ ঃ ১৯, ৪ ঃ ২-৩) খৃষ্টপূর্ব ১০২০ অব্দে তালূত যখন আল্লাহ্‌র হুকুমে বনী ইসরাঈলদের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি তাদেরকে পরপর কয়েকবার পরাজিত করে ফিলিস্তিনের বেশীর ভাগ অংশ তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন। তারপর হযরত দাউদ আ. (১০০৪-৯৬৫ খৃঃ পূঃ) শুধুমাত্র ফিলিস্তিন ও ট্রান্স জর্দানই নয় বরং সিরিয়ারও বড় অংশে ইসরাঈলী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সময় লৌহনির্মাণশিল্পের যে গোপন কলাকৌশল হিত্তী ও ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তা উন্মোচিত হয়ে যায় এবং কেবল উন্মোচিত হয়েই থেমে যায়নি বরং লৌহ নির্মাণের এমন পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয় যার ফলে সাধারণ ব্যবহারের জন্য লোহার কমদামের জিনিসপত্রও তৈরি হতে থাকে। ফিলিস্তিনের দক্ষিণে আদূম এলাকা আকরিক লোহায় (Iron ore) সমৃদ্ধ ছিল। সম্প্রতি এ এলাকায় যে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালানো হয় তার ফলে এমন অনেক জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ পাওয়া গেছে যেখানে লোহা গলাবার চুল্লী বসানো ছিল। আকাবা ও আইলার সাথে সংযুক্ত হযরত সুলায়মান আ.-এর জামানার বন্দর ইসয়ুন জাবেরের প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে যে চুল্লী পাওয়া গেছে তা পর্যবেক্ষণের পরে অনুমান করা হয়েছে যে, তার মধ্যে এমন সব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো যা আজকের অত্যাধুনিক যুগের Blast Furnace এ প্রয়োগ করা হয়। এখন স্বাভাবিকভাবেই হযরত দাউদ আ. সবার আগে ও সবচেয়ে বেশি করে এ নতুন আবিষ্কারকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকবেন। কারণ কিছুকাল আগেই আশপাশের শত্রু জাতিরা এ লোহার অস্ত্র ব্যবহার করে তাঁর জাতির জীবনধারণ কঠিন করে দিয়েছিল।"[১২]

কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নে কামার সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। তাও আবার বাজারের ধারে-কাছেই তাদের বসবাস চোখে পড়তো। কক্সবাজারের কোনো উপজেলায় কামার পাড়া নেই বললেই চলে। যেসব কামার তথা কর্মকার কক্সবাজারে আছেন তারা বৃহত্তর চট্টগ্রামের অন্য এলাকা থেকে জীবিকার কারণেই কক্সবাজারে এসে স্থায়ী আবাস গেড়েছে। বর্তমানে কক্সবাজার শহরের বড়বাজারসহ বিভিন্ন উপজেলার বাজারের ধারে-কাছেই কিছু কিছু কুমার সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে, তবে পূর্বের মতো নয়। প্রাচীনকালেই শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের কর্মকার গ্রুপই লোহার সামগ্রী তৈরিতে জড়িত ছিলেন। কিন্তু দিনবদলের ফলে মানুষের পেশার মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্য গোত্রের লোকজনও এই পেশায় আসছেন। শুধু কি তাই, মুসলমানেরাও এই পেশায় আসছেন।

www.pathagar.com
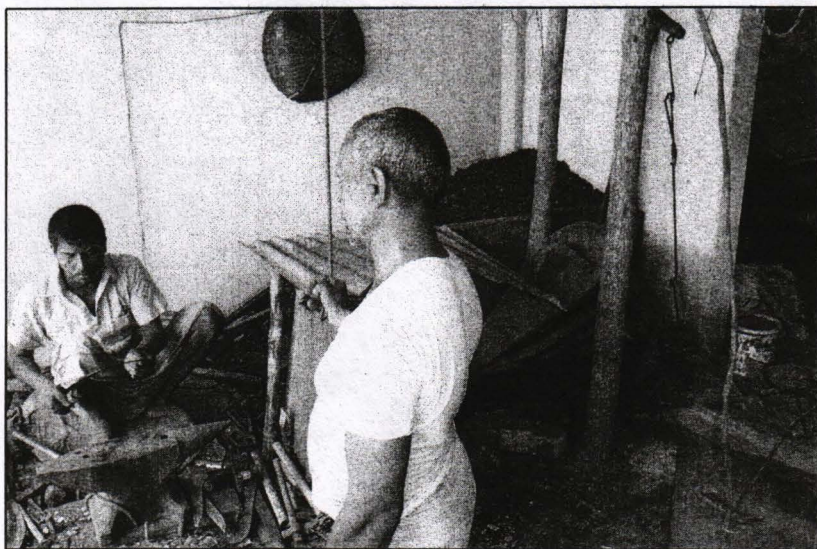
কক্সবাজার রামুতে কামার সম্প্রদায়ের লোকজন লোহা দিয়ে বিভিন্ন ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি করছে

www.pathagar.com

কামারের তৈরি বিভিন্ন হাতিয়ার

www.pathagar.com
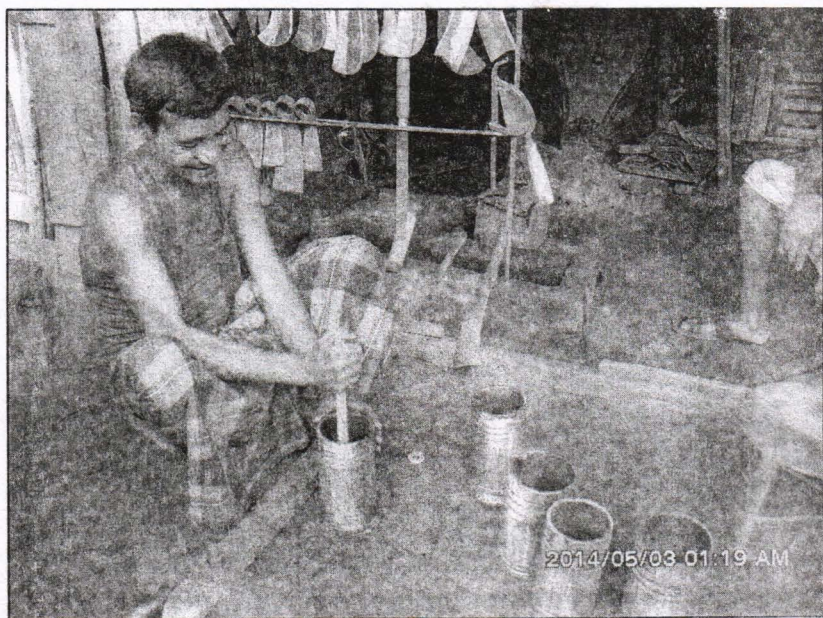
টেকনাফ সদরে ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বাজারে মুসলমানেরা এই পেশায় আসছেন এবং তারা এই পেশার উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন।"[১৩]

"আমি জন্মগতভাবেই চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা। পেশার কারণেই কক্সবাজারের রামু উপজেলা সদরের চৌমুহনীতে এসে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খুলেছি। জীবিকা ও পেশার কারণেই রামু উপজেলাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছি। রামু উপজেলার জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের চা-বাগান এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছি। পিতা-পুত্র একসাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সময় দিচ্ছে।"[১৪]

কামার বা কর্মকারেরা পারিবারিক প্রয়োজনেই বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করছেন। তাদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী ছাড়া দেশের চাষাবাদ কল্পনাই করা যায় না। বিশেষ করে দা, কোদাল, লাঙ্গলের ফলা কৃষিকাজের জন্য অপরিহার্য। ফলে এককথাতেই বলা যায় কর্মকারেরা দেশের অগ্রগতি, কৃষির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে অপরিহার্য। কামারের মাথার ঘামই দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

কামারেরা লোহাকে আগুনে পুড়িয়ে পিটাপিটি করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করে। তারা প্রথমে লোহাকে আগুনে তাতিয়ে নেয়। তারপর তাতানো লোহাকে পিটিয়ে নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করেন। লোহা প্রচণ্ড গরম হলে লাল হয়ে যায়, এসময় কামারেরা তিনজন তাল ঠিক রেখে দফায় দফায় পিটিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করে। পিটাপটির মাঝে একাধিকবার লবণপানিতে ডুবিয়ে লোহাকে জাত করা হয়। লোহাকে পোড়ানোর জন্যে কামারেরা জ্বালানী হিসেবে কাঠকয়লা ব্যবহার করে। কাঠ পুড়িয়ে বা কাঠকয়লা সরবরাহকারীর কাছ থেকে তারা কয়লা সংগ্রহ করে। সরকারি বনাঞ্চল থেকে বড় বড় কাঠ কেটে পুড়িয়ে কয়লা সংগ্রহ করে কামারের কারখানা, লন্ড্রিতে সরবরাহ করে খৈয়ালরা।

কয়লা ও লোহার পাশাপাশি কামারদের প্রয়োজন হয় চুলা। চুলাতে বাতাস পৌঁছে দেয়ার জন্যে প্রয়োজন মাটির তৈরি চোঙ্গা। চোঙ্গার ভেতর দিয়ে বাতাস পৌঁছে দেবার জন্য প্রয়োজন চামড়ার তৈরি হাপর, হাপরে বাতাসে সৃষ্টির জন্যে পায়ের সাথে সংযুক্ত দড়ি-সংলগ্ন একটি বাঁশের বা কাঠের কাঠি। হাপর টানার দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর। কামারেরা ছন্দবদ্ধ হয়ে লোহার ছোট-বড়ো হ্যামার দিয়ে লোহাকে পিটিয়ে এমনভাবে শায়েস্তা করে তাতে পিটুনি খেয়ে লোহা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে যা মানুষের প্রয়োজনে আসে। একটি কামারশালা পরিচালনা তথা বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির জন্য অন্যূন তিনজন মানুষ প্রয়োজন। রান্নাঘরে তরিতরকারি, মাছ, মাংস প্রভৃতি কাটার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন দা, চাষিদের ধানকাটারা জন্য প্রয়োজন কাস্তে, নিড়ানির জন্য প্রয়োজন ছেল বা সুঁচালো চিকন রড, চাষের জন্যে প্রয়োজন লাঙ্গলের ফাল, প্রয়োজন জমির আলের পাশ কাটার জন্য লম্বা দা, কোদাল, কাঠুরিয়ার কাঠ কাটার জন্য প্রয়োজন কুড়াল, বাইশ, করাতির কাঠ চিরাই করার জন্য প্রয়োজন করাত, গদু দা, বসতবাড়ি নির্মাণে লম্বা ও মোটা সাইজের পেরেক তথা তারকাটা তৈরি করে কামারেরা,

www.pathagar.com

নৌকা তৈরির মোটা ও লম্বা পেরেক বা তারকাটা– এসব কামারেরাই লৌহাকে পিটিয়ে তৈরি করে থাকেন।

এছাড়াও বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য খুন্তি, শাবল, কোদাল, ছুরিসহ, টেটা, বর্শা, বল্লম, সুঁপারি কাটার যাতা বা ছুরাতা, হিন্দুসম্প্রদায়ের ত্রিশূলসহ হরেক রকমের সামগ্রী ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করে থাকে।

তবে বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় মানুষের চাহিদায় পরিবর্তন আসছে। ফলে লোকজন এসব দা, ছুরিসহ বিভিন্ন সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করা বিশেষ করে চায়নিজ দ্রব্য কিনে নিচ্ছে।

কামারের পেশা নিয়েও রয়েছে স্থানীয় লোকধাঁধা।

'বাড়ির পিছে কুচুই বন
পিতাং কাড়া আরি
ভাইয়র পুন ভাইয়ে মারে
তার দইনর বাড়ি।'

এই ধাঁধার উত্তর একটু দীর্ঘই বটে। একই সাথে এই ধাঁধার একটি ভূমিকাও রয়েছে। ভূমিকাটি হচ্ছে, "এক রমণী নদী থেকে পানি ভর্তি কলসি নিয়ে বাড়ি ফিরছে। সেদিন ছিল এলাকার সাপ্তাহিক হাটের দিন। রমণী যখন পানিভর্তি কলসি নিয়ে ফিরছিল সে সময় তার প্রতিবেশী এক ব্যক্তি বাজারে যাচ্ছিলো। রমণী উক্ত ব্যক্তিকে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বাজার থেকে তাঁর জন্য কিছু সদাই-পাতি (সওদা-পাতি) আনার জন্য অনুরোধ করলেন। রমণী পানির কলসি রেখে তার কোমরের জালি (কাপড়ের তৈরি কোমরবন্ধ) থেকে টাকা-কড়ি বের করে বাজারে গমনেচ্ছু পুরুষটির হাতে দিলেন। তখন ঐ ব্যক্তি রমণীকে জিজ্ঞেস করে বাজার থেকে কী আনতে হবে? তখন রমণী তার চাহিদা অনুযায়ী বাজার থেকে 'জীবন আর যৌবন' আনতে অনুরোধ করেন।

একথা শুনে বাজারে গমনেচ্ছু ব্যক্তি ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল, কিন্তু তা প্রকাশ করলো না। সে বাজার থেকে কী আনতে হবে তা বুঝতে না পারলেও তা প্রকাশ না করে বলে, আমিতো তোমার বাড়ি চিনি না? এসব সদাই-পাতি এনে কোথায় পৌঁছে দেব? তখন রমণী তার বাড়ির ঠিকানা দিতে উপরের ধাঁধা বলে।

ঐ ব্যক্তি রমণীর উত্তর শুনে তাজ্জব বনে গেল কিন্তু তাও প্রকাশ না করে বাজারে চলে গেল। ঐ ব্যক্তি বাজার থেকে কী আনবে এবং তা কোথায় পৌঁছে দেবে তার উত্তর দিতে হবে। এখানে রমণীর বাড়ির ঠিকানা শুনতে খুবই অশোভন মনে হলেও প্রকৃত অর্থে রমণীর উত্তরটা কিন্তু অশোভন নয়।

ধাঁধার উত্তর :

মহিলার চাহিদামতে পণ্য হচ্ছে 'চাউল ও কাপড়'। জীবন হচ্ছে 'চাউল', যা খেয়ে মানুষের জীবন রক্ষা পায় এবং যৌবন হচ্ছে 'কাপড়', যা পরিধান করে মানুষের শরীর

www.pathagar.com

বা যৌবন আবৃত করা যায়। 'চাউল' এবং 'কাপড়'কেই জীবন ও যৌবন বুঝিয়েছে। মহিলার বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে, 'কামারের দোকানের দক্ষিণ পাশের বাড়ি, যে বাড়ির পেছনে রয়েছে বেতবাগান, ঐ বাড়িটাই মহিলার বাড়ি।' এখানে 'ভাইয়ের পুন ভাইয়ে মারে' বলতে বুঝানো হয়েছে মূলত কামারের দোকান। কামারের কাজ হচ্ছে লোহার উপর লোহা দিয়ে পিটানো, তাই 'ভাইয়ের পুন ভাইয়ে মারের তার দক্ষিণের বাড়ি' বলা হয়েছে। মহিলার বাড়ির ঠিকানা দেখাতে অত্যধিক অশোভন শব্দ ব্যবহার করা হলেও প্রকৃত অর্থে তাই নয়। প্রাচীনকালে গ্রামীণ জনপদে সাহিত্যচর্চার মধ্যেও যে মেধা, মনন এবং বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ছিল তা এই ধাঁধার মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে যায়।"[১৫]

## তথ্যনির্দেশ

১. ড. আবদুল করিম, "ইতিহাস"-কক্সবাজারের ইতিহাস, সম্পাদিত, কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ : ৩০ জুন, ১৯৯০ ইংরেজি, পৃষ্ঠা-৪২-৪৩।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৬।

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭।

৪. জাহানারা বেগম, স্বামী : আলী আযম, বয়স : ৫৪ বছর, গ্রাম : ডুমখালী মালুমঘাট, ইউনিয়ন : ডুলহাজারা, উপজেলা : চকরিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০২.১০.২০১২. সময় সকাল ১০টা।

৫. উখিয়ার ইতিহাস-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, কক্সবাজার, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১০, পৃষ্ঠা-উখিয়ার মিষ্টি-১৫৯-৬০।

৬. দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮) (কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর ভ্রমণ)- ভেলাম ভান সেন্দেল সম্পাদিত, অনুবাদ : সালাহউদ্দিন আউয়ুব, প্রকাশক : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, রুম ১১০৭, কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৪,পৃষ্ঠা-৬৯।

৭. এস এম জাফর, পিতা : কবির আহমদ সওদাগর, মাতা : ছৈয়দা চেমন বাহার, বয়স : ৩৫, গ্রাম : মণ্ডল পাড়া, ইউনিয়ন : ফতেখারকুল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২০-০৬-২০১২, সময় : সকাল : ১০টা।

৮. মোহাম্মদ আবুল কাসেম, পিতা : আবদুল হাই, মাতা : গোলতাজ বেগম, বয়স : ৫৪ বছর, গ্রাম : তেলিপাড়া, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ৮-০৩-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।

৯. ম্যাম্যাচিন, পিতা : মং কিউ লা, মাতা : উমেচেন, বয়স : ৪৫, গ্রাম : রাখাইনপাড়া, মহেশখালি পৌরসভা, উপজেলা : মহেশখালী, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১০-১০-০১৩, সময় সকাল : ১০টা।

১০. দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮) (কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর ভ্রমণ)- ভেলাম ভান সেন্দেল সম্পাদিত, অনুবাদ : সালাহউদ্দিন আউয়ুব, প্রকাশক : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, রুম ১১০৭, কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৪,পৃষ্ঠা-৬৯।

১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৯।

www.pathagar.com

১২. তাফহীমুল কুরআন, ৭ম-৮ম খণ্ড,- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র., অনুবাদ : মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রমাণী, ঢাকা, প্রকাশ -১৬তম প্রকাশ, মে ২০১২। অষ্টম খণ্ড, ১১৪-১১৫।

১৩. শ্রীমন্ত কর্মকার, ৩১, পিতা : সুধীর কর্মকার, মাতা : নীলু বালা কর্মকার, গ্রাম : উত্তর মিঠাছড়ি চা-বাগান, ইউনিয়ন : জোয়ারিয়ানালা, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২১-০৪-২০১৩, সময় : দুপুর ১২টা।

১৪. সুধীর কর্মকার, পিতা : রাখাল কর্মকার, মাতা : আরতি বালা কর্মকার, বয়স : ৬৫ বছর, গ্রাম : উত্তর মিঠাছড়ি চা-বাগান, ইউনিয়ন : জোয়ারিয়ানালা, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২১-০৪-২০১৩, সময় : দুপুর ১২টা।

১৫. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, কক্সবাজার, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা-৬৯-৭০।

www.pathagar.com

# লোকক্রীড়া

"অশিক্ষিত জনসাধারণ নিজেদের শরীরচর্চার জন্য এবং সর্বোপরি আনন্দ বিধানের জন্য বহু খেলাধুলা, ব্যায়াম ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে। এগুলোর কিছু সংখ্যক হয়তো শুধু অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক- কিন্তু অঙ্গভঙ্গি ছাড়াও বিশেষ নিয়মকানুন অনুসরণ করে বহু খেলার উদ্ভাবন করা হয়েছে যা এখনো দেশ দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এমন কী সুসভ্য সমাজের বহু কঠোর নিয়মতান্ত্রিক খেলাধুলাও এই সমস্ত লোকখেলাধুলা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছে। এই পর্যায়ের লোকক্রীড়ার মধ্যে হাডুডু, নোন্তা, ছিবুড়ি, ডাংগুলি, কানামাছি, নৌকাবাইচ, ষাঁড়ের লড়াই এবং আরো বহু রকমের খেলাধুলার নাম করা চলে। দেশে বিদেশে যে-কত বিচিত্র রকমের লোকখেলা আছে তার বর্ণনা দিয়ে শেষ করা দুরূহ। এই সমস্ত খেলাধুলায় অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ শুধু যে অফুরন্ত আনন্দ লাভ করে তা নয়- খেলাধুলার মাধ্যমে তারা বহু রকমের লোকসাহিত্যেরও সৃষ্টি করে চলেছে। লোকক্রীড়া প্রচারের প্রধান বাহন দর্শনেন্দ্রীয়। তবে অনেক সময় মুখে মুখে শুনেও খেলা শিখতে দেখা যায়। বংশপরম্পরায় খেলাধুলাগুলো যেমন দেখে শেখে তেমনি শুনেও শেখে এবং প্রাচীনকাল থেকে লোকক্রীড়ার প্রচলন রয়েছে।"[১]

বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোর-তরুণ-যুবসম্প্রদায়সহ সর্বস্তরের ছেলেমেয়েদের জন্য বিনোদনের মাধ্যমের অন্ত নেই। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে, কোথায় কী বিনোদন আছে তা দেখে ফেলছে। একটি শিশু জন্মগ্রহণের পরে চোখ খুলেই দেখতে পাচ্ছে টেলিভিশনসহ অন্যান্য সচিত্র গণমাধ্যম। সেসব গণমাধ্যমে দেখতে পাচ্ছে আধুনিক ক্রীড়াশৈলী, যা প্রাচীনকালে কল্পনাই করা যেতো না। প্রাচীনকালে জেলার শিশু-কিশোর-তরুণ-যুবাদের বিনোদনের কোনো মাধ্যম ছিল না। ফলে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলাকেই বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নিতো। শারীরিক বিকাশ ও বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই শিশুরা বিভিন্ন ধরনের খেলার প্রতি ঝুঁকে পড়তো। এসব লোকজ খেলার মধ্যে, বলীখেলা ও বৈশাখি মেলা, নৌকা বাইচ, ফুটবল, ঘোড়দৌড় ও মেলা, তুমরু খেলা, মঅল খেলা বা দাড়িয়াবান্ধা, মইয়া খেলা, ডাং খেলা বা ডাংগুলি খেলা, ছি খেলা, গুটি খেলা, দুধা খেলা, হাডুডু খেলা, বউছি খেলা, খুৎ খুৎ খেলা, একখা খেলা, চাকু খেলা, ইচিবিচি খেলা, বুড়িরঘর খেলা, মরিচ খেলা, গোলাপ ফুল খেলা, রোমাল চুরি খেলা, তেইক্যাচুরি খেলা, লুককেলানি বা লুকোচুরি খেলা, ঘিলা খেলা, বাঘকরই খেলা, লাডুম খেলা, লাটিম খেলা, হাত্তা খেলা, টনি খেলা, মোরগলড়াই খেলাসহ রয়েছে হরেক রকমের খেলা। বিনোদনের জন্য গরুর লড়াই, মহিষের লড়াইসহ বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হতো।

আধুনিক খেলাধুলা যেমন-ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিসবল, বাস্কেটবল ইত্যাদি খেলাধুলার প্রভাবে প্রাচীন খেলাগুলো প্রায় বিলুপ্ত। ডাংগুলি খেলার স্থান দখল করে

www.pathagar.com

নিয়েছে ক্রিকেট খেলা। কিছু কিছু লোকজ খেলাধুলা জেলার কোথাও কোথাও এখনও কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

## ১. গুটি খেলা

'গুটি খেলা' শিশু-কিশোরদের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। প্রাচীনকালে জেলার সর্বত্র গুটি খেলার প্রচলন ছিল। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী নির্বিশেষে ছেলেমেয়েরা সকলেই গুটি খেলায় মেতো থাকতো। ছেলেমেয়েদেরকে সকাল-বিকাল খাওয়া-দাওয়ার জন্য বাড়িতে পাওয়া যেতো না। খেলার আসর থেকেই ছেলেমেয়েদেরকে ধরে এনে খাওয়াতে হতো। পরে সেই গুটি খেলার স্থান দখল করেছে আধুনিক মার্বেল খেলা।

প্রাচীনকালে গুটি খেলার জন্য গাছের গুটি ব্যবহার করা হতো। এসব গুটিকে স্থানীয় ভাবে 'লাডুম' বলা হয়। লাডুম একটি গোলাকার ফল। তবে লাডুম ফল খাওয়ার নয়। তবে পাহাড়ি বন্য পশু-পাখি এসব লাডুম ফল খেয়ে থাকে। লাডুম আর লাটিম এক নয়। লাটিমও এক প্রকারের খেলা। লাডুম গাছ একটি পাহাড়ি বৃক্ষ। গ্রামীণ জনপদে এসব গাছ বেড়ে উঠে। এতে করে গ্রামীণ জনপদের সর্বত্র এসব গাছ দেখা যায়। গ্রামের লোকজন পারিবারিক ব্যবহারসহ জ্বালানি কাঠের জন্য এসব গাছ লাগিয়ে থাকে। এসব গাছের পাতা বা গাছ গরু-ছাগলে খায় না। তাই অনায়াসে এসব গাছ জনপদে বেড়ে উঠতে পারে। এসব গাছেই গোলাকার এসব লাডুম ধরে। লাডুম বড় হয়ে পরিপক্ক হলে গাছ থেকে নিচে পড়ে যায়। গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদেরকে কষ্ট স্বীকার করে গাছ থেকে ছিঁড়তে হয় না। ফলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা সহজেই এই গাছের ফল নিয়ে খেলা করতে পারে। লাডুম যেহেতু গোলাকার সেহেতু তা বর্তমানের মার্বেলের ন্যায় গড়িয়ে গড়িয়ে যায়। বর্তমানের মার্বেল 'লাডুম'-এর স্থান দখল করে নিয়েছে। লাডুম নিয়ে অন্যূন দু'জন নিয়েই খেলা যায় অথবা বেশি হলেও দু'দলে বিভক্ত হয়ে খেলা যায়। মাটিতে খুঁড়ে গর্ত করেই লাডুম নিয়ে খেলা করতে হয়। অর্থাৎ নিদিষ্ট গর্তই হচ্ছে খেলার কেন্দ্রবিন্দু। নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে গর্তের মধ্যে লাডুম ফেলার মাধ্যমে এই খেলার জয়-পরাজয়ের জন্য পয়েন্ট নির্ধারিত হয়। তবে এর মধ্যে প্রতিপক্ষের গুটিকে ঠিকতে পারলেও পয়েন্ট পাওয়া যায়।"[২]

## ২. হাডুডু খেলা

বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই এই খেলাটি পরিচিত এবং খুবই জনপ্রিয়। এটিকে বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ খেলার আর এক নাম কাবাডি। হাডুডু খেলাতে দুটো দল থাকে। প্রত্যেক দলে খেলোয়াড় থাকে ৮ থেকে ১০জন করে। প্রতি দলের খেলোয়াড় একজন একজন করে এক দমে ডুডু ... ডু ... ডু অথবা নিম্নোক্ত ছড়া কেটে যেমন-

তর দেশত গেইলামরে তরে নডরাই
তর বর (বাপের) ভা গঁদা লই
তরে দুঁরাই, তরে দুঁরাই ... তরে দুঁরাই

www.pathagar.com

অথবা
হাড়ে ঘাড়ে বইজ্যাল খের (শুকনো ঘাস)
হারি পেড়ানির পরান গেল্ ... পরান গেল্ ... পরান গেল্
অথবা
হাড়ে ঘাড়ে পচা দই
দারগোয়া (লাকড়ি) চুরাইয়ার বারি কই... বারি কই... বারি কই
অথবা
বাক্ কুম বাক্ কুম কি'য়ারা
মইষে ভাইঙ্গে টিয়ারা
মইষে মাইজ্জে লাথি
তর বাইয়ন বাতি... বাতি... বাতি
অথবা
উত্তরে গিলাম কী দেইলাম
তাল গাছর মা'তি
কাইল্যা বেইন্যা তরে ডাইক্কুম
জুতা চুরাইয়ার নাতি... নাতি... নাতি

এসব ছড়া উচ্চারণ করতে করতে বিপক্ষদলের সীমানায় ঢুকে যেতে হবে। সীমানায় ঢুকে প্রতিপক্ষের কাউকে ছুঁয়ে পূর্বের স্থানে ফিরে আসতে পারলে সে-দল পয়েন্ট পাবে। পয়েন্ট পাওয়াকে স্থানীয়ভাবে 'ডেইল' পাওয়া বলে। তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের যে খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে আসে সেই খেলোয়াড়টি 'মারা' যায়। 'মারা' যাওয়া অর্থ খেলায় সে পরাজিত। সে খেলা থেকে বাদ পড়ে যায়। অপরদিকে বিপক্ষদলকে ছোঁয়ার জন্য যে খেলোয়াড় ঢুকে ধরা পড়ে নিজের সীমানায় ফিরে আসতে না পারে সেও অনুরূপ 'মারা' পড়ে এবং সেও খেলা থেকে বাদ পড়বে। এমনিভাবে এক পক্ষ অপর পক্ষের কতোজনকে ছুঁয়ে বা ধরে ফেলে বাদ দিতে পারে তার ওপরই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। এ খেলাতে প্রতিপক্ষকে ছুঁয়ে বেরিয়ে আসার কৌশলের সঙ্গে-সঙ্গে প্রচুর দম, ক্ষিপ্রতা ও শক্তির প্রয়োজন হয়। কক্সবাজার জেলার সর্বত্র এ খেলাটি এখনও সচল রয়েছে। এ খেলার আদর্শ সময় শুষ্ক মওসুম। মাঠের আমন ধান উঠে যাওয়ার পরে যখন ঘরের রাখাল বালকসহ ছেলেদের কোনো কাজ থাকে না তখন সবাই মাঠে নামে। বিশেষ করে বিকেলে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। দিনের কাজ শেষে সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে তখন সবাই খেলাতে নেমে পড়ে। জ্যোৎস্না রাতেও রাখাল বালকসহ গ্রামের সকল ছেলে এ খেলার মাধ্যমে মাঠ কাঁপিয়ে তুলে। তবে বর্তমানে এ খেলার পরিসর খুবই সীমিত হয়ে যাচ্ছে। আমন ধান উঠার পরে বোরো ধান চাষ করার জন্য মাঠে সেচের পানি উঠে গেলে খেলার জন্য মাঠ পাওয়া যাচ্ছে না।"[৩]

## ৩. ডাংগুলি

ডাংগুলি খেলাকে স্থানীয়ভাবে ডাংখলদা খেলাও বলে থাকে। বিগত পাঁচ সাত দশক পূর্বেও ডাংগুলি জেলার অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা ছিল। বিগত দুই বা তিন দশক পূর্বেও এ

www.pathagar.com

খেলাটি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। গ্রামের শিশু-কিশোর-যুবকেরাই এ খেলার মধ্যেই দিন পার করে দিতো। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে তারা খেলার মধ্যে লেগে থাকতো। বাড়ির বুড়োদের বকুনি থেকে শুরু করে হালকা মারধরের শিকার হতো। খেলাটি এ জেলার শিশু-কিশোর-যুবকেরা দু'ভাবে খেলতো।

এক. এ খেলায় প্রয়োজন হয় প্রায় দেড়হাত লম্বা, পাঁচ/ছয় ইঞ্চি মোটা কাঠের একটি লাঠি। তবে লাঠিটি অবশ্যিই সোজা হতে হবে। সাথে পাঁচ বা ছয় ইঞ্চি লম্বা দেড় বা দুই ইঞ্চি মোটা গোলাকার কাঠি, যা সহজে ভাঙে না। দুটোই খুব শক্ত হতে হবে। খেলার শুরুতে মাটিতে একটি ছোট গর্ত করা হয়। যে পক্ষ খেলা পায়, সে গর্তের মাঝখানে ছোট কাঠিটি বসিয়ে, বড় লাঠির আগা বা অগ্রভাগে দিয়ে কাঠিটিকে যতদূর পারে ঠেলে দেয়। এখানে খেলা পাওয়া অর্থ টস করে খেলা শুরুর দল নির্ধারণ করা। ছোট কাঠিটি দূরে ঠেলে দেবার পর বড় লাঠিটি গর্তের উপর আঁড়াআঁড়ি রাখতে হয়। এরপর অপরপক্ষ ছোট কাঠির পেছনে ছুটতে থাকে এবং যে জায়গায় পড়ে সেখান থেকে সংগ্রহ করে গর্তের বড় কাঠির দিকে ছুঁড়ে মারে। ছোট কাঠি যদি সরাসরি বড় লাঠিটিকে আঘাত করে তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রথম খেলোয়াড় মারা পড়বে বা আউট হয়ে যাবে। যদি প্রতিপক্ষ ছোট কাটি দিয়ে বড় কাঠিটিকে আঘাত করতে পারবে না তখন প্রথম খেলোয়াড় কাঠির স্থানে গিয়ে বড় লাঠির আঘাতে কৌশলে ছোট কাঠিটিকে শূন্যে ভাসিয়ে দূরে ঠেলে দিতে চেষ্টা করে। এতে কেউ সফল হয় আবার কেউ সফল হয় না। শূন্যে থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের কাজ হচ্ছে, বড় লাঠি দিয়ে জোরে আঘাত করে ছোট কাঠিটিকে অনেক দূর পাঠিয়ে দেয়। পূর্বের ন্যায়, প্রথম খেলোয়াড় হাতের বড় লাঠিটি আঁড়াআঁড়িভাবে গর্তের উপর রাখে। প্রতিপক্ষের খেলোয়ড়েরা দূর থেকে ছোট কাঠিটি সংগ্রহ করে ছুঁড়ে মারবে। ছুঁড়ে মারার সময় যদি বড় লাঠিকে আঘাত করতে (স্থানীয় ভাষায় ঠিকতে পারলে) পারে তাহলেও মূল খেলোয়াড় আউট হয়ে যায়। এখানে বলে রাখতে হবে যে, প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়েরা যদি ছোট কাঠিটিকে শূন্যে তুলে দূরে পাঠাবার সময় ধরে ফেলতে পারে (ক্যাচ ধরতে পারে) তাহলে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় আউট বা মারা পড়ে। দূর থেকে বড় লাঠি বা ডাংয়ের কাছে ছোট কাঠিটি পড়ার পর মূল খেলোয়াড় গুনে এক ডাং, দুই ডাং, তিন ডাং, চার ডাং, পাঁচ ডাং ... এভাবে যত লাঠি গোনা হলো এবং অপর পক্ষের খেলার সময় দু'দলের গোনা-গুনতির পরিমাণের উপরই নির্ভর করে জয়-পরাজয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলাটি একই প্রকৃতির। ব্যবধানটা হচ্ছে মাত্র প্রথমটার গর্তে কাঠিটি সোজাসুজি সংস্থাপন করা হয়। এ জন্য প্রথমটাকে 'খলদা' খেলা এবং দ্বিতীয়টাকে ডাং বা ডাংগুলি খেলা বলা হয়।

এই খেলা মাত্র দু'জনে খেলতে পারে। আবার ১০ বা ২০জনও একসাথে খেলতে পারে। দু'জন খেলোয়াড় হলে একজন প্রথম পক্ষ অপরজন দ্বিতীয় পক্ষ। আর খেলোয়াড় বেশি হলে সমান ভাগ করে নিয়ে প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে খেলা হয়। এ খেলার জন্য প্রয়োজন এক টুকরো লম্বা ও এক টুকরো ছোট কাঠ আর খোলা মাঠ। খোলা মাঠের অভাবে বর্তমানে এইখেলাও সীমিত হয়ে পড়েছে। আগের মতো গ্রামের পথে-প্রান্তরে এইখেলা আর চোখে পড়ে না। ডাংগুলি খেলার স্থান দখল করে নিয়েছে ক্রিকেট খেলা।

www.pathagar.com

গ্রামের প্রতিটি স্থানে এখন ক্রিকেট ব্যাট ও বল হাতে শিশু-কিশোরদের দেখা যাচ্ছে। গ্রামের রাস্তা, উপ-রাস্তা, শহরের গলি, উপ-গলিতে শিশু-কিশোরদের ক্রিকেট ব্যাট, বল হাতে দেখা যাচ্ছে। পূর্বে যেখানে ডাংগলি হাতে দেখা যেতো।"[৪]

## ৪. রামু উপজেলার বাইছালি খেলা (নৌকা বাইচ)

নৌকা বাইচ জেলার একটি প্রাচীন খেলা। জেলার রামু উপজেলা-সদরেই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী বাঁকখালিতেই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে সুনির্দিষ্ট কখন থেকে জেলায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার তার কোনো তথ্য কোথাও নেই। তবে স্থানীয় প্রবীণদের মতে প্রায় শত বছর ধরেই রামুতেই এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়ে আসছে। রামু উপজেলার শ্রীকুল বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ নব্বই বছরের বর্ষিয়ান ভিক্ষু উঃ ছেকারা মহাস্থবির ১৯৩০ সাল থেকেই রামুতে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখে আসছেন বলে দাবি করেছেন। ভিক্ষু উঃ ছেকারা মহাস্থবির এখনো জীবিত আছেন। স্থানীয় বাঙালি হিন্দু, মুসলিম ও বড়ুয়া বৌদ্ধরা নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতাকে 'বাইচালি খেলা' বলে। দাঁড় টেনে নৌকা নিয়ে যাওয়াকে স্থানীয়ভাবে 'বাইছা' দেওয়া বলে। ফলে নৌকা বাইচ অর্থাৎ নৌকা নিয়ে বাইছা দেওয়া প্রতিযোগিতা কালক্রমে এখনে 'নৌকা বাইচ' প্রতিযোগিতায় রূপ নিয়েছে। আবার কেউ কেউ নৌকা খেলাও বলে থাকে। তবে বার্মিজ ভাষাভাষি রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের ভাষায় নৌকা বাইচকে 'লঙ প্যাঁয়ে পোয়ে' বলে।
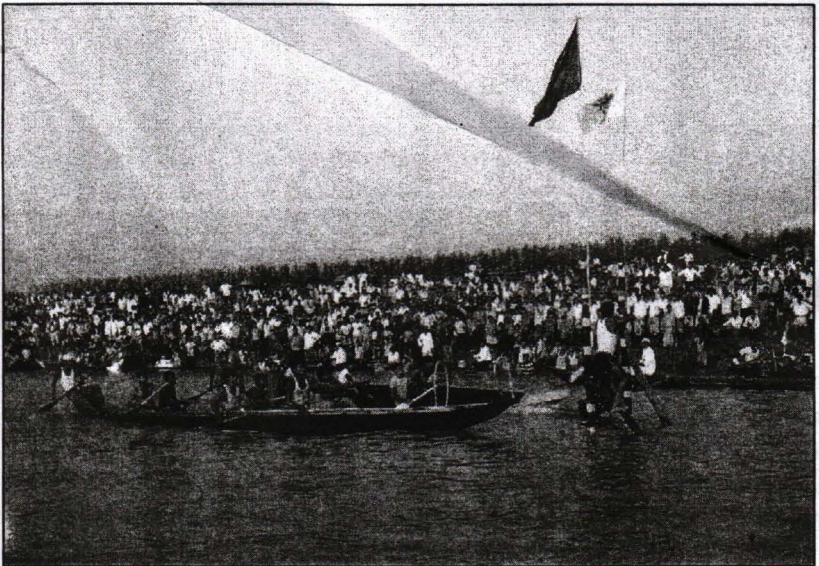
*রামু বাঁকখালী নদীর ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ (বাইছালি খেলা) প্রতিযোগিতার দৃশ্য*



www.pathagar.com

প্রাচীনকালে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন হতো রাখাইন সম্প্রদায়ের জন্য। রাখাইনরা নৌকার দাঁড় টানাতে বেশি পারদর্শী ছিল বলেই তাদের নিয়েই মূলত এই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতো রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন।

তবে অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন যে মোটেই থাকতো না এমন নয়। তবে তাদের সংখ্যা থাকতো খুবই কম। তবে তারা সম্প্রদায়ের বড় কেউকেটা বা প্রভাবশালী জাতীয় লোকজন। তারও অন্যতম কারণ ছিল রাখাইনরা তাদের কোনো কর্মসূচি, কর্মকাণ্ড বা প্রতিযেগিতায় অন্য কোনো সম্প্রদায়ের বা ধর্মাবলম্বীদের অংশগ্রহণ সহ্য করতো না।

এমনও নজির আছে রাখাইন সম্প্রদায়ের মহল্লার অভ্যন্তর থেকে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের লোকজন যাতায়াত করতে পারতো না। রাখাইন সম্প্রদায়ের জনপদ তথা মহল্লার অভ্যন্তর থেকে যাতায়াত করতে গেলে তাদেরকে ঢিল ছুঁড়ে বা অপমান করা হতো। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতো লাওয়ের পারা (হাইটুবি বা হাইটুপি) দল, শ্রীকুল দল, দক্ষিণ পাড়া (দক্ষিণ শ্রীকুল) দল, ঠাকুরপাড়া দল, আউছাপা রোয়ার বা লামার পাড়া দল, পানেরছড়া দল, টং শোয়ে রোয়ার বা আষ্টকাটা দল। পূর্বেই বলেছি প্রতিটি দলের সদস্য রাখাইন সম্প্রদায়ের সদস্য। সে সময় বরিশালের রাখাইনদের মধ্যেও নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার প্রচলন ছিল।

১৯৪০ সালে দিকে রামু উপজেলার বড়ুয়া সম্প্রদায়ের লোকজনও নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। তখন থেকে বড়ুয়া ও রাখাইনদের মধ্যে সম্মিলিতভাবে খেলা হতো। পাশাপাশি মাঝে মধ্যে বড়ুয়া ভার্সেস বড়ুয়া তথা 'বড়ুয়া নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হতো। পূর্ব রাজারকূল বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ উ নামে ঠাকুর বড়ুয়াদেরকে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। একই সথে তিনি নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন।

১৯৪৭ সালে পকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা সার্বজনীনতা লাভ করে। প্রতিযোগিতায় হিন্দু, মুসলিম, রাখাইন বৌদ্ধ ও বড়ুয়া বৌদ্ধরা সম্মিলিত ভাবে অংশগ্রহণ করতো।

তবে পাকিস্তানের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুদিনের মধ্যেই রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের পৈত্রিক ভিটি-বাড়ি বিক্রি করে প্রতিবেশী বার্মার আরাকানে চলে যেতে শুরু করে। এতে করে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হিন্দু, মুসলিম ও বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দিন যতই গড়িয়ে যেতে লাগলো ততই বড়ুয়া সম্প্রদায়ও নৌকা বাইচ প্রতিযেগিতা থেকে ছিটকে পড়তে শুরু করলো। ফলে সার্বজনীন নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা মুসলমান সম্প্রদায়ের একক প্রতিযোগিতা হিসেবে এসে দাঁড়ালো।

## নৌকা বাইচ প্রতিযেগিতার আয়োজন

বাঁকখালি নদীতেই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নদীর রামু সদরের ফকিরা বাজার পয়েন্ট থেকে শুরু করে রাজারকুল-চাকমারকুল পয়েন্ট এলাকার মধ্য

www.pathagar.com

নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাঁকখালি নদীর যে বাঁকটি অপেক্ষাকৃত লম্বা ও সোজা, আর পানির স্রোত কোনো অংশে কম কোনো অংশে বেশি নয় এমন স্থানেই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও পানির গভীরতাও দেখা হয়। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে পাশাপাশি চার-পাঁচ হাত অন্তর অন্তর দু'টি খুঁটি পুঁতে দেয়া হয়। সেই খুঁটি থেকে পাঁচশত গজ বা তার চেয়ে বেশি দূরত্বের কোনো পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়। সর্বশেষ পয়েন্ট বা গন্তব্যে পাশাপাশি দু'টি খুঁটি পুঁতে রাখা হয় এবং উক্ত খুঁটিতে একটি ফাঁপা বাঁশ বা চোঙ্গা শক্ত করে আটকিয়ে রাখা হয়।

উক্ত চোঙ্গার ভেতরে একটি সরু চালান করে বা ঢুকিয়ে রাখা হয় যাতে বেতের দুই প্রান্ত চোঙ্গার অন্তত একহাত বাইরে থাকে। এবার প্রতিযোগিতা শুরুর পালা। দু'টি নৌকা পাশাপাশি সমান দূরত্বে অবস্থান নেয়। খেলা পরিচালক বা রেফারি যখন হুইশেল বাজাবে বা পটকা বা বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে আওয়াজ করবে তখনই শুরু পুরস্কার জেতার যুদ্ধ। নৌকা দু'টি পাশাপাশি সমান দূরত্ব বজায় রেখে ছুটবে বেত সংগ্রহের জন্য, যারা বেতটি আগে নিতে পারবে তারাই বিজয়ী দল। প্রতিটি নৌকায় থাকে আটজন। আটজনের মধ্যে একজন থাকে মাঝি, একজন বেতটানা লোক ও অপর ছয়জনের কাজ হচ্ছে দাঁড় টানা। মাঝির কাজ হচ্ছে নৌকাকে সোজা রাখা। নৌকার একটি দাঁড় নিয়ে নৌককে সোজা রাখতে হবে। অন্যথায় নৌকা সোজা না চলে আঁকাবাঁকা চলতে থাকবে। মধ্যখানের ছয়জন পাশাপাশি বসে দাঁড় টানা।

ছয় দাঁড়টানা লোক যখন দাঁড় টেনে নৌকা প্রাণপণে টেনে নিয়ে যাবে তখন মাইকে ঘোষণা চলতে থাকে। মাইক থেকে ধাবমান নৌকাকে উৎসাহ দিয়ে ধারা বর্ণনা দেয়া হয়। নদীর দু'তীরে হাজার হাজার শিশু-কিশোর, বুড়ো-বুড়ি, ছেলে-মেয়ে, নর-নারী খেলা উপভোগ করে এবং প্রতিযোগিদের উৎসাহিত করে। এভাবে যারা আগে বেতটি সংগ্রহ করতে পারবে তারাই বিজয়ী।

এভাবে কয়েক রাউণ্ড খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। নৌকা বেশি হলে তিনদিন বা পাঁচদিন ধরে খেলা চলে। বর্তমানে এই ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা রামুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কক্সবাজার সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকেও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

নৌকা বাইচ উপলক্ষে নদীর দু'তীরে বসে মেলা। মেলায় রকমারি খাবার দ্রব্যসামগ্রী, ঘরের ব্যবহারের সামগ্রী বিকিকিনি হয়।

শতাব্দী প্রাচীন 'নৌকা বাইচ' বা 'বাইচালি খেলা' কক্সবাজারের অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। বর্তমানে খেলা পরিচালনার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় কমিটি। কমিটির উদ্যোগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার দেয়া হয়। এই খেলার জন্য প্রয়োজন নৌকা, দাড়, বেত, বাঁশ বা খুঁটি, চিকন তার বা সুতলি।"[৫]

www.pathagar.com

## ৫. ষাঁড়ের লড়াই

গরুর লড়াই ছিল এ অঞ্চলের নববর্ষ উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। গরুর লড়াই উপলক্ষে হাট-বাজারে ঢোল পিটিয়ে জনগণকে জানান দেওয়া হতো। পূর্বনির্ধারিত স্থানে ও সময়ে গরুর লড়াই হতো। পাশাপাশি দুটি গ্রামের বা দূরবর্তী গ্রামের দুটি গরুর মধ্যে লড়াই হতো। গরুর লড়াইকে কেন্দ্র করে অনেক সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়েছে। গরুর লড়াইকালে অনেক গরু মারা যাওয়ার নজিরও রয়েছে। বার্ষিক গরুর লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য অনেক পরিবার দু'চারটি গরুকে বলবান করে তুলতো। যার গরু লড়াইয়ে বিজয়ী হতো গ্রামে তার ছিল আলাদা সম্মান। তাকে সবাই সমীহ করে চলতো। নববর্ষে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এই গরুর লড়াইয়ের আয়োজন করা হতো। নববর্ষ ছাড়াও ঈদ উৎসবে বিনোদনের অংশ হিসেবে গরুর লড়াই-এর আয়োজন করা হতো। ঢোল, বাঁশি, নাল, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি করা হতো। গরুর লড়াইয়ে বিজয়ী ও বিজিতদেরকে পুরস্কারও দেয়া হতো। গরুর লড়াই উপলক্ষে ছোট-খাটো মেলার আয়োজনও থাকতো। এসব মেলায় রকমারি পণ্য বিকিকিনি হতো। থাকতো উপাদেয় শুকনো খাবার। বিশেষ করে বিস্কুট, বাদাম, গজা, বাতাসাসহ কিছু মিষ্টান্ন দ্রব্য। নানা রকমের লাল-হলুদ কাপড়, গলায় রঙিন কাজগের ফুল দিয়ে সাজিয়ে গরুকে মাঠে নেয়া হতো।

ইদানীং গরুর লড়াই সংস্কৃতি আমাদের এ অঞ্চল থেকে বলতে গেলে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির মন্দাভাবের কারণে গ্রামের লোকজন ও কৃষকেরা পূর্বের মতো গরু পুষতে পারছে না। তাছাড়াও পূর্বের মতো শুষ্ক মওসুমে এখন জমি পতিত থাকছে না। জমিতে হচ্ছে দু'তিন ফসলা চাষাবাদ। গরুর চারণক্ষেত্র যেমন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে তেমনিভাবে দু'একটি গরু থাকলেও লড়াইয়ের জন্য উন্মুক্ত জমি নেই। জেলার প্রতিটি উপজেলার গ্রামের মধ্যেই গরুর লড়াইর প্রচলন ছিল। বিশেষ করে কক্সবাজার সদর উপজেলার বৃহত্তর ঈদগাঁও এলাকার ধমকা বিলে গরুর লড়াই ও লড়াইর সাথে মেলা বসতো।"[৬]

## ৬. দাড়িয়াবান্ধা

দাড়িয়াবান্ধাকে স্থানীয়ভাবে মঅল খেলা বলে। চিল বদল... বদল উইল্লে দে ইয়ান কী? সবাই বলবে চাঁ...ন আঁইদ্দে ই তাঁর ধরি এহন আঁ...ন সবাই উচ্চস্বরে... চিল বদল... বদল।

খেলার মাঠে জড়ো হয়ে না আসা খেলোয়াড়দের নাম ধরে উপরোক্ত বদল দিয়ে খেলায় হাজির আহ্বান জানানো হতো এক সময়। ইদানীং জোছনারাতে খেলার মাঠ হতে এ বদল আর শোনা যায় না। তবে গ্রামাঞ্চলে পড়ন্ত বিকেলে কোনো কোনো জায়গায় বদল শোনা না গেলেও মঅল বা দাড়িবান্ধা খেলা দেখতে যায় এক্ষে দর্শক থাকে নগণ্য। আগে গ্রাম মহল্লা বা ইউনিয়নভিত্তিক প্রতিযোগিতা দিয়ে পড়ন্ত বিকেলে বা জোছনারাতে এ খেলা অনুষ্ঠিত হতো। অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এ খেলা খোলা জায়গায়

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট ঘর কেটে মঞ্জল বা দাড়িয়াবান্ধা খেলা হয়। বালক বালিকা এমন কি বয়স্করাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ খেলার জন্য দুটি দল গঠিত হয়। প্রতিদলে ৫/৬ জন থেকে ৮/৯ বা তার অধিক খেলোয়াড় থাকতে পারে। উভয় দলে থাকে ২ জন দলপতি। কক্সবাজারের ভাষায় এদের মঙ্গলা বলা হয়। ছঁকবাধা ঘর এ খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ছকের মধ্যে খেলা হয়। খেলা শুরুর আগেই মাটির উপর কোদাল দিয়ে সারিদাগ কেটে ঘরের সীমা নির্ধারণ করা হয়। এ খেলার ঘর থাকে ৮/১০ টি। পাশের লম্বা লম্বা দুইধাইর বা সারিদাগকে ক্ষুরের ধাইরে দলপতি বা মঙ্গল্যার বিচরণ। আর প্রস্থ বরাবর সারিগুলো বা রেখা ধাইরগুলোকে পাতাইল কোট বলা হয়। সারি বা রেখার শেষে গোলাকার চক্রগুলোকে কুণ্ডা বলা হয়। মঞ্জল খেলা বা দাড়িয়াবান্ধা খেলার জন্য প্রয়োজন সমতল ভূমি। জমিতে কোদাল দিয়ে লাইন কেটে কিংবা চুন ঢেলে দাগ দিয়ে নিতে হয়। এই জায়গাকে লম্বাভাবে সমান্তরাল দুটি রেখা দিয়ে ও সীমারেখা বিভক্ত করতে হয়। সমান্তারাল রেখার মধ্যে অন্তত একহাত জায়গা থাকতে হবে যাতে পা না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি। অন্যান্য ঘরেও খেলোয়াড়ের দাঁড়ানোর জন্য কমপক্ষে একহাত পরিমাণ জায়গায় লাইন থাকবে, সেখানেও একই লক্ষ্য দাগে যাতে পা না পড়ে। যেহেতু এ খেলায় ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার আছে। সেজন্য কোনো খেলোয়াড় যদি ছোঁয়া বাঁচিয়ে সব ঘর ঘুরে এসে উপরের ধাইর পার হতে পারে তবে তার পক্ষের খেলোয়াড় ১ ডেইল বা ১ পয়েন্ট পায়। উল্লেখ্য, যারা প্রথমে খেলার সুযোগ পায়, সে-সুযোগকে বলা হয় 'লাম'। ডেইল বা পয়েন্ট পেলে তাদের দখলে থাকে। 'লাম' কিন্তু সব ঘর ঘুরে আসার সময় বিপক্ষদলের খেলোয়াড় যদি ধাইর পার হতে ছুঁয়ে ফেলে বা স্পর্শ করে অথবা মঙ্গল্যা যদি যে-কোনো ধাইর থেকে লাফিয়ে ছুঁয়ে ফেলে তাহলে ১ম পক্ষ লাম হারায় ২য় পক্ষের লামের সুযোগ পায়। এভাবে খেলা চলতে থাকে সবাই ঘর ঘুরে আসার ওপর খেলার ফলাফল নির্ভর করে। একজনের অসর্তকতা বা অক্ষমতা গোটা দলকেই লাম হারিয়ে বিপক্ষদলের ভূমিকায় নামতে হয়।"[৭]

তিনজন খেলোয়াড় অসতর্ক অবস্থায় একখণ্ডে ঢুকে পড়লে 'তিনগুলা' হয়ে যায়। তিনগুলা হলে দল ভেঙে দিতে হয়ে। বিশেষ করে তিনগুলা শব্দটি এই খেলায় ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং তা এখান থেকেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। 'তিনগুলা' অর্থ বিশৃংখলা। তিনগুলা শব্দটি এখান থেকেই উৎসারিত বলে মনে করা হয়।

## ৭. গোল্লাছুট

সারাদেশে এ খেলাটি গোল্লাছুট খেলা নামে পরিচিতি হলেও এ অঞ্চলে এ খেলাটির নাম মইয়া খেলা। ধান মাড়াইয়ের সময় একটি লম্বা রশি দিয়ে গরুর গলায় পরস্পর বাঁধা হলেও প্রথম গরুটি খুঁটিতে বাঁধা হয়। এ খুঁটিটিকে মইয়া বলে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা সনাতন পদ্ধতির ধান মাড়াইকে 'ধান হুরানি' বলা হয়। আর ধান ওরানির কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত মইয়া। মইয়া হচ্ছে মূলত কেন্দ্রবিন্দু। অনেক সময় ধান মাড়াই করার সময় গরু যাতে এক জায়গায় থকে সেজন্য কাঠের বা বাঁশের খুঁটি পোঁতা হয়। ধান মাড়াই করতে করতে গরু একই জায়গাকে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে কোনো

একসময় ধান ওরানির খোলা থেকে নেমে যায়। সে কারণে মইয়ার সাথে গরুকে রশি দিয়ে আটকিয়ে রাখা হয়। প্রধানত খুঁটির মতো এ খেলায় পক্ষে একজন করে মূল দলপতি থাকে। তাকে মুইল্যা বা বচ্ছাফ (দলপতি) বলে। অপরপক্ষেও একজন 'বচ্ছাফ' বা দলপতি বা মুইল্যা থাকে। সমবেত খেলোয়াড়দের মধ্যে ঐ বচ্ছাফ দুজন দুদিকে দাঁড়ায় এবং কয়েক জোড়া খেলোয়াড় গলা ধরাধরি করে বচ্ছাফ দু'জন দুদিক দাঁড়ায়। তারা তখনও জানে না কে কোন দলে খেলবে। দলপতি ও ইচ্ছেমতো ভালো ছাফ বা খেলোয়াড়কে নিজ দলে নিতে পারবে না। এরপর জোড়া জোড়া ছাফ কিছু দূরে গিয়ে নিজেদের নাম পরিয়ে মুইল্যার কাছে এসে হাঁক দেয়, কে নেবে চাঁদ? কে নেবে তারা। তখন যার নাম চাঁদ সে চাঁদকে ডাকার দিকে যায়। আরেকজন তারা ডাকের দিকে। এ ডাকাডাকিতে কোনো পক্ষপাতিত্ব হতে পারে না। এ খেলার জন্য খোলা জায়গা ভালো। খেলোয়াড়ের সংখ্যানুপাতে দল ছোট-বড় হয়।

**যেভাবে খেলতে হয় :** একটা ছোট গর্ত খেলার কেন্দ্রীয় সীমানা। ৫০/৬০ হাত দূরে ইট বা পাথর কিংবা কোনো গাছ বাইরের সীমানা হিসাবে নির্ধারিত হয়। গর্তে একটি কাঠি থাকে তাকে কোণ্ডা বা গোলা বলে। কোণ্ডা বা গোলা থেকে ছুটে গিয়ে বাইরের সীমানার ইট বা পাথর বা পাথর বা গাছ ছোঁয়াই হলো এ খেলার মূল লক্ষ্য। যে-পক্ষ দান পায়, তারা গর্তের কোণ্ডা বা গোলা ছুঁয়ে দাঁড়ায়। স্বপক্ষের ছাফ বা খেলোয়াড়েরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে লম্বা হয়ে মুইল্যাকে ধরে ঘুরতে থাকে। বিপক্ষের ছাফ বা খেলোয়াড়েরা সুবিধামতো যে যার স্থান নিয়ে উঁৎপেতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে মূল থেকে যার হাত ছুটে যাবে সে দ্রুত দৌড়ে যাবে দূরের সীমানা ছুঁতে। বিপক্ষদলের তখন লক্ষ্য থাকে, সীমানায় পৌঁছে যাবার আগেই যাতে তাকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে। আর ছুঁয়ে ফেললেই সে মরে যায় অর্থাৎ সে খেলায় হেরে গেলো। সে খেলার প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়বে। দৌড়ের কোনো নিয়ম নেই, এঁকে বেঁকে যেভাবে হোক গা বাঁচিয়ে কৌশলে শেষ সীমানায় পৌঁছানোই তার লক্ষ্য। এভাবে একের পর এক ছুটতে থাকে। এ সময় গর্ত ছুঁয়ে থাকা খেলোয়াড় বা দলপতিকে ছোঁয়া যায় না। আর ছুঁলে সে মরে যায় না। কিন্তু তাকেও একসময় ছুটতেই হয়। যারা সফল হয় তারা কোণ্ডা বা গোলা থেকে জোড়া পায়ে একটা লাফ দেয় সীমানার দিকে। সব লাফ মিলিয়ে উক্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেই এক 'ঘাচ' হয়। না পারলে অথবা স্পর্শদোষে মারা পড়লে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়রা দান পাবে। 'ঘাচ' অনুযায়ী জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়। 'ঘাচ' হচ্ছে খেলার পয়েন্ট। এ খেলাটিও অধুনা বিলুপ্ত।"[৮]

## ৮. বলী খেলা

প্রাচীনকালে বৈশাখি মেলার সাথে বলী খেলা ছিল এ অঞ্চলের সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। বৈশাখিমেলার পাশাপাশি বলী খেলা লোকজনকে দিতো নির্মল আনন্দ। লোকজন প্রচণ্ড উত্তেজনা চেপে রেখে বলী খেলা উপভোগ করতো। বড় বড় বলী বা কুস্তিগিরের জন্য নির্ধারিত থাকতো বাদকদল।

www.pathagar.com

মাঠের অভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠ বলী যখন নাচতো তখন অনেকেই মনের আনন্দে শ্রেষ্ঠ বলীকে ১০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত উপহার দিতো। এমনকি ৫শ টাকা পর্যন্ত উপহার দেওয়ার নজির আছে। কয়েক দশক আগে ৫শ টাকার মান ছিল অনেক। যদিওবা বলী বা কুস্তিগীর নাচ শেষে অনেক সময় টাকা ফেরৎ দিতো, আবার কোনো কোনো বলী টাকা ফেরৎ দিতো না। বলীর নাচ দেখে 'তুলা রাশির' জাতকের লোকজন এ সময় নিজেকে ধরে রাখতে পারতো না। ফলে বলীর পেছনে পেছনে তারাও নাচ শুরু করতো।

আগে যেমন আসতো বাংলা নববর্ষ, হতো বৈশাখি মেলা, বলী খেলা। এর ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে এখনো আসে বাংলা নববর্ষ। বসে বৈশাখি মেলা, হয় বলী খেলা। কিন্তু বর্তমানের বৈশাখি মেলা ও বলী খেলায় এসেছে অনেক পরিবর্তন।

বর্তমানে বলী খেলা ও মেলায় পূর্বের চারুশিল্পের স্থলে প্লাস্টিকের সামগ্রী, কাঁচের চুঁড়ির স্থান দখল করে নিয়েছে ইমিটেশনের সামগ্রী। অপরদিকে বলী খেলার নামে হচ্ছে জুয়া এবং রাতে হয় পেশাদার নর্তকীর উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ নৃত্য। বিশেষ করে প্রশাসনিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ে থেকে ও রাজনৈতিক সুবিধা নিয়ে এক শ্রেণির অর্থলোভী পেশাদার লোকজন বলী খেলায় জুয়ার আসর এবং নর্তকীর নৃত্যের আসর বসিয়ে গ্রামের সাধারণ লোকজনের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে।

*কক্সবাজারের ঐতিহ্যবাহি বলি খেলা*

www.pathagar.com

জুয়া খেলতে গিয়ে গ্রামের উঠতি তরুণ ও যুবক সম্প্রদায় বাড়ি-ঘরে চুরি-ডাকাতি পর্যন্ত করছে।

জেলার সর্বত্র বৈশাখ মাস আসলেই বলী খেলার আয়োজন করতো। জেলার সর্বত্র বলী খেলা ও বৈশাখি মেলা উপলক্ষে নির্দিষ্ট স্থানকে সাজানো হতো রঙিন কাগজ কেটে কেটে চিকন রশি বা তারে আটকিয়ে পতাকা বানিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বলী খেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় বৈশাখি মেলার। মেলায় হরেক রকমের মৃৎশিল্প সামগ্রী, হস্তশিল্প সামগ্রী, কামার-কুমারের তৈরি সামগ্রী বিপুল সমরোহে বিকিকিনি হয়। গ্রামের লোকজন তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই বৈশাখি মেলা থেকে কিনে নিতো। বলা যেতে পারে গ্রামের লোকজন প্রতিবছর অপেক্ষায় থাকতো কখন বৈশাখি মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলা থেকে বছরের প্রয়োজনিয় সমুদয় দ্রবসামগ্রী কিনে নিতো। বিশেষ করে মাটির তৈরি তৈজসপত্র, ধান-চাউল রাখার গজি, মঠকা, সুপারি ভিজাবার জন্য মঠকা, দা, ছুরি, ছরতাসহ পরিবারে যা যা প্রয়োজন তা মেলা থেকে ক্রয় করে নিত। এছাড়াও মেলায় রকমারি শুকনো নাস্তা বিক্রি করা হতো। এসব নাস্তার মধ্যে মনছুচচড়ি, গজা, গুড়ের জিলাপি, বাতাসা, তিলের নাড়ু (নাড়ুকে স্থানীয় ভাষায় লারু বলে), তিলের খাজা, চাল ভাজার নাড়ুসহ রকমারি নাস্তা বিকিকিনি হতো। নব বিবাহিত বর স্ত্রীর জন্য মেলা থেকে রকমারি খাবার নাস্তা কিনে আনতো। আবার স্ত্রী শাশুড়বাড়ি থাকলে সেখানে পাঠিয়ে দিত। অথবা নিজে রকমারি নাস্তা নিয়ে শাশুড় বাড়ি বেড়াতে যেতো। বুড়োরা বাড়ির শিশুদের জন্য আনতো নাস্তা, খেলনা। মাটির তৈরি বিভিন্ন প্রকারের খেলনা এর মধ্যে পাওয়া যেতো। বিশেষ করে খেলনার মধ্যে ঘোড়া, বিভিন্ন রান্নাবাটি সামগ্রী।

জেলায় কখন থেকে বৈশাখি মেলা শুরু হয়েছে একথা স্পষ্ট করে বলা যাবে না। তবে জেলার প্রতিটি গ্রামেই বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বলী খেলা ও মেলার আয়োজন থাকতো। কক্সবাজারের সবচেয়ে বড় বলী খেলা ও মেলার আয়োজন হয় জেলা-সদরের স্টেডিয়ামে। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের বলী খেলা ও মেলার আয়োজন প্রায় শতাব্দী কাল ধরে। জেলা প্রশাসকের বলী খেলাকে স্থানীয়ভাবে ডিসি'র বলী খেলা বলা হয়। ১৯৮৪ সাল থেকে জেলা প্রশাসকের নামেই এই বলী খেলা ও মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। কক্সবাজার জেলায় উন্নীত হওয়ার পূর্বে মহকুমা প্রশাসকের নামেই বলী খেলা ও মেলার আয়োজন হতো। মহকুমা প্রশাসকের নামে চালু করা বলী খেলা ও মেলা 'এসডিও'র বলী খেলা' বলে স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের নামে প্রচলিত বলী খেলা ও এসডিও'র নামে প্রচলিত বলী খেলা ও বৈশাখি মেলা বর্তমানে অর্ধ শতাব্দী পেরিয়ে সাত দশকে পা দিয়েছে। কক্সবাজার মহকুমা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে ১৮৫৪ সালে। ঠিক একশত বছর পরে ১৯৫৪ সালেই কক্সবাজারের মহকুমা প্রশাসকের বলী খেলা ও বৈশাখি মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মূলত জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বলী তথা কুস্তিগিরদের সম্মিলন ঘটানোর জন্যই জেলা প্রশাসক বা তার পূর্ববর্তী মহকুমা প্রশাসকের বলী খেলার প্রবর্তন। শুধু তাই নয়, ডিসি'র বলী খেলায় প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ থেকেও কুস্তিগিরেরা অংশগ্রহণ করে থাকে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দু'দেশের

www.pathagar.com

সীমান্ত সমস্যা, আরাকানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর মায়ানমার সরকারের নির্যাতন, নিপীড়ন, পৈত্রিক ভিটা বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার ফলে রোহিঙ্গা ও রাখাইন কুস্তিগিরেরা ডিসি'র বলী খেলায় অংশ নিতে আসতে পারছে না। ডিসি'র বলী খেলায় জেলার শ্রেষ্ঠ বলী তথা কুস্তিগিরকে সম্মানিত করা হয় শ্রেষ্ঠ পুরষ্কারের মাধ্যমে। ফলে জেলা প্রশাসকের বলী খেলাই জেলার বলী বা কুস্তিগিরদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার আদর্শ স্থান। অপরদিকে সুদূর চট্টগ্রামের লালদিঘিতে আয়োজিত শতাব্দী প্রাচীন বলী খেলা ও মেলা বৃহত্তর চট্টগ্রামের বলী তথা কুস্তিগিরদের তীর্থস্থান। শতাব্দীকাল পূর্বে চট্টগ্রামের বলী খেলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জনৈক জব্বার বলী। ফলে চট্টগ্রামের বলী খেলা তার নামেই প্রচলিত হয়েছে 'জব্বারের বলী খেলা।'

কক্সবাজারের ডিসি'র বলী খেলা ও বৈশাখি মেলাতে জেলার অন্যান্য স্থানের গ্রামীণ মেলার ন্যায় রকমারি পণ্য-সামগ্রী বিকিকিনি হয়। তবে মেলায় শিশুদের আনন্দদানের জন্য রাখা হয় নাগরদোলা। গ্রামীণ মেলার প্রধান ও অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে শিশুদের জন্য নাগরদোলা। নাগরদোলা ছাড়া কেনো মেলা জমে না। ফলে বর্তমানেও যে কোনো মেলাতেই নাগরদোলা অপরিহার্য। সেই মেলা শহরে হোক কিম্বা গ্রামে হোক।

বলী খেলা আরাকান থেকে এসেছে বলে প্রবীণদের ধারণা। আরাকানে বলী খেলার প্রচলন অনেক পূর্ব থেকেই। পূর্বে বলেছি বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার আরাকানের অধীন ছিল। সে-কারণেই বৃহত্তম চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে বলী খেলার প্রচলন বেশি।"[১৬]

## ৯. অন্যান্য লোকক্রীড়া

এসব খেলা ছাড়াও জেলার শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী ও যুবাদের মধ্যে খেলাধুলার কমতি নেই। আবার কোনো কোনো খেলাধুলার মধ্যে ছড়া কাটা হয়। এধরনের সমৃদ্ধ শিশুতোষ একটি খেলা হচ্ছে 'এলম পাট ডেলম পাট' বা 'ইচিবিছি' খেলা। জেলার প্রায় প্রতিটি জনপদে এ খেলাটি প্রচলিত। 'এলমপাট ডেলমপাট' খেলাটি শিশু-কিশোরেরা একান্ত মনে আনন্দের সাথে খেলে থাকে। খেলার সময় শিশুরা নিচের ছড়াসমূহ শব্দ করে উচ্চারণ করে। তিন থেকে চারজন ছেলে-মেয়ে বৃত্তাকার হয়ে মাটিতে বসে প্রত্যেকে হাত দুটি সরাসরি মাটিতে সংস্থাপন করে রাখে। তারপর প্রথমে কোনো একজন অন্য একজনের হাত ছুঁয়ে ছড়া কাটা শুরু করে।

**ক. বাক্কুম বাক্কুম ক্কিয়ারা**
মুইষে ভাইংগে টিয়ারা
মুইষ মাইত্ত গেইলামরে
কেড়া ফুঁড়ি মইলামরে
ভ'ঝিরে ভ'ঝি চুরা দুপ্
চুরাত কিয়া ধান?

www.pathagar.com

চুলত ধরি আন
চুল কিয়া কালা
নাক কাঁড়ি ফেলা
নাকত কিয়া লউ?
বর ভাইয়র বউ।
বর ভাই বর ভাই গজ্জনগাছ তলে
ছোডভাই গিয়ে তেতইগাছ তলে
বা'শ্যার ঝিয়র লাম্বা চুল
মেইলতে মেইলতে চাম্‌বা ফুল।
চাম্‌বা ফুলত্‌ তলে
দুওয়া মানিক জ্বলে
দুওয়া মানিক ধইত্ত গেইলে
হাঁপে চত্তর ধরে
এলমপাক, ডেলমপাক
কাঁড়ি ফেলা সোনার হাত॥"[১]

যেখানে বা যার হাতে এসে ছড়া কাটা শেষ হয় সেই হাতটি কাটা যায়। কাটা যায় অর্থে দা দিয়ে কাটা নয়। সে খেলার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। সে খেলায় পরাজিত। ফলে কাটা হাতটি তুলে নিতে হয়। তাকে প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে হয়।

খেলা এভাবে চলতে থাকে এবং ছড়া পাঠও চলতে থাকে। এভাবে ছড়া আওড়ানোর মাধ্যমে হাতগুলো একটির পর একটি কাটা হয়। সব শেষে যার একটি হাত থেকে যায়, সে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়। যে বিজয়ী হয় সবাই তালি বাজিয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়। অভিনন্দন বলতে সবাই আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়।

নিছক আনন্দের জন্য শিশুতোষ এই খেলা। এতে জয় পরাজয়ের কোনো সুযোগ নেই। শিশুরা এ খেলার মধ্য দিয়ে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। প্রাচীনকালে গ্রামে শিশুদের বিনোদনের কোনো মাধ্যম ছিল না বলেই বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে শিশুরা আনন্দ উপভোগ এবং বিনোদন লাভের চেষ্টা করতো। নিচে অপরাপর ছড়াগুলো লিপিবদ্ধ করা হলো।

**খ. ইচি বিচি দুই ভাই কেচি**
দুই ভাই গিয়ে পাইক মাইত্‌ত
পাইক মারাত্তু আইতে
ছাতির তলে বইতে
ছাতির তলে জওরা (কাল নাগিনী) হাঁপ
ফালদি উড়ের বউয়র বাপ
এলমপাক ডেলমপাক
কাড়ি ফেলা সোনার হাত॥

www.pathagar.com

**গ. ইচি বিচি চাম চেকি**
চামর আগা মষণ্ডু
ঢেঁই গেইয়ে ডবণ্ডু
ডবণ্ডুর হারিকুরী ভাই
খাইতঅ বইস্যে
ভাতত পইয্যে মাছি
কোদাল দি দি আঁছি
কোদাল ত ভোতা
কন্ ছুরির মাথা
এলমপাক ডেলমপাক
কাঁড়ি ফেলা সোনার হাত॥

**ঘ. ইচি বিচি খাইমর দ্বারা**
খাইম গেইয়ে দে বোয়াল পারা
বোয়াল কন্দে টিং টিং
তিন টিয়াদি ঘোড়া কিন্
ঘোড়া গেইয়ে উত্তরে
গইর ফুড়েদ্দে ভুতরে
হাতির ট্যাংয়ে বেরা ভাংগে
কাউয়ার ট্যাংয়ে চইল চালে
চইল চালনি ঘরত নাই
খাজনা দিত মনত নাই
এ ঘড়ি বেঘড়ি পেয়ালা কাজী
আইজ্জানি মা'র বলকিছা
অবলকিছ অবলকিছ উঠ
তিন্নোয়া বাইয়ন কুট
এলমপাক ডেলমপাক
কাঁড়ি ফেলা সোনার হাত॥

এরপর নিম্নরূপে খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথমজন এবং দ্বিতীয় আরেকজনের মধ্যে কথা হবে-

**ঙ. তর হাত কড়ে?**
বিলাইয়ে নিয়ে।
বিলাই কড়ে?
পুরি ফেলাইয়ী।
ছাইয়িন কড়ে?

www.pathagar.com

দইয্যাত ফেইল্লি।
দইয্যায় কি দিয়ে?
মইনা পোড়র দলা।
দলা কেন গইজ্জছ?
ধান দ'ইল্যারে দিয়ি।
ধান দইল্যা কি দিয়ে?
ধানর ছরা।
ধানর ছরা কেন গইজ্যছ?
কুইজ্জাত দিয়ি।
কুইজ্যা কি দিয়ে?
খের দিয়ে।
খের কেন গইজ্যছ?
পুরি ফেলাইয়ী।
ছাইগিন কড়ে?
কোড়াত দিয়ি।
কোড়ায় কি দিয়ে?
জালা দিয়ে।
জালাগিন কেন গইজ্যছ?
জমিনত রূইয়ি।"[১০]

এভাবেই শেষ হয়ে যায় ইচিবিচি খেলা। খেলা শেষ হলে সবাই মিলে করতালি দিয়ে চলে যায়।

**চ. হাট্টা খেলা :** ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মুখে ছড়া কেটে লাফিয়ে লাফিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যায়। হাতে থাকে করলি (ছোট ছোট নুড়ি পাথর)। করলি পায়ের আঙ্গুলে চেপে লাফিয়ে নিক্ষেপ করে এবং যে ঘরে পড়ে সে ঘরের শেষ দাগে পড়লে প্রথম খেলোয়াড় আউট (প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে) হয়ে যায়। এভাবে সব খেলোয়াড় আউট হয়ে গেলে খেলায় জয়-পরাজয় নিয়ে সমাপ্তি ঘটে।

১. ইক্কিনি ইক্কিনি করলি
ধইয্যা কে'নে পারালি
ধইয্যার মাঝে তিন্নান ঘর
হিয়ানর মাঝতত্তি টইনর ঘর
টইনর ঘরগান্ দেইয়া
বউ আইলাম জুরিয়া
বউর নাম কি? ছুরতি।

ছিঁ ছিঁ অথবা হা ডু ডু খেলার সময় বৈলা পক্ষের খেলোয়াড় নিম্নের যে-কোনো একটি ছড়া আউড়িয়ে একবারে নিঃশ্বাস না ফেলে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের তাড়া করে।

www.pathagar.com

নিঃশ্বাস না ফেলে ধাবমান (তাড়িত) খেলোয়াড়কে ছুঁতে পারলে তাড়িত খেলোয়াড় মারা (এখানে মারা যাওয়া অর্থে পরাজিত হওয়া) যায়। আবার প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের দমবন্ধ হয়ে (শ্বাস ফেলা) নতুন করে শ্বাস নিয়ে তার স্বপক্ষীয় খেলোয়াড় তাকে ছুঁতে পারলে তাড়ক মারা যায়। খেলায় সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। এক পক্ষের সব খেলোয়াড় মারা (পরাজিত হলে) পড়লে অপরপক্ষ নতুন করে খেলতে আসে এবং তাদের পক্ষের খেলোয়াড় ছোঁয়ার বাইরে থাকলে তারা বিজয় লাভ করে। এভাবে খেলার মধ্য দিয়ে জয়-পরাজয় নিশ্চিত হয়।

২.
তর দেশত গেইলাম রে
তরে ন ডরাই
তর বাপর ফাড়া গদা লই
তরে দুরাই তরে দুরাই॥

৩.
হাড়ে গাড়ে পচা দই
দাউর্গ্যা চোরাইয়ার বাড়ি কৈ, বাড়ি কৈ?

৪.
চিঁ চিঁ পাতা ভোঁ ভোঁ ডাল
খাদে গোলার বিচি কিয়া লাল
বিচি কিয়া লাল?

৫.
তিন তের দিয়া বার,
ন দিয়া পুরণ গরঅ
আঁর সোয়ামীর এই নাম
পারগরাইদে ঘরজ্জাম ঘরজ্জাম।

৬.
শাখ বাছি শাখ লইয়ে
জাইদ কদুর আগা
নেক বাছি নেক লইয়ে
তিল্লুক বাহা, তিল্লুক বাহা।

৭.
উত্তরে গেইলাম কি দেইলাম
তাল গাছের আঁতি
কাইল্যা বেইন্যা তরে ডাইক্যম
জুতা চোরার নাতি... নাতি... নাতি।

৮.
বদুর বউয়র কদু, শারীর বউয়র তেল

www.pathagar.com

এত বড় কদু কেনে বদুর পেড়ত গেল ।
বদুর পেড়র গেল ... ।
৯.
এক বিয়ইত্তা মনুর বাপ দুই বিয়ইত্তা দাঁড়ি
আইয়ের লে মনুর বাপ দাঁড়ি লারি লারি ।
দাঁড়ি লারি লারি ... ।
১০.
হাঁসর বদা কুরার ওম
পরর পোয়া লই নাতুম তুম ।
নাতুম তুম ... ।
১১.
তারে এরি তারে ধর
লামার চাইন্দা বাইগ্যারে ধর॥
বাইগ্যারে ধর ... ॥
১২.
এত্ কেরানি বেত্ কেরানি
কেলার ডওগ
তোলের পানি
দেউচ্ছা উরের চাক চাক ।
দেউচ্ছা উরের চাক চাক ... ।"[১১]

**ছ. টঅনি খেলা** : চার থেকে পাঁচজন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে বৃত্তাকার হয়ে বসে পড়বে। একজন দলনেতা নির্বাচিত করে হাতে একটি লম্বা কাঠি নিয়ে বলবে, হাতে টানবে না দাঁতে টানবে? সবাই বলবে, দাঁতে টানবে। তারপরে একজনের পর একজন ঐ কাঠি দাঁতে টানবে। শেষে যে টানবে সে হবে কাক। তারপর দলনেতা ছোট কাঠি নিয়ে নিচের ছড়াটি আওড়িয়ে আওড়িয়ে যে-কোনো একজনের হাতে কেউ না দেখে মতো কাঠিটি ঢুকিয়ে দেবে। তারপর কাককে জিজ্ঞাসা করবে, কাঠিটি কার কাছে? যার কাছে কাঠি আছে তাকে কাক ধরতে পারলে কাঠিওয়ালা মারা (এখানে 'মারা যাবে' অর্থ পরাজিত হওয়া) যাবে। এভাবে সবাই মরে গেলে খেলা শেষ। ছড়াটি নিম্নরূপ:

০১.
অঁ-নী ভাইয়র ট-নী
হাওরগ্যা গাছর ব-নী
আঁরে কাওয়া আঁ-রে যা
মা'র কাওয়া দুধ ভাত খাঁ
লেইখ্যা পুইছ্যা সাত মেড়ির কুঁইচ্ছ্যা
কাত্তু আছে কাত্তু নাই
কই দেরে কাওয়া ।

www.pathagar.com

০২.
ঝি ঝি ঝিওলা
বুড়ির মাথাত পিয়ালা
বুড়ি গেইয়ে আ'রে ঘা'ড়ে
ঘুইন্যা পোগে দুয়ার কাড়ে
কান ফুরুস ...
০৩.
দুধারে দুধা
দুধ কিয়া ন'দর
বাঘর ডরে।
বাঘে কি গ'রে
মারে ধরে।
বাঘর নাম কি নাম?
ওঁয়ালা।
গাছে গাছে বুলা
এগ্গা ফুরুৎ টাণ্ডার মা।
০৪.
অ'পুতু অ'পুতু তর মা কড়ে
তর মা তরে দেইত ন পারে
চিক্কুর চিক্কুর চিন্দা মারে।
০৫.
প'থর মিইক্যা চাইতে চাইতে
চক্ষুন গইল্যাম খোঁয়া
উ'তরত্তুন নকিয়া আইয়ের
মর পরানর সোয়া।
০৬.
আব্বাইচ্যার ভাঙ্গা ঘর
টেং গলাই দি দি বগা ধর।"[১২]

**জ. তুমব্রু খেলা :** এ খেলাটি লোকজ ঐতিহ্যবাহী খেলা হলেও মূলত যাদুমন্ত্রের প্রভাবে চালিত। বিশেষ করে কোনো স্থানে অনুষ্ঠেয় বলী খেলার মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে লোক জমায়েত করার উদ্দেশ্যে তুমব্রু খেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। দুইজন বৈদ্য বা তান্ত্রিক যাদুকর তুমব্রু খেলার প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। উভয়ের মধ্যে কম করে হলেও ৮/১০টি খেলা দেখানোর কথা হয়। এ খেলায় একজন অপরজনকে মন্ত্রফুঁকে বাণ মারে। কুত্তাবাণ, বাঘাবান, কুমির বাণ, শুয়রবাণ, মাছবাণ, ভালুকবাণ ইত্যাদি জন্তু বিষয়ক বাণ মারে। কুত্তা বাণ মারলেই অপরজন ঘেউ ঘেউ

www.pathagar.com

করে কুকুরের মতো আওয়াজ করতে থাকে এবং কামড়াতে তেড়ে আসে। বানরবাণ মারলে বানরের মতো আচরণ করে এবং বানরের মতো গাছের ডালে ডালে বসে লাফালাফি করে। অর্থাৎ যে জীব জানোয়ারের বাণ মারে সে অনুরূপ-জীব-জানোয়ারের মতো আচরণ করতে থাকে। প্রথমজনের বাণ মারা অকার্যকর হয়ে গেলে বা বাণ কেটে ফেলতে সক্ষম হলে দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে অনুরূপ কুমির বাণ বা বাঘা বাণ মারে বা অনুরূপ বাণ মারতে থাকে। বাঘাবান মারলে বাঘের মতো, মাছবাণ মারলে মাছের মতো এবং যে প্রকৃতির বাণ মারে সেই প্রকৃতি দর্শকেরা প্রত্যক্ষ করে উপভোগ করতে থাকে। এভাবে বাণ কাটতে না পারলে তার পরাজয় ও দ্বিতীয়জনের জয় হয়। তুমক্রু খেলা একটি তান্ত্রিক খেলা। এখেলায় শারীরিকভাবে কষ্ট এবং আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। তাই এই খেলা সহজে অনুষ্ঠিত হয় না। অধিক টাকার লোভে তান্ত্রিক বৈদ্যরা এ খেলায় অংশ নেয়। প্রাচীন সমাজে এ খেলার ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। তবে ইদানীং কদাচিৎ আয়োজন হয়ে থাকে বলী খেলায়।"[১৩]

**ঋ. লুককেলানি বা লুকোচুরি খেলা :** লুকোচুরি খেলাকে স্থানীয়ভাবে লুককেলনি খেলা বলা হয়। এ খেলায় দল হয় দুটো। দু' দলের বেশ ক'জন খেলোয়াড় থাকতে পারে। কারা আগে লুকাবে তা ঠিক হয় লটারি বা কতাবার্তার মাধ্যমে। যে-দল লুকায় তারা গোপন স্থানে 'লো...ক...' শব্দ করে। এটিই সংকেত। এবার খোঁজে 'বের করো। এইভাবে খোঁজে সবাইকে বের করতে পারলে জিতে যায় সন্ধানী দল। এ খেলাটি শুধু গ্রামাঞ্চলে নয় প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। তবে জোছনারাতে এ খেলা খুব আনন্দদায়ক।

**ঞ. কানামাছি বা আন্ধা খেলা :** গ্রামাঞ্চলের একটি অসম্ভব প্রিয় খেলা কানামাছি। কক্সবাজারের ভাষায় আন্ধা খেলা। দলবদ্ধ এ খেলাটির শুরুতে একজন খেলোয়াড়ের দু'চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। চোখে অন্ধকার ছাড়া দেখার উপায় নেই। তার ভূমিকা কানার মতো। চারদিক থেকে অন্যান্য খেলোয়াড়েরা অন্ধ বা কানাকে ঘিরে গায়ে টোকা বা লঘু ধাক্কা দিয়ে ছড়া কাটে-

সত্য গরি ক
ঠেলা মাইজ্যে কনে
আন্ধার পুত কানাইয়া তুই
ন দেখছ কেনে?

কানার তখন চোখ বাঁধা অবস্থায় হাত বাড়িয়ে টোকামারা খেলোয়াড়টিকে ধরতে চেষ্টা করে ও ছড়া কাটে-

ধরিতে যদি পারি, ন অইব ছারাছারি
কানাই বানাই ছারি দিয়ম, ন গরিছ মস্কারি

যতক্ষণ খেলা এমনিভাবে চলতে থাকে কানা যখন একজনকে ধরতে পারে এবং চিনতে পারে কেবল তখনই সে কানার বা অন্ধের ভূমিকা থেকে মুক্তি পায়। কানা যাকে ধরে চিনতে পারে পরে সেই অন্ধের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে এবং পুনরায় নতুন করে

www.pathagar.com

খেলা খেলতে পারে। জেলার গ্রামীণ সমাজে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরী ছেলেমেয়েরা কানামাছি বা আন্ধা খেলাটি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে খেলে থাকে। খেলাটি চলমান।

**ট. ছি খেলা :** জেলার একটি প্রাচীন ও জনপ্রিয় লোকজ খেলা। পড়ন্ত বিকেলে বা জোছনা রাতে দু'দলে বিভক্ত হয়ে এ খেলাটি খেলতে হয়। উভয় দলের সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। সমতল এবং খোলা জায়গায় খেলাটি ভালো জমে। যুবক এবং কিশোরবয়সী ছেলেমেয়েরা এ খেলাটি খেলে থাকে। খেলায় কথাবার্তা বা লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় কারা ছি' বৈল বইলাবে বা আগে শুরু করবে। যারা ছি' বৈল বইলাবে তারা একটি চক্রাকার কোণ্ডে (কুণ্ডাইল) দলবদ্ধভাবে অবস্থান নেবে, এবং একজনকে রাজা বানিয়ে ৩০/৪০ হাত দূরে বসিয়ে রাখা হবে। বিপক্ষদল সুযোগ মতো দাঁড়িয়ে রাজা পাহারা দেবে যাতে রাজা বেলাকালীন অবস্থায় সুযোগ বুঝে অবস্থানরত দলের কুণ্ডায় আসতে না পারে। শুরু হয় একজন করে ছড়া কাটার মাধ্যমে দমবন্ধ করা দৌড়। ছড়া যেমন-

ইলিশ মাছের ত্রিশ কেড়া
ফাইস্যা মাছর তেল
সোনা দি মরাইয়া কইন্যা ক-ন দেশত গেল...ক-ন দেশত গেল... ক-ন দেশত গেল

অথবা
এ কাতলা বদলা দু'কাতলা শিং
শিং নাই দে বদলারে লাড়ি ভরি দিম... লাড়ি ভরি দিম... লাড়ি ভরি দিম
অথবা
এতরে বেতরে তালার আগা মুচরে
হাইনা হাপর ব'দা লই কালান্তর গোজরে... গোজরে... গোজরে
অথবা
ছি ছি পাতা ভোঁ ভোঁ ঢাল
খাদে গো'লার বীচি লাল... বীচি লাল... বীচি লাল

ইত্যাদি ছড়া কেটে কুন্ডা থেকে দৌড়ে বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের ছুঁতে ও তাড়াতে চেষ্টা করে। কাউকে ছুঁতে পারলে সে মারা পড়ে। বিপক্ষদলের সবাইকে তাড়িয়ে রাজা নিয়ে আসাই এ খেলার মূল লক্ষ্য। দম ছুঁড়ে গেলে ঐ খেলোয়াড়কে যদি এক ফাঁকে রাজা কুন্ডায় চলে আসতে পারে তখন যারা বৈলায় তারা এক ঘাছ অর্জন করে। আবার যদি রাজা চলে আসার সময় বিপক্ষদলের যে কেউ ছুঁয়ে ফেলে তখন বিপক্ষদল বৈল পায়। এভাবে খেলায় হার-জিৎ হয়। খেলাটি গ্রামাঞ্চলে কোনো রকম বেঁচে আছে। তবে আগের মতো জনপ্রিয়তা নেই। এর কারণ আধুনিক খেলাধুলার প্রসার।"[১৪]

www.pathagar.com

**ঠ. মরিচ খেলা :** পুকুরে বা নদীতেই এই খেলা খেলতে হয়। মরিচ খেলাও গ্রামের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। ছেলেমেয়েরাই মূলত এই খেলার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। পুকুরে বা নদীতে স্নান করার সময় এই খেলা খেলা হয়। হাতের শাহাদাৎ আঙ্গুলটাই মূলত খেলার মরিচ। খেলার জন্য রূপক অর্থে হাতের আঙ্গুলটকেই মরিচ হিসেবে ব্যবহার করে খেলা হয়। যেসব ছেলেমেয়ে সাঁতার জানে শুধু তাদের জন্যই এই খেলা। কারণ পানি সাঁতার কেটে, ডুব দিয়ে এই খেলা খেলতে হয়। দুই চারজন ছেলেমেয়ে থাকলে যে কোনো একজন খেলা শুরু করতে পারে। যে খেলা শুরু করবে সে পুকুরের বা নদীর পানিতে এক পর্যায়ে হাতের শাহাদাৎ আঙ্গুল উঁচু করে সবাইকে দেখিয়ে বলে উঠবে, 'ইবা কি।'

অন্য সবাই সমস্বরে বলে উঠবে, 'মরিচ।'

তখন প্রথমজন বলবে, 'এক্‌কু ডুমে ধরিচ।'

একথা বলে সে পানিতে ডুব দেবে। এখন অন্যদের কাজ হচ্ছে প্রথমজনকে খুঁজে বের করা ও তাকে ছুঁয়ে দেয়া। প্রথমজনকে ছুঁয়ে দিতে পারলে তখন সে মারা (পরাজিত হবে) যাবে। প্রথমজন চেষ্টা করবে অন্যদের ধরাছোঁয়ার বা নাগালের বাইরে থাকতে। পানিতে ডুব দিয়ে, সাঁতার কেটে সে অন্যদের নাগালের বাইরে থাকবে। এই খেলায় ভালো সাঁতার জানা খেলার প্রথম শর্ত। তাকে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন হতে হয়। কোনো সময় সে পুকুরের তলে গিয়ে পানিকে কাদাযুক্ত করে ফেলে যাতে তাকে পানির ভেতরে দেখা না যায়। খেলা এভাবেই চলতে থাকে। যতক্ষণ প্রথমজনকে ধরা বা ছোঁয়া যবে না ততক্ষণ সে খেলায় নেতৃত্ব দিয়ে যাবে। প্রথমজনকে আগে যে ছুঁতে পারবে সে পরবর্তী খেলা পরিচালনার দায়িত্ব পাবে। এভাবেই খেলা চলতে থাকে। এখানে খেলা পরিচালনাকারীকে ছুঁতে পারাটাই হচ্ছে জয়-পরাজয়। এই খেলার মাধ্যমে শিশুরা আনন্দ উপভোগ ও ব্যায়াম করার সুযোগ পায়।"[১৫]

**ড. রাখাইন খেলা :** রাখাইন সমাজে লৌকিক খেলাধুলার মধ্যে নিজেদের ভাষায় 'খ্যেৎ-ক্যাউছি-খেৎ-তেং, অং-লুং-চিং-ধেং', 'পুংনা-তারাঃ হোওয়া ধেং', 'খ্রাং-লুং-কাজেৎ-তেং', 'কোওয়েন-ছি হতেং', 'ক্রো-খুং-ধেং', 'চি-ঠো-ধেং', 'তেইং-তাক-ধেং', 'ঘং-পাউ-ধেং', ক্র-নাঃ-ক্রং লাই-তে (বিড়াল-ইঁদুর খেলা),' 'লেই-উ-প্যাউ-লো-লেই-ম্রা-হ্রা', 'তাপে-ওয়াং-মং-পেং-জাং' ইত্যাদি প্রচলিত আছে। নিম্নে কয়েকটি প্রধান খেলার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হল :

**ঢ. খেং-ক্যাউ-ছি খেলা :** বাংলা ভাষায় এ খেলাকে ডাং-গুলী খেলা বলে। দুটি দলে সমসংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। ছেলেরাই এ খেলার খেলোয়াড়। কাঠ বা গাছের ঢাল থেকে এ খেলার উপকরণ ডাং ও গুলা তৈরি করা হয়। গুলার যে-কোনো প্রান্তকে ডাং দিয়ে মৃদু স্পর্শ করার সাথে সাথেই উড়ন্ত গুলাকে জোরে মেরে দূরে পঠিয়ে দিতে চেষ্টা করে। যদি গুলাকে উড়ন্ত অবস্থায় প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা ধরে ফেলতে পারে তা হলে প্রথম খেলোয়াড় খেলায় মারা যাবে বা আউট হয়ে যাবে। যদি প্রথম খেলোয়াড় আউট না হয় তাহলে তিনি পয়েন্ট পাবেন। এখানে পয়েন্ট অর্থ ডাং-এর

www.pathagar.com

সাহায্যে দূরত্ব পরিমাপ করবে। ডাং-এর সাহায্যে দূরত্ব পরিমাপ করে নিজ দলের খেলোয়াড়দের দূরত্ব সমষ্টি করা হয়। যে দলে দূরত্ব বেশি হবে সে দল বিজয়ী হয়। বিজিত দলের খেলোয়াড়রা কান ধরে বা পিঠে ওঠে জয়ের স্বাদ গ্রহণ করে। রাখাইন গ্রামে গ্রামে এ খেলা খুব জনপ্রিয় ছিল।

**ণ. তেং-খুং-ধেং :** রাখাইন ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় ও চিত্তাকর্ষক খেলা। এ খেলাকে অনেকে জা-রাৎ-খুং-ধেং' আবার অনেকে ধং-ব্রাউ-খুং-ধেং' নামে আখ্যায়িত করে থাকে। রাখাইন অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে আজো এ খেলার প্রচলন আছে। হেলে-দুলে-হাতে-পায়ে নানা অঙ্গ ভংগিমায় খেলাটি দারুণ উপভোগ্য।

**ত. অং-লং-চিঃ-ধেং :** ছেলেদের খেলা এটি। নির্দিষ্ট দাগে দাগাঙ্কিত করে খেলার জন্য বিশেষভাবে মাঠে তারা দু'প্রান্তে মুখ ফিরিয়ে উল্টা দিকে বসে থাকে। একজন বিচারক খেলাটি পরিচালনা করেন। তাকে বলে আসতে হয় প্রতিপক্ষ দলে কে আসলে এ দল জয়ী হবে। এ খেলায় খেলোয়াড়দেরকে নিজ নামে না ডেকে ছদ্মনামে বা ভিন্ন নামে ডাকা হয়।

**থ. খ্রাং-লুং-খেলা :** বেত নির্মিত ফুটবল আকৃতি একটি হালকা বল। খেলাটি মূলত প্রতিযোগিতামূলক নয়। শরীরকে সতেজ রাখার জন্য ছেলেরা এ খেলা খেলে থাকে। বৃত্তাকার হয়ে খেলোয়াড়রা নির্দিষ্ট দূরত্বে দণ্ডায়মান থাকে। মাঝখানে একজন পঁচা খেলোয়াড় থাকে। মাটিতে স্পর্শ না করে পঁচা খেলোয়াড়টি যাতে বলটি না পায় সে রকমভাবে অন্যরা পরস্পরকে পা ও মাথার সাহায্যে আদান প্রদান করে। টেকনাফ অঞ্চলে রাখাইনদের এটি খুব জনপ্রিয় খেলা।

**দ. তাইং-তাৎ-ধেং :** ৩০ থেকে ৩৫ হাত লম্বা একটি সোজা ও মোটা বাঁশ নিতে হবে। বাঁশ নিয়ে তা তেল ও ঘি দিয়ে খুব পিচ্ছিল করে নিতে হবে। এরপরে বাঁশটি নির্দিষ্ট খেলার মাঠে পুঁতে দিতে হবে। বাঁশের শীর্ষে সোনা, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান অলংকার ও উপহার সামগ্রী আটকিয়ে রাখতে হয়। সাধারণত প্রব্রজ্যা (শ্রমণ দীক্ষা/ Novice Hood) অনুষ্ঠানোত্তর এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচুর দর্শক উপস্থিত হয়ে খেলাটি উপভোগ করে। কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ছেলেরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পালাক্রমে পুঁতে রাখা পিচ্ছিল বাঁশে আরোহণ করে বাঁশের শীর্ষে বা অগ্রভাগে আটকিয়ে রাখা সোনা, রুপাসহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। তৈল এবং ঘি দিয়ে পিচ্ছিল করা বাঁশের শীর্ষে আটকিয়ে রাখা দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে আসার প্রতিযোগী উপস্থিত সবাই উপভোগ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পিচ্ছিল বাঁশে কেউ আরোহণ করতে পারে না এবং তা আনতেও পারে না। তবে খেলা শেষে অংশগ্রহণকারী সবাইকে পুরস্কৃত করা হয়।

এছাড়াও তেঁতুলের বিচি খেলা, নিজেদের তৈরি পুতুল খেলা, নোবু হ্রুং খেলা, নানা প্রকারেরৎ কানমাছি খেলা, লুকোচুরি খেলা, সাকু খেলা, পাথরের পাঁচ গুটি খেলা, কাদামাটি দিয়ে ছোট ছোট পাত্র তৈরি করে ফোটানো, লাটিম খেলা, পাথর দিয়ে পয়সা খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, নৌকা বাইচ ইত্যাদি উল্লেখ করার মত। এককালে রাখাইন

www.pathagar.com

রমণীরা ঘিলা বিচি (এক প্রকার পাহাড়ি বিচি) নিয়ে জোছনা রাতে এক ধরনের মজাদার খেলা খেলত। মেয়েদের এ খেলা রাখাইন ভাষায় 'ধোঃ-কা-জেৎ-ধেং' নামে পিরিচিত। সমাজ ও যুগ বিবর্তনে রাখাইন লৌকিক খেলাধুলা সমূহ আজ বিলুপ্তের সম্মুখিন।

কিছু কিছু খেলা আছে খেলার সময় মুখ থেকে ছড়া আকারে আবৃত্তি করতে হয়। নিচে সে-রকম খেলার ছড়া উদ্বৃত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাখাইন ভাষায় এমন কয়েকটা বর্ণ, শব্দ ও শব্দ আছে যেটা বাঙালিরা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না।

আ ফোঃ আ ফোঃ জা তুঃ লে?<br>
সোওয়ে ঙোওয়ে তুঃ রে।<br>
সোওয়ে না ঙোওয়ে না ফা ফোঃ লাঃ?<br>
মা ফা।<br>
আফোঃ জা র মা নি রে?<br>
নেংদারা ছি র মা নি রে।<br>
নেংদারা ছি তালুং পিঃ ফো লাঃ?<br>
মা পিঃ।<br>
মাং ঘং থাৎ-মা ক্রাৎ সি,<br>
য়াক্ পা লাই,<br>
মা য়াৎ।<br>
চাঃ কা চাঃ লি, সিঃ মা পাউ ঘেঃ<br>
ভূ ভূ ভূ ভূ।

**অনুবাদ**

দাদু দাদু কি খনন কর?<br>
সোনা রূপো খনন করি।<br>
সোনার সাথে রুপোর বদল করবে কি?<br>
করবই না।<br>
দাদু তুমি থাকো কোন গ্রামে?<br>
থাকি আনারস গ্রামে।<br>
দেবে কি আনারস একটি?<br>
দেব না।<br>
তোর মাথার ওপর মুরগীর বিষ্ঠা,<br>
ফেলে দাও।<br>
দেব না।<br>
খাও তো খাও, পায়ু বুদ ফাটিও না<br>
ভূ ভূ ভূ ভূ।

www.pathagar.com

**বিবরণ :** এটি এক ধরনের দৌড় খেলা বিশেষ। একদল ছেলেমেয়ে তাদেরই একজনকে দাদু বানিয়ে এক কোণায় বসিয়ে রাখে। উপরোক্ত আবৃত্তি করার পর সবাই পালিয়ে যায়। যাকে সর্বপ্রথম বর্ণিত দাদু স্পর্শ করবে তাকেই পরবর্তীতে দাদুর ভূমিকা পালন করতে হয়। এভাবে পালাক্রমে দাদু অভিনয় করে ছেলেমেয়েরা এ খেলা উপভোগ করে মজা পায়।"[১৭]

## তথ্যনির্দেশ

১. ড. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, বাংলা একডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২১-২২।

২. সিরাজুল হক, পিতা : শাহাব মিয়া, মাতা : নীলা খাতুন, বয়স : ৬৩ বছর, গ্রাম : উয়ালাপালং ঘিলাতলী, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার। তারিখ : ০১-১০-২০১১, সময়- সকাল সাড়ে ৯টা।

৩. ধনিরাম বড়ুয়া (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, হালদারকূল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামু), পিতা : তেজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, মাতা : কেশীবালা বড়ুয়া, বয়স : ৬৮ বছর, গ্রাম : শ্রীধন পাড়া, ইউনিয়ন : ফতেখারকূল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৯-১২-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।

৪. মুহাম্মদ মুবারক আকতার, পিতা : আবদুস শুকুর, মাতা : জয়গুন বিবি, বয়স : ৬০ বছর, গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাক, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১১-১০-২০১৩, সময় : সকাল ১০টা।

৫. ধনিরাম বড়ুয়া (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, হালদারকূল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামু), পিতা : তেজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, মাতা : কেশীবালা বড়ুয়া, বয়স : ৬৮ বছর, গ্রাম : শ্রীধন পাড়া, ইউনিয়ন : ফতেখারকূল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৯-১২-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা

৬. মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, 'কক্সবাজারের বাংলা নববর্ষ : সেকাল-একাল,'- দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৫-০৪-১৯৯৫, বাংলা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা।

৭. সিরাজুল হক, পিতা : শাহাব মিয়া, মাতা : নীলা খাতুন, বয়স : ৬৩ বছর, গ্রাম : উয়ালাপালং ঘিলাতলী, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার। তারিখ : ০১-১০-২০১১, সময়- সকাল সাড়ে ৯টা।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. মুহম্মদ নূরুল ইসলাম সম্পাদিত ফেলে আসা দিন (কক্সবাজার লোকসাহিত্য পরিষদ-এর মুখপত্র), কক্সবাজারের লোক সঙ্গীত উৎসব'৮৭ উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলন, প্রকাশ : ১১ ডিসেম্বর'৮৭, পৃষ্ঠা-১৬।

১০. রেজিয়া বেগম, স্বামী : মাস্টার শাহ আলম, পিতা : ফয়েজ আহমদ বাঙ্গালী, মাতা : বিলকিছ খাতুন, বয়স : ৫০ বছর, গ্রাম : উয়ালাপালং, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০১-০৬-২০১১।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. সিরাজুল হক, পিতা : শাহাব মিয়া, মাতা : নীলা খাতুন, বয়স : ৬৩ বছর, গ্রাম : উয়ালাপালং ঘিলাতলী, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার। তারিখ : ০১-১০-২০১১, সময়- সকাল সাড়ে ৯টা।

www.pathagar.com

১৩. কবি রুহুল কদের বাবুল, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, কালারমারছড়া ইউনিযন পরিষদ, উপজেলা : মহেশখালী. জেলা : কক্সবাজার, বয়স : ৫৮ বছর, তারিখ : ১০-০৪-২০১২, সময় : সকাল-১০টা।

১৪. কবি মীজা মনোয়ার হাসান, পিতা : মোহাম্মদ সুলতান, বয়স : ৬০ বছর, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, টেকপাড়া, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার পৌর এলাকা, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৮-০৭-২০১৩, সময় : রাত ৮টা।

১৫. জাহানারা বেগম, স্বামী : আলী আযম, বয়স : ৫৪ বছর, গ্রাম : ডুমখালী মালুমঘাট, ইউনিয়ন : ডুলহাজারা, উপজেলা : চকরিয়া, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০২.১০.২০১২. সময় সকাল ১০টা।

১৬. মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, 'কক্সবাজারের বাংলা নববর্ষ : সেকাল-একাল,'- দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৫-০৪-১৯৯৫, বাংলা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা।

১৭. বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায় : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা-মং বা অং (মং বা), লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ। পৃষ্ঠা-১০৭-০১৯।

www.pathagar.com

# লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

## ক. লোকচিকিৎসা

প্রাচীনকালে জেলার চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল সেই মান্ধাতার আমলের। অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত সর্বস্তরের এবং সব ধর্মের লোকজন বৈদ্য, ওঝা ও কবিরাজে ছিল বিশ্বাসী। পাশাপাশি ভেষজ ঔষধে অভ্যস্ত ছিল। শুধু অভ্যস্ত নয়, বলা যেতে পারে বৈদ্য, ওঝা, কবিরাজের আগেই ভেষজ ঔষধের উপর নির্ভর করতো। ভেষজ ঔষধে কাজ না হলে বৈদ্য, ওঝা, কবিরাজের শরণাপন্ন হতো। সামান্য রোগবালাই সারাতে বৈদ্য ও ওঝার শরণাপন্ন হতো। পেট কামড়ালে আদার রস, কৃমির উৎপাত রোধে চুনের পানি, জ্বর হলে চিরতার পানি, কফ-কাশির জন্য বাসকপাতার রস গরম করে খাওয়াতো। ব্যথা অনুভব হলে গরম পানি ঢালতো ও অর পাতার (আখন্দপাতা) শেক দেয়া হতো। এসব ব্যবস্থা সংস্কারনির্ভর নয়, এসবের অভিজ্ঞতাপ্রসূত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। অবস্থা দেখে বৈদ্য করিবাজ-এর দ্বারস্থ হতো। কাটা ছেড়া যেমন পচা, ঘা, বাত, ফোঁড়া ইত্যাদি সারাতেন নাপিত ও বৈদ্যরা। আগেকার মানুষের মুখ থেকে শোনা যায়, নাপিত ও বৈদ্যরা কাটা ছেঁড়া তথা অপারেশনে এমনই পারদর্শী ছিল যে, পাশ করা সার্জনরাও তা করতে সাহস করতো না। বাঁশের তৈরি খুর দিয়েই নবজাতকের নাড়ি কাটা হতো। বিশেষ করে শিবা বাঁশ, মুলি বাঁশ, বরাক বাঁশের উপরের নীল অংশটি দা বা ছুরি দিয়ে তুলে নিলে তাই ধারালো ছুরির চেয়ে ভালো কাজ করে। তাছাড়াও মনে করা হয় যে, উক্ত ছুরিটি থাকে জীবাণুমুক্ত। ফলে তা দিয়েই নবজাতকের নার কাটা হয়। নার কাটার পরে ঘাস পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে নারের রক্তক্ষরণ বন্ধ করা হতো। উক্ত ছাইয়ের প্রলেপে শিশুর নারি ভাল হয়ে যেতো। কাটা-ছিঁড়ার ঔষধ হিসেবে কাঁচা পানের সাথে চিনি বা চুন মিশিয়ে পিষে রস বের করে ক্ষতস্থানে লগিয়ে দিয়ে বেঁধে দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভালো হয়ে যেতো বলে ধারণা। এছাড়াও আসাম লতা, গেদা ফুলের পাতা হাতের তালুতে পিষে রসসহ পাতা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে বেঁধে দিলে তাড়াতাড়ি ক্ষতস্থান ভালো হয়ে যায়। এসব ছাড়াও আরো অসংখ্য গাছ-লতা-পাতার রস বিভিন্ন ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হতো।"[১]

আধুনিক চিকিৎসাসুবিধার অভাবে লোকচিকিৎসার বহুল প্রচলন ছিল। মহিলাদের জ্বিন-পরী, ভূত, দৈত্য-দানবের আছর, কুদৃষ্টি, বদনজর, নজর ফেলা, বান মারা, জাদুটোনা ও পাগলের চিকিৎসা করতেন ওঝা ও বৈদ্যরা। তাদের চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল বিভিন্ন প্রকার। ওঝা বা লোকচিকিৎসক বা বৈদ্য তুলারাশির জাতকদের 'গাছা' ও 'হাট' নামের এক ধরনের লোক-চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীদের আরোগ্য করতে চেষ্টা করতেন এবং বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে ঝাঁড়-ফোঁক দিতেন। রোগীর আরোগ্যলাভের জন্য

www.pathagar.com

তারা মোমবাতি জ্বালিয়ে হাঁসের ডিম, কালো রঙের রাতাকুরা (মোরগ), দূর্বাঘাস, ফুল ও চাউল উৎসর্গ করতো। ওঝা কাঁসা বাজিয়ে ডাল (গাছা উপলক্ষে গাওয়া গীতকে ডাল বলে)-গেয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন স্তুতি গানের মাধ্যমে মা-মগিনীর নিকট আরোগ্য লাভের নিদান চাইতো। বর্তমানেও কোনো কোনো অঞ্চলে এই লোকচিকিৎসা বিদ্যমান। চালান (বিশেষ ধরনের ম্যাজিক) দিয়ে বৈদ্য-ওঝা এবং তাদের দোহারিরা ডাল গাইতো।

গ্রামের নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওলা ও শীলতা দেবীর পূজা করতো এবং তাদের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য গ্রামের কোনো এক প্রান্তে বা বড় গাছের নিচে নানা খাদ্য রেখে আসতো। মুসলমানেরাও এসব বিশ্বাস করতো এবং কুসংস্কার মানতো। অসুখ-বিসুখে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণে মুসলমানেরা সদকা দিত ও মানত করতো।

শুধু তাই নয় অসুখ এবং নানা রোগব্যাধি, চোর বা অপরাধী সনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা প্রচলন ছিল। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বশিকরণ তাবিজ-কবজ করা হতো। সুন্দরী রমণীর মন পাওয়ার জন্য, বা তার উল্টো কোনো সুপুরুষের মন পাওয়ার জন্য বা বশে আনার জন্য বা বিয়ে করার জন্য মহিলারা, শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য, শত্রুকে বশে আনার জন্য এই সব তাবিজ-কবজ তথা বশিকরণ তাবিজ দেয়া হতো।

আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা ক্রমশ জেলায় প্রসার লাভ করলে এসব লোকজ-চিকিৎসা ব্যবস্থা বিলুপ্ত হতে থাকে। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান সর্বরোগের চিকিৎসায় প্রভাব বিস্তার করলেও গ্রামাঞ্চলে কিছু মাত্রায় রয়ে গেছে হাজার বছরের সেই লোকজ-চিকিৎসা ব্যবস্থা। এসব চিকিৎসা ব্যবস্থা কুসংস্কার হলেও তা এখনো আমাদের সমাজের সাধারণ লোকজনের মধ্যে চালু রয়েছে। এসব প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থার কিছু বর্ণনা দেয়া হলো :

**১. হুইচ পরা :** সুঁইকে স্থানীয়ভাবে হুইচ বা ফুইচ বলা হয়। প্রাচীনকালে সুঁইকেও চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হতো। শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পেতে (আশ্বাসের ভিত্তিতে) 'হুইচপড়া' বা 'সুঁইপড়া' দেয়া হতো। প্রচলিত বিশ্বাস হচ্ছে যে, সুঁইপড়া শরীরে বিদ্ধ থাকলে ঐ শরীরে বন্দুকের গুলিও আঘাত করতে পারে না বা শরীরে বিদ্ধ হয় না। এমনকি কোনো যাদুকর যাদু-টোনা করে, বান (তন্ত্রমন্ত্র পড়ে বিভিন্ন ফুক দিয়ে) মেরেও ক্ষতি করতে পারবে না। এই প্রচলিত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই সুঁইপড়া পদ্ধতির চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। এটি একটি পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য চিকিৎসাপদ্ধতি। জেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকা যেখানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছেনি সেখানে এই লোকজ-চিকিৎসাব্যবস্থা এখনো বিদ্যমান।

**২. চালান :** যা চলমান তাই-ই 'চালান'। 'চালান' কক্সবাজার জেলার একটি প্রাচীনতম চিকিৎসাব্যবস্থা। অনেক রকমের 'চালান' হাজার বছর ধরে আমাদের কক্সবাজার অঞ্চলের জনপদে প্রচলিত আছে। 'চালান' হচ্ছে মূলত কোনো বস্তু বিশেষ করে লাঠি, ঘটি বা বাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালনা করা। লাঠি বা বাটি চালানের মাধ্যমে চোর বা অপরাধী সনাক্ত করাই হচ্ছে 'চালান'। অপরাধী সনাক্ত করার জন্য লাঠি বা বাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাচল করে অপরাধীকে সনাক্ত করবে। এসব চালানের মধ্যে রয়েছে লাঠি চালান, ঘটি চালান, বাটি চালান, কড়ি চালান, রশি চালান, চালপড়া, রুটি

www.pathagar.com

পড়া, হরই (সরিষা) পড়া ইত্যাদি। চোর ও অপরাধী চিহ্নিত করার জন্য বৈদ্যরা এসব চালান দিয়ে থাকে। মন্ত্র-তন্ত্র পাঠের মাধ্যমে এসব চালান দেয়া হয়। এসব চালান-এর মাধ্যমে চোর বা অপরাধীকে সনাক্ত করার রেওয়াজ জেলায় এখনো বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে এই চালানের মাধ্যমে বৈদ্য বা ওঝা বা লোকচিকিৎসকরা চোর ও অপরাধীকে সনাক্ত করে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। ফলে জনগণের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে চালানপদ্ধতি এই জনপদে স্থায়ী ভিত্তি লাভ করেছে। দেশে প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে 'চোরের আডু ঠক' (চোরের হাটু ঠক) অর্থাৎ যে চোর সবসময় তার মনের মধ্যে দুর্বলতা থাকবেই, তার পা কাঁপতে থাকে। এই চালানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, মনস্তাত্ত্বিক কারণেই চোরের মন থাকে দুর্বল। আর বৈদ্য-ওঝা ঝাড়-ফোঁক করলে এবং চালান দিলে চোরের মন আরো দুর্বল হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে সে নিজে থেকেই ধরা দেয়। এসব কারণেই প্রবাদ প্রচলিত হয়েছে, 'ঝড়ে বগা পড়ে ফকিরের কেরামতি বাড়ে'। এসব প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন জেলায় বিলুপ্ত। তবে কক্সবাজারের কোথাও কোথাও এই চিকিৎসা পদ্ধতি এখনো চালু আছে।

### ৩. গাছা

'আয়রে.... মা মগিনী আয়রে আয়
ফুলের ডালা সাজাই রাইখ্যি মা মগিনীর লাই
মা' রে আয়রে আয়।

এছাড়াও এমন ভাবে ডাল (গাছা উপলক্ষে গীত করে তাকে ডাল বলে) গেয়ে থাকে যেখানে বিভিন্ন ধর্মের দোহাই দেয়া হয়। যেমন-

আয়রে মা মগিনী আয়রে আয়,
তোর জনম গাইতে মা মোর জনম যায়।
বান্‌লরে নমঃ দূর্গা বান্‌লরে শিরে
মা মগিনীর গাছা হলে ঝরিয়া বান লরে॥
আয়রে আয় মইঘ্যার ঝি নাচন কান্ত দি'
তর নাচনে নাচে গাছা হাত টেং এরিদি
মা'রে আয়রে আয়, আয়॥'

এই মা এক অদৃশ্য শক্তি। তিনি সমস্যানাশিনী। তিনি মহা শক্তিশালী। মহা পরাক্রমশালী। উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের সব কৌশল তার জানা। মাকে বশে আনা গেলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছা সহজ। তাই-কাব্যের নন্দিত ছন্দে গ্রামীণ আদি সুরের মোহিনী ঝংকারে মাকে আহ্বান করা হয়, যেন ধরা দেন। এ হলো মানুষের আদি অবস্থার ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক-এর অবশিষ্টাংশ। সেকি অপূর্ব করুণ সুর! লহরীর পর লহরী তুলে সুরের সেই ইন্দ্রজাল যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন চারিপার্শ্বে সব মানুষের অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। এই গাছার সুর, লয়, তাল বাঙলার জনপদে প্রচলিত মেঠো সুরের মধ্যে সবচে বৈচিত্রময় এবং আকর্ষণীয়। আবহমান চট্টলার প্রত্যন্ত জনপদে এখনও এই আশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু আছে। জ্বীন পরী, ভূত, প্রেত অদৃশ্য এসব কল্পিত প্রাণীর বদনজরে পড়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য গ্রামীণ

www.pathagar.com

জনপদে এই অভিনব চিকিৎসার আয়োজন করা হয়ে থাকে। নানা গীতিকাব্যের সুর মুর্ছনায় গ্রামের ওঝা-বৈদ্য তন্ত্র-মন্ত্রের আশ্রয়ে এ চিকিৎসা করে থাকে। কক্সবাজারের আঞ্চলিক ভাষায় এ ব্যবস্থাকে 'গাছা' বলা হয়। গাছা শুধু তান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নয়, গাছা হচ্ছে এই জনপদের লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির এক অতুলনীয় ঐশ্বর্য। কোনো গৃহস্থের ষোড়শী কন্যা বা যুবতীর উপর অথবা কোনো ছেলের মাঝে পাগলামির লক্ষণ দেখা গেলে গ্রামের লোকেরা মনে করে ঐ মেয়ে বা ছেলেকে জীনে পেয়েছে অথবা ভূতে ধরেছে বা জীন ভূতের নজর ফেলেছে অথবা দুষ্ট কোনো গ্রহ তার উপর আছর করেছে বা সওয়ার হয়েছে। এজন্য সে পাগলামি শুরু করেছে। ক্রমশ এ পাগলামি বেড়ে গিয়ে যুবতী মেয়েটি আবোল-তাবোল বকছে, হাসছে আবার কখনো কাঁদছে। বাড়ি হতে বের হয়ে যাচ্ছে। কাপড়চোপড় শরীরে রাখছে না ইত্যাদি ইত্যাদি। ছেলেরাও এ ধরনের উন্মাদ হয়ে থাকে। উন্মাদ বা যাদুগ্রস্থ অথবা জ্বীন ভূত বা প্রেতে পাওয়া এসব পাগলদের নানা উন্নত চিকিৎসা করার পরও যখন ভালো করা সম্ভব হয় না, রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা তখন বাধ্য হয়ে ওঝা-বৈদ্যের শরণাপন্ন হয়ে থাকে অথবা কারো পাগলামির প্রকাশ পেলেই ওঝা-বৈদ্যের আশ্রয় নেয়। গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের চিকিৎসা প্রায়শ দেখা যায়। অনেক রোগীকে ভালো হতেও দেখা যায়। ইন্দ্রজালের উদ্ভট কাণ্ড-কীর্তনের মাধ্যমে রোগীর উপর মনস্তাত্ত্বিক যে ক্রিয়া হতো তাই আরোগ্যের কারণ বলে গণ্য করা হতো।

*গাছার আসন*

www.pathagar.com
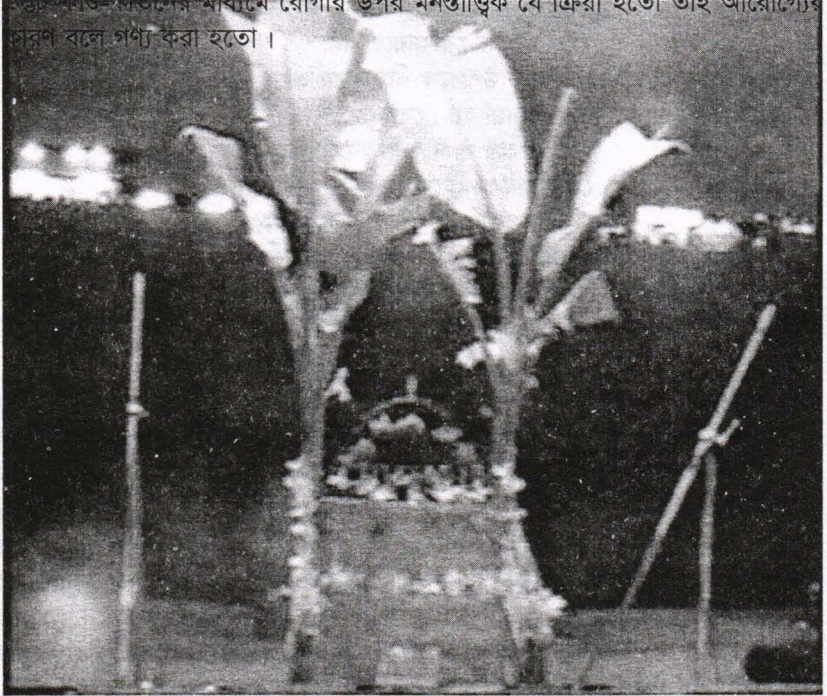
গাছার মাধ্যমে যখন চিকিৎসা শুরু হয় তখন বৈদ্য তন্ত্রমন্ত্র গাছার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলে গাছা ধীরে ধীরে আপনা-আপনি হাত-পা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নাচতে শুরু করে। বৈদ্যের তাৎক্ষণিক বান চালানো গাছা ডাল (ডাল হচ্ছে প্রাচীন লোকসংগীত) গেয়ে মা মগিনী সমস্যানাশিনী মা'কে হাজির করে। বৈদ্য এবং ক'জন দোহারিও একই সঙ্গে ডাল গায় এবং একই তালে তাল মিলিয়ে একটি পিতলের পাত্র বা বাটিতে কাঠি দিয়ে তাল এবং সুর তোলা হয়। এসময় বৈদ্য মাঝে-মধ্যে গাছার সঙ্গে কথা বলে। প্রয়োজনে অদৃশ্য কোনো প্রেতাত্মাকে কলাপাতার ডগা দিয়ে বেদম প্রহার করে। ফাঁকে ফাঁকে বৈদ্য গাছাকে লক্ষ্য করে আয়নায় কী দেখেছে জিজ্ঞেস করে এবং অদৃশ্য আত্মার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে তা শিখিয়ে দেয়। গাছা আয়না দেখে তার দেখা দৃশ্যাবালির বর্ণনা দেয়। ভয়ঙ্কর কোনো দৃশ্য দেখলে গাছা বৈদ্যকে তার ভয়ের কথা জানিয়ে দেয়। আয়নায় দৃশ্যমান দৈত্য, জ্বীন বা প্রেত বৈদ্যের চালান বা বাণ কেটে দেয় এবং বৈদ্যের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে। কোনো কোনো সময় সুনির্দিষ্ট যুবক বা যুবতীর পক্ষ থেকে বাণ মারা হলে তাদের পক্ষ থেকেও অন্যকোনো বৈদ্য দিয়ে সেই চালান বা বান কাটতে তৎপর থাকে। তবে বৈদ্যও সেই সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। চালান দিয়েই বৈদ্য ও তার দোহারিরা গাইতে শুরু করে। এসব বৈদ্য ও দোহারিরা যে গান করে তাকেই 'ডাল' বলে।

০১। গাছা নাচেল্লে বৈলগাছ তলা বৈ
নিশি রাইতে নাচের গাছা বৈদ্য ডাকম মুই।
মারে আয়রে আয় ...।

০২। ন ডরাইলে হাড়র গা'ছা ন'ডরাইছলে তুই
মা মাগিনী হাড়ত আইলে বৈদ্য আছম মুই।
মারে আয়রে আয় ...।

০৩। পরীর মাইয়া আইয়েল্‌লে ঝুড়া বাইন্দে গোল
রেঙ্গমত্‌তুন আইন্‌ন্যম তল্‌লাই সোনার কানর ফুল
মারে আয়রে আয় ...।

০৪। ঘাড়ার দুয়ারত বরই গাছত ঝুমকা ঝুমকা ফুল
নিশী রাইতত্‌ ঘুম গৈইয়ছ তুই ডালকা মারি তুল।
মারে আয়রে আয় ...।

০৫। আল্লাহ মানম, রাসূল মানম, মানম পয়গাম্বর
ত্রিশ পারা কালাম মানি লইলাম শিরের' পর
মারে আয়রে আয় ...।

০৭। আয়ের...লে... বেভোলা কাঁপে থর থর।
মুরা পা'র ভাঙ্গি আয়ের বেভোলা লস্কর।
মারে আয়রে আয় ...।

০৮। আল্লাহই দিব কুলরে মারে রসুলে দিব কুল
আল্লাহ চাইলে ফুড়াইত পারে মরা গাছত ফুল
মারে আইয়রে আয় ...।

www.pathagar.com

০৯। মইগ্যা আইয়ের খালে নালে মগিনী আইয়ের কৈ
মইগ্যার ঝি মগিনী আয়ের পিচ্ছা তুর লই
মারে আয়রে আয় ...।
১০। হাসর আন্ডা লম্বা লম্বা কুরার আন্ডা গুল
হন রাদনি রাইদ্যে চালন এক আড়ু দিয়ে ঝুল
মারে আয়রে আয় ...।
১১। ঈদগাঁরনা আমিনা বদ্য মানুষ ভালা ভাই
খুটাখালিতে নাম জাগাইয়ে ছালন বেশি খাই
মারে... আয়... আয়... আয়...
১২। ইলিম্‌মাছ কুড়ের লাম্বা লাম্বা চিরিমমাছ কুড়ের গোল
কন পেরতি রাইনধে ছালন এক আড়ু দিয়ে ঝুল
মারে... আয়.:. আয়... আয়
১৩. আয়রে মা মগিনী আয়রে আয়
ফুলের ডালা সাজাই রাইখ্যি মা মগিনীর লাই
মারে আয়রে আয় ---।

গাছার কার্যক্রম চলার সময় গাছা ও বৈদ্য পরস্পর কথোপকথনের মাধ্যমে এক বিচিত্র কল্পকাহিনির জন্ম দেয়। যা উপস্থিত মানুষকে একেবারে কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যায় এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো অভিভূত করে রাখে। মোহাচ্ছন্ন মানুষ বৈদ্যর তান্ত্রিক তালে তালে বিভোর হয়ে যায়। একসময় ভূত, প্রেত, জ্বীন বা পরী বৈদ্যের চালানে ও বানে আত্মসমর্পণ করে। বৈদ্য এ দুষ্টচক্রকে বোতলে বন্দি করে সে বোতল মাটিতে পুঁতে ফেলে। তারপর পানিপড়া (মন্ত্রপড়া পানি) অথবা তাবিজ দিয়ে জ্বীন ভুতে পাওয়া রোগীকে সুস্থ করে তোলে। এভাবে গাছার কার্যক্রমের অবসান ঘটে।

**৪. ফোঁয়ার পরা বা নজরপড়া :** কারো কু-নজর পড়া, দৃষ্টি পড়া বা বদনজর লাগাই হচ্ছে ফোঁয়ার পড়া। খাদ্যদ্রব্যের উপর কারও বদনজর বা দৃষ্টি পড়লে নজর আক্রান্ত লোকটি ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্যসহ কোনো ধরনের খাবার খেতে পারে না। যে-কোনো সুন্দর যুবক বা সুন্দরী নারীর উপর কারও নজর পড়লে ঐ পুরুষ বা নারী বিকলাঙ্গ পর্যন্ত হয়েছে এমন জনশ্রুতিও আছে গ্রামে। একইভাবে নারী-পুরুষ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন অসুখে। কোনো শিশুর উপর নজর পড়লে সে-শিশু গোঁঙাতে থাকে এবং তার শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং তাকে 'জ্বর উঠে' বলা হয়। নজর পড়া শিশুরা অনেক সময় পঙ্গু পর্যন্ত হয়ে গেছে বলে গ্রামে শোনা যায়। কোনো ফলবান বৃক্ষের উপর নজর আছে এমন কোনো মানুষের দৃষ্টি পড়লে গাছ থেকে তরতাজা ফল টপাটপ পড়ে যাওয়ার নজির আছে, এমনকি উক্ত বৃক্ষ মরে যাওয়ার নজিরও গ্রামে রয়েছে। এই নজর পড়া বা ফোঁয়ার পড়া থেকে মুক্তি পেতে ফোঁয়ার পোড়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়। এই ফোঁয়ার পোড়ার ব্যবস্থা হচ্ছে- বাড়ির চৌকোনা থেকে কিছু খড়, ঝাড়ু তথা শলার ঝাড়ুর অংশ, বাড়ির ভেতর পরিষ্কার করার ফুলেরঝাড়ু বা ফুরুইনের আগা ছেঁড়া অংশ, সামান্য লবণ ও একগণ্ডা বা একহালি শুকানো মরিচ নিয়ে ফোঁয়ার পোড়ানো হয়। সপ্তাহের প্রত্যেক দিন ফোঁয়ার পোড়ানো হয় না। নিচের মন্ত্র পড়ে

www.pathagar.com

আক্রান্তের গা মুছে সাতবার উক্ত দ্রব্যাদি দুপায়ের মধ্যে দিয়ে উনুনে বা জ্বলন্ত চুলায় ফেলে এ চিকিৎসা করা হয়।

শনিবার মন্ত্রপাঠ করে
সত্যের বাক্য লরে,
যদি ফোঁয়ার পরে খণ্ড খণ্ড হয়ে
পাতালত্ যাই পরে ...সু ... ।

এই পদ্ধতিতে আক্রান্ত রোগীরা অনেকাংশে সুস্থ হয়ে উঠে। এখনও গ্রামাঞ্চলে ফোঁয়ার পোড়ার এই পদ্ধতি চালু আছে। এছাড়াও নজর কাটার জন্য ভাত রান্না করে 'আওত' (যে পাতিল থেকে কেউ ভাত খায়নি) ভাত নিয়ে তার সাথে একটি ডিম সিদ্ধ বা মামলেট বা অমলেট করে, তরিতরকারি নিয়ে কলাপাতার উপরে (স্থানীয়ভাবে কেলার বরকের উপর নেয়া হয়। কলাপাতাকে 'বরক' বলা হয়) তিন রাস্তার মোহনায় বা চৌমুহনিতে অদৃশ্য কারো জন্য রেখে আসা হতো। রাস্তার মোহনায় রেখে আসার পূর্বে নজর কাটার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির পেটের উপর দিয়ে উক্ত খাবারগুলো আলতো মুছে নেয়া হয়। রাস্তার মোহনায় ভাত-তরকারি রেখে আসা অনেকটা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রসাদ রেখে আসার মতো। উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো 'নজর কাটার' জন্য এই প্রথা চালু আছে।

**৫. ঝাঁড়-ফুঁক :** কোনো ব্যক্তিকে বিষাক্ত কোনো পোকা-মাকড় বা সাপে কামড়ালে বা মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ঝাঁড়-ফুঁকের মাধ্যমে আরোগ্য হওয়ার চেষ্টা করা হতো। এতে অনেকেই ভালো ফল পেয়ে সুস্থ হওয়ার নজিরও আছে। আবার অনেকে মারাও গেছে। আবার অনেকেই আধুনিক চিকিৎসা নিতে চেষ্টা করে। গ্রামের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ওঝা- বৈদ্য আমপাতা বা ভেরেণ্ডা বা রেড্ডি (ভেরেণ্ডা বীচি একপ্রকার তৈলজাতীয় বীজ। এটি একটি উদ্ভিদ জাতীয় বৃক্ষ।) পাতার সাহায্যে অথবা চালপড়ার মাধ্যমে তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করে ঝাঁড়-ফুঁক দিয়ে চিকিৎসা করতো। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্প বয়সের কালো রঙ-এর মোরগ দিয়ে আক্রান্ত বা অসুস্থ রোগীকে ঝাঁড়-ফুঁক দেয়া হতো। কক্সবাজারের সর্বত্র এখনো এই প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি বা ঝাঁড়-ফুঁক চালু আছে।

**৬. তাবিজ বা কবচ :** বিভিন্ন প্রকার রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওঝা-বৈদ্য আক্রান্ত লোকজনকে (যে-কোনো বয়সের) তাবিজ বা কবচ দিয়ে থাকে। প্রত্যেক নর- নারীকে সযত্নে এসব তাবিজ-কবজ ব্যবহার করতে দেখা যায়। আরবি, মঘি (বার্মিজ ভাষাকে মঘি ভাষা বলে) ছাড়া অন্যান্য ভাষার সাংকেতিক চিহ্ন সংযোজনে তাবিজ বা কবচ লেখা হয়ে থাকে। মূলত কিছুটা আরবি জানা স্থানীয় মাওলানা তাবিজ-কবচ দিয়ে থাকে। এছাড়াও বাজারে বাংলা এবং আরবিতে লেখা বই আছে তাবিজ-কবচ করার। তাবিজি চিকিৎসা বর্তমানেও প্রচলিত আছে তবে আগের তুলনায় একেবারে কম। বর্তমানে পবিত্র কুরআনের উপর দখল আছে এমন অনেক মাওলানা কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ লিখে তাবিজ-কবচ দিয়ে থাকে। উপরোক্ত লোকজ চিকিৎসার মধ্যে আর ও রয়েছে গুনচিপড়া, ডোরাপড়া, কাছিম পড়া ইত্যাদি। কোনো প্রসূতির প্রসববেদনা হচ্ছে, মাওলানা সাহেবের কাছে ছুটে গিয়ে কাছিমপড়া এনে সন্তান

www.pathagar.com

সম্ভাবা মহিলাকে বেঁধে দেওয়ার পরে সন্তান প্রসব হওয়ার নজির আছে। তাবিজ বা কবচ ব্যবহারকারির মধ্যে মুসলিম শুধু নয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনও পিছিয়ে নেই। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মুসলিম মাওলানা বা তান্ত্রিকের কাছ থেকে তাবিজ, কবচ গ্রহণের পাশাপাশি তাদের ধর্মীয় গুরু পুরোহিতের কাছ থেকেও এসব তাবিজ, কবচ গ্রহণ করে থাকে।

**৭. গণাপরা :** কোনো কিছু হারিয়ে গেলে তা কীভাবে পাওয়া যেতে পারে, ভবিষ্যতে কী করা উচিত বা নিজের ভাগ্যে কী আছে তা দেখা হল গণা-পরা। কী রোগ হয়েছে তা জানা বা রোগ থেকে ভালো হওয়ার উপায় কী ইত্যাদি অজ্ঞাত বিষয় জানার জন্য মানুষ গণা-পরার আশ্রয় নিতো। কোনো কোনো বৈদ্য বিশেষ পদ্ধতিতে জীন হাজির করে (উপস্থিত) জীনের মাধ্যমে আক্রান্ত রোগীকে জানিয়ে দেয় তার অসুখ সম্পর্কে। ভাগ্য গণনার কাজে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের আগ্রহ বেশি। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার্য একটি গোত্রই রয়েছে যাদের পেশা ভাগ্য গণনা করা এবং নবজাতকের কোষ্ঠি প্রস্তুত করা।

**৮. পানি পরা :** বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা হিসাবে গ্রামের অল্প আরবি জানা মৌলভী, ওঝা ও বৈদ্যরা পানিপরা বা পানিপরা দিয়ে থাকে। মন্ত্র বা পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করে মাথাব্যথা, পেটকামড়ি, চোখে বালি পড়লে বা মহিলার গর্ভের সন্তান প্রসবকালে কষ্ট পেলে ইত্যাদিতে পানিপরা পান করা, পড়াপানি ছিটানো এবং কথিত অদৃশ্য জীন বা আছরে পাওয়া নর-নারীকে নির্দিষ্ট সময় পরাপানি দিয়ে গোসল করার মাধ্যমে রোগ মুক্তির চেষ্টা করা হতো। অনেক সময় দেখা গেছে কোনো মহিলা ফুঁ দেয়া পানি পান করে অতি সহজেই গর্ভের সন্তান প্রসব করেছে। পানিপরা গ্রামে সর্বরোগের মহৌষধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বিভিন্ন ধরনের রোগমুক্তির জন্য পানিপরা ছিল অপরিহার্য। বর্তমানেও গ্রামাঞ্চলে এ রেওয়াজ প্রচলিত আছে।

**৯. তেলপরা :** এটিও একটি লোকজ চিকিৎসা। হাড় মচকে গেলে, শরীরে কোথাও আঘাতজনিত কারণে ফোলে গেলে ওঝা বৈদ্যরা তেলপরা বা তৈলপড়া দেয়। খাঁটি সরিষার তেল মন্ত্র বা দোয়া-দরূদ পড়ে ফুঁ দিয়ে তেলপড়া দেয়া হয়। তেলপড়া মালিশ বিভিন্ন রোগের মহৌষধ। আঘাতজনিত স্থানে মালিশ পূর্বক এ চিকিৎসা করা হয়। প্রাচীনকালে এ চিকিৎসার ব্যাপক প্রসার থাকলেও বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে এই চিকিৎসা পদ্ধতি ক্রমে কমে যাচ্ছে।

**১০. শিরাবাণ :** প্রাচীনকালের আর এক চিকিৎসা হচ্ছে শিরাবাণ। বর্তমানে শিরাবাণ বা শিরাবন্ধ চিকিৎসা ব্যবস্থা বিলুপ্তপ্রায়। শরীরের কোনো স্থানে বিশেষ করে হাত ও পায়ে আঘাতজনিত কারণে কামড়ালে রক্ত দোষা ভেবে দূষিত রক্ত বের করে ফেলতে এ চিকিৎসার আশ্রয় নেয়া হতো। দূষিত স্থানের উপরে ছেড়াতানি (সুতলি) বান দিয়ে তাতে নতুন ব্লেড বা ধারালো ক্ষুর দিয়ে কেটে দুষিত রক্ত বের করা হতো।

**১১. ভঁঅর পোড়া :** শরীরের কোনো স্থানে ফোড়া বা টিউমার উঠলে ভঁঅর বা সুঁচালো লৌহ শলাকা বা লৌহদণ্ডকে আগুনে পুড়িয়ে লাল করে ঐ ফোঁড়ায় জ্বলন্ত লৌহশলাকা বা ভঁঅর ঢুকিয়ে দিয়ে ফোড়া গলানো হতো। বর্তমানে এ চিকিৎসা প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সুঁচালো লৌহদণ্ডকে স্থানীয়ভাবে ভঁঅর বলা হয়।

www.pathagar.com

**১২. মরিচ তেলা :** মেয়েশিশুদের কানছেদা (কানফোড়ানো বা কান ছিদ্র করা) বা নাক ছেদানি (নাক ফোড়ানো ফুরা বা নাক ছিদ্র করা) ও আঘাতজনিত ঘা শুকাতে মরিচ তেলা দেয়া হতো। শুধু তাই নয় বর্ষাকালে জমিতে চাষ দেয়ার সময় ঘরের পুরুষ মানুষের বা কামলা বা মজুরের পায়ের নখের ভেতরে মাটি ঢুকে যায়। নখের মাটি বের করার জন্য দেয়া হতো মরিচ তেলা। মরিচ তেলা পদ্ধতি হচ্ছে একটি শুকনো মরিচ নিয়ে তার বোঁটা ও দানাগুলো ফেলে দিয়ে একটি বাঁশের শলা নিয়ে মরিচটিকে গেঁথে ফেলতে হবে। এর পরে মরিচের উপরের উন্মুক্ত অংশ থেকে সরিষার তৈল দিয়ে তা আগুনে একটু গরম করে নিতে হবে যাতে মরিচটা পুড়ে না যায়। মূলত এটাকেই মরিচ তেলা বলে। এভাবে তেল গরম করে নির্দিষ্ট স্থানে বা ঘা বা আঘাত জনিত অংশে ফোঁটা ফোঁটা ফেলে চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে এই চিকিৎসা পদ্ধতিও বিলুপ্ত প্রায়।

**১৩. পাড়া বন্ করা :** প্রাচীনকালে এ জনপদের মানুষ ওলাবিবিকে অত্যন্ত ভয় পেত। ওলাবিবির আঁচড়, আছর বা ছোঁয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হেন কোনো কিছু ছিল না যা মানুষ করতে কার্পণ্য করতো না। তৎমধ্যে অন্যতম ওলাবিবি যাতে মহল্লার চৌহদ্দির মধ্যে আসতে না পারে সে জন্য 'পাড়া বন্ করা' হতো। পাড়া বন্ বা পাড়া বন্ধ করা ছিল প্রাচীন কালের একটি সামাজিক প্রথা। এতে প্রচুর আনুষ্ঠানিকতা ছিল। ওলাবিবির আগমনকে স্থানীয়ভাবে যাকে 'ওলাউঠা' বা 'গরম বিয়ারাম' বা 'কলেরা' রোগের কারণ বলে মনে করা হতো। গ্রামীণ জনজীবনে পাড়া বন্ করা ছিল 'গরম বিয়ারাম' বা কলেরা রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। প্রাচীনকালে কলেরা রোগের কোনো চিকিৎসা গ্রাম্য লোকদের জানা ছিল না। ফলে কোনো গ্রামে কলেরা শুরু হলে রাতের স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রামের অনেক লোক মারা যেতো। চিকিৎসার অভাবেই কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিতো। এই রোগে যে আক্রান্ত হতো তিনি দ্রুত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। এই রোগ মানববিনাশী ছিল বলেই এটাকে গ্রামে 'গরম বিয়ারাম' নামে আখ্যায়িত করা হতো। প্রাচীনকালে লোকজন মনে করতো 'ওলা বিবি' নামের জনৈক মহা ক্ষমতাবান মহিলা এই রোগ বহন করে নিয়ে আসতো। ওলা বিবি'র নজর যেখানে পড়তো সেখানে রেহাই ছিল না কারো। শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতি, বুড়া-বুড়ি, নির্বিশেষে কেউই এ রোগ থেকে রেহাই পেতো না। যে পাড়া বা মহল্লায় এ রোগের আগমন দেখা সে পাড়ার আর নিস্তার থাকতো না। মরার মড়ক লেগে যেতো সর্বত্র।

কিংবদন্তি আছে, 'ওলাবিবি' বা 'গলাকাটা ভূত' এ রোগের বিস্তার ঘটাতো। 'ওলাবিবি' ছিল ভয়ংকর প্রকৃতির এক নারীমূর্তি। এ নারী গভীর রাতে চলাফেরা করতো। ওলাবিবি বিভিন্ন ছদ্মবেশে বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লায় চলাফেরা করতো। এই ওলাবিবি কোনো সময় বিড়াল, কোনো সময় কুকুর বা অন্য কোনো প্রাণী বা কোনো খোঁড়া, ল্যাং মানুষের ছদ্মবেশ ধরে চলাফেরা করতো। একারণে গ্রামের মানুষের মধ্যে এক অজানা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তো। যে এলাকা দিয়ে সে গমন করতো সেই এলাকায় পরের দিন থেকে ওলাউঠা রোগ শুরু হতো এবং অকাতরে মারা যেতো এলাকার লোকজন। এ রোগে ঘন ঘন পায়খানা এবং বমি হতে থাকে এবং এটা হলো ছোঁয়াচে রোগ। এ রোগে যেই আক্রান্ত হয়েছে তাকে রক্ষা

www.pathagar.com

করার কোনো ঔষধ গ্রামের লোকের জানা ছিল না। ওঝা-বৈদ্য ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তাই চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য গ্রামের লোকজন একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে নিজেদেরকে অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দিতো। তবে প্রতিরোধ হিসেবে বেছে নিতো এই অদ্ভূত পদ্ধতি।

এলাকার লোকজন সম্মিলিতভাবে এ রোগ প্রতিহত করার উদ্যোগ নিতো। মহল্লা-র মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে গ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন মিলে মসজিদে শিরনি বা পায়েস দেয়ার ব্যবস্থা করতো। শিরনি বা পায়েস দেয়ার জন্য সকলেই দলবদ্ধভাবে রাতের বেলা নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে 'গরম বিয়ারাম' বহনকারি ওলাবিবিকে তাড়াবার জন্য এলাকার বাড়ি ওবাড়ি গিয়ে শিরনির জন্য চাল ভিক্ষা করে তা সংগ্রহ করতো।

ভিক্ষার সময় তারা সমস্বরে গেয়ে উঠতো-

'ফকির আইলামরে.... দরবেশ আইলামরে.....
আল্লাহ নবীর বাণী লই ভিক্ষা চাইলামরে।'

ভিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত দোয়া বা গান গীত হতে থাকবে। গৃহস্থ তার ঐচ্ছিক চাল দিয়ে সকলকে বিদায় করতো। ভিক্ষার চাল গ্রহণ করার পর সকলে মিলে নিম্নরূপ দরুদ স. পাঠ করতো। যেমন-

'শামসুজ্জোহা মোহাম্মদ
বদরুদদোজা মোহাম্মদ
নুরে খোদা মোহাম্মদ
ছল্লে আলা মোহাম্মদ। (কম করে হলেও তিনবার পাঠ করবে)

দরুদ শরীফ পাঠ শেষ করে তারা আবার যাত্রা করতো অন্য ঘরে। এভাবে ঘর ঘর ভিক্ষা নিয়ে যাওয়ার পথে তারা রাস্তার একপাশে দিয়ে সবাই ধীরে ধীরে হেঁটে যেতো এবং উচ্চস্বরে দরুদ গাইতো-

'ইয়া মুখলেচু ...ইয়া খাঁলেচু ...
ইয়া মালেকু ... ইয়া আল্লাহ ...

এভাবে দরুদ গাইতে গাইতে পাড়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে আল্লাহ্-রাসূল স.-এর নামখচিত লাল পতাকা পুঁতে দিতো। পাড়া বা মহল্লার চারি পার্শ্বে লাল পতাকা পুঁতে সকলেই রাতের কাজ সমাপ্ত করতো। তিনদিন বা এক সপ্তাহ পরে পবিত্র জুম্মাবারে সংগৃহীত ভিক্ষার চাল, নারিকেল, গুড় দিয়ে শিরনি বা পায়েস তৈরি করে ঐ শিরনি মসজিদে মুসল্লিদের মাঝে বিলিয়ে দিতো। যদি অবশিষ্ট থাকতো তা পাড়ার ঘরে ঘরে বিতরণ করা হতো। উল্লেখ্য, ওলাবিবি যাতে গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যই পাড়া বা মহলার চারিপার্শ্বে দোয়া লেখা লাল পতাকা পুঁতে দেয়ার মাধ্যমে পাড়া বন্ধ করার কাজ সমাপ্ত হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাটির ছোট ছোট ঢাকনার উপর বিভিন্ন দোয়া বা পবিত্র কুরআন মজিদের সূরার আয়াত লিখে তা মহল্লার চারকোণায় গাছের ঢালে আটকিয়ে দেয়া হতো। লাল পতাকাটা অনেকটা হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূলের অগ্রভাগে ত্রিকোণাকৃতির যে লাল পতাকা উড়ানো হয় দেখতে অনেকটা সে-রকম। পাশাপশি বলা যেতে পারে, মুসলমানদের কোনো মাজারে অনুরূপ পতাকা উড়াতে দেখা যায়। প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, পাড়া বন্ধ করা গেলেই 'ওলাবিবি' পাড়ায় প্রবেশ করতে পারবে না এবং গরম বিয়ারামও আনতে

www.pathagar.com

পারবে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন কলেরা বা বসন্ত বা হাআরা বা হাম ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'ওলাশীলতা দেবীর' পূজা করতো এবং তাদের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য গ্রামের একপ্রান্তে বা বট গাছের নিচে নানা প্রকারের খাদ্য-দ্রব্য রেখে আসতো। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসার বদৌলতে কলেরা প্রতিষেধক স্যালাইন আবিষ্কার হওয়ায় ঐ রোগ নির্মূল হয়ে গেছে এবং প্রচলিত 'পাড়া বন্ধ করার' কাজও বিলুপ্ত আজ।"[২]

## খ. তন্ত্রমন্ত্র

তন্ত্রমন্ত্র, যাদু, চালান, ঝাঁড়-ফুকসহ বিভিন্ন লোকজ চিকিৎসার মাধ্যমে কক্সবাজারের মানুষ নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করতো। নিরাপদ বলতে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে 'গাছা' বসিয়ে জ্বীন হাজির করে চিকিৎসা সেবা দেওয়া বা জীনকে বোতলের মধ্যে আটকিয়ে রাখার মাধ্যমে অসুস্থ তথা পাগল রোগীকে ভালো করা একটি বিচিত্র পদ্ধতি। এ চিকিৎসার জন্য প্রথমে নতুন অথবা পুরাতন একটি ডালা (কক্সবাজারের আঞ্চলিক ভাষায় কুলা) সাজানো হয়। ডালায় ৫পোয়া (১,২২৫ গ্রাম) বা ৯ পোয়া (২,২২৫ গ্রাম) চাউল রেখে তার উপরে একটি আয়না বসানো হয়। তার উপর রাখা হয় একজোড়া ডিম, সাতটি টুকটুকে লাল জবা ফুল, কয়েকটি মোমবাতি, এক বাণ্ডিল বা একগোছা দুখ্খের (দুর্বাঘাসকে স্থানীয় ভাষায় দখ্খের বলে। ঘাস বা খড়কে স্থানীয়ভাবে খের বলে) আগরবাতি, একটি ম্যাচ, একটি তেলের বোতল বা শিশি, একটি চেইন ও একটি ছুরি। এসব নিয়ে ডালা সাজিয়ে ডালাখানি কচি কলা গাছের খিলানের নিচে রাখা হয়। তারপর বৈদ্য একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বাছাই করে তার গায়ে সরিষার তেল মেখে তন্ত্রমন্ত্র পাঠকরত আয়নার দিকে লক্ষ্য করার নির্দেশ দেয় এবং হাতের মুষ্টিতে চাউল নিয়ে তাতে মন্ত্র ফুঁকে গাছার গায়ে ছুড়ে মারে। বৈদ্য যার গায়ে ফুঁ দেয় এবং চাল ছিটিয়ে মারে তাকেই মূলত 'গাছা' বলে। 'গাছা' একজন মানুষ। চিকিৎসা প্রদানের পদ্ধতির প্রধান নায়ক হিসেবে একজন মানুষকেই 'গাছা' হিসেবে সৃষ্টি করা হয়। আর এই গাছা হতে হয় তুলা রাশি জাতকের মানুষ। মন্ত্রের আছর গাছার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে ধীরে ধীরে আপনা-আপনি হাত-পা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নাচতে শুরু করে। বৈদ্যের তাৎক্ষণিক বান চালানো গাছা ডাল (ডাল হচ্ছে প্রাচীন লোকসংগীত) গেয়ে মা মগিনী সমস্যানাশিনী মা' কে হাজির করা হয়।"[৩]

**রাখাইন লোক চিকিৎসা :**"পুরাকালে রাখাইনসমাজে আয়ুর্বেদীয় বা নিজ শাস্ত্রীয় চিকিৎসার মাধ্যমে রোগমুক্ত হতো। জ্বর, পেটের পীড়া, শরীর ব্যথা, পোড়া, ক্ষত, হাত-পা কাটা ছেঁড়া ইত্যাদি ব্যাধি সারাবার জন্য গাছ-গাছালি, শিকড়-বাকড়, লতা-পাতা, ব্যবহার করত। রাখাইন সমাজে কেউ অসুখ-বিসুখে পড়লে মন্ত্রজানা লোক মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে, ধর্মীয় ভিক্ষু বা গুণীজনেরা আশীর্বাদ পড়ে ফুঁ দিলে ভালো হয়ে যায় বলে লোক বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ধর্মীয় পুরোহিত কৃর্তক মন্ত্রপড়া পানি খাওয়ালে পেড়ের পীড়া ও জীন-ভূত-প্রেতের আছর ভালো হয়ে যায়। মন্ত্রপড়া পানি বাড়িময় ছিটলে বাড়ির লোকজনের মঙ্গল হয় এবং আয় উন্নতি প্রসার ঘটে বলে মনে করা হয়। গলায় টনসিল, খাবার সময় মাছ-মাংসের কাঁটা বা হাড় গলায় আটকে গেলে কিংবা বাহু বা বগলে পিছলা হলে মন্ত্র পড়ে সারিয়ে তোলা হয়। শিশুরা হঠাৎ হঠাৎ অসুস্থ হলে

www.pathagar.com

কিংবা কোনো ব্যক্তি অস্বাভাবিক রকম আচরণ করলে ভূতে ধরেছে বলে মনে করা হয়। এ অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য একজন বয়স্ক মহিলাকে একটি ঝুড়িতে করে ভূতের উদ্দেশ্যে মাছ-মাংস, জীবন্ত মুরগী, তরতাজা ফলমূল নির্জন জায়গায় রেখে আসতে হয়। কিছু সংখ্যক রসিক লোক এসবের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। যে-মাত্র খাবার দিয়েছে পরক্ষণে তারা খেয়ে ফেলে। একটি তরবারি বা দা সাথে বহন করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে গমন ও প্রত্যার্পনের সময় উক্ত মহিলা কারো সাথে কথা বলে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মহিলাটি আসছে না ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়ির উপর হতে কাউকে নিচে নামতে দেয়া হয় না এবং কাউকে বাড়ির ওপরে উঠতে দেয়া হয় না। মহিলাটি আসলে দা দিয়ে সিঁড়িকে তিন তিন বার আঘাত করে প্রতিবার বলে 'কং ব্যেৎ লা- থা ব্যেৎ লা' অর্থাৎ ভালো হয়েছে– শান্ত হয়েছে কিনা। বলার সাথে সাথে বাড়ির ওপর থেকে একজনকে হ্যাঁ সূচক জবাব দিতে হয়।

কোনো খাবার গ্রহণের পূর্বে প্রথমে ভূত-প্রেতের উদ্দেশ্যে কিছু খাবার ফেলে দিতে হয়। রাতে ছেলেমেয়েরা বাড়ি হতে বের হবার সময় জ্বীন-ভূত-প্রেত যাতে আছর পরতে না পারে সে লক্ষ্যে বাড়ির আচ্ছাদন থেকে গোলপাতা ছিড়ে এক টুকরা তাদের কানের উপরিভাগে স্থাপন করা হয়। বদলোকদের কুনজর এড়ানোর জন্য বাচ্চাদের কোমরে সূতা নির্মিত কালো রঙের একটি বিছা পড়ানো হয়। অজগর সাপের পিত্ত খেলে শিশুদের অসুখ, কাঠবিড়ালির মাংস খেলে হাঁপানির অসুখ ভালো হয়ে যায় বলে লোক বিশ্বাস আছে। সমাজে কেউ কাউকে ক্ষতি করতে চাইলে মন্ত্রজানা লোকদের বাণ মারা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। যাকে ক্ষতি করা হবে তাঁর মাথার চুল, ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরো, স্পর্শিত মাটির তলা থেকে বালু/মাটি সংগ্রহ করা হয়। মন্ত্র পড়িয়ে, ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে প্রেমিক প্রেমিকা ও স্বামী-স্ত্রীর মন জয় কিংবা কাউকে বিষিয়ে দেয়া সম্ভব বলে লোকবিশ্বাস আছে। দুর্বল চিত্তের লোকেরা ভূত-প্রেতাত্মাকে বিশ্বাস করে। স্বপ্নের দেখা ভালোমন্দ বাছ-বিচার করে। ভবিষ্যৎ কর্মের শুভ-অশুভ ফলাফল নির্ণয় ও ভাগ্যে বিশ্বাস করে। রাখাইনসমাজে গৃহ দেবতা ও বোধিবৃক্ষ পূজা ও মানত রেয়াজ এখনো প্রচলিত আছে।"[৪]

## তথ্যনির্দেশ

১. ডা. কবীর আহমদ হোমিওপ্যাথ, পিতা : আবদুর রশিদ, বয়স : ৮৪ বছর, হ্যানিম্যনিয়ান হিলিং হোম, ডা. কবীর মার্কেট, পূর্ব বাজারঘাটা, প্রধান সড়ক, পৌরএলাকা, কক্সবাজার, তারিখ : ১৮-০৪-২০১৩, সময় : বিকাল-৫টা।

২. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-৪৭-৫৫।

৩. সিরাজুল হক, পিতা : শাহাব মিয়া, মাতা : নীলা খাতুন, বয়স : ৬৩ বছর, গ্রাম : উয়ালাপালং ঘিলাতলী, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার। তারিখ : ০১-১০-২০১১, সময়- সকাল সাড়ে ৯টা।

৪. বাংলাদেশের রাখাইন- ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা-মং বা অং (মং বা), প্রকাশক : লেখক, প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা-১০৫-১০৬।

www.pathagar.com

# ধাঁধা

প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম ও আরাকান (বর্তমান মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশ যা চট্টগ্রামের মানুষের কাছে রোসাঙ্গ নামে বেশি পরিচিত ছিল) ছিল অভিন্ন রাজ্য। এই দুই রাজ্যের সেতু বন্ধন ছিল বর্তমান কক্সবাজার এলাকা। সে সূত্রে আদি-চট্টগ্রাম ও আরাকানের ইতিহাসের সঙ্গে কক্সবাজারের আদি-ইতিহাসের যোগসূত্রের সন্ধান করেন ড. আবদুল করিম, আবদুল হক চৌধুরীসহ অনেকেই। প্রাচীনকালে বহু বিদেশি-বিভাষি শাসক-শোষক ও রাজা-বাদশাহর হাত বদলে এই ভূ-খণ্ড। সর্বশেষ ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন হিরাম 'কক্স'-এর নামধারণ করে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে চলছে এ অঞ্চল। এখানকার ভাষার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় ভাষায় রয়েছে প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, শ্লোকসহ রকমারি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এখানে ধাঁধা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

'ধন্ধ' থেকে ধাঁধা শব্দের উৎপত্তি; অর্থ 'ধোঁকা, সংশয়, দুরূহ সমস্যা, কৌতূহলজনক ও বুদ্ধিবিভ্রমকারী প্রশ্ন'। ধাঁধা একটি সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন। বর্ণনার কৌশলে রহস্যময় বাতাবরণ রচনা করা হয়। রূপক, সংকেত, উপমা, তুলনা, অতিশয়োক্তি, শ্লেষ ইত্যাদির সাহায্যে রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন রচনা করা হয়। প্রশ্ন আছে বলে এর একটি উত্তরও আছে। রূপক-সংকেত-উপমাদির ভেদ ভেঙ্গে উত্তরটি বের করতে হয়। প্রশ্ন ও উত্তর মিলে ধাঁধা পূর্ণাঙ্গ হয়। ধাঁধা'র চর্চায় কমপক্ষে দু'জনের উপস্থিতি আবশ্যক; অর্থাৎ দু'টি পক্ষ থাকতে হয়। দু'জন বা দু'দলের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলে।

বিগত তিন দশক আগেও কক্সবাজারের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে ধাঁধা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলতো। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে এই প্রবণতা ছিল বেশি। এই ধাঁধা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশুদের বুদ্ধি বৃত্তিক চর্চার প্রসার লাভ করতো। এমনকি বয়স্ক ও প্রবীণদের মধ্যেও এই চর্চা ব্যাপকভাবে ছিল। পরস্পর পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্যই এই ধাঁধা প্রতিপক্ষের প্রতি ছুড়ে দেয়া হতো যেভাবে কবিগানে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রচেষ্টা চলে। বিশেষ করে বিয়ে-শাদিতে ধাঁধার উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে অনেক স্থানে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। ফলে বিয়ে-শাদিতে ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং এব্যাপারে প্রভূত ধারণা রাখে এমন বয়স্ক লোকজনকে নিয়ে যাওয়া হতো। এখান থেকেই প্রচলিত হয়েছে, 'বুরাবুরিরে ঢোলত ভরি লই যাইয়'। কক্সবাজার অঞ্চলের ধাঁধার রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য যা একটু লক্ষ করলেই চোখে পড়ে। বিশেষ করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক ধাঁধার একই উত্তর পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো ধাঁধার পরিসর বড়ো। সে সব ধাঁধার উত্তরও বর্ণনামূলক। নিম্নে যেসব ধাঁধা দেয়া হলো তা হচ্ছে কক্সবাজার অঞ্চলের ধাঁধার একটি

www.pathagar.com

খণ্ডিতরূপ মাত্র। জেলার সমগ্র ধাঁধা সংগ্রহ করা গেলে তা একটি পৃথক গ্রন্থে রূপ নেবে। একটি ধাঁধা এলাকা ভেদে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে উচ্চারণের তারতম্যের কারণে একটি ধাঁধা ভিন্নভাবে দেখা যায়।

০১.
ধান পাআন পোক, ডুল পাআন চউক
গাছ্ খাই মেড়ি হাগে
এক্খান কথা মিছা আছে।"[১] উত্তর : উইপোকা।

০২.
কিচ্ছা মিচ্ছা নাইর্কলর্ চেচ্চুয়া
বাপ ন হইতে
পুত গেল মুচ্ছা। উত্তরঃ কাঁঠালের মুকুল।

০৩.
ঘাট কাছে পইর দূরে
মাদার গাছতলা হুয়া গুজরে। উত্তরঃ হুক্কা।

০৪.
তিন কোণা মধ্যম গাতা
দুই আডুয়ে মাইল্লাম যাতা
জরজরাইয়া পইল্ল পানি
হাতদি চা গইল্লেনি।"[২]
উত্তরঃ লুই বা ফেঙ্গি জাল। (লুই তঞ্চগ্যা শব্দ। এটি কক্সবাজারের আঞ্চলিক শব্দের সাথে মিশে স্থানীয় শব্দে রূপ নিয়েছে। লুই দিয়ে মাছ ধরার কাজ করা হয়।)

০৫.
তারা বাপ্পুত তারা বাপ্পুত
চাইল্লা তলে খাপ্পুত খাপ্পুত
চাইল্লা পাইয্যে ছউয়া
জনে পাইয়ে কউয়া?"[৩]
উত্তরঃ ছয়টি। ছয়টি চালতা পেড়ে পিতা, পুত্র ও দাদা তিনজনে দুটি করে পাবে।

০৬.
যত্তন গরি রুইলে ঝারে, হাজিলাতে বায়
বুরা অত্তে নখায় যারে, পোয়া অত্তে খায়।
দশ্অ শিরঅ এক মুনড্, না হয় রাবন
ভাল মতন পাক করিলে অমূল্য বেজন।"[৪] উত্তরঃ ঝিঙ্গে।

www.pathagar.com

০৭.
এক বুরিয়ে বাজন বায়
ছকুরি নাউট্টা নাচন যায়। উত্তরঃ খৈ।

০৮.
এঘরর্ বুরি অঘরঅত্ যায়
দাম্মর দুমুর আছার খায়। উত্তরঃ ঝাড়ু।

০৯.
ধইল্লাম মতর, মাইল্লাম মেলা। উত্তরঃ নাকের পানি।

১০.
ঘর আছে দুয়ার নাই
মানুষ আছে মাত বুল নাই। উত্তরঃ কবর।

১১.
এলুইন, মেলুইন,
হক্কল দেশত্ এক্কই তেলইন। উত্তরঃ সূর্য।

১২.
দিলে ন খায়, ন দিলে খায়।
উত্তরঃ গরুর মুখের কওর, কইর, ঠুলি, টুসি, কাপাইর, কাভার। (তবে স্থানীয়ভাবে তাকে কওর বলা হয়)।

১৩.
রাজার পইরত ন' ভিজে সিরি
ফুল ফুড়িলে ফিরিফিরি। উঃ কচুঁ পাতা।

১৪.
পাক আছে উরি ন যায়
ঠোঁট আছে খুড়ি ন খায়। উত্তরঃ কলাগাছের মোচা।

১৫.
উয়ত্তুন পইল্ল বুরি
ছ'মা আরাই কুরি। উত্তরঃ কচুর ছড়া।

১৬.
উড়ের ডেম ন মেলের পাতা
সেই কিচ্ছা ভাঁ'ই দি ন পাইল্লে জনমভর গাধা। উত্তরঃ গরুর শিং।

১৭.
উয়ত্তুন পইল্ল বুরি
তিন ঠেং উয়া গরি। উত্তরঃ চুলা, উনুন।

www.pathagar.com

১৮.
উঅত্তুন পরের বুরি,
ছ-মা আডার কুরি। উত্তরঃ বৃষ্টি বা বৃষ্টির ফোঁটা।

১৯.
কেচাতে পাতা রঙ বিয়াক মাইনসে খায়,
পাগিলে সোনার রঙ, গইজ্জাগরি খায়। উত্তরঃ বেগুন।

২০.
মিসতিরীর হাতিয়ার আছে তেইশ্শান
চোরাইআ আই লই গেল বাইশ্শান
হাতত্ আছে আর কআন্। উত্তরঃ বাইশটি।

২১.
রাজারঅ পইরত্
রাজা বাদে কিঅ ঠাঁই ন পায়। উত্তরঃ শাপলা।

২২.
লাম্বা বেডির লামবা চুল
পোয়া বিয়াদ্দে গুল গুল। উত্তরঃ সুপারি গাছ ও সুপারি।

২৩.
উঅরেও মেডি নিচেও মেডি
তার ভুতরে বিরবিজ্জা লডি। উত্তরঃ কেচোঁ।

২৪.
উঅরেও মেডি নিচেও মেডি
তার ভুতরে কালামিয়া চৌধুরী। উত্তরঃ ইঁদুর।

২৫.
উরিয়ার পক্ষী জোরে যার কিল
সোনাচ্ছর কিল লোয়ার খিল। উত্তরঃ বন্দুকের গুলি।

২৬.
সজিনের লই পিরীত গরি
মধু গইল্লাম পান,
গুয়ার মাথাত ঠেং দি
গংগাত গইল্লাম সিয়ান। উত্তরঃ ভোমরা।

২৭.
বাঘর্ ডইল্লা বই, কুইরঅর্ ডইল্ ফাল্দে
পানিত্ পইল্লে ভাসে। উত্তরঃ ব্যাঙ।

www.pathagar.com

২৮.
চারকুলদি চারগোআ খুডা
ফুল তুলিতে গাছ হিডা। উত্তরঃ গরু বা ছাগল বা মহিষের দুধের বাট।

২৯.
হাড়ের গুর গুর ফাড়ের মেডি
তিন মাথা দশ ঠেং ছয় চোখ তিন ফ'ড়ি। উত্তরঃ লাঙল।

৩০.
মা খাদে চরি চরি
ছ-এ খাদে গারি পরি। উত্তরঃ মুরগি।

৩১.
চারিকুদ্দি লোহার ঘাড়া
মাঝখানে জোয়ার আইলা। উত্তরঃ তরকারির ডেকসি।

৩২.
গাছ তক্ তক্ পাতা ছেরানি
হাতে লাল কেরানি। উত্তরঃ খেজুর গাছ ও খেজুর।

৩৩.
হাডত্তুন আইন্নে ছেরাইননা গাই
মেড়া দিবার কিচ্ছু নাই। উত্তরঃ চালুন।

৩৪.
চিচি পাতা ভু ভু ঢাল
খাদে গুলার বিচি লাল। উত্তরঃ তেঁতুল।

৩৫.
এক ছালামের কন্যারে দুই ছালাম রাখে
ছালামের কন্যারে বেরাত বাজাই রাখে। উত্তরঃ জায়-নামায।

৩৬.
লতা টানে মুরা ঘুরে। উত্তরঃ চরকা।

৩৭.
একর্ ভুতরে বেরা বোতলর্ ভুতরে তেল
ঘরত্ কইয়েদে কথা শহরে কেনে গেল? উত্তরঃ চিঠি।

৩৮.
একুলে ছ ঘর অকুলে ন ঘর
হাত্তুয়া নারিকেল গোড়া গোড়া ভাগ গর। উত্তরঃ প্রতিটি ঘরে একটি করে নারিকেল পাবে।

www.pathagar.com

৩৯.
এক গাছের বার ডেইল, বার ডেউলর্ বার নাম
চন্দ্র পুতি গাছের নাম, সায়র পক্ষী নাম
এপ্পিট কালা এপ্পিট ধলা। উত্তরঃ বছর, বার মাস, দিন রাত।

৪০.
আগা লল্লইস্সা পাতা খসখইস্সা
খাদে মাইয়নি রাক্কইস্সা। উত্তরঃ আঁখ, ইক্ষু।

৪১.
গাছ ছাউললা পাতা ডাললুয়া
খাদে বিচি লাললুয়া। উত্তরঃ পেঁপে।

৪২.
জল টি টি জলের উয়রে ভাসে
হাড্ডি নাই গুদুরি নাই মানুষ পাইলে চুষে। উত্তরঃ জোঁক।

৪৩.
অগগুয়া জিনিসঅর্ তিন্মুচরা
ভাআই দি ন পাইল্লে কানমুচরা। উত্তরঃ পান।

৪৪.
রাজার ঘরত ঘলি পারে,
বাইর হই ন পারে। উত্তরঃ চাঁই।

৪৫.
কালা বেডির গলাত দরি
হাজুইন্না হইলে তালাশ গরি। উত্তরঃ কেরোসিনের বোতল।

৪৬.
এন্ এক্কান খানার নাম ক
যেখানা কন্অ কিয়ে ন খায়। উত্তরঃ দস্তরখানা।

৪৭.
কিচ্ছা মিচ্ছা নাইজ্জলর চেওচ্ছা
বাপ ন অ'ইতে পোঁয়া গেল মুওচ্ছা। উঃ মুচ্ছি

www.pathagar.com

৪৮.
মারব্যা চিনার ভুতরে খোল
বছর বছর আচুরে চুল। উঃ ঘরের ছাউনি

৪৯.
মাথা কাড়া, মধ্যে ফাড়া
লাইল্লে ছাইল্লে পরে আড়া
যদি কিচ্ছা অখণ্ড, একশ টিয়া দণ্ড। উঃ স্তন।

৫০.
আর ভিড়াত বাজার বইস্যে
খাপদ্দি খাপদ্দি চাই
এত্তু কিছু বাজার আনি
বউ পোয়ানদ্দে খাই। উঃ ক্ষেত।

৫১.
হাত নাই টেং নাই দেশে দেশে ঘুরে
হেই জিনিস না থাইলে মনের দুঃখে মরে। উঃ টাকা।

৫২.
চাইর কুদ্দি কেড়া
মাঝদ্দি ওগগ্যা বেড়া। উঃ কাঁঠাল।

৫৩.
রাইতত পাতা, দিনত ডিগ
এ'ড়র উয়র নেইট্টে শিখ। উঃ পাঠি বা মাদুরা।

৫৪.
হাজারি ঘরর কাঁচারি
ষোল হাজার বিয়ারী
ঘর বান্দেদ্দে খান খান
এক ঘরর এক বান। উঃ মৌচাক।

৫৫.
অইতে দুই সিং মইত্তে দুই সিং,
জোয়ান কালে গেল্ কড়ে সিং। উঃ চাঁদ।

৫৬.
আধার ঘরত বাদর নাচে
না না গইল্যে আরো নাচে উঃ জিহ্বা।

www.pathagar.com

৫৭.
হাত কাড়া কেইল কাড়া
বুক কাড়া আর গলা কাড়া
তও ন মরে ইবা কন বেড়া। উঃ শার্ট।

৫৮.
ঝুম ঝুম পরে আধার খায়
নিজে ন খায় পররে খাবায়। উঃ জাল।

৫৯.
পোয়ায় খাইলে কেঁচ কেঁচায়
জোয়ানে খাইলে শরম পায়
বুড়ায় খাইলে বিয়াড্যায় থ্যায়। উঃ আছাড়।

৬০.
চাইর গান টেং দুইয়ান হাত
ভিতরে দাত মাথাওয়া গাত
গালে খাই কেইলে হাগে। উঃ ডলইন (ধান মাড়াই কল)।

৬১.
পর পরানী ফরফরার
কেঁথা ভুতর দরপরার। উঃ পেটের বায়ু (বাতাস ছাড়া)।

৬২.
উয়ত্তি বোট যায়
দুনিয়া ধর পরায়। উঃ ভুঁচাল (ভূমিকম্প)।

৬৩.
আল্লাহর নিম, গরগরাই দিম
ধরিত পাইল্লে হাজার টিয়া দিম। উঃ বাতাস।

৬৪.
ক'থা ক'থা করলা পাতা
বতল ভরা তেল
তুঁই লই, মুঁই লই কথা কইলাম
পারাত কেনে গেল্। উঃ আলুর লতা (মিষ্টি আলু)।

৬৫.
পেট কা'ড়ি দুধ খায়
আজব কারবার ন'অভাই। উঃ খেজুর রস।

www.pathagar.com

৬৬.
রাজা'র পইরত ন' ভিজে সিরি
ফুল ফুড়িলে ফিরিফিরি। উঃ কচুঁ পাতা।

৬৭.
রাজা মিয়ার গাই
যত দুইই তত পাই। উঃ পানির কল।

৬৮.
তুঁই থাকচ খালে খালে
আঁই থাকি বিলে বিলে
দুইজনার দেখা অঁইব
মরণের কালে। উঃ মাছ ও মরিচ।

৬৯.
লুড়িত পারে, উড়িত ন' পারে
বিয়াগ্‌গুনর লয় বসত গরে। উঃ থু থু।

৭০.
একখান জিনিস তিন মুছরা
ভাইদি ন পাইল্যে কান মুছরা। উঃ পানের খিলি।

৭১.
রাজার পইরত ভাসে তাল
দেইতে লাগে ভাতর থাল। উঃ শাপলা পাতা।

৭২.
আল্লাহ্‌র কেন্ কুদরতি
পোঁকর পোন্দত তিব্বাত্তি। উঃ জোনাকি।

৭৩.
সাত ধইয্যা হাচুরি
ধইল্যা আইয়ের গুজরি। উঃ জাহাজ।

৭৪.
এক কু'ড়ি বার ভাই, এক নামে ডাকে
এক ভাই মরি গেইলে বার ভাই কাঁদে। উঃ দাঁত।

৭৫.
হাত অ নাই, টেং অ নাই
তারে ধরি খাই। উঃ পানি।

www.pathagar.com

৭৬.
বেইন্যা হাড়ে চাইর টেংয়ে,
দুইজ্যা হাড়ে দুই টেংয়ে,
হাজুইন্যা হাড়ে তিন টেংয়ে,
ইবা কন্ কহ্ তুঁই । উঃ মানুষ ।

৭৭.
বাকসু ভরা, টুলকি মারা
খাইতে ভালা বিচিও বালা
গরম কালে মিঠে জ্বালা । উঃ তরমুজ ।

৭৮.
মরায় জিয়াতা ধরি খায় । উঃ চাঁই ।

৭৯.
আগাইন্যা খাই, মাজাইন্যা পুড়ে
ছা'ল লই কত কাজকাম গরে । উঃ পাট/পাওট্যা ।

৮০.
বুকখান কাড়া কাড়া, পিটট্যান হুয়ান
যারে পায় তারে কাড়ি গরে খান্ খান্ উঃ করাত ।

৮১.
সারাদিন উয়াস থাই, রাইত ভরি খাই
এক বছরে একবার নাইয়র, একমাসে থাই যাই । উঃ রোজা ।

৮২.
জোয়ার আইয়ের কলকলাই
বিরিশ আইয়ের হেক্কুরাই । উঃ সাম্পান ।

৮৩.
যারে আঁই আইনত্য গেইলাম
তারে দেই ফিরি আইলাম
তে যেত্তে চলি গেইল
তারে আঁই লৈ আইলাম । উঃ পানি আনা ।

৮৪.
একশ ওগ্যা জামা গায়
রাজার পোয়া হাড়ত যায় । উঃ বাঁধা কপি ।

www.pathagar.com

৮৫.
পাখ আছে পাইখ নয়
উড়ি যায় বিমান নয়
মানুষ খায়, রাক্ষস নয়,
হুইচ পোড়ায় ডাক্তার নয়। উঃ মশা।

৮৬.
পিজারার ভুতর বনর পাইখ বাসা মারি থাই,
বাসা একবার ভাইই দিলে বনত উড়ি যাই,
বনর মালিক সদাইগর টংগিত বসত গরে,
সময় মত ধরি পাইখ নোয়া খাঁচাত ভরে। উঃ রূহ/ আত্মা

৮৭.
পাঁচজনে লারেচারে দুই জনে চায়
দুইজনে মিলিমিশে গাতত ফেলায়
একজনে পরখ গরি বিদেশ পাঠায়
বিদেশইত্যা বৈ বৈ মজা লুড়ি খায়। উঃ ভাত খাওয়া।

৮৮.
হাত নাই, ঠেং নাই
গইজ্জায় গইজ্জায় যায়
ছাল নাই চাম নাই,
সক্কল মাইনষে খায়। উঃ পানি।

৮৯.
চোখ আছে ন' দেখে,
কান আছে ন' হুনে,
হাত আছে ন' ধরে,
ঠেং আছে ন' হাড়ে,
মুখ আছে কথা নাই,
ইবা কি ক চাই। উঃ মূর্তি

৯০.
ইক্কিনীচ চারা তালতু ভাই
ইক্যা ওইক্যা বিলবিলায়। উঃ বিদ্যুৎ চমকান।

৯১.
রাইতত আছে দিনত নাই
কড়ে গেইলে তারে পাই। উঃ চাঁদ

www.pathagar.com

৯২.
মা লতা মা পাতা
মায়ার গাত কত ছাতা। উঃ কইড়া/চিচিঙ্গা।

৯৩.
পানিত জন্ম পানিত বাস
বিয়াকে খায় বার মাস
পিড়ত চোখ, মুখত দাঁড়ি
উত্তর চাই তাড়াতাড়ি। উঃ চিংড়ীমাছ।

৯৪.
চাইর টেংয়ে বইয়ে, আষ্ট টেংয়ে হা'ড়ে
মানুষ নয় রাক্ষস নয় গোড়া মানুষ পেড়ে। উঃ পালকি।

৯৫.
আইস্যি কাজে, ন কইর লাজে
কাম্মান গইত্যাম দুই টেংয়র মাঝে। উঃ দুধ দোহন।

৯৬.
পেড়ত দানা, ফোঁদত ফুল
বিয়ারাইম্যার ওষুধ তুল। উঃ ডালিম।

৯৭.
বর দইজ্যার বরমাছ, লম্বা লম্বা কেঁড়া
এ মাছরে ধইত্যে লাগে পাঠান ঘরর বেড়া।
পাঠান ঘরর বেড়া নয়, পাঠান ঘরর আঁতি
এ মাছরে যে ন'চিনে ই'তে কার নাতি। উঃ কুমির।

৯৮.
বিনা দোষে মাইর খাই
মাইরর ছ'ড়ে কাঁদি
আঁর কাঁদায় মানুষ অয়
দেশর জ্ঞানী গুণী। উঃ স্কুলের ঘন্টা।

৯৯.
খন্দা কুরইল বাইশ্‌শান
চোরায় নিল তিন্নান
আর থাকে ভাই কওয়ান? উঃ একটিও না।

১০০.
চাইর শিশিরত শরবত ভরি
রাইখ্যে আল্লায় ওঁইত্ গরি

শিশির মুখত্ মে'ড়া নাই
পরের কিছমত কাড়ি খাই। উ: গরুর দুধ।

১০১.
ছোট মোট বটগাছ আট গোলা ধরে
আট গোলা খাইলে পোঁন্দে ছুয়ার মারে। উ: তরিচ বা বোম্বাই মরিচ।

১০২.
পাঁচ মাথা, দশ ট্যাং
এক মুখ বন্
কহ এ মানুইষ্যা কন্। উ: মরা মানুষ।

১০৩.
লাল গাড়ি পানি খায়
পানি খাইলে মরি যায়। উ: আগুন।

১০৪.
ঘরর পিছে ছনফুল,
বড়ু নাইদে কন্ ফুল? উ: সিদুঁর।

১০৫.
বাইরে হাড্ডি ভিতরে চাম
কহ্ তয়িবার কী নাম? উ: কচ্ছপ।

১০৬.
আগা থথ্থর
গোড়া পাথ্থর
উয়রে চিঁ'ড়া
ভিতরে মিড়া। উ: নারকেল গাছ।

১০৭.
বুকখান কাড়া কাড়া, পিটট্যান হুয়ান
যারে পায় তারে কাড়ি গরে খান্ খান্। উ: করাত।

১০৮.
এ্যান উত্তগ্যা শ'তান
নাকে বৈ ধবে কান। উ: চশমা।

১০৯.
আঁই থাই খালত্ বিলত্ তুঁই থ ঢালে
তোঁয়ার আঁর দেখা হইব মরণের পরে। উত্তর: মাছ ও মরিচ।

www.pathagar.com

এখানে লক্ষণীয় নিম্নের ১১০ নম্বর থেকে শুরু করে ১৭৮ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে ভিন্ন রকমের ধাঁধার একই উত্তর। অর্থাৎ একই উত্তরের একাধিক ধাঁধা।

১১০.
এক বুড়ি খায়, দুই বুড়ি চায়। উঃ হাঁটু।

১১১:
রাজার পোয়া ভাত খাইত্অ বইসসে
দুই কুদ্দি দুই জনে চাই রইয়ে। উত্তরঃ হাটু।

১১২.
কাদির উঅরে কাদি
যে ভায়াই ন পারে তার বাপ-ভাই আঁআর বাদি। উত্তরঃ কলার ছড়া।

১১৩.
মা রইয়ে নানির পেড়ত
পোয়া গেইয়ে বাজারত। উঃ কলার ছড়া।

১১৪.
অফুল ফুলনী
লাম্বা গাছত ঢুলনী
পাইলে গোলা সক্কগুলে খায়
হাড়ত যাইতে লেগুা যায়। উঃ চাউল।

১১৫.
খাইতে বিয়াকে খায়
বাজারত যাইতে লেগুা যায়। উঃ চাউল।

১১৬.
পা'ড়র উয়র কদম গাছ এত্তো কদম ধরে
লাল বাহাদুর উড়িলে ঝরঝরইয়া পরে। উঃ কুয়াশা বা খোঁয়া।

১১৭.
মুরার ওয়র অলিম গাছ, কত অলিম ধরে,
পাইখ পশু বইলে মন্তর অলিম ঝরি পরে। উঃ কয়াশা বা খোঁয়া।

১১৮.
কাডিলে বাঁচে, ন কাডিলে মরে। উত্তরঃ শিশুর জন্মকালীন নাড়ি।

১১৯.
ভব নদীর পারে
এমন একটি বৃক্ষ আছে যা কাড়িলে বাঁচে
ন' কাড়িলে মরে। উঃ শিশুর জন্মকালীন নাড়ি।

www.pathagar.com

১২০.
দৌরি গেলাম এরি আইলাম
সোনার জিনিস ফেলি আইলাম। উঃ মলত্যাগ করা।

১২১.
দুওরি গিলাম
লাল লাডিওয়া ফেলি আইলাম। উত্তরঃ মলত্যাগ করা।

১২২.
বত্তা গাছর বত্তা,
দইজ্যার বালুর বস্তা
পানি ভরামুত্তি
তারা তিনজন একযুক্তি। উঃ পান, সুপারি, চুন।

১২৩.
এক ভাই সাইগরে, এক ভাই নগরে
আর এক ভাই গাছর উয়রে
তিন ভাই মিলি
কী ছল্লা গরে। উঃ চুন, পান, সুপারি।

১২৪.
ও সুন্দরি পেরগোয়া পুদি
পরল পরল গা
জীবনত্ মাঝে
এক বিয়ানত্তু দুই বিয়ান নদছ্ কিয়া। উত্তর : কলাগাছ।

১২৫.
এক বিয়ানে জীবন শেষ। উত্তর : কলাগাছ।

১২৬.
রাজার ঘোড়া এক বিয়ানে আয়ু শেষ। উত্তরঃ কলাগাছ।

১২৭.
একগাছত্ তিন তরকারি
গাছর নাম গুলবাহারী। উত্তরঃ কলাগাছ।

১২৮.
পুদর পানি পুদত পরে
বাহাতে গদ্দনা মুচরে। উত্তরঃ কলসি।

১২৯.
যত মারে তত খায়
পেট ভরিলে ঘরত যায়। উঃ কলসি।

www.pathagar.com

১৩০.
পোন্দে ঠেলে মুখে খায়
পেট ভরিলে ঘরত যায়। উঃ কলসি।

১৩১.
কুম্বালার উ'য়র লাল গাই
বই রইয়ে পানি খাই (পেটু পুরায়)। উঃ কলসি।

১৩২.
হলইদরঅ টল মঅল
কাবচরঅ ছানি
কন খোদায়ে তুলি দিয়ে
গাছর আগাত পানি। উত্তর : ডাব বা নারিকেল।

১৩৩.
চাইরঅ ডাকত্তু লোহার আইল
মাঝে কেনে জোয়ার আইল। উত্তরঃ ডাব বা নারিকেল।

১৩৪.
আষ্ট মাথা, ষোল্য আ'ড়ু
জাল বুয়াদ্দে রাধা কানু
পানি বাজে, মাছ 'ন' বাজে
ক'ন দিয়তার আর্শিবাদে। উঃ মাকড়সা।

১৩৫.
আষ্ঠ ট্যাং ষোল আড়ু
কন দিয় তার আছে রাধু
মাছ ন' বাজে পানি বাজে
কন দিয় তার আছে গাছে। উঃ মাকড়াসা।

১৩৬.
কুয়াত পরি, গু হাতা। উত্তর : ছরাতা; যাতা।

১৩৭.
দুই রান চিরি, মাঝে দিলাম ভরি
টিপ দিলে কাজ হয়,
টিপ ন দিলে কাজ নয়। উত্তর : যাতা, ছরাতা।

১৩৮.
কালা মুরার্ সে'রে
কালা হরিণ চ'রে
দশ বেতে ধরি আনি
দুই বেতে মারে। উত্তরঃ উঁকুন।

www.pathagar.com

১৩৯.
ছন ক্ষেতে কালা গাই
ধইত্য গেইলে আর নাই। উ: উঁকুন।

১৪০.
আল্‌লার কী কুদরত্‌
লাডির ভুতরে শরবত। উত্তর: আঁখ, ইক্ষু।

১৪১.
রক্ত খাইয়া কল্যা গারায়
এত্তুন উ'ড়ে ই'তার ভাই। উ: আঁখ, ইক্ষু।

১৪২.
ছ'ল্‌ লুডে, দরি হাঁডে। উত্তর: লাউ।

১৪৩.
হাইল (সবুজ) ফল্‌না বাজারত যায়
বিনা দোষে চিন্দা খায়। উ: লাউ।

১৪৪.
টাব্‌বুর টুব্‌বুর ডুম মারে,
পাঁছায় আঁধার খায়। উত্তর: সুই।

১৪৫.
পোন্দে টিপ্পির টিপ্পির আঁধার খায়। উ: সুঁই।

১৪৬.
বর্‌ গিরসর্‌ ডঁ'র উডান ফুরইননা নাই
ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফুইট্‌টে তুলইন্‌না নাই। উত্তর: আকাশ ও তারা।

১৪৭.
দয়াল আল্লাহর ফুল বাগানত ফুইট্টে নানান ফুল
গণি চাই দেখিলাম নাইরে অভাই তুল। উ: আকাশ ও তারা

১৪৮.
বর্‌ ঘরর্‌ বর্‌ বাড়ি ফুরআইয়া নাই
ঝাঁক ঝাঁক ফুল ফুডের তুলইয়া নাই। উত্তর: আকাশ ও তারা।

১৪৯.
চি'তারা মিতারা দোতরা গাই
কিনতে গেইলে দেশত নাই। উ: আসমান।

www.pathagar.com

১৫০.
শ’রত্তুন বেরাই আইলাম
ব’ডু ছাড়া গোলা খাইলাম। উঃ ডিম।

১৫১.
লাইঅর্ উঅরে লাই,
টেপ পরিয়া যায়।
সোনার মোমমান্ ভাঁইগ্গা গেলে
জোড়া লইবার কিচ্ছু নাই। উত্তরঃ ডিম।

১৫২.
জানর্ বগা জানর্ থাই,
জান্ ফুরাইলে বগা ধাই। উত্তরঃ চেরাগ, বাতি।

১৫৩.
একখান ছনে বর্ ঘর ছায়। উত্তরঃ চেরাগ, খুপি।

১৫৪.
জোরে জোরে বগা চরে
জোর পুঁয়াইলে বগা মরে। উঃ চেরাগ, খুপি।

১৫৫.
দইজ্জাত্তু জন্ম লই মাইনষের মাঝে বাস
মায়ে ধইল্লে পোয়া মরে, এন্ কেন সর্বনাশ! উত্তরঃ লবণ।

১৫৬.
পানিতে জরজর্ম, পানিতে বাস
আবার পানিতে পইল্যে সর্বনাশ। উঃ লবণ।

১৫৭.
আফটি গাছের ঝিলিমিলি বট গাছের তেল
সোনাদি মরাইয়ে কন্যা কন্ দেশত্ গেল। উত্তর : হলুদ।

১৫৮.
উঅরেও মেডি, নিচেও মেডি
মাঝে আছে সুন্দরী বেড়ি। উত্তরঃ হলুদ।

১৫৯.
মুরাত্তু নিয়ল্লে বুরি,
চউক তার ছ’কুরি। উত্তরঃ আনারস।

www.pathagar.com

১৬০.
চারিকুদ্দি কেঁড়া
মাজত্তি উগ্গা লাম্বা বেডা। উত্তরঃ আনারস।

১৬১.
মুরাত্তুন নিয়ল্লে ভোঁজা
হাতত্ লাড়ি মাথাত্ পোঁঝা। উত্তরঃ আনারস।

১৬২.
শুঁড় দিয়রে কাম গরি, আঁই নই হাতি
মানুষর্ গরি উপকার, তও খাই লাথি। উত্তরঃ ঢেঁকি।

১৬৩.
ইলত লুড়ে বিলত লুড়ে
লেচত ধইললে ফালদি উড়ে। উত্তরঃ ঢেঁকি।

১৬৪.
রাজার হাতি আইলে আইলে চরে
লেজৎ ধইল্লে টুক্কুর গরি পরে। উত্তরঃ শামুক।

১৬৫.
এক সুয়ারি তিন মুছরা
ভাগি দি ন পাইললে কান মুছরা। উত্তরঃ শামুক।

১৬৬.
উঅততু পরের বুরি
লাল শারিআন্ পরি। উত্তরঃ পেঁয়াজ।

১৬৭.
অসুন্দরী পেরগুয়া পুদি পরল পরল ঘা
সে কিচ্ছা ভায়াই দি ন পাইললে জনমভর গাধা। উত্তর : পেঁয়াজ।

১৬৮.
কালারে কালা অন্দুত কালা
আস্টআন ঠেং উগ্গা নলা। উত্তরঃ ছাতা।

১৬৯.
অষ্ট খণ্ড মাঝে দণ্ড,
উয়রে উরনি বুকত চাবি
রইদে ঝরে হাতত লবি। উঃ ছাতি।

১৭০.
এক্কুনি ভুঁইয়র দুইকুনি নারা
পাইক বইয়েদদে কোডা কোডা
যদি পাইকে ছোয়াল গরে
পণ্ডিত ভাইয়ে লারাই গরে। উত্তরঃ কুরআন শরীফ।

www.pathagar.com

১৭১.
এক্কান আনা, দুনিয়া ফানা
ওগ্‌গ্যা ফলত তিরিশ দানা
হেঁই কিচ্ছা ভাঙ্গিত ন পাইল্যে
বেহেশতত য'য়ন মানা। উঃ কুরআন শরীফ।

১৭২.
দু'য়া উয়া, ওগ্‌গ্যা কাইত,
গলাই দিয়ে ছর্‌প্য রাইত।
যদি কিচ্ছা অখণ্ড।
পাঁচ টিয়া দণ্ড। উঃ দরজার খিল।

১৭৩.
নেইটতে গিলে দিতে হয়, ন দিলে ক্ষতি হয়,
মাইনষে যিয়ান কয়, বুইঝছ নে হিয়ান নয়। উত্তর : দরজার খিল।

১৭৪.
চিৎ গরি ফেলে, উইত গরি গরে
এন্ গরা গরে গোয়ানা ত'ত্ লরে। উত্তরঃ শিলনোড়ায় মরিচ পিঁষা বা বাঁটা।

১৭৫.
এক ঘরত গেইলাম
চিৎগরি ফেলাইলাম
কেইল লারি গরি আইলাম
আইবাসৎ ধুই ধাই আইলাম। উঃ শিলনোড়ায় মরিচ পিঁষা বা বাঁটা।

১৭৬.
একখান্ হাড্ডি, একমণ গোস্ত
ভাঙ্গি ন' পাইল্যে মনরে বুঝ্ দ। উঃ খড়ের স্তুপ (কুইজ্জ্যা)।

১৭৭.
এক মন গোস্‌ত এক্‌খান হাড়্‌ডি। উত্তরঃ কুইজ্জা।

১৭৮.
ধান লারদ্‌দে সুন্‌দরী বইন
পিচ্‌ছা দিয়ছ লেচ
আঁই কুমার বাজারত যাইদ্‌দে
কী কী দিবা বেশ।
উত্তরঃ পানি আইননো চুড়ুর চাড়ুর, হসতির আইন্‌নো দাঁত
সোনার আইননো কনচ মালা, রূপার আইন্‌নো পাত।

এদিকে ১৭৯ নম্বর থেকে ১৮২ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধাগুলোতে দেখা যায় প্রশ্নগুলো যে রকম বর্ণনামূলক তেমনি উত্তরও দীর্ঘ ও বর্ণনামূলক।

১৭৯.
ছাঁআতে নিয়লিলাম ঘর
রানর শেরত্‌তুন ধাইলদে সর।

www.pathagar.com

আংকির উয়রে, পাংখির বাসা
জল দেখিলাম শালে।
চুপাইয়ার উয়রে, নেপাইয়া নাচে
দুপাইয়া নিল ডালে।
শুন বাশ্‌শার বিবরণ
ওনদুরে বিলাই মারে কি কারণ।"[১]

উত্তর: শুভক্ষণে বাড়ি থেকে বের হতেই দু'পায়ের মধ্যখান দিয়ে একটি সাপ পালিয়ে গেল। কতদুর গিয়ে দেখি মাঠে একটি মরা গরুর কংকাল। কংকালের চোখের গর্তে একটি পাখি বাসা বেঁধেছে। আরো দেখলাম মাঠের পরিত্যক্ত ধান ক্ষেতের ধানের নাড়া বা খড়ে মাকড়শার জাল। সেই জালে শীতকালের কুয়াশার মৃদু পানি। আরো কিছু দূর যাওয়ার পরে ছোট একটি নদীতে কয়েকটি মহিষ পানিতে ডেরা পড়ে রয়েছে। সে সময় কয়েকটি পুঁটি মাছ মহিষের গায়ের উপর লাফালাফি করছে। শিকাররত মাছরাঙ্গা সুযোগ বুঝে ছুঁ মেরে মহিষের উপর থেকে মাছ ধরে গাছের একটি ডালে গিয়ে বসল। সর্বশেষ বাক্যটি রসিকতা করে পুঁথি সাহিত্যের ঢঙে রাজা বা বাদশার বর্ণনা দিয়ে বললো, 'কি কারণে ইঁদুর বিড়াল মারে।'

১৮০. এক রমণী নদী থেকে পানি ভর্তি কলসি নিয়ে বাড়ি ফিরছে। তখন তার প্রতিবেশি এক ব্যক্তি বাজারে যাচ্ছে। এসময় রমণী কোমরের জালি (কাপড়ের তৈরি কোমর বন্ধ) থেকে টাকা (কড়ি) বের করে বাজারে গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে দিয়ে বলেন, বাজার থেকে আমার জন্য কিছু সদাই-পাতি আনতে হবে। তখন ঐ ব্যক্তি রমণীকে জিজ্ঞেস করে বাজার থেকে কী আনতে হবে? রমণী তার চাহিদা অনুযায়ী বাজার থেকে 'জীবন আর যৌবন' আনতে বলেন।

একথা শুনে বাজারে গমনেচ্ছু ব্যক্তি ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন কিন্তু প্রকাশ করলো না। তিনি বাজার থেকে কি আনতে হবে তা বুঝতে না পারলেও তা প্রকাশ না করে বলেন, আমিতো তোমার বাড়ি চিনি না? এসব সদাই-পাতি এনে কোথায় দেব? তখন রমণী বলে-

'বাড়ির পিছে কুচুই বন
পিতাং কাড়া আরি
ভাইয়র পুন ভাইয়ে মারে
তার দইনর বাড়ী।"[২]

ঐ ব্যক্তি রমণীর উত্তর শুনে তাজ্জব বনে গেলেন কিন্তু তা প্রকাশ না করে বাজারে চলে গেলেন। ঐ ব্যক্তি বাজার থেকে কী আনবে এবং তা কোথায় পৌঁছে দেবে তার উত্তর দিতে হবে। এখানে মহিলার বাড়ির ঠিকানা শুনতে খুবই অশোভন হলেও প্রকৃত পক্ষে এখানে অশোভন কিছু নেই।

উত্তর: মহিলার চাহিদা মতে পণ্য হচ্ছে 'চাউল ও কাপড়'। জীবন হচ্ছে 'চাউল, যা খেয়ে মানুষের জীবন রক্ষা পায় এবং যৌবন হচ্ছে 'কাপড়' যা পরিধান করে শরীর ঢাকা যায়। 'চাউল' এবং 'কাপড়'কেই জীবন ও যৌবন বুঝিয়েছে।

মহিলার বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে,'কামারের দোকানের দক্ষিণ পাশের বাড়ি, যে বাড়ির পেছনে রয়েছে বেত বাগান, ঐ বাড়িটাই মহিলার বাড়ি'। এখানে 'ভাইয়ের পুন ভাইয়ে মারে' বলতে বুঝানো হয়েছে মূলত কামারের দোকান। কামারের কাজ হচ্ছে লোহার উপর লোহা দিয়ে পিটানো, তাই 'ভাইয়ের পুন ভাইয়ে মারে'র তার দক্ষিণের বাড়ি বলা

www.pathagar.com

হয়েছে। মহিলার বাড়ির ঠিকানা দেখাতে অত্যধিক অশোভন শব্দ ব্যবহার করা হলেও প্রকৃত অর্থে তাই নয়। প্রাচীনকালে গ্রামীণ জনপদে সাহিত্য চর্চার মধ্যেও মেধা, মনন ও বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ছিল তা এই ধাঁধা দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায়।

১৮১. 'গোদাও ন মন, গোদিও ন মন, গোদার এক ছেলে ও এক মেয়ের ওজনও ন মন করে (দু'জনের ওজন)। সামনে আছে একটি নদী। নদীর ঘাটে বাঁধা আছে একটি নৌকা। নৌকায় কোন মাঝি বা চালক নেই। নৌকার ধারণ ক্ষমতাও ন মন। নদী পার হতে হবে তিন জনকে। কীভাবে নদী পার হওয়া সম্ভব?'

উত্তর: প্রথমে গোদার দুই ছেলেমেয়ে একসাথে (দুইজনের নয় মন) নৌকায় করে নদীর ওপারে চলে যাবে। এরপরে গোদার মেয়েকে রেখে ছেলে নৌকা নিয়ে নদীর এপারে বা যেখানে গোদা ও গোদি রয়েছে সেখানে আসবে। এখন নৌকা নিয়ে গোদা নদীর ওপারে চলে গেল। এবার গোদার মেয়ে নৌকা নিয়ে ওপার থেকে এপারে চলে আসলো এবং ছেলেমেয়ে দু'জনেই আবার নৌকা নিয়ে ওপারে চলে গেলো। আবার গোদার ছেলে নৌকা চালিয়ে ওপার থেকে এপারে চলে আসলো। এবার নৌকা চালিয়ে গোদি ওপারে চলে গেল। এবার গোদার মেয়ে নৌকা নিয়ে এপারে চলে আসলো এবং গোদার ছেলেমেয়ে দু'জন একসাথে নৌকা নিয়ে ওপারে চলে গেল। এতে করে গোদা, গোদি ও গোদার ছেলেমেয়ে নদী পেরিয়ে চলে গেল।

১৮২. 'একব্যক্তি একটি পোষা বাঘ, একটি ছাগল এবং এক খাচি পান নিয়ে বাজারে যাচ্ছে। সামনে আছে একটি নদী। নদী পেরুতে হবে। ঘাটে বাঁধা একটি নৌকা। তবে কোনো মাঝি নেই। নৌকায় একসাথে সব মালামাল তথা বাঘ, ছাগল এবং পানের খাচা নিয়ে নদী পেরুলে নৌকা ডুবে যাবে। একবারে নৌকায় মাত্র একটি পণ্য নেয়া যাবে। বাঘের সাথে ছাগল রাখা যাবে না। কারণ বাঘ ছাগল খেয়ে ফেলবে, অনুরূপভাবে ছাগলের সাথে পান রাখা যাবে কারণ ছাগল পান খেয়ে ফেলবে। মালামালগুলো নৌকায় করে নদীর ওপারে নিয়ে যেতে হবে। তা কীভাবে সম্ভব?'

উত্তর: ছাগল নিয়ে নৌকায় করে ওপারে গিয়ে ছাগল রেখে আবার নৌকা নিয়ে এপারে চলে আসলো। এরপরে নৌকায় করে বাঘ নিয়ে ওপারে গেল। বাঘ রেখে এবার ছাগলকে সাথে নিয়ে এপারে চলে আসলো। এবার ছাগল রেখে পান নিয়ে ওপারে গেল। এবার পান রেখে নৌকায় করে এপারে চলে আসলো এবং ছাগল নিয়ে ওপারে চলে গেল। এতে করে তার তিনটি পণ্যই নদীর ওপারে চলে গেলো।

## তথ্যনির্দেশ

১. জাহানারা বেগম, এমইউপি, প্যানেল চেয়ারম্যান, ডুলাহাজারা ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রাম : ডুমখালি, উপজেলা : চকরিয়া। তারিখ : ১০.১১.২০১২, সময় : সকাল সাড়ে ৯টায়।
২. মোহাম্মদ আলম, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, খোনকারখিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বর্তমান হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক, জন্ম: ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫০, গ্রাম : পালাকাটা বটতলি, জালালাবাদ ইউনিয়ন, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, তারিখ : ০৪.০৩.২০১২. সময় : বিকাল ৫ট।
৩. ঐ।
৪. সুলতান আহমদ। তিনি ২০০৯ সালে ইন্তেকাল করেন। গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাক, জালালাবাদ ইউনিয়ন, উপজেলা : কক্সবাজার সদর। (তিনি প্রধান সমন্বয়কারীর পিতা। প্রধান সমন্বয়কারী ২০০৫ সালে ধাঁধাটি তার কাছ থেকে সংগ্রহ করেন।)
৫. আবদুল মজিদ। তিনি ১৯৬৮ সালে ৬৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাক, জালালাবাদ ইউনিয়ন, উপজেলা : কক্সবাজার সদর। (তিনি সম্পর্কে প্রধান সমন্বয়কারীর পিতামহ। প্রধান সমন্বয়কারী ১৯৬৭ সালে এই বচনটি তার কাছ থেকে সংগ্রহ করেন।)

www.pathagar.com

# প্রবাদ-প্রবচন

মানুষের হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে জগৎ, সংসার, ব্যক্তিজীবন, মানুষ তথা পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক নিয়ে যে সব মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে তা প্রবাদ-প্রবচনে রূপ পায়। জীবনে চলার পথ সহজ করা, বিপদ থেকে বাঁচা, নিজের উন্নতি, অন্যকে চেনা, ঋতু বৈচিত্র্য বোঝা-ইত্যাদির প্রয়োজনে অভিজ্ঞতার সার-সংকলন স্বরূপ-এ গুলো তৈরি হয়। মনে রাখার জন্য, বার বার আউড়ালেও যেন বিরক্তি না ধরে- সে কারণে এ গুলোকে করা হয় ছন্দোময়, রূপক এবং সুন্দর ভাষা মণ্ডিত। এ সবের কিছু জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং তা কিছুটা সার্বজনিনতা ও বিশ্বজনিনতা লাভ করে। সেসব বৈশিষ্ট্য ক্রমে দর্শনে রূপ লাভ করে; কিছু থেকে যায় ভূয়ো-দর্শন আকারে। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ পরিচিতিমূলক বক্তব্য থেকে জন্ম নেয় ব্যবহারিক জ্ঞান-টেকনিক। প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সূত্রাবদ্ধ হয়ে জ্ঞানের বিকাশের প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা। যে সব অভিজ্ঞতা দৈনন্দিন, কালিক ও স্থানিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত থাকে সেগুলো প্রবাদ-প্রবচনে আটকে থাকে বা অনেক সময় সংস্কারে রূপ পায়। অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত লোকদের কাছে এ গুলোই হয়ে উঠে জীবন-দর্শন। তাই, এ সবের সেরূপ সীমিত পর্যায়ের সামাজিক মূল্য রয়েছে।

ভৌগোলিক ভিন্নতা সত্ত্বেও সব দেশের মানুষের কতেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আবার, সমাজ বিজ্ঞানের দিকে তাকালে সকল দেশের দাস সমাজ ও সামন্ত সমাজের রূপও প্রায় কাছাকাছি। তাই, একই রূপ অভিজ্ঞতা বিভিন্ন দেশের মানুষ লাভ করে। তাদের প্রবাদ প্রবচনেও একই রূপ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, ভারতবর্ষ ও চীনে একই রূপ প্রবচনে লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া কিছু আছে একান্ত স্থানিক। পাশ্ববর্তী অঞ্চল বা দেশ থেকেও কিছু প্রবচন গ্রহণ করা হয়।

আধুনিক শিক্ষা ও জীবন ব্যবস্থার কারণে প্রাচীন প্রবাদ প্রবচন ক্রমে কম উচ্চারিত হচ্ছে। তবে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে এগুলো যে অবদান রেখেছে তার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। দাস বা সামন্তযুগের অনেক গবেষণার সাথে সে যুগের নারীর ও দাসের স্থান চোখের সমানে এক কথায় ফুটে ওঠে– 'দাশঅরে থাবা, বা বউয়রে কিল'।

সমাজের যে সব রূপ মানুষের কাছে অসহনীয় সে সব প্রবাদ-প্রবচনে ফুটে ওঠে। মানুষ এ সবের যে পরিবর্তন চায় সে কথা প্রকাশ পায়। এ সব দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ বিকাশের সহায়ক। মানুষ যা কিছু জীবনের জন্য অনুকূল হিসেবে দেখছে সে সবের প্রশংসা করেছে; যেগুলো জীবনের জন্য অনুকূল নয় সেসবের সমালোচনা করেছে। 'হক কথা সে বাপের কোলে বসেও বলতে চায়'। এখানে সত্যের জয়গান গাওয়া হয়েছে, মানবতার ধ্বজা উড়ানো হয়েছে। মানুষ যে সত্যানুসন্ধানী, ন্যায় বিচারক,

www.pathagar.com

অপরের সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল- সেসব বৈশিষ্ট্য প্রবাদ-প্রবচনে ফুটে ওঠেছে। মানুষ মৌলিকভাবে ভালো- সে ভালো থাকতে চায়। মুষ্টিমেয় ঠক, চোর, বদমাস- যারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের চিহ্নিত করে এদের খারাপ পরিণাম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়; 'চোরের দশদিন গেরস্থের একদিন' (চোরঅর দশ দিন গিরস্তর একদিন)। শ্রমবিমুখ লোক, অলস, দুর্বলচিত্ত লোক, উদাসীন, পরের ধনের আশায় বসে থাকা লোক সমাজের উপহাসের পাত্র। পরিশ্রমী লোক সচ্ছল, জ্ঞানী, শ্রদ্ধার পাত্র, গুরুজন পূজনীয়- এ সব কথা বার বার মনে করিয়ে দেয় প্রবাদ-প্রবচন।

প্রবাদ-প্রবচন আউড়ায় অনেকে; কিন্তু কয়জন মানে বা অনুসরণ করে। নিজের চোখের হাল কেউ দেখে না। ভাল কথা অপরের বেলায় ছুড়ে দিতে ওস্তাদ সবাই; নিজের বেলায় ঠন্ ঠন্। প্রবাদ- সেটাও মনে করিয়ে দেয়।

কক্সবাজার এলাকার আঞ্চলিক ভাষা চাটগাঁয়ে, যাকে আমরা বৃহত্তর চট্টগ্রামের ভাষা বলে থাকি। চাটগাঁয়ের ভাষার নিজস্ব একটি স্বকীয়তা আছে, আছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এ ভিন্নতা কিছু প্রবাদ প্রবচনেও লক্ষণীয়। তবে, এখানে সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচনের বেশির ভাগ পুরো চাটগাঁয়ে ভাষাভাষি অঞ্চলে প্রচলিত। কিছু প্রবাদে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তথা অন্যান্য জেলা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের প্রভাব রয়েছে। এমনকি উর্দু বা হিন্দি প্রবচনও স্থানীয় ভাষায় স্থান করে নিয়েছেঃ 'বাপ কা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া'- ইত্যাদি। যেগুলো যে অঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয় সেগুলো সেই স্থানীয় ভাষার অংশ হয়ে যায়।

প্রবাদ-প্রবচনে স্থানীয় লোকের বৈশিষ্ট্য, তাদের জীবন যাত্রা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রবাদগুলোতে শুধু কক্সবাজার বা চট্টগ্রাম অঞ্চল নয়; পুরো দেশের, বিশেষত বাঙাল বা বাঙালি নামের জনগোষ্ঠির, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তবে বাঙালি মাত্রই এ রূপ বলার সুযোগ নেই। সমাজ বিকাশের অবস্থান থেকে তাদের দেখতে হবে। প্রবাদ প্রবচনগুলো তৈরি হয়েছে- বিশেষত সামন্ত ব্যবস্থাধীন সময়ে। সামন্ততন্ত্রের কিছু রূপ এবং জের এখনো এ সমাজে রয়েছে। তাই, প্রবাদগুলোর বর্ণিত রূপ আমাদের চারপাশে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন হলেও সাংস্কৃতিক রূপ বদলায় অতি ধীরে। তাই, আধুনিক পুঁজিবাদ প্রভাবাধীন সমাজেও সামন্তযুগে তৈরি প্রবাদ-প্রবচনে বর্ণিত সমাজের ছাপ বা অবস্থান লক্ষ করা যায়।

আমাদের সমাজ দ্রুত পুঁজিবাদে রূপ লাভ করছে। এর রূপ শহরে আগে দেখা দেয়। শহুরে দম্পতি 'কিল' এর মাধ্যমে স্ত্রী শাসন করার কথা শুনলে হয়তো নাক ছিটকাবেন; কিন্তু, গ্রামের অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত লোকেরা বলবে, তবে কি 'রাজরাণী' করে রাখব! যে সব প্রবাদ-এর রূপ সংস্কারে পরিণত হয়েছে সে গুলোকে মানুষ চিরন্তন বলে মনে করে, এমনকি ধর্মের কথা বলে তা চালিয়ে দিতেও কসুর করে না। শিক্ষা- একমাত্র শিক্ষা, বিশেষত সমাজ ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষা ও সেখান থেকে পাওয়া বিজ্ঞান মনস্কতা মানুষের মন থেকে কালে, ক্রমে পৌরাণিক তমসা কাটাতে সাহায্য করবে। তখন নারী নিছক 'নেক সোহাইগ্যা' (স্বামী সোহাগী) হওয়া ছাড়া মানুষ হিসেবে তার আরো গুণ বিকাশের সুযোগ পাবে; সংসার ছাড়াও তার অবদান সমাজে প্রসারিত হবে।

কেউ চাইলেও সমাজকে এক জায়গায় ধরে রাখা যাবে না-তা এগিয়ে যাবেই। 'অপথ পথ হবেই, অঘাট ঘাট হবেই' (অপথ পথ অইব, অঘাট ঘাট অইব)। নতুনত্বকে শত টিটকারী দিলেও গ্রামের নিছক গরিব কৃষকও চাপে পড়ে তার মেয়েকে কনে সাজাবার জন্য বিউটি পার্লারে পাঠাচ্ছে। হ্যাঁ, কিছু সংস্কৃতি সমাজে চাপানো আকারে (Superimposed) আসছে। সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচন সমাজ বিকাশের প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। এগুলোকে মানুষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য ভাবলে সংস্কার ও কুসংস্কারের জন্ম নেবে। 'উত্তরের মাইনষর ভুতরে বুদ্ধি, দউনর মইষ সাদা'- দক্ষিণের মানুষের ভেতরে বুদ্ধি তো কম দেখি না, আর সাদা-ই-বা আর কই! এ কথা এখন আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট বলে নিন্দিত হবে। এ রূপ অনেক কথার গ্রহণযোগ্যতা এখন আর নেই। কিন্তু, এক হাতে যে তালি বাজে না বা বিপদ একা আসে না- এ সব শুধু এ দেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশে সব সমাজে সমানভাবে প্রযোজ্য এবং সব দেশে অনুরূপ প্রবাদও রয়েছে।

সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচনের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝা প্রয়োজন। এখানে এমন শব্দ রয়েছে যেগুলোকে আধুনিক মানুষ 'গ্রাম্যতা' দোষে দুষ্ট বলে অভিহিত করে। হ্যাঁ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে গ্রামে বাস করা নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত লোকজন যারা এগুলো সৃষ্টি করেছেন তারা যে ভাষা জানেন বা ব্যবহার করতেন তা-ই এসব প্রবাদ-প্রবচনে ব্যবহার করেছেন। আবার, শিল্পের দাবি হলো কোনো বিষয়কে প্রকট করে দেখানো। 'নাম ফাইট্টে যার, পুন ফাইট্টে তার'- নামের বিড়ম্বনাকে 'পুন' বা 'পায়ু' ফাটার সাথে তুলনা করে বিষয়টি স্পষ্ট ও প্রকট করে তোলা হয়েছে। এ প্রকাশ ভঙ্গিতে গ্রাম্যতা রয়েছে সন্দেহ নেই; তবে পাঠককে চমকে দেয়া গেছে, রচনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এ শিল্প জীবনের জন্য-জীবনের কাজে লেগেছে- এখানেই এর সার্থকতা। এ দেশের মানুষ শত শত বছর 'হেগেছে', 'পায়খানা' করছে এই সম্প্রতি। উন্মুক্ত আকাশের নিচে মলত্যাগ করতে অভ্যস্ত, ইংরেজি শব্দ 'টয়লেট' চিনছে বা ব্যবহার করছে বেশি দিন হয় নি। তাই, প্রবাদে 'হাগা'- কথাটা আসা স্বাভাবিক।

এ অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচনে ব্যবহৃত 'বাঙাল' শব্দটা বুৎপত্তিগত অর্থে মুর্খ, বোকা এ ধরনের লোকদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। মুগল আমলে পুরো বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে [পূর্ব বঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম বাংলা] 'সুবে বাঙাল' নামে উল্লেখ করা হতো। বাঙালের লোকদের পরিচয়ও বাঙাল হলে আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু, বাইরে থেকে আসা লোকেরা 'মুগল' নামধারী হওয়ায় এর অপভ্রংশ স্বরূপ 'মঅল' নামক শব্দ ভাষায় ঢুকে পড়ে। মুগলদের বংশধর না হয়েও ধনী, সামন্ত-অভিজাত ও রাজকর্মচারীরা নিজেদের 'মঅল' এবং স্থানীয় গরিব, কৃষিজীবী, অশিক্ষিত ও নিম্ন সংস্কৃতির লোকদের বাঙাল বলতে শুরু করে। 'মঅল' হয় অভিজাত সংস্কৃতিবান এবং 'বাঙাল' হয়ে দাঁড়ায় অনভিজাত অসংস্কৃতিবান অর্থবোধক। ইংরেজদের বদৌলতে শিক্ষায়, বিত্তে, ক্ষমতায় এগিয়ে গিয়ে পশ্চিম বাংলার লোক-নিজেদের বাঙালি এবং পূর্ববাংলার লোকদের 'বাঙাল' পরিচয় দিতে থাকে। 'বঙ্গালী' চণ্ডালের মত অপশ্রেণি বা নিচু জাত অর্থে। তার জায়গায় শুধু পূর্ব বাংলার লোকদের 'বাঙাল' বলা অবজ্ঞাজাত

www.pathagar.com

এবং আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার একটা কৌশল হিসেবে দেখা দেয়। প্রবাদ সৃষ্টিকারিরা সে অর্থে নিজেরাও বাঙাল। তবে, শিক্ষা, অর্থ-বিত্ত এর ছোঁয়া পেলেই এ অঞ্চলের লোক 'মঅল' বা 'বাঙালি' হয়ে ওঠে, বাঙাল (বাআঁল) থেকে যায় নিম্ন বর্গের লোকরা। তাই, এ অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচনে ব্যবহৃত 'বাঙাল' বা 'বা'ল' শব্দটাকে অবজ্ঞা সূচক হিসেবে না ধরে মূর্খ, বোকা এ রূপ বুৎপত্তিগত অর্থে ধরা দরকার।

প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম ও আরাকান (বর্তমান মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশ যা চট্টগ্রামের মানুষের কাছে রোসাঙ্গ নামে বেশি পরিচিত ছিল) ছিল অভিন্ন রাজ্য। এই দুই রাজ্যের সেতু বন্ধন ছিল বর্তমান কক্সবাজার এলাকা।

প্রবাদ-প্রবচন হচ্ছে এখানকার লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ। ভাষার শ্রী বৃদ্ধি ও সংক্ষেপায়নে প্রবাদ-প্রবচনের কোনো তুলনা নেই। সকল মূল ভাষায় যেমন, তেমনি আঞ্চলিক বা উপ-ভাষার সমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও প্রবাদ-প্রবচনের ভূমিকা অপরিসীম। এঅঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা বাংলা উপ-ভাষার এক অনন্য সংযোজন। কক্সবাজার এলাকায় এমন অনেক প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত আছে যা বৃহত্তর চট্টগ্রামের অন্য এলাকায় নেই। কক্সবাজার এলাকার আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচনগুলোর এক বিরাট অংশ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচন হলেও উচ্চারণরীতি ও অর্থগতভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র।

বাংলা সাহিত্যের অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতের ধারণা কক্সবাজার অঞ্চলে মহাপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার নেই। বিশেষ করে ঘ, ঝ, ঢ, ধ,ভ বর্ণের ব্যবহার বা উচ্চারণ কক্সবাজারে নেই। কিন্তু তাদের এধরনের ধারণা সঠিক নয়। কক্সবাজার অঞ্চলের কথা-বার্তায়, প্রবাদ-প্রবচনে মহাপ্রাণ শব্দের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। এখানে দেখা যেতে পারে, কক্সবাজারে 'ঘর' শব্দকে 'ঘর'ই উচ্চারণ করে। 'ঘর'কে 'গর' উচ্চারণ করে না। অনুরূপ 'মধু'কে 'মধু'ই উচ্চারণ করে, 'মদু' উচ্চারণ করে না। 'ঘিঁইর বাসে ছালা বেচা যায়' এখানে ঘি উচ্চারণ করে 'গি' নয়। 'ঝরে বগা পরে' এখানে 'ঝরে'ই উচ্চারিত হয়, 'জরে' নয়। স্থানীয়ভাবে বৃষ্টিকে 'ঝর' বলে, তবে 'ঝড়' নয়। 'ঝরে'র স্থলে 'জরে' হলে শব্দার্থই বদলে যাবে। একইভাবে 'ঢেই' কে 'ঢেই'ই উচ্চারণ করে, 'ডেই' নয়। একইভাবে ধ বা ভ এর ব্যবহার একই থাকে।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, আর তা হচ্ছে : কোনো কোনো প্রবাদ ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'যে পাতত্ খায়, হে পাত ভায়'। 'যে পাতিলাত্ খায়, হে পাতিলা ভায়'। 'যাচেদে ভাত ন খাইলে, হে ভাতে পিঠ দেয়'। 'যাচেদে ভাত ন খাইলে উয়াইস্‌সা থা পরে'।

কক্সবাজার জেলার সমুদয় প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ করা গেলে তা একটি গ্রন্থে রূপলাভ করবে। এখানে সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচনগুলো মুদ্রিত করা হলো :

### সংগৃহীত প্রবাদ

১.
অপথ পথ অইব,
অঘাট ঘাট অইব ।

www.pathagar.com

অমানুষ মানুষ অইব,
তেলি অইব পাল ।
নাইত অইব ফেরকা বইদ্‌দ,
কনে ফেলিব বাল ।
শব্দার্থ: অপথ= যেখানে রাস্তা নেই, অইব=হবে, নাইত=নাপিত, ফেরকা=প্রতারক, কনে=কে (প্রকৃত অর্থে কনে অর্থ নববধূ, কিন্তু এখানে কনে অর্থ কে), বাল= চুল । উর্দু শব্দ বাল অর্থ চুল ।
**ব্যাখ্যা :** অমানুষ মানুষ হবে, যেখানে ঘাট হওয়ার কথা নয় সেখানে ঘাট হবে; অমানুষ মানুষ নামে পরিচিত হবে । চামার সম্প্রদায়ের লোকজন হবে অভিজাত সম্প্রদায়ের পাল, নাপিত হবে প্রতারক-চিকিৎসক, তখন চুল কাটার লোক কে হবে? পাল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটি অভিজাত সম্প্রদায় । তেলি বা চামার সম্প্রদায় হচ্ছে মুসলমান । তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও তেলি একটি গোত্র রয়েছে । এখানে অভিজাত বুঝাবার জন্য পাল সম্প্রদায়ের উদাহরণ দেয়া হয়েছে ।

২.
অতি কাউম্‌মার ভাত নাই,
অতি সুন্‌দরীর নেক নাই
শব্দার্থ: নেক=পতি বা স্বামী, কাউম্‌মা=কর্মঠ ।
**ব্যাখ্যা :** অতি কর্মঠ লোকের কাজ মেলে না, তেমনি অতি-সুন্দরীরও স্বামী মেলে না ।

৩.
অভাইগ্‌গারে পাইয়ে ভূতে,
ঘর এরি বারে ফুঁতে ।
শব্দার্থ: অভাইগ্‌গা=অভাগা বা ভাগ্যহীন, ফুতে=ঘুমায় ।
**ব্যাখ্যা :** বিপাকে পড়ে ভাগ্যহীন লোক নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে রাত কাটায় ।

৪.
অকথা কথা অয় মাইন্‌ষে কইলে,
অদারু দারু অয় পাড়াৎ পিষিলে ।
শব্দার্থ: অকথা=যা কথা নয়, দারু=ঔষধ, অদারু=যা ঔষধ নয়, পাড়াৎ=শিল নোড়া; যা দিয়ে মরিচ বা মশলা পেষণ করা হয় ।
**ব্যাখ্যা :** মানুষের মুখে অকথাও কথা হয়, পাটায় ঘষলে যা ঔষধ নয় তাও ঔষধ হয় ।

৫.
অঁইন খাই, আঁরা হাগির ।
শব্দার্থ: অঁইন= আগুন, আঁরা= কয়লা, হাগা= মলত্যাগ করা ।
**ব্যাখ্যা :** আগুন খেয়ে কয়লা মল ত্যাগ (পায়খানা) করছি । এ প্রবাদ দ্বারা কঠিন পরীক্ষা বুঝানো হয়েছে । এটা মূলতঃ কোন স্ত্রী যখন শাশুড় বাড়িতে স্বামী, শাশুড়ি, দেবর, ননদসহ অন্যদের অত্যাচারে কঠিন জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়- এ রূপ পরিস্থিতি বুঝানো হয় ।

www.pathagar.com

৬.
অউলাদে বাঘ কলত্ পরে।
শব্দার্থ: অউলাদে=বাড়াবাড়ি করা, কল্=ফাঁদ, কলত্=ফাঁদে পড়া বা বিপদে পড়া।
**ব্যাখ্যা :** যে বাঘ বা মানুষ বেশি বাড়াবাড়ি করে সে বিপদে পড়ে।

৭.
অপঅঁলা হঁ ন লারিচ।
শব্দার্থ: অপঅঁলা= অ পাগলা; হে পাগল, হঁ=সাঁকো, লারিচ=নাড়ানো।
**ব্যাখ্যা :** পাগলা, সাঁকো নেড়ো না। (বুদ্ধিহীনকে খারাপ কিছু মনে করিয়ে দিলে সে সেটা নিয়ে মেতে ওঠে।)

৮.
অঁনের বুয্ প'লেও বুঝে।
শব্দার্থ: অঁনর=নিজের, বুয্=বিষয়; স্বার্থ, প'লে=পাগলে।
**ব্যাখ্যা :** পাগলেও নিজের স্বার্থ বুঝে।

৯.
অতি ভক্তি যার,
চোরর্ লক্ষণ তার।
শব্দার্থ: অতি=অতিরিক্ত, চোরঅর্=চোরের।
**ব্যাখ্যা :** অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

১০.
অঁওল ফুলি কেলাগাছ হইয়ে।
শব্দার্থ: অঁওল=আঙুল, ফুলি=ফুলে বা ফাঁপা হয়ে, কেলাগাছ=কলাগাছ, হইয়ে=হয়েছে।
**ব্যাখ্যা :** রাতারাতি সম্পদশালী হওয়া।

১১.
অঁইনত্ ফিরিং পরে।
শব্দার্থ: অঁইনত্=আগুনে, ফিরিং=ফড়িং।
**ব্যাখ্যা :** আগুনে ফড়িং পড়া। অর্থাৎ মৃত্যু ডেকে আনা।

১২.
অউগ্গা ভাতৎ দুয়া চইল
দুই হতিনঅর এত কইল্।
শব্দার্থ: অউগ্গা=একটি, হতিনঅর্=সতিনের, কইল্=ঝগড়া।
**ব্যাখ্যা :** একটি ভাতের দুটি চাল, দুই সতিনের অত ঝগড়া অর্থাৎ দুজনের অভীষ্ট এক হলে বিবাদ অনিবার্য।

www.pathagar.com

১৩.
আইল্লাত্তুনারঅ কাট্টল দানা ডঁঅর।
**শব্দার্থ:** আইল্লা=মালসা (আগুন রাখার পাত্র), আইল্লাত্তুন=মালসার চেয়ে, দানা=বীচি, ডুঁঅর = বড়।
**ব্যাখ্যা :** যে মালসায় কাঠাল বীচি পোড়া হয় (খাবার জন্য) সেটা যেন মালসার চেয়ে বড়ো অর্থাৎ কর্তার চেয়ে তার অধীনস্থের দাপট বেশি।

১৪.
আদা বিয়ারি জাঁ'চর খবর লর।
**শব্দার্থ:** বিয়ারি=বেপারি, জাঁ'চ্ = জাহাজ, জাঁ'চর্=জাহাজের।
**ব্যাখ্যা :** আদা বেপারি জাহাজের খবর নিচ্ছে। ( ছোটো লোকের বড় ভাব। গরীব লোকের বড় চিন্তা।)

১৫.
আঁরর্ লয় বাজি-বুজি,
পীরর লই মশকারি।
**শব্দার্থ:** আঁরর্=অপর, লয়=সঙ্গে, মশকারি=ঠাট্টা মশকারি বা বেয়াদবি।
**ব্যাখ্যা :** সাধারণ লোকের সঙ্গে না হয় যা তা ব্যবহার করে পার পাচ্ছো, তাই বলে পীর বা গুরু বা শক্তলোকের সঙ্গেও সেরূপ করলে বিপদের আশংকা।

১৬.
আদা চোরনির্ মনত্ গুত্গুতি।
**শব্দার্থ:** চোরনি = (চোর পুং লিঙ্গ, চোরনি স্ত্রী লিঙ্গ) মহিলা চোর, মনত্ = মনে, গুত্গুতি =গুতাগুতি; আশংকা; অস্থিরতা।
**ব্যাখ্যা :** চোরের মনে সর্বদা ধরা পড়ার আশংকা।

১৭.
আঁধা, আঁতুর, লেং,
এই তিন্নোয়া শতানর্ ঠ্যাং।
**শব্দার্থ:** আঁধা=অন্ধ, আঁতুর= পঙ্গু, লেং=খোঁড়া, তিননোয়া = তিনটে।
**ব্যাখ্যা :** অন্ধ, পঙ্গু আর খোঁড়া- এদের মনে শয়তানি বুদ্ধি কাজ করে। (অর্থাৎ শারীরিক ঘাটতি যেন-তেন ভাবে পূরণ করতে চায়।)

১৮.
আক্কল্ অলা কুঁইররে ছেই কওয়া ন পরে।
**শব্দার্থ:** আক্কল =বুদ্ধি, আক্কল অলা= বুদ্ধিমান, ছেই = দূর দূর করা, কওয়া=বলা।
**ব্যাখ্যা :** বুদ্ধিমান কুকুর পরিস্থিতি আপনা-আপনি বুঝে। (বুদ্ধিমান লোক ধাক্কা খাওয়ার আগেই পরিস্থিতি বোঝে নেয়।)

১৯.
আদা পঁচিলেও ঝাঁচ থাকে।

www.pathagar.com

শব্দার্থ: ঝাঁচ = ঝাঁজ, আদার নিজস্ব গন্ধকে ঝাঁজ বা সুগন্ধ বলে ।
**ব্যাখ্যা :** আদা পঁচে গেলেও তার নিজস্ব সুগন্ধি থাকে । (ধনী বা সম্মানী লোক দরিদ্র হলেও তার বৈশিষ্ট হারায় না ।)

২০.
আক্কলে সকল বন্দি, শিঁয়রে বন্দি গাছ
নারীর হাতত পুরুষ বন্দি, জলে বন্দি মাছ ।
শব্দার্থ: আক্কল = বুদ্ধি, আক্কলে= বুদ্ধিতে, শিঁয়র=শেকড় ।
**ব্যাখ্যা :** বুদ্ধিমানের কাছে সকলে বশ্, গাছ বাঁধা শেকড়ে, পুরুষ বশ্ থাকে নারীর হাতে, মাছ বন্দী পানিতে ।

২১.
আগে খেশ, বাদে দরবেশ ।
শব্দার্থ: খেশ= নিজ, বাদে=পরে ।
**ব্যাখ্যা :** নিজের কাজ আগে, অন্যের কাজ পরে বা আগে ঘরের মানুষের সেবা, পরে গুরুর সেবা ।

২২.
আগর্ হাল্ যেইক্কা যায়, পিছর্ হাল হিক্কা যায় ।
শব্দার্থ: আগর্=আগের বা সামনের, হাল=লাঙ্গল (এখানে জমিতে চাষ দেয়া অর্থে ব্যবহৃত), পিছর্=পেছনের, হিক্কা= সেদিকে ।
**ব্যাখ্যা :** সামনের গরু যেদিকে লাঙ্গল টেনে নিয়ে যায়, পেছনের গরুও সেদিকে লাঙ্গল টেনে নিয়ে যায় । (বিশেষত পরিবারের বড় সন্তান ভাল বা খারাপ যে পথে যায় পরের সন্তানও সে পথে যেতে চায় ।)

২৩.
আতা খাইলুম্ পাতা খাইলুম্ ভাতঅর্ সুক্কান্ নাই
পরঅর্ মা'রে মা ডাকিলে মার সুক্কান্ নাই ।
শব্দার্থ: আতা খাইলুম= আতা ফল খেলাম (প্রকৃত অর্থে বিভিন্ন খাবার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে), সুক্কান=সুখটুকু, পরঅর=পরের ।
**ব্যাখ্যা :** আতা, পাতা খেয়ে যেমন ভাত খাওয়ার তৃপ্তি পাওয়া যায় না তেমনি অপরের মা'কে মা ডাকলে মা'য়ের মতো আদর মমতা পাওয়া যায় না ।

২৪.
আন্ পরা বৈদ্য জমঅর্ ভাই ।
শব্দার্থ: আন্=নাই যার বা যার নাই, পরা=পড়া বা লেখাপড়া, জমঅর্= যম বা জান কবচকারি বা আযরাইল ।
**ব্যাখ্যা :** অশিক্ষিত (পড়ালেখা ছাড়া) তান্ত্রিক বা চিকিৎসক যমের ভাই । (পড়ালেখা ছাড়া তান্ত্রিক বা চিকিৎসক যে কোনো ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর প্রাণ কেড়ে নিতে পারে ।)

www.pathagar.com

২৫.
আতুরার্ চতুরা বুদ্ধি ।
শব্দার্থ: আতুর্= আতুড় বা পঙ্গু, চতুর্=চালাক বা বুদ্ধিমান ।
**ব্যাখ্যা :** পঙ্গু লোক সব সময় সুচতুর হয় ।

২৬.
আনুনি নুন বিলানি, আপদি জাতত্ উট্ঠে ।
শব্দার্থ: আনুনি= লবণ ছাড়া, বিলানী= যে বিলায় বা বিলি বণ্টণ করে, আপদি= অখ্যাত ।
**ব্যাখ্যা :** যার লবণ নাই সে লবণ বিলাচ্ছে, আর অখ্যাত জন বনেদি বা সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে ।

২৭.
আঁচল্ত্ আনি পাতিলাত্ রাঁধে ।
শব্দার্থ: আঁচলঅত্=আঁচলে, রাঁধে=রান্না করা ।
**ব্যাখ্যা :** আঁচলে করে চাউল এনে পাতিলে রান্না করে । (সংসারের দুরবস্থা এমন যে আঁচলে করে অল্প পরিমাণই শুধু সংগ্রহ করা সম্ভব ।)

২৮.
আগর বিবি আগ-ছুরতি, মাঝর্ বিবি সুয়া,
শেষর্ বিবি লাং-খাডানি, ঠারে ভাঙে গুয়া ।
শব্দার্থ: আগর=পূর্বের বা প্রথম, আগ-ছুরতি=সুন্দরী, সুয়া=সোহাগী, লাং=পরকিয়া, লাং-খাডানি=পরকিয়া নিয়ে মত্ত থাকে, গুয়া=সুপারি ।
**ব্যাখ্যা :** ঘরের প্রথম বিবি ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন করেছে, দ্বিতীয় বিবি স্বামীর কাছে অত্যন্ত সোহাগী । শেষের বিবি পরকিয়া নিয়ে ব্যস্ত । তার দৃষ্টির চমকে যেন শক্ত সুপারি ভেঙে পড়ে, পুরুষ কোন্ ছার ।

২৯.
আগে জামাইয়ে কাটঠ্ল ন খায়
পরে জামাইয়ে ভোতা ন পায় ।
শব্দার্থ: জামাই=মেয়ের স্বামী বা জামাই, ভোতা=কাঠালের উচ্ছিষ্ট অংশ ।
**ব্যাখ্যা :** নতুন জামাই বেড়াতে আসলে গোমরে (লজ্জায়) কাঁঠাল খেতো না, জামাই পুরনো হয়ে শাশুড় বাড়িতে বেড়াতে এসে খাওয়ার জন্য কাঠালের ভোঁতাও পাচ্ছে না । (প্রথম প্রথম জামাই শাশুড় বাড়িতে নিজের মান দেখানোর জন্য কাঁঠালের মতো সাধারণ জিনিস খেতে চাইতো না; পুরোনো হয়ে গেলে জামাইয়ের ভাগ্যে কাঠালের ভোঁতাও জোটে না ।)

৩০.
আছে গরু ন চয় হাল, দুক্খ ন যায় সর্বকাল ।
শব্দার্থ: ন= না, চয়=চাষ, ন চয়= চাষ করে না, হাল= লাঙ্গল বহন করে না ।
**ব্যাখ্যা :** ঘরে গরু আছে অথচ জমি চাষ করছে না, তেমন কৃষকের দুঃখ সব সময় তার পেছনে লেগেই থাকে অর্থাৎ যা আছে তার সদ্ব্যবহার না করলে দুঃখ লেগে থাকে ।

www.pathagar.com

৩১.
আন্ কথায় কান্ ভার,
ভেজাইল্লা কথায় মন্ বেজার।
শব্দার্থ: আন্ কথা=আজে বাজে কথা, ভেজাইল্লা=উদ্ভট, বেজার=রাগ করা।
**ব্যাখ্যা :** আজে বাজে কথায় কান ভারি হয়, কিন্তু উদ্ভট কথায় রাগ ধরে যায়। (অনেক সময় বাজে কথা গুছিয়ে বলে বিশ্বাস করানো যায়; কিন্তু কথা এলোমেলো হলে বিরক্তি ধরে।)

৩২.
আম খাই ভরঅ পানি
পোঁদে কদে আঁই ন জানি।
শব্দার্থ: ভরঅ= পান করা, পোঁদে=মল দ্বার বা গুহ্যদ্বার, কদে=বলে, আঁই=আমি।
**ব্যাখ্যা :** আম খেয়ে পানি খেলে মলদ্বার (গুহ্যদ্বার) অসহায় হয়ে পড়ে। (আম অর্থাৎ টক্ জাতীয় ফল খাবার পর পানি খেলে পাতলা পায়খানার প্রকোপ হয়।)

৩৩.
আঁরার্ হতিনে লারে চারে
ভইন্ হতিনে পরাণে মারে।
শব্দার্থ: আঁরার্=অপর, লারে-চারে=নড়া-চড়া করে।
**ব্যাখ্যা :** অন্য কেউ সতিন হলে বিভিন্ন ভাবে যন্ত্রণা দিয়ে থাকে, কিন্তু নিজের বোন সতিন হলে সুযোগ পেলেই প্রাণে মারে।

৩৪.
আলা আইয়ক্ ডালা আইয়ক্ মুই পুতর্ মা,
পাইক্ আইয়ক্ পিয়াদা আইয়ক্ মুই কিচ্ছু না।
শব্দার্থ: আলা= উচ্চ, ডালা=ডাল বুৎপত্তিগত অর্থে নীচ, আইয়ক্=আসুক, মুই=আমি।
**ব্যাখ্যা :** বড়-ছোট যে কেউ আসুক তখন আমি ছেলের মা, কিন্তু রাজার পাইক-পিয়াদা আসলে আমি কিছু না। অর্থাৎ ছেলে সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা। (ছেলে অপকর্ম করলেও উচ্চ-নীচ কারো কথা কানে নেয় না; কিন্তু, রাজশক্তি যা শাস্তি দিতে পারে না তার কাছে ছেলেকেই অস্বীকার করে বসে।)

৩৫.
আল্লার্ ধন অফুরানী, বন্দার ধন্ খোয়ার পানি।
শব্দার্থ: বন্দা= বন্দা, খোয়া=কুয়াশা।
**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া নিয়ামত অফুরন্ত, কিন্তু বান্দার ধন (যে কোন কিছু) কুয়াশার পানির মতো ক্ষণস্থায়ী।

৩৬.
আরৎ বারি ঝারৎ বারি, বুইয্যা বুরির্ ঠেলাঠেলি।
শব্দার্থ: আরৎ=ঘরের বেড়ায়, ঝারৎ= জঙ্গলে (এখানে গাছ-গাছাড়া)।
**ব্যাখ্যা :** বৃদ্ধ বয়সে স্বামী-স্ত্রী নগণ্য বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় মেতে থাকে।

www.pathagar.com

৩৭.
আঁআরা এন্ বাঁআল কজ্জ গরি ঘি খাই ।
শব্দার্থ: আঁরা=আমরা, এন্=এমন, বাঁআল=বাঙাল (স্থানীয়ভাবে বাঙ্গাল অর্থে অশিক্ষিত হলেও এখানে বিবেচনাহীন), কজ্জ= ঋন, গরি=করে ।
**ব্যাখ্যা :** আমরা এমন বিবেচনাহীন বাঙালি জাতি, ঋণ করে হলেও ঘি খেতে চাই ।

৩৮.
আপন ভালা ত জগৎ ভালা
ভাত ভালা ত পানি ভালা ।
শব্দার্থ: আপন ভালা=নিজে ভালো ।
**ব্যাখ্যা :** নিজে ভালো হলে সবকিছুই ভালো, ভাত ভালো হলে পানিও ভালো হয় ।

৩৯.
ইজ্জতর্ কুঁ'রি, বদা পারে ছ'কুরি ।
শব্দার্থ: ইজ্জতর্=ইজ্জত, কুঁ'রি=মুরগি, বদা=ডিম, পারে=পাড়ে, ছ'কুরি=ছয়কুড়ি ।
**ব্যাখ্যা :** ইজ্জতের মুরগি, ডিম দিচ্ছে ছয় কুড়ি । (বনেদি পরিবারের লোকজন নানা গুণের অধিকারী হয় ।)

৪০.
ইবা ধরি, না উবা ধরি, হাতর্ পাঁচ নইদদ্ ছারি ।
শব্দার্থ: ইবা=এটা, উবা=ওটা, নইদ্দ=দিওনা ।
**ব্যাখ্যা :** এটা ধরি না ওটা ধরি করে হাতে যা আছে তা ছেড়ে দিওনা ।

৪১.
উত্তরর্ মাইন্ষর্ ভুতরে বুদ্ধি, দইনর্ মইষ সাদা
পছিমর্ মইষ চান ছুরতি, পুগর মইষ গাধা ।
শব্দার্থ: মইষ=মানুষ, ভুতরে = ভেতরে বা অভ্যন্তরে, দইনর = দক্ষিণের, পছিমর = পশ্চিম দিকের, চান-ছুরতি = চাঁদের ন্যায় সুন্দর, পুগর = পূর্ব দিকের, গাধা = বোকা ।
**ব্যাখ্যা :** উত্তর দিকের মানুষ ধূর্ত, দক্ষিণ দিকের মানুষ সরল-সোজা, পশ্চিম দিকের মানুষ সুশ্রী আর পূর্বদিকের মানুষ গাধার ন্যায় বোকা। (বৃহত্তর চট্টগ্রাম এর পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবাদ ।)

৪২.
উন্দুরে ন চিনে কুরআন কিতাব পুঁথি,
অমাইন্ষে ন বুঝে ভালা মাইন্ষর্ গতি ।
শব্দার্থ: উন্দুর = ইঁদুর, অমাইন্ষে = অমানুষ বা মনুষ্যত্বহীন, মাইনষর্=মানুষের ।
**ব্যাখ্যা :** ইঁদুর যেমন কুরআন কিতাব, পুঁথি চিনে না বা বুঝে না, তেমনি মনুষ্যত্বহীন বা মানবতাহীন মানুষও মানি লোকের মান রাখতে জানে না বা সম্মানী মানুষকে সম্মান দিতে জানে না ।

www.pathagar.com

৪৩.
উনাভাতে দুনা বল ।
**শব্দার্থ:** উনা=স্বল্প, উনাভাতে=স্বল্প ভাতে; স্বল্প আহারে, দুনা=দ্বিগুণ, বল= শক্তি ।
**ব্যাখ্যা :** স্বল্প আহারে দ্বিগুণ শক্তি হয় ।

৪৪.
উঝার ভা ঘর, বৈদ্য বউয়র নিত্তি জ্বর ।
**শব্দার্থ:** উঝা = ঘর বাঁধার মিস্ত্রী বা ঘরামি, ভা=ভাঙ্গা ।
**ব্যাখ্যা :** যিনি অপরের ঘর বাঁধে তার ঘর থাকে ভাঙা, আর তান্ত্রিক চিকিৎসকের (ঝাঁড় ফুক্‌কারী) বউ সর্বদা জ্বরে আক্রান্ত থাকে । (বাইরে অতি কর্মব্যস্ততা দেখাতে গিয়ে নিজের কাজের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন ।)

৪৫.
উরি আই জুরি বইয়ন ।
**শব্দার্থ:** উরি=উড়ে, আই=এসে, জুরি = জুড়ে বসা; বড় জায়গা দখল করা, বইয়ন=বসা ।
**ব্যাখ্যা :** উড়ে এসে জুড়ে বসা ।

৪৬.
উরি নেএলি ফুরি খন্ ।
**শব্দার্থ:** উরি=উড়ে, নেএলি=বেরিয়ে, ফুরি=ফুড়ে, খঅন্=খাওয়া ।
**ব্যাখ্যা :** উড়ে চলে ফোঁড়ে খাওয়া । (কোনোভাবে সংসার চালানোর ব্যবস্থা করা) ।

৪৭.
উদারে ফুড়ে বরকনে ঠুড়ে ।
**শব্দার্থ:** উদার=হাওলাদ বা ঋণ, ফুড়ে=ফুটু হয়ে যাওয়া, বরকন=অলংকারাদি স্বল্প সময় ব্যবহারের জন্য কাউকে দেয়া, ঠুড়ে= ভেঙে যাওয়া ।
**ব্যাখ্যা :** কাউকে ঋণ দিলে সম্পর্ক নষ্ট হয়, অনুরূপ কাউকে অলংকারাদি স্বল্প সময় ব্যবহারের জন্য দিলে তাও নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ নিজের জিনিস কাউকে না দেওয়াই শ্রেয় ।

৪৮.
উল্‌ডা চোরে কোতোয়াল ধরে ।
**শব্দার্থ:** উল্‌ডা=উল্টা, কোতোয়াল=নগর প্রহরী; আধুনিক পুলিশ ।
**ব্যাখ্যা :** কোথায় কোতোয়াল চোর ধরবে; চোরই কোতোয়ালকে ধরতে যায় অর্থাৎ উল্টো বিচার ।

৪৯.
উঅরে চক্‌চইক্‌কা ভিতরে ভক্ ভইক্‌কা ।
**শব্দার্থ:** উঅরে=উপরে, চক্‌চইক্‌কা=চাকচিক্যময়, ভক্ ভইক্‌কা=ময়লা আবর্জনায় পূর্ণ তথা অসুন্দর ।
**ব্যাখ্যা :** উপরে সাদা ভিতরে কালা ।

www.pathagar.com

৫০.
উঅরে বাবু আনা, ভিতরে খেরঅর্ বেনা।
**শব্দার্থ:** উঅরে=উপরে, বাবুআনা=বাবু মানে সাহেবের মতো, খেরঅর্=খড়ের, বেনা=আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য খড়ের তৈরি বেণী সদৃশ বস্তু বিশেষ।
**ব্যাখ্যা :** বাইরে বাবুগিরি কিন্তু ভেতরে আগুন জ্বালাবার খড়ের বেণী বিশেষ অর্থাৎ অন্ত সারশূন্য।

৫১.
উইত্ গইল্লে দুই টিয়া, চিত্ গইল্লে দুই বিছা।
**শব্দার্থ:** উইত্=উপুড়, গইল্লে=করলে, দুই টিয়া=পাছার দুই পাশের মাংসপিন্ডকে বুঝানো হয়েছে, বিছা=অণ্ডকোষ।
**ব্যাখ্যা :** উপুড় করলে দুই মাংস পিণ্ড, আর চিত করলে দুই অণ্ডকোষ ছাড়া আর কিছু নেই অর্থাৎ দেউলিয়া।

৫২.
উইত্ গইল্লে ফঁড়া, চিত্ গইল্লে ল'ড়া।
**শব্দার্থ:** উইত্=উপুড়, গইল্লে= করলে, ফঁড়া=মলদ্বার বা গুহ্যদ্বার; পায়ুপথ, ল'ড়া=লিঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ।
**ব্যাখ্যা :** উপুড় করলে দেখা যাবে পায়ুপথ, আর চিত করলে দেখা যাবে লিঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ। (এই প্রবাদও উপরের প্রবাদের মতো কাউকে দেউলিয়া বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।)

৫৩.
উজু কথাত্ গুঁজা বেজার, গরম ভাতত্ ঠুঁডা বেজার।
**শব্দার্থ:** উজু=সোজা, গুঁজা=কুঁজো, বেজার=রাগ করা, ঠুঁডা=খোঁড়া বা যার ডান হাত কোন কাজের অনুপযোগি।
**ব্যাখ্যা :** সোজা কথা বল্লে কুঁজোরা রাগ করে যেহেতু তিনি কুঁজো, তদ্রুপ খাওয়ার জন্য গরম ভাত দিলে খোঁড়া মানুষও রাগ করে যেহেতু গরম ভাত খেতে তার সমস্যা।

৫৪.
উজু কথাত্ গুঁজা বেজার
গরম ভাতঅত্ বিলাই বেজার।
**শব্দার্থ:** উজু=সোজা, গুঁজা=কুঁজো, বেজার=রাগ করা, বিলাই=বিড়াল।
**ব্যাখ্যা :** সোজা কথা বল্লে কুঁজো মানুষ অর্থাৎ যে সোজা পথে চলতে জানেনা সে রাগ করে; তদ্রুপ গরম ভাত দিলে বেড়াল রাগ করে যেহেতু বিড়াল গরম ভাত খেতে পারে না।

৫৫.
উস্তাদর মাইর্ পোঁয়াইত্তা।
**শব্দার্থ:** উস্তাদ= শিক্ষক বা ওস্তাদ বা গুরু ভাবার্থে বিচক্ষণ ব্যক্তি, উস্তাদর্=গুরুর, মাইর্=চাল, পোঁয়াইত্তা=শেষ রাত্রে বা শেষ প্রহরের কালে; ভাবার্থ=শেষ মুহূর্তে।
**ব্যাখ্যা :** উস্তাদ বা শিক্ষক শেষ রাতেই চূড়ান্ত চালটা দেন। (বিচক্ষণ ব্যক্তিরা শেষ মুহূর্তেই আসল কাজ সারেন।)

www.pathagar.com

৫৬.
উনা ভাতে দুনা বল, ভরা পেডে রসাতল।
**শব্দার্থ:** উনা=কম বা স্বল্প, পেটে কিছু জায়গা রাখা, দুনা=দ্বিগুণ, বল=শক্তি।
**ব্যাখ্যা :** স্বল্প খাবার খেলে কাজে শক্তি পাওয়া যায়, আর ভরা পেটে কাজ করা যায় না বা শক্তি পাওয়া যায় না, শরীরে আলস্য আসে।

৫৭.
উষর পানি তুঁইষর অঁইন।
**শব্দার্থ:** উষর=কুয়াশা, তুঁইষ= ধানের উচ্ছিষ্ট অংশ বা তুঁষ, অঁইন=আগুন।
**ব্যাখ্যা :** কুয়াশার পানি এবং তুঁষের আগুনের চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। (কারণ রোদের তাপ পেলেই কুয়াশার পানি উবে যায় আর তুঁষের আগুন জ্বলতে থাকে।)

৫৮.
উর মেডি চুর গরে, মইনা মেডি ঝুল গরে।
**শব্দার্থ:** উর মেডি=শক্ত মাটি, চুর=গুড়ো করা, চুর্ণ করা, গরে=করে, মইনা মেডি=এঁটেল মাটি, ঝুল=নরম, পানির মত টলটলে, (ঝুল মূলত তরকারির ঝোল) মাটিকে তরকারির ঝোলের মতো করছে।
**ব্যাখ্যা :** শক্ত মাটিকে গুড়ো করছে, এঁটেল মাটিকে পানির মতো নরম করছে। (ক্ষমতার দাপট দেখানো।)

৫৯.
উয়া উয়া কুশগুইশলর্ ডোয়া।
**শব্দার্থ:** উয়া=সোজা বা খাঁড়া, কুশগুইশল=আঁখ, ডোয়া=কাণ্ড।
**ব্যাখ্যা :** সোজা বা খাঁড়া বস্তুর উপমা।

৬০.
এক জামাই হারাম, আরেক বিলাই হারাম।
**শব্দার্থ:** হারাম = অকৃতজ্ঞ, আরেক=অন্যটি, বিলাই = বিড়াল।
**ব্যাখ্যা :** জামাই ও বিড়াল– দুই'ই সমান অকৃতজ্ঞ।

৬১.
এক মলইর্ ধরা, আর এক জলইর্ ধরা।
**শব্দার্থ:** মলইর্ = মোল্লা, জলই = পেরেক।
**ব্যাখ্যা :** মোল্লার প্যাঁচ অর পেরেকের প্যাঁচ (আটকানো) সমান শক্ত! (পেরেকের মতো মোল্লাও ধর্মের নামে সমাজে এঁটে আছে এবং নিজের জীবিকার স্থায়ী ব্যবস্থা করে নিয়েছে।)

৬২.
এক মুইক্কার্ পাতত্ ভাত,
দুই মুইক্কার্ কোয়ালৎ হাত।
**শব্দার্থ:** মুইক্কার্ = বিবাহিত পুরুষ, এক মুইককার্=এক স্ত্রীর স্বামীকে বুঝায়, পাতত্=বাসনে, কোয়ালৎ = কপালে।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** এক নারী বিয়ে করলে পেটে ভাত পড়ে অর্থাৎ শান্তিতে থাকা যায়, দুই নারী বিয়ে করলে কপালে হাত দিতে হয় অর্থাৎ অশান্তি পোহাতে হয়।

৬৩.
একজনে এক গলাৎ লামিলে,
আরেক জনত্তুন এক আঁড়ুৎ লামা পরে।
**শব্দার্থ:** এক গলাৎ=গলা সমান, লামিলে=নিচে নামা, আঁড়ুৎ = হাঁটু, এক আঁড়ুৎ=এক হাটু সমান, লামা = নামা।
**ব্যাখ্যা :** একজন এক গলা সমান পানিতে নামলে, অন্যজনকে একহাঁটুতে হলেও নামতে হয় অর্থাৎ দানের প্রতিদান কিছু হলেও দিতে হয়।

৬৪.
এজ্জনর্ কথাৎ দজ্জন হাঁসিলে হিতারে ক'দে রইস্সা,
নিজর কথাৎ নিজে হাঁসিলে তারে ক'দে বেইশ্শা।
**শব্দার্থ:** এজ্জন=একজন, এজ্জনর্=একজনের, হিতারে=তাকে, ক'দে=বলে, রইস্সা=রসিক, দজ্জন্=দশজন, হাঁসিলে=হাসলে।
**ব্যাখ্যা :** যার কথায় সবাই হাসে তাকে বলে রসিক, আর নিজের কথায় যে নিজে হাসে তাকে বলে বেশ্যা।

৬৫.
এক শিয়ালে গুজইল্লে, আরেক শিয়ালর্ বদা টন্টনায়।
**শব্দার্থ:** গুজইল্লে=আওয়াজ করলে বা ডাক ছাড়লে, বদা=ডিম, তবে এক্ষেত্রে অ-কোষ অর্থে ব্যবহৃত (আরবি শব্দের অপভ্রংশ বদা অর্থ ডিম), টন্টনায় = ব্যথা করা, বদা টনটনায়= প্রতিক্রিয়া বুঝাতেই এখানে 'বদা (অণ্ডকোষ) টনটনায়' হয়েছে।
**ব্যাখ্যা :** এক শিয়াল ডাক ছাড়লে অন্য শিয়ালও সহজাত ভাবে সে ডাকে যোগ দেয় অর্থাৎ সমমানসিকতার লোক একই পথে চলে।

৬৬.
একর্ কেঁড়ি পেড়ন্ ভালা।
**শব্দার্থ:** একর্=এক-এর; কেঁড়ি=কড়ি, ক্ষুদ্রাংশ, পেড়ন্=কুঁড়ানো।
**ব্যাখ্যা :** ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাভই উত্তম।

৬৭.
এনালে খাইলে বেনালে ছেরায়।
**শব্দার্থ:** এনালে=এক নাগাড়ে, খাইলে=খেলে, বেনালে=যেখানে কোন শৃংখলা নেই, ছেরায়=পাতলা পায়খানা বা উদরাময়।
**ব্যাখ্যা :** এক নাগাড়ে খেতে থাকলে উদরাময় হবেই।

৬৮.
এরিঅ ন দে, ছুরিঅ ন দে।
**শব্দার্থ:** এরি=ছেড়ে, এরি ন দে=ছেড়ে দেয় না, ছুরি=ছুরি বা ধারালো ছুরি, কিন্তু এখানে ছুরি অর্থে ছেড়ে, ছুরি ন দে=ছেড়ে দেয় না।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** ছেড়েও দেয় না, ছুঁড়েও দেয় না। (যেন-তেনভাবে নিজের কব্জায় রাখা।)

৬৯.
এক হারাই বুঝে, আরেক মারাই বুঝে।
**শব্দার্থ:** হারাই= হারিয়ে, মারাই=সর্বনাশ করার সুযোগ দেয়া বিশেষত মেয়েদের বেলায় যৌন সংক্রান্ত সুযোগ দেয়া।
**ব্যাখ্যা :** কেউ সর্বস্ব হারিয়ে বুঝে, কেউ সর্বনাশ করার সুযোগ দিয়ে বুঝে।

৭০.
এক ঝরে বাইরা ন যায়।
এক মাঘে শীত ন যায়।
এক কঅরে জনম ন যায়।
**শব্দার্থ:** ঝর=বৃষ্টি, স্থানীয় ভাবে বৃষ্টিকে ঝর বলা হয়, বাইরা=বর্ষা কাল, কঅরে=কাপড়ে।
**ব্যাখ্যা :** এক পশলা বৃষ্টিতে বর্ষাকাল যেমন শেষ না, অনুরূপ এক মাঘে শীতও যায় না আর এক কাপড় সারা জীবনও শেষ হয় না।

৭১.
এক হাতত্ তালি ন বাজে।
**শব্দার্থ:** হাতত্=হাতে, ন বাজে=বাজে না।
**ব্যাখ্যা :** এক হাতে তালি বাজে না।

৭২.
এনে উলাইয়া বুরি, তার উঅরে ঢুলত্ বারি।
**শব্দার্থ:** এনে=এমনিতে, উলাইআ=উৎফুল্ল; সহজে মেতে উঠা, বুরি=বুড়ি, উঅরে বা উয়রে=উপরে, ঢুলত্=ঢুলে, বারি=বাড়ি, ঢুলে তাল দেয়া, ঢুলে আওয়াজ তোলা।
**ব্যাখ্যা :** বুড়ি এমনিতেই থাকে উৎফুল্ল, তার উপরে ঢুলে পড়েছে বাড়ি। (ফলে বুড়িকে ঘরের ভেতরে আটকানো দায় বা তার নাচন ঠেকায় কে!)

৭৩.
এক ঘরত্ তিন জন চতুর
এক জন মইলে পাঁজজন্ আঁতুর।
**শব্দার্থ:** ঘরত্=ঘরে, পাঁজজ্ন= পাঁচজন, আঁতুর=আঁতুড় বা পঙ্গু।
**ব্যাখ্যা :** এক ঘরে তিন জনই চালাক, এক জন মারা গেলে পাঁচ জনই পঙ্গু। (বোশ চালাকেরা যে কোনো ভাবে কাজে ফাঁকি দেয়ার অজুহাত খোঁজে।)

৭৪.
এক বুঝে গায়, আর এক বুঝে মা'য়।
**শব্দার্থ:** গায়=শরীরে, মা'য়=মা-এ।
**ব্যাখ্যা :** এক বুঝে শরীরে, আর এক বুঝে মা'য়ে। (শ্রমের কষ্ট সেই বুঝে যে পরিশ্রম করে; অনুরূপ, সন্তান পালনের কষ্ট বুঝে মা।)

www.pathagar.com

৭৫.
এক জিদে মরে, আর এক বদে মরে।
শব্দার্থ: মরে=মারা যায়, বদে=হিংসায়।
**ব্যাখ্যা :** মানুষ জিদ করলে মরে, আর অপরকে হিংসা করলে মরে। (জিদ করলে মানুষ বিপদগ্রস্থ হয়, হিংসাও বিপদ ডেকে আনে।)

৭৬.
এব্‌বার হাগি তিনবার ফিরি চ'ন্‌।
শব্দার্থ: হাগি=মলত্যাগ করা, চ'ন্‌=দেখা।
**ব্যাখ্যা :** একবার মলত্যাগ করে তিনবার ফিরে দেখা। (ব্যয় করার পর অনুশোচনা করা।)

৭৭.
এক সের চইলর্‌ পাঁচ্‌চান পিড়া
যার কথা ফুনি তার কথা মিড়া।
শব্দার্থ: চইলর্‌=চাউলের, পিড়া=পিঠা, ফুনি=শুনি, মিড়া=মিষ্টি।
**ব্যাখ্যা :** এক সের চাউলের পাঁচটি পিঠা, যার কথা শুনি তার কথা মিষ্টি। (বিশ্বাসপ্রবণ লোক।)

৭৮.
এরিঅ ন দে, বেরিঅ মারে।
শব্দার্থ: এরিঅ=ছেড়ে, ন দে=দেয় না, বেরিঅ=বেষ্টন করা।
**ব্যাখ্যা :** ছেড়েও দেয় না, বেষ্টন করে রেখে মারে।

৭৯.
এব্‌বার খাইয়ে যে মুইশর্‌ দই
আবার আইস্‌সে যে হাত্‌তুয়া লই।
শব্দার্থ: এব্‌বার= একবার, মুইশর্‌=মহিষের, আইস্‌সে=এসেছে, হাত্‌তুয়া=মাটির তৈরি পাত্র।
**ব্যাখ্যা :** মহিষের দই একবার খেয়ে আরো পাবার জন্য পাত্র নিয়ে এসেছে। (সুযোগ বার বার নিতে চাওয়া।)

৮০.
এক বাপল্‌লা ন পারে, আর এক জইদারল্‌লা ন পারে।
শব্দার্থ: বাপল্‌লা= পিতার সাথে, ন পারে=পারে না, জইদারল্‌লা= জমিদারের সাথে।
**ব্যাখ্যা :** পিতা এবং জমিদারের সাথে রাগ, অভিমান বা প্রতিযোগিতা দিয়ে লাভ নেই।

৮১.
ওস্‌তাদর্‌ মাইর পোয়াইত্‌তা।
শব্দার্থ: ওসতাদ=গুরু বা ওস্তাদ, ওস্‌তাদর্‌=গুরুর, মাইর=মার, পোয়াইত্‌তা=শেষ প্রহরে।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** গুরু শেষ রাতেই চূড়ান্ত চাল্‌টা দেন। (অভিজ্ঞতার সাথে এঁটে উঠা কঠিন।)

৮২.
ওদা ধানর্‌ চইল্‌ দরঅ, গোদা ঠেঙঅর্‌ লাত্থি দরঅ।
**শব্দার্থ:** ওদা=আর্দ্র বা ভেজা, চইল্‌=চাউল, দরঅ=শক্ত, গোদা=মোটা, ঠেঙ=পা, ঠেঙঅর্‌=পায়ের।
**ব্যাখ্যা :** আর্দ্র ধানের চাউল শক্ত হয় আর মোটা পায়ের লাত্থিও শক্ত হয়। (কারো কোন ঘাটতি থাকলেও অবজ্ঞা করা ঠিক নয়।)

৮৩.
ওদা চইলর্‌ ভাত্‌ রাঁধে তারে কয় রাঁধনি,
ওদা ধানর বারা বাঁধে তারে কয় বাঁধনি।
**শব্দার্থ:** কয়=বলে, বারা=ধান ভানা, বাঁধনি= যে ধান ভানে।
**ব্যাখ্যা :** আর্দ্র চাউলের ভাত যিনি রাঁধেন, তাকে রাঁধুনি বলে। আর আর্দ্র ধান যিনি ভানে তাকে বাঁধনি বলে। (আয়োজনের ঘাটতি সত্ত্বেও যে কাজ সমাধা করতে পারে সেই প্রকৃত কর্মকুশলি।)

৮৪.
কড়িয়ার পানি কড়ে যায় চাইয়ুম।
**শব্দার্থ:** কড়িয়ার = কোথাকার, কড়ে=কোথায়, চাইয়ুম = দেখব।
**ব্যাখ্যা :** কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায় তা দেখব। (সবকিছুর মূলকথা এর পরিণাম।)

৮৫.
কিলরে ভুতে ডরায়।
**শব্দার্থ:** কিল = মার, কিলরে=মারাকে বা পিটুনিকে, ডরায়=ভয় পায়।
**ব্যাখ্যা :** মারকে ভূতেও ভয় পায়। (মারের উপর ঔষধ নাই।)

৮৬.
কড়ে আদিনাতর্‌ পাআর্‌, কড়ে ছ'লে খের খার।
**শব্দার্থ:** আদিনাথ=কক্সবাজার জেলার দ্বীপ উপজেলা মহেশখালীতে অবস্থিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র তীর্থ স্থান, আদিনাথর পাআর্‌ = আদিনাথ মন্দির যে পাহাড়ে অবস্থিত, ছ'ল = ছাগল, ছ'লে=ছাগলে, খের= খড়; ঘাস।
**ব্যাখ্যা :** কোথায় আদিনাথের পাহাড়, আর কোথায় ছাগলে ঘাস খায়। (অসম উদাহরণ বুঝাতে এ কথা ব্যবহৃত হয়।)

৮৭.
কড়ে আচ্‌চানর্‌ তারা, কড়ে জইনর্‌ নারা।
**শব্দার্থ:** আচ্‌চান্‌=আসমান, আচ্‌চানর্‌=আসমানের, জইন্‌=জমিন, জইনঅর্‌=জমিনের, নারা=নাড়া।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** কোথায় আসমানের তারা, আর কোথায় জমিনের নাড়া। (অসম উদাহরণ বুঝাতে ব্যবহৃত।)

৮৮.
কোয়াল উঁতাইলে দুক্ আইয়ে।
**শব্দার্থ:** কোয়াল = কপাল, উঁতাইলে = চুলকালে, দুক্ = দুঃখ, আইয়ে=আসে।
**ব্যাখ্যা :** কপাল চুলকালে দুঃখ আসে। (কপাল চুলকানো অমঙ্গলের লক্ষণ।)

৮৯.
কোয়ালৎ জিয়ান্ আছে, হিয়ান হইব।
**শব্দার্থ:** কোয়ালৎ=কপালে, জিয়ান্ = যা, হিয়ান = তা, হইব=হবে।
**ব্যাখ্যা :** ললাটে যা আছে, তা-ই হবে বা ললাটের লিখন যায় না খণ্ডন।

৯০.
কাওয়ার্ গুচ্চ কাওয়ায়ে ন খায়।
**শব্দার্থ:** কাওয়া = কাক, গুচ্চ=গোস্ত বা মাংস।
**ব্যাখ্যা :** কাকের মাংস কাকে খায় না।

৯১.
কাওয়ায়ে চিনে ঘাওয়া কাট্টল্,
হুয়রে চিনে ঘেচু,
অজাইত্তা বাঁআলে চিনে তিন জাইত্তা কঁচু।
**শব্দার্থ:** কাওয়া=কাক, ঘাওয়া=ঘা বা পঁচা, কাট্ঠল= কাঠাল, হুয়র=শুকর, ঘেচু=ছোট কচু, অজাইত্তা=জাত নাই যার, বাঁআলে=বাঙ্গাল, জাইত্তা=প্রকার।
**ব্যাখ্যা :** কাকের রুচি পঁচা কাঁঠালে, শুকরের রুচি ঘেচুতে আর আভিজাত্যহীন বাঙালির রুচি তিন জাতের কচুতে।

৯২.
কুঁইরর্ লেচ্ চোঁয়াৎ ভইল্লেও উজু ন-অয়।
**শব্দার্থ:** কুঁইরর্ =কুকুরের, লেচ্ =লেজ, চোঁয়াৎ =চোঙায়, ভইললেও =পুরলেও, উজু =সোজা, ন অয়=হয়না।
**ব্যাখ্যা :** কুকুরের লেজ চোঙায় পুরলেও সোজা হয় না।

৯৩.
কুঁইরর্ লেচ্ বার বছর চুঁআৎ ভরি
রাইলেঅ যেই বেঁআ হেই বেঁআ থাকে।
**শব্দার্থ:** কুঁইর=কুকুর, লেচ্=লেজ, চুঁয়াৎ=চোঙায়, ভরি=পুরে, রাইলেঅ=রাখলে, বেঁআ=বাঁকা, হেই=সেই।
**ব্যাখ্যা :** কুকুরের লেজ বার বছর চোঙায় পুরে রাখলেও যেই বাঁকা সেই বাঁকাই থাকে।

৯৪.
কুঁইরর্ পরানে ডুই (ধোঁাই) পিড়া মাগের।
**শব্দার্থ:** কুঁইর=কুকুর, কুঁইরর্=কুকুরের, ডুইপিড়া=ভাপা পিঠা, মাগের=ইচ্ছা হওয়া;

সাধ হওয়া।
**ব্যাখ্যা :** কুকুরের ভাপা পিঠা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। (যে যার যোগ্য নয় তা পেতে চাওয়া।)

৯৫.
কুঁইরর্ পেড়ত ঘি হজম ন হয়।
শব্দার্থ: কুঁইর=কুকুর, কুঁইরর্=কুকুরের, পেড়ত=পেটে।
**ব্যাখ্যা :** কুকরের পেটে ঘি হজম হয় না।

৯৬.
কেলার্ ভুতর্ আঁইট্‌ঠা,
ঘেড়র্ ভুতর্ ঘাইট্‌ঠা।
মাছর্ ভুতর্ লইট্‌টা,
দেশর্ ভুতর্ পইট্‌টা।
শব্দার্থ: আঁইট্‌টা=দানাদার কলা, ঘেড়=ঝগড়াটে, ঘাইট্‌ঠা=ঘাটের মাঝি, লইট্‌টা=লইট্টা মাছ, পইট্‌টা=পটিয়া, চট্টগ্রাম জেলার বৃহৎ উপজেলার নাম।
**ব্যাখ্যা :** কলার মধ্যে বিচি বা দানাদার কলা, ঝগড়াটে মানুষের মধ্যে ঘাটের মাঝি, মাছের মধ্যে লইট্টা মাছ, আর দেশের ভেতর পটিয়া। (অদ্ভুত ধরনের বৈশিষ্ট বুঝাতে।)

৯৭.
কথা ন কইঅ যারৎ,
কথা ন কইয় বুক বাজারৎ,
কথা কইঅ বিল পাতথরৎ।
শব্দার্থ: যারৎ=জঙ্গলে, বুক বাজার = বাজারের ভেতর, বিল পাত্থর = জনশূন্য মাঠ।
**ব্যাখ্যা :** যেখানে সেখানে নয় জনশূন্য বিলের মাঝে কথা বলা সবচেয়ে নিরাপদ।

৯৮.
কথাৎ কথা বারে।
শব্দার্থ: কথাৎ=কথায়, বারে=বাড়ে; বৃদ্ধি পায়।
**ব্যাখ্যা :** কথায় কথা বাড়ে।

৯৯.
কঁঅচি বেশি চিবিলে তিতা বাইর অয়।
শব্দার্থ: কঁঅচি = লেবু, চিবিলে=টিপলে, অয়=হয়।
**ব্যাখ্যা :** লেবু বেশি টিপলে তেতো বের হয়। (সব কিছুতে বেশি বাড়াবাড়ি করলে তিক্ততা বাড়ে।)

১০০.
কুঁইরে ঘাগ্‌ঘুয়াইলে, ছ'লর্ বদা টন্‌টনায়।
শব্দার্থ: কুঁইরে=কুকুরে, ঘাগ্‌ঘুয়ার=ঘেউঘেউ করা, ঘাগ্‌ঘুয়াইলে=ঘেউ ঘেউ করলে, ছ'ল্=ছাগল, ছ'লর্=ছাগলের, বদা=অ-কোষ, টন্‌টনায়=ব্যথা করা।
**ব্যাখ্যা :** কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে ছাগলেরও প্রতিক্রিয়া হয়।

www.pathagar.com

১০১.
কেলা চুরিৎ ফাঁসি নাই ।
শব্দার্থ: কেলা= কলা, কেলা চুরি= কলা চুরি ।
**ব্যাখ্যা :** কলা চুরিতে কারো ফাঁসি হয় না। (কলা একটি মামুলি দ্রব্য সে জন্য তা চুরি করলেও তার জন্য ফাঁসির বিধান নাই বা বলা যেতে পারে ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নাই ।)

১০২.
কাজীর্অ বিলাইয়ও হাঁত ছিয়ারা পরে ।
শব্দার্থ: কাজী=বিয়ের কাজী (তবে পূর্বে কাজী সমাজের বিচারক বা ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। ভালোভাবে কুরআন কিতাব জানা যার জন্য আবশ্যক), কাজীর্অ= কাজীর ঘরের, বিলাই=বিড়াল, হাঁত=সাত, ছিয়ারা = পারা বা অধ্যায়, হাঁত ছিয়ারা=সাত অধ্যায় ।
**ব্যাখ্যা :** কাজীর ঘরের বিড়ালও সাত অধ্যায় কোরান পড়তে পারে। (গুণসম্পন্ন পরিবারের লোকজন কম-বেশি গুণ পাবেই ।)

১০৩.
কাওয়ায়ে কাট্ঠল খাইয়ে, বগার পোঁদৎ আঁড়া বাইজ্ঝে ।
শব্দার্থ: কাওয়া=কাকে, কাট্ঠল=কাঁঠাল, বগার পোঁদৎ = বকের পাছায়, আঁড়া=আঁঠা, বাইজ্ঝে=লেগেছে ।
**ব্যাখ্যা :** কাকে কাঁঠাল খায়, আর বকের পাছায় আঠা লাগে। (উদর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে ।)

১০৪.
কোয়ালৎ ঘিলা ফুল ফুইট্ঠে ।
শব্দার্থ: কোয়ালৎ=কপালে, ঘিলা=পাহাড়ি লতা জাতীয় এক প্রকার গাছের ফল, ঘিলা ফুল = দুর্লভ ফুল, (ঘিলা ফুল দেখা সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হয়), ফুইট্ঠে=ফুটেছে ।
**ব্যাখ্যা :** কপালে ঘিলা ফুল ফুটেছে। (ভাগ্যদেবী চোখ তুলে দেখেছে ।)

১০৫.
কোণ্ পাইতে পাইতে দোন্ পাইত চায় ।
শব্দার্থ: কোণ্=ঘরের কোণ, পাইতে=পেতে, দোন্=স্থানীয়ভাবে ১৬ কানি (৪০ শতকে এককানি) জমিতে এক দোন বা দ্রোন ।
**ব্যাখ্যা :** ঘরের কোনো পেলে পরে পুরো ঘরের মালিক হতে চায়। (কিছু সুযোগ দিলে আরো সুযোগ পেতে চায় ।)

১০৬.
কথা পেডত্ থাইলে গুণ গরে
পেড়র বাইরে গেলে রণ গরে ।

**শব্দার্থ:** পেডত্=পেটে, পেডত্ থাইলে=পেটের মধ্যে থাকলে, গরে=করে।
**ব্যাখ্যা :** কথা পেটে থাকলে গুণ করে আর পেটের বাইরে গেলে রণ করে (ক্ষতি করে)।

১০৭.
কেইলত্ বাঁধা চাবির ছরা
গজির ভিতর হাদ্দি চাইলে তাক্কুলুম্ মারা।
**শব্দার্থ:** কেইলত্=কোমরে, গজির=চাউল রাখার মাটির পাত্র, হাদ্দি=হাত দিয়ে, তাক্কুলুম্ মারা=শূন্য।
**ব্যাখ্যা :** কোমরে দৃষ্টি নন্দন মোটা চাবির তোড়া রয়েছে, তবে চাউলের হাড়িতে হাত দিয়ে দেখলে শূন্য পাত্র। (বাইরে ঠাট-বাট থাকলেও আসলে আর্থিক ভাবে অসচ্ছল।)

১০৮.
কাইট্টা ফুতা অউল ন গরিচ।
**শব্দার্থ:** কাউট্টা=তৈরি, ফুতা=সুতা, অউল=অগুছালো, ন গরিচ= করো না।
**ব্যাখ্যা :** তৈরি সুতা অগোছালো করো না।

১০৯.
কিয়র হাল কিয়র বিয়াল।
**শব্দার্থ:** কিয়র=কারো, হাল=ভাল বা স্বচ্ছল অবস্থা, বিয়াল=অব্যবস্থা, অস্বচ্ছল।
**ব্যাখ্যা :** কারো স্বচ্ছল অবস্থা, কারো অস্বচ্ছল অবস্থা বা কোনো ঘটনার কারণে কারো সুবিধা হওয়া, আর কারো অসুবিধার সৃষ্টি হওয়া।
কির্পনর্ সম্বত্তি বকিলে খায়।
**শব্দার্থ:** কির্পন্=কৃপণ, কির্পনর্=কৃপণের, সম্বত্তি=সম্পত্তি, বকিলে=হাড়কিপ্টে।
**ব্যাখ্যা :** কৃপণের সম্পত্তি হাড়কিপটের হাতে পড়ে অর্থাৎ তা কারো কাজে লাগে না।

১১০.
কাড়া ঘা'ত নুন্অর্ ছিটা।
**শব্দার্থ:** কাড়া=কাটা, কাড়া ঘা'ত=শরীরের কাটা অংশে বা কাটা দাগে, নুনঅর্=নুনের বা লবণের, ছিটা=ছিটিয়ে দেয়া।
**ব্যাখ্যা :** কাটা ঘা'য়ে লবণের ছিটা দেয়া। (কষ্টের উপর কষ্ট দেয়া)
১১১.
কইলে কথা লারাচারা, ন কইলে কথা পেটভরা।
**শব্দার্থ:** লারাচারা=নাড়াচাড়া, পেটভরা=পেটেই থাকে।
**ব্যাখ্যা :** কথা মুখের বার করলে ছড়িয়ে পড়ে, আর না বললে তা পেটের মধ্যেই আটকে থাকে অর্থাৎ নিজের মধ্যেই থাকে। শেষের পথই উত্তম।

১১২.
কাউয়া ন বুঝে কিঁয়র দুক্,আইলত্ লই যাই চিরে বুক।
**শব্দার্থ:** কাউয়া=কাকে, কিঁয়র=কারো, দুক্=দুঃখ, আইলত্=জমির আইল, লই যাই=নিয়ে গিয়ে, চিরে=ছিঁড়ে ফেলা।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** কাকে বুঝে না কারো দুঃখ, আইলে নিয়ে বুক ছিঁড়ে খায়। (খাবার মাত্রই বিশেষ করে মুরগিসহ বিভিন্ন ধরনের ছানা ধরে নিয়ে আলে বসে এবং বুক ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। কিন্তু ছানার মায়ের যে দুঃখ তা কাক বুঝে না।)

১১৩.
কাউয়ার বাখাত কুইলার ছ, যার ছ তার র।
শব্দার্থ: কাউয়ার=কাকের, বাখাত=বাসায়, কুইলা = কোকিল, কুইলার ছ=কোকিলের ছানা, যার ছ=যার ছানা, তার র= তার শব্দ।
**ব্যাখ্যা :** কাকের বাসায় কোকিলের ছানা বেড়ে উঠলেও সে কোকিলের শব্দই করে।

১১৪.
কাজির গরু আছে গনাৎ, তোয়াই ন পায় উরাৎ।
শব্দার্থ: গনাৎ=গণনায়, তোয়াই=খুঁজে, তোয়াই ন পায়=খুঁজে পাচ্ছে না, উরা=গোয়াল ঘর।
**ব্যাখ্যা :** কাজির গরু গণনার মধ্যেই আছে কিন্তু গোয়াল ঘরে খুঁজে পাওয়া যায় না। (সরকারি জিনিসপত্র কর্মচারীরা লুটপাট করে থাকে।)

১১৫.
কাজির গরু কিতাবত্ আছে, উরাৎ নাই।
শব্দার্থ: কিতাবত্=কিতাবে, উরাৎ= গোয়াল ঘরে।
**ব্যাখ্যা :** কাজির গরু কিতাবে লেখা আছে, কিন্তু গোয়াল ঘরে নেই। (সরকারি জিনিসপত্র কর্মচারীরা লুটপাট করে থাকে।) (কথার সাথে কাজের মিল না থাকা)

১১৬.
কান্অর্ সোনায়ে কান্ কাডে।
শব্দার্থ: কান্অর্=কানের, কাডে=কাটে।
**ব্যাখ্যা :** কানের সোনায় নিজের কান কাটে। (নিজের লোকই নিজের ক্ষতি করে।)

১১৭.
কানা চৌগৎ হাল্ পরে, ভা ঠেং গাতৎ পরে।
শব্দার্থ: চৌগৎ=চোখে, হাল্=ময়লা, ভা=ভাঙ্গা, গাতৎ=গর্তে।
**ব্যাখ্যা :** কানা চোখে ময়লা বেশি পড়ে আর ভাঙ্গা পা'ই গর্তে পড়ে। বিপদ আরো বিপদ ডেকে আনে।

১১৮.
কাম নাই গইতত্, বাল নাই হাইতত্।
শব্দার্থ: কাম=কাজ, গইত্ত=করার, বাল=নিম্নাঙ্গের চুল (উর্দু শব্দ বাল অর্থ মাথার চুল), হাইত্ত=ছিঁড়ে ফেলা; উপড়ে ফেলা।
**ব্যাখ্যা :** কাজ নেই তেমন করার এমনকি উপড়ানোর মতো নিম্নাঙ্গের কেশও নেই। (প্রয়োজনের কাজ ছেড়ে অ-কাজ করে বেড়ানোকে বুঝানোকে হয়েছে।)

www.pathagar.com

১১৯.
কামাইয়া মাথাত্ খুর বুলান্ ।
শব্দার্থ: কামাই=মাথার চুল চেঁচে ফেলা, বুলান্=বুলিয়ে নেয়া ।
**ব্যাখ্যা :** চুল ছেটে ফেলা মাথায় খুর বুলিয়ে নেয়া । (অপ্রয়োজনীয় কাজ করা ।)

১২০.
কার্ ঘরর্ সোনা কার্ ঘরত্ গইয্‌যায় ।
শব্দার্থ: কার্=কাহার, ঘরর্=ঘরের, ঘরত্=ঘরে, গইয্‌যা=গড়াগড়ি দেয়া ।
**ব্যাখ্যা :** কার বাড়ির সোনা কার বাড়িতে গিয়ে গড়াগড়ি খায় । (উচ্চপদের লোকের বিপাকে পড়া বুঝায় ।)

১২১.
কার্ দুক্ কনে বুঝে, যার্ যার্ পেডৎ তে তে গুঁজে ।
শব্দার্থ: কার্=কাহার, দুক্=দুঃখ, কনে=কে, পেডৎ=পেটে, গুঁজে=লুকিয়ে রাখা ।
**ব্যাখ্যা :** কার দুঃখ কে বুঝে, যার দুঃখ সে নিজের কাছেই লুকিয়ে রাখে ।

১২২.
কিঅর্ মাঝে কী? পানি ভাতত্ ঘি ।
শব্দার্থ: কিঅর্=কিসের, ভাতত্=ভাতে, পানিভাত=পান্তাভাত ।
**ব্যাখ্যা :** কিসের মধ্যে কী, পান্তাভাতে ঘি । (অসামঞ্জস্যপূর্ণ ।)

১২৩.
কি তাইর্ মুখর্ ঠাঠ, আনাদি মুক্ চাচ ।
শব্দার্থ: তাইর্=তার (নারী বুঝাতে তাইর), মুখর্=মুখের, ঠাঠ=দেমাক, আনা=আয়না, আনাদি=আয়না দিয়ে, চাচ=দেখা ।
**ব্যাখ্যা :** সে নারীর কিযে দেমাক, আয়না দিয়ে মুখ দেখে । (যোগ্যতার বেশি ঠাঁট দেখানো ।)

১২৪.
কি কইয়ুম্ বাঁ'লরে,
তে ন বুঝে ঠারে ঠুরে ।
দুই চাইর্ লাথি পইল্‌লে ঘারে
তই বাঁ'লে বুঝিৎ পারে ।
শব্দার্থ: কইয়ুম্=বলবো, বাঁ'লরে=বাঙালিকে, তে=সে, ন বুঝে=বুঝে না, ঠারে ঠুরে=আকারে ইঙ্গিতে, পইললে=পড়লে, ঘারে=ঘাড়ে, তই=তখনই ।
**ব্যাখ্যা :** বাঙ্গালকে কি আর বলবো, সে আকারে ইঙ্গিতে বুঝে না । ঘাড়ের উপর দুই-চার লাথি পড়লে তখনই বাঙ্গালে বুঝতে পারে । (সাধারণ লোক সহজে প্রয়োজনিয় শিক্ষা নিতে চায় না । তাই চাপে পড়ে বা ঠকে শেখে ।)

১২৫.
কিলর্ ডরে বাদর নাচে ।
শব্দার্থ: কিলর্=কিলের; মারের, ডরে=ভয়ে ।
**ব্যাখ্যা :** বানর নাচে মারের ভয়ে ।

www.pathagar.com

১২৬.
কিলরে ভূতে ডরায়।
**শব্দার্থ:** কিলরে=কিলকে; মারকে, ডরায়=ভয় পায়।
**ব্যাখ্যা :** মারকে ভূতও ভয় পায়। (শক্তি প্রদর্শন দ্বারা কাজে বাধ্য করানো)।

১২৭.
কেঁড়া দি কেঁড়া তোলা পরে।
**শব্দার্থ:** কেঁড়া=কাঁটা।
**ব্যাখ্যা :** কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়।

১২৮.
কেঁড়ি কুত্‌তার ঘেড়ঘেড়ি বেশি।
**শব্দার্থ:** কেঁড়ি=নেড়ি, কুত্‌তার=কুকুরের, ঘেড়ঘেড়ি=ঘেউ ঘেউ।
**ব্যাখ্যা :** নেড়ি কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ বেশি।

১২৯.
কম্‌বলত্‌তুন কেশ বাছিলে কম্‌বল থাইত্‌অ ন।
**শব্দার্থ:** কম্‌বল্‌=কম্বল, কম্‌বলত্‌তুন=কম্বল থেকে, বাছিলে=বাছলে, থাইত্‌অ=থাকত, ন=না, থাইত্‌অ ন=থাকবে না।
**ব্যাখ্যা :** কম্বলের কেশ তুললে কেশ তুলতে তুলতে শেষ পর্যন্ত কম্বল থাকবে না। (সমাজ যেখানে খারাপ লোকে ভরা সেখানে খারাপ লোকদের শাস্তি দিতে গেলে আর লোকই থাকবে না।)

১৩০.
কিঅ কাড়ে ধারে, কিঅ কাড়ে ভরে।
**শব্দার্থ:** কিঅ=কেউ, কাড়ে=কাটে, ধারে=প্রভাবে, ভরে=শক্তিতে।
**ব্যাখ্যা :** কেউ কাজ সিদ্ধ করে নিজের প্রভাবে, আবার কেউ করে শক্তির জোরে।

১৩১.
কেলা দি পোয়া ভারান্‌।
**শব্দার্থ:** কেলা=কলা, পোয়া=শিশু, ভারা=প্রতারনা, কিন্তু এক্ষেত্রে ফাঁকি দেয়া।
**ব্যাখ্যা :** কলা দিয়ে শিশুর মন পাওয়ার চেষ্টা করা। (কম বুদ্ধিমানকে অল্পতে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা।)

১৩২.
কেলারে দলা ছঁইয়রে গিল, গরুরে নাফা বউঅরে কিল্‌।
**শব্দার্থ:** কেলা=কলা, দলা=মাটির ঢেলা, ছঁই=সিম, ছঁইয়রে=সিমকে, গিল=গাছ বা বাঁশের আগা, নাফা=গরু বা মহিষের নাক ছিদ্র করে রশি দিয়ে আটকিয়ে রাখা।
**ব্যাখ্যা :** ভাল ফলন পাওয়ার জন্য কলা গাছের গোড়ায় মাটির ঢেলা দিতে হয়, সিম বৃদ্ধির জন্য দিতে হয় গিল বা লতা বাড়ার খুঁটি, গরু বা মহিশকে শাসন করতে প্রয়োজন নাফা আর বউকে বসে রাখতে মাঝে মধ্যে মারধর বা কিল দিতে হয়।

www.pathagar.com

১৩৩.
কেলারে দলা, হলইদরে ছাই, বউয়রে সেবিলে পুতরে পায়।
**শব্দার্থঃ**কেলা=কলা, কেলারে=কেলাকে, দলা=মাটির ঢেলা, হলইদ্=হলুদ, হলইদ্রে=হলুদকে, পুত=পুত্র, পুতরে=পুত্রকে।
**ব্যাখ্যা :** ভাল ফলন পাওয়ার জন্য কলা গাছের গোড়ায় মাটির ঢেলা দিতে হয়, অনুরূপভাবে ভাল ফলনের জন্য হলুদ গাছে দিতে হয় ছাই। মা যদি পুত্রের মন পেতে চায় তা হলে মাকে পুত্রবধূর সেবা করতে হয়।

১৩৪.
কইঅর তেল দি কই ভাজন।
**শব্দার্থ:** কই=কৈ মাছ, কইঅর=কৈ মাছের, দি=দিয়ে, ভাজন=ফ্রাই করা।
**ব্যাখ্যা :** কৈ মাছের তেল দিয়ে কৈ মাছ ভাজতে হয়। (নিজের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা।)

১৩৫.
কোআলর্ দোষে ভাত ন মিলে
ভিঁডারে গাইল দে রাইৎ পোআইলে।
**শব্দার্থ:** কোআলর্=কপালের, মিলে=মেলা; পাওয়া, ভিঁডারে=ভিটি, গাইল=গাল দেয়া, পোআইলে=শেষ হলে।
**ব্যাখ্যা :** কপালের দোষে ভাত জোটে না, রাত শেষ হলে বাড়ির ভিটিকে গালিগালাজ করে। (নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো।)

১৩৬.
কোদালে বুক টানে, পিট ন টানে?
**শব্দার্থ:** বুক টানে=বুকের দিকে টানা, পিট ন টানে=পিঠের দিকে টানা।
**ব্যাখ্যা :** মাটি কাটার সময় কোদাল সব সময় বুকের দিকে টানে, পিঠের দিকে টানে না। (সবাই নিজস্ব লোকজনের প্রতি পক্ষপাত দেখায়)।

১৩৭.
কোলৎ মারে পোষ্যুইন ন দে।
**শব্দার্থ:** কোলৎ=কুলে, মারে=মেরে ফেলা, পোষ্যুইন=দত্তক দেয়া, ন দে=দেয় না।
**ব্যাখ্যা :** শিশুকে বড়ো করার সাধ্য নেই আবার কাউকে দত্তকও দেয় না। (কোন কাজ নিজের সাধ্যাতীত হলে অপরের সাহায্য নেয়া বাঞ্চনিয়।)

১৩৮.
কাম ন জানছ্ এক খান, হুরি ভঁঅছ দশ্শান।
**শব্দার্থ:** ন জানছ্= জান না, হুরি=পায়ে পিষ্ট করে, ভঁঅছ=ভাঙ্গ, দশ্শান=দশটি।
**ব্যাখ্যা :** নিজে একটি কাজও জান না, কিন্তু পায়ে মাড়িয়ে দশটি ভাঙ্গ। (অকর্মণ্যলোক কাজ ভণ্ডূল করে বেশি।)

১৩৯.
কাউয়াতুন্অ ন হারে, চিলত্তুনঅ ন হারে।

শব্দার্থ: কাউয়া= কাক, কাউয়াতুন্=কাকের কবল থেকে, ন হারে= রক্ষা পাওয়া, চিলত্তুন=চিলের কবল থেকে।
**ব্যাখ্যা :** কাকের কবল থেকেও রক্ষা পায় নি, চিলের কবল থেকেও রক্ষা পায় নি। (কাক বা চিলের খাবার হিসেবে প্রচণ্ড হুমকিতে আছে) সুরক্ষাহীন তথা অসহায়।

১৪০.
ক পইনর্ পিডা খাইয়ছ্।
শব্দার্থ: ক=কয়টি, (স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় 'ক' অর্থ কওয়া বা বলা কিন্তু এক্ষেত্রে 'কয়টি'), পইনর্=পিঠা তৈরি করার মাটির পাত্র বিশেষ, পিডা=পিঠা, খাইয়ছ্= খেয়েছো।
**ব্যাখ্যা :** কয়টি পাত্রের পিঠা খেয়েছো অর্থাৎ কী বা তোমার অভিজ্ঞতা।

১৪১.
কথা কইয়ুম আঁরে ঠাঁরে, বুঝি লইবা আক্কলর্ জোরে।
শব্দার্থ: কইয়ুম=বলবো, আঁরে=আকারে, ঠাঁরে=ইঙ্গিতে, লইবা=নেবে, আক্কল্= আক্কেল বা বুদ্ধি, আক্কলর্=আক্কেলের।
**ব্যাখ্যা :** কথা বলবো আকারে ইঙ্গিতে, তা বুদ্ধির জোরে বুঝে নিতে হবে।

১৪২.
কঁচু কুড়ার কল্ কঁচু কুড়াত্ খোলা পরে।
শব্দার্থ: কুড়ার=জমির এক খণ্ডকে 'কুড়া' বলে; যাকে আমরা ভূমির এক খণ্ডও বলতে পারি। কল্=গিট্টু।
**ব্যাখ্যা :** কঁচুর গিট্টু খেলা কঁচুর জমিতেই খেলতে হয়। (যেখানকার ঝগড়া বা বিষয় সেখানেই নিষ্পন্ন করা শ্রেয়।)

১৪৩.
কেঁচা কেলা প'না গরের।
শব্দার্থ: কেঁচা=কাঁচা, কেলা=কলা, প'না=পাকা, গরের= করছে।
**ব্যাখ্যা :** কাঁচা কলাকে পাকা করছে। তিনি কথার মার্ প্যাঁচে কাঁচা কলাকে পাকা করতে পারঙ্গম।

১৪৪.
কিও ন চায় ঘিনে, কিও ন চায় ডরে।
শব্দার্থ: কিও=কেউ, চায়=চাওয়া, ঘিনে=ক্ষুদ্র মনে করে হিংসা করা।
**ব্যাখ্যা :** কেউ ক্ষুদ্র মনে করে আসছে না, সমকক্ষ নয় এই ভেবে কেউ ভয়ে আসছে না। (বিশেষত কন্যার বিয়ের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।)

১৪৫.
কার গরুরে কনে ধোঁয়া দের?
শব্দার্থ: কার=কাহার, কনে=কে (এখানে কনে অর্থ পাত্রি নয়), দের=দিচ্ছে।
**ব্যাখ্যা :** কার গরুকে কে ধোঁয়া দেয়। (সাহায্য করার লোক কোথায়!)

www.pathagar.com

১৪৬.
কেউ সোনা ধইল্লে মেডি হয়, কেউ মেডি ধইল্লে সোনা হয়।
শব্দার্থ: ধইল্লে=ধরলে, মেডি=মাটি।
**ব্যাখ্যা :** কেউ স্বর্ণে হাত দিলে তা মাটি হয়ে যায়, আবার কেউ মাটিতে হাত দিলে তা সোনা হয়ে যায়। (নিজের গুণে লোক ধনী বা গরীব নয়।)

১৪৭.
খরাতর্ চইল আরালা অইলেও ভালা।
শব্দার্থ: খরাত্=ভিক্ষা, চইল=চাউল, খরাতর্ চইল = ভিক্ষার চাল, আরালা =আঁকাড়া।
**ব্যাখ্যা :** ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আঁকাড়া হলেও মন্দ নয়।

১৪৮.
খালৎ থাইলে ঝুরাতও থাকে।
শব্দার্থ: খালৎ=খালে, ঝুরা = নালা।
**ব্যাখ্যা :** খালে পানি থাকলে নালাতেও থাকে। (বড়তে যা আছে ছোটতে স্বল্প পরিমাণে হলেও থাকবে।)

১৪৯.
খইয়া খাই মরে, আ খইয়া ধান ফোয়াদ্দি মরে।
শব্দার্থ: খইয়া=যে খায়, আ খইয়া= যে খায় না, ফোয়াদ্দি = শুকিয়ে, এখানে খেটে।
**ব্যাখ্যা :** খাওয়ার লোক খেয়ে মরে, কাজের লোক খেটে মরে যদিও খেতে পায়না।

১৫০.
খাইতে খাইতে ডাইন, গাইতে গাইতে গাইন।
শব্দার্থ: ডাইন=পেটুক।
**ব্যাখ্যা :** খেতে খেতে পেটুক হয়, গাইতে গাইতে গায়েন (গায়ক) হয়। (অনুশীলনে মানুষ দক্ষ হয়।)
১৫১.
খাইতে খাইতে জির লাম্বা হইয়ে।
শব্দার্থ: জির=জিহ্বা, লাম্বা = লম্বা, এখানে লোভ-লালসা।
**ব্যাখ্যা :** খেতে খেতে লোভ-লালসা বেড়েছে।

১৫২.
খাইত পাইলে ভালা, খাইত ন পাইলে হালা।
শব্দার্থ: খাইতঅ=খেতে, পাইলে= পেলে, ন পাইলে= না পেলে।
**ব্যাখ্যা :** খেতে দিলে ভাল, আর না দিলে শালা।

১৫৩.
খাই ন জানি মরে, বই ন জানি লরে।
শব্দার্থ: ন জানি= না জেনে, বই = বসা, লরে=নড়াচড়া করা। কিন্তু এখানে লরে অর্থ স্থান চ্যুত হওয়া।

**ব্যাখ্যা :** খেতে না জেনে মরে, বসতে না জেনে নড়ে বা স্থানচ্যুত হয়। (নিজের স্বার্থ নিজে চিনে না নিলে অসুবিধায় পড়তে হয়।)

১৫৪.
খের ছিরি দুইয়ান ন গরে।
**শব্দার্থ:** খের= খড়, ছিরি=ছিঁড়ে, দুইয়ান= দুই টুকরো, ন গরে=করে না।
**ব্যাখ্যা :** খড় ছিড়ে দুই টুকরো করে না। (নিষ্কর্মা।)

১৫৫.
খাজানাত্‌তুন বাজনা বেশি।
**শব্দার্থ:** খাজানাত্‌তুন=খাজনার।
**ব্যাখ্যা :** খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। (আয়োজনের চেয়ে আড়ম্বর বেশি।)

১৫৬.
খাল কাইচ্‌ছা বারী,
মুছলমানর নারী,
হিন্দুর দারি,
ডলু বাঁশ'র লাই,
মুরার কুইল্‌লা গাই
এই পাঁচ চিজর্ বিশ্বাস নাই।
**শব্দার্থ:** কাইচ্‌ছা=ধারে, খাল কাইচছা=খালের (নদীর) ধারে, বারী=বাড়ি, দারি=দাড়ি, ডলু বাঁশ=এক প্রকার পাতলা বাঁশ, লাই=বাঁশের তৈরি ঝুড়ি, মুরা=পাহাড় বা জঙ্গলকে স্থানীয়ভাবে মুরা বলা হয়, মুরার কুইললা=জঙ্গলের ধারের, চিজ=দ্রব্য; কিন্তু এখানে 'চিজ' অর্থ প্রকারের বুঝানো হয়েছে।
**ব্যাখ্যা :** খালের ধারের বাড়ি (যে কোনো সময় নদী ভাঙ্গনে পড়তে পারে), মুসলমানের নারী (যে কোনো সময় তালাক পেতে পারে), হিন্দুর দাঁড়ি (যে কোনো সময় ছেঁটে ফেলা হতে পারে), ডলু বাঁশের ঝুড়ি (যে কোনো সময় ভেঙ্গে যেতে পারে) আর জঙ্গলের ধারের গাই (যে কোনো সময় বাঘ-ভালুকসহ বন্য প্রাণীর পেটে যেতে পারে) তাই এদের অস্থিত্ব অনির্ভরযোগ্য।

১৫৭.
খাইত পানি নাই, পুন ধুইত মধু তুয়ায়।
**শব্দার্থ:** খাইত=খেতে বা পান করতে, পুন=পায়ুপথ, তুয়ায়=খোঁজে।
**ব্যাখ্যা :** পান করার পানি নেই, কিন্তু মলত্যাগ করে ধোঁয়ার জন্য মধু খোঁজছে। (সাধ্যের অতীত ঠাঁট দেখানো।)

১৫৮.
খাংকিরে খাংকি ন ডাইলে হাল্‌দাত ব'ই হাগে।
**শব্দার্থ:** খাংকি=নষ্টা মেয়ে, ন ডাইলে=না ডাকলে, হালদাত্=ঘরের প্রবেশ পথে, বই=বসে, হাগে=মলত্যাগ করা।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** নষ্টা মেয়েকে নষ্টা মেয়ে না বললে ঘরের প্রবেশ পথে বসেই মলত্যাগ করে। (লোকে সহজে অভ্যাস ছাড়ে না।)

১৫৯.
খাইলাম দাইলাম মাছে কাছে, আর ন যাইয়ুম্ তেলইনর কাছে।
শব্দার্থ: খাইলাম=খেলাম, দাইলাম=খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ করা, তেলইন=তারকারির মাটির পাত্র।
**ব্যাখ্যা :** মাছ এবং অন্যান্য তরকারি দিয়ে খাওয়া শেষ করলাম, ফলে আর তরকারির পাত্রের কাছে যাব না। (এরপর খাওয়ায় টান পড়বে)।

১৬০.
খারে মন খা, পুত ঝি ন'ইতে খা।
শব্দার্থ: খারে=খাও, ন'ইতে=হওয়ার আগে বা জন্ম হওয়ার আগে।
**ব্যাখ্যা :** ছেলে-মেয়ে জন্ম নেয়ার আগেই যা ইচ্ছে তা খেয়ে নাও।

১৬১.
খাইবার শঅঁত্ বার ভাই, পোয়া লইত কিয় নাই।
শব্দার্থ: শঅঁত্=সময়, লইত= লওয়ার, কিয়=কেউ।
**ব্যাখ্যা :** খাওয়ার সময় বার ভাইকে দেখা যায়, কিন্তু শিশুকে কোলে নেয়ার সময় কাউকে পাওয়া যায় না। (কাজের লোক পাওয়া ভার।)

১৬২.
খাইল্লা ঘরর্ মাইল্লা রাজা খাইতে বঅর্ সুক,
মাইত্ত গেলে ধইত্ত নাই ইয়ান বঅর্ দুক্।
শব্দার্থ: খাইল্লা=খালি, ঘরর্=ঘরের, মাইল্লা=মালিক, বঅর্=বেশি, মাইত্ত=মারার জন্য গেলে, ধইত্ত=ধরার, ইয়ান=এটা।
**ব্যাখ্যা :** খালি ঘরের একমাত্র মালিক রাজা, খাওয়া-দাওয়ায় খুবই সুখ, মারার জন্য কেউ আসলে ধরার জন্য (সাহায্যকারী) কেউ যে থাকে না সেটাই সবচেয়ে দুঃখের কথা। (একা কিছু ভোগ করার মজা যেমন, সাজাও তেমন।)

১৬৩.
খাল্ ফুয়াইলে রেক্ ন মরে।
শব্দার্থ: রেক্=পানির ধারা।
**ব্যাখ্যা :** খাল শুকালে পানির ধারা কিন্তু শুকায় না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা মানুষের প্রভাব শেষ পর্যন্ত কিছু না কিছু থেকে যায়।

১৬৪.
খদা বরঅ টোনা দর্অ।
শব্দার্থ: খদা=খোদা (খোদা ফার্সি শব্দ), বরঅ=বড় বা শ্রেষ্ঠ, টোনা=জাদুটোনা, দর্অ=শক্ত।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** খোদা বড় বা শ্রেষ্ঠ, আর জাদুটোনা শক্ত। (ধর্মের সাথে তান্ত্রিকতা রক্ষা করার জন্য এই ভ্রান্ত কু-সংস্কারাচ্ছন্ন কথা ছড়ানো হয়েছে।)

১৬৫.
খাদে মিউন্‌দা পাতা, ন ছারে বরাইয়া কথা।
**শব্দার্থ:** খাদে=খায়, ন ছারে=ছাড়ে না, বরাই=অহঙ্কার, বরাইয়া= বড় লোক, মিউন্‌দা পাতা= প্রায় অখাদ্য শাক।
**ব্যাখ্যা :** মিউন্দা পাতা দিয়ে ভাত খেলেও অহঙ্কার করতে ছাড়ে না। (মিথ্যা অহঙ্কার দেখানো।)

১৬৬.
গুরু ন মানি ঝারৎ যাবি, উরকা বলা তরে খাইব।
**শব্দার্থ:** ন মানি= মান্য না করে, উরকা বলা= উড়ন্ত সাপ (যাকে ইংরেজীতে Flying Tree Snake বলে, যার বাইলোজিক্যাল নাম Chrysopelea Pelias), ঝারৎ = জঙ্গলে।
**ব্যাখ্যা :** গুরুকে অমান্য করে জঙ্গলে গেলে সাপে কাটবে। (গুরুকে অমান্য করলে মার খেতে হয়।)

১৬৭.
গালে গালে তওয়া খা।
**শব্দার্থ:** তওয়া = তওবা, খা = খাও (তবে এক্ষেত্রে তওবা করা)।
**ব্যাখ্যা :** গালে গালে তওবা কর। (নিজের গালে চড় মেরে প্রায়শ্চিত কর।)

১৬৮.
গাছ চিনে বাকলে,
মইষ চিনে আকলে,
পণ্ডিত চিনে বচনে।
**শব্দার্থ:** মইষ = মানুষ, আকল=আক্কেল বা বুদ্ধি, বচন=বাক্য।
**ব্যাখ্যা :** গাছের পরিচয় বাকলে, মানুষের পরিচয় বুদ্ধিতে আর পণ্ডিতের পরিচয় বাক্য ব্যবহারে।

১৬৯.
গাইয়ে-গিরছে রাজি থাইলে এক আঁড়ু পানিতও আজঝের দুদ্ দুই পারে।
**শব্দার্থ:** গাই=গাভী, গিরছ=গেরস্ত, এক আঁড়ু = এক হাঁট, আজঝের=আধা সের, দুধ্ দুই=দুধ দোহন।
**ব্যাখ্যা :** গাভী ও গৃহস্তের মধ্যে সমঝোতা থাকলে হাঁটু পানিতেও আধা সের দুধ দোহন করা সম্ভব। (দু'পক্ষ রাজি থাকলে যে কোনো সমস্যা সমাধান সম্ভব।)

১৭০.
গরিপর বউ বিয়াক্‌কুনর ভউচ্।
**শব্দার্থ:** গরিপ=গরিব, বিয়াক্‌কুন=সবার, ভউচ্=ভাবি, বিয়াক্‌কুনর্ ভউচ=সবার ভাবী।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** দরিদ্র লোকের স্ত্রী গ্রামের সবার ভাবী। (দুর্বলকে সবাই নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়।)

১৭১.
গরিপর পুন্ হক্কলে মারে।
**শব্দার্থ:** গরিপ=গরিব, গরিপর=গরিবের, পুন্=পায়ুপথ; গুহ্যদ্বার, হক্কলে=সবাই।
**ব্যাখ্যা :** দরিদ্রকে সবাই অত্যাচার-নির্যাতন করে।

১৭২.
গরিপ দেইলে পেরতেও ছেফ ফেলে।
**শব্দার্থ:** গরিপ=গরিব; দরিদ্র, দেইলে=দেখলে, পেরত=অপদেবতা, ছেফ=থুথু।
**ব্যাখ্যা :** গরিবের দিকে অপদেবতাও থুথু ছিটায় বা সবাই ঘৃণা করে।

১৭৩.
গোরা কাড়ি, আগাৎ পানি ঢাল।
**শব্দার্থ:** গোরা=গোড়া, কাড়ি=কেটে, আগাৎ=অগ্রভাবে বা কাণ্ডে।
**ব্যাখ্যা :** গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি দেয়া। (গুরু মেরে জুতো দান।)

১৭৪.
গরবা আইস্সে পরবা নাই
ভাওয়া বেঙর কমতি নাই।
**শব্দার্থ:** আইস্সে=এসেছে, পরবা=পরোয়া বা ভয়, পরবা নাই=পরোয়া নাই বা ভয় নেই, ভাওয়া=বড়, ভাওয়া বেঙ=বড় ব্যাঙ।
**ব্যাখ্যা :** গরবা বা মেহমান এসেছে ভয় নেই, বাড়ির ধারেই তো রয়েছে বড় ব্যাঙ। (বিয়াই সম্পর্কের কেউ বেড়াতে আসলে এ ধরনের প্রবাদ কেটে ঠাট্টা মশকরা করা হত।)

১৭৫.
গাছ নষ্ট গুয়া
মাছ নষ্ট পোয়া
পইর নষ্ট পেনা
গরু নষ্ট মেনা
জইন নষ্ট অরল
মুখ নষ্ট বরল।
**শব্দার্থ:** গুয়া=উপকূলীয় প্যারাবনের এক প্রকারের গাছ যা জ্বালানী ছাড়া অন্যকোনো কাজে লাগে না, তবে এই গাছ ঝড় জলোচ্ছ্বাসের সময় উপকূলীয় জনগণের জানমাল রক্ষায় সাহায্য করে, পোয়া=পোপা মাছ, পেনা= কচুরিপানা, জইন= জমিন, অরল=অড়হর, মেনা=যে গরুর শিং অমসৃন বা ধারালো নয়।
**ব্যাখ্যা :** গাছের মধ্যে বাজে গাছ হচ্ছে গুয়া গাছ, মাছের মধ্যে পোপা মাছ ভাল নয়, পুকুর নষ্ট হয় কচুরিপানায়, যে গরুর শিং অমসৃন সে গরু কোনো কাজে আসে না, জমি নষ্ট হয় অড়হর চাষে, মানুষের মুখের পেলবতা নষ্ট করে ব্রন উঠলে।

www.pathagar.com

১৭৬.
গাছ বুরা হইলে ঢুর হয়।
শব্দার্থ: বুরা=বৃদ্ধ, ঢুর=গাছের শাঁস নষ্ট হয়ে ফাঁপা হয়ে যাওয়া।
**ব্যাখ্যা :** গাছের বয়স বেড়ে গেলে ভেতরটা ফাঁপা হয় এবং এভাবে গাছ নষ্ট হয়ে যায়।

১৭৬.
গরু মরে খেরে, মানুষ মরে ফেরে।
শব্দার্থ: খের=খড়, ফের=কৌশল বা ফাঁদ।
**ব্যাখ্যা :** গরু মারা যায় খড় না পেয়ে, আর মানুষ মারা পড়ে অন্যের পাতা ফাঁদে পড়ে।

১৭৭.
গরুএ ন চিনে হাল্, মাইন্‌ষে ন চিনে কাল্।
শব্দার্থ: হাল্=চাষ, কাল্=সময়।
**ব্যাখ্যা :** গরু হাল চাষ চিনে না, আর মানুষ সময় চিনে না (গরু হাল চেনে না- তাকে চেনাতে হয়। মানুষের কালজ্ঞান থাকে না, তাকে কালজ্ঞান দিতে হয়।)

১৭৮.
গাল গুণে বেঙ মরে।
শব্দার্থ: গাল=মুখ; এখানে মুখের শব্দ, গুণে=কারণে।
**ব্যাখ্যা :** গালের কারণে ব্যাঙ মারা যায়। (বর্ষাকালে একটু পানি দেখলেই ব্যাঙ আওয়াজ করে, আওয়াজ লক্ষ্য করে শিকারীরা সহজেই তাকে ধরতে পারে।) (নিজের অবস্থান নিরাপদ করা দরকার।)

১৭৯.
গরুত্‌তুন পুচার গরি হাল ন চয়।
শব্দার্থ: গরুত্‌তুন=গরুর কাছ থেকে, পুচার=জিজ্ঞেস, পুচার গরি=জিজ্ঞেস করে, ন চয়= চাষ করে না।
**ব্যাখ্যা :** গরুকে জিজ্ঞেস করে কেউ চাষ করে না। (অধীনস্থদের পরামর্শে তাদের দিয়ে কাজ করানো হয় না।)

১৮০.
গিরস্‌তর্ অবস্‌তা বুজি, চোরে হাত ভার বাঁধে।
শব্দার্থ: গিরস্‌ত=গৃহস্ত; গেরস্ত, বুজি=বুঝে, হাত=সাত, ভার বাঁধে= বোঝা বাঁধে।
**ব্যাখ্যা :** গেরস্তের অবস্থা বুঝে চোর সাত বোঝা মাল বাঁধে তথা সিদ্ধান্ত নেয় কি পরিমাণ মালামাল চুরি করা যাবে। অর্থাৎ মানুষ ততটুকু তার সম্পদ রক্ষা করতে পারে যতটুকু সে সতর্ক।

১৮১.
গিতর্ আগে কুন্‌কুনি, ঝরর্ আগে পিন্‌পিনি।
শব্দার্থ: গিতর্=গীতের, কুনকুনি=গুন গুন করা, ঝরর্= বৃষ্টির।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** গান শুরুর আগে গুন গুন সুর, আর বৃষ্টির আগে পিনপিনে বৃষ্টি হয়। অর্থাৎ শুরুটা স্বল্প মাত্রা দিয়ে হয়।

১৮২.
গুরুরে সেবিলে বিদ্যা বাড়ে।
**শব্দার্থ:** গুরু=ওস্তাদ, সেবিলে=সেবা করলে।
**ব্যাখ্যা :** ওস্তাদের সেবা করলে বিদ্যা বৃদ্ধি পায়।

১৮৩.
গপে সপে মরদ, কানে শিং-এ বলদ।
**শব্দার্থ:** গপে সপে=গল্প গুজবে, কানে শিং-এ=কানও শিং-এর সমন্বয়ে।
**ব্যাখ্যা :** গাল গল্পে পুরুষ, আর কান এবং শিং দেখে বলদ বলে মনে হয়। (বাহ্যিক রূপের মতো বস্তু সে রূপ যোগ্য বা গুণধর নাও হতে পারে।)

১৮৪.
গাধা গরু এক দাম।
**ব্যাখ্যা :** গাধা আর গরুর এক দাম। (বাজারের অরাজক অবস্থা।)

১৮৫.
গরিবের কথা বাই অইলে ফলে।
**শব্দার্থ:** বাই = বাসী, বাই অইলে=বাসি হলে, ফলে=বাস্তব হয়ে দেখা দেয়।
**ব্যাখ্যা :** গরিব মানুষের ভবিষ্যৎ বাণী বাসী হলেই বাস্তব হয়ে দেখা যায়। (অনেকসময় সাধারণ লোকের মতামতও গুরুত্বপূর্ণ হয়।)

১৮৬.
গুরুর দোয়া হাইল, গুরুর দোয়া মাইল।
**শব্দার্থ:** হাইল=উন্নতি, মাইল=অধপতন।
**ব্যাখ্যা :** ওস্তাদ দোয়া করলে উন্নতি হতে পারে আবার অভিশাপে অধঃপতনও হতে পারে।

১৮৭.
ঘর লিপি দোয়ারত্ আঁছার খার।
**শব্দার্থ:** লিপি= লেপন, দোয়ারত্ = ঘরের দরজায়; ঘরের সিঁড়িতে, আঁচার=আছাড়, খার=খাচ্ছে।
**ব্যাখ্যা :** ঘর লেপামুছা শেষ করে দরজায় এসে আছাড় খাচ্ছে। (সকল আয়োজন শেষ মুহূর্তে পণ্ড হওয়া।)

১৮৮.
ঘর ভাঁগন আর মছ্ইৎ ভাঁগন এক্কু ফোয়ান।
**শব্দার্থ:** ভাঁগন=ভেঙ্গে দেয়া, মছ্ইৎ=মসজিদ, ফোয়ান=সমান, ঘর ভাঙন-এর বুৎপত্তিগত অর্থ সংসার ভাঙা।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** সংসার ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা সমান। কারো সংসার (স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক) রক্ষার উপর গুরুত্বারোপ।

১৮৯.
ঘরত্‌তুন বাইর অইতে খাইল্‌লা ঘরা দেইলে কু ছা-ৎ অয়।
**শব্দার্থ:** ঘরত্‌তুন= ঘর থেকে, খাইল্‌লা ঘরা = খালি কলস, কু ছা-ৎ = অমঙ্গল, অয়=হয়।
**ব্যাখ্যা :** যাত্রা পথে খালি কলস অমঙ্গলের লক্ষণ। (প্রাচীন সংস্কার, কোন বস্তুগত কারণ নেই।)

১৯০.
ঘরর্ গরুয়ে ঘাঁড়ার খের ন খায়।
**শব্দার্থ:** ঘরর্=ঘরের, ঘাঁড়ার = প্রবেশপথ বা বাড়ির মূল ফটক, খের=ঘাস।
**ব্যাখ্যা :** বাড়ির প্রবেশ পথের খড় বাড়ির গরু-এ খায় না। (সহজলভ্য বস্তুকে সবাই অবহেলা করে।)

১৯১.
ঘিঁইর বাসে ছালা বেচা যায়।
**শব্দার্থ:** ঘিঁই=ঘি, বাসে=গন্ধে, ছালা = বস্তা।
**ব্যাখ্যা :** ঘি'র সুগন্ধিযুক্ত বস্তা সহজে বিক্রি হয়। (বংশ মর্যাদার কারণে অপাত্র ও সুপাত্র হিসেবে গৃহীত হয়।)

১৯২.
ঘুমে ন চিনে চাড়া-পাড়ি, প্রেমে ন চিনে জাত-বেজাতি।
**শব্দার্থ:** ন চিনে=চিনে না, চাড়া-পাড়ি = চাটাই-পাটি।
**ব্যাখ্যা :** ঘুমে যেমন চাটাই-পাটি চিনে না (ঘুম পেলে যেখানে- সেখানে ঘুমানো যায়), তেমনি প্রেম কোন জাত-বেজাত মানে না।

১৯৩.
ঘরর্ ঢাকে কি ঘর ন থাকে নে।
**শব্দার্থ:** ঘরর্=ঘরের, ঢাকে= পাশে, ন থাকে=থাকে না।
**ব্যাখ্যা :** বাড়ির পাশে কী বাড়ি থাকে না? (কারো মনে স্থান করে নেবার ফঁন্দি হিসেবে ব্যবহৃত।)

১৯৪.
ঘরর্ ভাত খাই, মউরঅ মুইশ চরায়।
**শব্দার্থ:** ঘরর্=ঘরের, মউ=মামা, মুইষ = মহিষ, মউরঅ মুইষ=মামার মহিষ।
**ব্যাখ্যা :** ঘরের খেয়ে মামার মোষ চড়ানো। (ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।)

১৯৫.
ঘরর্ ভাত খাই, পরর্ মুইষ চরায়।
**শব্দার্থ:** ঘরর্=ঘরের, পরর্=অপরের, চরায়=চড়ানো।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** ঘরের ভাত খেয়ে, অপরের মহিষ চড়ানো।

১৯৬.
ঘরর্ ছিন্‌নি পরে খার, হাছইন্না কদ্‌দা লই বেরার।
**শব্দার্থ:** ঘরর্=ঘরের, হাছইন্‌না=হাছন নামের এক ব্যক্তি, কদ্‌দা = পেয়ালা (কদ্‌দা আরবি শব্দ)।
**ব্যাখ্যা :** ঘরের শিরনি পরে খায়, হাছইন্না পেয়ালা হাতে অন্যের দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। দুর্বিপাকে পড়ে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া।

১৯৭.
ঘর পইল্‌লে ছ'লে হোরে।
**শব্দার্থ:** পইল্‌লে=পড়লে, ছ'লে=ছাগলে, হোরে=মাড়ায়।
**ব্যাখ্যা :** পতিত ঘর ছাগলেও মাড়ায়। (বিপদগ্রস্তকে সবাই পায়ে ঠেলে।)
ঘরর্ উন্‌দুরে বেরা কাড়িলে, বেরায়ে কুল ন পায়।
**শব্দার্থ:** ঘরর্=ঘরের, উন্‌দুরে=ইঁদুরে, বেরা = বেড়া, কুল ন পায়=টান ধরে না।
**ব্যাখ্যা :** ঘরের ইঁদুর বেড়া কাটতে থাকলে, বেড়ায় টান ধরে না। (ঘরের শত্রু বিভীষণ বা আপনজন শত্রু হলে তার রক্ষা নাই।)

১৯৮.
ঘাট্ পার হইলে, ঘাইট্‌টা হালা।
**শব্দার্থ:** ঘাট্=খেয়া ঘাট, ঘাইটটা=খেয়া পারের মাঝি।
**ব্যাখ্যা :** ঘাট পার হলে খেয়া মাঝি শালা হয়। (কাজ উদ্ধার হলে মানুষ উপকার ভুলে যায়।)

১৯৯.
ঘরর্ পোয়াইন্‌দে ভাত খাই গজি চায়
পরর্ পোয়াইন্‌দে ভাত খাই উড়ান চায়।
**শব্দার্থ:** ঘরর্=ঘরের, পোয়াইন্=ছেলেমেয়ে, গজি=চাউল রাখার মাটির পাত্র, পরর্=পরের।
**ব্যাখ্যা :** ঘরের ছেলেমেয়েরা ভাত খাওয়ার পরে আবার খাওয়ার জন্য পাতিলে চাউল আছে কিনা দেখে নেয়, কিন্তু পরের ছেলেমেয়েরা খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

২০০.
ঘরৎ চেরাগ্ ন দি, মছইদত্ চেরাগ দন।
**শব্দার্থ:** ঘরৎ=ঘরে, ন দি= না দিয়ে, মছইদত্=মসজিদে।
**ব্যাখ্যা :** ঘরে বাতি না দিয়ে, মসজিদে বাতি দেয়া। (আগে নিজের স্বার্থ দেখার উপর গুরুত্বারোপ।)

২০১.
ঘর পইললে ছ'লে হুরে, রাঁরী পাইলে হক্‌কলে হাঁআ গরে।
**শব্দার্থ:** পইল্‌লে=পড়লে, ছঅলে=ছাগলে, হুরে=মাড়ায়, রাঁরী=বিধবা, হক্‌কলে= সকলে, হাঁআ=সাগা-বিয়ে করা।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** ঘর ভাঙ্গলে ছাগলেও মাড়ায়, অনুরূপ বিধবা নারী পেলে সবাই বিয়ে করতে চায়। (মানুষ মানুষের অসহয়াত্বের সুযোগ নিতে চায়।)

২০২.
ঘইষ্যাত্ বারি মাইল্‌লে টাক্‌কুয়ায়ে হা গরে।
**শব্দার্থ:** ঘইষ্যা=তিল, বারি মাইল্‌লে= আঘাত করলে, টাক্‌কুয়া= টাকমাথা, হা গরে= হা করে।
**ব্যাখ্যা :** তিলে আঘাত করলে টাকমাথা হা করে। (কারো কোনো দুর্বলতা থাকলে সে ঐ বিষয়ে সন্ত্রস্থ থাকে।)

২০৩.
ঘি ডাইলত পইয্যে।
**শব্দার্থ:** ডাইলত=ডাইলে, পইয্যে=পড়েছে।
**ব্যাখ্যা :** ঘি ডালে পড়েছে। ঠিক জায়গায় পৌছানো।

২০৪.
ঘুঅর্ দলারে লাড়ি বানঅদ্দে।
**শব্দার্থ:** ঘু= মল, ঘু অর্=মলের, দলা=ঢিলা, দলারে=ঢিলাকে, বানঅদ্দে=বানাচ্ছ।
**ব্যাখ্যা :** মলকে লাঠি বানাচ্ছ। অর্থাৎ যে যা নয় তাকে সে রকম করে দেখা।

২০৫.
চোখ কানা গইজ্‌জ, তও দেশ কানা ন' গইজ্‌জ।
**শব্দার্থ:** কানা=ছিদ্র, তবে এক্ষেত্রে অন্ধ করে দেয়া, তও=তবু, গইজ্‌জ = করো।
**ব্যাখ্যা :** নিজের চোখ নষ্ট করে অন্ধ হলেও দেশের ক্ষতি করো না।

২০৬.
চোর বুরা অইলে ফইর অয়।
**শব্দার্থ:** বুরা=বৃদ্ধ, অইলে=হলে, ফইর = ফকির; সূফি; সাধক।
**ব্যাখ্যা :** চোর বৃদ্ধ হলে সূফি-সাধক হয়। (অসৎ লোক অক্ষম হলে সাধু সাজে।)

২০৭.
চিনা ব'নর্ পৈতা ন লাগে।
**শব্দার্থ:** চিনা=পরিচিত, বঅন = ব্রাহ্মণ, ব'নর্=ব্রাহ্মণের।
**ব্যাখ্যা :** ব্রাহ্মণ হিসেবে যিনি সবার কাছে পরিচিত তার পৈতা লাগে না। (খ্যাতিমান ব্যক্তির বিশেষণ লাগে না।)

২০৮.
চিলে ছোঁ মাইল্‌লে ফেঁজা অইলেও বাঝে।
**শব্দার্থ:** ছোঁ = থাবা, মাইললে=মারলে, ফেঁজা = খড়খুঁটো, অইলে=হলে।
**ব্যাখ্যা :** চিলের থাবায় হাঁস-মুরগির ছানা বা অন্য কোন খাদ্য-দ্রব্য না আটকালেও খড়খুটো আটকায়। (শক্তিমানের আঘাতে কিছু ক্ষতি হবেই।)

২০৯.
চোরর্ দশ দিন, গিরচ্ছর এদ্দিন।

www.pathagar.com

**শব্দার্থ:** চোরর্=চোরের, এদ্দিন = একদিন, গিরছ=গৃহস্ত, গিরচ্ছর্=গৃহস্তের; গেরস্তের।
**ব্যাখ্যা :** চোরের দশ দিন আর গৃহস্থের একদিন। (খারাপ লোক পরিণামে একদিন না একদিন ধরা পড়বেই।)

২১০.
চোর ধাইলে বুদ্ধি বারে।
**শব্দার্থ:** ধাইলে=পালালে, বারে=বাড়ে; বৃদ্ধি পায়।
**ব্যাখ্যা :** চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

২১১.
চাড়া নাইদে বেড়া মাঝত্তু নেড়ে।
**শব্দার্থ:** চাড়া=পাঠি বা বিছানা, মাঝত্তু=মধ্যখানে, নেড়ে= শোয়ে।
**ব্যাখ্যা :** যার বিছানা নেই সে মধ্যখানে শোয়ে অর্থাৎ মাত্রাতিরিক্ত সুবিধা পেতে চাওয়া।

২১২.
চোরর্ চউক গাট্টিত।
**শব্দার্থ:** চোরর্=চোরের, গাট্টিত=প্যাকেটে বা বস্তায়।
**ব্যাখ্যা :** চোরের চোখ সব সময় বস্তার দিকেই থাকে। (চোর চুরির সন্ধানে থাকে।)

২১৩.
চোরর্ চোক্ বোচ্কাত।
**শব্দার্থ:** চোরর্=চোরের, বোচ্কাত্= বস্তা বা পুটুলি।
**ব্যাখ্যা :** চোরের চোখ সব সময় পুটুলিতেই নিবদ্ধ থাকে।

২১৪.
চাঁইন্দা গাইয়র চ'রা ছ।
**শব্দার্থ:** চাঁইন্দা=চাঁন তারা মার্কা, গাই=গাভী, চ'রা=নক্সা করা, ছ=ছানা, এখানে 'ছ' অর্থে বাছুর।
**ব্যাখ্যা :** চাঁদ মার্কা গাভীর বাচুরের শরীরে নক্সা থাকে। (সন্তান পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য পাবেই।)

২১৫.
চাইয়া ঘরর্ বাঁদি, আচাইয়া ঘরর্ বিবি।
**শব্দার্থ:** চাইয়া=দেখা, ঘরর্=ঘরের, আচাইয়া=অদেখা।
**ব্যাখ্যা :** দেখা ঘরের বাঁদি বা চাকর, আর অদেখা ঘরের বিবি সমান। (পরিবেশ মানুষকে শেখায়।)

২১৬.
চিনডা দিলে ভঁউচা খায়।
**শব্দার্থ:** চিনডা=চিমটি, ভঁউচা=খামছি।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** চিমটি দিলে প্রতি উত্তরে খামছি হজম করতে হয়। (ঢিলটিকে মারলে পাটকল খেতে হয়।)

২১৭.
চইত্ মাইস্সার হরানে, কাটঠ্ল মাগের পরানে।
**শব্দার্থ:** চইত্=চৈত্র, মাইস্সা=মাসের, হরান=ক্লান্তি, হরানে=ক্লান্তিতে, কাটঠ্ল= কাঁঠাল, মাগের=খোঁজা বা খাওয়ার জন্য আগ্রহ বা লোভ।
**ব্যাখ্যা :** চৈত্র মাসের গরমের ক্লান্তিতে কাঁঠাল খাওয়ার জন্য ইচ্ছা জাগছে। (ঋতুর ফলাদি সময়ের প্রতিকূলতার প্রতিষেধক।)

২১৮.
চোর্ মরে কাঁশে, বঅন মরে আশে।
**শব্দার্থ:** মরে=মারা যায়; এ ক্ষেত্রে চোর ধরা পড়ে, কাঁশে=কাঁশিতে, বঅন্=ব্রাহ্মণ, আশে=আশায়।
**ব্যাখ্যা :** চোর ধরা পড়ে কাঁশি দিলে আর ব্রাহ্মণ মরে পাওয়ার আশায়।

২১৯.
চোরর্ পুন ডাকাইতে মারের।
**শব্দার্থ:** চোরর্=চোরের, পুন=পায়ুপথ, মারের=মারছে।
**ব্যাখ্যা :** চোরের মালামাল ডাকাতি করে নিয়ে যাওয়া।

২২০.
চোরঅর্ মনঅত্ গুত্গুতি।
**শব্দার্থ:** চোরঅর্=চোরের, মনঅত্=মনে, গুতগুতি= অস্বস্তিভাব।
**ব্যাখ্যা :** চোরের মনে সব সময় ভয় থাকে কেউ যেন তাকে দেখে ফেলছে।

২২১.
চোররে কদে চুরি গর, গিরচরে কদে হজাগ থাক।
**শব্দার্থ:** চোররে=চোরকে, কদে=বলে, গর=করো, গিরচরে=গেরস্তকে, হজাগ=সজাগ।
**ব্যাখ্যা :** চোরকে বলে চুরি করো আর গেরস্তকে বলে সজাগ থাকো। (বরের ঘরে মাসী, কনের ঘরের পিসি।)

২২২.
চোরে চোরে মউত্অ ভাই।
**শব্দার্থ:** মউত্অ=মামাতো।
**ব্যাখ্যা :** চোরে চোরে মামাতো ভাই।

২২৩.
চেরাকর্ তলে আঁধার থায়।
**শব্দার্থ:** চেরাক্=চেরাগ বা খুপি বা বাতি, চেরাকর্=বাতির বা খুপির, তলে=নিচে, থায়=থাকে।
**ব্যাখ্যা :** বাতির নীচে অন্ধকার থাকে।

www.pathagar.com

২২৪.
ছ'ল্ মুতিতে ধরা পরে।
**শব্দার্থ:** ছ'ল=ছাগল, মুত=প্রশ্রাব, মুতা=প্রশ্রাব করা, মুতিতে = প্রশ্রাবরত।
**ব্যাখ্যা :** ছাগল ধরতে হয় প্রস্রাব করার সময়। (সুযোগ মতো লক্ষ্য সিদ্ধি করতে হয়)।

২২৫.
ছিন্দি খ'ন্ পঅল্র কাম নঅ।
**শব্দার্থ:** ছিন্দি = শিরণি, খ'ন্ = খাওয়া, পঅল্র = পাগলের, কাম = কাজ, নঅ=নয়।
**ব্যাখ্যা :** শিরণি খাওয়া পাগলের কাজ নয়। (ভাল কাজ অযোগ্যকে দিয়ে হয় না, এলোমলো করে ফেলতে পারে।)

২২৬.
ছ'ল্ নাচে খুঁড়ার বলে।
**শব্দার্থ:** ছ'ল্=ছাগল, খুঁড়া=খুঁটি, বলে=শক্তিতে।
**ব্যাখ্যা :** ছাগল নাচে খুঁটির জোরে বা শক্তিতে।

২২৭.
ছঅল্ নাচে খুঁড়ার বলে, বেডি নাচে নেকর বলে।
**শব্দার্থ:** ছঅল্=ছাগল, খুঁড়া = খুঁটি, বলে=শক্তিতে, বেডি=নারী বা স্ত্রী, নেক =স্বামী।
**ব্যাখ্যা :** ছাগলের শক্তি তার খুঁটি, আর নারীর শক্তি তার স্বামী।

২২৮.
ছললুকর ন' পা'রত্তু চলে।
**শব্দার্থ:** ছল্লুক= শ্লোকের অপভ্রংশ, উপমা বা গল্প অর্থে ব্যবহৃত, পা'রত্তু=পাহাড় থেকে।
**ব্যাখ্যা :** গল্পের নৌকা পাহাড়ের উপর চলে অর্থাৎ গল্পে কল্পনা বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যায়। একই সাথে বলা যেতে পারে, সবাই পরামর্শ করে চললে ভালোভাবে চলা যায়।

২২৯.
ছালন্ রাইন্দে আনুনি, বাই অইলে খাইঅ
ঝি বিয়াইয়ে ফেদেরা, ডঁঅর অইলে চাইঅ।
**শব্দার্থ:** ছালন্ = তরকারি, রাইনদে=রান্না করেছে, বাই = বাসি, বাই অইলে=বাসি হলে, বিয়াইয়ে=জন্ম দিয়েছে, ফেদেরা = বিশ্রী বা অসুন্দর, ডঁঅর = বড়।
**ব্যাখ্যা :** লবণ ছাড়া তরকারি বাসি খাওয়া যায়, মেয়ে শিশু জন্মে বিশ্রী দেখালেও বড় হলে সুশ্রী হয়।

২৩০.
ছেফ গিলিলে পানির তিরাশ্ ন মরে।
**শব্দার্থ:** ছেফ=থুথু, গিলিলে=গলধকরণ করলে, তিরাশ্ = তৃষ্ণা, ন মরে=মিটে না। অর্থাৎ তৃষ্ণা মিটে না।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** থুথু বা লালায় কখনো তৃষ্ণা মিটে না। (প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া কাজ সমাধা হয় না।)

২৩১.
ছেপ ছিঁড়িলে গা'ত পরে, কুরঐল মাইল্‌লে পা'ত পরে।
**শব্দার্থ:** ছেপ্=থুথু, ছিঁড়িলে=ছিঁটালে, গা'ত=শরীরে, কুরঐল=কুড়াল, মাইরলে= মারলে, পা'ত=পায়ে।
**ব্যাখ্যা :** থুথু ছিঁটালে নিজের গায়ে পড়ে, কুড়াল মারলে পায়ে পড়ে। (অকাজ থেকে দূরে থাকা ভাল)।

২৩২.
ছলর্ লা গরু ছিন্‌নি।
**শব্দার্থ:** ছলর্=ছাগলের, লা=জন্য, ছিন্‌নি=শিরণি।
**ব্যাখ্যা :** ছাগলের জন্য গরু শিরনি। (ছোট কাজের জন্য বড় আয়োজন কাম্য নয়।)

২৩৩.
ছাফ মিড়া খাই খন্‌ডার বারি খাইলেও ভালা।
**শব্দার্থ:** ছাফ=পরিষ্কার, মিড়া=গুড়, খনডার=খণ্ডির।
**ব্যাখ্যা :** পরিষ্কার গুড় খেয়ে খণ্ডির ঘা খেলেও ভালো। (প্রাপ্তি বড়ো হলে যে কোনো আঘাত সহনীয়।)

২৩৪.
ছাফ মিডা খাই ছেরাইলেও পুদর সাবাশি।
**শব্দার্থ:** ছাফ=পরিষ্কার, মিড়া=গুড়, ছেরাইলে=পাতলা পায়খানা করলেও, পুদর=পায়ুপথের, তবে এখানে পায়ুপথকে বুঝানো হয়েছে।
**ব্যাখ্যা :** ভালো কাজ করে ক্ষতির সম্মুখীন হলেও গৌরবজনক।

২৩৫.
ছা'রা খাতু হাডত্ যায়, খারু বেচি লারু খায়।
**শব্দার্থ:** ছা'রা=ছাহারা, খাতু=খাতুন, হাডত্=হাটে, খারু=চুড়ি, লারু=নাড়ু।
**ব্যাখ্যা :** ছাহারা খাতুন হাটে গিয়ে চুড়ি বিক্রি করে নাড়ু খায়। (নগন্য জিনিসের জন্য মূল্যবান দ্রব্য হারানো।)

২৩৬.
ছপ বিছাই গপ মারন্।
**শব্দার্থ:** ছপ=লম্বা পাটির মাদুরা, গপ=গল্প, মারন্=মারা, গপ মারন্=গল্প-গুজব করা।
**ব্যাখ্যা :** মাদুর বিছিয়ে গল্প করা। (অলসজনের জন্য ব্যবহৃত।)

২৩৭.
ছাফ খাই চিয়ন লাদন।
**শব্দার্থ:** ছাফ=পরিষ্কার, চিয়ন=চিকন, লাদন=লাদা; মলের মণ্ড।
**ব্যাখ্যা :** পরিষ্কার খেয়ে ভালো মল ত্যাগ করা। (সুখী লোকের উপমা।)

www.pathagar.com

২৩৮.
ছাফ কইজ্জা ছাফ কইজ্জা হালা
কালা কইজ্জা কার হালা।
শব্দার্থ: ছাফ=পরিষ্কার, কইজ্জা=কাপড়ের মানুষ; কাপড় পরিহিত মানুষ, কালা=ময়লা, হালা=শালা।
ব্যাখ্যা : ধূপধুরস্ত কাপড় পরা সবাই আত্মীয়, কিন্তু ময়লা কাপড় পরা মানুষ কারো কুটুম্ব নয়। [ধূপধুরস্ত পোশাকধারী বা ধনী লোক পরস্পরে শালা বা নিকট আত্মীয় পরিচয় দেয়, ময়লা পোষাকধারী (গরিব লোক) নিকট আত্মীয় হলেও কেউ তাকে সহজে কুটুম্ব পরিচয় দিতে চায় না]।

২৩৯.
ছঅল দিয় হাল চই পাইল্লে গরু ন লাইত।
শব্দার্থ: ছঅল=ছাগল, চই=চাষ করা, পাইল্লে=পারলে, ন লাইত=লাগতো না।
ব্যাখ্যা : ছাগল দিয়ে চাষ করা গেলে গরুর প্রয়োজন হতো না। (যার কাজ তারে সাজে।)

২৪০.
ছ'ল ধরন্ মুতিতে, পারাবেরানি ধরন্ ঘুরিতে।
শব্দার্থ: ছ'ল্=ছাগল, ধরন্=ধরা, পারাবেরানি=সমগ্র গ্রামে যে ঘুরে বেড়ায়।
ব্যাখ্যা : ছাগল ধরতে হয় প্রশ্রাব করার সময়, পাড়াময় ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত মহিলাকে ধরতে হয় পাড়ায় ঘোরার সময়। (সময়ের কাজ সময়েই করতে হয়।)

২৪১.
ছ'ল পালে প'লে হাঁস পালে আঁধে,
হাজুইন্না হইলে দুয়ারৎ বই কাঁদে।
শব্দার্থ: ছঅল=ছাগল, প'লে=পাগলে, আঁধে=অন্ধলোকে, হাজুইন্না=সন্ধ্যা বেলা, দুয়ারৎ= দরজায়, বই=বসে।
ব্যাখ্যা : ছাগল পালে পাগলে, হাঁস পালে অন্ধলোক, সন্ধ্যা হলে ঘরের দরজায় বসে যার কাঁদতে হয়। (ঝামেলাপূর্ণ কাজ সাধারণ লোক এড়িয়ে চলে।)

২৪২.
ছেপর্ ভরে ন' ন ডুপে।
শব্দার্থ: ছেপ=থুথু, ছেপর্=থুথুর, ন=নৌকা, ডুপে=ডুবে, ন ডুপে=ডুবে না।
ব্যাখ্যা : থুথুর ভরে নৌকা ডুবে না। (শক্ত লোকের ক্ষতি সহজে করা যায় না।)

২৪৩.
ছোড মুখে ডঁএর কথা কঅন গম ন।
শব্দার্থ: ছোড=ছোট, ডঁঅর্=বড়, কঅন=বলা, গম=ভাল, ন=না।
ব্যাখ্যা : ছোট মুখে বড় কথা বলা ভালো নয়।

www.pathagar.com

২৪৪.
ছোড মোড বেডিবা এত ঠঁঅক্ জানে,
কেলাগাছ তলে নেক্কুয়া এরি লাং ধরি টানে।
শব্দার্থ: ছোড=ছোট, ছোড মোড=ছোট খাট, বেডিবা=মেয়েটা, ঠঁঅক্=ঠমক, নেক্কুয়া=স্বামী, এরি=রেখে, লাং=পরকিয়া প্রেমিক।
ব্যাখ্যা : ছোটো-খাট নারীটি এত ঠমক জানে, কলাগাছ তলে (ঘরের বাইরে) স্বামীকে রেখে পরকিয়া প্রেমিক ধরে টানে (ঘরে তোলে)

২৪৫.
ছ'লে কি ন খায়, প'লে কি ন কয়।
শব্দার্থ: ছ'লে=ছাগলে, প'লে=পাগলে।
ব্যাখ্যা : ছাগলে কোন্ জিনিস খায় না আর পাগলে কোন্ কথা বলে না। (অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার দরকার নেই।)

২৪৬.
ছেপর বান দিয়ি।
শব্দার্থ: ছেপ=থুথু, বান= বাঁধ, দিয়ি=দিয়েছে।
ব্যাখ্যা : থুথু ছিটিয়ে বাঁধ দিয়ে সাময়িক ভাবে আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করা। (রূপক অর্থে ব্যবহৃত।)

২৪৭.
জিক্কার ঝর, হিক্কার জুঁইর।
শব্দার্থ: জিক্কার = যে দিকের, হিক্কার = সে দিকের, ঝর = বৃষ্টি, জুঁইর = বর্ষাতি, গোলপাতা বা পাহাড়ি বড় কোনো পাতা দ্বারা তৈরি ছত্র বিশেষ।
ব্যাখ্যা : বৃষ্টি যেদিকে সে দিকেই ছাতি ধরতে হয়। (অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।)

২৪৮.
জামাই চাইবা হাডৎ, বউ চাইবা ঘাড়ৎ।
শব্দার্থ: চাইবা = দেখবে, হাডৎ= হাট-বাজারে, ঘাডৎ= পুকুর বা নদীর ঘাটে, যে খানে মেয়েরা পানি আনতে যায়।
ব্যাখ্যা : জামাই (পাত্র) দেখবে বাজারে আর বউ (পাত্রী) দেখবে ঘাটে-যাদেরকে অলক্ষ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়। (সুবিধা মতো কাজ সম্পন্ন করা।)

২৪৯.
জাতর্ কইন্না গাঁতৎ মরে।
শব্দার্থ: গাঁতৎ=গর্তে।
ব্যাখ্যা : জাতের (অভিজাত ঘরের) মেয়ে গর্তেই মরে। (উপযুক্ত বরের অভাবে আইবুড়ো থেকে যায়।)

২৫০.
জাতর মাইয়া কালাও ভালা।
শব্দার্থ: কালা= বোবা; তবে এখানে কালো গাত্রবর্ণের।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** জাতের মেয়ে কাল রং হলেও ভালো। (পাত্রী নির্বাচনে সাংস্কৃতিক মান দেখা দরকার, গায়ের রং নয়।)

২৫১.
জামাই হারামখোর আর, বিলাই হারামখোর এক ফুয়ান।
**শব্দার্থ:** বিলাই=বিড়াল, ফুয়ান=সমান।
**ব্যাখ্যা :** জামাই আর বিড়াল দুই-ই হারামী, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (যতই দাও কৃতজ্ঞতা বোধ নেই।)

২৫২.
জামাই, যম, ভাইনা, এই তিনজন নয় আপনা।
**শব্দার্থ:** ভাইনা=ভাগিনা, আপনা=আপন।
**ব্যাখ্যা :** জামাই, যম, ভাগিনা এই তিন জন কখনো আপন হয় না। (এরা শুধু আদায় করতে জানে)

২৫৩.
জামাইএ নিলেও গেল, যমে নিলেও গেল।
**শব্দার্থ:** গেল= যাওয়া, চলে যাওয়া।
**ব্যাখ্যা :** জামাই এবং যম দু'জনই সমান। (মেয়ে মাত্রই অন্য পাত্রের।)

২৫৪.
জোগর্ মুখত্ ছাই।
**শব্দার্থ:** জোগ=জোক, জোগর্=জোকের, মুখত্=মুখে।
**ব্যাখ্যা :** ছাই দিলেই জোকের মুখ বন্ধ হয়। (ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারি পরাস্ত হওয়া।)

২৫৫.
ঝি চাইতে মা চা, পুত চাইতে বাপ চা।
**শব্দার্থ:** ঝি=কন্যা বা মেয়ে, চা= দেখা; চাওয়া, পুত=পুত্র বা ছেলে।
**ব্যাখ্যা :** মেয়ে দেখতে হলে মাকে দেখতে হয়, আর পুত্র দেখতে হলে পিতাকে দেখতে হয়। (মেয়ে মা'য়ের গুণ, ছেলে পিতার গুণ পায়।)

২৫৬.
ঝরে বগা মরে, ফইরর্ কেরামতি বারে।
**শব্দার্থ:** ঝরে=ঝড়ে (ঝরে অর্থ ঝড়ে পড়া নয়), ফইর=ফকির, ফইরর্=ফকিরের।
**ব্যাখ্যা :** ঝড়ের তোড়ে বক মরে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে। (ভণ্ড লোকের অভাব নাই।)

২৫৭.
ঝিয়রে মারি বউয়রে শিকা।
**শব্দার্থ:** ঝিয়রে=ঝি'কে (এখানে মেয়েকে বুঝানো হয়েছে), মারি=মেরে, শিকা=শিক্ষা দেয়া।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** মেয়েকে মেরে নতুন বউকে শিক্ষা দিতে হয়।

২৫৮.
ঝারিয়া ঝুরিয়া বসিও পাট্
(রাতের বেলায়) বাইরে যেতে রাখিও সাথ।
**শব্দার্থ:** ঝারিয়া=ঝেড়ে, ঝারিয়া ঝুরিয়া=ঝেড়ে মুছে, পাট্=তক্তা (গাছের টেরি), সাথ=সাথী।
**ব্যাখ্যা :** বসার সময় তক্তা ঝেড়ে মুছে নেবে, আর (রাতের বেলায়) বাইরে যাওয়ার সময় সাথী রাখবে। (সব সময় সাবধানতা অবলম্বন করা শ্রেয়।) সাবধানের মাইর নেই।

২৫৯.
টিঁয়ায়ে টিঁয়া বিয়ায়।
**শব্দার্থ:** টিঁয়া = টাকা, বিয়ায় = প্রসব করে।
**ব্যাখ্যা :** টাকায় টাকা বৃদ্ধি করে।

২৬০.
টিঁয়ারায়ে খেতি খাইলে খেতিয়ে টান ন ধরে।
**শব্দার্থ:** টিঁয়ারা=বেড়া; বাঁশের খুঁটির ঘেরা, খেতি=ক্ষেত, টান=কুলানো, টান ন ধরে=কুলাবেনা।
**ব্যাখ্যা :** বেড়ায় ক্ষেত খেতে থাকলে ক্ষেতে কুলাবে না। (রক্ষক ভক্ষক হলে কোন কিছু রক্ষা করা সম্ভব নয়।)

২৬১.
টিঁয়াদি টিঁয়া ফাঁদে, হাতি দি হাতি বাঁধে।
**শব্দার্থ:** টিঁয়াদি=টাকা দিয়ে, ফাঁদে=ফাঁদে ফেলানো; এখানে বৃদ্ধি করা, দি=দিয়ে।
**ব্যাখ্যা :** টাকায় টাকা বাড়ায় আর হাতি ধরতে হাতির প্রয়োজন হয়।
২৬২.
ঠোঁট কাডাদে হাসের্ পান লাগের।
**শব্দার্থ:** কাডা=কাটা, পান=মতো, লাগের=লাগছে।
**ব্যাখ্যা :** ঠোঁট কাটা তো, সে জন্য মনে হচ্ছে হাসছে। (আসলে ঘড়েল লোক।)

২৬৩.
ঠেলারে নাম বা'জি।
**শব্দার্থ:** বা'জি=বাবাজি।
**ব্যাখ্যা :** ঠেলার নাম বাবাজি। আসল জায়গায় ধরতে পারা।

২৬৪.
পাতিলার ভাত অউগ্গা চিবিলে হয়।
**শব্দার্থ:** পাতিলার=ভাতের হাঁড়ি, অউগ্গা= একটা, চিবিলে=টিপলে।
**ব্যাখ্যা :** হাঁড়ির ভাত একটা টিপলেই বুঝা যায় ভাত হয়েছে কিনা। অল্পতে বুঝা যায়

www.pathagar.com

সে বুদ্ধিমতি কী না?

২৬৫.
ডুম মারি পানি খাই, হারা দিন্নান্ রোজা থাই।
শব্দার্থ: ডুম=পানিতে ডুব দেয়া, হারা=সারা, দিন্নান্=দিনটা, থাই=থেকে।
**ব্যাখ্যা :** পানিতে ডুব দিয়ে পানি খেয়ে সারা দিন রোযা রাখা। (কপট ধার্মিক।)

২৬৬.
ডুম উজর দিয়ে।
শব্দার্থ: ডুম=জলদাস সম্প্রদায়; ধীবর, উজর=হৈ-হুল্লোড়; আওয়াজ করা।
**ব্যাখ্যা :** কিছু হলেই জলদাস সম্প্রদায়ের লোকজন হৈ-হুল্লোড় করে বিষয়টি জানান দেয়।

২৬৭.
ঢোলর বারি ক'রত্তলে ন থায়।
শব্দার্থ: ঢোলর=ঢাকের, ক'র=কাপড়, তলে=নিচে, ক'রত্তলে=কাপড়ের নিচে; কাপড়ের ভেতরে, থায়=থাকে।
**ব্যাখ্যা :** ঢোলের আওয়াজ কাপড়ের ভেতরে চাপা থাকে না। (সত্য কখনো গোপন থাকে না।)

২৬৮.
ঢেঁই মক্কা গিলেও বারা বাঁধে।
শব্দার্থ: ঢেঁই=ঢেঁকি, মক্কা=মক্কা মোয়াজ্জমা (মুসলমানদের পবিত্র স্থান), গিলে=গেলে, বারা=ধান।
**ব্যাখ্যা :** ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। (স্বভাব ধর্ম)।

২৬৯.
ঢোঁষ পাদে মেলা হাসে, ফোঁষ্ পাদে কইল্লা ছেদে।
শব্দার্থ: ঢোঁষ=বিকট শব্দ, পাদে=বাতাস ছাড়া বা বাত কর্ম করা, ফোঁষ্=শব্দ ছাড়া, কইল্লা= কলিজা, ছেদে=ছিদ্র করে।
**ব্যাখ্যা :** বিকট শব্দে বাতাস (বাত কর্ম) ছাড়লে মানুষ হাসে, আর শব্দ ছাড়া গন্ধ বাতাস ছাড়লে কলিজা ছিদ্র করে ফেলে।

২৭০.
ঢেইত্তু (ধাই) পোয়া খোঁজন।
শব্দার্থ: ঢেঁইত্তো=ঢেঁকি থেকে, রূপক অর্থে ব্যবহৃত, ধাই থেকে, খোঁজন=খোঁজা।
**ব্যাখ্যা :** ধাই থেকে পুত্র খুঁজলে সে দেবে কোথা থেকে। (কোনো কিছু সঠিক জায়গায় সন্ধান করতে হয়।)

২৭১.
তুই দিয়ারে মুই দিয়া, ন দিয়ারে কি চেট দিয়া।
শব্দার্থ: তুই=তোমাকে, দিয়া=দেয়া, মুই =আমি।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** তুমি দিলে আমিও দেব, না দিলে আমিও দেব না। এখানে চেট (পুরুষাঙ্গ) ব্যবহার করেছে বিষয়টিকে তুচ্ছার্থে বুঝাতে। (লেনদেন সর্বদা পারস্পরিক ব্যাপার।)

২৭২.
তলে তলে গাছ কাডে, উয়ত্তু পানি ঢালে।
**শব্দার্থ:** তলে তলে=নীচে নীচে, কাডে=কাটে, উয়র=উপর, উয়ত্তু=উপর থেকে।
**ব্যাখ্যা :** নিচে নিচে ক্ষতি করে উপর থেকে শান্ত্বনা দিচ্ছে।

২৭৩.
তাল্ত ভাইরে তাল্ত ভাই
তাল খাইয়দ্দে মনত্ নাই
পইছা দিবার মুরদ্ নাই।
**শব্দার্থ:** তাল্ত ভাই=বিয়াই, খাইয়দ্দে=খেয়েছো, পইছা=পয়সা, মুরদ্=সম্বল।
**ব্যাখ্যা :** বিয়াই তাল খেয়েছো মনে নেই, এমনকি তালের পয়সা দেয়ার সম্বলও তোমার নেই। [অবিবাহিত তাল্ত ভাই (বিয়াই) এর সাথে কুমারি মেয়েদের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠা এক সাধারণ ঘটনা। এটা তারই ইঙ্গিতবহ ঠাট্টার সুরে অভিমান প্রকাশ]।

২৭৪.
তিতা খাইলে মিডার লাগ পায়।
**শব্দার্থ:** মিডা=গুড়, এখানে মিডা হচ্ছে মিষ্টি, লাগ=নাগাল।
**ব্যাখ্যা :** তিতা খেলে মিষ্টির স্বাদ পাওয়া যায়। দুঃখের পরে সুখ আসে।

২৭৫.
তিন লারায়ে কচু মরে।
**শব্দার্থ:** লারায়ে=স্থান পরিবর্তন করা।
**ব্যাখ্যা :** তিনবার স্থান পরিবর্তন করলে কচুও মারা যায়। (বেশি স্থান বা পেশা পরিবর্তন করলে উন্নতি করা দুষ্কর।)

২৭৬.
তিন লারায়ে ছুয়ারি সোনা
তিন লারায়ে নাইর্কল্ টেনা,
তিন লারায়ে জির্ফল্ বেল্
তিন লারায়ে গিরছ্ গেল।
**শব্দার্থ:** লারায়ে=নাড়ানো; স্থান পরিবর্তন করা, ছুয়ারি=সুপারি, নাইর্কর=নারিকেল, টেনা=খাটু; বামন, গিরছ্=গেরস্ত।
**ব্যাখ্যা :** তিনবার নাড়লে সুপারি গাছে ভালো ফলন হয়, তিনবার নাড়লে নারিকেল গাছের বৃদ্ধি ঘটে না, তিনবার নাড়লে জিরফল্ও বেল হয়ে যায়, আর তিনবার বসত বাড়ি নাড়লে গেরস্ত শেষ হয়ে যায়। (একই নিয়ম সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)

২৭৭.
তেইল্লাচুরা পক্ষী নয়, সর্বেসটর অফিসার নয়।

www.pathagar.com

**শব্দার্থ:** থেইল্‌লাচুরা=তেলাপোকা, সর্‌বেসটর্‌= সাব-রেজিস্টার।
**ব্যাখ্যা :** পাখা থাকলেও তেলাপোকা পাখি নয়, আর সাব-রেজিস্টার অফিসার নয়। (বিঃদ্রঃ বর্তমানে সাব-রেজিস্টার সরকারি গেজেটেড অফিসার।) (অবজ্ঞা প্রকাশ।)

২৭৮.
তেলর্‌ মাথাত্‌ তেল্‌ দন্‌।
**শব্দার্থ:** তেলর্‌=তেলে, দন্‌=দেয়া।
**ব্যাখ্যা :** তেলা মাথায় তেল দেয়া।

২৭৯.
তেল ন দি মস্‌মইস্‌সা খঅন।
**শব্দার্থ:** তেল ন দি=তেল না দিয়ে, মস্‌মইস্‌সা=মরমইজা; মচমচে, খঅন=খাওয়া।
**ব্যাখ্যা :** তেল না দিয়ে মচমচে খাওয়া। (কৌশলে ভালো কিছু পেতে চাওয়া)।

২৮০.
তোলা দুতে পোয়া ন বাঁচে।
**শব্দার্থ:** তোলা দুতে=অন্য দুধ; সংগ্রহ করা দুধ, ন বাঁচে= বাঁচে না।
**ব্যাখ্যা :** সংগ্রহ করা দুধে শিশু বাঁচে না। (যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়া কাজ সমাধা হওয়ার নয়।)

২৮১.
তুই কী সোনা লাদঅর্‌ নে?
**শব্দার্থ:** লাদঅর্‌=মল ত্যাগ করা;
**ব্যাখ্যা :** তোমার মল তো স্বর্ণ নয় যে তোমাকে পুঁজো করতে হবে।

২৮২.
থাই গরু ন চ'য় হাল, দুক্‌খ ন যার সর্বকাল।
**শব্দার্থ:** থাই = থেকে, থাই গরু=গরু থেকেও, চ'য়=চাষ করা, দুক্‌খ=দুঃখ।
**ব্যাখ্যা :** ঘরে গরু থেকেও যে হাল চাষ করে না, কোনো সময় তার দুঃখ যায় না। (সব কিছুর সদ্ব্যবহার হওয়া চায়।)

২৮৩.
থানার ঢাকত্‌তু কানাও ন হাঁড়ে।
**শব্দার্থ:** ঢাকত্‌তু = পাশ দিয়ে, ন হাঁড়ে = হাঁটে না, কানা=অন্ধ।
**ব্যাখ্যা :** থানার পাশ দিয়ে কানাও হাঁটে না। (থানা মানুষের উপকার তো দূরে থাক সমস্যাই বেশি করে, তাই সবাই একে এড়িয়ে চলে।)

২৮৪.
ত্রি'র ভাগ্য ধন, পুরুষ ভাগ্য জন।
**শব্দার্থ:** ত্রি=স্ত্রী, জন=মানুষ-জন; এক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততি।
**ব্যাখ্যা :** স্ত্রীর ভাগ্যে ধন আর পুরুষের ভাগ্যে জনসংখ্যা।

www.pathagar.com

২৮৫.
থইলার চইল থইলাত আডে
লাথির চোডে ভারাল ফাডে।
শব্দার্থ: থইলা=বেগ বা বস্তা, চইল=চাউল, আডে=সংকুলান হয়, চোডে=আঘাতে, ভারাল=পেট, ফাডে=ফাঠে।
ব্যাখ্যা : বস্তার চাউল বস্তায় ধরে, লাথিতে পেট ফাটে। (বস্তায় চাল যা ধরার ধরবে, লাথি দিয়ে বেশি ধরাতে চাইলে বস্তা ফেটে যাবে। কোনো বিষয়ে জোরাজুরি করতে নেই।)

২৮৬.
দিন থাইতে হাঁড়অ, সম্‌বত্‌তি থাইতে বাডঅ।
শব্দার্থ: থাইতে=থাকতে, হাঁডঅ= হাঁটা, সম্‌বত্‌তি=সম্পত্তি, বাডঅ = বৃদ্ধি কর।
ব্যাখ্যা : দিন থাকতে পথ শেষ করো, আর সম্পদ থাকতে তার বৃদ্ধি কর। (সব কাজ সময়ে করতে হয়।) সময়ের কাজ সময়েই করতে হয়।

২৮৭.
দুত দেদে গাইঅর্‌ লাথিও ভালা।
শব্দার্থ: দুধ দেদে = দুধাল, গাই=গাভী, গাইঅর্‌=গাভীর।
ব্যাখ্যা : দুধাল গাভীর লাথিও ভালো। (উপকারি পায়ে ঠেললেও মান্যবর।)

২৮৮.
দাসরে থাবা,
মুইশরে নাফা,
ছঁইয়রে গিল,
বউয়রে কিল।
শব্দার্থ: মুইশ=মহিষ, নাফা=নাক ছিদ্র করে রশি দিয়ে আটকানো, ছঁই=সিম, ছঁইয়রে=সিমকে, গিল=বাঁশ বা গাছের খুঁটি।
ব্যাখ্যা : দাসকে থাবা, মহিষকে নাফা, সিম গাছে গিল আর বউকে কিল দিতে হয়। (নিয়ন্ত্রনে রাখা)।

২৮৯.
দশর লাড়ি, একর পোঁঝা।
শব্দার্থ: লাড়ি=লাঠি, পোঁঝা = বোঝা।
ব্যাখ্যা : দশের লাঠি একের বোঝা।

২৯০.
দশজন রাজি থাইলে, আল্লাঅ রাজি অয়।
শব্দার্থ: থাইলে=থাকলে, অয়=হয়।
ব্যাখ্যা : দশজন যেখানে রাজি, আল্লাহতালাও সেখানে রাজি থাকে।

www.pathagar.com

২৯১.
দেইক্‌খা ঘর'র্ বাঁদি, আদেইকখা ঘরর বিবি।
শব্দার্থ: দেইক্‌খা = দেখা, ঘর'র্=ঘরের, আদেইকখা=অদেখা বা যিনি দেখেনি।
ব্যাখ্যা : শিক্ষিত ঘরের বাঁদী আর অশিক্ষিত ঘরের বেগম সমান।

২৯২.
দুখ্‌খর রাইত ন ফুরায়।
শব্দার্থ: দুখ্‌খর=দুঃখের, ন ফুরায়= শেষ হয় না।
ব্যাখ্যা : দুঃখের রাত সহজেই শেষ হতে চায় না।

২৯৩.
দারিও ছুন, করিও ছুন।
শব্দার্থ: দারি= দাঁড়ি, করি=কড়ি, ছুন = পণ্ড বা অনর্থক।
ব্যাখ্যা : দাঁড়ি-কড়ি সবকিছুই অনর্থক। (সম্মান ও সম্পদ-কিছুতেই শেষ রক্ষা না হওয়া)

২৯৪.
দিনর্ ঝরে ধান বারে, রাইতর ঝরে পান বারে।
শব্দার্থ: দিনর্=দিনের, বারে=বৃদ্ধি পায়, রাইতর্=রাতের।
ব্যাখ্যা : দিনের বৃষ্টিতে ধানের বৃদ্ধি ঘটে, আর রাতের বৃষ্টিতে পানের বৃদ্ধি ঘটে। (কৃষি কাজের বচন)

২৯৫.
দুরুচ্ কুরা মোচরা, জামাইর কথা দোছরা।
শব্দার্থ: দুরুচ্‌কুরা=মুরগির রোস্ট, মোচরা=মোচড়ানো, দোছরা=দুই প্রকার অর্থাৎ বাঁকা।
ব্যাখ্যা : মুরগির রোষ্ট হয় মোচড়ানো, আর জামাই-এর কথা হয় বাঁকা। (শত আদর যত্নেও (রোস্ট খাওয়ায়েও) জামাই-এর মনভরানো দায়)
২৯৬.
দইপ্ কই বুলি নু আইয়ে।
শব্দার্থ: দইপ্=বিপদ, বুলি=বলে, আইয়ে=আসে। নু আইয়ে=আসেনা।
ব্যাখ্যা : বিপদ বলে-কয়ে আসে না।

২৯৭.
দইপ্ আইলে চাইরঅ ঢাকত্‌তুন আইয়ে।
শব্দার্থ: দইপ্-বিপদ, আইলে=আসলে, চাইরঅ=চারিদিক, ঢাক=পাশ, ঢাকত্‌তুন= পাশদিয়ে, আইয়ে=আসে।
ব্যাখ্যা : বিপদ আসলে চারপাকা থেকেই আসে। (বিপদ একা আসে না।)

২৯৮.
দয়া আছে মায়া আছে গলাৎ ধরি কাঁদে,

www.pathagar.com

আদ্‌ধান পইছার আঁইটটা কেলা পরান গেলে ন দে ।
শব্দার্থঃ আদ্‌ধান=অর্ধেক, আদ্‌ধান পইছার=অর্ধেক পয়সার বা এক পয়সার অর্ধেক, আঁইটটা কেলা=একপ্রকার দানাদার কলা, (যা স্থানীয় ভাবে নিচুমানের এবং অল্পপয়সার কলা হিসেবে বিবেচিত । এইসব কলা লোকজন একসময় টাকা দিয়ে ক্রয় করে খেতো না ।), ন=না, দে=দেয়, ন দে=দেয় না ।
ব্যাখ্যা : গলায় ধরে কেঁদে-কেটে দয়া-মায়া দেখাবে, কিন্তু মারা গেলেও অর্ধেক পয়সার আঁইট্‌টা কলাও দেবে না । (কৃপনের দয়া প্রদর্শন মুখেই শুধু ।)

২৯৯.
দশ জন যিঁঅৎ রাজি, খোদাঅ হিঁঅৎ রাজি ।
শব্দার্থঃ যিঁঅৎ=যেখানে, হিঁঅৎ=সেখানে ।
ব্যাখ্যা : দশ জন যেখানে রাজি, খোদাতালাও সেখানে রাজি ।

৩০০.
দাতায় দান গরে, ভান্‌ডারির পেট ফাড়ে ।
শব্দার্থঃ ভান্‌ডারি=ভাণ্ডার রক্ষক, ফাড়ি=ফেটে, পেট ফাড়ে=পেট ফেটে যাচ্ছে; এক্ষেত্রে সহ্য করতে পারছে না ।
ব্যাখ্যা : দাতা দান করলেও ভাণ্ডার রক্ষকের তা সহ্য হয় না ।

৩০১.
দাত থাইতে খঅন্ ভালা, দাত পইলে মরঅন্ ভালা ।
শব্দার্থঃ খঅন্=খাওয়া, পইলে=পড়লে, মরঅন্=মরা ।
ব্যাখ্যা : দাঁত থাকতে খাওয়া ভালো, আর দাঁত পড়লে মৃত্যু ভালো ।

৩০২.
দাত থাইতে দাতর্ কদর ন বুঝে ।
শব্দার্থঃ দাতর্=দাঁতের, কদর্=মর্যাদা ।
ব্যাখ্যা : দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না । দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বুঝা ।

৩০৩.
দুই নওকাত্ ঠেং দিলে রান্ চিরি যাইব ।
শব্দার্থঃ নওকা=নৌকা, ঠেং=পা, রান=উরু, চিরি=ছিঁড়ে ।
ব্যাখ্যা : দুই নৌকায় পা দিলে পা ছিড়ে যাবে । (বিপদজনক সিদ্ধান্ত) ।

৩০৪.
শিংলারেদে গরুত্‌তুন আরো খাইল্‌লা উরা গম ।
শব্দার্থঃ শিংলারেদে=শিং বাঁকায়, শিংলারেদে গরুত্‌তুন=যে গরু শিং বাঁকা করে বা দুষ্ট গরু, খাইল্‌লা= খালি, উরা=গরুর ঘর বা গোয়ালঘর ।
ব্যাখ্যা : দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো ।

www.pathagar.com

৩০৫.
দুস্ট জনর্ মিস্টি কথা কাছে বই ঠেসে,
কথা দিয় কথা লয় পরানে মারে শেষে।
**শব্দার্থ:** জনর্=জনের, বই=বসে ('বই'-এর বাংলা অর্থ গ্রন্থ তবে স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় 'বই' অর্থ 'বসে'), ঠেসে=ঘনিষ্ট হয়ে বসা, বই ঠেসে=নিকট আত্মীয়ের মতো ঘনিষ্ট হয়ে বসা, লয়=নেয়।
**ব্যাখ্যা :** দুষ্ট জনের মিষ্টি কথা পাশে বসে বলে, কথা দিয়ে কথা নিয়ে শেষে পরাণে মারে।

৩০৬.
দেইখ্‌তে সুন্‌দর কাইদা ফল।
**শব্দার্থ:** দেইখ্‌তে=দেখতে, কাইদা=মাকাল, কাইদা ফল=মাকাল ফল।
**ব্যাখ্যা :** মাকাল ফল দেখতে সুন্দর হলেও খাওয়া যায় না।

৩০৭.
দেইৎ ন পারে যারে, হাঁইট্‌টে ভিয়াই তারে।
**শব্দার্থ:** দেইৎ=দেখতে, হাঁইট্‌টে=হাটতে, ভিয়াই=ভেঙ্গায়।
**ব্যাখ্যা :** যারে দেখতে নারে তার চলন বাঁকা।

৩০৮.
দুক্‌কর্ রাইত তারাতারি ন ফুরায়।
**শব্দার্থ:** দুক্‌কর্=দুঃখের, রাইত=রাত, ফুরায়=শেষ, ন ফুরায়=শেষ হয় না।
**ব্যাখ্যা :** দুঃখের রাত শেষ হতে চায় না।

৩০৯.
দেখা ন দে ছোরা দে, কদ্‌ধা ভরি ছালন দে।
**শব্দার্থ:** ছোরা=পানি খাওয়ার পাত্র বা গ্লাস, কদ্‌ধা=পেয়ালা, ভরি=ভরে, ছালন=তরকারি।
**ব্যাখ্যা :** দেখা না দিলেও পানির গ্লাস দিচ্ছে, আর পেয়ালা ভরে তরকারি দিচ্ছে। (দয়াবতী নারীর অন্তরাল থেকে দেয়া সেবা।)

৩১০.
দইজ্‌জার চরত্ পেশাব গরন্।
**শব্দার্থ:** দইজ্‌জা= দরিয়া; সমুদ্র, চরত্=চরে, পেশাব=প্রশ্রাব, গরন্=করা।
**ব্যাখ্যা :** সমুদ্র চরে (বালিতে) প্রশ্রাব করলে তা তাৎক্ষণিক শুকিয়ে যায় বলে দেখা যায় না। (নিষ্ফল চেষ্টা।)

৩১১.
দেশর্ বলা পিরে ন বাছে।
**শব্দার্থ:** দেশর্=দেশের, বলা=আপদ; সমস্যা; যিনি দেশের জন্য বা এলাকার জন্য বিপদজনক, পির=পীর, ন বাছে=পৃথক করে না; আলাদা করে না।
**ব্যাখ্যা :** দেশের জন্য যিনি বিপদজনক তার প্রতিও পীরেরা বিমুখ হয় না।

www.pathagar.com

৩১২.
ধা গইদে মাছ ডঁঅর্ বেশি ।
**শব্দার্থ:** ধা গই=পলাতক, ডঁঅর=বড় ।
**ব্যাখ্যা :** পলাতক মাছ সর্বদাই বড় । (হারানো বস্তু বেশি মূল্যবান মনে হয় ।)

৩১৩.
ধরি আইন্ত কইলে, বাঁধি আনে ।
**শব্দার্থ:** ধরি=ধরে, আইনত=আনতে, কইলে=বলে, বাঁধি=বেঁধে ।
**ব্যাখ্যা :** ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে । (বাড়াবাড়ি করা ।)

৩১৪.
ধরি মাছ ন ছুই পানি ।
**শব্দার্থ:** ধরি মাছ=মাছ ধরে, ন ছুই=না ছুয়ে ।
**ব্যাখ্যা :** পানি না ছুয়ে মাছ ধরা । (বিনাশ্রমে কাজ আদায় ।)

৩১৫.
ধাউন্না মরিচ ঝাল বেশি ।
**শব্দার্থ:** ধাউন্না=এক প্রকার ছোট প্রজাতির ঝাল মরিচ ।
**ব্যাখ্যা :** ধাউন্না মরিচ ঝাল বেশি । (ছোটরাও অনেক সময় দক্ষতা দেখাতে পারে ।)

৩১৬.
ধরি ন পাইল্লে হাব্বিচ ।
**শব্দার্থ:** পাইল্লে=পারলে, ন পাইল্লে= না পারলে, হাববিচ্=হা ডু ডু খেলার সীমানা- যেখানে পৌঁছতে পারলে খেলা থেকে বাদ পড়ে না ।
**ব্যাখ্যা :** প্রতিযোগিতায় এটে না উঠলে 'হাব্বিচ' ধরা যাতে আত্মরক্ষা হয় ।

৩১৭.
ধারঅ থা পরিব, ভরঅ থা পরিব ।
**শব্দার্থ:** ধারঅ=ধারালো, ধারঅ থা পরিব=ধারও থাকতে হবে, ভরঅ=ওজন ।
**ব্যাখ্যা :** ধারও থাকতে হবে যাতে কাটা যায়, আর ওজনও থাকতে হবে । (কোন কাজ সমাধা করতে 'ধার'ও 'ওজন' দু'টোরই দরকার ।)

৩১৮.
ধাপল্লা বাপে ন পারে ।
**শব্দার্থ:** ধাপ্=নিবিষ্ট চিত্ত; মনোনিবেশ; একাগ্রতা, ধাপল্লা=একাগ্রতার সাথে, বাপে=পিতা, ন পারে=পারে না ।
**ব্যাখ্যা :** একাগ্রতার সাথে কেউ পেরে উঠে না ।

৩১৯.
নাচিত্ ন জাইনলে উডান বিঁয়া ।
**শব্দার্থ:** নাচিত্=নাচতে, জাইন্লে = জানা, উডান = উঠান, বিঁয়া=বাঁকা ।
**ব্যাখ্যা :** নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা । (ব্যর্থ লোক সর্বদা অপরকে দোষ দেয় ।)

www.pathagar.com

৩২০.
নোয়া নোয়া বাল্ উড়িলে হাতদি হাতদি চায়।
**শব্দার্থ:** নোয়া নোয়া = নতুন নতুন, বাল্ =উর্দু শব্দ 'বাল' অর্থ মাথার চুল; 'বাল' শব্দ দ্বারা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় শুধু নিম্নাঙ্গের কেশ বুঝায়।
**ব্যাখ্যা :** নতুন নতুন কেশ গজালে সবাই হাতিয়ে দেখে। (আকিস্মিক কিছু পেলে গৌরব বোধ হয়)।

৩২১.
নোয়া নোয়া বঅরি, নোয়া নোয়া ডং,
পুরান হইলে বঅরি গলা ঢং ঢং।
**শব্দার্থ:** নোয়া=নতুন, বঅরি=চুড়ি, ঢং ঢং=রং দেখানো; কদর।
**ব্যাখ্যা :** নতুন নতুন চুড়ির ঢং দেখতে কে না চায়, কিন্তু চুড়ি পুরাতন হলে তার কোন কদর থাকে না। (নব যৌবন প্রাপ্তও বিগত যৌবনা নারীর উপমা।)

৩২২.
নিজর্ চোগর হাল্ নিজে ন দেখে।
**শব্দার্থ:** নিজর্=নিজের, চোগর=চোখের, হাল্=ময়লা।
**ব্যাখ্যা :** নিজের চোখের ময়লা নিজে দেখে না। (নিজের দোষ নিজে দেখে না।)

৩২৩.
নিজে বাঁচিলে বাপর নাম।
**শব্দার্থ:** বাঁচিলে=বাঁচলে, বাপর=পিতার।
**ব্যাখ্যা :** নিজে বাঁচলেই পিতার নাম। (চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।) স্বার্থপর

৩২৪.
নিজর্ নাক কাড়ি পরর্ যাত্রা ভাঙ্গন।
**শব্দার্থ:** নিজর্=নিজের, কাড়ি = কেটে, পরর্=পরের।
**ব্যাখ্যা :** নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

৩২৫.
নেকর্ খাই, লাংঅর্ গা চিবে।
**শব্দার্থ:** নেকর্=স্বামীর বা পতির, খাই=খেয়ে, লাং = পরকিয়া, লাংঅর্=পরকিয়া প্রেমিকের।
**ব্যাখ্যা :** স্বামীর খেয়ে পরকিয়া প্রেমিকের শরীর টিপতে যাওয়া।

৩২৬.
ন কাঁদেদে পোয়া দুধ ন পায়।
**শব্দার্থ:** কাঁদেদে=কাঁদে, ন কাঁদেদে=কাঁদে না।
**ব্যাখ্যা :** যে শিশু কাঁদে না, সে দুধ পায় না। (না চাইলে কোনো দাবি আদায় হয় না।)

www.pathagar.com

৩২৭.
নাইত্ দেইলে নক্কুনি বারে।
শব্দার্থ: নাইত্ = নাপিত, নক্কুনি=নকের কোণা, বারে=বৃদ্ধি পায়।
ব্যাখ্যা : নাপিত দেখলে নখ তথা নখের কোণা বৃদ্ধি হয়। (অর্থাৎ তাকে দিয়ে কাটাতে চায়। অথচ নিজে সহজে কাটতে পারে। অপরকে দিয়ে কাজ আদায়ের চেষ্টা করা।)

৩২৮.
নাইতর্ পোয়ায়ে কাম শিখে দে পরর্ মাথাত্।
শব্দার্থ: নাইতর্= নাপিতের, পোয়া=ছেলে, পরর্=পরের।
ব্যাখ্যা : নাপিতের ছেলে চুল-দাঁড়ি কাটা শিখে অপরের মাথায়। (অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় অন্য লোকের মাধ্যমে।)

৩২৯.
নাতিল্লা হাতি মরে।
শব্দার্থ: নাতিল্লা= নাতির জন্য।
ব্যাখ্যা : নাতির জন্য প্রয়োজনে হাতি মারতে হয়। (প্রিয়জনের জন্য সব কিছু করা যায়।)

৩৩০.
নারী জাতি অমানুষ পানি দেইলে মুতে
নারীর কথা বিশ্বাস গেলে, পুন মারি যায় ভূতে।
শব্দার্থ: দেইলে=দেখলে, মুতে=প্রশ্রাব করে, পুন=পায়ুপথ।
ব্যাখ্যা : নারীর কথা বিশ্বাস করলে পদে পদে ঠকতে হয়। (মেয়েরা সাধারণ বিষয়েও প্রতিক্রিয়া দেখায়।)

৩৩১.
নেকরে ভাত দি ডাংগুলি মারের।
শব্দার্থ: নেকরে=স্বামী; পতি, ডাংগুলি= খেলার উপকরণ, কাঠের দু'টি পৃথক টুকরো-একটি লম্বা অন্যটি ছোট, ডাংগুলি মারে=ডাংগুলি খেলা করে; কিন্তু এখানে বাইরে গিয়ে ঘুরাঘুরি করা।
ব্যাখ্যা : স্বামীকে ভাত খেতে দিয়ে বাইরে গিয়ে ঘোরাঘুরি করে। (সংসার উদাসীনতা।)

৩৩২.
নাম পাইট্টে যার্, পুন ফাইট্টে তার।
শব্দার্থ: পাইট্টে= প্রচার হয়েছে; ফেটেছে, পুন=পায়ুপথ, ফাইটটে=ফেটেছে।
ব্যাখ্যা : যাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, তার সর্বনাশও হয়েছে। (খ্যাতির বিড়ম্বনা।)

৩৩৩.
নিদানর্ বিচ ধান।
শব্দার্থ: নিদান=দুঃসময়; নিদানর্=দুঃসময়ের, কঠিন সময়, বিচ=বীজ।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** দুঃসময়ে যা পাওয়া যায় তা বীজ ধানের মতো মূল্যবান। (দুঃসময়ে যে সাহায্য পাওয়া যায় তা-ই মূল্যবান।)

৩৩৪.
নখম্ নখম্ পেডৎ বিষ্, খাইত বইলে ন পায় দিশ।
**শব্দার্থ:** নখম্=খাই না, পেডৎ=পেটে, বিষ্=বেদনা বা ব্যথা, বইলে=বসলে, ন পাই দিশ=হুশ-জ্ঞান থাকেনা।
**ব্যাখ্যা :** খেতে দিলে পেটের ব্যথার কথা বলে খেতে অনিহা প্রকাশ, আর খেতে বসলে হুশ-জ্ঞান থাকে না। (উল্টো চরিত্র।)

৩৩৫.
ন জানে এক্কান, হুরি ভায় দশ্শান।
**শব্দার্থ:** এক্কান= একটি, হুরি=পায়ে মাড়িয়ে, ভায়=ভাঙ্গে, দশ্শান=দশটি।
**ব্যাখ্যা :** এমনিতে কিছুই জানে না, করতে দিলে পায়ে মাড়িয়ে দশটি নষ্ট করে। (অনভিজ্ঞ লোকের অনধিকার চর্চা।)

৩৩৬.
নরমর্ যম্, দরর্ ফেওয়া।
**শব্দার্থ:** নরম্=নরম, নরমর্=নরমের, দরঅ=শক্ত, ফেওয়া=শিয়াল (বাঘের অনুসরণকারী)।
**ব্যাখ্যা :** নরমের জন্য আযরাইলের মত, আর শক্তের কাছে শিয়ালের মত। শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

৩৩৭.
নাই দেশত্ এরেন্ডা গাছও বৃক্ষ।
**শব্দার্থ:** দেশত্=দেশে, এরেন্ডা= ভেরেণ্ডা।
**ব্যাখ্যা :** যে দেশে গাছের আকাল সেখানে এরেণ্ডা গাছও বৃক্ষের মর্যাদা পায়। (যোগ্য লোক না থাকায় অযোগ্যের আস্ফালন।)

৩৩৮.
নান্দা মউষর্ কথা ও নান্দা।
**শব্দার্থ:** নান্দা=বাজে, নান্দা মউষ=বাজে মানুষ, মউষর্=মানুষের।
**ব্যাখ্যা :** বাজে মানুষের কথাও বাজে হয়।

৩৩৯.
নাক নাই বেডির বালির সখ
চঅনা বেডির কত ঠঁঅক্।
**শব্দার্থ:** বেডির=বেটির, বালি=নাকের বালি, চঅনা=দেখনা, ঠঁঅক্=ঠাঁঠ।
**ব্যাখ্যা :** নাক নাই যে নারীর বালি দেয়ার সখ, আর তার কতই ঠাঁঠ। (তুলনীয়ঃ খালি কলসী বাজে বেশি।)

www.pathagar.com

৩৪০.
নাঠা মইষ আগে মাতে, নাঠা জইন্ আগে ফাডে।
শব্দার্থঃ নাঠা=কৃপণ; এখানে অকাজের, জইন্=জমি, ফাডে=ফাটে, মইষ=মানুষ।
ব্যাখ্যা : অকাজের মানুষ আগে-ভাগেই কথা বলে, অনুর্বর জমি আগেই ফেটে যায়। (অযোগ্যের যোগ্যতা প্রদর্শনের চেষ্টা)।

৩৪১.
নাম নাই গেরাম নাই, করিমা জোলার নাতি।
শব্দার্থঃ গেরাম=গ্রাম, করিমা=করিম নামের মানুষের স্থানীয় উচ্চারণ, জোলা=যারা বস্ত্র তৈরি করে; মুসলমানদের একটি সম্প্রদায়।
ব্যাখ্যা : নাম গেরাম ছাড়া যে তার পরিচয়, সে করিম জোলার নাতি। (নাম গোত্রহীন।)

৩৪২.
নিজর্ ঠেংত্ কুরুইল মারন্।
শব্দার্থঃ নিজর্=নিজের, ঠেং=পা, ঠেংত্=পায়ে, কুরুইল্=কুড়াল, মারন্=মারে বা আঘাত করা।
ব্যাখ্যা : নিজের পায়ে কুড়াল মারা। (নিজেই নিজের ক্ষতি করা।)

৩৪৩.
নিজর্ বুদ্ধিএ ভাত, পরর্ বুদ্ধিএ হাভাত।
শব্দার্থঃ নিজর্=নিজের, পরর্=পরের, হাভাত= ভাতের অভাব।
ব্যাখ্যা : নিজের বুদ্ধিতে ভাত, আর পরের বুদ্ধিতে ভাত না খেয়ে থাকতে হবে। (নিজের বুদ্ধিতে চলাই ভালো।)

৩৪৪.
নিজর্ লুডি গরম গর।
শব্দার্থঃ নিজর্=নিজের, লুডি=পেট, গর=করা।
ব্যাখ্যা : নিজের পেট ভর্তি কর। (নিজের স্বার্থ আগে দেখা।)

৩৪৫.
নিজর্ ঠেং নিজঅর্ গদ্দনা।
শব্দার্থঃ নিজর্=নিজের, ঠেং=পা, গদদনা=গর্দনা বা ঘাড়।
ব্যাখ্যা : নিজের পা, নিজের ঘাড় সবই একাকার। (সমগোত্রীয়।)

৩৪৬.
নিজঅর্ গারাৎ নিজে পরে।
শব্দার্থঃ নিজঅর্=নিজের, গারাৎ=গর্তে।
ব্যাখ্যা : নিজের গর্তে নিজেকে পড়তে হয়। (অপরের জন্য শত্রুতা করলে নিজেকেই বিপদে পড়তে হয়।)

৩৪৭.
নিজে ন পার জাগা, কুত্তা আইন্নে বাগা।
শব্দার্থঃ ন পার= পাচ্ছেনা, জাগা=জায়গা, কুত্তা= কুকুর, আইন্নে=এনেছে।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : নিজের থাকার জায়গা নেই, কিন্তু সাথে নিয়ে এসেছে একটি কুকুর। (অবিবেচক।)

৩৪৮.
নিত্তি গরবার আদর নাই,
নিত্তি ছালনর ফোয়াদ নাই।
শব্দার্থ: নিত্তি=নিয়মিত, গর্বা=মেহমান; অতিথি, ছালনর্=তরকারির, ফোয়াদ=স্বাদ।
ব্যাখ্যা : নিয়মিত যে মেহমান আসে তাঁর ইজ্জত থাকে না, একই রকমের তরকারিও মুখে বেশিদিন স্বাদ লাগে না।

৩৪৯.
নিধইন্নায় ধন পাইলে টিবি টিবি চায়
হাভাইত্তায় ভাত পাইলে মথি মথি খায়।
শব্দার্থ: নিধইন্না=নিঃস্ব; ধান হীন ব্যক্তি, টিবি টিবি=টিপে টিপে, হাভাইত্তা=যার ভাত নাই; যেভাত খাইনি, পাইলে=পেলে, মথি মথি=ডলে ডলে।
ব্যাখ্যা : নিঃস্ব ব্যক্তি সম্পদ পেলে তা টিপে টিপে দেখে, আর অভুক্ত ব্যক্তি ভাত পেলে ডলে ডলে খায়।

৩৫০.
নেক সোআইগ্গা নাচন চায়
মউক সোআইগ্গা ঝাঁড়া খায়।
শব্দার্থ: নেক=স্বামী; পতি, সোআইগ্গা= সোহাগী, মউক=স্ত্রী, ঝাঁড়া=ঝাঁটা।
ব্যাখ্যা : স্বামী সোহাগী স্ত্রীরা আনন্দেই থাকে শাশুড় বাড়িতে, আর স্ত্রীকে সোহাগ দেখাতে গেলে স্বামীকে লাঞ্চিত হতে হয়।

৩৫১.
নেক সোআইগ্গা তরে, পারা সোআইগ্গা মরে।
শব্দার্থ: নেক=স্বামী, পতি, সোআইগ্গা=সোহাগী, পারা=পাড়া।
ব্যাখ্যা : স্বামীকে ভালবাসলে ঘর সংসার ভাল হয়, আর পাড়া ভালবাসলে তথা পাড়া-বেড়াতে থাকলে সংসারের ক্ষতি হয়।

৩৫২.
নাইচ্তে নাচিলি শেষে পারা হাসালি।
শব্দার্থ: নাইচ্তে=নাচতে, নাচিলি=নাচলে।
ব্যাখ্যা : শেষ পর্যন্ত নাচলে, কিন্তু প্রথমে নাচতে না চেয়ে লোক হাসালে। (প্রয়োজনিয় কাজে দ্বিধা করতে নেই।)

৩৫৩.
নিন্ দেদে ফুল পিদা পরে।
শব্দার্থ: নিন্=হিংসা, নিন্ দেদে=হিংসা করে, পিদা=পরতে।
ব্যাখ্যা : যে ফুলকে হিংসা করা হয় তাও একদিন গলায় দিতে হয়। (কোন কিছুকেই অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই)।

www.pathagar.com

৩৫৪.
**নিজর্ পোয়ারে যত মারে তত ডাকে মা**
**পরর্ পোয়ারে যত খাবার তঅ কদ্দে না।**
**শব্দার্থঃ নিজর্=নিজের,** পরর্=পরের, তঅ=তবু, কদ্দে=বলে।
**ব্যাখ্যা : নিজের ছেলেকে** মারলেও মা বলেই ডাকে, কিন্তু পরের ছেলেকে খাবার দিলেও মা বলে না। (আপন পর হয় না, পর আপন হয় না।)

৩৫৫.
**নাম নধরর্ যার,** বাপ-দাদার পুন মারর্ তার।
**শব্দার্থঃ ধরঅর্=ধরা, নধরর্=**ধরছে না, পুন=পায়ুপথ, মারর্=মারা।
**ব্যাখ্যা : প্রকাশ্যে যার** নাম ধরছো না, তার বাপ-দাদার চৌদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করছো। (পরোক্ষভাবে ক্ষতি করা।)

৩৫৬.
**নেট্‌লে তুই নেট্, হতিন্** ন অইতে নেট্।
**শব্দার্থঃ নেট= শুয়া, হতিন্**=সতীন, অইতে=হওয়ার আগে।
**ব্যাখ্যা : সতীন হওয়ার** আগে স্বামীর সাথে ভালোভাবে শুয়ে কাটাও। (উপভোগ সময় সাপেক্ষ।)

৩৫৭.
**নিজর্ মুখ্‌খান হুই** চা।
**শব্দার্থঃ নিজর্=নিজের, মুখ**= মুখমণ্ডল, হুই=শুকে, চা=দেখ।
**ব্যাখ্যা : নিজের মুখ শুকে** দেখ। (নিজের দোষ আগে দেখ।)

৩৫৮.
**পোয়ার মুতৎ আঁছার ন খাইচ্।**
**শব্দার্থঃ পোয়া=ছেলে,** মুত=প্রস্রাব, মুতৎ=প্রশ্রাবে, পোয়ার মুতৎ=ছেলের প্রশ্রাবে, **আঁছার=আছাড়, খাইচ্=**খেয়ো।
**ব্যাখ্যা : বাচ্চা ছেলের প্রস্রাবে** আছাড় খেয়ো না। (ছোট বা কম অভিজ্ঞ লোকের কাছে পরাজিত হওয়া কাম্য নয়।)

৩৫৯.
**পাঁড়ারে জ'রাইলে পাঁড়িয়ে** হাসে,
**(পাঁড়া কঅদে) অ'পাঁড়ি তল্‌লা**ও আছে খদার ছিনদি।
**শব্দার্থঃ পাঁড়া=পাঁঠা,** জঅরাইলে=জবাই করলে, অ'পাঁড়ি=পাঁঠি, তল্‌লাও=তোমার **জন্যও, খদার=খোদার,** ছিনদি=শিরণি।
**ব্যাখ্যা : পাঁঠাকে জবাইকালে** পাঁঠি হাসে, আর পাঁঠা বলে, পাঁঠি আমার পরেই তোমার **পালা। (বিপদ সময়ে সবার জন্যই** আসে।)

৩৬০.
**পুরান্ পঅলে ভাত ন পার,** নোয়া পঅল জুইট্‌ঠে।

www.pathagar.com

**শব্দার্থ:** পঅল = পাগল, নোয়া = নতুন, জুইট্‌ঠে = জুটেছে।
**ব্যাখ্যা :** পুরান পাগল ভাত পায় না, সেখানে এসেছে নতুন পাগল। (আগের লোকের কাজ নেই, নতুন লোকের আবির্ভাব।)

৩৬১.
পইরল্‌লা গোশ্‌শা অই পুন ন ধূয়ে।
**শব্দার্থ:** পইরঅল্‌লা=পুকুরের সঙ্গে, অই=হয়ে, পুন=পায়ুপথ; পাছা।
**ব্যাখ্যা :** পুকুরের সঙ্গে রাগ করে পাছা অপরিষ্কার রাখবে নাকি? (নিজের কাজ সমাধা করতে অভিমান করা ঠিক নয়।)

৩৬২.
পোয়ার্‌ হাতৎ কেলা দিলে বুরার মন পায়।
**শব্দার্থ:** পোয়া=ছেলে, হাতৎ=হাতে, কেলা=কলা, বুরা=বৃদ্ধ।
**ব্যাখ্যা :** ছেলের হাতে কলা দিলে বড়দের মন পাওয়া যায়।

৩৬৩.
পিঁয়াদাল্‌লই দোস্‌তিয়ালি নাই।
**শব্দার্থ:** পিঁয়াদা=পুলিশ, দোস্‌তি=দোস্ত।
**ব্যাখ্যা :** পুলিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব নাই।

৩৬৪.
পিঁয়াদাত্‌তু বাপভাই চিন্‌ন নাই।
**শব্দার্থ:** পিঁয়াদা=পুলিশ, চিন্‌ন=পরিচয়।
**ব্যাখ্যা :** পুলিশের বাপভাই পরিচয় নাই।

৩৬৫.
পরর ঘরৎ ছেফরঅ ড়র।
**শব্দার্থ:** পরর=পরের, ঘরৎ=ঘরে, ছেফ্‌=থুথু, ড়র্‌=ভয়।
**ব্যাখ্যা :** পরের বাড়িতে থুথুকেও ভয় পেতে হয়। (ভিন্ন জায়গায় অতি সাবধানতা প্রয়োজন।)

৩৬৬.
পরর্‌ পিড়া, মুখৎ মিড়া।
**শব্দার্থ:** পরর=পরের, মুখৎ=মুখে, মিড়া=মিষ্টি; মিড়া অর্থ গুড় হলেও এখানে মিষ্টি।
**ব্যাখ্যা :** পরের পিঠা স্বাদ বেশি।

৩৬৭.
পুরান চইল ভাতে বারে।
**শব্দার্থ:** চইল=চাউল, বারে=বৃদ্ধি পায়।
**ব্যাখ্যা :** পুরাতন চাল রান্না করলে তাতে ভাত বৃদ্ধি পায়। (অভিজ্ঞলোক সমাজের বেশি কাজে লাগে।)

www.pathagar.com

৩৬৮.
পোষর শীতে বাঘ গুজরে, মাঘর শীতে গরু মরে।
শব্দার্থ: পোষর=পৌষ মাস, গুজরে=গর্জাতে থাকে, চিৎকার করে।
ব্যাখ্যা : পৌষের শীতে বাঘ ডাকে, আর মাঘের শীতে গরু মারা পড়ে।

৩৬৯.
পানি নিচর মিক্কা যায়।
শব্দার্থ: নিচর=নীচের, মিক্কা=দিকে।
ব্যাখ্যা : পানি নিম্নগামী। (যার যা বৈশিষ্ট)।

৩৭০.
পরুল্লারে জাগা দিলে বংশ নিপাত যায়।
শব্দার্থ: পরুল্লা=পরগাছা, জাগা=জায়গা, স্থান, দিচ্=দিও, ন দিচ্=দিওনা।
ব্যাখ্যা : পরগাছাকে আশ্রয় দিলে একসময় আশ্রয়দাতাকে ধ্বংস করে ফেলে। (বাইরের লোক-কে বেশি সুযোগ দিতে নেই।)

৩৭১.
পুদত্ ঘু আইলে, লুডা তুয়াতুই।
শব্দার্থ: পুদত্=পায়ুপথে, ঘু=মল, লুডা=বদনা, তুয়া=খোঁজা, তুই=খুঁজি, তুয়াতুই=খোঁজাখুজি।
ব্যাখ্যা : মল ত্যাগ করার বেগ পেলে বদনা খোঁজার তাড়া। (বিপদ আসার আগেই সাবধান থাকা দরকার।)

৩৭২.
পাইলাম থালত্, দিলাম গালত।
শব্দার্থ: থালত্=বাসনে বা প্লেটে।
ব্যাখ্যা : বাসনে পেলেই মুখে দেয়া। (সবকিছুর বাছবিচার থাকা দরকার)।
৩৭৩.
পুদত্তু ছইয়র্ দানা ন যার, বরইদ্দানা দদ্দে।
শব্দার্থ: পুদত্=পাছায়, ছই=সিম, দানা=বীচি, বরইদ্দানা=কুলের বীচি, দদ্দে=দিচ্ছ।
ব্যাখ্যা : পায়ুপথ দিয়ে সিমের বীচি যাচ্ছে না, সেখানে কুলের বীচি দিচ্ছ। (সাধ্যের অতীত কাজ চাপানো।)

৩৭৪.
পুদত্ নাই তেনা, মিড়াদি ভাত খানা।
শব্দার্থ: পুদত্=পাছায়, তেনা=ফাঁটা ডাষ্টার, তবে এখানে ছেড়া কাপড়, মিড়া=গুড়।
ব্যাখ্যা : পাছায় নেই কাপড়, সেখানে গুড় দিয়ে ভাত খেতে চাচ্ছে। (বিলাসিতা।)
৩৭৫.
পইল্ বসৎ ন হইল্ পুত্, মা'র সুক্ না বাপর সুক্।
শব্দার্থ: পইল্=পহেলা, বসৎ=বয়সে, হইল্=হল, ন হইল্= হলনা।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** প্রথম বয়সে পুত্র না হলে মা-বাবা কেউ সুখ পায় না।

৩৭৬.
পরর্ ধন লই ফটকানি গরা।
**শব্দার্থ:** পরর্=পরের, লই=নিয়ে, ফটকনি=ফটফটর করা, গরা=করা।
**ব্যাখ্যা :** পরের ধনে পোদ্দারি।

৩৭৭.
পরর্ ভাত, অনঅর হাত।
**শব্দার্থ:** পরঅর্=পরের, অনঅর্=আপনার।
**ব্যাখ্যা :** পরের ভাত, আপনার হাত। (নিজের রুজি-রোজগার নিজেকেই করতে হয়।)

৩৭৮.
পরঅর্ মাথাত্ খুর বুলান।
**শব্দার্থ:** পরর্=পরের, বুলান=বুলানো; চুল ছেটে ফেলা।
**ব্যাখ্যা :** পরের মাথার চুল ছেটে ফেলা। (অন্যকে দিয়ে কাজ উদ্ধার।)

৩৭৯.
পরর্ ভিড়াৎ জরিপ আইলে মাপ্লে মাপ্
নিজর্ ভিড়াৎ জরিপ আইলে বাপ্লে বাপ।
**শব্দার্থ:** পরর্=পরের, ভিড়াৎ=ভিটি বা ভিটা, আইলে=আসলে, মাপ্=মাফ চাওয়া, ওজন করা, কিন্তু এখানে পরিমাপ করার জন্য 'মাপ্' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে।
**ব্যাখ্যা :** পরের ভিটায় জরিপ আসলে পরিমাপ করো, আর নিজের ভিটায় জরিপ আসলে পরিমাপ করো না। (নিজের বিষয়টি সবার কাছে গুরুতর।)

৩৮০.
পথত্ পাইলাম কামার, দ বানাইয়া দে আমার।
**শব্দার্থ:** পথত্=পথে, দ=দা, বানাইয়া=বানিয়ে দাও।
**ব্যাখ্যা :** পথে কামারের দেখা পেলেই দা বানিয়ে নিতে আগ্রহ জন্মে। (অন্যকে দিয়ে কাজ করানোর প্রবণতা।)

৩৮১.
পথত্ পাইলে সোনা, কানৎ দঅন্ কি মানা?
**শব্দার্থ:** পথত্=পথে, কানৎ=কানে, দঅন্=দেয়া।
**ব্যাখ্যা :** কুড়িয়ে পাওয়া সোনা কানে দিতেতো নিষেধ নেই। (না চাইতেই যা পাওয়া যায় তাতে আবার হারাম-হালাল কিসের?)

৩৮২.
পাইক্ আইয়ক্ পেয়াদা আইয়ক্ আঁই কিছু না
ভেট্ আইয়ক্ বেগার্ আইয়ক্ মুই জঁইদারর্ মা।
**শব্দার্থ:** আইয়ক্=আসুক, বেগার্=বেকার, ভেট্=উপঢৌকন, জঁইদার=জমিদার।
**ব্যাখ্যা :** পাইক-পেয়াদা যাই আসুক আমি কিছুই নয়, উপঢৌকন-অন্যান্য উপহার সামগ্রী আসুক আমি জমিদারের মা। (কষ্ট নয়, লাভটাই সবাই আগে চায়।)

www.pathagar.com

৩৮৩.
পাইল্ পরব্ নাই যার, কিঅয়্ নাই অভাইগ্গার।
শব্দার্থ: পাইল্=পালা-পার্বণ, পরব্=ঈদ পার্বন, কিঅয়্=কেহ, অভাইগ্গার= দুর্ভাগার।
ব্যাখ্যা : দুর্ভাগার পালা-পার্বণও নেই।

৩৮৪.
পাডা উতার ঘঅা ঘ'ই, মুই মরিচর সর্বনাশ।
শব্দার্থ: পাড়া=মরিচ-মসলা পিষার পাটা, উতার=মরিচ পিষার পাথরের শীল; শীল নোড়া, ঘঅা ঘঅই=ঘষাঘষি।
ব্যাখ্যা : শিল-নোড়ার ঘষাঘষিতে মরিচের সর্বনাশ। (রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়।)

৩৮৫.
পাতার ঝারত্ বাঘ লুয়াই থাকে।
শব্দার্থ: ঝারত্=ঝাড়ে, লুয়াই=লুকিয়ে।
ব্যাখ্যা : পাতার আড়ালেও বাঘ লুকিয়ে থাকে। (যোগ্য লোক যে কোনো স্থানে থাকতে পারে।)

৩৮৬.
পানি কাডিলে দুই ভাগ হয়
ভাই-বোন কাডিলে দুই ভাগ নয়।
শব্দার্থ: কাডিলে=কাটলে।
ব্যাখ্যা : পানি কাটলে দুই ভাগ হয় কিন্তু ভাই-বোন কাটলে দুই ভাগ হয় না। (আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয় না।)
৩৮৭.
পানি দেইলে মুতে, হতিন দেইলে চিতে (রীষে)।
শব্দার্থ: দেইলে=দেখলে, মুতে=প্রশ্রাব করে, হতিন=সতিন, চিতে=চেতে, চেতা।
ব্যাখ্যা : পানি দেখলে প্রশ্রাব করে, আর সতিন দেখলে চেতে।

৩৮৮.
পারাইল্লায় কয় বছর বিয়াইন্না, গিরস্তে কয় ভাঁজা।
শব্দার্থ: কয়=বলে, বিয়াইন্না=প্রশব করে, গিরসতে=গেরস্ত, ভাঁজা=বন্ধা।
ব্যাখ্যা : গ্রামবাসী বলে প্রতি বছরেই প্রসব করে আর গেরস্তে বলে বন্ধ্যা। (গাভী সম্পর্কে)- নিজের সম্পদ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা।

৩৮৯.
পাঁচচুয়া অঁউল ফোয়ান নয়, পাঁচচুয়া মইষ্ এক নয়।
শব্দার্থ: পাঁচচুয়া=পাঁচটি, অঁউল=আগুল, ফোয়ান=সমান, মইষ্=মানুষ।
ব্যাখ্যা : পাঁচটি আগুল যেমন সমান নয় ঠিক তেমনি পাঁচটি মানুষও এক রকম নয়।

৩৯০.
পেডৎ ভোক্ মুখৎ লাজ।
শব্দার্থ: পেডৎ=পেটে, ভোক্=ক্ষুধা, লাজ=লজ্জা।
ব্যাখ্যা : পেটে ক্ষুধা, মুখে লজ্জা।

৩৯১.
পেডর্ ভোক্ নয়, চোখর্ ভোক্।
শব্দার্থ: পেডর্=পেটের, ভোক=ক্ষুধা, চোখর্=চোখের।
ব্যাখ্যা : পেটে ক্ষুধা নেই, চোখেই ক্ষুধা। (লোভ)

৩৯২.
পাইক্ পিয়াদার হউরর্ বারি নাই।
শব্দার্থ: পাইক-পিয়াদা=পুলিশ-সিপাই, হউরর্=শাশুড়ের, বারি=বাড়ি।
ব্যাখ্যা : পুলিশ-সিপাহীর শ্বশুড় বাড়ি নেই। (অসামাজিক-নির্লজ্জের মতো অর্থ উপার্জনকারী।)

৩৯৩.
পোয়ার্ মুত পানি পানি লাগে।
শব্দার্থ: পোয়ার্=শিশুর, মুত=প্রস্রাব।
ব্যাখ্যা : শিশুর প্রস্রাব পানি পানি বলে মনে হয়। (খুব সহজ বিষয় নয়।)

৩৯৪.
পোয়া চিয়ারা ন বুঝে, হইল্ চিয়ারা নহিজে।
শব্দার্থ: পোয়া=শিশু, পোয়া চিয়ারা=উড়তি বয়সের শিশু বা তরুণ, হইল্= শোল, হিজে=সিদ্ধ, নহিজে=সিদ্ধ হয় না।
ব্যাখ্যা : উঠতি শিশুরা যেমন কিছু বুঝতে চায় না তেমনি উঠতি বয়সের শোল মাছ রান্না করতে গেলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় না। (কম বয়সীদের বাগে আনা কঠিন।)

৩৯৫.
পোয়ার হাতত্ কেলা দিলে, বুরার মন পায়।
শব্দার্থ: পোয়ার্=শিশুর, হাতত্= হাতে, বুরার=বৃদ্ধদের বা বয়স্কদের, কেলা=কলা।
ব্যাখ্যা : শিশুর হাতে কলা দিলে বয়স্কদের মন পাওয়া যায়।

৩৯৬.
পরবাসীর পিরিতি, দুইয্যার ডাকাতি।
শব্দার্থ: দুইয্যা=দুপুর।
ব্যাখ্যা : প্রবাসীর প্রেম দুপুরের ডাকাতির সমান। (অস্থায়ী)

৩৯৭.
পথ ভালা বেকা যাইঅ, ভাত ভালা ফুদা খাইঅ।

www.pathagar.com

শব্দার্থ: বেকা=বাঁকা, ফুদা=তরকারি ছাড়া, যাইঅ=যেয়ো, খাইঅ=খেয়ো।
ব্যাখ্যা : রাস্তা ভালো হলে বাঁকাও যাওয়া যায়, ভালো চালের ভাত হলে তরকারি ছাড়াই খাওয়া যায়।

৩৯৮.
পরল্‌লা (পরিয়াল্‌লা) কুরিবি গারা, নিজে পরিবি।
শব্দার্থ: পরল্‌লা (পরিয়াল্‌লা)= পরের জন্য, কুরা=খনন করা, গারা=গর্ত, পরিবি=পড়বে।
ব্যাখ্যা : পরের জন্য গর্ত খনন করলে নিজেই সেই গর্তে পড়ে।

৩৯৯.
পঅনা ধানত্‌ হুয়র ঘইল্‌লে।
শব্দার্থ: পঅনা=পাকা, ধানত্‌=ধানে, হুয়র=শুকর, ঘইল্‌লে=প্রবেশ করেছে বা ঢুকেছে।
ব্যাখ্যা : পাকা ধানে শুকর ঢুকেছে। (সর্বনাশ করা।)

৪০০.
পিয়ারার বলঅ বল।
শব্দার্থ: পিয়ারা=পিপড়া, বল=শক্তি।
ব্যাখ্যা : পিপড়া ছোটো হলেও তার শক্তি কোনো কোনো সময় কাজে লাগতে পারে।

৪০১.
পুরা কুয়াইল্‌লার পইর ভাদমাইস্‌সাও ফুয়ায়।
শব্দার্থ: পুরা=পুড়ে যাওয়া বা দুর্ভাগা, কুয়াল=কপাল, পইর=পুকুর বা পুষ্করণি,ভাদমাইস্‌সা=ভাদ্র মাসে, ফুয়ায়=শুকায়।
ব্যাখ্যা : দুর্ভাগার পুকুর ভাদ্র মাসেও শুকায়।

৪০২.
পুরি গিলে উরি আইয়ে।
শব্দার্থ: পুরি=পুড়ে, গিলে=গেলে, উরি=উড়ে, আইয়ে=আসে।
ব্যাখ্যা : পুড়ে গেলে উড়ে আসে।

৪০৩.
ফোয়াদর্‌ ফোড়া, আফোয়াদর্‌ গোঁড়া।
শব্দার্থ: ফোয়াদ=স্বাদ, ফোড়া=শূন্য বা ফোটা, আফোয়াদ=স্বাদহীন বা বিস্বাদ, গোঁড়া= গোটা, আস্ত।
ব্যাখ্যা : স্বাদহীন সমস্ত খাবার স্বাদ বিশিষ্ট খাবারের এক ফোঁটার সমান হয় না।

৪০৪.
ফোয়ানা ঘু উল্‌ডাইলে বাস উড়ে।
শব্দার্থ: ফোয়ানা=শুকনো, ঘু=মল, উলডাইলে=উল্টালে, বাস=দুর্গন্ধ।
ব্যাখ্যা : পুরোনো মল উল্টালে দুর্গন্ধ বের হয়। (পুরনো বিষয় তুলতে নেই।)

www.pathagar.com

৪০৫.
ফইর মারি ভাঁইর কারি লন্ ।
শব্দার্থ: ফইর = ভিক্ষুক, ভাঁইর = ঝুড়ি, কারি=কেড়ে, লন্=নেয়া ।
ব্যাখ্যা : ভিক্ষুক মেরে ঝুড়ি কেড়ে নেয়া । (বাচ-বিচারহীন দুর্বৃত্ত ।)

৪০৬.
ফইরর্ চোখ ভাঁইরর্ কোনাত্ ।
শব্দার্থ: ফইর্=ফকির বা ভিক্ষুক, ভাঁইরর্=টুকরি বা মালামাল নেয়ার পাত্র যা বাঁশ বা বেতের তৈরি, কোনাত্=কোণায় ।
ব্যাখ্যা : ভিক্ষুকের চোখ টুকরির দিকেই থাকে ।

৪০৬.
ফুঁইচর্ পোঁদত্তু কুরইল্ চালা ।
শব্দার্থ: ফুঁইচ্=সুঁই, পোঁদত্=পাছায়, কুরইল্=কুড়াল ।
ব্যাখ্যা : সুঁইয়ের ছিদ্রতে কুড়াল ঢুকানোর চেষ্টা । (ব্যর্থ চেষ্টা ।)

৪০৭.
ফুঁইচ্দি ভাঁইবদে কামৎ কুর্ইল্ লাগন্ ।
শব্দার্থ: ফুঁইচ=সুঁই, ফুঁইচ্দি= সুঁই দিয়ে, ভাঁইবদে=ভাঙবে, কামৎ=কাজে, কুরইল=কুড়াল ।
ব্যাখ্যা : যেখানে সুঁই দিয়ে কাজ হবে সেখানে কুড়াল দিয়ে কাজ করা ।

৪০৮.
ফেঁজাত ফেঁজা বাঝে ।
শব্দার্থ: ফেঁজা=ময়লা-আবর্জনা, বাঝে=আটকায় ।
ব্যাখ্যা : ময়লা-আবর্জনাতে ময়লা-আবর্জনাই আটকায় ।

৪০৯.
ফউনর্ শীতে বঅনে গরু বেচে কেতা কিনে ।
শব্দার্থ: ফউন=ফাল্গুন, ফউনর্=ফাল্গুনের, বঅনে=ব্রাহ্মনে, কেতা=কাঁথা ।
ব্যাখ্যা : ব্রাহ্মণরা ফাল্গুনের শীতে গরু বিক্রি করে কাঁথা ক্রয় করে ।

৪১০.
ফোতাটুনিএ ধন পাইয়ে পান গরছ ।
শব্দার্থ: ফোতাটুনি=ছোট বুলবুলি পাখি, পান=মতো, গরছ=করছো ।
ব্যাখ্যা : ছোট বুলবুলি পাখি ধন পেলে যা করে তাই করছো ।

৪১১.
বাঁ'লর্ পেড়ৎ ঘিঁ অজম ন-য় ।
শব্দার্থ: বাঁ'লর = মূর্খের, পেড়ৎ=পেটে, অজম=হজম ।
ব্যাখ্যা : মূর্খের পেটে ঘি হজম হয় না । (আধুনিকতা মূর্খের অসহ্য ।)

www.pathagar.com

৪১২.
বিলাইর্ ভাইগ্গয়ে ছিক্কা ন ছিরে ।
শব্দার্থ: বিলাই=বিড়াল, বিলাইর্=বিড়ালের, ভাইগ্গয়ে= ভাগ্যে, ছিক্কা = শিকে, ছিরে=ছিড়ে ।
ব্যাখ্যা : বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিড়ে না । (কারো ভাগ্য বলে কিছুই হয় না ।)

৪১৩.
বেইস্সা বুরা অইলে পানর দোয়ান দেয় ।
শব্দার্থ: বুরা=বৃদ্ধ, পানর = পানপত্র, দোয়ান = দোকান ।
ব্যাখ্যা : বারবণিতা বৃদ্ধ হলে পানের দোকান দেয় । (কারণ কিছু না হোক রং তামাশা চালানো যায় বলে । অভ্যাস ছাড়া দায় ।)

৪১৪.
বিলাই মারন্ পইল রাইত ।
শব্দার্থ: বিলাই=বিড়াল, মারন্=মারতে হয়, পইল=প্রথম ।
ব্যাখ্যা : বিড়াল মারতে হয়ে প্রথম রাতেই । (বিয়ের প্রথম রাতে বিড়াল মেরে স্বামীর মেজাজ দেখানো, যাতে স্ত্রী প্রথম থেকেই স্বামীকে সমীহ করে ।)

৪১৫.
বিলাইরে মাছ চঁ'ই ন দিয়অ ।
শব্দার্থ: বিলাই=বিড়াল, বিলাইরে=বিড়ালকে, চঁঅই=পাহারা, দিয়অ=দিও ।
ব্যাখ্যা : বিড়ালের কাছে মাছ পাহারা দিতে নাই । (ভক্ষকের কাছে কোনো কিছুর নিরাপত্তা নাই ।)
৪১৬.
বাঁদর বুরা অইলেও গাছ বায় ।
শব্দার্থ: বাঁদর=বানর, বুরা = বৃদ্ধ, গাছ বায় = গাছে চড়ে ।
ব্যাখ্যা : বানর বৃদ্ধ হলেও গাছে চড়ে । (অভ্যাস ছাড়তে না পারা ।)

৪১৭.
ব'ন্ পরি মইল্লেও শূদ্দরর্ দোনা ।
শব্দার্থ: ব'ন = ব্রাহ্মণ, পরি=পড়ে, মইল্লে=মরলে, শূদ্দরর্= নিম্নবর্ণের হিন্দু, দোনা=দ্বিগুণ ।
ব্যাখ্যা : ব্রাহ্মণ মরে গেলেও শূদ্রের পূজনীয় । (ব্রাহ্মণের সম্মান বিত্ত কমে গেলেও শূদ্রের চেয়ে বেশি ।)

৪১৮.
বাইন্নার টুন্নুরটান্নুর, কঁইজ্জার এব্বারি ।
শব্দার্থ: বাইন্না = স্বর্ণকার, টুন্নুরটান্নুর=টুকটুক আওয়াজ, কঁইজ্জা = কামার, এব্বারি=একটি আঘাত ।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : স্বর্ণকারের টুংটাং অনেক আঘাতে কাজ সমাধা করে আর কামার এক আঘাতে কাজ সারে ।)

৪১৯.
বুরার্ কথা কুরার্ ঘু, পোয়াইন্দর কথা সার ।
ভাপি চ'গই মনেমনে, কার পুন মারা যার ।
শব্দার্থ: বুরার্=বৃদ্ধের, কুরা=মোরগ, পোয়াইন্দর=উঠতি ছেলেদের, ভাপি=ভেবে, চ=দেখ, পুন=পায়ুপথ ।
ব্যাখ্যা : বৃদ্ধের কথা মোরগের মলের মত, নবীনের কথা সার, ভেবে দেখ কার ক্ষতি কার লাভ । (আসল রহস্য বের করা প্রয়াজন ।)

৪২০.
বিয়ার টিয়া ভূতে জোয়ায় ।
শব্দার্থ: টিয়া=টাকা, জোয়ায়=জোগান দেয় ।
ব্যাখ্যা : বিয়ের খরচ ভূতে যোগান দেয় অর্থাৎ বিয়ের টাকার অভাব হয় না (কারণ যেন-তেন ভাবে তা জোগাড় করতে হয় ।)

৪২১.
বিয়াই আইলে থিয়াই কথা
জামাই আইলে বাক্কা রাতা ।
শব্দার্থ: থিয়াই=দাঁড়িয়ে, আইলে=আসলে, বাক্কা রাতা=বড় মোরগ ।
ব্যাখ্যা : বিয়াই আসলে দাঁড়িয়ে কথা (বাড়িতে অতিথি করার গরজ কম), আর জামাই আসলে বড় মোরগ জবাই দিতে হয়! (জামাই বলে কথা ।)

৪২২.
বাঘ মাইত্ত হতিনর্ পোয়া দি পেড়ায় ।
শব্দার্থ: মাইত্ত= মারতে, হতিন = সতীন, পোয়া = পুত্র, দিপেড়ায় = পাঠায় ।
ব্যাখ্যা : বাঘ মারতে সতীনের পুত্র পাঠায় । (যাতে সতীনের ছেলে বাঘের হামলায় মারা যায় ।)

৪২৩.
বাঘে-মুইশে এক ঘাড়ৎ পানি খার?
শব্দার্থ: মুইশ=মহিষ, ঘাড়ৎ=ঘাটে, খার=খাচ্ছে ।
ব্যাখ্যা : বাঘ-মহিশ একসঙ্গে জল পান করে? (অসম্ভব ব্যাপার) (তা সম্ভব হলে এলাকায় শান্তি আসবে ।)

৪২৪.
বাঘে-মুইশে হাল চ'য়্?
শব্দার্থ: মুইশ=মহিষ, চ'য়্=চাষ করে ।
ব্যাখ্যা : বাঘ-মহিষ নিয়ে এক সঙ্গে হাল চাষ হচ্ছে? (অসম্ভব ব্যাপার ।)

www.pathagar.com

৪২৫.
বঅনে ভট্‌ভড়ার, পাঁড়ার সেঁড়েঅ ন ফুনের।
শব্দার্থঃ বঅনে=ব্রাহ্মণে, ভট্‌ভড়ার = বকবক করা, পাঁড়া=পাঁঠা, সেঁড়/সেঁট = পুরুষাঙ্গ, পাঁড়ার সেঁড়ে=পাঁঠার যৌনাঙ্গে।
ব্যাখ্যা : ব্রাহ্মণ বকবক করে, পাঠার যৌনাঙ্গও শুনে না। (কর্তা বকাবকি করে, কর্মীর কর্ণগোচর হয় না।)

৪২৬.
বাপর্‌ কোলৎ বই হক বিচার গরা পরিব।
শব্দার্থঃ কোলৎ=কোলে, বই=বসে, গরা=করা, পরিব=পরবে।
ব্যাখ্যা : রায় পিতার বিরুদ্ধে গেলেও পিতৃক্রোড়ে বসে ন্যায় বিচার করতে হবে।

৪২৭.
বাঁ'লরে হাই কোর্ট দেখদ্‌দেনে।
শব্দার্থঃ বাঁ'লরে=অশিক্ষিত, মুর্খ, দেখদ্‌দে=দেখাচ্ছ।
ব্যাখ্যা : বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছো? (সাধারণ লোক ভেবে বোকা বানানোর চেষ্টা।)

৪২৮.
বই থনত্‌থুনারও বিয়ার দ'ন্‌ ভালা।
শব্দার্থঃ বই=বসে, থনত্‌থুনার=থাকার চেয়েও, বিয়ার=খাবারের বিনিময়ে শ্রম দেয়া, দ'ন=দেওয়া।
ব্যাখ্যা : বেকার থাকার চেয়ে বেগার খাটা ভাল।

৪২৯.
বন্‌দার দিয়া খোয়ার পানি,
আল্‌লার দিয়া অফুরানি।
শব্দার্থঃ বন্‌দা=বান্দা, খোয়া = শিশির, খোয়ার=শিশিরের।
ব্যাখ্যা : বান্দার দান শিশিরের সমান, আল্লাহ্‌ তা'আলার দান অফুরন্ত।

৪৩০.
বেক্‌কুন্‌অর পোঁদৎ ঘু আছে।
শব্দার্থঃ বেক্‌কুন্‌=সবার, পোঁদৎ=পায়ুপথ, ঘু=মল।
ব্যাখ্যা : সবার পায়ুপথে মল আছে। (দোষত্রুটি সকলেরই আছে।)

৪৩১.
বাপর্‌ দিন্‌না শাল, পুতর্‌ দিন্‌না জুতা।
শব্দার্থঃ বাপর্‌=পিতার, দিন্‌না = দিনের; কালের; আমলের, পুতর্‌=পুত্রের।
ব্যাখ্যা : পিতার আমলের শাল, পুত্রের কালের জুতোর সমান। (অবমূল্যায়ন।)

৪৩২.
বাঁধা গরু এরি দিয়া অইয়ে।

শব্দার্থ: এরি দিয়া=বন্ধন মুক্ত, অইয়ে=হয়েছে।
ব্যাখ্যা : বন্দি গরু বন্ধন মুক্ত হলে প্রথম এক দৌড় দিয়ে স্বাধীনতার আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

৪৩৩.
বেতালে-বেতালে ফজর।
শব্দার্থ: বেতাল=গোলমাল; যেখানে তাল বা নিয়ম নেই।
ব্যাখ্যা : গোলমালে গোলমালে সকাল হওয়া। (প্রয়োজনিয় কাজ না হওয়া।)

৪৩৪.
বনর বাঘে ন খাইতে মনর বাঘে খায়।
শব্দার্থ: বনর্=বনের, ন=না, মনর=মনের।
ব্যাখ্যা : বনের বাঘে খাওয়ার আগে মনের বাঘে খায়।

৪৩৫.
বা'তত্ু ফিটফাট, ভুতরে সদর ঘাট।
শব্দার্থ: বা'তত্ু=বাইরে।
ব্যাখ্যা : বাইরে দেখতে টিপটপ সুন্দর হলেও ভেতরে তার সম্পূর্ণ উল্টো।

৪৩৬.
বউ পালন রসে আর বসে।
শব্দার্থ: রসে=আনন্দ-ফূর্তিতে, বসে=পোষ মানিয়ে।
ব্যাখ্যা : বউ পালতে হয় আনন্দ-ফূর্তি দিয়ে ও পোষ মানিয়ে।

৪৩৭.
বট পাতাত্ নু আড়ে, এখন বরই পাতাত্ আড়ে।
শব্দার্থ: পাতাত্=পাতা, বট পাতাত্=বট গাছের পাতায়, আড়ে=সংকুলান, নু আড়ে=সংকুলান হচ্ছে না।
ব্যাখ্যা : বট পাতায় সংকুলান হচ্ছে না এখন কুল পতায় সংকুলান হচ্ছে। (গাঢ় বন্ধুত্ব।)

৪৩৮.
বা'ড়ি শ'তানর্ লাড়ি।
শব্দার্থ: বা'ড়ি=খর্বকায়, ক্ষুদ্র, বামন, শ'তানর্=শয়তানের।
ব্যাখ্যা : বামন ব্যক্তি শয়তানের বন্ধু।

৪৩৯.
বিলর্ গরু বদরর্ ছিনদি।
শব্দার্থ: বিলর্=বিলের, বদরর্ =আল্লাহ্র নামে, ছিনদি=শিরণি।
ব্যাখ্যা : বিলের গরু দিয়ে আল্লাহ্র নামে শিরণি করা। (তুলনীয়: উড়ো খইয়ে গোবিন্দায় নম:)

৪৪০.
বেদর্ বিল্লাহ্ বদরঅর্ ছিনদি।

www.pathagar.com

শব্দার্থঃ বেদর্ বিল্লাহ্=যেন তেন ।
ব্যাখ্যা : যেন তেন করে আল্লাহর নামে শিরনি দেয়া । (যেন তেন ভাবে কাজ সমাধা করার চেষ্টা ।)

৪৪১.
বুঝর্ এক কথা অবুঝর দশ কথা ।
শব্দার্থঃ বুঝর্=যিনি বোঝেন ।
ব্যাখ্যা : যিনি বোঝেন তার এক কথা, যিনি বোঝেন না তার দশ কথা ।

৪৪২.
বঅলী নারে ঢঅলি, গাং কেঅনে পারালি?
শব্দার্থঃ বঅলী=কলাগাছের ভেতরের অংশ, ঢঅলি=গাছের ঢাল, গাং=গঙ্গা, নদী, কেঅনে=কেমনে, পারালি=পার হলে ।
ব্যাখ্যা : কলাগাছও দেখি না, গাছের ডালও দেখি না, নদী কেমনে পার হলে? (অর্থাৎ রহস্যটা কী?)

৪৪৩.
ব'ই খাইলেও বশ যায়, চ'ই খাইলেও বশ যায় ।
শব্দার্থঃ ব'ই=বসে, বশ=বয়স, চ'ই=চাষ করা ।
ব্যাখ্যা : বসে খেলেও বয়স যায়, আর চাষ করে খেলেও বয়স যায় । (যাই করো জীবন কেটেই যায় ।)

৪৪৪.
বইত্অ দিলে খাইত চায়, খাইত দিলে নেইটত চায় ।
শব্দার্থঃ বইত্অ=বসতে, নেইটত=শুতে ।
ব্যাখ্যা : বসতে দিলে খেতে চায়, খেতে দিলে শুতে চায় । (সুযোগসন্ধানী ।)
৪৪৫.
বন্ পোরা যায়, বেক্কুনে দেখে
মন্ পোরা যায়, কিঅ ন দেখে ।
শব্দার্থঃ বন্=জঙ্গল, পোরা=পোড়া, বেক্কুনে=সবাই, কিঅ=কেহ ।
ব্যাখ্যা : জঙ্গল পুড়লে সবাই দেখে কিন্তু মন পুড়লে কেউ দেখে না ।

৪৪৬.
বর্ ছপ্ পরি রইয়ে বইন্না নাই
বর্ উডান্ পরি রইয়ে কুরাইন্না নাই ।
শব্দার্থঃ বর্=বড়, ছপ্=বিছানা, বইননা=বসার, কুরাইন্না=কুড়ানোর ।
ব্যাখ্যা : বিছানা পড়ে রয়েছে বসার কেউ নাই, উঠানে পরে রয়েছে কুড়ানোর কেউ নাই । (বৃথা আয়োজন ।)

৪৪৭.
বরাইয়া পোন্ ছেরাইয়া যায় ।

শব্দার্থঃ বরাইয়া=আত্ম-অহমিকা, পোন্=পায়ুপথ, ছেরাইয়া=ছিড়ে।
ব্যাখ্যা : আত্ম-অহমিকা করলে পতন হবে।

৪৪৮.
বরই পারে পরে খায়, কাইন্তে কাইন্তে ঘরৎ যায়।
শব্দার্থঃ ঘরত্=ঘরে, কান্= কান্না, কাইন্তে=কাঁদতে।
ব্যাখ্যা : গাছে উঠে বরই পাড়তে গেলে তা অন্যে খেয়ে যায়, নিজের জন্য কিছু থাকে না। (সম্পদ আয় করে রক্ষা করতে জানতে হয়।)

৪৪৯.
বঅনে পইছা পাইলে ঢেঁইর নামেও চন্ডি পরে।
শব্দার্থঃ বঅনে=ব্রাহ্মণে, পইছা=পয়সা/টাকা, ঢেঁই=ঢেঁকি।
ব্যাখ্যা : ব্রাহ্মণে টাকা পেলে ঢেঁকির নামেও চণ্ডি পাঠ করে।

৪৫০.
বাঁ'ল্ মরে ফেরে, গরু মরে খেরে।
শব্দার্থঃ বাঁ'ল=মুর্খ, অশিক্ষিত, ফেরে=কারচুপি, খেরে=খড়।
ব্যাখ্যা : মূর্খ মারা যায় সূক্ষ্ম কারচুপিতে, গরু মারা যায় খড় না পেয়ে।

৪৫১.
বাঁ'লঅর্ পেডত্ ঘি ন জারে।
শব্দার্থঃ বাঁ'লঅর্=মুর্খের, অশিক্ষিতের, পেডত্=পেটে, জারে=হজম হওয়া।
ব্যাখ্যা : মুর্খের পেটে ঘি হজম হয় না।

৪৫২.
বাঁ'ল্ মনুষ্য নয় কেবল একটা জন্তু,
গাধার্ মত পোঝা বয়্ লেজ নাই কিন্তু।
শব্দার্থঃ বাঁ'ল্=মুর্খ, অশিক্ষিত, পোঝা=বোঝা, বয়্=বহন করে।
ব্যাখ্যা : মূর্খ মানুষ পশুর ন্যায়, লেজ না থাকলেও গাধার মত বোঝা বহন করে।

৪৫৩.
বাঁকারে শীতে খায়।
শব্দার্থঃ বাঁকা=ফুলবাবু, যিনি সব সময় ফিটফাট থাকেন।
ব্যাখ্যা : ফুলবাবুকে শীতে পায়।

৪৫৪.
বাঁদররে পসকি দিলে মাথাত বই মুতে।
শব্দার্থঃ বাঁদর্=বানর, পসকি=পশ্রয়, বই=বসে, মুতে=প্রশ্রাব করে।
ব্যাখ্যা : বানরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় বসে প্রশ্রাব করে।

৪৫৫.
বা'রে গেলে সরাজ কাজী, ঘরৎ আইলে শরার্ কাজী।
শব্দার্থঃ বা'রে= বাইরে, শরার্=আইনের।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** বাইরে গেলে সরাজ (স্বরাজ) কাজী, আর ঘরে আসলে আইনের কাজী। (বাইরে বেলাল্লাপনা করে বেড়ায়,
বাড়িতে পত্নীর বেলায় যত ধর্মীয় আইন।)

৪৫৬.
বাইন্নায় মা'র কানর্ সোনাও চুরি গরে।
**শব্দার্থ:** বাইন্না=স্বর্ণকার, মা'র=মায়ের, কানর্=কানের।
**ব্যাখ্যা :** স্বর্ণকার মায়ের কানের স্বর্ণও চুরি করে। (প্রত্যেক ব্যবসায় চুরি আছে।)

৪৫৭.
বাইরার্ কাইললা ঝরে, বাআর কাউয়া লরে।
**শব্দার্থ:** বাইরার্= বর্ষার, কাইল্লা=কালের, মওসুমের, ঝরে=বৃষ্টিতে, বাআর=বাসার, কাউয়া=কাক, লরে=নড়ে।
**ব্যাখ্যা :** বর্ষার বৃষ্টিতে বাসার কাকও নড়ে।

৪৫৮.
বাঘর্ মাথাৎ টাক্, চিলর্ পোঁদৎ ধেচ্চুয়া।
**শব্দার্থ:** মাথাৎ=মাথায়, টাক্=জোঁকে ধরা, চিলর্=চিলের, পোঁদৎ=পাছায়, ধেচুয়া = ফিঙ্গে।
**ব্যাখ্যা :** ছোট হলেও জোঁক বাঘের মাথা থেকে রক্ত চোষে, ফিঙ্গে চিলকে পেছন থেকে ঠুকরায়।

৪৫৯.
বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া, বহুত ন হইলে থোরা থোরা।
**শব্দার্থ:** বাপকা= পিতার, বেটা=পুত্র, বাপকা বেটা=পিতার পুত্র, থোরা=কিছু।
**ব্যাখ্যা :** পিতার পুত্র আর সিপাহীর ঘোড়া, বেশি উপযুক্ত না হলেও কম যায় না।
(এটি একটি উর্দু প্রবাদ হলেও বর্তমানে স্থানীয়ভাবে বহুল প্রচলিত।)

৪৬০.
বাপ দাদার্ নাই চাষ, ধান দাতি কুরইল্ লই যাচ্।
**শব্দার্থ:** দাতি=কাটতে, ধান দাতি=ধান কাটতে, কুরইল্=কুড়াল, লই=নিয়ে যাচ্=যাচ্ছ।
**ব্যাখ্যা :** বাপ-দাদার তো ধান চাষ নেই, কুড়াল নিয়ে ধান কাটতে যাচ্ছ। (যার কাজ তারে সাজে।)

৪৬১.
বাপ্ দাদার্ নাই ডুলি, আগে দিয়ে ঠেং তুলি।
**শব্দার্তঃ** ডুলি=পাল্কি, ঠেং=পা, ঠেং তুলি=পা তুলে।
**ব্যাখ্যা :** বাব-দাদার তো পাল্কি নেই কিন্তু পাল্কিতে উঠার জন্য আগেই পা তুলে দিচ্ছে।

৪৬২.
বারা ভাতত্ ছাই দিয়ে।
**শব্দার্থ:** বারা=ধান ভানা, কিন্তু এখানে ভাত খাওয়ার পূর্বে 'গামলায় নেয়া' অবস্থাকে বুঝাচ্ছে।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : বাড়া ভাতে ছাই দেয়া।

৪৬৩.
বাল্ ফেলিলে মুদ্দা পাতল নঅয়।
শব্দার্থ: বাল্=নিম্নাঙ্গের চুল বা কেশ, মুদ্দা=মুর্দা, পাতল=হালকা, নঅয়=হয় না।
ব্যাখ্যা : নিম্নাঙ্গের চুল ফেললেও মুর্দা (শব) ওজনে হালকা হবে না। (নগন্য বিষয়ে হের ফের হলে কিছু যায় আসে না।)

৪৬৪.
বিঅঁড়িয়ে লারেচারে, হঁওড়া বেডিয়ে পরানে মারে।
শব্দার্থ: বিঅঁড়ি=সোহাগী নয়, লারেচারে=নড়াচড়া করে, হঁওড়া=সোহাগী, বেডি=স্ত্রী।
ব্যাখ্যা : বেশি আদরের স্ত্রী পরাণে মারে কিন্তু অন্য স্ত্রী নাড়া চাড়া করলেও পরাণে মারে না।

৪৬৫.
বিলৎ খ'ন উরাৎ আই লাদন্।
শব্দার্থ: বিলৎ=মাঠে; বিলে, খঅন্=খাওয়া, উরাৎ=গোশালা; গোয়াল ঘর, আই=এসে, লাদঅন্=মল ত্যাগ করা।
ব্যাখ্যা : (গরু) মাঠে চড়ে বেড়ায়, মলত্যাগ করে গোশালায়। (সম্পদ আসে বাইরে থেকে।)

৪৬৬.
বিলর্ মাঝে চিলর্ বাখা।
শব্দার্থ: বিলর্=বিলের, চিলর্=চিলের, বাখা=বাসা।
ব্যাখ্যা : বিলের মাঝে চিলের বাসা। (নিঃসঙ্গ বাস।)

৪৬৭.
বিলাইর ভাইগ্গে ছিক্কা ছিয়্যে।
শব্দার্থ: বিলাইর=বিড়ালের, ভাইগ্গে=ভাগ্যে, ছিক্কা=শিকে, ছিয়্যে= ছিড়ছে।
ব্যাখ্যা : বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। (অপ্রত্যাসিত ফল লাভ।)

৪৬৮.
বিলাইর্ গোসসা খোয়ালাত।
শব্দার্থ: বিলাইর=বিড়ালের, খোয়ালা=পাতার তৈরি চাটাই।
ব্যাখ্যা : বিড়ালের রাগ চাটাইর উপরে। (একজনের কারণে সৃষ্ট রাগ অন্যের উপর ঝাড়া।)

৪৬৯.
বিষ খাই বিষ হজম গরন্।
শব্দার্থ: বিষ=প্রাণঘাতি রাসায়নিক দ্রব্য; এখানে অত্যাচার-নির্যাতনকে বুঝাচ্ছে,গরন্=করা।
ব্যাখ্যা : অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও স্বামীর ঘর করা।

৪৭০.
বুইজ্জা কুইয্যাত্তুন গইয্যাই গইয্যাই দইয্যাত্ পইয্যে।

www.pathagar.com

শব্দার্থ: বুইজ্জা=বৃদ্ধ লোক, কুইজ্জা=ঘড়ের গাদা, গইয্যাই=গড়িয়ে, দইয্যাত্=দরিয়া বা সমুদ্রে, পইয্যে=পড়েছে।
ব্যাখ্যা : বৃদ্ধ মানুষটি খড়ের গাদা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে সমুদ্রে পড়েছে।
(রোয়াই ও চাটি-চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার দুইরূপ বুঝাতে এই উদাহরণ দেয়া হয়। এটা রোয়াই রূপ; এর চাটি রূপ হলঃ বুইর্গা কুইরগাত্তুন গইর্গাই গইর্গাই দইরগাত্ পইর্গে।)

৪৭১.
বুক ফাড়ি যারগই ত'ও মুখ ন ফাডের।
শব্দার্থ: ফাড়ি=ফেটে, তও=তবু, যারগই=যাচ্ছে, ন=না, ফাডের=ফাটছে, ন ফাডের=ফাটছে না।
ব্যাখ্যা : বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না।

৪৭২.
বুদ্ধিতে বেক্কিন ঘটে, কোয়ালর্লাই কিঅ ন আঁটে।
শব্দার্থ: বেক্কিন=সবকিছু, কোয়াল্র=কপালের, কিঅ=কেহ, আঁটে=পেরে উঠা।
ব্যাখ্যা : বুদ্ধিতে সবকিছুই পাওয়া যায়, কিন্তু ভাগ্যের সাথে কেহ পারে না।

৪৭৩.
বুরা গরু, চোয়া ধান, যে বেচে হিতে সিয়ান্।
শব্দার্থ: চোয়া=চিটা, হিতে=সে, বুরা=বৃদ্ধ, বেচে=বিক্রি করে।
ব্যাখ্যা : বৃদ্ধ গরু আর চিটা ধান যিনি বিক্রি করতে পারেন তিনি খুবই সেয়ানা বা বুদ্ধিমান। (ঠকানো বুদ্ধি।)

৪৭৪.
বউয়ে ভাঁইলে চাঁরা, হরিয়ে ভাঁইলে খলা।
শব্দার্থ: ভাঁইলে=ভাঙ্গলে, চাঁরা=মাটির নুড়ি বা খোলমকুচি, হরিয়ে=শাশুড়ি, খলা= খোলা, মুড়ি বা পপ কর্ন তৈরি করার মাটির পাত্র বিশেষ।
ব্যাখ্যা : শাশুড়ি ভাঙ্গলে খোলা হয় আর বউয়ে ভাঙ্গলে মাটির নুড়ি হয়। (অন্যের দোষ ধরার বাতিক।)

৪৭৫.
বাইয়ন্ তোলা খাইয়্,মুলা তোলা ন খাইয়্।
শব্দার্থ: বাইয়ন্=বেগুন, খাইয়্=খাওয়া, তোলা=ছিঁড়া, ন খাইয়্=খেয়ো না।
ব্যাখ্যা : মুলার মতো না তুলে (একেবারে তোলা) বেগুনের মতো (বার বার তোলা যায় এমন) খেয়ো।

৪৭৬.
বুরাবুরি ডুলত্ ভরি লই যা পরে।
শব্দার্থ: বুরাবুরি=বৃদ্ধ লোকজন, ডুলত্=ঢুলে, ভরি=ভরে বা ভর্তি করে, লই=নিয়ে।
ব্যাখ্যা : প্রয়োজনে বয়স্ক লোকজনকে ডোলের ভেতরে করে নিয়ে যেতে হয়। (কোন

www.pathagar.com

যাত্রায় অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন ।)

৪৭৭.
বেশি দিন ন থাইব বউদালি ।
**শব্দার্থ:** থাইব=থাকবে, ন থাইব= থাকবে না, বউদালি=বাহাদুরী ।
**ব্যাখ্যা :** বেশি দিন থাকবেনা বাহাদুরী ।

৪৭৮.
বেঙ এর মুখত্ বাইরা ।
**শব্দার্থ:** মুখত্=মুখে, বাইরা=বর্ষা ।
**ব্যাখ্যা :** ব্যাঙের আওয়াজেই বর্ষার আগমন বোঝা যায় ।

৪৭৯.
বইনে বাঁধের মোচা, ভাইয়ে চাঁছের ওঁচা ।
**শব্দার্থ:** মোচা=ভাতের মোচা, চাঁছের=দা'তে সান দেয়া, ওঁচা=কাঠের লাঠি ।
**ব্যাখ্যা :** বোন ভাইয়ের জন্য ভাতের মোচা বাঁধছে, অপর দিকে ভাই বোনকে মারার জন্য লাঠি তৈরি করছে । (বোন স্নেহশীল হলেও ভাই বোনের সম্পত্তি হরণ করে ।)

৪৮০.
বেশি খাইত চাইলে আইট্টার লতও ন পায় ।
**শব্দার্থ:** খাইত=খেতে, আইট্টা=স্বল্প, অল্প, লত=নাগাদ ।
**ব্যাখ্যা :** বেশি খেতে চাইলে প্রয়োজনেরটাও পাওয়া যায় না ।

৪৮১.
বাঘর্ কেনা ঢাকত্ ।
**শব্দার্থ:** বাঘর্=বাঘের, কেনা=প্রতিশোধ, ঢাকত্=পাশে ।
**ব্যাখ্যা :** বাঘ প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ে না ।

৪৮২.
বাঘর্ বল্ বার বছর ।
**শব্দার্থ:** বাঘর্=বাঘের, বল্=শক্তি ।
**ব্যাখ্যা :** বাঘের শক্তি থাকে বার বছর । (সব কিছুর শেষ আছে ।)

৪৮৩.
বেইচ্চা গরুর দাঁত চাই লাভ কি?
**শব্দার্থ:** বেইচ্চা=বিক্রি করা, চাই= দেখে ।
**ব্যাখ্যা :** যে গরু বিক্রি হয়ে গেছে সেই গরুর দাঁত দেখে (বয়স যাচাই করে) কী লাভ? (হারানো জিনিস নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই ।)

৪৮৪.
বন্ বন্ খুঁতর বন্, খুঁত ফুরাইলে চেডর্ বন্ ।
**শব্দার্থ:** বন্=বন্ধু, খুঁত=চালের ভাঙা অংশ, ফুরাইলে=ফুরালে, চেডর=চেট, পুরুষাঙ্গ;

www.pathagar.com

স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় শব্দটির দ্বারা মূল্যহীন বুঝায় ।)
**ব্যাখ্যা :** বন্ধু শুধু খাবারের সময় কিন্তু খাবার ফুরালে বন্ধুত্ব থাকে না ।

৪৮৫.
বাআল্ বনত্তু শিক্ষিত দুষমন বেশি গম ।
শব্দার্থ: বাআল্=মূর্খ; অশিক্ষিত, বন্=বন্ধু; গম=ভাল ।
**ব্যাখ্যা :** মুর্খ বন্ধুর চেয়ে শিক্ষিত শত্রু উত্তম ।

৪৮৬.
বাঁড়ি শতানর লাড়ি ।
শব্দার্থ: বাঁড়ি=বেটে, লাড়ি=লাঠি ।
**ব্যাখ্যা :** বেটে মানুষ শয়তানের লাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয় । অর্থাৎ বেঁটে লোকের মনে শয়তানি বুদ্ধি বেশি ।

৪৮৭.
বিনি কলর্ চিনি খাইয়ছ ।
শব্দার্থ: বিনি=বিন্নি ভাত; বিন্নি ধানের ভাত হালকা আঠাযুক্ত এবং সামন্য মিষ্টি, কলর্=ফাঁদ ।
**ব্যাখ্যা :** বিন্নি ভাতের ফাঁদের চিনি খেয়েছ ।

৪৮৮.
বরাতর্ বাইরে খরাত নাই ।
শব্দার্থ: বরাত=বরাদ্ধ, খরাত=খয়রাত; ভিক্ষা ।
**ব্যাখ্যা :** বরাদ্ধের বাইরে ভিক্ষা জোটে না ।

৪৮৯.
ভাত খ'ন আর নোয়াছ পরন ফোয়ান ।
শব্দার্থ: খ'ন =খাওয়া, নোয়াছ=নামাজ, ফোয়ান=সমান, পরন=পড়া ।
**ব্যাখ্যা :** আহার আর নামাজ পড়া সমান গুরুত্ববহ । (মনযোগী হয়ে কাজ করা ।)

৪৯০.
ভালাইর ভালা হক্কলে অয়,
খরাপর ভালা কিইয়ে ন-অয় ।
শব্দার্থ: ভালাইর=ভালো কর্মের, হক্কলে=সকলে, কিয়ে=কেহ, খরাপর=খারাপের, ন-অয়=হয় না ।
**ব্যাখ্যা :** ভালো কর্মের ভাগি সকলে হয়, মন্দের ভাগি কেউই নয় ।

৪৯১.
ভাত ছিঁডিলে কাওয়ার রাট নাই ।
শব্দার্থ: ছিঁড়িলে = ছিটালে, কাওয়ার = কাকের, রাট=সংকট, অভাব ।
**ব্যাখ্যা :** ভাত ছিটালে কাকের অভাব হয় না । (টাকা দিলে লোকের অভাব হয় না ।)

www.pathagar.com

৪৯২.
ভূতে পুন মাইজ্‌ঝে।
শব্দার্থ: পুন=পায়ুপথ; গুহ্যদ্বার, মাইজ্‌ঝে=মেরেছে; স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় 'পুন মাইজঝে' দ্বারা ক্ষতি হওয়া বুঝায়।
ব্যাখ্যা : মনে হয় ভূতে পেয়েছে। (বোকামি করা।)

৪৯৩.
ভা ঠ্যাং নিত্‌তি গাতৎ।
শব্দার্থ: ভা=ভাঙ্গা, নিত্‌তি = সর্বদা, গাতৎ=গর্তে।
ব্যাখ্যা : ভাঙ্গা পা সর্বদা গর্তেই পড়ে। (বিপদ যার পিছু ছাড়ে না।)

৪৯৪.
ভা ঠেং গারাৎ পরে।
শব্দার্থ: ভা=ভাঙ্গা, ঠেং=পা, গারাৎ=গর্তে।
ব্যাখ্যা : ভাঙ্গা পা গর্তেই পড়ে।

৪৯৫.
ভিরি বাইন্‌লে ছিরি যায়, হঁস গরি বাইনলে গলি যায়।
শব্দার্থ: ভিরি=শক্ত, বাইন্‌লে=বাঁধলে, ছিরি=ছিড়ে, হঁস=হালকা, গরি=করে, গলি=গলে; বেরিয়ে।
ব্যাখ্যা : শক্ত করে বাঁধলে ছিঁড়ে যায়, আর হালকা করে বাঁধলে গলে যায়। (উভয় সঙ্কট।)

৪৯৬.
ভাত ভালা ফুদা খাইয়, পথ ভালা বেকা যাইয়।
শব্দার্থ: ফুদা=তরকারি ছাড়া, খাইয়=খাওয়া; খেয়ো, বেকা=বাঁকা, যাইয়=যাওয়া; যেও।
ব্যাখ্যা : ভাল চালের ভাত হলে তরকারি ছাড়াও খাওয়া যায়, আর পথ ভাল হলে বাঁকাও যাওয়া যায়। (ভালো সব কিছু উপভোগ্য।)

৪৯৭.
ভাইগ্‌গইত্‌তার ভাইগ্য, খালকাচাত্‌ যাই হাইগ্‌গ।
শব্দার্থ: ভাইগ্‌গইত্‌তা=ভাগ্যবান, কাচাত্‌=কিনারে; তীরে, খালকাচাত্‌=খালের কিনারে, হাইগ্‌গ=মল ত্যাগ করা।
ব্যাখ্যা : ভাগ্যবানের ভাগ্য, খালের কিনারে গিয়ে মল ত্যাগ কর। (এক সাথে সব কাজ সারা যায়।)

৪৯৮.
ভাইগ্য যার্‌ কোয়ালত্‌ ফলে, বুদ্ধি তার্‌ পোঁদত্‌তি ঠেলে।
শব্দার্থ: ভাইগ্‌গ=ভাগ্য, কোয়ালত্‌=কপালে, পোঁদত্‌তি=পাছায়।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** ভাগ্য যার কপালে ফলে, বুদ্ধি তাঁকে পাছায় ঠেলে। (ভাগ্য ভালো হলে-বুদ্ধিও ঠিক সময়ে এসে যায়।)

৪৯৯.
ভাইয়র্ বলে বলি ধরন্ গম নয়।
**শব্দার্থ:** ভাইয়র্= ভাইয়ের, বলে=শক্তিতে, বলি=কুস্তি, ধরঅন্=ধরা, বলি ধরন্=কুস্তি ধরা; কুস্তি করা, গম=ভাল।
**ব্যাখ্যা :** ভাইয়ের শক্তিতে কুস্তি করা ভাল নয়। (লড়তে হয় নিজের শক্তিতে।)

৫০০.
ভাগর্ ভাত চাবাই ফেলা।
**শব্দার্থ:** ভাগর্=ভাগের, চাবাই=চিবিয়ে।
**ব্যাখ্যা :** ভাগের ভাত খেতে না পারলে চিবিয়ে ফেলো। (নিজের ভাগ বুঝে নেয়া ভাল।)

৫০১.
ভালাত্ মন্দ মিডাৎ পোক্।
**শব্দার্থ:** মন্দ=মন্দ, মিডাৎ=গুড়ে, পোক্=পোকা।
**ব্যাখ্যা :** ভাল-এর মন্দ আর গুড়ে পোকা। (ভাল-তে মন্দ থাকতে পারে, গুড়ে পোকা থাকতে পারে।)

৫০২.
ভালা মাইন্ষর এক কথা।
**শব্দার্থ:** মাইনষর=মানুষের।
**ব্যাখ্যা :** ভদ্র লোকের এক কথা।

৫০৩.
ভালার্লাই দিলাম তেল পরা, তেলে গেলদে কোয়াল পোরা।
**শব্দার্থ:** ভালা=ভাল, ভালার্লাই=ভালর জন্যে, গেলদে=গেল যে, কোয়াল=কপাল, পোরা= পুড়া।
**ব্যাখ্যা :** মঙ্গলের জন্য তেল পরা দিয়ে সেই তেলে কপাল পুড়া গেল। (তান্ত্রিক ওঝা-স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য তেল পড়া দিয়েছে; উল্টো তাতে বিয়ে ভেঙে গেল।)

৫০৪.
ভালার্ লয় ভালা, খারাপর্ লয় হালা।
**শব্দার্থ:** লয়=জন্যে, খারাপর্=খারাপের, হালা=শালা।
**ব্যাখ্যা :** ভাল-এর জন্য ভালা, খারাপের জন্য শালা।

৫০৫.
ভাবেতে মজিলে মন, কেবা হাঁরি কিবা ডোম্।
**শব্দার্থ:** হাঁরি=নিম্নবর্ণের হিন্দু, ডোম্= জলদাশ, ধীবর।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** ভাবেতে মন মজে গেলে সেখানে হাড়ি জলদাস পার্থক্য থাকে না। (প্রেম অন্ধ।)

৫০৬.
ভূতর্ বিয়ার খাডন্।
**শব্দার্থ:** ভূতর্=ভূতের, বিয়ার=ভাতের বিনিময়ে শ্রম দেয়া; বেগার, খাডন্=খাটা।
**ব্যাখ্যা :** ভূতের বেগার খাটা।

৫০৭.
ভোক্ থাইলে হুদাও রচে
ভিঁউরে করাইলে বুরাও নাচে।
**শব্দার্থ:** ভোক্=ক্ষুধা, হুদা=তরকারি ছাড়া, রচে=চলে, ভিঁউর=ভীমরুল, কঅরাইলে=কামড়াইলে, বুরা=বৃদ্ধ।
**ব্যাখ্যা :** ক্ষুধা থাকলে তরকারি ছাড়াও ভাত খাওয়া যায়, ভীমরুল কামড়ালে বুড়োরাও নাচে। (প্রয়োজনে সবকিছু হতে পারে।)

৫০৮.
ভাতর্ মাঝে গিরিং,
মাছর্ মাছে চিরিং
ডাইলর্ মাছে মসুর,
মাইন্ষর মাঝে শশুর।
**শব্দার্থ:** গিরিং=এক প্রকারের আমন ধান, চিরিং=এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ।
**ব্যাখ্যা :** ভাতের মধ্যে গিরিং, মাছের মধ্যে চিরিং, ডালের মধ্যে মসুর এবং মানুষের মধ্যে শ্বশুরই শ্রেয়।

৫০৯.
ভাইগ্গইত্তার মালর্ উয়ত্তু যায়
অভাইগ্গইত্তার যানর্ উয়ত্তু যায়।
**শব্দার্থ:** ভাইগ্গইত্তা=ভাগ্যবান, ভাইগগইত্তার=ভাগ্যবানের, মাল্=সম্পদ, মালর্=সম্পদের, উয়ত্তু=উপর থেকে; উপর দিয়ে, যান্=প্রাণ, যানর্=প্রাণের।
**ব্যাখ্যা :** ভাগ্যবান মানুষের (ক্ষতিটা) সম্পদের উপর দিয়ে যায়, ভাগ্যহীন মানুষের (ক্ষতি) প্রাণের উপর দিয়ে যায়।

৫১০.
ভাত চিনচ্ চইল ন চিনচ্।
**শব্দার্থ:** চিনচ্=চিনো, চইল=চাউল, ন চিনচ্=চিনো না।
**ব্যাখ্যা :** ভাতই শুধু চিনো, চাউল চিনো না।

৫১১.
মেলাৎ যাইও আগে, কজিয়াৎ যাইও পিছে।
**শব্দার্থ:** মেলাৎ=মেজবানে, কজিয়াৎ = বিবাদে, যাইও=যেও।

**ব্যাখ্যা :** খাবার আয়োজনে আগে আর বিবাদে শেষে যাওয়া ভাল।

৫১২.
মও ভাইনা জিয়ৎ, নরাইজ্জর্ পোন মারামারি হিঁয়ৎ।
**শব্দার্থ:** মও = মামা, জিয়ঁৎ = যেখানে, নরাইজ্জর্=বিভিন্ন ধরণের, হিঁয়ৎ=সেখানে।
**ব্যাখ্যা :** মামা-ভাগ্নে যেখানে, সকল কাণ্ডকারখানা সেখানে। (সম্পত্তির অংশীদারিত্বের ঝঞ্ঝাট।)

৫১৩.
মও ভাইনা জিয়ৎ, বিআক্কাম হিঁঅত।
**শব্দার্থ:** মও=মামা, জিয়ৎ=যেখানে, বিআক্=সব, কাম=কাজ, বিআক্কাম=সবকাজ, হিঁঅত্=সেখানে।
**ব্যাখ্যা :** মামা-ভাগ্নে যেখানে, সব কাজ সেখানে।

৫১৪.
মও ভাইনা যিয়ত্, আপদ নাই হিয়ত্।
**শব্দার্থ:** মও, মউ=মামা, ভাইনা=ভাগিনা, যিয়ত=যেখানে, আপদ=বিপদ, হিয়ত্=সেখানে।
**ব্যাখ্যা :** মামা-ভাগিনা যেখানে, বিপদ নাই সেখানে।

৫১৫.
মাছে ন চিনে জাল,
গরুএ ন চিনে ফাল
আঁধায়ে ন চিনে লাল,
বেকুপে ন চিনে কাল।
**শব্দার্থ:** ফাল=লাঙ্গলের ফাল; যা দিয়ে জমি চাষ করে, ন চিনে=চিনে না, কাল=সময়।
**ব্যাখ্যা :** মাছ চিনেনা জাল, গরু চিনেনা ফাল, অন্ধ চিনেনা লাল আর বেকুবের থাকে না সময় জ্ঞান।

৫১৬.
মওত্তুন আরও ভাইনা ডঁঅঁর।
**শব্দার্থ:** মওত্তুন = মামার চেয়েও, ভাইনা = ভাগ্নে, ডঁঅঁর = বড়, মান্যবর।
**ব্যাখ্যা :** মামার চেয়েও ভাগিনা মান্যবর! (ছোট-র বড়ো হওয়ার ভান।)

৫১৭.
মাছর মজা লেজৎ, কথার মজা প্যাঁজৎ।
**শব্দার্থ:** প্যাঁজৎ = প্যাঁচ, কূট কৌশল।
**ব্যাখ্যা :** মাছের সাধ লেজে, কথার সাধ কূট কৌশলে।

৫১৮.
মশরির বা'রে ঠ্যাং টানিলে মুশায় খায়।
**শব্দার্থ:** বা'রে=বাইরে, ঠ্যাং=পা, টানিলে=টানলে; এখানে মশারির বাইরে গেলে,

www.pathagar.com

মুশায়=মশা।

**ব্যাখ্যা :** মশারির বাইরে পা বের করলে মশা তো কামড়াবেই (আয়ের অধিক ব্যয় করলে দারিদ্র্য বাড়ে।)

৫১৯.

মা'না কামৎ শিয়ার নাই।

**শব্দার্থ:** মা'না=বিনা পয়সার; অলাভজনক, কাম=কাজ, কামৎ=কাজে।

**ব্যাখ্যা :** বিনা পয়সার ব্যবসায় অংশীদার নাই।

৫২০.

মিড়াল্লাপ পিঁয়ারায়ে খায়্।

**শব্দার্থ:** মিড়া = গুঁড়, লাপ=লভ্যাংশ, মুনাফা, পিয়াঁরা = পিঁপড়া।

**ব্যাখ্যা :** গুঁড়ের মুনাফা পিঁপড়ায় খায়। (ব্যবসায় সতর্ক থাকা দরকার।)

৫২১.

মা'না পাইলে পাতার মিড়াও জেপৎ ভরে।

**শব্দার্থ:** মা'না=বিনা পয়সা, জেপৎ = পকেটে, পাতার মিড়া=রাফগুড়।

**ব্যাখ্যা :** বিনা পয়সায় পেলে রাফগুড়ও পকেটে ভরে। (বিনা পয়সার তুচ্ছ জিনিসও কেউ ছাড়ে না।)

৫২২.

মজাল্লা ফেলাই ন পারে, কেঁড়াল্লা গিলি ন পারে।

**শব্দার্থ:** মজা=স্বাদ, মজাল্লা=স্বাদের জন্য, কেঁড়া=কাঁটা, কেঁড়াল্লা=কাঁটার জন্য।

**ব্যাখ্যা :** স্বাদের জন্য ফেলে দেয়া যাচ্ছে না, কাঁটার জন্য গিলতে পারছে না। (উভয় সঙ্কট)।

৫২৩.

মেট্টাইল্লা মেট্টাইল্লা কজিয়া গইল্লে, গিরচ্ছর ভিড়া উচল অয়।

**শব্দার্থ:** মেট্টাইল্লা=মাটি কাটার শ্রমিক, কজিয়া=ঝগড়া, গইল্লে=করলে, গিরছ= গৃহস্থ; গেরস্থ, উচল=উঁচু।

**ব্যাখ্যা :** মাটি কাটার শ্রমিকেরা ঝগড়া করলে গৃহস্থের ভিটি উঁচু হয়।

৫২৪.

মেলার ভাত দি ফইর বিদায় গরে।

**শব্দার্থ:** মেলা=মেজবান, ফইর = ভিক্ষুক।

**ব্যাখ্যা :** মেজবানের ভাতে ভিক্ষুক বিদায় করে।

৫২৫.

মনে মনে মন-কেলা খ'ন।

**শব্দার্থ:** মন-কেলা=মনে মনে কলা খাওয়া।

**ব্যাখ্যা :** মনে মনে কল্পনা করা। (ফন্দি করা।)

www.pathagar.com

৫২৬.
মাইর্‌রে ভূতে ডঁরায় ।
**শব্দার্থ:** মাইর=মার; পিটা, মাইর্‌রে=পিটুনি; বেদম প্রহারকে, ডঁরায়=ভয় পায় ।
**ব্যাখ্যা :** বেদম প্রহারকে ভূতেও ভয় পায় । (শক্তির জোরে অনেক কিছু হয় ।)

৫২৭.
মিশ্‌শিয়ারীর ঘু ডিয়াইলে একশিয়ারা বিয়ারাম হয় ।
**শব্দার্থ:** মিশ্‌শিয়ারী=দাঁতের কালো রং (মিশি) বিক্রেতা-বেদের মেয়ে । প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায় বলে এরা গণিকাবৃত্তি করে বলে সন্দেহ করা হয়, ডিয়াইলে=ডিঙ্গালে, বিয়ারাম=অসুখ ।
**ব্যাখ্যা :** নষ্টা মেয়ের মল ডিঙ্গালে একশিয়ারা অসুখ হয় । (নষ্টা মেয়ের ছায়া ডিঙানো নিষেধ ।)

৫২৮.
মাআনা কেলা মিডা নাই ।
**শব্দার্থ:** মাআনা=বিনা পয়সার, কেলা=কলা, মিডা=গুড়, তবে এখানে মিষ্টি ।
**ব্যাখ্যা :** বিনা পয়সার কলা মিষ্টি হয় না । (সহজে কিছু পেলে তার কদর থাকে না ।)

৫২৯.
মা'য়ে পালে ভূত, মাস্‌টরে পালে পুত ।
**শব্দার্থ:** পালে=লালন পালন করা ।
**ব্যাখ্যা :** মা'য়ে লালন-পালন করে ভূত, আর শিক্ষকরা লালন-পালন করে পুত্র । (অশিক্ষিত শিক্ষিত হয় গুরুর হাতে ।)

৫৩০.
মা মইল্‌লে বাপ তালই ।
**শব্দার্থঃ** মইল্‌লে=মরলে, তালই=তাঅই ।
**ব্যাখ্যা :** মা মারা গেলে পিতাও পর হয়ে যায় ।
৫৩১.
মা ভান্‌ডাল্‌, বাপ চান্‌ডাল ।
**শব্দার্থ:** ভান্‌ডাল্‌=আপন-জন, চান্‌ডাল্‌= দুষ্ট ।
**ব্যাখ্যা :** মা ছেলেমেয়েদের জন্য আপন-জন, পিতা দুষ্ট জন । (ছেলে মেয়ের জন্য মায়ের ভাণ্ডার খোলা, আর বাপ চাণ্ডালের মতো কৃপণ ।)

৫৩২.
মন ভাগন আর মছইদ্‌ ভাগন এক্‌কু ফুয়ান ।
**শব্দার্থ:** এককু=এক, এককু ফুয়ান্‌=এক সমান ।
**ব্যাখ্যা :** মন ভাঙ্গা আর মসজিদ ভাঙ্গা সমান ।

৫৩৩.
মুরংঅত্‌তু পইসা হইলে কুইচ্‌ছ কিনে ।

www.pathagar.com

**শব্দার্থ:** মুরুং=এক পাহাড়ি উপজাতি সম্প্রদায়, অত্‌তু= থেকে, কুইচ্‌ছ=কুকুরের ছানা।
**ব্যাখ্যা :** মুরুং সম্প্রদায়ের লোকজনের অর্থ কড়ি বেশি হলে কুকুরের ছানাও ক্রয় করে খায়। (হঠাৎ কারো অর্থ কড়ি বেশি হলে আজে-বাজে খরচ করে।)

৫৩৪.
মক্‌কা বউত দূর।
**শব্দার্থ:** বউত=বহু।
**ব্যাখ্যা :** মক্কা নগরী অনেক দূরে। (লক্ষ্য অনেক দূরে)। (তুলনীয়: দিল্লী দূর অস্ত।)

৫৩৫.
মরদর্ জিতে বাশ্‌শা, মাইয়াপোয়ার জিতে বেইস্‌সা।
**শব্দার্থ:** মরদর্= পুরুষের, বাশ্‌শা=রাজা-বাদশা, মাইয়াপোয়ার=মেয়েছেলে, বেইস্‌সা=বারবণিতা।
**ব্যাখ্যা :** পুরুষের জিতে বাদশা হয়, আর মেয়ে লোকের জিতে বারবণিতা হয়। (মেয়েদের বেশি জিদ দেখাতে নেই।)

৫৩৬.
মরদ্ কা বাত্, হাতি কা দাঁত্। (এটি একটি উর্দু প্রবাদ যা স্থানীয় ভাবে বহুল প্রচলিত।)
**শব্দার্থ:** মরদ্=ছেলে, পুরুষ, বাত্=কথা।
**ব্যাখ্যা :** পুরুষের কথা হাঁতির দাঁতের সমান। (সত্যিকার মানুষের কথার নড়চড় হয় না।)

৫৩৭.
মরুত্ পোয়ায়ে বুঝে হারাই, মাইয়া পোয়ায়ে বুঝে মারাই।
**শব্দার্থ:** মরুত পোয়া=পুরুষ, মাইয়া পোয়া=নারী; মেয়ে মানুষ, মারাই=নিজের সর্বনাশ করে।
**ব্যাখ্যা :** পুরুষেরা বুঝে সর্বশান্ত হয়ে, আর মেয়েরা বুঝে নিজের সর্বনাশ করে তথা বিয়ের আগে কারো সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এতে গর্ভবতী হয়ে পড়ে।

৫৩৮.
মরুত পোয়ার কানত্ শীত, মাইয়া পোয়ার রানত্ শীত।
**শব্দার্থ:** মরুত পোয়া=পুরুষ, কানত্=কানে, মাইয়া পোয়া=নারী; মেয়ে মানুষ।
**ব্যাখ্যা :** পুরুষ মানুষের শীত কানে, আর মেয়ে মানুষের শীত উরুতে। (দুজনের কানে সমান শীত লাগে; মেয়েদের বিষয়টি গ্রাম্যতা সুলভ যৌণ সুড়সুড়ি।)

৫৩৯.
মরারে মারর্ কিয়া, ন মরেদ্ দে'ই।
**শব্দার্থ:** মরারে=মৃত ব্যক্তিকে, মারঅর্=মারছো, কিয়া=কেন, মরেদ্=মরছে, ন মরেদ দে=মরছে না বলেই।

**ব্যাখ্যা :** মৃত ব্যক্তিকে মারছো কেন! মরছে না বলেই! (সমাজ বিপদগ্রস্থ কে আরো বিপদে ঠেলে দেয়া ।)

৫৪০.
মুদ্‌দারে আরো মার ।
**শব্দার্থ:** মদ্‌দারে=মুর্দা, মার=মরো ।
**ব্যাখ্যা :** মুর্দাকে আরো মারো । (তুলনীয়: মড়ার উপর খাড়ার ঘা ।)

৫৪১.
মুদ্‌দার্ ক'নর ক'র চুরি গরে ।
**শব্দার্থ:** মুদ্‌দার=মুর্দার, ক'নর্=কাফনের, ক'র=কাপড়, গরে=করে ।
**ব্যাখ্যা :** মুর্দার কাফনের কাপড় চুরি করে । (দুর্বৃত্তজন সব ধরনের খারাপ কাজ করতে পারে ।)

৫৪২.
মল্‌লার্ দঁউর মসইদ্ ল'তি ।
**শব্দার্থ:** মল্‌লা=মৌলভী, দঁউর=দৌড়, মসইদ্=মসজিদ, ল'তি=পর্যন্ত ।
**ব্যাখ্যা :** মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত ।

৫৪৩.
মাইল্‌লে ঝাঁড়া, ত ন ছারে ঘাডা ।
**শব্দার্থ:** মাইর্‌লে=মারলে, ঝাঁড়া=ঝাঁটা, ত=তবু, ন ছারে=ছাড়ে, ঘাডা=বাড়ির সদর দরজা ।
**ব্যাখ্যা :** ঝাঁটা মারলেও বাড়ির সদর দরজা ছাড়ে না । (নাছোড়বান্দা ।)

৫৪৪.
মঅশ্‌শার্ ছ'ড্‌ডইল মার বুক খায় ।
**শব্দার্থ:** মঅশ্‌শা=মাকড়শা, ছ'ড্‌ডইল=ছানার মতো, মার=মায়ের ।
**ব্যাখ্যা :** মাকড়শার ছানার মতো মায়ের বুক খাচ্ছে ।
৫৪৫.
মাগি খুঁজি খাই, কনকিয়ার দুয়ারত্ ন যাই ।
**শব্দার্থ:** মাগি=ভিক্ষা, কন=কেউ, কিয়ার=কারো, দুয়ারত্=দরজায় ।
**ব্যাখ্যা :** ভিক্ষা করে খাই, কারো দরজায় যায় না । (কূটাভাস ।)

৫৪৬.
মা গুনে পোয়া, জইন গুনে রোয়া ।
**শব্দার্থ:** জইন=জমিন, রোয়া=বীজ । (ধানের বীজ থেকে যে উদ্ভিদ বের হয়ে ধানের চারায় পরিণত হয় তাকে স্থানীয় ভাবে জালা বলে । রোপিত জালাকে 'রোয়া' বলে ।
**ব্যাখ্যা :** মা গুণে ছেলে, জমিন গুণে রোপন । (ছেলে মায়ের কারণে ভাল-খারাপ হয়, অনুরূপ ভাবে, জমির ফলন ভাল হবে জমির উর্বরতার কারণে ।)

৫৪৭.
মাঘর শীতে বাঘ ডুরে ।

www.pathagar.com

**শব্দার্থ**: মাঘর=মাঘ মাসের, ডুরে=কান্না করে, আওয়াজ করে, শব্দ করে।
**ব্যাখ্যা** : মাঘ মাসের শীতে বাঘও কান্না করে।

৫৪৮.
মাথার উঅরে হাত্ হাত পানি।
**শব্দার্থ**: উঅরে=উপরে, হাত্=সাত।
**ব্যাখ্যা** : মাথার উপর সাত হাত পানি। (মহাবিপদ।)

৫৪৯.
মাথার উঅরে হঁ'উন উরের।
**শব্দার্থ**: উঅরে=উপরে, হঁউন=শকুন, উরে=উড়ে।
**ব্যাখ্যা** : মাথার উপরে শকুন উড়ছে। (বিপদ ঘনিয়ে আসছে।)

৫৫০.
মানীর মান্ খোদায়ে রাখে।
**শব্দার্থ**: মানী=সম্মানী, মান্=সম্মান।
**ব্যাখ্যা** : সম্মানী মানুষের সম্মান খোদাতালায় রাখে।

৫৫১.
মইষ্ চিনন্ আকলে, গাছ চিনন্ বাকলে।
**শব্দার্থ**: মইষ্=মানুষ, চিনন্=চিনতে, আকলে=আক্কলে।
**ব্যাখ্যা** : মানুষ চিনতে হয় আক্কলে, আর গাছ চিনতে হয় বাকলে।

৫৫২.
মার দুধে যার পেট ন ভরে
বাপর্ বুইজ্জা অঁউল চুইলে কি ভরে?
**শব্দার্থ**: বুইজ্জা=বুড়ো, অঁউল=আঙ্গুল, চুইলে=চুষলে, ন ভরে=ভরেনা।
**ব্যাখ্যা** : মার দুধ পান করে যার পেট ভরে না, পিতার বুড়ো আঙ্গুল চুষে কি পেট ভরবে?

৫৫৩.
মিডা কথায় পেড় ন ভরে।
**শব্দার্থ**: মিডা=গুড়, তবে এখানে বাক্যের ব্যহারের জন্য 'মিডা' শব্দের অর্থ মিষ্টি, পেড়=পেট, ন ভরে=ভরে না।
**ব্যাখ্যা** : মিষ্টি কথায় পেট ভরে না।

৫৫৪.
মিডা খাই কুত্তার্ কেশ যায়, তও কুত্তা হাডৎ যায়।
**শব্দার্থ**: মিডা=গুড়, কুত্তা=কুকুর, তও=তবু, হাডৎ=হাটে-বাজারে।
**ব্যাখ্যা** : গুড় খেয়ে কুকুরের কেশ যায়, তবুও কুকুর বাজার ছাড়ে না। (আসক্ত ব্যক্তি নিজের সর্বনাশ দেখেও আসক্তি ছাড়ে না।)

www.pathagar.com

৫৫৫.
মুখত্ মিডা, বুকত্ বিষ ।
শব্দার্থঃ মুখত্=মুখে, মিডা=মিষ্টি ।
**ব্যাখ্যা :** মুখে মিষ্টি, মনে বিষ ।

৫৫৬.
মুখত্ চড়র ফড়র, কাজত্ অন্‌ডইল্ ।
শব্দার্থঃ মুখত্=মুখে, কাজত্=কাজে, অন্‌ডইল্=অন্যরকম ।
**ব্যাখ্যা :** মুখে খুবই চটপটে, তবে কাজে অন্যরকম বা বিপরীত তথা শ্লথ স্বভাবের ।

৫৫৭.
মুখে শেক্ ফরিদ, বগলে ইট্ ।
শব্দার্থঃ মুক্‌মে=মুখে, শেক্=শেখ, বগল্‌মে=বগলে ।
**ব্যাখ্যা :** মুখে শেখ ফরিদ রা. বগলে ইট । (বাইরে সাধুর বেশ, আসলে অনিষ্টকারী) ।

৫৫৮.
মুখৎ আইলে রন গরে, পেডৎ থাইলে গুন গরে ।
শব্দার্থঃ মুখৎ=মুখে, আইলে=আসলে, পেডৎ= পেটে, থাইলে=থাকলে ।
**ব্যাখ্যা :** যে কোনো কথা পেটে থাকলে গুণ করে, আর পেটের বাইরে মুখে আসলে সর্বনাশ করে ।

৫৫৯.
মইজ্‌জা কেলা পানি ভাত ।
শব্দার্থঃ মইজ্‌জা=মজে যাওয়া, কেলা=কলা ।
**ব্যাখ্যা :** মজে যাওয়া কলা (সাথে) পানি ভাত । (সহজ বিষয় ।)

৫৬০.
মইয়রর্ নাচঅ ন, খন্‌জনর্ নাচঅ ন ।
শব্দার্থঃ মইয়র্=ময়ূর, খন্‌জন=খঞ্জন ।
**ব্যাখ্যা :** ময়ূরের নাচও নয়, আর খঞ্জনের নাচও নয় । (কোনো কাজের নয় ।)

৫৬১.
মেডিত্ এক চুয়ার, কোয়ালত্ এক চুয়ার ।
শব্দার্থঃ মেডিত্=মাটিতে, চুয়ার=থাপ্পড়, চপেটাঘাত, কোয়াল=কপাল ।
**ব্যাখ্যা :** মাটিতে এক থাপ্পড়, কপালে এক থাপ্পড় । (চরম সর্বনাশ ।)

৫৬২.
মরিচ্চুরা খাই ঘির্ ঢেক মারর ।
শব্দার্থঃ মরিচ্চুরা=মরিচ ভর্তা, ঘির্=ঘি-এর, ঢেক্=ঢেঁকুর, মারর্=মারছে বা ছাড়ছে ।
**ব্যাখ্যা :** মরিচ ভর্তা দিয়ে খেয়ে ঘি'র ঢেঁকুর ছাড়ছে । (গরীব লোকের বড়লোকী চাল ।)

www.pathagar.com

৫৬৩.
মা'র বইন খালা, গলাত ধরি ফালা।
বাপর্ ভইন ফু, কুইরর্ ডইল রু।
**শব্দার্থ:** মা'র=মায়ের, বইন=বোন, ফালা=লাফা, বাপর্=পিতার, ভইন=বোন, ফু=ফুঁ ফুঁ, কুইরর্=কুকুরের, ডইল=মতো; ন্যায়, রু=হৃদয়।
**ব্যাখ্যা :** মা'এর বোন খালা'র গলায় ধরে লাফালাফি করলেও কোন সমস্যা হয় না, পক্ষান্তরে পিতার বোন ফুঁ ফুঁ'র হৃদয় কুকুরের ন্যায় খুবই কঠিন।

৫৬৪.
মরা পোয়া লই কাদর্।
**শব্দার্থ:** মরা=মৃত, পোয়া=ছেলে, লই=নিয়ে, কাদর্=কাঁদছো।
**ব্যাখ্যা :** মৃত ছেলেকে নিয়ে কেঁদে আর লাভ নাই।

৫৬৫.
যদিও পরে কঅর্, তও ন ছাইজ্জ শঅর।
**শব্দার্থ:** কঅর্ = বজ্র বা গজব, তও=তবু, ছাইজ্জ = ছেড়ে যাওয়া, শঅর = শহর।
**ব্যাখ্যা :** বিপদ ঘনিয়ে এলেও শহর ছেড়ে যেও না।

৫৬৬.
যার মঅৎ যিয়ৎ আছে হেড়ে অইব।
**শব্দার্থ:** মঅৎ = মৃত্যু, যিয়ৎ=যেখানে, হেড়ে = সেখানে।
**ব্যাখ্যা :** যার মৃত্যু যেখানে নির্ধারিত সে সেখানেই হবে।

৫৬৭.
যদি গইত্ত চ'চ্ বিয়া, টিয়ার বস্তা লই থিয়া।
**শব্দার্থ:** গইত্ত = করতে, চ'চ্=চাও, টিয়া=টাকা, বসতা=বস্তা, লই=নিয়ে, থিয়া=দাঁড়াও।
**ব্যাখ্যা :** বিয়ে করতে চাইলে লাখ টাকা হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হবে। (বিয়ের অপ্রয়োজনিয় ব্যয়ের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ।)

৫৬৮.
যে কুঁ'রি বদা পারে, হে কু'রির পোঁদে জানে।
**শব্দার্থ:** কুঁ'রি = মুরগি, বদা = ডিম, পুঁন=পায়ুপথ।
**ব্যাখ্যা :** ডিম দেয়ার কষ্ট মুরগিই ভাল জানে। (আয়ের কষ্ট অর্জনকারীই ভাল জানে।)

৫৬৯.
যার ব'রে কুঁ-ইরে খাইয়ে, হিতে ঢেঁই দেইলে ডরায়।
**শব্দার্থ:** বঅ = বাপ, ব'রে=বাপকে, কুঁইর = কুমির, হিতে=সে, ঢেঁই=ঢেঁকি, দেইলে=দেখলে, ডরায়=ভয় পায়।
**ব্যাখ্যা :** যার পিতাকে কুমিরে খেয়েছে সে ঢেঁকি দেখলেও ভয় পায়। (ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।)

www.pathagar.com

৫৭০.
যার্‌লা দার (দ্বার) বাইলাম, দ্বার ছিরি চোয়ার খাইলাম।
**শব্দার্থ:** যার্‌লা= যার জন্য, দ্বার=নৌকার দ্বার, ছিরি=ছিড়ে, চোয়ার = থাপ্পর।
**ব্যাখ্যা :** যার জন্য দাঁড় টানলাম, দাঁড় ছিঁড়ে তার থাপ্পড় খেলাম। (পুরস্কারের বদলে তিরস্কার।)

৫৭১.
যেন্‌ গাল, হেন চোয়ার।
**শব্দার্থ:** যেন=যেমন, যত বড়, হেন=তেমন, চোয়ার=থাপ্পড়।
**ব্যাখ্যা :** যত বড় গাল, তত বড় থাপ্পড়।

৫৭২.
যার লা নাই, তার লা মেজ্‌জাইন্‌না বারিত্‌অ নাই।
**শব্দার্থ:** লা=জন্য (আরবি শব্দ 'লা' অর্থ না, কিন্তু এখানে বাংলা শব্দ 'লা' অর্থ 'জন্য' ব্যবহৃত হয়েছে), মেজ্‌জান্‌=মেজবান, মেজ্‌জাইন্‌না=মেজবান আয়োজনকারী বাড়ি, বারিত্‌=বাড়িতে।
**ব্যাখ্যা :** যার জন্য নেই, তার জন্য মেজবানের বাড়িতেও নেই। (তুলনীয়: অভাগা যেদিকে চায় সাগরও শুকায়।)

৫৭৩.
যার কামে তারে সাজে, অইন্‌ন কামে বারা বাঁধে।
**শব্দার্থ:** কামে = কাজে, অইন্‌ন=অন্য, বারা=ধান ভানে।
**ব্যাখ্যা :** যার কাজ তারেই সাজে, অন্যথায় ঝামেলা বাড়ে। (যার কাজ তারে সাজে, অন্য কাজে লাঠি বাজে।)

৫৭৪.
যে ন বুঝে মনে মনে, তারে বুঝাই পারে কনে?
**শব্দার্থ:** ন বুঝে=বুঝে না।
**ব্যাখ্যা :** নিজে নিজে যে বুঝে না, কেউই তাকে বুঝাতে পারে না।

৫৭৫.
যেদ্‌দুর উড়নি, হেদ্‌দুর লামনি।
**শব্দার্থ:** যেদদুর=যতদূর, উড়নি=উপরে উঠার রাস্তা, হেদদুর=ততদূর, লামনি=নীচে নামার রাস্তা।
**ব্যাখ্যা :** যতদূর উপরে উঠতে হয়, ততদূর নিচে নামতে হয়। (সব কিছুর বিপরীত ক্রিয়া আছে।)

৫৭৬.
যাচনে মাইন্‌ন নাশা, বুদ্‌ধি নাশা ভোজনে।
**শব্দার্থ:** যাচনে=অযাচিত, মাইন্‌ন= ইজ্জত, নাশা=নষ্ট।
**ব্যাখ্যা :** যাচনা করলে মান যায়, বেশি ভোজনে বুদ্ধি লোপ পায়।

৫৭৭.
যিঁয়ৎ রাইত, হিঁয়ৎ কাইৎ।
শব্দার্থ: যিঁয়ৎ=যেখানে, রাইত্=রাত, হিঁয়ৎ=সেখানে, কাইৎ=কাত্, শুয়ে পড়া।
ব্যাখ্যা : যেখানে রাত, সেখানে কাত। (চাল-চুলোহীনের কি বাচ-বিচার!)

৫৭৮.
যেড়ে বাগর্ ডর, হেড়ে রাইত্ হয়।
শব্দার্থ: যেড়ে=যেখানে, বাগঅর্=বাঘের, ডর=ভয়, হেড়ে=সেখানে।
ব্যাখ্যা : যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত হয়।

৫৭৯.
যমে ছাইল্লে ছারিত পারে, তবে আঁই ন ছারিয়ুম।
শব্দার্থ: যমে=আযরাইলে, ছাইল্লে=ছাড়লে, ছারিত=ছাড়তে।
ব্যাখ্যা : যমে ছাড়লে ছাড়তে পারে, তবে আমি ছাড়বো না। (প্রেমিক প্রবরের প্রতিজ্ঞা স্বরূপ।)

৫৮০.
যার আছে ধান, তার আছে মান।
যার আছে টিয়া,তার কথা বিয়া॥
শব্দার্থ: টিয়া=টাকা, বিয়া=বাঁকা বা দম্ভ প্রকাশক।
ব্যাখ্যা : যার আছে ধান, তার আছে মান, যার আছে টাকা, তার কথা বাঁকা বা তাঁর কথায় দম্ভ প্রকাশ পায়।

৫৮১.
যার ঘরত্ ভাত, তার ঘরত্ জাত্।
শব্দার্থ: ঘরত্=ঘরে, জাত্=বংশ পরিচয়।
ব্যাখ্যা : যার ঘরে আছে ভাত, তার ঘরে আছে আভিজাত্য। (স্বচ্ছল পরিবারই আভিজাত্য রক্ষা করতে পারে।)

৫৮২.
যাচেদে ভাত ন খাইলে, হে ভাতে পিঠ দেয়।
শব্দার্থ: যাচেদে=যেচে দেয়া; সাধা।
ব্যাখ্যা : সেধে দেয়া ভাত না খেলে, সে ভাতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পরে উপোস করতে হয়। (সুযোগ হাত ছাড়া করতে নেই।)

৫৮৩.
যাচেদে ভাত ন খাইলে, উয়াইস্সা থা পরে।
শব্দার্থ: যাচেদে=যেচে দেয়া, উয়াইস্সা= উপোস, থা=থাকা।
ব্যাখ্যা : যেচে দেয়া ভাত না খেলে উপোস থাকতে হয়।

৫৮৪.
যার পুদত্ দউদ আছে, তার পুদে খউত খউত গরে।
শব্দার্থ: পুদত্=পাছায়, দউদ=দাদ, খউত খউত=চুলকালে খস্ খস্ শব্দ করে, গরে=করে।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : যার পাছায় দাদ আছে তার পাছায় চুলকানি শুরু হবে। (সমস্যা লুকানো যায় না।)

৫৮৫.
যিঁয়ত ঠেকি হিঁয়ত শিখি।
শব্দার্থঃ যিঁয়ত=যেখানে, ঠেকি=ঠেকা, হিঁয়ত=সেখানে।
ব্যাখ্যা : যেখানে ঠকা, সেখান থেকে শেখা।

৫৮৬.
যাত্তু আছে ভাইগ্গর্ সই, তে খায় দে পরর্ ধন বই।
শব্দার্থঃ যাত্তু=যার, ভাইগ্গর্= ভাগ্যের, তে=সে, পরর্=পরের, বই=বসে।
ব্যাখ্যা : যার আছে ভাগ্যের লক্ষণ, সে বসে বসে পরের সম্পদ খায়।

৫৮৭.
যাত্তু নাই মাথা, তার কিঅর্ বেথা।
শব্দার্থঃ যাত্তু=যার, কিঅর্=কিসের, বেথা=ব্যথা।
ব্যাখ্যা : যার নেই মাথা তার কিসের ব্যথা।

৫৮৮.
যার আছে মাথা, তার আছে বেথা।
শব্দার্থঃ বেথা=ব্যথা।
ব্যাখ্যা : যার মাথা আছে, তার ব্যথাও আছে।

৫৮৯.
যার্লাই চুরি গরি তে কদে চোর।
শব্দার্থঃ যার্লাই=যার জন্য, গরি=করি, তে=সে, কদে=বলে।
ব্যাখ্যা : যার জন্য করি চুরি, সে বলে চোর।

৫৯০.
যার নাম মহাশয়, তার পোঁদে কুরইল্ সয়।
শব্দার্থঃ পোঁদে=পাছায়, কুরইল্=কুড়াল, সয়=সহ্য করে।
ব্যাখ্যা : যার নাম মহাশয়, তার পাছায় কুড়াল সহে। (সজ্জন লোকের অনেক কিছু সহ্য করতে হয়।)

৫৯১.
যার মনত্ কালি, তার কোয়ালত্ ছালি।
শব্দার্থঃ মনত্=মনে, কোয়ালত্=কপালে, ছালি=ছাই।
ব্যাখ্যা : যার মনে কালিমা, তার কপালে ছাই। (যার মনে কালিমা তার কপালও কালিমা লিপ্ত অর্থাৎ তার ভাগ্যও ফেরে না।)

৫৯২.
যার বিয়া তার ছবর নাই, আরাইললা পারাইল্লার ঘুম নাই।

www.pathagar.com

শব্দার্থ: মনঅত্=মনে, আরাইল্লা পারাইল্লা= পাড়া প্রতিবেশি।
ব্যাখ্যা : যার বিয়ে তার খবর নেই, পাড়া-প্রতিবেশির ঘুম নেই।

৫৯৩.
যিঁক্কার ঝর, হিক্কার জুঁইর।
শব্দার্থ: যিঁক্কার=যেদিকের, হিক্কার= সেদিকের, জুঁইর=বর্ষাতি।
ব্যাখ্যা : যেদিকে বৃষ্টি সেদিকে বর্ষাতি। (অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।)

৫৯৪.
যে গাইয়ে দুত দে, হে গাইঅর লাথিঅ ভালা।
শব্দার্থ: গাই=গাভী, গাইঅর্=গাভীর।
ব্যাখ্যা : যে গাভী দুধ দে, সেই গাভীর লাথিও ভালো।

৫৯৫.
যেই দেশৎ যে ভ, ন মাথাত্ দি জুঁইর ব।
শব্দার্থ: দেশৎ=দেশে, ভ=নিয়ম, দি=দিয়ে, জুঁইর=বর্ষাতি, ন=নৌকা, ব=বেয়ে যাওয়া।
ব্যাখ্যা : যে দেশে যে নিয়ম, নৌকা মাথায় দিয়ে বর্ষাতি বেয়ে যাও বা চালিয়ে যাও। (উল্টোরীতি বা ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত।)

৫৯৬.
যে নালে উৎপত্তি, হে নালে বিনাশ।
শব্দার্থ: নালে=নিয়মে, উৎপত্তি= শুরু, হে=সে, বিনাশ=ধ্বংস।
ব্যাখ্যা : যে নিয়মে শুরু, সে নিয়মে ধ্বংস।

৫৯৭.
যে পাতত্ খায়, হে পাত ভায়।
শব্দার্থ: পাতত্=বাসনে, হে=সে, ভায়=ভাঙ্গে।
ব্যাখ্যা : যে বাসনে খায়, সে বাসন ভাঙে। (নিজেই নিজের সুবিধা ধ্বংস করা।)
৫৯৮.
যে পাতিলাত্ খায়, হে পাতিলা ভায়।
শব্দার্থ: পাতিলাত্=ডেকসি; মাটির পাতিল, হে=সে, ভায়=ভাঙ্গে।
ব্যাখ্যা : যে পাতিলে খায়, সে পাতিল ভাঙে। (নিজেই নিজের সুবিধা ধ্বংস করা।)
৫৯৯.
যেএন কুইর, হেএন্ মইর্।
শব্দার্থ: যেএন=যেমন, কুইর=কুকুর, হেএন্=তেমন, মইর=মুগুর, লাঠি।
ব্যাখ্যা : যেমন কুকুর তেমন মুগুর।
৬০০.
যে করে পরিআর্ আশ, তে খায় যে মুরার্ ঘাস।

www.pathagar.com

**শব্দার্থ:** পরিআর্=পরের, আশ=আশা, মুরার্=জঙ্গলের, তে=সে ।
**ব্যাখ্যা :** যে পরের আশা করে, সে জঙ্গলের ঘাস খায় । (পরের আশা বৃথা ।)

৬০১.
যে খায় ঘিঅর্ হাঁরি, তে খায় মইরর্ বারি ।
**শব্দার্থ:** ঘিঅর্=ঘিয়ের, হাঁরি=হাঁড়ি, মইর্=মুগুর, মইরঅর্= মুগুরের, বারি=বাড়ি; আঘাত ।
**ব্যাখ্যা :** যে খায় ঘি'র হাঁড়ি, সে খায় মুগুরের বাড়ি । (অধিক সুবিধাভোগীর অনিষ্টের সম্ভাবনা ।)

৬০২.
যে খায় কইতরর্ রান্, তে দা'য় বিলর্ ধান ।
**শব্দার্থ:** কইতরর্=কবুতর, দা'য়=কাটা, তে=সে, বিলর্=বিলের ।
**ব্যাখ্যা :** যে খায় কবুতরের রান, সে কাটে বিলের ধান । (সম্পদশালীরই বিলাসিতা সাজে ।)

৬০৩.
যেছাকো তেছা, ফেরাউন কা মুছা । (এটি একটি উর্দু প্রবাদ, তবে তা বর্তমানে স্থানীয় প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত ।)
**শব্দার্থ:** যেছাকো=যেমন; যেরকম, তেছা=তেমন, কা=জন্য ।
**ব্যাখ্যা :** যে যেমন তার জন্য তেমন, ফেরাউনের জন্য যেমন মুসা । (সঠিক লোকের হাতে শায়েস্তা হওয়া ।)

৬০৪.
যিআন্দি ফুইচ ন যার হিয়ানদি কুরইল চালান ।
**শব্দার্থ:** যিআন্দি= যেখান দিয়ে, ফুইচ্=সুঁই, হিয়ানদি=সেখান দিয়ে, কুরইল্=কুড়াল ।
**ব্যাখ্যা :** যেখানে সুঁই যায় না, সেখানে কুড়াল চালান করা । (অসম্ভব কাজ করতে চাওয়া ।)

৬০৫.
যেত্তর আইল্লা নয়, হেত্তর কাট্ঠল বিচি ।
**শব্দার্থ:** যেত্তর= যত বড়, আইল্লা=মালসা বা আগুন রাখার মাটির পাত্র বিশেষ, হেত্তর=ততবড়, কাটঠল=কাঁঠাল, বিচি=বীজ ।
**ব্যাখ্যা :** যতবড় মালসা নয়, ততবড় কাঁঠাল বীচি । (বেঢপ কাজ ।)

৬০৬.
যে যারে চায়, তে তারে পায়
খোদা বলে মরকি যায় ।
**শব্দার্থ:** তে=সে, তারে=তাকে, মরকি=আমার ।
**ব্যাখ্যা :** যে যাকে চায় সে তাকে পায়, খোদা বলে আমার তাতে কিছু যায় আসে না । (প্রেমের মিলন ঘটলে এ প্রবাদ আউড়ানো হয় ।)

৬০৭.
যার ঠেং, তার গদ্দনা ।

www.pathagar.com

শব্দার্থ: টেং=পা, গদ্দনা=গর্দান, ঘাড় ।
ব্যাখ্যা : যার পা, তার ঘাড় । (নিকটজনের মধ্যে সুবিধা বা অসুবিধার ভাগ পড়া ।)

৬০৮.
যার বারিতে ত্তে শেষ ।
শব্দার্থ: বারি=আঘাত; লাঠির আঘাত, তে=সে, শেষ=সমাপ্ত (এখানে ধরাশায়ী) ।
ব্যাখ্যা : যার লাঠির আঘাতে সে নিজেই ধরাশায়ী । (নিজের পায়ে কুড়াল মারা ।)

৬০৯.
যাইচ্চা কেলা মিড়া নাই ।
শব্দার্থ: যাইচ্চা=যেচে দেয়া; সেধে দেয়া, কেলা=কলা, মিড়া=গুড়; এক্ষেত্রে মিষ্টি ।
ব্যাখ্যা : সেধে দেওয়া কলা মিষ্টি হয় না । (সেধে কিছু দিলে তার মূল্য থাকে না ।)

৬১০.
রসর কালে রসর কথা, ভাপি চাইও মন,
শেষ কাড়ালে মন ন পাইবা আসিব সমন ।
শব্দার্থ: ভাপি=ভেবে, শেষ কাড়ালে=শেষ পর্যায়ে, সর্বশেষে, পাইবা=পাবে, সমন=নোটিশ, চাইও=দেখো ।
ব্যাখ্যা : রসের কালে রসের কথা ভেবে দেখ মন, শেষ বয়সে মন পাবে না, আসবে পরপারের ডাক ।

৬১১.
রাগৎ কী ন কয়?
শব্দার্থ: রাগৎ=রাগের মাথায়, ন কয়=বলে না ।
ব্যাখ্যা : রাগের মাথায় অনেক কথাই বলা হয় ।

৬১২.
রাডর্ ভাততুন্ পেড়ত্ থাকে, নিদানর্ কথা মনত্ থাকে ।
শব্দার্থ: রাড্=দুর্ভিক্ষ, রাডর্=দুর্ভিক্ষের, ভাত্তুন= ভাতগুলো, পেড়ত্=পেটে, নিদান=দুঃসময়, নিদানর=দুঃসময়ের, মনত্=মনে ।
ব্যাখ্যা : দুর্ভিক্ষের ভাত পেটে থাকে, যেমন দুঃসময়ের দিনের কথা মনে থাকে ।

৬১৩.
রাঢ়ৎ কী ন খায়?
শব্দার্থ: রাঢ়=দুর্ভিক্ষ, ন খায়= খায় না ।
ব্যাখ্যা : দুর্ভিক্ষের সময় মানুষকে অনেক কিছু খেতে হয় ।

৬১৪.
রুইলে হাইট, ন রুইলে আশি,
খিল গিলে আরো বেশি ।
শব্দার্থ: রুইলে=রোপন করলে, হাইট=ষাট, খিল=অনাবাদী ।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** রোপন করলে যে আয়, অনাবাদী থাকলে তার চেয়েও বেশি পায়। (কূটাভাসের মাধ্যমে উদাসীন লোকের আত্মতৃপ্তি।)

৬১৫.
রাগ গইল্লে ভাক হারায়।
**শব্দার্থ:** গইল্লে=করলে, ভাক=ভাগ।
**ব্যাখ্যা :** রাগ করলে ভাগ হারাতে হয়।

৬১৬.
রূপ চাইয়া কাইদা ফল।
**শব্দার্থ:** চাইয়া=দেখা, কাইদা=মাকাল।
**ব্যাখ্যা :** মাকাল ফল খাওয়ার জন্য নয় রূপ দেখার জন্যই। (উল্টো চরিত্র।)

৬১৭.
রসিকে রসিক চিনে, ভঁ'রা চিনে মধু,
অজাইত্তা বাঁ'লে চিনে বিজাইত্তা কচু।
**শব্দার্থ:** ভঁ'রা=ভোমরা, অজাইততা=যার কোন জাত নেই, বাঁ'লে=মূর্খ, বিজাইত্তা=বিজাতীয়, যা গলা চুলকায়।
**ব্যাখ্যা :** রসিকে রসিক চিনে, ভোমরা চিনে মধু, গণ্ডমূর্খ লোকে চিনে বিজাতীয় কচু। (যোগ্যলোক যোগ্য বিষয় বেছে নেয়।)

৬১৮.
রাজার ঘরৎ মুতিবার্ রাট।
**শব্দার্থ:** ঘরৎ=বাড়িতে, মুতিবার্=প্রশ্রাব করার, রাট=দুঃর্ভিক্ষ, এখানে অভাব।
**ব্যাখ্যা :** রাজার বাড়িতে প্রশ্রাব করার স্থানাভাব। (উদ্ভট চিন্তা।)

৬১৯.
রাজাল্ লাই রাণী, ফইরাল্লাই হাঁইচা (হাক) পেডানি।
**শব্দার্থ:** রাজাল্লাই=রাজার জন্য, ফইরাল্লাই=ফকিরের জন্য, হাঁইচা হাক=এক প্রকারের শাক, পেডানি=কুড়ানি; সংগ্রহকারী।
**ব্যাখ্যা :** রাজার জন্য রাণী, বিত্তহীনের জন্য হাঁইচা শাক কুড়ানি। (এ যেন দুনিয়ার নিয়ম!)

৬২০.
রারি বেডির বিয়ার শখ, উনাই পরের্ রসর্ ঠঁঅক্।
**শব্দার্থ:** রারি বেডি=স্বামী হারা মহিলা, উনাই=উপচিয়ে পড়া, রসর্=রসের, ঠঁঅক=ঠমক।
**ব্যাখ্যা :** স্বামীহারা মহিলার বিয়ের শখ, উপচে পড়ছে রসের ঠমক। (বিয়ে করতে চাইলে বিধবা মেয়েকে আলগা কিছু আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হয় বৈকি!)

www.pathagar.com

৬২১.
রীষে মরে রীষোল্‌লাই, বিষে মরে হাপ্‌
হাছদ্‌ পিউনে মরে হাত হতিনর্‌ বাপ।
শব্দার্থঃ রীষ=হিংসা, রীষোল্‌লা= একটি পাখি, হাপ্‌=সাপ, হাছদ্‌ পিউন=হিংসা বিদ্বেষ, হাত=সাত, হতিনর্‌=সতিনের।
**ব্যাখ্যা :** হিংসায় মরে রিশোল্লা পাখি, বিষে মরে সাপ, হিংসা-বিদ্বেষে মরে সাত সতিনের বাপ। (বিষে সাপ মরে এমনটি জানা যায় না। সম্ভবত ছন্দের মিল রাখার জন্য 'হাপ' ব্যবহৃত হয়েছে। আসল উদ্দেশ্য এটা বলা যে, হিংসুটের হাত থেকে নিস্তার নেই।)

৬২২.
রাজার খাই রাজার আইদ্‌দ ন মানের।
শব্দার্থঃ খাই=খেয়ে, আইদ্‌দ=আদেশ।
**ব্যাখ্যা :** রাজার খেয়ে রাজার আদেশ মানছে না।

৬২৩.
রতত্‌ ঘুইন্‌নাপুগে বাকা বাইন্‌দে।
শব্দার্থঃ রতত্‌= শক্তিতে, ঘুইন্‌নাপুগে=গাছের ঘুন খাওয়া পোকা, বাকা=বাসা, বাইন্‌নে=বেঁধেছে।
**ব্যাখ্যা :** শ্রম-শক্তিতে ঘুন খাওয়া পোকাতে বাসা বেঁধেছে। (কর্মবিমুখতার প্রকাশ।)

৬২৪.
রাতা নাইদে দেশৎ কুঁরি বাক দে।
শব্দার্থঃ রাতা=মোরগ, কুঁরি=মুরগি, বাক দে=ডাক দেয়।
**ব্যাখ্যা :** যেদেশে মোরগ নাই, সেদেশে মুরগির ডাকাডাকি বেশি।

৬২৫.
লাইঅ ন ডুলাঅ ন, তারে কয় পেরগোওয়া,
হিন্দুও নঅ ডোমও নঅ, তারে কয় বউর্‌গোওয়া।
শব্দার্থঃ লাই/ডুলা = বাঁশ বা বেতের তৈরি পাত্র বিশেষ, ন=না, পের্‌গোওয়া = বন-লতায় তৈরি পাত্র বিশেষ যা দিয়ে মাটি বহন করা হয়, ডোম = জেলে, বউর্‌গোওয়া = বড়ুয়া।
**ব্যাখ্যা :** পেরগোয়া যেমন লাই-ডুলা কিছুই না, তেমনি বড়ুয়াও হিন্দু-জেলে কিছুই না অর্থাৎ ভিন্ন এক সম্প্রদায়। প্রবাদটি জাতি-বিদ্বেষগন্ধী।

৬২৬.
লাথি খাদে কাট্‌ঠল লাথি ন খাইলে ন পাগে।
শব্দার্থঃ খাদে=যে খেতে অভ্যস্ত, পাগে=পাঁকে, কাট্‌ঠল=কাঁঠাল, ন খাইলে= না খেলে।
**ব্যাখ্যা :** লাথি খাওয়ার কাঁঠাল লাথি না খেলে পাঁকে না। (যে যেমন তার সাথে তেমন ব্যবহার করতে হয়।)

www.pathagar.com

৬২৭.
লাল কুত্তা হিয়ালর ভাই ।
শব্দার্থ: কুততা=কুকুর, হিয়াল = শৃগাল, শিয়াল ।
**ব্যাখ্যা :** লাল কুকুর শৃগালের ভাই । (চোরে চোরে মামাতো ভাই ।)

৬২৮.
লাজর-লেজর পানি ন দে পান্‌লার ।
শব্দার্থ: লাজর=লজ্জার, লাজর-লেজর পানি = নবজাতককে গোসলের পানি । (শিশুর জন্মের পরে গোসল সেরে ঘরের দরজায় বর্ষাতির (জুঁইর) উপর রেখে পানি ছিটানো হয় তাকে লাজ-লজ্জার পানি বলা হয় ।), ন=না, পানলার=মনে হয় ।
**ব্যাখ্যা :** এমন নির্লজ্জ! মনে হয় জন্মকালে তাকে লাজ-লজ্জার পানি দেয়া হয় নি ।

৬২৯.
লুতা কুঁইরে গু বেশি খায় ।
শব্দার্থ: লুতা=নরম, শান্ত, কুঁইর = কুকুর ।
**ব্যাখ্যা :** অতি শান্ত কুকুর মল বেশি চাটে । (নিরীহ দেখালেও ক্ষতি করতে পাকা ।)

৬৩০.
লেনডিয়াত্‌তু মাইরর ডর নাই ।
শব্দার্থ: লেনডিয়া = সর্বহারা, ডর = ভয় ।
**ব্যাখ্যা :** সর্বহারার কিসের ডর? (যার কিছুই নেই তার হারানোর ভয় নেই ।)

৬৩১.
লাংঅর্ আশায় নেক হারায় ।
শব্দার্থ: লাং=পরকিয়া, লাংঅর=পরকিয়ার, নেক=স্বামী বা পতি ।
**ব্যাখ্যা :** পরকীয়ার আশায় পতি হারায় ।

৬৩২.
লাভে লোয়া বয়, অলাভে ফোলাঅ ন বয় ।
শব্দার্থ: লোয়া=লোহা, ফোলা = ফাঁপা (বর্তমানে দেশে প্রচলিত কর্কসীট), বয়=বহর করে ।
**ব্যাখ্যা :** লাভে লোহা বহন করে, অলাভে কেউ ফাঁপা জিনিসও বহন করে না ।

৬৩৩.
লোকর্ মুখৎ জয়, লোকঅর্ মুখৎ খয় ।
শব্দার্থ: মুখৎ=মুখে, খয়=ধ্বংস ।
**ব্যাখ্যা :** লোকের মুখে জয়, লোকের মুখে ক্ষয় ।

৬৩৪.
লুডালই গিলেও পইরত্, ঘরা লই গিলেও পইরত্ ।
শব্দার্থ: লুডা=বদনা, পইরত্=পুকুরে, পুস্করণি, ঘরা=কলসি ।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** বদনা নিয়ে গেলেও পুকুরে, আর কলসি নিয়ে গেলেও পুকুরে। (সুযোগ বড়টা নেয়াই ভালো।)

৬৩৫.
ল ঘর ল বারি, জাতে মিশ্‌শিয়ারী।
**শব্দার্থঃ** ল=নাই, ল ঘর=বাড়ি নাই, মিশ্‌শিয়ারী অর্থ বেদে বা যাযাবর। কিন্তু আমাদের দেশে এই মিশ্‌শিয়ারী অর্থে বেদের দলকে বুঝায়। ('ল' প্রকৃত পক্ষে এসেছে আরবি শব্দ 'লা' থেকে। 'লা'-এর বাংলা অর্থ না। তবে আরবি শব্দের সংক্ষিপ্ত হয়ে 'ল' অর্থে আমি হাজির। আবরি শব্দ 'লব্বায়েক' অর্থ আমি হাজির। এই লব্বায়েক থেকেই স্থানীয় ভাবে শব্দের ব্যবহারের সুবিধার্থে 'ল' হয়েছে)।
**ব্যাখ্যা :** নাই ঘর, নাই বাড়ি, তারাই প্রকৃত অর্থে বেদের দল। (চালচুলো হীন।)

৬৩৭.
লরিচরি বার, ঘরত্ বই তের।
**শব্দার্থঃ** লরিচরি=নড়েচড়ে, বার=ভাত বাড়া, ঘরত্=ঘরে, বই=বসে, তের=তের।
**ব্যাখ্যা :** নড়েচড়ে বার, ঘরে বসেই তের। (কূটাভাসের মাধ্যমে অকর্মন্যের আত্মশ্লাঘা।)

৬৩৮.
লাজর্ বিবি হা ন গরে, চাইল্‌লা পা'ন্ গরাস্ ধরে।
**শব্দার্থঃ** লাজর্=লজ্জার, হা ন গরে=হা করে না, চাইল্‌লা=চালতা, পা'ন্=সমান, গরাস্=গেরাস।
**ব্যাখ্যা :** লজ্জায় বিবি হা করতে পারে না, কিন্তু চালতা সমান ভাতের গেরাস ধরতে লজ্জা পায় না। (স্বার্থের বেলায় টনটনে)।

৬৩৯.
লাজর্ বুরি আগে যায়।
**শব্দার্থঃ** লাজঅর্=লজ্জার, বুরি=বুড়ি।
**ব্যাখ্যা :** লজ্জায় যে বুড়ি কুকড়ে যায় সে বুড়ি আগে যায়। (স্বার্থের বেলায় টনটনে।)

৬৪০.
লাত্থির চোড়ে ছালা ফাডে, যে ছালার চইল্ হেই ছালাত্ আডে।
**শব্দার্থঃ** ফাডে=ফাঁটে, চইল্=চাউল, ছালা=বস্তা, আডে=সংকুলান হয়, চোড়ে=আঘাতে।
**ব্যাখ্যা :** লাত্থিতে বস্তা ফাঁটে, যে বস্তার চাউল সে বস্তায় ধরে। (নিজনিজ অবস্থায়ই শ্রেয়, এর ব্যত্যয় হলে দুর্ঘটনা।)

৬৪১.
লাল দেইরে ফাল ন মারিচ।
**শব্দার্থঃ** দেইরে=দেখে, ফাল=লাফ, মারিচ=মেরো না।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : লাল দেখে লাফ দিও না। (বাহ্যিক রূপে লোভে পড়া ঠিক নয়।)

৬৪২.
কচি বেশি চিবিলে তিতা নিয়লে।
শব্দার্থ: কচি=লেবু, চিবিলে=টিপলে, নিয়লে=বের হয়।
ব্যাখ্যা : লেবু বেশি টিপলে তেতো হয়। (বাড়াবাড়িতে কাজ নষ্ট হয়।)

৬৪৩.
লেচ্ নাই কুত্তার নাম 'বাইগ্গা'।
শব্দার্থ: লেচ্=লেজ, কুত্তা=কুকুর, বাইগ্গা=বাঘা।
ব্যাখ্যা : লেজ নাই কুকুরের নাম বাঘা। (তুলনীয়: কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।)

৬৪৪.
লেডা গরুরে আঁডালি বেশি ধরে।
শব্দার্থ: লেডা=ক্ষিণকায়, হালকা, আঁডালি=আঁঠালি।
ব্যাখ্যা : ক্ষীণকায় গরুকে আঁঠালিতে বেশি ধরে। (দুর্বলের অনেক বিপদ)।

৬৪৫.
লোকে কয় সুক্কে আছি, মাথার উঅরে উরে মাছি।
শব্দার্থ: কয়=বলে, উঅরে=উপরে, উরে=উড়ে।
ব্যাখ্যা : লোকে বলে সুখে আছি, মাথার উপরে মাছি উড়ে। (নিজের অবস্থা নিজেই জানে।)

৬৪৭.
লোকে কয় আছি সুক্কে, আঁই মরির্ আঁর দুক্কে।
শব্দার্থ: কয়=বলে, মরির্= মরছি, আঁর=আমার, দুক্কে=দুঃখে।
ব্যাখ্যা : লোক বলে সুখে আছি, আমি মরি আমার দুঃখে। (নিজের অবস্থা নিজেই জানে।)
৬৪৮.
লেডা গাইয়ে দুত্ ন দেয়।
শব্দার্থ: লেডা=ক্ষিণকায়, গাইয়ে=গাভীতে, দুত্=দুধ।
ব্যাখ্যা : ক্ষীণকায় গাভী দুধ দেয় না।

৬৪৯.
লেন্ডিয়ার কু বুদ্ধি সার।
শব্দার্থ: লেনডিয়ার= উলঙ্গ-যার কাপড়টি পর্যন্ত নেই; সর্বহারা, কু-বুদ্ধি=খারাপ বুদ্ধি; দুষ্ট বুদ্ধি।
ব্যাখ্যা : যার কিছু নেই সে কুবুদ্ধি দিয়ে বাঁচতে চায়।

৬৫০.
শতানর আঁড়ালি।

www.pathagar.com

**শব্দার্থ:** শতানর্=শয়তানের, আঁড়ালি = আঁটালি ।
**ব্যাখ্যা :** হাঁড়ে হাঁড়ে শয়তান!

৬৫১.
**শুক্কুর বাইজ্জা মছল্লি ।**
**শব্দার্থ:** বাইজ্জা = বারের / দিনের, মছল্লি = মুসল্লি, নামাযি ।
**ব্যাখ্যা :** শুক্রবারের মুসল্লি সেজেছে ।

৬৫২.
**শরমত্তুন মরন ভালা ।**
**শব্দার্থ:** শরমত্তুন= লজ্জার ।
**ব্যাখ্যা :** লজ্জার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় ।

৬৫৩.
শিয়ারি বিলাই মোচ দেইলে চিনা যায় ।
**শব্দার্থ:** শিয়ারি=শিকারি, বিলাই=বিড়াল, মোচ = গোঁফ, দেইলে=দেখলে ।
**ব্যাখ্যা :** শিকারি বিড়াল গোঁফ দেখে চেনা যায় । (চালাক লোক আচরণে বুঝা যায় ।)

৬৫৪.
শিং ভাঁই কারুল অন ।
**শব্দার্থ:** ভাঁই=ভেঙে, কারুল =বকনা গরু, অন্=হয় ।
**ব্যাখ্যা :** শিং ভেঙ্গে বকনা বাছুরের রূপ পাওয়া । (হতদশায় পড়ে সাধারণ লোকের দলে পড়া ।)

৬৫৫.
শিয়া-শিয়া বইয়ার বার, কল্লপে থান ন পার ।
**শব্দার্থ:** শিয়া=পর্বতচূড়া, বইয়ার = বাতাস, কল্লপ = গিরিখাদ ।
**ব্যাখ্যা :** পর্বতচূড়ায় বাতাস বয়, গিরিখাদে সে বাতানের খবর নেই । (বড়ো লোকে বড়ো লোকে লেনদেন, সাধারণ লোকের তা নাগালের বাইরে ।)

৬৫৬.
শঅন্ মাইস্সার ঝরে, বাখার্ কাউয়া লরে ।
**শব্দার্থ:** শঅন্=শ্রাবণ, মাইস্সা=মাসের, ঝরঅত্=বৃষ্টিতে, বাখার=বাসার, কাউয়া= কাক, লরে=নড়ে ।
**ব্যাখ্যা :** শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে বাসার কাকও অন্যত্র আশ্রয় খোঁজে ।

৬৫৭.
**শক্তের ভক্ত নরমর যম ।**
**শব্দার্থ:** শক্ত= শক্ত, ভক্ত= অনুগত, নরমর=নরমের ।
**ব্যাখ্যা :** শক্তের কাছে আনুগত্য দেখানো আর নরমের কাছে আজরাইলের রূপ নিয়ে নিজেকে জাহির করা ।

www.pathagar.com

৬৫৮.
সতির গুরু পতি, অসতীর গুরু লাঙ
শূদ্রর গুরু বঅন্, মদ্‌দীর গুরু ভাঙ ।
শব্দার্থ: পতি=স্বামী, লাঙ=পরকিয়া, বঅন=ব্রাহ্মন, ভাঙ=এক প্রকার মাদকদ্রব্য ।
**ব্যাখ্যা :** সতী নারীর কাছে তার স্বামী, অসতী নারীর কাছে তার পরকিয়া প্রেমিক, শূদ্রের কাছে ব্রাহ্মণ আর মাদকসেবীর কাছে গাঁজা গুরু স্বরূপ ।

৬৫৯.
সতি নারীর পতি ন মরে ।
শব্দার্থ: পতি=স্বামী, ন মরে=মরে না; মারা যায় না ।
**ব্যাখ্যা :** সতি নারীর স্বামী মরে না । (সতি নারী বৈধব্যেও সতীত্ব রক্ষা করে ।)

৬৬০.
সু-পুত্র অইলে বাপর রাখে নাম
কুপুত্র অইলে বাপর কাড়ে কান ।
শব্দার্থ: অইলে=হলে, কাড়ে=কাটে ।
**ব্যাখ্যা :** সুপুত্রের জনক সম্মানিত, কুপুত্রের জনক হলে অপমানিত হতে হয় ।

৬৬১.
সমাজত্ খায়, মছইদত্ ঘুম যায় ।
শব্দার্থ: সমাজত্=সমাজে, মছইদত্=মসজিদে ।
**ব্যাখ্যা :** সমাজে খেয়ে মসজিদে ঘুমানো । (সংসার সম্পর্কে উদাসীন ।)

৬৬২.
সোনাত্ থালত্ দুধ ভাত খাবর্?
শব্দার্থ: থালত্=থালায়, বাসনে, খাবর্=খাওয়াচ্ছ ।
**ব্যাখ্যা :** সোনার থালায় দুধভাত খাওয়াচ্ছ? (সুখে রাখা ।)

৬৬৩.
সুক্‌কে খদার নাম পইয্‌যে ।
শব্দার্থ: সুক্‌কে=সুখে, খদার=খোদার, পইয্‌যে=ভুলে গেছে ।
**ব্যাখ্যা :** সুখে খোদার নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে । (সুখে বিভোর ।)

৬৬৪.
সভাব ন যায় মইলে, কালি ন যায় ধুইলে ।
শব্দার্থ: মইলে=মরলে, কালি=কালিমা ।
**ব্যাখ্যা :** স্বভাব যায় না ম'লে, কালি যায় না ধুলে ।

৬৬৫.
সমত্ পইল্‌লে পঅত্ ধরে, সম্ হারাইলে চুলত্ ধরে ।
শব্দার্থ: সম্=সমস্যা, পইল্‌লে=পড়লে, পঅত্=পায়ে ।
**ব্যাখ্যা :** সমস্যায় পড়লে পায়ে ধরে, সমস্যা সমাধান হলে চুলে ধরে । (সুযোগ সন্ধানী কৃতঘ্ন ।)

www.pathagar.com

৬৬৭.
সমে বাদির পঅত্ও ধরা পরে।
শব্দার্থ: সম=সমস্যা, পঅত্=পায়ে, বাদি=গৃহ পরিচারিকা।
ব্যাখ্যা : সমস্যায় পড়লে ঝি-বাদীরও পায়ে পড়তে হয়।

৬৬৮.
সুখ ভাতে বুক লাইত্তায়।
শব্দার্থ: লাইততায়=লাথি দেয়।
ব্যাখ্যা : পরিশ্রম ছাড়া ভাত পাওয়া গেলে এর মর্যাদা দেয়া হয় না।

৬৬৯.
হাজির ঘরৎ বাজি-বুজি, মলইর ঘরৎ খান্কি বেশি।
শব্দার্থ: ঘরৎ=ঘরে, মলই = মৌলবী, খানকি = ছিনাল।
ব্যাখ্যা : হাজির ঘরে আজেবাজে কারবার, মৌলবীর ঘরে ছিনাল বেশি।

৬৭০.
হাফ মারি লেজৎ পরান ন রাইখ্য।
শব্দার্থ: হাফ = সাপ, লেজৎ=লেজে, রাইখ্য=রেখে, ন রাইখ্য= রেখো না।
ব্যাখ্যা : সাপ মেরে লেজে প্রাণ রাখতে নেই। (শত্রুর শেষ রাখতে নেই।)

৬৭১.
হক্কল্ ছালনর্ ব'র পাতা।
শব্দার্থ: হক্কল=সকল, ছালনর্=তরকারির, ব'র্=ধন্যাপাতা।
ব্যাখ্যা : সকল তরকারির কমন আইটেম ধনে পাতা। (যে লোক সব কিছুতেই আছে।)

৬৭২.
হক্কল্ তরকারির ইছা মাছ।
শব্দার্থ: হক্কল্=সকল, ইছামাছ=চিংড়ি মাছ।
ব্যাখ্যা : চিংড়ি মাছ সব ধরনের তরকারি দিয়ে রান্না করা যায়।

৬৭৩.
হাফরে ন কঅয় লাম্বা, বেঙরে ন ক-অয় বাইট্যা।
শব্দার্থ: হাফ=সাপ, লামবা=লম্বা, কঅয়=বলে, বাইট্ঠা=বেটে, ন কঅয়=বলে না।
ব্যাখ্যা : সাপকে লম্বা বলে না, বেঙকে বেটে বলে না। (কারো সাথেও নেই পাঁচেও নেই।)

৬৭৪.
হুঁসর প'ল।
শব্দার্থ: হুঁসর = সচেতন, পঅল=পাগল।
ব্যাখ্যা : সচেতন পাগল। (জাতে মাতাল তালে ঠিক।)

www.pathagar.com

৬৭৫.
হাত পাঁচ গুইন্না, হাল ন গরে বাইন্না।
শব্দার্থ: হাত=সাত, গুইন্না= গুনে, হিসেব করে, হাল=চাষ, বাইন্না=স্বর্ণকার।
ব্যাখ্যা : নানা রকম হিসেব কষে, স্বর্ণকারেরা চাষ করে না। (সবাই নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে চলে।)

৬৭৬.
হাত পুত তের নাতি, তে গরেদ্দে কুইস্সুইল্ খেতি।
শব্দার্থ: হাত=সাত, তে=সে, গরেদ্দে=করছে, কুইস্সুল=আখ, ইক্ষু, খেতি=ক্ষেত, চাষ।
ব্যাখ্যা : সাত-পুত্র তের নাতী যার, সেই আখের চাষ করে। (শ্রম সাধ্য কাজ।)

৬৭৭.
হইল ফালার ফালার পুঁড়ি মাছও ফালার।
শব্দার্থ: হইল=শোল মাছ, পুঁড়ি মাছ=পুঁটি মাছ, ফালার=লাফাচ্ছে।
ব্যাখ্যা : শোল মাছের সঙ্গে সঙ্গে দেখছি পুঁটি মাছও লাফাচ্ছে! (বড়দের মাত্রায় ছোটদের আস্ফালন।)

৬৭৮.
হউনঅর্ দোয়ায় গরু ন মরে।
শব্দার্থ: হউন=শকুন, হউনঅর্=শকুনের।
ব্যাখ্যা : শকুনের দোয়ায় গরু মরে না। (কারো অভিশাপে কিছুই হয় না।)

৬৭৯.
হইলে ন বছরঅত্ নঅইলে নব্বই বছরও নঅয়।
শব্দার্থ: ন=নয়, বছরঅত্=বয়সে, নঅইলে=না হলে, নঅয়=হয় না।
ব্যাখ্যা : নয় বছরে যে মানুষ হয় না, সে নব্বই বছরেও হয় না।

৬৮০.
হাজার অইলেও মিয়ারও পোয়া।
শব্দার্থ: হাজার অইলেও = যা-ই হোক, মিয়ার = অভিজাত বংশ।
ব্যাখ্যা : যা-ই হোক, তিনি তো মিয়ার ছেলে। (অভিজাত বংশের সন্তানদের কিছু না কিছু গুণ থাকবে।)

৬৮১.
হাতি জুরাইত পাইললে, কাঁছিও জুরাইত পারে।
শব্দার্থ: জুরাইত = অর্জন, পাইল্লে= পারলে, কাঁছি = রশি।
ব্যাখ্যা : হাতি কিনতে পারলে রশি কেনারও ক্ষমতা থাকে।

৬৮২.
হাঁতি পাদিলেও মুশার তোয়ান।

**শব্দার্থ:** পাদিলে = বাতকর্মকরা বা বাতাস ছাড়া, তোয়ান = তুফান, ঝড় ।
**ব্যাখ্যা :** হাতি বাতাস ছাড়লেও মশার জন্য তা ঝড় হয়ে দেখা দেয় ।

৬৮৩.
হাতি মইল্লেও লাখ টিঁয়া ।
**শব্দার্থ:** মইল্লে=মরলে, ঠিঁয়া=টাকা ।
**ব্যাখ্যা :** মরা হাতি লাখ টাকা ।

৬৮৪.
হাতি মইল্লেও দাঁত দি মরে ।
**শব্দার্থ:** মইললে=মরলে, দি=দিয়ে ।
**ব্যাখ্যা :** হাতি মরতেও দাঁত দিয়ে মরে । (ধনী বা মর্যাদাবান দুর্বিপাকে পড়লেও সব হারায় না ।)

৬৮৫.
হাফর বিষ যেন তেন, পেমর বিষ উজান বায় ।
**শব্দার্থ:** হাফর = সাপের, পেমর = প্রেমের ।
**ব্যাখ্যা :** সাফের বিষ যেমন তেমন, প্রেমের বিষ উজান যায় । (প্রেমের উম্মাদনার রূপ ভীষণ ।)

৬৮৬.
হরিরে মারি বউয়রে শিখার ।
**শব্দার্থ:** হরি = শ্বাশুড়ি ।
**ব্যাখ্যা :** (বাড়িরকর্তা) শাশুড়িকে মেরে বউকে শেখায় ।

৬৮৭.
হরিয়ে ভাঁইলে খলা, বউয়ে ভাঁইলে সর্বনাশ ।
**শব্দার্থ:** হরিয়ে=শাশুড়ি, ভাঁইলে=ভাঙ্গলে, খলা = রুটি সেঁকার তাবা ।
**ব্যাখ্যা :** শাশুড়ির হাতে ভাঙলে রুটির তাবা, বউয়ের হাতে ভাঙলে সবশেষ ।

৬৮৮.
হতিনত্‌তু পুত অউক, পারাৎ ধন অউক ।
**শব্দার্থ:** হতিন=সতিন, হতিনত্‌তু=সতিন থেকে; সতিনের, অউক=হউক, পারাৎ=পাড়ায়, গ্রামে ।
**ব্যাখ্যা :** সতীনেরও ছেলে হোক, পাড়ায় ধন হোক । (পুত্র সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি যারই হোক সমাজের বা নিজের কাজে লাগে ।)

৬৮৯.
হতিনর্‌ পোয়া নিত্‌তি মোটা, নিজর পোয়া নিততি ল্যাড়া ।
**শব্দার্থ:** হতিন = সতিন, নিত্‌তি=নিয়মিত, সবসময়, ল্যাড়া=ক্ষিণকায়, শীর্ণকায় ।
**ব্যাখ্যা :** নিজের ছেলেকে সর্বদা দুর্বল, আর সতিনের ছেলেকে সর্বদা তাজা মনে হয় ।

www.pathagar.com

৬৯০.
হক কথাৎ ঠক্ বেজার,
গরম ভাতে বিলাই বেজার,
হঁ দেইলে ল্যাং বেজার।
শব্দার্থ: কথা=কথায়, ঠক্=প্রতারক, বিলাই=বিড়াল, হঁ=সাঁকো, ল্যাং=পঙ্গু, বেজার=রাগ।
ব্যাখ্যা : সত্য কথায় প্রতারক, গরম ভাতে বিড়াল আর সাঁকো দেখলে পঙ্গু ব্যক্তিরা রাগ করে। (নিজের কাজের বাঁধা সবার অসহনীয়।)

৬৯১.
হক কথা কইলে মাইরং খাইর,
বেহক কথা কইলে কুঁইর কাঁজি খাইর।
শব্দার্থ: মাইরং=মার, কুঁইর কাঁজি=কুকুরে খাওয়া জল।
ব্যাখ্যা : সত্য কথা বললে মার খেতে হচ্ছে, মিথ্যা বললে কুকুরে খাওয়া খাবার খেতে হচ্ছে। (উভয় সংকট।)

৬৯২.
হক কথা কইলে কাজী আনুনী।
শব্দার্থ: কইলে=বললে, কাজী=টক মিশ্রিত পানি যাকে কাজি বলা হয়। কাজি করার একটি পৃথক পদ্ধতি আছে, আনুনী=নুন বিহীন বা আলুনী।
ব্যাখ্যা : সত্য কথা বললে কাজীও আলুনী হয়। (সত্য কথা লোকে সহজে মানতে চায় না।)

৬৯৩.
হাত থাইতে কি মুখে কথা।
শব্দার্থ: থাইতে=থাকতে।
ব্যাখ্যা : হাত থাকতে কেন মুখে কথা। (ঝগড়াই যদি করবে তবে মারামারিতে লেগে যাও যাতে ঝগড়াটা জমে।)

৬৯৪.
হাতর সেরত্তু পানি ন গলে।
শব্দার্থ: হাতর সের=আঙুলের ফাঁক, সেরত্তু=ফাঁক দিয়ে।
ব্যাখ্যা : আঙুলের ফাঁক দিয়ে পানিও গলে না। (কৃপণকে বুঝায়।)

৬৯৫.
হাগিয়রে ফিরি চাআদে মানুষ।
শব্দার্থ: হাগিয়রে=মলত্যাগ করে, চাআদে=দেখে।
ব্যাখ্যা : মলত্যাগ করে পেছনে ফিরে দেখে কি পরিমাণ পায়খানা করেছে। (কৃপণ।)

৬৯৬.
হরফ ছারা মঅরি, তরফ ছারা জঁইদারি।
শব্দার্থ: হরফ ছারা = অক্ষরজ্ঞানহীন, মঅরি=মুহুরি, তরফ=জমি।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** অক্ষরজ্ঞানহীন মুহুরি, জমিহীন জমিদারি! (নামে আছে কিন্তু কাজে নেই ।)

৬৯৭.
হইল ধরিম নে বোয়াল ধরিম ।
**শব্দার্থ:** হইল= শোল মাছ, ধরিম=ধরবো ।
**ব্যাখ্যা :** শোল মাছ ধরবো না কি বোয়াল ধরবো? (সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা ।)

৬৯৮.
হাত-ঠ্যাং কাড়ি ছাউম্‌মাৎ ভইজ্‌জে ।
**শব্দার্থ:** ছাউম্‌মা =বাঁশের তৈরি বাক্স, ভইজ্‌জে = পুরেছে; ভরেছে ।
**ব্যাখ্যা :** হাত-পা কেটে বাক্স ভর্তি করা । (আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বিপদে ফেলা ।)

৬৯৯.
হাতত্‌ কেলা দি পঁথত্‌ বুয়াইয়ে ।
**শব্দার্থ:** হাতত্‌ = হাতে, পঁথত্‌ = পথে, বুয়াইয়ে = বসিয়েছে ।
**ব্যাখ্যা :** হাতে কলা দিয়ে পথে বসিয়েছে । (প্রতারণা করে সর্বস্ব হরণ ।)

৭০০.
হাঁত-পাঁচ চইদ্‌দ, দুই টিঁয়া নইদ্‌দ ।
**শব্দার্থ:** চইদ্‌দ = ১৪, নইদ্‌দ = দিও না, চইদ্‌দ=চৌদ্দ ।
**ব্যাখ্যা :** সাত + পাঁচ = চৌদ্দ, দুই টাকা দিও না! (নিজের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে খাতির দেখানো ।)

৭০১.
হাঁত পাঁচ চইদ্‌দ, গুয়ানাপাতি নইদ্‌দ ।
**শব্দার্থ:** গুয়ানাপাতি=অলংকার ।
**ব্যাখ্যা :** বিয়েতে সাত-পাঁচ চৌদ্দ করে অলংকার না দিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করা । (এটা মূলতঃ কৌতুক করে বলা ।)

৭০২.
হাগইয়ার শরম ন, দেখইয়ার শরম ।
**শব্দার্থ:** হাগ্‌ইয়=যে মলত্যাগ করে , ন=না, দেখইয়া=যে দেখে ।
**ব্যাখ্যা :** যে পায়খানা করে তার লজ্জা নয়, যে দেখে তারই লজ্জা । (নির্লজ্জের কোন বালাই নেই ।)

৭০৩.
হাত-ধরনিয়ে পোয়া মারে ।
**শব্দার্থ:** হাত=সাত, ধরনি=ধাত্রী ।
**ব্যাখ্যা :** ধাত্রী বেশি হলে নবজাতকের মৃত্যু ঘটে । (তুলনীয়: অতি সন্যাসীতে গাজন নষ্ট ।)

৭০৪.
হঁঅততু পরি জোঁয়ার গোছল ।

www.pathagar.com

শব্দার্থ: হঁঅতত্তু=সাঁকো থেকে,পরি=পড়ে, জোঁয়ার=জুমার ।
**ব্যাখ্যা :** সাঁকো থেকে পড়ে জুমার গোসল সারা । (দায়ে পড়ে কর্তব্য পালন ।)

৭০৫.
হদাত্তু উড়ি গদার বারি ।
শব্দার্থ: হদাত্তু =হঠাৎ, গদা=লাঠি বা বল্লম ।
**ব্যাখ্যা :** হঠাৎ উঠে লাঠির আঘাত! (বিনামেঘে বজ্রপাত ।)

৭০৬.
হাঁতির গা হাঁতিয়ে ন দেখে ।
শব্দার্থ: গা=শরীর, হাঁতিয়ে=হাঁতি ।
**ব্যাখ্যা :** হাতির শরীর হাতি দেখে না । (নিজের দোষ নিজে দেখে না ।)

৭০৭.
হারা বছরর্ এবাদত, এক্কু দিনে শেষ ।
শব্দার্থ: হারা = সারা, পুরো, এক্কু = একই ।
**ব্যাখ্যা :** সারা বছরের এবাদত একদিনেই শেষ । (সমস্ত আয়োজন এক মুহূর্তে পণ্ড ।)

৭০৮.
হাঁ'র অত্থৎ বিয়ার কাম ।
শব্দার্থ: হাঁ'র = সাগা-এর স্থানীয় রূপ (ছোটো আয়োজনের বিয়ে বিশেষত দ্বিতীয় বিয়ে), অত্থৎ=সময়, বিয়ার=বিয়ের ।
**ব্যাখ্যা :** সাগার সময় বিয়ের আয়োজন । (যার প্রয়োজন নেই তা করতে যাওয়া ।)

৭০৯.
হাঁড়র লাত্থি ঘাঁড়র কিল, যার কোয়ালে যে চিতিল ।
শব্দার্থ: হাঁড়র = হাটের, ঘাঁডর=বাড়ির সদর দরজা, কোয়ালে=কপালে, চিতিল=জুটেছে ।
**ব্যাখ্যা :** হাটের লাত্থি ঘাটের কিল, যার ভাগ্যে যা জুটল । (বিশৃংখল দশায় কোনো বাচ-বিচার থাকে না ।)

৭১০.
হাতির পীড়ৎ পাড়ার ওজনে নঅয় ।
শব্দার্থ: পীড়ৎ=পিঠে, পাড়া=শিল, মরিচ পিষানোর শিল-নোড়া ।
**ব্যাখ্যা :** হাতির পিঠে পাঁটার ওজনে খবর হয় না ।

৭১১.
হাতির ঘাঁত পাড়ার অসুদে কি হইব?
শব্দার্থ: ঘাঁ=ক্ষত, পাড়া=শিল-পাটা, অসুদ=ঔষধ ।
**ব্যাখ্যা :** হাতির ক্ষত পাটায় বাটা ঔষধে কী হবে? (যেমন ক্ষত তেমন ঔষধ দরকার ।)

www.pathagar.com

৭১২.
হতিনে খাইলে মুইঅ খাম, গা'র বিষে ঘুম ন যাম।
শব্দার্থ: হতিন=সতিন, মুইঅ=আমিও, খাম=খাই, গা'র=শরীরের, বিষে=ব্যথায়, যাম=যাই।
ব্যাখ্যা : সতিনে খেলে আমিও খাই, শরীরের ব্যথায় ঘুমাতে পারি না। (সতিনে সতিনে প্রতিযোগিতা অবশ্যাম্ভাবী।)

৭১৩.
হতিনর্ দিন্না কেলা গাছ্ ন থউক।
শব্দার্থ: হতিন=সতিন, দিন্না= দিনের, আমলের, কালের, সময়ের, থউক=থাক, ন থউক=না থাক।
ব্যাখ্যা : সতিনের সময়ের কলা গাছও যেন না থাকে। (সতিনের কোনো কিছুই সহ্য হয় না।)

৭১৪.
হাতে নখায় দারা দি খায়।
শব্দার্থ: নখায়=খায় না, দারা=কাঠি, দি=দিয়ে।
ব্যাখ্যা : হাতে না খেয়ে কাঠি দিয়ে খায়। (পরোক্ষ সুবিধাভোগ।)

৭১৫.
হাতে ন মারি, ভাতে মারে।
শব্দার্থ: ন মারি=মারে না।
ব্যাখ্যা : হাতে মারে না, কিন্তু ভাত না দিয়ে মারে। (পরোক্ষ ক্ষতি করা।)

৭১৬.
হঅসতা কেলা মিডা নাই।
শব্দার্থ: হঅসতা=সস্তা, কেলা=কলা, মিডা=মিষ্টি।
ব্যাখ্যা : সস্তা কলা মিষ্টি হয় না। (সহজে যা পাওয়া যায় তার মূল্য কম।)

৭১৭.
হ দেইক্খছ, ভ ন দেখছ।
শব্দার্থ: হ=সাঁকো, দেইক্খছ=দেখেছ, ভ=ভাও, রীতি-নীতি।
ব্যাখ্যা : সাঁকো দেখেছ, (সাঁকে পারাপারের) রীতি-নীতি দেখো নি বা শিখো নি। (সমস্যার এখনো দেখেছো কী!)

৭১৮.
হরিয়ে মাইয্যে গুথা, বউ এ পাইয়ে ছুতা।
শব্দার্থ: হরিয়ে=শাশুড়ি, মাইয্যে=মেরেছে, ছুতা=কারণ, কৈফিয়ৎ, গুথা=ঠেলা; ঠেলা দিয়ে কথা বলা।
ব্যাখ্যা : শাশুড়ি ঠেলা মারায় বউ কৈফিয়ৎ দেয়ার সুযোগ পেয়েছে। (শাশুড়ি বউয়ের দ্বন্দ্ব।)

www.pathagar.com

৭১৯.
হক কথাত্ নেইক্কা বেযার্, গরম্ ভাতত্ ঠুঁডা বেযার্ ।
শব্দার্থ: নেইক্কা=জামাই, বেযার্=রাগ, ঠুঁডা=যার ডান হাত পঙ্গু ।
ব্যাখ্যা : সত্যি কথায় জামাই রাগ করে, গরম ভাত দিলে ঠুঁডা রাগ ।

৭২০.
হক বিচার গইল্লে বাপর্ কোলত্ বই গরা পরিব ।
শব্দার্থ: গইল্লে=করলে, বাপর্=পিতার, কোলত্=কোলে, বই=বসে, গরা=করা ।
ব্যাখ্যা : সত্যি বিচার করতে গেলে পিতার কোলে বসে করতে হবে ।

৭২১.
হক্কল্ মাছে ঘু খায়, বোয়াল মাছর বন্নাই ।
শব্দার্থ: হক্কঅল্=সকল, ঘু=মল, বন্নাই=বদনামী ।
ব্যাখ্যা : সকল মাছেই মল খায়, কিন্তু বোয়াল মাছেরই বদনামী । (দোষ কম-বেশি সবাই করে কিন্তু দোষ যেন একা দাগী ব্যক্তির ।)

৭২২.
হক্কল্ শিয়ালর্ এক রা ।
শব্দার্থ: হক্কল্=সকল, রা=আওয়াজ ।
ব্যাখ্যা : সকল শিয়ালের এক আওয়াজ ।

৭২৩.
হরিপে কাট্ঠল খায়, বগার পোঁদৎ আডা বাঝে ।
শব্দার্থ: হরিপ=ফাঁকিবাজ, ধুর্ত, বোগা=বক, পোঁদৎ=পাছায়, আডা=আঁঠা, কাট্ঠল=কাঁঠাল ।
ব্যাখ্যা : ফাঁকিবাজ কাঁঠাল খায়, কিন্তু বকের পাছায় আঁঠা লাগে ।

৭২৪.
হাগা ধইল্লে বাঘরে ন ডরায় ।
শব্দার্থ: হাগা ধইল্লে=মল ত্যাগ শুরু করলে, বাঘরে=বাঘকে, ডরায়=ভয়, ন ডরায়=ভয় পায় না ।
ব্যাখ্যা : পায়খানার বেগ পেলে বাঘকেও ভয় পায় না । অর্থাৎ বনে বাঘ আছে কিনা সে চিন্তা মাথায় আসে না ।

৭২৫.
হাত ঠেং থাইতে মুকে কি কথা ।
শব্দার্থ: থাইতে=থাকতে, ঠেং=পা ।
ব্যাখ্যা : হাত-পা থাকতে মুখে কিসের কথা । (ঝগড়া উসকে দেয়া ।)

৭২৬.
হাপঅ মারন্ লাডিও ন ভাঙ্গন ।
শব্দার্থ: হাপ=সাপ, মারন্=মারা, লাডি=লাঠি ।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** সাপও মারা লাঠিও না ভাঙা। (কৌশলে কর্ম সম্পাদন।)

৭২৭.
হাপর্ কোনা, বেঙর্ কোনা
যার্ যার্ অঙ্গে তার তার সোনা।
**শব্দার্থ:** হাপর্=সাপের।
**ব্যাখ্যা :** সাপের কোনা, ব্যাঙের কোনা, তাদের সোনা তাদের গায়ে। (সব কিছু নিজ জায়গায় মানানসই।)

৭২৮.
হাভাইত্তা পাইয়ে ধন, বায়-পুতে দিয়ে কিত্তন।
**শব্দার্থ:** হাভাইত্তা=যে ভাত খাইনি, পাইয়ে=পেয়েছে, বায়-পুতে=পিতা-পুত্রে, কিত্তন= কীর্তন।
**ব্যাখ্যা :** হা-ভাতে পেয়েছে ধন, পিতা-পুত্র মিলে দিয়েছে কীর্তন। (ধনহীন ধন পেলে অপব্যয় শুরু করে।)

৭২৯.
হাভাইত্তা ভাত পাইলে উইত্ গরি খায়,
নিধইন্নায় ধন পাইলে টিবি টিবি চায়।
**শব্দার্থ:** নিধইন্না=নিঃস্ব, টিবি টিবি=টিপে টিপে, হাভাইত্তা= যেভাত খাই নি, পাইলে=পেলে, উইত-=উপুড়, গরি=করে।
**ব্যাখ্যা :** অভূক্ত ব্যক্তি ভাত পেলে উপুড় হয়ে খায়, আর নিঃস্ব ব্যক্তি সম্পদ পেলে তা টিপে টিপে দেখে।

৭৩০.
হারা রাইত রামায়ন পরি বিয়ানে উড়ি কয় সীতা কার্ বাপ?
**শব্দার্থ:** হারা=সারা, রাইত=রাত, পরি=পড়ে, কয়=বলে, বিয়ানে=সকালে।
**ব্যাখ্যা :** সারা রাত রামায়ন পড়ে সকালে উঠে জিজ্ঞেস করে সীতা কার পিতা? (অমনোযোগী শ্রোতা।)

৭৩১.
হালত্ গিলে হাইল্লা, জালত্ গিলে জাইল্লা।
**শব্দার্থ:** হালত্=চাষে, হাইল্লা=হাইল্লা, জালত্=জাল নিয়ে, জাইল্লা=জেলে।
**ব্যাখ্যা :** জমি চাষ করতে গেলে হাইল্লা, জাল নিয়ে গেলে জেলে। (উভয়বিধ কাজে দক্ষ।)

৭৩২.
হালত্ ন হাডে গরু কুইয্যার যম।
**শব্দার্থ:** হালত্=চাষে, হাডে=হাটা, কুইয্যার্=খড়ের গাদা, যম=আজরাইল।
**ব্যাখ্যা :** যে গরু লাঙল টানে না সে খড়ের গাদার যম অর্থাৎ খড় খায় বেশি। (বিনা কাজে অন্ন ধ্বংস।)

www.pathagar.com

৭৩৩.
হাজুইন্নার্ গর্বা গরবা ন, বেইন্নার ঝরঅ ঝর্ ন ।
শব্দার্থ: হাজুইন্না=সন্ধ্যা বেলা, গর্বা=মেহমান, অতিথি, বেইন্নার= সকালের, ঝর=বৃষ্টি ।
**ব্যাখ্যা :** সন্ধ্যার অতিথি অতিথি নয়, সকালের বৃষ্টি বৃষ্টি নয় । (অসময়ের কিছুই কাম্য নয় ।)

৭৩৪.
হাতি গারাত পইল্লে, বাদরেও থাবায় ।
শব্দার্থ: গারাত=গর্তে, পইল্লে=পড়লে, থাবায়=থাপ্পড় দেয় ।
**ব্যাখ্যা :** হাতি গর্তে পড়লে বানরেও থাপ্পড় দেয় ।

৭৩৫.
হাতি দি হাতি ধরে ।
শব্দার্থ: দি=দিয়ে ।
**ব্যাখ্যা :** হাতিকে হাতি দিয়ে ধরতে হয় ।

৭৩৬.
হিসাবর্ গরু বাঘে ন খায় ।
শব্দার্থ: হিসাবর্=হিসাবের, ন খায়=খায় না ।
**ব্যাখ্যা :** হিসেবের গরু বাঘে খায় না । অর্থাৎ বাঘে খেয়েছে বলে ফাঁকি দেবার সুযোগ নেই ।

৭৩৭.
হুশ ঠিক মাথা খারাপ ।
শব্দার্থ: হুশ=জ্ঞান ।
**ব্যাখ্যা :** মাথা খারাপ হলেও হুশিয়ার ।

৭৩৮.
হইল খাইলাম, বোয়াল খাইলাম,
ইচার ছুরত্ দাঁত ভাইলাম ।
শব্দার্থ: হইল=সোল, ইচা=চিংড়ি, ছুরত্= শুড়, ভাইলাম=ভাঙলাম ।
**ব্যাখ্যা :** সোল খেলাম, বোয়ালও খেলাম, কিন্তু শেষে চিংড়ি মাছের শুড়ে দাঁত ভাঙলাম । (অপ্রত্যাশিত আঘাত পাওয়া ।)

৭৩৯.
হারি ন পাইত্তে বাদির প'দ্ ধরন ।
শব্দার্থ: হারি ন=না পেরে, পাইত্তে=পারতে, পঅদ্=পায়ে ।
**ব্যাখ্যা :** দায়ে পড়ে বাঁদির পায়ে ধরা । (যেন তেন ভাবে কাজ উদ্ধার করা ।)

৭৪০.
হাইজর্ কদু তুলি ছুঁইয়ে ।

www.pathagar.com

শব্দার্থঃ হাইজ্=ঘরের চাউনীর সাথে দেয়া অতিরিক্তি চাল, তুলি=ঘরের চালের উপরে, ছুঁইয়ে=ছুয়েছে।
ব্যাখ্যা : নিচের কদু ঘরের চাউনীর উপরে উঠে গেছে। (হঠাৎ বড়লোক হওয়া।)

৭৪১.
হাজে আই মাঝে লুডে।
শব্দার্থঃ হাজে=সন্ধ্যা, আই=এসে, লুডে=শুয়ে।
ব্যাখ্যা : সন্ধ্যা বেলা এসে মধ্যখানে শোয়। (অনাকাংখিত সুযোগ চাওয়া।)

৭৪২.
হুয়রনির্ হাত ছ, বাঘিনীর এক ছ।
শব্দার্থঃ হুয়র=শুকর, হুয়রনির্=মাদি শুকরের, হাত=সাত, ছ=ছানা বা বাচ্ছা।
ব্যাখ্যা : শুকরের সাত বাচ্ছা আর বাঘিনীর এক বাচ্ছাই সমান। (শক্তিমান একাই যথেষ্ট।)

৭৪৩.
হেডামে চেডাই ন পারির।
শব্দার্থঃ হেডামে=সম্বল, সামর্থ, তৌফিক, চেডাই=পেরে উঠা, ন পারির=পারছি না।
ব্যাখ্যা : সামর্থের অভাবে পেরে উঠছি না।

৭৪৪.
হওরঅ্ বারি সর্গপুরি, তিনদিন পরে ঝাডার বারি।
শব্দার্থঃ হওরঅ্=শাশুড়, বারি=বাড়ি, ঝাড়ার=ঝাঁটার।
ব্যাখ্যা : শ্বশুর বাড়ি স্বর্গপুরী, তিনদিন পরে ঝাঁটার বারি। (শ্বশুর বাড়ি বেশি দিন থাকলে আদর কমে যায়। এ প্রবাদ মাত্রাজ্ঞান স্মরণ করিয়ে দেয়।)
৭৪৫.
হওরঅ্ বারী মধুর হাঁরি, তিন দিন্ পরে ঝাডার বারি।
শব্দার্থঃ হওরঅ্=শাশুড়, বারী=বাড়ি, হাঁরি=মাটির তৈরি পাত্র, ঝাডা=ঝাটা।
ব্যাখ্যা : শশুড় বাড়ি মধুর হাঁড়ি, তিনদিন পরেই ঝাটার আঘাত সহ্য করতে হয়।

৭৪৬.
হাতলারা কাম ভালা ন।
শব্দার্থঃ লারা=নাড়া; নড়াচড়া করা, হাতলারা=যা হাত দিয়ে নড়াচড়া করে; এখানে চুরি করাকে বুঝাচ্ছে, কাম=কাজ, ভালা=ভালো।
ব্যাখ্যা : চুরি করা ভালো কাজ নয়।

৭৩৮.
হাত টানি আচ্চান লঅত পাই-ই।
শব্দার্থঃ টানি=টেনে,আচ্চান=আসমান, লঅত=নাগাল পাওয়া, পাই-ই=পেয়েছি।
ব্যাখ্যা : হাত টেনে আসমান নাগাল পাওয়া।

www.pathagar.com

৭৩৯.
হাদা খঅর্ মঅর, কোয়াল পুরঅর তর।
শব্দার্থঃ হাদা=সাদা পাতা বা তামাক পাতা, খঅর্=খাচ্ছ, মঅর=আমার, কোয়াল= কপাল, পুরঅর্=পুড়ছ, তর=তোমার।
**ব্যাখ্যা :** তামাক পাতা খাচ্ছ আমার, তোমার কপাল পুড়ছ।"[১]

## সংগৃহীত প্রবচন

১.
বরর্ বচন, গজের দশন, যেন পাষাণের রেখা
কমিনার বচন, দুলার দরশন, যেন পেরতের দেখা।"[২]
শব্দার্থঃ বরর্=বড় লোকের, গজ=হাতি, কমিনার=ছোট লোকের।
**ব্যাখ্যা :** বড়লোকের কথা এবং হাতির দাঁত দেখা স্থায়ীভাবে মনে রেখাপাত করে ঠিক তার উল্টো হচ্ছে ছোটো লোকের কথা এবং (দুলার) বরের শাশুড় বাড়িতে আগমন অশরীরী আত্মার মতো ক্ষণস্থায়ী।
২.
ভাই বুলম বদ্দা বুলম মুই বুলম তোঁয়ারে
গাছর আগার শাইরর্ ছ পারি দে মরে।
সুন্দরি তুই ধান উরদ্দে
লাইল্লা যার উরি
সুন্দরির রসর যবন
রইদে যার পুরি।
৩.
পিনপিননা ঝরগানত্ ভিজাইলাম ঝুড়া
উজাড়া মেডি তুলে ছ'লর খুড়া।
৪.
পিড়ৎ বাইন্দম কুলা, যত বুলাবি বুলা
কানত বাইন্দম ঢুল, যত বুলাবি বুল।
৫.
অওঁল পাঁচ্ছোয়া ফোয়ান ন।
শব্দার্থঃ অঁওল=আঙ্গুল, ফোয়ান=সমান।
**ব্যাখ্যা :** হাতের পাঁচটি আঙুল সমান হয় না অর্থাৎ সমাজের সব লোক সমানের নয়।
৬.
তোতায়ে চোখ ফিরা পান।

www.pathagar.com

শব্দার্থ: তোতা=টিয়া, ফিরা=ফেরা, পান=মতো।
**ব্যাখ্যা :** টিয়ে পাখির মতো চোখ ফিরিয়ে নিও না (নিষ্ঠুর আচরণ করে না।)
৭.
তুই হরর খুঁড়া।
শব্দার্থ: হরর্=টলটলে নরম, খুঁড়া=খুঁটি।
**ব্যাখ্যা :** তুমি নরম মাটির খুঁটি। (অদৃঢ় লোক।)
৮.
থোতা মুখ ভোতা গরি দেয়।
শব্দার্থ: থোতা=থোতলানো, গরি=করে, গরি দে=করে দাও।
**ব্যাখ্যা :** থোতলানো মুখ ভোঁতা করে দেয়া। (দুর্মুখকে দমন করা।)
৯.
দুক্‌খে কুঁইরে মিড়া ন খার।
শব্দার্থ: দুক্‌খে=দুঃখে, কুঁইরে=কুকুরে, মিড়া=গুড়, ন খার=খাচ্ছে না।
**ব্যাখ্যা :** আমার কষ্ট দেখে কুকুর পর্যন্ত গুঁড় খাচ্ছে না। (অতীব কষ্টকর জীবন।)
১০.
নিজর বঁলত্‌তল ফুঁই চ গই।
শব্দার্থ: বঁলত্‌তল = বগলের তলা বা নীচে, ফুঁই = শুঁকে, চ= দেখ, চ গই=দেখ না।
**ব্যাখ্যা :** নিজের বগলের তলা শুঁকে দেখ। (অপরকে দোষ দেবার আগে নিজের দোষ দেখ।)
১১.
পিঁআরার্ পাক্ গজাইয়ে মরিবাল্ লাই।
শব্দার্থ: পিঁআরার্=পিঁপড়া, পাক্=পাখা, গজাইয়ে=গজিয়ে উঠা, মরিবার্=মরার, লাই=জন্য।
**ব্যাখ্যা :** মরার জন্যই পিঁপড়ার পাখা গজায়।
১২.
পুঁড়ি মাছে পন্ পানি পাইয়ে পান গরর্ কিঅল্‌লা।
শব্দার্থ: পুঁড়ি=পুঁটি, পঅন্ পানি=নতুন পানি, পান=মতো, গরর্=করের, কিঅল্‌লাই= কিসের জন্য।
**ব্যাখ্যা :** পুঁটি মাছে নতুন পানি পেলে যেমন (লাফালাফি করে) করে সে রূপ করছ কেন?
১৩.
পুঁথির পাঠ পরাপান্ পরা পরে।
শব্দার্থ: পরা=পড়া, পরাপান্=পড়াবার মত।
**ব্যাখ্যা :** পুঁথি পাঠ করে যেভাবে ব্যাখা দিতে হয় ঠিক তেমনি বুঝাতে হবে। (ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া।)

www.pathagar.com

১৪.
পুঁড়ি মাছর পেড়ি খাইয়া?
শব্দার্থ: পুঁড়ি=পুঁটি, পেড়ি=পেট, খাইয়া=খাওয়া।
**ব্যাখ্যা :** পুঁটি মাছের পেটি (খুবই তিতা) খাওয়া। (কৃপণ; ছোট লোক।)
১৫.
বেশি চোখ্খাড়াই গরন্ ভালা নঅ।
শব্দার্থ: চোখ্খাড়াই =চোখবন্ধ করা, স্বার্থপর হওয়া, গরন্=করা, নঅ=না।
**ব্যাখ্যা :** বেশি স্বার্থপর হওয়া ভালো নয়
১৬.
বাপর্ দারি পুরা ন দিছ্।
শব্দার্থ: বাপর্=পিতার, দারি=দাঁড়ি, পুরা= পোড়ানো, দিছ্=দিওনা।
**ব্যাখ্যা :** পিতার দাঁড়ি পুড়িয়ে দিও না। (অর্থাৎ এমন কিছু করো না যাতে পিতার অবমাননা হয়।)
১৭.
বিয়াক হইয়ার বাপ্।
শব্দার্থ: বিয়াক=সবাই, হইয়া=হওয়া, বাপ্=পিতা।
**ব্যাখ্যা :** সবাই যা হয়েছে তার পিতা, না হওয়ার পিতা কেউ হতে চায় না। (সবাই সফলতার পক্ষে বা সবাই জী-হুজুর।)
১৮.
বাঘ গইল্লে পান্ কিয়া গরর্?
শব্দার্থ: গইল্লে=ঢুকেছে বা প্রবেশ করেছে, পান=ন্যায় বা মত, কিয়া=কেন, গরর্=করছো।
**ব্যাখ্যা :** লোকালয়ে বাঘ প্রবেশ করলে যে অবস্থার সৃষ্টি সে রকম করছো কেন?
১৯.
লুতি পুগত্তু দুধ দোয়ে।
শব্দার্থ: লুতিপুগ্=এক প্রকার সাদা রং-এর ক্ষুদ্র পোকা।
**ব্যাখ্যা :** ক্ষুদ্র পোকা থেকেও দুধ দোহন করে। (সব জায়গায় লাভ খোঁজা।)
২০.
লাশ মারি খুনিত দাইল্ অ'ন।
শব্দার্থ: লাশ মার=মুর্দাকে খুন করে, দাইল্=দাখিল, অঅন্=হন, দোয়ে=দোহন করে।
**ব্যাখ্যা :** লাশ মেরে খুনি মামলায় দাখিল হওয়া। (অহেতুক ফ্যাসাদে জড়ানো।)
২১.
লেচমোচ পোঁদত্তলে দি হাববিশ।
শব্দার্থ: লেচমোচ=হাত পা, পোঁদত্তলে=পাছার নিচে/গুটিয়ে, হাববিশ=আত্মসমর্পণ।

www.pathagar.com

**ব্যাখ্যা :** হাত-পা গুটিয়ে আত্মসমর্পণ।

২২.

লেজে-পীড়ে টাক ভিরাই ন পারির।

**শব্দার্থ:** লেজে-পীড়ে=হাতে পায়ে, ভিরাই=ভেড়ানো, টাক ভিরাই=নাগাল পাওয়া।

**ব্যাখ্যা :** হাতে-পায়ে নাগাল পাচ্ছি না। (আয়-ব্যয় সমান হচ্ছে না।)

২৩.

শতানর্ পৌঁদত্ দাঁরা দন্।

**শব্দার্থ:** শতানর্= শয়তানের, পৌঁদত্=পাছায়, দাঁরা=লাঠি, দন্=দেওয়া।

**ব্যাখ্যা :** শয়তানের পাছায় লাঠি দেয়া। (দুষ্টকে আরো উস্‌কে দেয়া।)

## তথ্যনির্দেশ

১. কক্সবাজারের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-১৫৮।

২. মোহাম্মদ আলম, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, খোনকারখিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বর্তমান হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক, জন্ম: ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫০, গ্রাম : পালাকাটা বটতলী, জালালাবাদ ইউনিয়ন, উপজেলা : কক্সাবাজার সদর, তারিখ : ০৪.০৩.২০১২. সময় : বিকেল ৫টা।

www.pathagar.com

## লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

প্রাচীনকাল থেকে লোকজন যা সহজেই এবং অন্ধভাবে বিশ্বাস করে আসছে তাই লোকবিশ্বাস। গ্রামাঞ্চলের সহজ-সরল মানুষগুলো এমন সব কথা সহজেই বিশ্বাস করে যা শিক্ষিত সমাজের কাছে কুসংস্কার বৈ কিছুই নয়। বর্তমানে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির যুগে মানুষ কুসংস্কারকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ভাগাড়ে নিক্ষেপ করে। যখন চাঁদে গিয়ে তারা স্থান করে নিচ্ছে, সাগরের তলদেশ থেকে মুক্তো আহরণ করছে এমন সময়েও মানুষ এমন সব কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করে যাচ্ছে যা বর্তমান সভ্যতার জন্য দুঃখজনক। কক্সবাজার জেলার শিক্ষার হার খুব বেশি নয়। ফলে জেলার প্রায় এলাকাতেই কুসংস্কার এখনো জেঁকে বসে আছে। ফলে মানুষ এখনো ঝাড়-ফুঁকসহ তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস করে। এসব তন্ত্র-মন্ত্রসহ বিভিন্ন কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। নিম্নে কিছু লোকবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা হলো।

**আড়ুর উয়র বত্তন রাখি ভাত খাইলে হৈয়াত কমি যায়**

খাবার গ্রহণের সময় হাঁটুর উপর ভাতের বাসন রেখে খেলে মানুষের আয়ু কমে যায়। প্রাচীনকাল থেকেই স্থানীয়ভাবে লোকজনের মধ্যে এটা বদ্ধমূল ধারণা। এই ধারণার কারণেই বাড়ির শিশু-কিশোরদের হাঁটুর উপরে বাসন রেখে ভাত খেতে দেয় না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই ধারণায় চিড় ধরেছে। প্রাচীনকালে মানুষ যা বিশ্বাস করতো বা মেনে চলতো বর্তমানে শিক্ষার আলো সর্বত্র পৌছে যাওয়ার ফলে এসব ব্যাপারে আর লোকজনের বিশ্বাস নেই।"[১]

**ঠেং টানি ভাত খাইলে হউরঅর ঘর দূরে হয়**

স্থানীয় জনমনে বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, পা টেনে ভাত খেলে মেয়ের শ্বশুড়বাড়ি দূরে হয়। বর্তমানে খাবার টেবিলে ভাত বা যেকোনো খাবার গ্রহণের সংস্কৃতি চালু হয়েছে। পূর্বে মাটিতে কাঠের তৈরি পিড়ি পেতে বা পাটি বিছিয়ে ভাত বা যে কোনো খাবার গ্রহণ করা হতো। খেতে বসে অনেক সময় অনেকেই পা লম্বা করে দিয়ে খাবার গ্রহণ করতো, যা দেখতে মোটেই সুন্দর ও রুচিশীল দেখাতো না।"[২]

**টুটটুই ঠিক ঠিক গইললে হাছা (সত্য) হয়**

যার বাংলা অর্থ একাধিক ব্যক্তি কথা বলার সময় টিকটিকি ঠিক ঠিক শব্দ করলে আলোচিত কথা সঠিক বলে বিশ্বাস করা হয়। একারণেই কথা বলার সময় টিকটিকির আওয়াজের সাথে সাথে মাটিতে আঙ্গুল দিয়ে টিকটিকির অনুকরণে টক টক করে তিনটি শব্দ করতে হয়।

**রাতিয়া নক (নখ) কাডন গম ন**

রাতের বেলায় হাত-পায়ের নখ কাটা ভালো নয়। কেন ভালো নয় তার কোনো ব্যাখ্যা জানা যায় না। আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে বর্তমানে রাতের বেলায়ও দিনের মতো

www.pathagar.com

ফক ফকা উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত থাকে। এতে করে রাতের বেলায় নখ কাটলে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু পূর্বে রাতের বেলায় কুপির আলোতে ভালোভাবে দেখা যেতো না বিধায় রাতের বেলায় নখ কাটলে যে-কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে; বিশেষ করে নখ বা আঙ্গুল কেটে যেতে পারে। সে কারণে রাতের বেলায় নখ কাটা বারণ বলে ধারণা করা যায়। তবে রাতের বেলায় নখ কাটলে কী অমঙ্গল ঘটতে পারে সে ব্যাপারে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না।

আবার কেউ কেউ মনে করে রাতের বেলায় নখ কাটলে মানুষ গরিব হয়। এ প্রসঙ্গে স্থানীয়ভাবে একটি গল্পও চালু আছে। কোনো এক সময় এক চোরা এক গৃহস্থের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকে। এক পর্যায়ে চোরের হাতের একটি নখ পড়ে যায়। চোর বেচারা সারা রাত নখ খুঁজতে খুঁজতে সকাল হয়ে গেল। নখতো খুঁজে পায়নি· উপরন্তু ঘরের লোকজন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে এক চোর ঘরের মধ্যে কী যেন খুঁজছে। আর যায় কোথায়। তাকে ধরে উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো।"[৩]

**'হলইদ্যা পাইগে ডাইলে গরবা আইয়ে'**

হলইদ্যা পাইগ বা পাইক বা পাখি। হলইদ্যা পাইক বা হলদে পাখি বা কুটুম পাখি। ঘরের দাওয়ায় বসে হলদে পাখি ডাকাডাকি করলে বাড়িতে মেহমান বা আত্মীয় স্বজনেরা বেড়াতে আসে বলে প্রবাদ প্রচলিত আছে।

**'পান খাই জিব্‌ চাইলে জামাইর হইয়াত কমে'**

যে বিবাহিত মহিলা পান খেয়ে জিহ্বা দেখলে সে মহিলার স্বামীর আয়ু কমে যায়।

**'জামাইর আগে বৌয়ে খাইলে জামাইর হইয়াত কমে'**

যে গৃহবধূ স্বামী খাওয়ার পূর্বে ভাত খায় সে মহিলার স্বামীর আয়ু কমে যায়।

**'রাইত বিয়ালে ছ'দি দ'ন গম ন'**

কথিত আছে যে, রাত্রিবেলায় পান খাওয়ার জন্য বাইরের কাউকে চুন চাইলে তা দেয়া ভালো না। এ বিশ্বাস প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। রাতের বেলায় চুন দিলে গেরস্থের অমঙ্গল হয়। আবার কেউ কেউ মনে করে রাতের বেলায় প্রতিবেশিকে চুন দিলে ঘরের ভাগ্য দেবী বিমুখ হয়ে অন্যত্র চলে যায়ে।

**'বদা বা আণ্ডা খাই পরীক্ষা দিলে পরীক্ষাত আণ্ডা পায়'**

স্থানীয়ভাবে ডিমকে 'বদা' বলা হয়। আরবি 'বয়জা' শব্দ থেকে 'বদা' শব্দটি এসেছে। বলতে গেলে 'বয়জা'' শব্দটি বিকৃত হয়ে স্থানীয়ভাবে 'বদা' হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। কথিত আছে যে, পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে খাবারের সাথে ডিম খেলে পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয় না। পরীক্ষাতে ডিমের মতো ডিম বা শূন্য পায়। সে কারণেই গ্রামের মানুষ এখনো ঘরের ছেলেমেয়েদেরকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে খাবারের সাথে ডিম খেতে দেয় না। বরঞ্চ ডিম খেলে পুষ্টি এবং শক্তি বেশি পাওয়া যায় গ্রামের মানুষ এটা বিশ্বাস করতে নারাজ।"[৪]

**'পঁনা কেলা খাই পরীক্ষা দিতে গিলে ক'লা পাইবা'**

কথিত আছে যে, পাকা কলা খেয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে ফলাফল ভালো হয় না।

www.pathagar.com

**'খাইল্যা ঘরা চাই গেইলে কু'ছাৎ হয়'**
কথিত আছে যে, কোথাও যাওয়ার সময় শূন্য কলসি দেখলে অমঙ্গল হয়। যে উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয় সে উদ্দেশ্য সফল হয় না। এ কারণে গ্রামের মানুষ এখনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হওয়ার পূর্বে বাড়ির কাউকে বের করে দিয়ে যাওয়ার রাস্তায় কোনো খালি কলসি আছে নাকি দেখে আসার জন্য প্রেরণ করেন। খালি কলসি নেই এটা নিশ্চিত হওয়ার পরে গৃহস্থ বা ঘরের কর্তা কাজে বের হয়। পক্ষান্তরে পানিভর্তি কলসি দেখলে মনে করা হয় ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন। বিশেষ করে পানিভর্তি কলসি করে ঘরে আসছে এরকম দেখা ভাগ্যের ব্যাপার।"[৫]

**'কুম্ভালার তক্তা পুরন গম ন'**
কথিত আছে যে, কুম্পালা বা কুম্ভালার তক্তা পোড়ানো ভালো নয়। মূল গৃহের রান্নাঘরে বা পৃথক রান্নাঘরে এই কুম্পালা বা কুম্ভালা নির্মাণ করা হয়। পানির কলসি রাখার জন্যই কুম্পালা তৈরি করা হয়। তক্তা বা কাঠ বা বাঁশের ফালা দিয়েই কুম্ভালা তৈরি করা হয়। এই কুম্ভালার তক্তা বা কাঠ বা বাঁশের ফালাগুলো আগুনে পোড়ানো ভালো নয়। এখানে আগুনে পোড়ানো বলতে জ্বালানি হিসেবে চুলায় দেওয়া ভালো নয়। স্থানীয় ভাবে কুম্ভালাকে 'কুম্পালা' বলে থাকে। কুম্ভালা শব্দটি মূলত কুম্ভ অর্থ কলসি, আর মালা হচ্ছে সারি। পুরো বাক্যটি হচ্ছে-কলসীর সারি।"[৬]

**'কুইর কাঁদিলে বিপদ আইয়ে'**
কথিত আছে, রাতে বা দিনের বেলায় তারস্বরে কুকুর ডাকাডাকি করলে বিপদ আসে। কথিত আছে, কুকুর বা যে কোনো আমান পোষ (মূলত পশুকেই আমান পোষ বলা হয়) আগেভাগে গৃহস্থের বিপদ দেখতে পায়। সে কারণেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করে কান্না করে আর গৃহস্থকে অজানা আগাম বিপদ সম্পর্কে জানান দেয়। অন্য পশুগুলো বিপদ দেখলেও তা প্রকাশ করার ব্যাপারে সিদ্ধ নয়।

**'বারিষা বা বাইরা শিয়াল ডাইলে রইদ উঁড়ে'**
কথিত আছে যে, বর্ষাকালে সন্ধ্যা বা রাতে একাধিক শিয়াল ডাকাডাকি করলে দু'একদিনের মধ্যেই রোদ উঠে।

**'বেঙ ডাইলে বাইরা নামে'**
কথিত আছে যে, বেঙ ডাকাডাকি করলে অচিরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয়ভাবে একটি আঞ্চলিক প্রবাদও আছে। আর তা হচ্ছে, 'বেঙয়র মুখত বাইরা (বর্ষা)।'

**'কচু খাই গলা ওঁতাইলে মিছাখোর'**
কথিত আছে তরকারি হিসেবে কচু খেয়ে কারো গলা ধরলে বা চুলকালে যার গলা ধরবে সে মিথুক। তাকে মিথ্যুক হিসেবেই ধরে নেয়া হয়।

**'কালা মানুষ আছার খাইলে ঝর্দ্দে'**
কালো বর্ণের লোক যদি বৃষ্টি থামার পর কোথাও যেতে পিছলে মাটিতে পড়ে যায়' তাহলে নাকি আবার ঝর দেয়, মানে বৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

**'ভাতে বর ভাত ফুঁড়িলে গর্বা আইয়ে'**

জ্বলন্ত চুলায় ভাতের ডেকচির উপরিভাগে কিছু ভাত ফুটে বড় বড় দেখা গেলে অনুমান করা হয় অতিথি বা মেহমান আসবে।

**'ডান হাতর তাললুয়া উতাইলে বা ওঁতাইলে টিয়া আইয়ে'**

কথিত আছে যে, ডান হাতের তালু চুলকালে অচিরেই হাত ভর্তি করে টাকা আসে।

**'বাম হাতর তাললুয়া উতাইলে বা ওঁতাইলে টিয়া খরচ হয়'**

কথিত আছে যে, বাম হাতের তালু চুলকালে অগাইরে টাকা খরচ হতে থাকে।

**'টেংয়র তাললুয়া ওঁতাইলে বেশি হাড়া পরে**

কথিত আছে যে, পায়ের তালু চুলকালে লম্বা রাস্তা হেঁটে অনেক দূর যেতে হয়।

**'চালইন লৈ (লই) কিছু খাইলে বিয়া পাক্কায়'**

কথিত আছে যে, চালুনে রাখা কোনো খাবার বিশেষ করে মুড়ি, খই বা অন্য কোনো খাবার যদি অবিবাহিত যুবক/যুবতি খায় তা হলে তাদের বিয়ে ঘুরতে থাকে। চাল থেকে চালুনে করে যেভাবে ধান বের করা হয় ঠিক তেমনি ভাবে তাদের বিয়েও ঘুরতে থাকে।

**'ডালা কোলার বাতাস লাইলে পোঁয়া-ছা বাইট্যা অয়'**

কথিত আছে যে, চাউল অথবা ধান আবর্জনামুক্ত (পরিষ্কার করা) করার সময় ডালা অথবা কুলার বাতাস শিশুদের গায়ে লাগলে সেই শিশু শারীরিকভাবে খাটো হয়।

**'ডান বা ডেন চোগর পাতা ফালাইলে জ্বর উড়ে'**

কথিত আছে যে, ডানচোখের পাতা লাফালাফি করলে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার কেউ কেউ বলে থাকে ডানচোখের উপরের পাতা লাফালাফি করলে সুসংবাদ আসে। অনুরূপভাবে বামচোখের উপরের পাতা লাফালাফি করলে বিপদ আসে বলে ধরে নেয়া হয়।

**'মা'র দুধ ওঁতাইলে পোয়ার অসুখ অয়'**

কথিত আছে যে, মায়ের স্তনদ্বয়ের যে-কোনো একটি চুলকালে তার সন্তানের অসুখ হয়।

**'গর্ভিতা মাইয়া কিছু চাইলে দিয়া পরে'**

কথিত আছে যে, গর্ভবতী কোনো মহিলা যদি কারো কাছ থেকে কিছু খেতে চায়, তা হলে তাকে দিতেই হয়।

**'খাঁ খাঁ কাওয়ার ডাক গম ন'**

কাকের একটানা কা-কা ডাক অমঙ্গলের পূর্বাভাষ বলে মনে করা হয়।

**'ক'র পোয়াদে দরির নিচত্তুন ন গলিছ'**

যে রশিতে ভেজা কাপড় শুকাতে দেয়া হয় তার নিচ দিয়ে যাওয়া ভালো না। এতে শরীরের অসুখ বা বিপদ-আপদ হতে পারে।

www.pathagar.com

**'কেইশ্‌শা ফুরা উড়িলে ভাগ্য ধরে'**
কথিত আছে, শরীরের কোনো স্থানে কেইশ্‌শা (বেশ বড় ও কয়েকটি মুখ বিশিষ্ট ফোড়াকে কেইশ্‌শা ফোড়া বলে) ফোড়া উঠলে বলা হয় তার উপর ভাগ্যদেবী ভর করেছে বা ভাগ্যদেবী।

**'নগত্ বা নকত্ ফুল ফুঁড়িলে ক'র পায়'**
হাতের নখে সাদা সাদা দাগ যা দেখতে প্রস্ফুটিত ফুলের মতো তা খুশির খবর বয়ে নিয়ে আসে। এরকম ফুল বা দাগ দেখা দিলে মনে করা হয় সে নতুন কাপড় পাবে।

**'গোড়া কেলা পাতা ঘরত ঘলান গম ন'**
অর্থাৎ আস্ত কলাপাতা কোনো বাড়িতে ঢুকানো নিষেধ। এতে গৃহস্থের অমংগল হয়। এটা কারণ হচ্ছে মানুষ মারা গেলে কলাপাতার উপর রেখেই মুর্দার গোসল দেয়া হয়। সে কারণেই আস্ত কলাপাতা ঘরের ঢোকানো নিষেধ।

**'কুয়াল ওঁতাইলে দুখ আইয়ে'**
কথিত আছে যে, কারো কপাল চুলকালে দুঃখ ঘনিয়ে আসে বা কোনো বিপদ-আপদ আসে।

**'গা'র বারে নক, চুল ও দারি কাড়ন গম ন'**
জন্মবারে (দিন) নখ, চুল ও দাড়ি (ক্ষৌরকর্ম) কাটানো ভালো নয়। জন্মবারে এসব কাটালে আয়ুক্ষয় হয় বলে প্রচলিত বিশ্বাস। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা জন্মবারে এখনো ক্ষৌরকর্ম করে না।

**'টেংয়র তাললুয়াত কালাজট থাইলে বৈদেশ যায়'**
কথিত আছে যে, পায়ের তালুতে কালো তিল থাকা বিদেশ যাওয়ার লক্ষণ।

**'ডান হাতর তাউলাত জট থাইলে রাধা ভালা অয়'**
ডান হাতের তালুতে তিল থাকা রমণীর রান্না মজাদার হয়।

**'বিচইনর বারি খাইলে মেড়িত বারি দিয়া পরে'**
হাতপাখা করে বাতাস করার সময় কারো শরীরে পাখার আঘাত লাগলে ভালো নয়। মনে করা হয়, এতে করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পাখার মতো ঘুরতে থাকবে। তাই পাখার আঘাত শরীরের লাগার সাথে সাথে পাখাকে মাটিতে আঘাত করতে হয় যাতে পাখার আঘাতপ্রাপ্ত রাহুমুক্ত হয়।

**'মাথা আছুরার সয়ত হাতত্তুন হ'নী মেডিত পইলে গর্বা আইয়ে'**
মহিলারা মাথা আঁচড়ার সময় অসাবধানতাবশত যদি চিরুণী মাটিতে পড়ে যায় তা হলে মনে করা হয় বাড়িতে মেহমান আসবে।

**'যাইতে পিছততু ডাকন গম ন'**
কোথাও যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরুনোর পরে কাউকে পেছন দিক থেকে ডাকা ভালো নয়। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অমঙ্গল হয়। এই বিষয়টি কক্সবাজার অঞ্চলে এখনো কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।

www.pathagar.com

**'ঘুমত্তুন উড়ি নাইত দেইলে কুছাৎ লাগে'**
ভোরে ঘুম থেকে জেগে প্রথমে যদি কেউ নাপিত দেখে সারাদিন তার অশুভ হয়।

**রারী বেডির মুখ চাই বারইলে ছাৎ নয়**
বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার মুখ দেখে কোথাও গেলে সেই কাজের সিদ্ধি হয় না।

**'বৌয়র ওইধ্যা মাথা জামাইর কুছাৎ হয়'**
স্ত্রীর অনাবৃত মাথা (মাথার কাপড়) দেখে স্বামী কোথাও গেলে তার মঙ্গল হয় না। স্ত্রীর মাথায় কাপড় না থাকাটা একটি গর্হিত কাজ। এতে মনে করা হয় স্ত্রীকে (ঘরের বউকে) অলক্ষ্মীতে ভর করেছে।

**'যাইতে পথত শিয়াল দেইলে ছাৎ হয়'**
কোথাও যাওয়ার সময় পথে (যাত্রাপথে) শিয়াল দেখলে যাত্রা শুভ হয়।

**'জামাই মইললে বৌয়ে জামাইর মরা মুখ চ'ন গম ন' বা 'বৌয়ে মরা জামাইর মুখছন গম ন'**
স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর জন্য মৃত স্বামীর মুখ (চেহারা) দেখা নিষেধ।

**'মুসলমানর ছোঁয়া লাইলে পুজা নয়'**
পূজার কোনো অর্ঘ্যে মুসলমানের ছোঁয়া বা স্পর্শ লাগলে সে অর্ঘ্যে আর পূজা হবে না।

'সিতাদাঁতা বেড়ি বিয়া ন গইয্য'
দাঁতের উপরের পাটির সামনের ফাঁকা দাঁত বিশিষ্ট মহিলা বা পুরুষকে সিতাদাঁতা বলা হয়। এই রকম ফাঁকা দাঁতওয়ালা নারী বিয়ে করলে নাকি অকালে স্বামী মারা যায়। তাই এই রকম সিতাদাঁওয়ালা নারী বিয়ে করা নিষেধ।

**'জামাই মইললে গোঁয়ানা পরা গম ন'**
স্বামী মারা গেলে স্ত্রী বিধবা হয়ে যায়। আর তাই বলা হয় স্বামী মারা যাওয়ার পরে বিধবা স্ত্রীর অলংকার পরা শোভা পায় না।

**'সাপছত্তর নারী বিয়া ন গইয্য'**
যে নারীর পিঠে সর্পের ফণার মতো তিল রেখা দেখা যায়, সেই নারীকে বিয়ে করলে অল্প বয়সে স্বামী মারা যায়। তাই সর্পের ফণার মতো দেখতে তিলযুক্ত মহিলা বিয়ে করা নিষেধ।

**'মাথাত ২ পইর থাইলে ২ বিয়া, ৩ পইর থাইলে ৩ বিয়া'**
বলা হয়, কোনো নারী বা পুরুষের মাথায় দুই পাক থাকলে দুই বিয়ে, তিন পাক থাকলে তিনটি বিয়ে করতে হয় বলে বিশ্বাস রয়েছে।

**'যাইবার স'ত না যাইও কইলে গম ন'**
শুভ কাজে যাওয়ার সময় কেউ যদি না যাওয়ার জন্য নিষেধ করে বাধার সৃষ্টি করে সে যাত্রা শুভ হয় না। মনে খটকা লাগে।

www.pathagar.com

**'যে নারী গা ধুই মাথার ভিজা চুলর আগা চায় তার খসম (জামাই) মারা যায়'**
যেসব বিবাহিতা মহিলা গোসল সেরে মাথার চুলের আগা (অগ্রভাগ)দেখে তার স্বামী মারা যায় বলে স্থানীয় ভাবে প্রচলিত বিশ্বাস।

**'রাতিয়া ফুইচ দ'ন গম ন'**
রাতের বৈলায় প্রতিবেশিকে সুঁই দেওয়া ভালো নয়। এতে সম্পদে টান পড়ে বলে প্রচলিত ধারণা।

**শনিবার ও মঙ্গলবার কনিক্কা যন ছাৎ ন**
শনিবার ও মঙ্গলবার কোনো কাজে কোথাও যাওয়া মঙ্গল হয় না। জেলার সর্বস্তরের ও সব ধর্মের লোকজন বিশ্বাস করেন, শনিগ্রহের প্রভাবে শনিবার দিনটি অমঙ্গলে ভর করে থাকে। ফলে কোনো কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়াও মঙ্গল নয়। অপর দিকে মঙ্গলবার দিনটিও অপয়া হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। ফলে শনিবারের মতো মঙ্গলবারও কোনো কাজ করলে তা সফল হয় না। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বিশ্বাস করেন, শনিবার ও মঙ্গলবার প্রভাতে উষার উদয়ের পূর্বে যাত্রা করলে সেই অপয়া কেটে যায়।

অপরদিকে অনেকেই বুধবার দিনটিও অশুভ দিন বলে মনে করে। বুধবার দিনের অকল্যাণ ক্রমাগত চলতে থাকে। বুধবারকে অমঙ্গল বা অপয়া ভাবার কারণ হিসেবে জানা গেছে, হাজার হাজার বছর আগে আরব উপদ্বীপে 'আদজাতি' নামের একটি সম্প্রদায় ছিল। তারা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হওয়ায় একপর্যায়ে তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে গযব নেমে আসে। সমগ্র এলাকা ধ্বংস হয়ে যায়। সম্প্রদায়ের কোনো লোক জীবিত ছিল না। পুরো জনপদ ও সম্প্রদায় তৃণের মতো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ কথা হলো, এ গযব যেদিন শুরু হয়েছিল সেদিন ছিল বুধবার। তাই মনে করা হয় যে, এই দিনে কোনো কাজ শুরু করা উচিত নয়। আদ জাতির উপর যে আসমানী গযব নেমে এসেছিল পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা হা-মীম-এর ১৬ নম্বর আয়াতে, সূরা যারিয়াতের ৪১ ও ৪২ নম্বর আয়াতে, সূরা ক্বামারের ১৮, ১৯ ও ২০ আয়াতে, সূরা হাক্কাহ-এর ৬, ৭ ও ৮ নম্বর আয়াতে এবং সূরা ফজরের ৭ ও ৮ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, আদ জাতির ব্যাপারে পবিত্র কুরআন মজিদের অনেক সূরাতে বর্ণনা রয়েছে। আদ জাতিকে পৃথিবী থেকে ধ্বংসের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা হাক্কাহ-এর ৬ ও ৭ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, "৬) আর আদকে কঠিন ঝঞ্ঝাবাত্যা দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে, ৭) যা তিনি সাত রাত ও আট দিন ধরে বিরামহীনভাবে তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে তারা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। যেন, খেজুরের পুরনো কাণ্ড।" এব্যাপারে পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা আল কামারের ১৮, ১৯ ও ২০ নম্বর আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে এভাবে, "১৮) আদ জাতি অস্বীকার করেছিল। দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব এবং কেমন ছিল আমার সাবধানবাণী। ১৯) আমি এক বিরামহীন অশুভ দিনে তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস পাঠালাম, ২০) যা তাদেরকে উপরে উঠিয়ে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলছিল যেনো তারা সমূলে উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড।"

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআন মজিদের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরকারগণ বর্ণনা করেছেন, "এমন একটি দিন যার দুর্যোগ ও দুর্ভোগ একাধারে কয়েক দিন ধরে চলছিল। সূরা আল হাক্কাহ-এর ৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, এই ঝঞ্ঝাবাত্যা একাধারে সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ কথা হলো, গযব যেদিন শুরু হয়েছিল সেদিন ছিল বুধবার। এ কারণে মানুষের মধ্যে এ ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে, বুধবার দিনটি হচ্ছে অশুভ, তাই এ দিনে কোনো কাজ শুরু করা উচিত নয়। এ বিষয়ে কিছু যয়ীফ হাদিসও উদ্ধৃত করা হয়েছে যার কারণে এ দিনটির অশুভ হওয়ার বিশ্বাস সাধারণের মনমগজে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইবনে মারদুইয়া ও খতীব বাগদাদীর বর্ণিত এ হাদিসটিও আছে যে, "মাসের শেষ বুধবার অশুভ, যার প্রভাব একাধারে চলতে থাকে। ইবনুল জাওযী একে 'মাওযূ' অর্থাৎ জাল ও মনগড়া হাদিস বলেছেন। ইবনে রজব বলেছেন, এ হাদিস সহীহ নয়। হাফেজ সাখাবী বলেন, এ হাদিস যতোগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা সবই একেবারে ভিত্তিহীন। অনুরূপভাবে তাবারানী বর্ণিত "বুধবার দিনটি অশুভ দিন যার অকল্যাণ ক্রমাগত চলতে থাকে" আরো কিছু সংখ্যক হাদিসে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, বুধবার দিন যেতো ভ্রমণ না করা হয়, লেনদেন না করা হয়, নখ না কাটানো হয় এবং রোগীর সেবা না করা হয়। কুষ্ঠ ও শ্বেতরোগ এ দিনেই শুরু হয়। কিন্তু এসব হাদিসের সব ক'টিই যয়ীফ। এর ওপরে কোনো আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। বিশেষজ্ঞ মুনাভী বলেন : "অশুভ লক্ষণসূচক মনে করে বুধবারের দিনকে পরিত্যাগ করা এবং এক্ষেত্রে জ্যোতিষদের ন্যায় বিশ্বাস পোষণ করা কঠোরভাবে হারাম। কেননা, সব দিনই আল্লাহ্‌র। কোনো দিনই দিন হিসেবে কল্যাণ বা অকল্যাণ কিছুই সাধন করতে পারে না।"

আল্লামা আলূসী বলেন, "সব দিন সমান। বুধবারের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। রাত ও দিনের মধ্যে এমন কোনো মুহূর্ত নেই যা কারো জন্য কল্যাণকর এবং কারো জন্য অকল্যাণকর নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মুহূর্তেই কারো জন্য অনুকূল এবং কারো জন্য প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে থাকেন।"[৭]

**'শনি ও মঙ্গল বারে নুয়া ক'র' পরন গম ন'**

শনিবার এবং মঙ্গলবারে নতুন কাপড় পরা উচিত নয়। তবে কেন নিষেধ এর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

**'শনি, মঙ্গলবারে মাথা আছুরন গম ন'**

সাধারণ মানুষের বিশ্বাস শনি এবং মঙ্গলবার চিরুণী দিয়ে মাথার চুল আচড়ানো শুভ নয়।

**'লক্ষ্মীমালূলাই চুলার পিছততুন ছাপ গরি এরা পরে'**

'লক্ষ্মীমায়ের জন্য চুলার পেছনের অংশ পরিষ্কার করে রাখতে হয়। রাতের বেলায় লক্ষ্মী মা ঘরে আসে। লক্ষ্মী মা ঘরে এসে নামায পড়ে। রান্নাঘরের চুলার পেছনের ক্ষুদ্র অংশটি লক্ষ্মী মা'র নামায পড়ার নির্ধারিত স্থান। তাই রাতের খাবারের পরে চুলার পেছনের অংশটি পরিষ্কার করে রাখতে হয়। রাতের খাবার পর্ব শেষে গৃহবধুরা যথারীতি চুলার পেছনের অংশটি ফুলের ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে রাখে যাতে লক্ষ্মী মা নামায না পড়ে ফিরে না যায়। কেউ কেউ চুলার পেছনের অংশটি ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করার পরে আবার পানি দিয়ে মুছে ফেলে বা লেপন করে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের

www.pathagar.com

ধর্মীয় বিশ্বাস মতে লক্ষ্মী হচ্ছে ধন-দৌলত বা ভাগ্যের দেবী। ঘরের চুলাতে রান্না করা হয় বলেই দৌলত বা বরকত ওখানে আসে। সে কারণেই গৃহস্থের বাড়িতে রাতের বেলায় কথিত লক্ষ্মী মা তার দু'হাত ভরে দৌলত নিয়ে আসে। এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের মহিলারা ছাড়াও মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তা ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো সনাতন ধর্মাবলম্বীর মতে লক্ষ্মীমার আদলে রাতের বেলায় অন্নপূর্ণা দেবী ঘরে আসে। সে কারণে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ঘরের চুলার পেছনের অংশ পরিষ্কার করে রাখে।"[৮]

## চাঁদরে গান্ধা ধৈরলে গর্ভিতা বউয়েরা কিছু খাই ন পারে

'চাঁদরে গান্ধা ধৈরলে গর্ভিতা বউয়েরা কিছু খাই ন পারে' বা 'চন্দ্রগ্রহণের কালে গর্ভবতী নারীদের কিছু খেতে নেই।' চন্দ্রগ্রহণকে স্থানীয় ভাষায় 'চাঁদরে গান্ধা' ধরা বলা হয়। চন্দ্রগ্রহণকালে গর্ভবতি মহিলাদের কিছু খাওয়া, দা বা ছুরি দিয়ে কিছু কাটাছিরা করা বা শুয়ে থাকা শিশুর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনমনে দৃঢ় বিশ্বাস চন্দ্রগ্রহণকালে দা বা ছুরি দিয়ে কিছু কাটাছিরা করলে গর্ভস্থ শিশুর হাত-পা বা অন্য কোথাও কাটা যায়। একই সময়ে গর্ভবতি মহিলা শুয়ে থাকলে বা বসে থাকলেও গর্ভস্থ শিশু বিকলাঙ্গ, পঙ্গু বা শরীরের অন্য কোনো ক্ষতি হয়। ফলে গর্ভবতি মহিলারা চন্দ্র গ্রহণকালে কিছু কাটাছিরা করে না। এমনকি বসে বা শুয়ে থাকে না।"[৯]

## রাখাইনসমাজে লোকসংস্কার

রাখাইনসমাজে স্মরণাতীত কাল থেকেই শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল বোধ প্রচলিত আছে। সাধারণ পূর্ণিমা ও আমাবস্যার পরের দিন যাত্রা বা কোনো কাজ সূচনা করে না। রাখাইন পঞ্জিকার নির্দেশনা মোতাবেক মসে নির্দিষ্ট বারে (প্রা-ছা-ধা) যাত্রা ও শুভ কাজ সূচনা করে না, পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট বারে (রাৎ-রাজা) যাত্রা ও শুভকাজ সূচনা করে। বৃহস্পতিবারকে ভালো দিন মনে করা হয়। শনিবারে যাত্রা অশুভ বলে ধরে নেয়া হয়। বৃহস্পতিবারে দক্ষিণ দিকে এবং মংগল ও বুধবারে উত্তর দিকে ভ্রমণ করে না। যাত্রাপথে সাপ পড়লে আর যাত্রা করে না। যাত্রাকালে হোঁচট খেলে সে যাত্রা অশুভ হয়। আকাশে অপ্রত্যাশিতভাবে তারকাপুঞ্জ বা ধুমকেতু জাতীয় কিছু দেখা দিলে দেশে অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা থাকে বলে মনে করা হয়। পাখির কলরব অতিথি আগমণের লক্ষণ বলে ধরে নেয়া হয়। অস্বাভাবিক কর্কশ ডাক অশুভ। খাবার সময় জিহ্বায় হঠাৎ দাঁড় কামড় পড়লে প্রিয়জন স্মরণ করছে বলে মনে করা হয়। চোখের উপরিভাগ নাড়াচাড়া করলে শুভ লক্ষণ ও নিম্নভাগ নাড়াচাড়া করলে অশুভ লক্ষণ বলে ধরে নেয়া হয়। জন্মবারে কেউ চুল ছাঁটাই করে না, রাতে আয়না দেখে না এবং চুল আঁচড়ায় না। স্ত্রীর বড় বোন থেকে স্বামী, হাতে হাতে কোনো জিনিস গ্রহণ করে না এবং সাধারণত পরস্পর কথাও বলে না। মহিলাদের পোশাক সামগ্রীর নিচ দিয়ে এবং সিঁড়ির নিচ দিয়ে পুরুষেরা গমন করে না। নতুন বাড়িঘর নির্মাণের সময় স্থাপিত প্রথম খুঁটির সাথে আমপাতা, জামপাতা ইত্যাদি ঝুলিয়ে দেয়া হয়। কুনজর এড়ানোর জন্য ফসলী গাছের সাথে পুরনো জুতা, গরু-মহিষের শিং ঝুলিয়ে রাখে।

রাখাইনদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস যে, বিয়ে শাদীসহ অপরাপর ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের পূর্বে গৃহদেবতাকে অবশ্যই পূজা করতে হয়। নচেৎ পরবর্তীতে

www.pathagar.com

কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে। আধুনিক রাখাইনগণ বিশ্বাস করুক বা না করুক প্রথাটি ঘরে ঘরে বছরে ন্যূনতম একবার পালিত হয়। পরিচ্ছন্ন নির্ভেজাল মিষ্টান্ন জাতীয় আহার তৈরি করে গৃহদেবতাকে পূজা করার জন্য সমাজে গুটিকয়েক মহিলা আছে যাঁরা রাখাইন ভাষায় 'নেৎ-কাং-মা' নামে পিরিচিত (নেৎ অর্থ দেবতা, কং অর্থ ভালো আর মা অর্থ মহিলা)। কেবল উক্ত মহিলাদেকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে গৃহ দেবতা অর্চনা সম্পাদন করা হয়। নেৎ-কং-মা কর্তৃক ধর্মীয়/সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পূর্বে বোধিবৃক্ষ ও অশত্থ বৃক্ষ পূজা করার প্রথাও এখনো প্রচলিত আছে। নেৎ-কং-মা'রা যেমন অনর্গল কথা বলতে, গণনা করতে পারদর্শী। নাচতেও তারা সমান পারদর্শী। রাখাইন সম্প্রদায়ের যে-কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্টান, উৎসব-পার্বণে এদের চাহিদা লক্ষ করা যায়।"[১০]

## তথ্যনির্দেশ

১. দিলদার বেগম (সম্প্রতি প্রয়াত), স্বামী : মমতাজ উদ্দিন আহমদ, গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাক, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার, জেলা : কক্সবাজার, তরিখ : ১১-১১-২০১১, সময় : সকাল : সকাল ১০টা।
২. জাহানারা বেগম, পিতা : সুলতান আহমদ, মাতা : আলতাজ বেগম, বয়স : ৫৬ বছর, গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাক, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৫-০৯-২০১২, সময় : সকাল-১০টা।
৩. ছমুদা বেগম, স্বামী : মোহাম্মদ আলী, বয়স : ৬৫ বছর, গ্রাম : পালাকাটা, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২৮-০৬-২০১২, সময় : সকাল ১০টা।
৪. ডা. কবির আহমদ হোমিওপ্যাথ, পিতা : আবদুর রশিদ, বয়স : ৮৪ বছর, টেকপাড়া, পৌরএলাকা, কক্সবাজার, তারিখ : ২২-০৯-২০১৩, সময় : সকাল : ১০টা।
৫. সিরাজুল হক, পিতা : শাহাব মিয়া, মাতা : নীলা খাতুন, বয়স : ৬৩ বছর, গ্রাম : উয়ালাপালং ঘিলাতলী, ইউনিয়ন : রাজাপালং, উপজেলা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার। তারিখ : ০১-১০-২০১১, সময়- সকাল সাড়ে ৯টা।
৬. কবি রুহুল কাদের বাবুল, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, কালারমারছড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা : মহেশখালি, জেলা : কক্সবাজার, বয়স : ৫৮ বছর, তারিখ : ২১০৩-২০১৩, সময় : বিকাল : ৫টা।
৭. তাহফীমুল কুরআন, মূল : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র., অনুবাদ : মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ১৬তম খণ্ড : ১৬তম প্রকাশ, মে ২০১২, সূরা আল কামার এর আয়াত নম্বর ১৮-২০ এবং ১৬ নম্বর টিকা। পৃষ্ঠা-৫০-৫১।
৮. আলতাজ বেগম, স্বামী : সুলতান আহমদ, বয়স : ৭৬ বছর, গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাক, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার। (ইনি ২০০৯ সালে ৯ অক্টোবর ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় উক্ত তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছিল)।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. বাংলাদেশের রাখাইন- ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা-মং বা অং (মং বা), প্রকাশক : লেখক, প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ। পৃষ্ঠা-১০৫-১০৬।

www.pathagar.com

# লোকপ্রযুক্তি

মানুষ নিজেদের ব্যবহারের জন্য লোকপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী তৈরি করার কৌশল অবলম্বন করেছে। গাছের মগ ডাল বা কাণ্ডের উপর টংঘর নির্মাণ থেকে শুরু করে পাহাড়ের গুহায় বসবাস করার ধারাবাহিকতায় মানুষ আজ খড়ের ঘর, বাঁশের ঘর ও কাঠের ঘর নির্মাণ করছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ নিজেদের চাহিদা এবং প্রাপ্তিকে উত্তরোত্তর উন্নত করেছে। কৃষিসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই লোকপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছে গ্রামের সাধারণ নিরক্ষর মানুষ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ তার জীবনযাপনকে সহজসাধ্য করার জন্যে, তাদের পরিবেশকে পরিবর্তিত করার জন্যে নানা কৌশল প্রয়োগ করেছে যা লোকপ্রযুক্তি হিসেবে বিবেচ্য। কৃষিক্ষেত্রে লাঙ্গলের ফাল, মই, মাছ ধরার বাঁশের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের পাশাপাশি মৃৎশিল্প আবিষ্কারেও লোকপ্রযুক্তি ক্রিয়াশীল। ধান ভানার জন্য ঢেঁকি, ডলইন (ধান মাড়াইয়ের প্রাচীনতম প্রযুক্তি), গম বা ভুট্টা ভানার জন্য যাতা তৈরি ও স্থাপন প্রযুক্তিগত দক্ষতারই পরিচায়ক।

*কক্সবাজার শহরের নাজিরার টেক এলাকায় মাছধরার জাল মেরামত করছে*

www.pathagar.com

## ১. মাছ ধরার জাল

কক্সবাজার জেলার সর্বত্র মাছ ধরার জাল চোখে পড়ে। এসব জালের মধ্যে রয়েছে ঝাকি জাল, ফাইস্যা জাল, ইলিশ জাল, বাডা জাল, টানা জাল, চাক জালসহ রকমারি জাল। কথিত জালগুলো পৃথক পৃথক মৎস্য শিকারে ব্যবহার করা হয়। জাল ছাড়াও সাগরে বড়শি দিয়েও মাছ ধরা যায়। কক্সবাজার একটি সমুদ্র-উপকূলীয় জেলা হিসেবে এখানে এই জাল বুননের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।
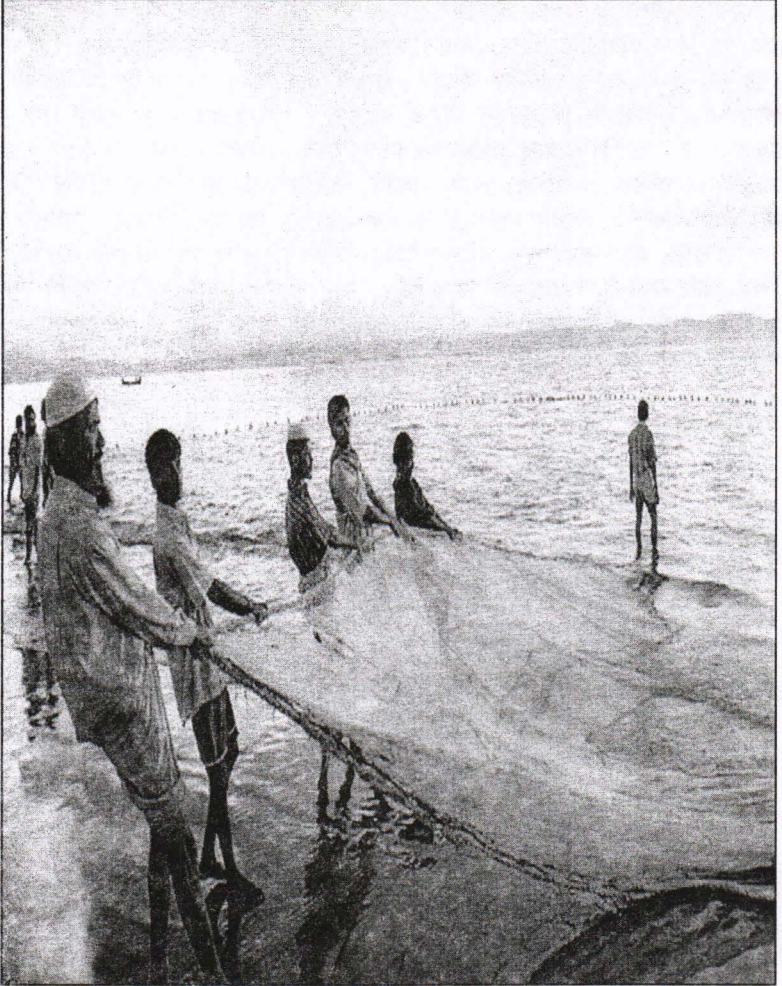
*কক্সবাজারের টেকনাফে মাছধরার জাল নিয়ে মাছ ধরছে মৎস্যজীবীরা*

www.pathagar.com

জালের প্রধান ও একমাত্র কাঁচামাল হচ্ছে সুতা। পূর্বে সুতা দিয়েই জাল তৈরি করা হতো। সুতার জাল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই মৎস্যজীবীরা ক্ষণস্থায়ী জালের পরিবর্তে বর্তমানে দীর্ঘস্থায়ী জালের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। নাইলনের জাল দীর্ঘস্থায়ী। নাইলনের জাল দীর্ঘস্থায়ী বলেই মৎস্যজীবীরা সুতার জাল ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। এই নাইলনের জালের প্রধান কাঁচামাল নাইলন সুতা বিদেশ-নির্ভরশীল। জাল বুননের কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও জড়িত। তবে নারীরা স্বল্প পরিসরের ঝাকি জাল ও বাডা জাল তৈরিতে জড়িত। গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারের জন্য মূলত ব্যবহৃত হয় ইলিশ জাল, টানা জাল, চাক জাল, বিহন্দি জাল, লাউক্যা জাল, ফাইস্যা জালের পরিমাণ বেশি বিধায় এসব জাল পুরুষেরাই তৈরি করে। জাল বুননের জন্য প্রয়োজন সুতা বা নাইলন সুতা, সীসা, চিকন রশি, সুতা আটকিয়ে রাখার জন্য তইলা ও হনি। তবে সুতার জাল বুননের আগে গাবগাছের কষ দিয়ে সুতাকে জাত করে নিতে হয়, যাতে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি বা নদীর মিষ্টি পানিতে জালে পচন না ধরে।"[১]

প্রাচীনকালে জেলে বা কৈবর্ত সম্প্রদায় সরাসরি জালের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু জেলার সর্বত্র জেলে বা কৈবর্ত সম্প্রদায় ছাড়াও প্রতিটি পরিবারে জাল ছিল। কোনো কোনো পরিবারে একাধিক জালও চোখে পড়ে। এসব জাল দিয়ে পরিবারের প্রয়োজনে মাছ শিকারের ব্যবস্থা করে। প্রাচীনকালে প্রতিটি পরিবারে ছিল পুকুর। যেখানে মাছের চাষ হতো। অন্তত বছরের খাবারের কাঁচা মাছ নিজস্ব পুকুরেই পাওয়া যেতো। যাদের নিজস্ব পুকুর ছিল তারা খাল-বিল, নদী-নালা জাল দিয়ে মাছ শিকার করতো। খাল-বিল, নদ-নদী-নালাসহ উন্মুক্ত জলাশয় ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। যে কেউ ইচ্ছে করলেই জাল ফেলে মাছ ধরতো পারতো। শুধু কি তাই? অনেকেই খাল-বিল, নদ-নদী-নালা, উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের উপর পরিবারের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। গরীব ও দরিদ্র পরিবারের লোকজন উন্মুক্ত জলাশয় থেকে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাতো। তবে বর্তমানে বঙ্গোপসাগর ছাড়া কোনো উন্মুক্ত জলাশয় নাই বললেই চলে। এসব কারণেই জেলার প্রতিটি পরিবারে হাত জাল বা ঝাকি জাল থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে বর্তমানে হাতজাল বা ঝাকি জালের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। তাছাড়া একটি হাতজাল বা ঝাকিজালের মূল্যও অনেক বেশি।

মাছধরার জাল নিয়েও স্থানীয়ভাবে রয়েছে অনেক লোকধাঁধা। তৎমধ্যে উল্লেখ করতে হয় যে,

"ঝুম ঝুম পরে আধার খায়
নিজে ন খায় পররে খাবায়।" উত্তর : জাল।"[২]

## ২. মাছ ধরার চাঁই, পলো, টেঁটা, ডউক বা বেঙ চাঁই

মাছ ধরার সনাতনী পদ্ধতি হচ্ছে হাতজাল বা ঝাকিজাল। তার পাশাপাশি রয়েছে চাঁই, পলো, টেঁটা, লুই, ডউক বা বেঙ চাঁই, ছেল বা বর্শা। তবে চাঁই ও ডউকে করেই কম

www.pathagar.com

সময়ে বেশি মাছ ধরা সম্ভব। অন্য পদ্ধতিগুলো দিয়ে কম সময়ে বেশি মাছ ধরা সম্ভব নয়। বর্শা দিয়ে একদফে একটির বেশি মাছ শিকার করা যায় না। টেঁটা দিয়েও তাই। টেঁটা ও বর্শা বাঁশ বা লোহা দিয়ে তৈরি করা যায়।

*কক্সবাজারের রামু উপজেলার পাহাড়ি এলাকা দারিয়ারদীঘিতে মাছধরার চাই তৈরি করছে।*

www.pathagar.com

কক্সবাজারের রামু উপজেলার পাহাড়ি এলাকা দারিয়ারদীঘিতে মাছধরার চাই তৈরি করছে।

www.pathagar.com
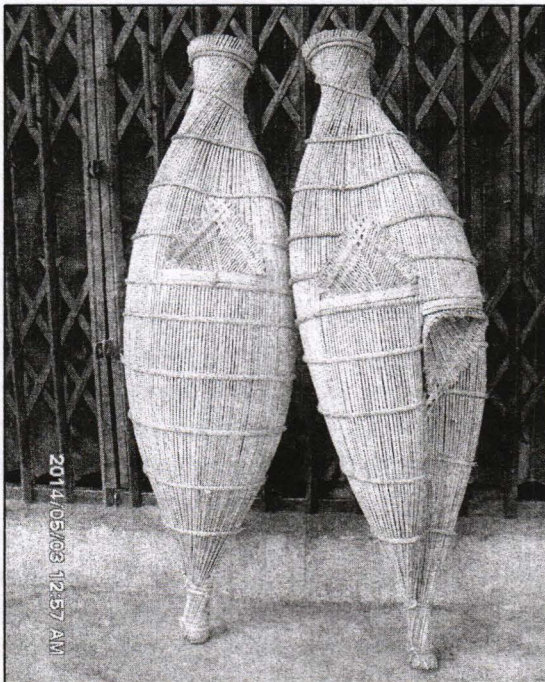
বাঁশের অগ্রভাগ ধারালো দা দিয়ে তেরছি করে কেটে সুঁচালো করে তৈরি করা যায় বাঁশের ছেল বা বর্শা। অনুরূপভাবে টেঁটাও তৈরি করা যায়। এসব প্রযুক্তি দিয়ে প্রাচীনকালে মানুষ জলাভূমি থেকে মাছ ধরতো। বাঁশ ছাড়াও লোহার বর্শা ও টেঁটা তৈরি করা হয়। লোহার বর্শা, টেঁটা বাঁশের বর্শা ও টেঁটার ছেয়ে বেশি স্থায়ী ও অব্যর্থ। অব্যর্থ এ কারণে যে, লোহার ওজনের কারণে মাছকে টার্গেট করে বিঁধতে পারলে লোহার ওজনের কারণেও মাছ আর পালাতে পারে না। আবার লোহার টেঁটা তৈরি করে বাঁশ বা ছোট কাঠের কঞ্চির অগ্রভাগে সুতা বা রশি বা চিকন তার দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ব্যবহার করা হয়।

বাঁশ ও বেত নিয়ে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করতে যে সমস্ত সহায়ক হাতিয়ার ব্যবহার হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে দা, প্রয়োজনমত চিকন তার যা স্থানীয়ভাবে ২৪তার নামে খ্যাত এবং লোহার সুঁচালো রড বা বহর (ছিদ্র করার কাজে ব্যবহার করা হয়)। তবে চিকন তারের পরিবর্তে বেত ব্যবহারে প্রতিটি পণ্য বেশি মজবুত হয়। অবশ্যি সাম্প্রতিক সময়ে বেতের পরিবর্তে প্লাস্টিক বা নাইলনের সুতা ব্যবহার করা হয়।

জলাভূমি থেকে মাছ ধরার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে চাঁই। আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত সময়ে ধানখেতে প্রচুর পরিমাণের দেশিয় মিঠাপানির মাছ পাওয়া যেতো। এসব মাছ ধরার জন্য মাঠের আইলে (আল) বসানো হতো 'চাঁই' (মাছ ধরার এক প্রকারের আঁধার)। আষাঢ় মাসের শুরুতে জেলার প্রতিটি হাটে একাধিক 'চাঁই' বিক্রি হতে দেখা যেতো। কিন্তু বর্তমানে ধানখেতে মিঠাপানির মাছের তীব্র সংকটের কারণে 'চাঁই'-এর ব্যবহারও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এই 'চাঁই'-এর মধ্যে থাকে দুটি 'পতর' (চাই-এর ভেতরে মাছ ঢোকার পকেট)। ফলে 'চাঁই'-এর পকেট নিয়েও স্থানীয়ভাবে প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। যেমন-'দুই পতরি চাই, আইতেও বাজে যাইতেও বাজে (আসতেও মাছ আটকায় আবার যেতেও আটকায়)'। বর্ষার সময় ধানখেতের পানি আটকিয়ে 'চাঁই' বসানো হয়। এসময় পানি স্রোতের সাথে মাছ চলাচল করার সময় 'পতর' (পকেট)-এর ভেতরে ঢুকে পড়ে, যেখান থেকে আর বের হতে পারে না। আবার মাছের স্বভাব নিয়ম অনুযায়ী পানির স্রোতের উল্টো দিকে চলতে চেষ্টা করে। পানির স্রোতের উল্টো দিকে চলতে গিয়ে 'চাঁই'-এর নিচের পকেটের মাধ্যমে ভেতরে চালান হয়ে যায়। তাই বলা হয় "'চাই'-এ আসতেও বাজে যাইতেও বাজে"।

বাঁশের সামগ্রী তৈরি করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে, যে সামগ্রী তৈরি করা হবে তার জন্য প্রয়োজনমতো বাঁশ বাছাই করা। যে-কোনো কিছু তৈরি করার জন্য পাকা তথা Mature বাঁশ নিতে হবে। বাঁশ কাঁচা বা অপরিপক্ক হলে তাতে পোকায় আক্রমণ করে। এতে করে উক্ত সামগ্রী দীর্ঘস্থায়ী হয় না। চাঁই তৈরির জন্য নির্দিষ্ট সাইজ অনুসারে বাঁশ কেটে খণ্ড খণ্ড করে নিতে হবে। তবে চাঁই তৈরির একমাত্র আদর্শ বাঁশ হচ্ছে 'পায়া বাঁশ বা মুলি বাঁশ'। কেটে নেয়া বাঁশ ফালা ফালা করে চিরে নিয়ে গিরাগুলো দা দিয়ে ছেটে নিতে হবে। একই সাথে বাঁশের শলাকাগুলো দা দিয়ে মসৃণ করে নিতে হবে যাতে চাঁই বানানোর সময় হাত কাটা না

www.pathagar.com

যায়। কারণ বাঁশের নীল অংশে একটু জোরে চাপ পড়লে হাত কাটা যায়। 'চাঁই' বানাতে কাইমের শলাকাকে লম্বা করে মিহি তথা মসৃণ করে নিতে হবে। কাইমের শলাকাকে মসৃণ করতে দা দিয়ে কাইমের ধারগুলো ফেলে দিতে হয়। চাঁই বানাতে বাঁশের শলাকা ছাড়াও প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণের বেত। পূর্বেই কয়েকটি পরিপক্ক বেত ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। ভালোভাবে শুকানোর পরে ফালা ফালা করে কেটে চিকন চিকন করে নিতে হবে যা দেখতে অনেকটা চিকন ২৪ তারের মতো দেখায়। প্রতিটি চাঁই লম্বায় প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার ফুট লম্বা হয়ে থাকে। 'চাঁই'-এর ফ্রেমে বাঁধার জন্য প্রয়োজন এক প্রকার পাহাড়ি লতা। যাকে স্থানীয়ভাবে 'গুইচ্যা লতা' বলা হয়। মোদ্দাকথায় বলা যায়, চাঁই বানাতে প্রয়োজন মুলি বাঁশ, গুইচ্যা লতা ও কেজনি বেত বা প্লাস্টিকের তার। 'কেজনি বেত' স্থানীয় পাহাড় থেকে সংগ্রহ করা হয়। এসব কেজনি বেত বাজারেও কিনতে পাওয়া যায়। 'চাঁই' বানানোর প্রাথমিক উপকরণসমূহ তৈরি হওয়ার পরে বানানো শুরু করতে প্রথমে প্রতিটি শলাকা গাঁথতে হয়। শলাকাগুলো গাঁথার জন্য একমাত্র গুইচ্যা লতার উপরই নির্ভর করতে হয়। গুইচ্যা লতা ছাড়া অন্যকোনো বেত বা বাঁশের উপর নির্ভর করা যাবে না। ১২ থেকে ১৫ ফুট লম্বা একটি গুইচ্যা লতা দিয়ে চাঁই তৈরি করে নিতে হবে। গুইচ্যা লতার স্থলে বাঁশের শলাকা ব্যবহার করলে তা সহজেই পোকায় আক্রমণ করে, এতে অল্প সময়ের মধ্যেই চাঁই নষ্ট হয়ে যায়। গুইচ্যালতা বাইরে রেখে পূর্বে তৈরি করে রাখা বাঁশের শলাকাগুলো প্লাস্টিকের তার দিয়ে একটার পর একটা শলাকা বাঁধতে হবে। 'চাঁই'-এর মধ্যখানে প্রায় তিন থেকে থেকে সাড়ে তিন ফুট ব্যাসের হয়ে থাকে। 'চাই' বানানোর পদ্ধতি হচ্ছে- বাঁশের শলাকাগুলো গুইচ্যা লতার ভেতরে রেখে একটির সাথে আরেকটি শলাকা প্লাস্টিকের তার দিয়ে বাঁধতে হবে। বলা যেতে পারে গাঁথতে হবে। এমনভাবে, যেভাবে মালা গাঁথা হয়। গুইচ্যা লতার ভেতরে বাঁশের শলাকাগুলো গাঁথতেই থাকবে। শিল্পী এভাবে বাঁশের শলাকাগুলো গাঁথতে থাকবে আর গুইচ্যা লতা চারপাশে সাপের মতো পরম আদরে পেঁচিয়ে থাকবে। গুইচ্যা লতা বাঁশের শলাকার চারপাশে এভাবে পেঁচাতে পেঁচাতে নিচে লেজের মধ্যে চলে যাবে। এরপরে শিল্পী গুইচ্যা লতা পেটের ওখান থেকে গাঁথতে গাঁথতে মুখে চলে যাবে। গুইচ্যা লতা চাঁইয়ের মুখ থেকে শুরু করে পেঁচাতে পেঁচাতে লেজের মধ্যে গিয়ে শেষ হবে। গাঁথা শেষ হলে দেখা যাবে এক পর্যায়ে গোল জাতীয় একটি সসারের মতো জিনিস তৈরি হয়ে গেলো। 'চাঁই'-এর শেষ প্রান্ত তথা লেজে গিয়ে বাঁশের শলাকাগুলো শক্ত করে বেঁধে নিতে হয়ে একই সাথে শলাকাগুলোর মধ্যখানে একটি দুই থেকে তিন ইঞ্চি ব্যাসের চিকন, শক্ত ও সোজা কঞ্চি ঢুকিয়ে দিতে হবে। উক্ত কঞ্চি ঢুকিয়ে দিয়েই শক্ত করে বাঁধতে হবে যাতে তা খুলে না যায়। 'চাঁই'-এর উপরের দিকে মুখ রাখতে হবে যাতে মাছ বের করা যায়। 'চাঁই'-এর মধ্যখানে যেখানের অংশ সবচেয়ে বেশি মোটা সেখানে উপরের দিকে মুখ করে একটি পতর বা পকেট আর তার পাশে নিচের দিকে মুখ করে আরেকটি পতর বা পকেট ঢুকাতে হবে। উপরে-নিচে দুই দিকের 'পতর' লাগাবার স্থান চিহ্নিত করে পরিমাণ

www.pathagar.com

মতো ধারালো দা বা ছুরি দিয়ে কাটতে হবে। তার আগে পাতলা বাঁশের কাইম দিয়ে দুটি পতর বা পকেট তৈরি করে নিতে হবে। 'পতর' দুইটি তৈরি করার পরে তা চাঁইয়ের পেটে কাটা অংশে ঢুকিয়ে দিতে হয়। 'পতর' এভাবে তৈরি করতে হয় যাতে মাছ ভেতরে ঢুকে পড়লে পরে বের হতে না পারে। অর্থাৎ 'চাঁই'-এর ভেতর থেকে মাছ যাতে বের হতে না পারে সেজন্য পতরের কাইমগুলো ক্রস করেই তৈরি করতে হয়। এর মাধ্যমে একটি 'চাঁই' বানানো হয়ে গেলো। পূর্বেই বলেছি, পাহাড়ি কেজনি বেতের সাহায্যে গুইচ্যা লতার সাথে বাঁশের শলাকাগুলো বাঁধা হয়। কিন্তু বর্তমানে বেতের পরিবর্তে বাজার থেকে নাইলনের সুতা বা প্লাস্টিকের তার দিয়ে বাঁধা হয়। বর্তমানে পাহাড়ে বেতের যেমন সংকট দেখা দিয়েছে, তেমনি ভাবে নাইলন বা প্লাস্টিকের তারের চেয়ে কম টেকসই। ফলে চাঁই বুননশিল্পীরা প্লাস্টিক বা নাইলনের সুতা দিয়েই চাঁই বাঁধার ব্যবস্থা করে।"[৩]

একজন শ্রমিক একদিনে একটি 'চাঁই' বানাতে সক্ষম। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী একজন শ্রমিকের এক দিনের মজুরী ও দুইবেলা ভাত খাওয়ানোর পরে বেতন হিসেবে নগদ পাবে চারশত টাকা। আর 'চাঁই' বানাতে যে বাঁশ, বেত বা প্লাস্টিকের তারের প্রয়োজন তার মূল্য পড়ে একশত ত্রিশ টাকা। অর্থাৎ একটি 'চাই'-এর উৎপাদনমূল্য চার থেকে সাড়ে পাঁচশত টাকা মাত্র। বাজারে একটি দুই পতরের 'চাঁই' বিক্রি হয় মাত্র ছয়শত টাকা। পূর্বে জেলার প্রায় পরিবারে চাঁই দেখা যেতো। বিশেষ করে জমি ছিল, হালচাষ ছিল তো চাঁই ছিলই। এসব পরিবার বর্ষাকালে চাঁই দিয়েই নিজেদের খাবারের মাছ সংগ্রহ করতো। ফলে পরিবারে চাঁই থাকা অপরিহার্য। প্রতিটি পরিবারে নিজেদের ব্যবহারের চাঁই নিজেরাই বানিয়ে নিতো। জোতদ্দার, জমিদার ও বিত্তশালী পরিবারের চাঁই বাড়ির দিনমজুর, কামলা বা রাখাল বালকেরাই তৈরি করতো। তবে এর বাইরেও বাণিজ্যিকভাবে চাঁই বাজারে কিনতে পাওয়া যেতো। জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু কিছু পরিবার চাঁই বানাতো এবং বাজারে বিক্রি করে ঘর-সংসার চালাতো। অনুরূপ এখনও জেলার রামু উপজেলার খুনিয়াপালং ইউনিয়নের পাহাড়ি এলাকা দারিয়ারদিঘী এলাকার বড়ডেবা নামক গ্রামে মাত্র তিনটি পরিবার চাঁই তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। ব্যাপকভাবে চাঁই তৈরি না করার অন্যতম কারণ হচ্ছে, আমন মওসুম তথা চাঁই দিয়ে মাছ ধরার মওসুমে ধান খেতে মাছের আকাল।

মাছ ধরার লোকপ্রযুক্তি চাঁই নিয়েও কক্সবাজারে রয়েছে একাধিক লোকধাঁধা। যেমন-

"রাজার ঘরত্ ঘলি পারে,<br>
বাইর হই ন পারে।" উত্তর : চাঁই।"[৪]

"মরায় জিয়াতা ধরি খায়।" উত্তর : চাঁই।"[৫]

আগে মাছ ধরার জন্য চাঁই-এর পাশাপাশি 'ডউক' ব্যবহার করা হতো। ডউক তৈরি করতে চাঁই-এর ন্যায় বাঁশ ও বেতের প্রয়োজন। বর্তমানে মিষ্টিপানির মাছের আকালের কারণে এসব ডউক তৈরি করা হয় না। তবে জেলার উপকূলীয় এলাকার

www.pathagar.com

চিংড়ি প্রকল্পে মাছ ধরার জন্য মাঝে মধ্যে এসব ডউক ব্যবহার করতে দেখা যায়। চাঁই সাড়ে তিন থেকে চারফুট লম্বা হয়ে থাকে পক্ষান্তরে ডউক লম্বায় সর্বোচ্চ দুই ফুট। যাতে উপর থেকে হাত দিয়ে ভেতরের মাছ বের করা যায়। ডউকও চাঁইয়ের মতো বাঁশের শলা দিয়ে রশি বা নাইলনের সুতা বা রশি দিয়ে বেঁধে বানাতে হয়। চাঁইয়ে উপরে নিচে দুইটি পতর বা পকেট থাকে কিন্তু ডউকে পকেট থাকে একটি। যা লম্বায় ডউকের সমান। পানি স্রোত নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ার সময় ডউকের মুখ দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে আর যায় কোথায়? পানির সাথে নিচের দিকে নামতে থাকা মাছগুলো ডউকের ভেতরে আটকে পড়ে। ডউকের নিচে রয়েছে একটি তলানি। তলানিটা ডউকের প্রধান অংশের সাথে শক্ত করে আটকানো থাকে। কিন্তু উপরের ঢাকনাটা খোলা-বাঁধার ব্যবস্থা রয়েছে। উপরের ডাকনা খুলে মাছ নেওয়া হয়। মাছ নেওয়ার পরেই তা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে মাছগুলো লাফিয়ে ডউকের ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে। ডউককে স্থানীয়ভাবে বেঙ চাঁইও বলা হয়।

সনাতন পদ্ধতিতে 'পলো' দিয়ে মাছ ধরা হতো। কিন্তু বর্তমানেও কোনো কোনো অঞ্চলে 'পলো' দিয়ে মাছ ধরা হয়। আগাম বর্ষা বা বৃষ্টি নামলে মাছ পানির স্রোতের উজানে চলতে থাকে, যাকে স্থানীয়ভাবে উজানী মাছ বলা হয়। এসব উজানী মাছ ধরার জন্যই এলাকায় এসব পলো ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে এসব প্রযুক্তি কদাচ চোখে পড়ে।

'পলো' তৈরি করতে প্রয়োজন পরিপক্ক বাঁশ, বেত ও প্লাস্টিকের তার বা সুতা। মোদ্দা কথা একটি পূর্ণাঙ্গ চাঁই বানানোর পরে মধ্যখানে কেটে দুই টুকরো করার পরেই একটি পলো হয়ে যায়। চাঁই কেটে ফেলার পরে তার উপরের অংশ তথা যে অংশে চাঁইয়ের মুখ আছে সেই অংশকেই 'পলো' করা হয়। চাঁইয়ে যেরকম মধ্যখানে পতর বা পকেট থাকে পলতে সে-রকম পকেট থাকে না। অথবা একটি পূর্ণাঙ্গ চাঁই কাটার পরে তার নিচের অংশ নিয়েও এই 'পলো' তৈরি করা যায়। চাঁইয়ের নিচের অংশের বাঁধটি খুলে দিয়ে ওখানে একটি মুখ বানিয়ে নিলেই পলো হয়ে যায়। তবে কর্তিত অংশে বেতি বা নাইলনের তার দিয়ে শক্ত করে মুখটি বেঁধে নিতে হবে। চলন্ত পানিতে বা বদ্ধ পানিতে মাছ দেখতে পেলে উপর থেকে মাছের উপর পলো ফেলে দিয়ে উপরের মুখে হাত ঢুকিয়ে মাছ ধরা হয়।"[৬]

## ৩. মাছ ধরার লুই

মাছ ধরার লুই ত্রিভুজাকৃতির হয়ে থাকে। 'লুই' তঞ্চগ্যা শব্দ। তা বর্তমানে কক্সবাজারে আঞ্চলিক শব্দ হিসেবে গ্রহণ করে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। লুই এককোণে সামান্য সরু করে বাঁকিয়ে হাত দিয়ে ধরার জন্য কিছু অংশ লম্বা করে রাখা হয়। লুই তৈরি হয় বাঁশ দিয়ে। লুই'র মোখা শক্ত করে বাঁধার জন্য প্রয়োজন কিছু বেত। বর্তমানে বেতের পরিবর্তে প্লাস্টিকের তার বা নাইলন সুতাকে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। লুইয়ের উপরের অংশ থাকে ফাঁকা। নিচের অংশ বেতি দিয়ে তৈরি করা হয় চালুন

www.pathagar.com

বোনার মতো। বলতে গেলে চালুনের মতো তলা বুনে পরে লুই হিসেবে তৈরি করে দুই পাশ থেকে বাঁকিয়ে উপরের তোলা হয়। চালুন গোলাকার করে তৈরি করতে হয় আর লুই চারকোণা করে তৈরি করতে হয়। চারকোণা বিশিষ্ট করে চালুন বানানোর পরে বাঁশ বা বেতের ফ্রেম তৈরি করে তিনপাশে ফ্রেম বাঁধা হয়। বেত বা নাইলনের সুতা দিয়ে চালুনের তিন পাশ বাঁধার পরে দুটি কোণা ধরে উপরের দিকে তুলে পরস্পর আটকানো হলে লুই তৈরি হয়ে যায়। ভাঁজটা এমনভাবে করতে হয় যাতে একটি কোণার সাথে অপর কোণা লেপটে থাকে। তখন স্বাভাবিকভাবেই চালুনের ফ্রেম ছাড়া অপর প্রান্ত পরস্পরের সাথে ভাঁজ হয়ে যায়। ফ্রেম ছাড়া অংশ পরস্পরের সাথে ভাজ হয়ে গেলে ঐ প্রান্তটির দু'পাশে বাঁশের বা বেতের ফালা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। এর মাধ্যমে একটি লুই তৈরি হয়ে গেলো।"[৭]
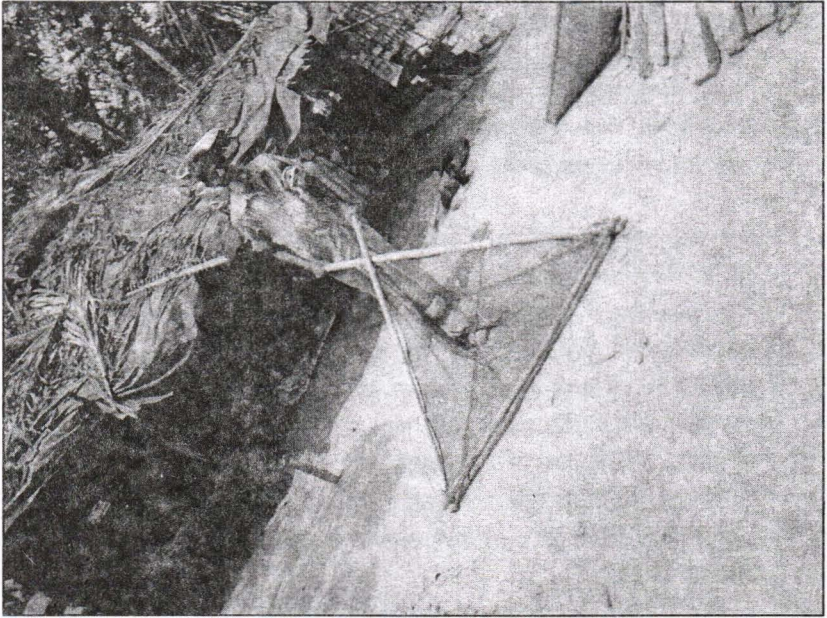
*মাছধরার লুই*

লুই দিয়ে মূলত উন্মুক্ত জলাশয়, ছোট ছোট খাল, পাহাড়ি ছরা, বিলে মাছ ধরা হয়। খাল, ছড়া বা বিলের নিচের দিকে ধাবমান মাছ ধরার জন্য লুই ব্যবহার করা হয়। লুইর নিচের কোণে মাছ পড়ে গেলে তা আর লাফিয়ে পালাতে পারে না তখন মাছটি ধরে অন্য একটি পাত্রে তথা ডোলায় রাখা হয়। লুই সাধারণত দুই ফুট, ধারার অংশ তিন থেকে সাড়ে তিন ফুটের মতো লম্বা হয়। পাহাড়ি ছরার চলন্ত পানিতে বিভিন্ন

www.pathagar.com

প্রজাতির মাছ থাকে। এসব মাছের মধ্যে বাইলা, পুঁই, পুটি, টাকি, শুল, টেংরা, চিংড়ি মাছ থাকে বেশি। পাহাড়ি ছরার নুড়ি পাথরের নিচে পুঁইমাছ লুকিয়ে থাকে। এসব মাছ লুই দিয়ে ধরা হয়। এসব নুড়ি পাথরের নিচে লুই ঢুকিয়ে দিয়ে বালিসহ নুড়ি পাথর উপরে তুললে পানি ও বালি চুইয়ে পড়ে যায়। তখন পুঁইমাছগুলো নুড়ি পাথরের মধ্যে লাফালাফি করতে থাকে। পাহাড়ি জনপদে ছরা, নালা বা পাহাড়ি ঝর্নায় লুই দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য এখনো চোখে পড়ে। কিন্তু জেলার অন্যত্র লুইয়ের ব্যবহার ক্রমে কমে যাচ্ছে। তবে আমন ধান উঠে যাওয়ার পরে বা বোরো ধান উঠে যাওয়ার পরে জমিতে পানি থাকলে গ্রামের ছেলে-বুড়ো একসাথে লুই নিয়ে মাছ ধরতে যায়। আবার কোথাও খাঁড়ি সেচে মাছ ধরার সময় লুই ব্যবহার করা হয়।

কক্সবাজারে লুই নিয়েও রয়েছে আঞ্চলিক ছড়া। যেমন-

"তিন কোণা মধ্যম গাতা
দুই আড়ুয়ে মাইল্লাম যাতা
জরজরাইয়া পইল্ল পানি
হাতদি চা গইল্লেনি।" উত্তর : লুই বা ফেঙ্গি জাল। (লুই তঞ্চগ্যা শব্দ। এটি কক্সবাজারের আঞ্চলিক শব্দের সাথে মিশে স্থানীয় শব্দে রূপ নিয়েছে। লুই দিয়ে মাছ ধরার কাজ করা হয়।)"[৮]

এরকম আরো অনেক লোকধাঁধাসহ বিভিন্ন লোকছড়া, প্রবাদ-প্রবচন বা লোকজ উপাদান পাওয়া যাবে।

## ৪. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ

সাধারণ মানুষের তৈরি দেশীয় বা লোকজ পদ্ধতিতে সরষে, তিলসহ বিভিন্ন তৈলাক্ত বীচি থেকে তেল বের করার জন্য গাছের যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে ঘানি বা ঘানিগাছ বলা হয়। এই যন্ত্রের নামই হচ্ছে ঘানি– যা কাঠ দিয়ে তৈরি করতে হয়।
ঘানি থেকে সরিষা ভাঙানোর সময় ঘানির গর্তে সরিষা রাখতে হয়। তারপর সরিষা ভাঙিয়ে তেল তৈরির জন্যে প্রয়োজন কাঠের তক্তা এবং তক্তার উপর ভারি পাথর বা কাঠের টুকরা, ঘানি টানার জন্য চোখ বাঁধা অবস্থায় একটি গরু এবং এ কাজের জন্য দুজন কলু। ঘানি থেকে তেল উৎপন্ন হয়ে নিচের দিকে গড়ায়। তেল বা রাখার জন্যে প্রয়োজন হয় যে-কোনো পাত্র।

## ৫. কাপড় বোনার তাঁত

সাধারণ মানুষেরই তৈরি তাঁত। কাপড় বোনার জন্যে একটি তাঁত তৈরিতে প্রয়োজন কাঠের বিম, বাঁশের মালশি, বাঁশের সুতা কাটনি, সানা বাঁশের চিরুনির মতো শলা, খিলি, ডাণ্ডি, মাকু সামা, বোয়া প্রভৃতি।

তাঁতের নিচ থেকে হাঁটু সমান গর্ত থাকে। পায়ের চাপে সরু তল বা পাওয়ার (বাঁশের সরু নল দুই পায়ের নিচে দুটি থাকে, পায়ের চাপে নড়ে) ওঠা-নামা করে। মাকুতে থাকে সুতা প্যাঁচানোর 'নলী'। হাতে মাকু চালিয়ে কাপড় বোনা হয়। তাঁতে কাপড় বুনার আগে আরও কয়েকটি ধাপে কাজ করতে হয়।

www.pathagar.com

জেলার মহেশখালি উপজেলার পৌরএলাকার রাখাইনপাড়া, কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদণ্ডি, রামু উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের পানেরছড়া ও চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের রাখাইনপাড়ায় এখনও লোকপ্রযুক্তির তাঁত রয়েছে। এখানকার তাঁতীরা তাঁত শিল্পকে উপপেশা হিসেবে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাঁত কমে যাচ্ছে।"[৯]

## ৬. জাঁতি বা ছরতা

যাতা যাকে স্থানীয়ভাবে ছুরাতা বলা হয়। লোহার ব্যবহার যখন থেকে এসেছে যাতার ব্যবহারও তখন থেকে এসেছে। মানুষ প্রয়োজনে যাতার ব্যবহার শিখে নিয়েছে এবং প্রয়োজনে যাতা তৈরির কৌশল শিখে নিয়েছে। গ্রন্থের লোকপেশাজীবী গ্রুপের কামার অংশে লোহার আবিষ্কার ও তার ব্যবহারের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন মজিদের উদ্ধৃতি সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে এখানে সে ব্যাপারে আর আলোচনার অবকাশ নেই। তবে যাতা বা ছুরাতার নির্মাণকৌশল খুবই সহজ এবং অল্প সময়েই তা তৈরি করা সম্ভব। এর উপকরণ লোহা ও লোহা পুড়ানোর জন্যে হাপরের তৈরি কয়লার আগুন এবং গরম লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে ছুরাতার আকৃতি দানের জন্য প্রয়োজন হাতুড়ি, চিমটা, ধারালো করার জন্য দরকার শান দেয়া, ছিদ্র করার জন্য প্রয়োজন হাতুড়ি ও ছিদ্র করার উপকরণ।

*স্থানীয়ভাবে তৈরি ছরাতায় সুপারি কাটছেন এক মহিলা*

www.pathagar.com

*কক্সবাজারের রামুতে একজন কামারের তার তৈরি একটি ছুরাতা*

ছুরাতা তৈরির জন্যে অল্প পরিমাণ চিকন লোহা প্রথমে প্রয়োজনমতো তাপের আগুনে পুড়াতে হয়। আগুনে পোড়ানোর পরে অপর একটি লোহার উপর তুলে পিটিয়ে পিটিয়ে ছুরাতা তৈরির জন্য নির্দিষ্ট লোহাকে কিছুটা চ্যাপটা করে দুটি শলাকা ও একটি পাত তৈরি করতে হয়। পাতটি পুড়িয়ে পিটিয়ে মাঝখানে বাঁকিয়ে এমনভাবে অর্ধবৃত্তাকার করা হয় যাতে মাঝখানের ফাঁক দিয়ে চ্যাপটানো ধারালো পাত প্রবেশ করানো যায়। এ অবস্থায় অর্ধবৃত্তাকার পাতটির নিচের দুটি পৃথক প্রান্ত একটি শলাকার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই শলাকাটি মূলত ধারালো পাতের নিচে থাকে। ধারালো ও চ্যাপটানো পাতটি অপর একটি শলাকার অগ্রভাগে যুক্ত করা হয়। ধারযুক্ত চ্যাপটানো পাত অর্ধবৃত্তকার দুটি পাতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিচের শলাকার অগ্রভাগের অংশের সঙ্গে পেরেক বা তারকাঁটার সাহায্যে আটকালে ছুরাতা তৈরি হয়ে গেলো। নিচের শলাকা ও উপরের ধারালো পতের মাঝখানে সুপারি রেখে শলাকা দুটির পেছনভাগে চাপ দিলে সুপারি কেটে দুই টুকরো হয়ে যায়।"[১০]

এই ছুরাতা নিয়েও কক্সবাজার অঞ্চলে রয়েছে লোকধাঁধা। যেমন-

"কুয়াত পরি, গু হাতা।"
উত্তর : ছুরাতা; যাতা।"[১১]
"দুই রান চিরি, মাঝে দিলাম ভরি
টিপ দিলে কাজ হয়,
টিপ ন দিলে কাজ ন-অয়।"
উত্তর : যাতা, ছরাতা।"[১২]

www.pathagar.com

## ৭. হুঁকা

হুঁকাকে স্থানীয়ভাবে হুক্কা বা ফুক্কা বলা হয়। কক্সবাজার অঞ্চলে কয়েক প্রকারের হুঁকা দেখা যায়। তারমধ্যে ডাবা, মাটির হুঁকা ও লম্বা নলযুক্ত পিতলের তৈরি আলিশান হুঁকা যাকে স্থানীয়ভাবে 'গুরগুরি' বলা হয়। লম্বা রাবারের নলযুক্ত হুঁকায় অনেক দূরে বসেও ধূমপান করা যায়। বিশেষ করে জমিদার, জোতদার, প্রভাবশালী কৃষকের বাড়িতে এবং প্রাচীনকালে রাজা-রাজড়ারা এই নলযুক্ত হুঁকা ব্যবহার করতো।

হুঁকা সাধারণত গ্রামীণ জনজীবনে ধূমপানের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এর ব্যবহার অনেক কমে গেছে। গ্রামের কিছু অস্বচ্ছল ও দরিদ্র পরিবারে হুঁকার ব্যবহার দেখা যায় মাত্র। ধূমপান ছাড়াও হুঁকার ব্যবহার রয়েছে লোকাচারে। 'ডাবা হুঁকা' সাধারণত ছুতারেরাই তৈরি করে। তবে মাটির হুঁকা তৈরি করে কুমারেরা। মাটির হুঁকার সাথে যুক্ত থাকে বাঁশের নল, মাটির কলকি। আর পিতলের হুঁকা তৈরি করে কাটারিরা। তবে এই পিতলের নলযুক্ত হুঁকা স্থানীয়ভাবে তৈরি করা হয় না। কাটারিরাই এসব হুঁকা তৈরি করে।

বর্ষা মওসুমে কক্সবাজারের প্রতিটি মাঠে ডাবা ও বেনা (আগুন ধরিয়ে রাখার খড়ের গাদা) দেখা যায়। কৃষক, দিনমজুর, কামলারা বর্ষাকালে আমন ধানের মাঠ প্রস্তুত করা, ধানের বীজতলা প্রস্তুত করা, আমন ধানের চারা রোপন করার সময় এই ডাবা সাথেই রাখে। ভারি বৃষ্টি হলেও যাতে আগুন নিভিয়ে না যায় সে জন্যই খড় তৈরি বিশেষ ধরনের বেনা তৈরি করে আগুনকে জিইয়ে রাখে। মহিলাদের মাথার চুলে যে 'বেণী' বাঁধে শুকনো খড় দিয়েও অনুরূপ তৈরি করা খড়ের গাদাকে স্থানীয়ভাবে 'বেনা' বলে। নারীদের মাথার চুলের 'বেণী' স্ত্রী লিঙ্গ, আর খড়ের গাদাকে পুংলিঙ্গবৎ 'বেনা' বলে কিনা জানা যায়নি।

ডাবা তৈরির জন্য প্রয়োজন নারিকেলের-খোল ও কাঠ বা বাঁশের নল, কুমারের তৈরি মাটির কলকে। অপর দিকে মাটির হুঁকা তৈরিতে প্রয়োজন মাটি, বাঁশ বা কাঠের নল।

ডাবা তৈরি করতে প্রথমে একটি নারিকেলের মালা বা খোল নিতে হবে। পাকা নারিকেল বা ঝুনা নারিকেলের ভেতরের পানি ও শাঁস বের করে নিয়ে মালা বা খোলটিকে কয়েকদিন ভালো করে রোদে শুকাতে হবে। নারিকেলের মুখের দিকে একটি ছিদ্র থাকে দেখতে অনেকটা মানুষের চোখের মতো। অনেকেই ওটাকে নারিকেলের চোখ বলে। নারিকেলের চোখের ওখানে ছিদ্র করে পানি ও শাঁস বের করতে হয়। নারিকেলের চোখটি তুলে ফেললে ছিদ্র হয়ে যাবে। ছিদ্রটাকে গোলাকৃতি করে একটু বড় করে কাটতে হয়। উপরের ছিদ্র থেকে সামান্য নিচে আরও একটি গোলাকার ছিদ্র করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি সরু কাঠ পরিমাণ মতো কেটে নিয়ে ভেতরে গোলাকৃতি করে ফাঁকা করতে হয়। কাঠের নলটি নারিকেলের খোলের মুখে বসিয়ে নলের উপরের অংশে কলকে বসাতে হয়। এভাবেই একটি হুঁকা তৈরি হয়ে যায়। কাঠের নলটিকে সৌন্দর্যময় ও আকর্ষণীয় করার জন্যে নকশা কাটা হয়। আবার কেউ কেউ একটি ছিদ্র করে তার মধ্যে কাঠের বা বাঁশের নল প্রতিস্থাপন করে উক্ত নলের গোড়ায় আরো একটি বাঁশের বা কাঠের নল সংযুক্ত করে দিলেই হুঁকা তৈরি হয়ে

www.pathagar.com

যায়।"[১৩] হুঁকার সাথে কৃষক, শ্রমিক, মজুর, কামলারা একাত্মতার কারণেই কবি গেয়ে উঠেন, 'পরানের হুঁকারে তোর নাম কে রাখিল ডাবা।"

ডাবা তথা হুঁকা নিয়েও কক্সবাজার অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে লোকধাঁধা। যেমন-
"ঘাট কাছে পইর দূরে
মাদার গাছতলা হুয়া গুজরে।" উত্তর : হুঁক্কা।"[১৪]

## ৮. ঢেঁকি

বাংলা সাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক প্রবাদ হচ্ছে, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বারা বা ধান ভানে।" প্রাচীনকালে কক্সবাজারের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি পরিবারে ঢেঁকি ছিল। ছোট-বড়, জোতদার-জমিদারের বাড়িতেই বিভিন্ন আকারের বা সাইজের ঢেঁকি ছিল। হয়তো কারো বাড়িতে ছিল লম্বায় বেশি, আর করো বাড়িতে ছিল লম্বায় কম। তবে ঢেঁকি ছিলই। ঢেঁকির প্রধান কাজ ধান ভানা। তবে পিঠা তৈরির জন্য ধান ভানার পাশাপাশি চাউলকে গুঁড়ো করার কাজও ছিল ঢেঁকির। ঢেঁকি ছাড়া চাউলে ভিটামিন বেশি থাকে একথা বইতেই মুদ্রিত ছিল। কিন্তু সেই আপ্তবাক্য বোধহয় এখন বাসি হয়ে গেছে?
জমিদার-জোতদারের বাড়িতে ধান ভানার ঢেঁকি, লোকপ্রযুক্তি ডলইনের জন্য পৃথক ঘর থাকতো। মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে ঢেঁকি থাকতো রান্নাঘরের একপাশে। বর্তমানে বিদ্যুৎচালিত ধানমাড়াইকল, তার আগে কেরোসিন বা ডিজেল চালিত ধান মাড়াইকলের কারণেই ঢেঁকির কদর ক্রমে কমে গেছে। ঢেঁকি আমাদের অন্যতম লোকউপাদান। ফলে ঢেঁকি তৈরিতে প্রয়োগ হয়েছে লোকপ্রযুক্তি।

ঢেঁকি তৈরির প্রধান ও একমাত্র উপকরণ কাঠ। ছুতারেরাই ঢেঁকি তৈরি করে। ঢেঁকি তৈরিতে কাঠ ছাড়া অন্য কোনো উপকরণ প্রয়োজনই হয় না। পাঁচ থেকে সাত হাত তথা সাড়ে সাত বা ১০/১১ ফুট লম্বা একটি গোলাকার কাঠ বা আয়তাকার কাঠের একটি ব্লক নিয়েই তৈরি করা হয় ঢেঁকি। লম্বা যতদূরই হোক না কেনো তাকে সমান চারভাগে ভাগ করে মাঝখানে দুই ভাগে রেখে সামনে একভাগ ও পেছনে একভাগ রাখতে হয়। সামনের ভাগে একটি ছিদ্র করে আকারে ছোট একটি কাঠের 'মসল' আটকে দিতে হয়। মসল এমনভাবে দিতে হবে যাতে ধান বা চাউল ভানার সময় মসলটি বেরিয়ে পড়তে না পারে। মসলটি উক্ত ছিদ্রে ঢুকানোর পরে মসলের উপর থেকে কাঠের পেনা দিয়ে শক্ত করে আটকাতে হবে। এতে করে ধান ভানার সময় বা চাউল গুঁড়ো করার সময় মসলটি আর বেরিয়ে পড়বে না। যে স্থানে মসল আটকানো হয় ঠিক তার নিচে মাটিতে একটি বর্গাকার কাঠের গুড়ি বসিয়ে দিতে হবে। কাঠের উক্ত গুড়িকে 'পঅল' বলা হয়। উক্ত গুড়ির কেন্দ্রস্থলে যেখানে মসল প্রতিস্থাপিত হবে সেখানে মসলের চেয়ে একটি বড়ো আকারের গর্ত খুঁড়ে দিতে হবে। উক্ত গর্তে চাউল বা ধান দিয়ে তা ভানতে হয়। অপর দিকে ঢেঁকির নিচের দিকে যেখানে পা দিয়ে ধান ভানা হয়, চাউল গুড়ো করা হয় অর্থাৎ পা-দানি ওঠা চেপ্টা করতে হয়। কাঠের চেপ্টা অংশ যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে কাঠের পাশ থেকে ছিদ্র করে আর একটি

www.pathagar.com

আকারে ছোট কাঠের লাঠি ঢুকিয়ে দিতে হবে। উক্ত ছিদ্র থেকে কাঠের যে লাঠি বা টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সেটাকে 'আরাইল' বলা হয়।

*বাংলাদেশের প্রাচীনতম লোকপ্রযুক্তি ঢেকি*

উক্ত 'আরাইল' পূর্বে স্থাপিত দুটি কিলার উপর বসাতে হবে। কিলা হচ্ছে পাশাপাশি দুটি ছোট আকারের কাঠের গুড়ি যার উপর 'আরাইল' বসানো হয়। সামনে যেখানে ঢেঁকির মসল বা 'পঅল' রয়েছে সেখানে ঢেঁকির দুপাশ থেকে দুটি লম্বা কাঠের খুঁটি গেড়ে দিতে হবে যাতে ঢেঁকি পাশে কোথাও যেতে না পারে। ঢেঁকির পাশের কাঠের উক্ত খুঁটি দুটিকে বলা হয় 'ঘাসাইন্যা'।"[১৫]

ঢেঁকি বানাতে মূলত প্রয়োজন একটি লম্বা কাঠ, দুই ঘাসাইন্যা, দুটি কিলা, একটি বর্গাকারের পঅল, একটি মসল ও একটি আরাইল।

ঢেঁকি নিয়ে বাংলায় সাহিত্যে গান, ধাঁধা, প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে অনেক। উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে–

"শুঁড় দিয়ে করি কাজ, নই তবু হাতি
করি পরের উপকার, তবু খাই লাথি। উত্তর : ঢেঁকি।

সেদিক দিয়ে কক্সবাজারের লোকসাহিত্যের পণ্ডিতেরাও পিছিয়ে নেই। তাই তাঁরাও সৃষ্টি করেছেন লোক ধাঁধা। যেমন-

"ইলত লুডে বিলত লুডে
লেচত ধইললে ফালদি উড়ে।" উত্তর : ঢেঁকি।"[১৬]

www.pathagar.com

## ৯. লাঙল

"নাকলঅর (লাঙলের) ইশ দরিয়ারকূল, ইসকুল।"
এটি কক্সবাজার জেলার শিশুদের একটি জনপ্রিয় ছড়া। শিশুরা খেলার ফাঁকে ফাঁকে এই ছড়া কাটতো।
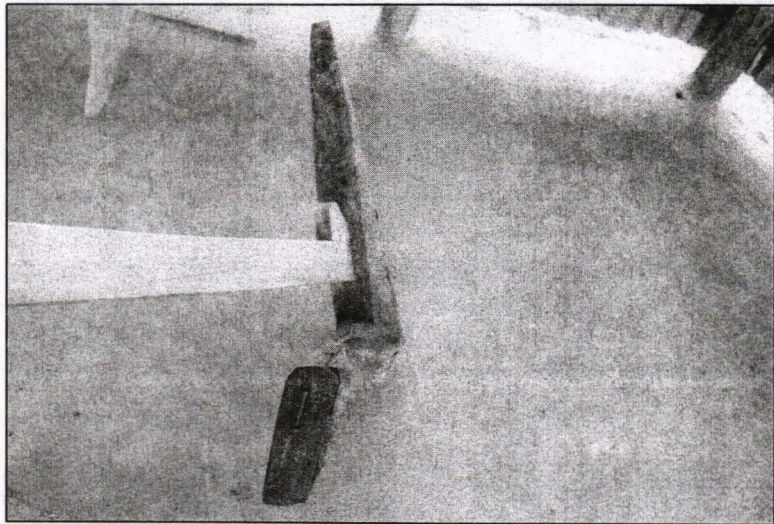
*কক্সবাজারে রামুতে একজন সুতার লাঙল তৈরি করছে*

www.pathagar.com

কক্সবাজার রামুতে নতুন করে তৈরি একটি লাঙল যাচাই করছেন

একজন কৃষক লাঙল জোয়াল কাধে মাঠে যাচ্ছেন

www.pathagar.com

প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিকাজের তথা চাষাবাদের অন্যতম ও প্রধান উপকরণ কাঠের লাঙল। জেলার প্রায় বাড়িতেই এই লাঙল ছিল। বর্ষাকালে বিশেষ করে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ভোরে গ্রামে বের হলেই দেখা যেতো রাখাল, দিনমজুর বা কামলা বা কৃষক গরুর পেছনে পেছনে লাঙল-জোয়াল কাঁধে নিয়ে মাঠে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য জমি চাষ দেওয়া। জমি চাষ দিয়ে খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা। খাদ্য-শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে নিজে যেমন আহারের সংস্থান করেন তেমনিভাবে অপরের জন্য শস্য উৎপাদন করেন। কিন্তু বর্তমানে লাঙল-জোয়াল ক্রমে আমাদের গ্রামীণ জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। দেখা যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জাদুঘরে গিয়েই লাঙল-জোয়াল দেখাতে হবে। কলের লাঙল বা ট্রাক্টর আমাদের শেকড়ের কাঠের লাঙলের স্থান দখল করে নিচ্ছে। তবে এখনো জেলার কোথাও কোথাও প্রাচীন লোকপ্রযুক্তির লাঙল দেখা যাচ্ছে। এই লাঙল দিয়েই চাষাবাদ করছে। বর্তমানে কাঠের লাঙলের উপযোগিতা কমে আসছে কলের লাঙল ব্যবহৃত হওয়ায়। লাঙল তৈরি হয়ে থাকে লোকপ্রযুক্তিতে।

লাঙল তৈরির প্রধান ও অন্যতম উপকরণ কাঠ ও লোহার ফাল। কক্সবাজার জেলা বনভূমি প্রধান এলাকা হিসেবে দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া ছাড়া অপরাপর উপজেলায় লাঙল তৈরির কাঠের সংকট কোনো কালেই ছিল না।

লাঙল তৈরি করার জন্য কাঠের যে উপকরণগুলো প্রয়োজন হয় তা হচ্ছে যথাক্রমে- ১. গাদা (লাঙলের ফাল যেখানে আটকাতে হয় তাকে গাদা বলে), ২. ঈশ, ৩. কুড়ি।

দুই ফুট পুরো বা গোলাকার একটি কাঠকে লাঙলের বাঁকা অংশ থেকে সামনের দিকে দুই পারা (দুই পা) লম্বা এবং পিছনের দিকে বাঁকানো খুঁটি পর্যন্ত তিন পারা পরিমাণ কেটে ও চেঁছে চেঁছে লাঙল তৈরি করতে হয়। তবে কক্সবাজারের বনাঞ্চলে লাঙলের গাদার ন্যায় কাঠ পাওয়া যায়। ফলে গোলাকার বা দুই ফুট বেড়ের কাঠ প্রয়োজন হয় না। কাঠের বাঁকানো অংশে একটি ছিদ্র করে চার হাত বা ছয় ফুট লম্বা একটি ঈশ যুক্ত করতে হয়। ঈশ চেপ্টায় দুই থেকে তিন ইঞ্চি ও পাশে (বেদ) এক থেকে দেড় ইঞ্চি হয়ে থাকে। গাদা তৈরি করার পরেই ঈশ কেটে, চেঁছে তৈরি করে রাখতে হয়। ঈশকে চেঁছে মসৃণ করতে হয়, যাতে ঘষাঘষিতে গরুর শরীরে কাঠের আশ ঢুকতে না পারে। ঈশের পেছনে অন্তত দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি ভেতরে মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র করতে হয়। উক্ত ছিদ্রে গাদার সাথে ঈশ যুক্ত করার পরে একটি পেনা দিয়ে শক্ত করে আটকাতে হয়। পেনা হচ্ছে একটি কাঠের তৈরি পেরেক। ঈশের পেছনের অংশে পেনা দিতে হয় যাতে ঈশ লাঙলের মূল অংশ তথা গাদা থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে। ঈশ গাদার যে ছিদ্র দিয়ে যুক্ত হয় সেখানে ঈশের উপরে একটি খিল দিয়ে ঈশটিকে আরো শক্ত করে নিতে হয়। অন্যথায় জমিতে চাষ দেওয়ার সময় ঈশটি নড়াচড়া করতে পারে। ঈশ নড়াচড়া করলে গরুর কাঁধে ব্যথা পায়। জোয়াল নড়াচড়া করলে গরুর কাঁধে ঘাঁয়ের সৃষ্টি হয়। ঈশের সাথে খিল দিয়ে লাঙলের খর বা মাড়া নির্ণয় করা হয়। লাঙল বেশি খর হয়ে লাঙলের ফাল বেশি মাটির ভেতরে প্রবেশ করে, আর মাড়া হলে লাঙল মাটির ভেতরে বেশি ঢুকে না। লাঙল মাড়া হলে জমিতে ভাল চাষ হয় না। জমিতে ভাল চাষ না হলে ভাল ফলও হয় না। সে জন্য লাঙল বেশি খরও

www.pathagar.com

করতে নেই আবার মাড়াও করতে নেই। ইশের অগ্রভাগের কিছুটা নিচে থাকে কয়েকটি খাঁজকাটা। উক্ত খাঁজকাটা স্থানে রশি দিয়ে জোয়ালের সাথে লাঙলের সংযোগ স্থাপন করা হয়। এদিকে গাদার সামনের সুচালো অংশে কামারের দোকান থেকে কিনে আনা ফাল লাগাতে হয়। ফালের অগ্রভাগও সুচালো থাকো। তবে পূর্বেই গাদাতে ফাল বসাবার জন্য ছুতার তার হাতিয়ার দিয়ে ফালের আকৃতি করে খুঁদে নেবে। উক্ত ফাল লাগানোর মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ লাঙল তৈরি হয়ে যায়।"[১৭] জমি চাষকরা তথা লাঙল নিয়েও কক্সবাজারের সৃষ্টি হয়েছে লোকধাঁধা। যেমন-

"হরা, ব ব্ব, তি তি
এ তিন কথার অর্থ কি?" উত্তর : বাম, ডান ও সোজা।
"হাড়ের ঘোর ঘোর
ফাঁড়ের মেড়ি
ছ চোখ তিন ফড়ি।" উত্তর : মানুষ ও গরু।"[১৮]

দুটি গরু ও একজন মানুষ জমিতে চাষ দিচ্ছে একথাই এখানে বুঝানো হয়েছে। সে জন্য দুটি গরু ও একজন মানুষের দুইটি করে ছয়টি চোখ ও তিন ফড়ি। আঞ্চলিক শব্দ 'ফড়ি' হচ্ছে মলদ্বার বা গুজ্যদ্বার।

## ১০. কামারের হাপর

কামারের হাপর তৈরি শুরু থেকেই সভ্যতার সাথে যুক্ত হয়েছে। আদিম মানুষ পাথরে পাথরে ঘর্ষণের মাধ্যমে আগুন সৃষ্টি করে আগুন উৎপাদন শিখেছে। যা পরবর্তীতে মানব সভ্যতার বিকাশের একটি ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে মানুষ লোহার ব্যবহার শিখে। মানুষ আগুন জ্বালানোর শিক্ষা গ্রহণ করার পরেই লোহাকে আগুনে পুড়িয়ে, গলিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করার মাধ্যমে সভ্যতার বিকাশে অবদান রাখে। পৃথিবীতে লোহাকে পিটিয়ে বর্ম তৈরি করার দৃষ্টান্ত অনেক পুরোনো। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা সাবা'র ১০ ও ১১ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেছেন এভাবে, "আর আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছি (এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছি) যে, পূর্ণমাপের বর্ম তৈরি করো এবং বুনন করার ক্ষেত্রে যথাযথ পরিমাণ রক্ষা করো।" একই সাথে পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা আল-আম্বিয়া'র ৮০ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেছেন এভাবে, "আর আমি তাকে তোমাদের উপকারার্থে বর্ম নির্মাণ শিল্প শিখিয়েছিলাম, যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত থেকে রক্ষা করে, তাহলে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে?"[১৯] লোহাকে গলিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করার প্রয়োজনেই হাপর তৈরি আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আর তখনই মানুষ হাপর বানাতে উদ্যোগী হয়। কক্সবাজারের বিভিন্ন উপজেলায় কামারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সাথে রয়েছে আগুন জ্বালানোর হাপর। কিন্তু জেলার কোথায় হাপর তৈরি করা হয় না। হাপর তৈরির সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। একটি হাপর বানাতে কমপক্ষে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা প্রয়োজন। কক্সবাজারের কামারেরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনেই চট্টগ্রাম থেকেই হাপর কিনে আনে। হাপর তৈরি করতে প্রয়োজন কাঠের তক্তা, গরু বা হরিণের চামড়া, কিছু পেরেক বা তারকাটা।"[২০] প্রাচীনতম প্রযুক্তির মধ্যে হাপর একটি।

www.pathagar.com
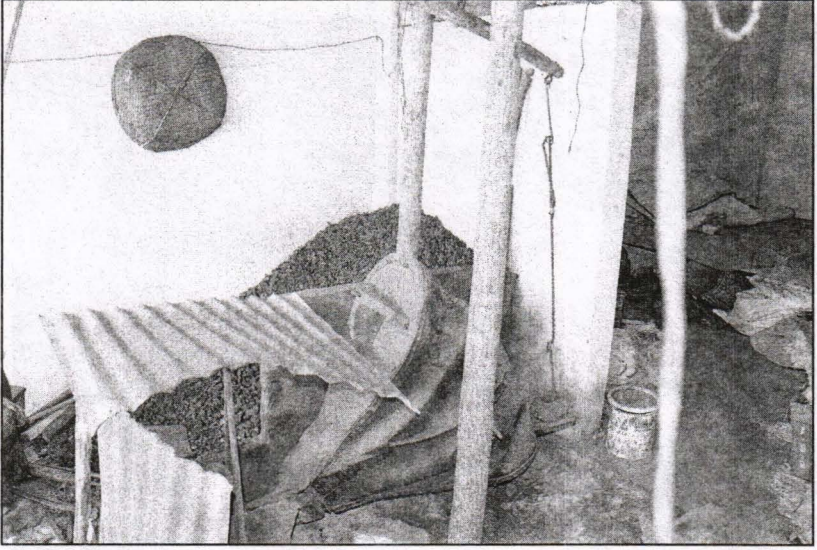
*কক্সবাজারের রামুতে একটি কামারের হাপড়*

## ১১. ধান মাড়াই কল 'ডলইন'

'ডলইন' কক্সবাজারের আঞ্চলিক শব্দ। মূলতঃ 'ডলা' বা 'পিসা' বা ধান থেকে চাল বের করার যন্ত্রটাকেই 'ডলইন' বলা হয়। মুদ্দা কথা ডলাডলি করার কারণেই এই মাড়াই কলটাকে 'ডলইন' বলে। এই 'ডলইন' হচ্ছে একটি লোকপ্রযুক্তি। এই 'ডলইন' ছিল প্রাচীনকালে জেলার একমাত্র ধান মাড়াই কল। প্রতিটি সম্পন্ন পরিবারেই 'ডলইন' নামক ধান মাড়াই কল থাকা অপরিহার্য। বিশেষ করে প্রতিটি কৃষক পরিবারেই 'ঢেঁকি'র পাশাপাশি 'ডলইন' থাকা বংশ বুনিয়াদের প্রতীক ছিল। ঢেঁকি ছাটা চাউল ছিল গ্রামের একমাত্র ব্যবহার্য। তবে চাউলগুলো ঢেঁকিতে যাওয়ার আগেই 'ডলইন' দিয়ে মাড়াই করা হয়। তবে যাদের 'ডলইন' নাই তারা সরাসরি ঢেঁকিতেই ধান থেকে চাউল করে নিজেদের প্রয়োজন মিঠাতো। তবে ঢেঁকিতে ধান থেকে চাউল করতে গেলে চাউলের পরিমাণ কমে যায়। কমে যায় বলতে চাউল বেশি ভেঙ্গে যায়। এসব ধানে চালের গুড়োর (স্থানীয় ভাষায় খুত) পরিমাণ হয়। ফলে গ্রামের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজনসহ সম্পন্ন কৃষকরা ধান মাড়াইয়ের জন্য ডলইনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অবশ্যি শতাব্দী প্রাচীন আগে 'যাতা' দিয়ে ধান থেকে চাউল বের করা হতো। একই ভাবে মোটাদানার লবণও যাতাতে পিসিয়ে মিহি করে ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে যুগের পরিবর্তনের পালা বদলে আসে 'ডলইন' নামক অদ্ভুদ ধরনের ধান মাড়াই কল।

www.pathagar.com
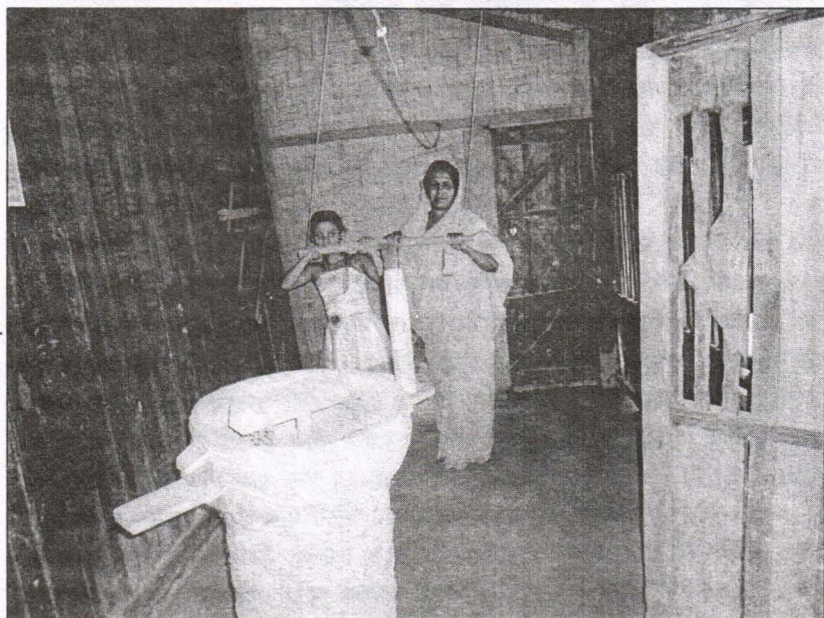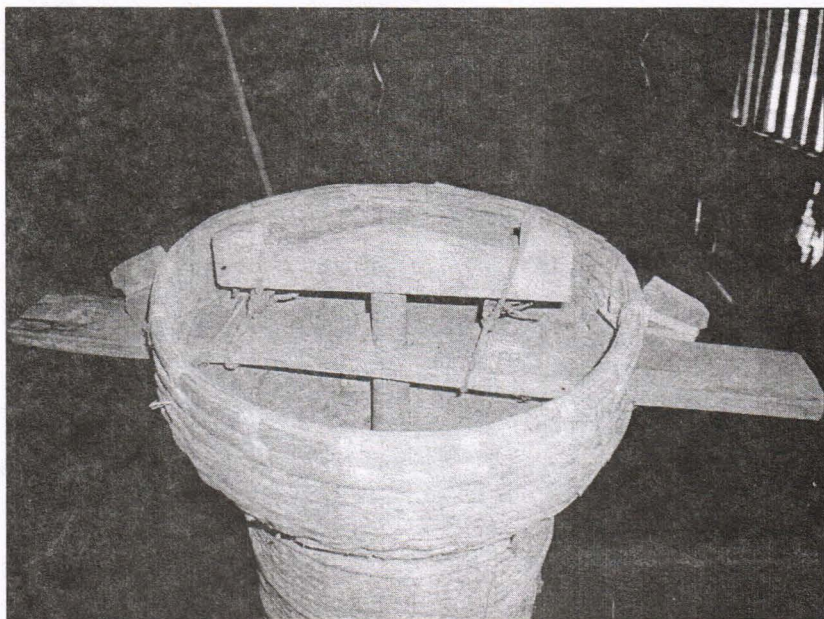
কক্সবাজার জেলার প্রাচীনতম লোকপ্রযুক্তি ধানমাড়াই কল 'ডলইন'

www.pathagar.com

'ডলইন' একাধিক অংশে বিভক্ত। ডলইনের মূল অংশে রয়েছে দু'টি পৃথক অংশ। তৎমধ্যে রয়েছে মূল অংশ ও হাতলযুক্ত অংশ। ডলইনে একটি নীচের অংশ, অপরটি উপরের অংশ। উপরের অংশে রয়েছে ধান ভর্তি করার একটি বাক্স। এছাড়াও উপরের অংশের দুইপাশে দুইটি হাতলযুক্ত রয়েছে। ডলইনের পৃথক অংশটি হচ্ছে লম্বা হাতাবারি বা ঘুরানি। এই ঘুরানির সাথে সংযুক্ত থাকে একটি গোলাকার কাঠের হাতল। যে হাতলে ধরেই ধান মাড়াই করা হয়। একসাথে সর্বোচ্চ দুইজন ধান মাড়াই করতে পরে। তবে একজনও ধান মাড়াই করতে পারে। হাতল ধরেই টান দিলেই পুরো ঘুরানিটা ডলইনকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ধান মাড়াইয়ের ব্যবস্থা করে।

ডলইন তৈরি করার প্রধান উপকরণ কাঠ ও মাটি। তবে মাটির সাথে মিশিয়ে বাইরের খোল বা বাঁশের চাটাইয় লেপন করার জন্য গরুর গোবরও প্রয়োজন হয়। ডলইন যদিওবা ছুঁতারেরাই তৈরি করে থাকেন কিন্তু তার মধ্যেও ডলইন তৈরির জন্য কিছু বিশেষায়িত ছুঁতার রয়েছে। সব ছুঁতার ডলইন তৈরি করতে পারে না। তবে ডলইন তৈরির ছুঁতারের হাতিয়ার আসবাবপত্র তৈরি করার ছুঁতারের মতো এতো অধিক পরিমাণের প্রয়োজন পড়ে না। ডলইন তৈরি করার ছুঁতারের হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োজন দা, গদু দা, বাইশ (বাইশ একটি হাতিয়ারের নাম। বাইশ দেখতে কোদালের মতো, তবে বাইশ দিয়ে কাঠ ছাঁচা যায়), বাড়িল, মাত্তুল (হেমার), কাঠ ছিদ্র করার বুরুং বা সুঁচালো রডসহ অন্যান্য হাতিয়ার।

ডলইন তৈরি করতে প্রথমে প্রয়োজন বিভিন্ন সাইজের কাঠ। প্রয়োজন অনুসারে কাঠগুলো সংগ্রহ করে প্রথমেই ডলইনের পায়া কেটে খুঁটি তৈরি করতে হয়। তিন ফুট লম্বা, ৮ ইঞ্চি উচ্চতা ও ৬ ইঞ্চি চওড়া বা বেদের কাঠের রদ্দা বা লগ কেটে ডলইনের পায়া নিতে হয়। আয়তাকার কাঠের লগ কেটেই ডলইনের খুঁটি তৈরি করা হয়। ডলইন চারটি খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। দুইটি কাঠকে পরস্পর ক্রস করে ডলইনের খুঁটি তৈরি করা হয়। এরপরে পায়া (খুঁটি) যেখানে ক্রস হয়েছে সেখানে একটি ১০ ইঞ্চি থেকে এক ফুট ব্যাসের অপর একটি খুঁটি লম্বালম্বি ভাবে প্রতিস্থাপন করতে হয় যাতে পায়ার মধ্যখানে উপরের খুঁটিটি মজবুত করে গেঁথে থাকে। লম্বালম্বি খুঁটিকে কেন্দ্র করে ডলইনের নিম্নের অংশটি তৈরি করতে হয়। লম্বালম্বি খুঁটিটিকে স্থানীয় ভাষায় 'মালুম' বলা হয়। মালুম হচ্ছে ডলইনের মধ্যমণি। এই মালুমকে কেন্দ্র করেই ডলইনের উপরের বক্সটি চারপাশে ঘুরতে থাকে। বলা যায়, এই মালুমই ডলইনের বক্সকে স্থির রাখে। আরবি শব্দ 'মোয়াল্লিম' বা 'মুয়াল্লিম' শব্দ থেকে 'মালুম' শব্দটি এসেছে। মোয়াল্লিম অর্থ শিক্ষক হলেও এক্ষেত্রে মুয়াল্লিম অর্থ পরিচালক। যার নেতৃত্বে মানুষ কোথাও গমন করেন। যেমন হাজ্জি সাহেবরা মোয়াল্লিমের নেতৃত্বে পবিত্র হজ্জ পালন করার জন্য মক্কা মোকাররমায় গমন করেন। ফলে বলা যায়, মোয়াল্লিম হচ্ছেন হাজ্জি সাহেবদের পরিচালক। এক্ষেত্রে 'মালুম' হচ্ছে ডলইনের পরিচালক বা কেন্দ্রবিন্দু। পায়ার উপরে একটি গোলাকার তক্তা বসাতে হবে। উক্ত তক্তার মুখবন্ধ আকারে বাঁশের তৈরি গোলাকার একটি ফ্রেইম তক্তা সাথে চারপাশে বসাতে হবে। এই মালুমটি প্রায় ৩ ফুট লম্বা। ফ্রেইম বসাবার পরে মধ্যখানের খুঁটির সাথে পরস্পর সমান দূরত্ব রেখে খাড়া ভাবে কাঠের তক্তা বসাতে হবে। কাঠের তক্তাগুলো অপরদিকে বাঁশের তৈরি গোলাকার ফ্রেইমের সাথে আটকে থাকে। এরপরে প্রতিটি ফাঁকে এঁটেল মাটি

www.pathagar.com

দিয়ে বাঁশের ফ্রেইম ভরে দিতে হবে। মাটি এমনভাবে ভরতে হবে যাতে কোনো ছিদ্র না থাকে। প্রয়োজনে কাঠের ফাঁকে ফাঁকে মাটিগুলোকে মাত্তুল বা হেমার দিয়ে অপর একটি সুঁচালো তক্তা দিয়ে শক্ত করে আটকাতে হবে। এর মাধ্যমে ডলইনের নিচের অংশ তৈরি হয়ে গেলো। এরপরে ডলইনের উপরের অংশ বা বক্সটি তৈরি করতে হবে। বক্স তৈরি করারও পদ্ধতি প্রায় একই রকম। তবে এরমধ্যে একটু ভিন্নতা লক্ষণীয়। উপরের অংশ তথা বক্সে থাকে দুটি হাত বা কান। উক্ত কানে ছিদ্র রাখতে হয়। যেখানে লম্বা হাতল দিয়ে ডলইনের বক্সকে ঘোরানো হয়। ডলইনের উপরের অংশও নিচের অংশের সমান একটি বাঁশের ফ্রেইম তৈরি করে নিতে হবে। তবে উপরের ফ্রেইমটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যা দেখতে একটি বোতলের মুখের অংশের মতো দেখায়। একটি আস্ত বোতলের ঠিক অর্ধেক ভেঙ্গে মুখের অংশটি উপুড় করে দিলে যেরকম হয় ঠিক সেভাবে তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ নিচের দিকে ছোট উপরের দিকে মুখটি বড় করতে হবে। একই সাথে উপরের অংশের সাথে একটি কাঠের বর্গাকারের বক্স তৈরি কতে সংস্থাপন করাতে হবে। এরপরে নিচের অংশের মধ্যখানের ফাঁকা অংশে মাটি ঢুকাতে হবে। মাটি খুব ভালভাবেই আটকতে হবে যাতে কোনো ছিদ্র না থাকে। ধান মাড়াই করার সময় যেনো মাটি পড়ে না যায়। শুরুতে ডলইনের পায়ার সাথে প্রতিস্থাপিত খুঁটির অগ্রভাগে বাদুরা স্থাপন করতে হবে। বাদুরার নিচের দিকে মধ্যখানে একটি ছিদ্র করে মালমের অগ্রভাগে স্থাপন করতে হবে। ফলে মালুমটা এমনভাবে তৈরি করতে যাতে গোড়ার দিকে তেকে ক্রমে উপরের দিকে আসতে আসতে সুঁচালো হয়। মালুমের সুঁচালো অংশেই বাদুরা বসাতে হয়। বাদুরার দুপাশে গ্রুপ কেটে দুটি রশি দিয়ে হাতলের সাথে শক্ত করে বাঁধতে হবে যাতে ডলইন ও মালুম পরস্পরের সাথে সম্পর্ক রাখে। বাদুরার মাধ্যমেই ধান মাড়াই কালে ডলইন বেলেন্স রক্ষা করে। আগেভাগে সাড়ে ৫ ফুট বা ৬ ফুট লম্বা একটি কাঠের শক্ত লাঠি তৈরি করে রাখতে হবে। যাকে স্থানীয়ভাবে ঘুরানি বলা হয়। উক্ত ঘুরানির এপ্রান্তে আড়াই থেকে তিন ফুট লম্বা অপর একটি কাঠের গোলাকার মসৃণ কাঠি যুক্ত করতে হয়। যাতে স্থানীয় ভাবে হাতল বলা হয়। উক্ত কাঠের কাঠির মধ্যখানে ছিদ্র করে লম্বা ঘুরানিটি তারমধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে যাতে ধান মাড়াই কালে লম্বা হাতলটি বিছিন্ন না হয়। ঘুরানির অপর প্রান্তে একফুট থেকে সোয়া ফুট লম্বা কাষ্টখণ্ড যুক্ত করতে হবে। উক্ত কাষ্টখণ্ডের নিন্মপ্রান্তের অংশটি দা দিয়ে সুঁচালো করতে হবে। উক্ত সুঁচালো অংশকে ফুয়ালি বলা হয়। ফুয়ালিটি চার থেকে ছয় ইঞ্চি হয়ে থাকে। উক্ত ফুয়ালিটি ডলইনের হাতের ছিদ্রযুক্ত স্থানে ঢুকানোর মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ডলইন তৈরি হয়ে গেলো।"[২১] ডলইনের বক্সে ধান দিয়ে লম্বা হাতল ধরে ডলইনকে ঘোরালে ডলইনের উপরের ও নিচের অংশের ঘষাঘষিতে ধান ফেটে চাউল বের হয়। এসব চাউল ডলইনের উপরের ও নিচের সংযোগস্থল থেকে বেরিয়ে নিচে ডলইলের চারপাশে পড়ে যাবে। এভাবে ধান ফেটে চাউলগুলো ক্রমেই নিচে পড়তে থাকে। এ জন্যই কক্সবাজার জেলায় ধান মাড়াইকল 'ডলইন' নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে লোকধাঁধা। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

"চাইরগান টেং দুইয়ান হাত
ভিতরে দাত মাথাওয়া গাত
গালে খাই কেইলে হাগে।" উ : ঢলইন (ধান মাড়াই কল)।"[২২]

www.pathagar.com

## ১২. পানের বরজ

কক্সবাজার অঞ্চলের প্রাচীনতম লিখিত ইতিহাস বা রিপোর্ট হচ্ছে ফ্রান্সিস বুকাননের ভ্রমণকাহিনি। ড. ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৯৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ট্রেডের নির্দেশক্রমে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা ভ্রমণ করেন। ১৭৯৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে তিনি কক্সবাজার ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ৩১ মার্চ জেলার মহেশখালি দ্বীপ ভ্রমণে যান এবং সেখানে চারদিন অবস্থান করেন। তাঁর সম্পূর্ণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রায় দুইশ বছর পর ১৯৯২ সালে উইলিয়াম ভ্যান স্যাডলের সম্পাদনায় ঢাকাস্থ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড হতে প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সিস বুকাননের গবেষণাধর্মী বা বিশ্লেষণমূলক বিস্তারিত কোন জীবনী এখনও প্রণীত হয় নি। তাঁর গবেষণামূলক বুদ্ধিবৃত্তিক বহু কর্মই প্রকাশিত হয়েছে যা বাংলার ইতিহাসকে আমাদের কাছে অনেক বেশি স্বচ্ছ করতে সক্ষম হয়েছে। যার কারণে তাঁর জীবনী আজ বাংলার ইতিহাসের উৎসের একটি প্রয়োজনিয় অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

(ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৬২ সালে স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। গ্লাস্কো বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রাজুয়েশন লাভের পর তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করে ১৭৮৩ সালে এম. ডি. (ডক্টর অব মেডিসিন) ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনের সূচনালগ্নে তিনি জাহাজের ডাক্তার হিসেবে এশিয়া এবং পশ্চিম ভারতীয় দেশসমূহ ভ্রমণ করেন। অতপর ১৭৯৫ সালে তিনি বার্মার রাজধানী আভাতে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ক্যাপটেন মাইকেল স্যামের চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তখন তিনি বার্মা এবং আন্দামানের সমাজ জীবনের নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন যা পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বার্মা মিশনের কাজ শেষে তাঁকে মেঘনা নদীর মোহনায় পাটাহাট নামক স্থানে বদলি করা হয়। সেখানে তিনি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা ভ্রমণ করে মশলা চাষের উপযোগী স্থানসমূহ অনুসন্ধানের নির্দেশ লাভ করেন। ১৭৯৮ সালের ২রা মার্চ তিনি যাত্রা শুরু করেন এবং একই সালে ২১শে মে ভ্রমণ শেষ করেন। এটাই তাঁর দ্বারা পরিচালিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম জরিপ।)

ফ্রান্সিস বুকানন ভ্রমণকালে তিনি দ্বীপে পানচাষীদের দেখতে পান। এব্যাপারে তিনি কোম্পানির কাছে যে রিপোর্ট প্রদান তার অংশ বিশেষ নিম্নে প্রদান করা হলো।

"ভোরবেলা আমি দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্ব পরীক্ষা করার জন্য বের হলাম। প্রথমে আমি গোরকঘাটার চর দিয়ে অগ্রসর হলাম যেখানে কেবল লোনা পানি। স্থানীয় জনগণ বলল চরের ওপর দিয়ে যে জোয়ার আসছে তা তাদের ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে এবং অর্থনৈতিক অসংগতির জন্য তারা সেখানে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করতে পারছে না। আদিগঞ্জ (আদিনাথগঞ্জ? আদিনাথ গঞ্জের বর্তমান বাজারের নাম গোরকঘাটা বাজার) হতে আনুমানিক এক মাইল পশ্চিমে পুকুরের কাছে ডুমসাগাকাতালু[12] নামে পরিচিত একটি উচ্চ ভূমি রয়েছে যার প্রান্ত বৃষ্টির পানি চলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ঢালু এবং যার মাটি অত্যন্ত ভাল। পানির অভাবে এ জমিতে কোন চাষাবাদ হয় নি, তবে তার এক জায়গায় একটি পানের বরজ বা বাগান রয়েছে। আমি অনুমান করতে পারলাম এই জমিটা পরীক্ষামূলকভাবে মশলা চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত জমি।

www.pathagar.com

*কক্সবাজারের পান বরজের দৃশ্য*

www.pathagar.com
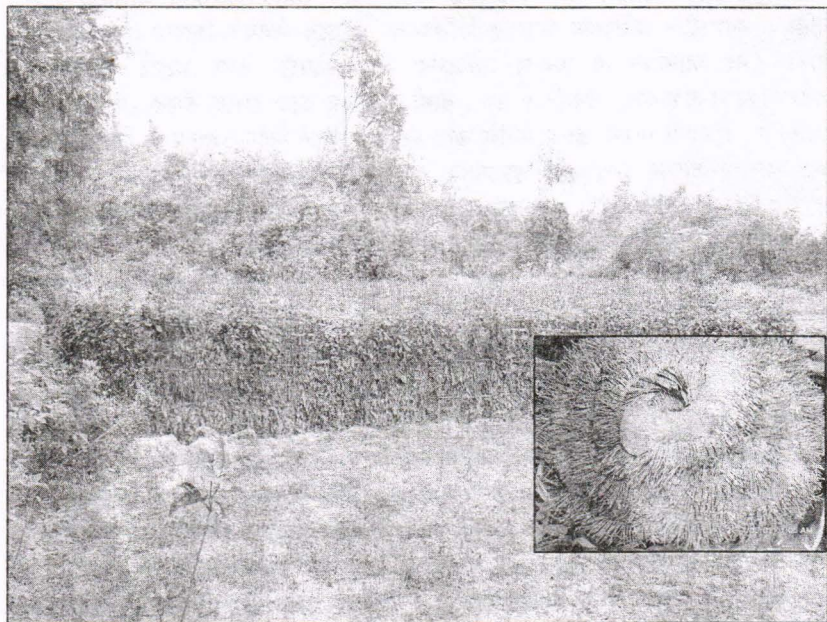
পান খুব বেশি স্পর্শকাতর গুল্ম এবং এর আবাদ করতে হলে খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয়। যে জমির ওপর পানের চাষ করা হয়েছে তাকে অবশ্যই উঁচু করতে হয়। ভাল করে চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দুই হাত প্রস্থ সামান্য উঁচু বীজতলা তৈরি করতে হয় যায় দুই পাশে অগভীর পরিখা তৈরি করা হয় যাতে করে সহজে পানি ধরে রাখতে পারে। দুই পরিখার মাঝখানে উঁচু মাটির সারির মধ্যে দুই বিঘাৎ পর পর পানের লতা (বীজ) লাগানো হয়। অতপর ৮ ফুট লম্বা কাটি প্রত্যেক লতার পার্শ্বে খাড়া করে পুঁতে দেওয়া হয় যাতে করে সে কাটির ওপর ভার দিয়ে লতাটা ওপরে উঠতে পারে। অনেকগুলো কঞ্চি বা কাটি আড়াআগিভাবে কাটির ওপরে মাচার মতো করে বেঁধে দেওয়া হয় যার ওপর খড় বা ছন দিয়ে সূর্য্যের কিরণ যেন প্রবেশ করতে না পারে। এটা ভুল, যে সুগন্ধিযুক্ত গুল্মে সূর্যের কিরণ প্রয়োজন হয়। এ ধরনের স্পর্শকাতর উদ্ভিদের বাগানে যেন অবাধে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য বাগানের চারদিকে খেজুর পাতা বা খড়ের বেড়া দেওয়া হয়। পানের লতা বা গাছ লাগানোর জন্য চারদিকে খেজুর পাতা বা খড়ের বেড়া দেওয়া হয়। পানের লতা বা গাছ লাগানোর জন্য সবচেয়ে উত্তম মৌসুম হচ্ছে আষাঢ় মাস অর্থাৎ জুন মাসের শেষ এবং জুলাই মাসের প্রথম দিকে এবং আনুমানিক নয় মাস পর বাগান হতে পূর্ণাংগ বা পাকা পান তোলা যায়। পান একটি দীর্ঘস্থায়ী গুল্ম। একটি বাগান হতে সকল মৌসুমে বহু বছর ধরে পান তোলা যায়। পানের বাগান বা বরজ অত্যন্ত পরিষ্কার রাখতে হয় এবং এর তলায় প্রতি বছর নতুন মাটি দিতে হয়। কিন্তু পশুর বিষ্ঠা পানের গুল্মের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আমি এলাকায় স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রচলিত একটি কুসংস্কার প্রত্যক্ষ করেছি এবং তা হলো তারা পান বাগানের মাঝখানের একটি বড় লালচে পাতা বাহারের গাছ লাগায় যা লাল অগ্রভাগ বাগানের ছাউনির উপরে দেখা যায় এবং তারা মনে করে উক্ত গাছ বাগানকে নানারকম রোগব্যাধি হতে রক্ষা করে। এ জন্যই তারা এটাকে 'পানরাজা' বলে।"[২৩]

উপরের বর্ণনাটি দেয়া হলো কক্সবাজার অঞ্চলে বিগত দুই থেকে সোয়া দুইশত বছর পূর্বেও যে পানের চাষ হতো তা দেখার জন্য। হতে পারে তারও আগে থেকেই পান চাষ হতো।

"পান জেলার অন্যতম অর্থকরী কৃষি ফসল। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেও কৃষক সমাজ বাৎসরিক দু'শ কোটি টাকার পান জেলায় উৎপাদন করেছে। বর্তমানে জেলায় ৬,৮৮৬ একর জমিতে পান চাষ করা হয়। জেলার কুতুবদিয়া থানা ছাড়া অবশিষ্ট ৬ থানায় কম-বেশি পানের চাষ করা হয়। তবে মহেশখালি, টেকনাফ, উখিয়া ও কক্সবাজার সদরে পানের চাষ বেশি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মাটির তারতম্য অনুযায়ী মহেশখালির পানের একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মহেশখালির মিষ্টি পান নিয়ে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় গান পর্যন্ত রচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেই পান রপ্তানি পণ্যের তালিকাভুক্ত হয়। সর্বপ্রথম ১৯৭৫-৭৬ সালে ৬ লাখ ৮২ হাজার টাকার পান রপ্তানির মাধ্যমে যাত্রা শুরু। প্রতি বছর পান রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে বৈ কমে নি। পাকিস্তান প্রধান পান আমদানিকারক

www.pathagar.com

দেশ। এছাড়াও যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, সযুক্ত আরব আমিরাত, হংকং, ফ্রান্স, কাতার, ইতালি, কুয়েত, ভারত, জার্মান, থাইওয়ান, বাইরাইন, কানাডা ও ওমানে বাংলাদেশের পান রপ্তানি হয়।"[২৪]

কক্সবাজারের মহেশখালির পান নিয়ে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের রাণী নামে খ্যাত প্রয়াত শেফালী ঘোষ যে গান গেয়েছেন তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

'যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম
মহেশখাইল্যা পানর খিলি তারে বানাই খাওয়াইতাম।'

পান একটি লতা জাতীয় উদ্ভিদ। পানের খাদ্যমান যেমন রয়েছে তেমনিভাবে রয়েছে এর ভেষজমান। পান এনজাইম হিসেবেও কাজ করে বলে কথিত।

পান চাষের জন্যে পান চাষিদের তৈরি করে নিতে হয় পান বরজ। আর এই বরজের অন্যতম অংশ হচ্ছে ছাউনি ও তার চারপাশের ঘেরা। পানের বরজে প্রয়োগ হয় লোকপ্রযুক্তি। অনেক ক্ষেত্রেই লোকপ্রযুক্তির পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধিত হলেও পানের বরজের ছাউনির ক্ষেত্রে কোনো রূপ পরিবর্তন আসে নি। পান মূলতঃ পাহাড়ি ঢালু জমিতে ভাল উৎপন্ন হয়। যেসব জমিতে বৃষ্টির পানি জমে থাকে না এমন ভূমিই পান চাষের আদর্শস্থান। সেদিক দিয়ে জেলার কুতুবদিয়া উপজেলা ছাড়া অবশিষ্ট ৭টি উপজেলাই পান চাষের আদর্শস্থান।

পানের বরজ তৈরির উপকরণ হচ্ছে বাঁশের সরু লম্বা কাঠি, বাঁশের চটা, খড় প্রভৃতি।

পান চাষের জমি নির্ধারণ করে নিয়ে আগাছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। এরপরে মাটি খুঁড়ে নিয়ে মাটির আঁড়ি (বেড) তৈরি করতে হবে। আঁড়ি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে পাশাপাশি দুইটি আঁড়ির মধ্যখানে কমপক্ষে একহাত ফাঁকা থাকে। বলা যেতে পারে এমনভাবে করতে হবে যাতে একজন মানুষ সহজেই দুইটি আঁড়ির মধ্যখান থেকে হাটাচলা করতে পারে। পানের পরিচর্যা করতে পারে, পানের আগাছা পরিষ্কার করতে পারে, তুলতে পারে পরিপক্ক পান। এরপরে প্রতিটি আঁড়িতে লাইন করে বাঁশের বা কাঠের কঞ্চি বা সরু কাঠি পুঁতে দিতে হবে। কাঠিগুলো দুভাবেই পানের বরজে কাজ করে। আর তা হচ্ছে প্রতিটি কঞ্চিতে পানগাছ আঁটকাতে হয় যাতে গাছটি উপরের দিকে বেয়ে উঠে যেতে পারে। তবে পানের গাছ কঞ্চি বেয়ে উপরে উঠলেও তাকে বেশি উঠতে দেয়া হয় না। তাকে কঞ্চি থেকে নামিয়ে চাকার মতো করে মাটি ফেলে দেয়া হয়। পানের লতার চাকা মাটিতে ফেলার ফলে পানের লতার চারপাশেই শিকড় গজিয়ে নতুন করে পান গাছ বেয়ে উঠে। এতে করে মনে করা হয় কয়েক সারি করে পান গাছ লাগানো হয়েছে। অপরদিকে কঞ্চিটি উপরের ছাউনির একটি খুঁটি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পরে বরজের চারপাশে ছোট ছোট বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা দিতে হবে। উক্ত ঘেরার সাথে বাঁশের তর্জা দিয়ে ঘেরা দেয়া হয় অথবা খড় বা ছনের ঘেরা দেয়া হয় যাতে ভেতরে কি আছে তা বাইর থেকে দেখা না যায়। অনুরূপভাবে বরজের উপরে ছনের ছাউনি দেয়া হয় যাতে সূর্যের প্রখর তাপ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে।"[২৫]

www.pathagar.com

## তথ্যনির্দেশ

১. মুকুন্দ জলদাস, পিতা : চন্দ্রকুমার জলদাস, মাতা : হরিবালা জলদাস, বয়স : ৫৫ বছর, গ্রাম : জলদাস পাড়া, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১৫-০৪-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।
২. জাহানারা বেগম, এম ইউ পি, প্যানেল চেয়ারম্যান, ডুলাহাজারা ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রাম : ডুমখালি, উপজেলা : চকরিয়া। তারিখ : ১০.১১.২০১৩, সময় : সকাল সাড়ে ৯টায়।
৩. ছৈয়দ আলম, পিতা : কবির আহমদ, মাতা : সোনা মেহের, বয়স : ৪৮ বছর, গ্রাম : দারিয়ারদিঘী বড়ডেবা (বরডেবা), ইউনিয়ন : খুনিয়াপালং, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২১-০৫-২০১৪, সময় : বেলা ১১টা।
৪. কক্সবাজারের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-১৬১।
৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬২।
৬. মোহাম্মদ আলী, পিতা : আজগর আলী, বয়স : ৯০ বছর, গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাক, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১০-০৪-২০১৪, সময় : সকাল-সাড়ে ৯টা।
৭. মোহাম্মদ হোসেন, পিতা : মোহাম্মদ সিকান্দর, মাতা : জরিনা খাতুন, বয়স : ৬৫, গ্রাম : কোদালিয়াকাটা, ইউনিয়ন : ইদগড়, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০১-০৪-২০১৩, সময় : বেলা-১১টা।
৮. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-৭৪।
৯. ডা. মায়ে নু, স্বামী : ডা. পুচে নু, শিক্ষক, কক্সবাজর মেডিকেল কলেজ, বয়স : ৫২ বছর, স্থায়ী ঠিকানা : পূর্ব বাজারঘাটা, কক্সবাজার পৌর এলাকা, কক্সবাজার, তারিখ : ২৩-০৩-২০১৩, সময় : সকাল-সাড়ে ৯টা।
১০. শ্রীমন্ত কর্মকার, ৩১, পিতা : সুধীর কর্মকার, মাতা : নীলু বালা কর্মকার, গ্রাম : উত্তর মিঠাছড়ি চা-বাগান, ইউনিয়ন : জোয়ারিয়ানালা, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২১-০৪-২০১৪, সময় : দুপুর ১২টা।
১১. কক্সবাজারের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-১৪৯।
১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫২।
১৩. জেবর মুল্লুক, পিতা : সুলতান আহমদ, মাতা : মাহমুদা খাতুন, বয়স : ৭০, গ্রাম : দারিয়ারদিঘী, ইউনিয়ন : খুনিয়াপালং, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৬-০৫-২০১৩, সময় : দুপুর- সাড়ে ১২টা।
১৪. কক্সবাজারের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-১৪৫।
১৫. ছাবের আহমদ, পিতা : ফরুখ আহমদ, মাতা : ধলু বিবি, বয়স : ৫৯ বছর, গ্রাম : পশ্চিম উমখালী, ইউনিয়ন : দক্ষিণ মিঠাছড়ি, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১৭-১০-২০১৩, সময় : সকাল : ১০টা।
১৬. কক্সবাজারের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-১৫৬।
১৭. জালাল আহমদ, পিতা : আবদুল করিম, মাতা : জরিনা বেগম, বয়স : ৫২ বছর, গ্রাম : পূর্ব রাজারকূল, ইউনিয়ন : রাজারকূল, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ০৬-০৫-

www.pathagar.com

২০১৩, সময় : বেলা ১১টা।

১৮. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-৪২।

১৯. তাফহীমুল কুরআন, ৭ম-৮ম খণ্ড,- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র., অনুবাদ : মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রমাণী, ঢাকা, প্রকাশ -১৬তম প্রকাশ, মে ২০১২। অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৪।

২০. শ্রীমন্ত কর্মকার, ৩১, পিতা : সুধীর কর্মকার, মাতা : নীলু বালা কর্মকার, গ্রাম : উত্তর মিঠাছড়ি চা-বাগান, ইউনিয়ন : জোয়ারিয়ানালা, উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ২১-০৪-২০১৩, সময় : দুপুর ১২টা।

২১. মোহাম্মদ আলী, পিতা : আজগর আলী, বয়স : ৯০ বছর, গ্রাম : দক্ষিণ লরাবাক, ইউনিয়ন : জালালাবাদ, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, তারিখ : ১০-০৪-২০১৩, সময় : সকাল-সাড়ে ৯টা।

২২. কক্সবাজারের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-১৫৮।

২৩. দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮) (কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর ভ্রমণ)- ভেলাম ভান সেন্দেল সম্পাদিত, অনুবাদ : সালাহউদ্দিন আউয়ুব, প্রকাশক : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, রুম ১১০৭, কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৭১-৭২।

২৪. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কক্সবাজারের অবদান- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, বাঁকখালী প্রকাশনী, ঢাকা-কক্সবাজার, দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৫৪ (গ্রন্থ প্রকাশিত তথ্যগুলো ১৯৯৫ সালের। বর্তমানে পানচাষের আওতায় জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও সেসময় জেলায় উপজেলার সংখ্যা ছিল ৭টি। ২০০২ সালে পেকুয়া নতুন উপজেলায় উন্নীত হয়ে জেলায় উপজেলার সংখ্যা ৮টিতে দাঁড়িয়েছে)।

২৫. এইচ এম জহিরুল ইসলাম, পিতা : গোলাম হোসেন, মাতা : জরিনা বেগম, বয়স : ২৮, গ্রাম : তেতৈয়া, ইউনিয়ন : খুরুশকূল, উপজেলা : কক্সবাজার সদর, জেলা : কক্সবাজার, সহাকারি সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, কক্সবাজার, তারিখ : ১০-১১-২০১৩, সময় : সকাল-১০টা।

www.pathagar.com

# লোকভাষা

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত জেলা কক্সবাজার। জেলার পূর্ব পাশে রয়েছে আন্তর্জাতিক নদী নাফ এবং তার পূর্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বার্মা। সে-দেশের স্বৈরশাসক বার্মা নামটি পরিবর্তন করে বর্তমানে দেশটির নাম মিয়ানমার করেছে। কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলা সংলগ্ন ভূখণ্ডটি (যা বর্তমানে মিয়ানমারের অধীন) ছিল স্বাধীন আরাকান। আর সমগ্র কক্সবাজার, বান্দরবান জেলা বর্তমান বাংলাদেশের কিছু এলাকা ছিল স্বাধীন আরাকান রাষ্ট্রের অধীন। কক্সবাজার বিমানবন্দর সংলগ্ন নাজিরারটেক থেকে শুরু করে টেকনাফ উপজেলার বদরমোকাম (সাম্প্রতিক সময়ে যা নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরের ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে) পর্যন্ত ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত। জেলার পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে গিরিকুন্তলা বনানীর সবুজ শ্যামলিমা শোভিত গভীর জঙ্গল আর পশ্চিমে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর। প্রাকৃতিক সম্পদ, পর্যটনশিল্পসহ সম্পদের সমাহারে কক্সবাজার দেশি-বিদেশি মানুষের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। জেলার ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ইতিহাস বহু পুরোনো।

প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম ও আরাকান (বর্তমান মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশ যা চট্টগ্রামের মানুষের কাছে রোসাঙ্গ নামে বেশি পরিচিত ছিল) ছিল অভিন্ন রাজ্য। এই দুই রাজ্যের সেতুবন্ধন ছিল বর্তমান কক্সবাজার এলাকা। কক্সবাজার এলাকার আঞ্চলিক ভাষা চাটগাঁইয়া, যাকে আমরা বৃহত্তর চট্টগ্রামের ভাষা বলে থাকি। চাটগাঁইয়া ভাষার নিজস্ব একটি স্বকীয়তা আছে, আছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। রোসাঙ্গ নিয়ে স্থানীয়ভাবে অনেক লোকসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের চর্চা ও উত্থান হয়েছে রোসাঙ্গ রাজসভায়।

সে সূত্রে আদি-চট্টগ্রাম ও আরাকানের ইতিহাসের সঙ্গে কক্সবাজারের আদি-ইতিহাসের যোগসূত্রের সন্ধান করেন ড. আবদুল করিম, আবদুল হক চৌধুরীসহ অনেকেই। কালে বহু বিদেশি-বিভাষি শাসক-শোষক ও রাজা-বাদশাহর হাত বদলে এই ভূ-খণ্ড। সর্বশেষ ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন হিরাম 'কক্স'-এর নামধারণ করে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে চলছে এ অঞ্চল।"[১]

কক্সবাজারের বর্তমান জনগোষ্ঠির মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও (বড়ুয়া, রাখাইন, চাক ও তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের লোকজনের বাস রয়েছে) স্বল্প সংখ্যক খ্রিষ্টান রয়েছে। এসব খ্রিষ্টান ধর্মান্তরিত বিধায় তাদের নিজস্ব ভাষা বলতে বাংলা বা স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা। তবে উখিয়া-টেকনাফের সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকা উখিয়ার মাদারবুনিয়া থেকে টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নের তেলখোলা পর্যন্ত এলাকায় কিছু সংখ্যক চাক ও

www.pathagar.com

তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের লোকজনের বসবাস রয়েছে। এই চাক সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলা ছাড়াও কক্সবাজারের আঞ্চলিক ভাষায় এবং যারা পড়ালেখা করছে তারা মানভাষায় কথা বলতে পারে। তবে এটা সঠিক যে, এসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি তাদের কোনো কোনো আদি আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ভুলে যেতে বসেছে। জেলায় বসবাসকারি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় হচ্ছে রাখাইন সম্প্রদায়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বি রাখাইনরা তাদের পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। এমনকি তাদের সম্প্রদায়ের দুজনের মধ্যে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাদের ভাষাতেই কথা বলে। তাদের দাবি তাদের ভাষা রাখাইন ভাষা। তাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। তবে তাদের ভাষাকে বার্মিজ ভাষা থেকে পৃথক করা যায় না। বর্ণমালাও বার্মিজ। ভবিষ্যতে যদি কোনো রাখাইন পণ্ডিত, গবেষক বার্মিজ ভাষা থেকে তাদের ভাষাকে পৃথক করতে পারে তখন তাদের নিজস্ব ভাষা হিসেবে স্বকীয়তা থাকবে। রাখাইনরা তাদের ভাষা ছাড়াও স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। ফলে জেলায় বৃহত্তর চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা তথা উপ-ভাষার পাশাপাশি রাখাইন ভাষা তথা বার্মিজ ভাষা ও চাক সম্প্রদায়ের ভাষা প্রচলিত।

দেশের অন্যান্য অংশের লোকজন কক্সবাজারের মানুষ সম্পর্কে একটি অপবাদ দিয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে, দুজন কক্সবাজারের স্থানীয় বাসিন্দার মধ্যে সাক্ষাৎ হলে তারা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। এটা সঠিক যে, বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে দুজন কক্সবাজারের বা বৃহত্তর চট্টগ্রামের মানুষের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে তারা স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। বৃহত্তর চট্টগ্রামের লোকজন মনে করে, রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলার পাশাপাশি তাদের রয়েছে নিজস্ব মাতৃভাষা। অর্থাৎ বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসী মনে করে যে, তাদের দুটি মাতৃভাষা। একটি রাষ্ট্রীয় মাতৃভাষা 'বাংলা', অপরটি নিজস্ব মাতৃভাষা স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা তথা কথ্যভাষা। যেভাবে রাখাইন, চাক, চাকমা, মার্মা, মুরুংসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি মাতৃভাষায় কথা বলে অনুরূপভাবে কক্সবাজারের লোকজনও তাদের মাতৃভাষায় কথা বলে।

ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাসের ন্যায় কক্সবাজারের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মধ্যযুগের আরাকানের অভিন্ন রাজ্য হওয়ায় আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্যের প্রভাব তৎকালিন কক্সবাজারকেও আলোকিত করেছিল। শুধু তাই নয়, গবেষণায় দেখা গেছে কক্সবাজার অঞ্চলে পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের মানুষের আগমন ঘটেছিল। এখানে আগমন ঘটেছে তুর্কি, চীনা, আরবিয়, পাখতুন, পাঞ্জাবি, পাঠান, পারস্য অঞ্চলের অগ্নি উপাসক আর্য, দ্রাবিড়, মধ্য ভারতীয়, নিগ্রো, মঙ্গোলীয়, আলপাইনীয়, আর্মেনীয়, নর্ডীয়, সাঁওতাল, রোহিঙ্গা, রাখাইন, মার্মা, বড়ুয়া, মগ, চাকমা, চাক, মুরং, উরিয়া, ত্রিপুরা, ইংরেজ, পর্তুগিজ, ডাচ, ভুটিয়াসহ অনেকের। এছাড়াও রয়েছে অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে নৌকাডুবি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত আরবিয় মুসলমান, যা পরে স্থানীয় জনগোষ্ঠির সংমিশ্রণে বর্ণ শংকর জাতি হিসেবে রূপ নিয়েছে তারা। স্থানীয়ভাবে তাদেরকে তাম্বুইরগা মগ (প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলমান। তাদের আচার-আচরণ আরাকানের মগ সম্প্রদায়ের মতো বিধায় তাদেরকেও মগ বলে অভিহিত করা হয়) বলা হয়। এসব সম্প্রদায়ের সাথে এসেছে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি। এর ফলে কক্সবাজার অঞ্চলের ভাষা, শব্দভাণ্ডার, সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ।"[২]

www.pathagar.com

এখানকার মানুষের মন ও মনন পুথি-পাণ্ডুলিপি ও লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতিতে লালিত। এখনো এই এলাকার গ্রামে-গ্রামে পুঁথির আসর বসে, শোনা যায় নানান রোমান্টিক কাব্যকথা। কবির লড়াই, হঁওলা, হাইল্যাসারিসহ হরেক রকমের গ্রামীণ সংস্কৃতির চর্চা হতে দেখা যায়। তদুপরি সমুদ্র ও অরণ্য প্রভাবিত অঞ্চল হিসেবে এখানকার লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যও বৈচিত্র্যময়। যদিও আকাশ সংস্কৃতি, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিসহ আধুনিক সংস্কৃতির নামে এসব তৃণমূলীয় মানুষের প্রাণের সাংস্কৃতিক স্পন্দন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে।

বৃহত্তর চট্টগ্রামের উপভাষার একই ভাষাগোষ্ঠির ও একই গোত্রীয়-কক্সবাজারের উপভাষা বাংলাদেশের প্রমিত বাংলা ভাষা থেকে তো বটেই-এমনকি দেশের বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক ভাষা থেকে এতই পৃথক যে একে একটি আলাদা 'ভাষা' বলা যায়।

এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা বাংলা উপ-ভাষার এক অনন্য সংযোজন। এ ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিবৈচিত্র্য ও গঠন সম্পর্কে ভাষা-তাত্ত্বিক আলোচনায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) মন্তব্য করেন যে, 'চট্টগ্রামের-কথ্যভাষা বড়ই অদ্ভুত... । লিখিত ভাষার সহিত উহার বৈষম্য খুবই বেশি। এত বেশি যে, চেষ্টা করিলে আসামীয়াদের মতো আমরাও অনায়াসে পৃথক ভাষার সৃষ্টি করিতে পারিতাম।'"[৩]

একটি অঞ্চলের পৃথক ভাষার যে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দরকার, শব্দভাণ্ডার ও এর প্রয়োগ এবং প্রকরণগত যে বিশিষ্টতা ও চারিত্র্য দরকার–তা এ অঞ্চলের উপভাষায় বিদ্যমান। হয়তো এ কারণেই এখানকার উপভাষা সম্পর্কে এ ধরনের একটা ধারণা এখনো লক্ষ করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে, উপভাষা হচ্ছে কোনো এলাকায় বা ভৌগোলিক সীমায় কথিত কোনো বিশেষ রূপ, যা উচ্চারণে, ব্যাকরণগত গঠনে এবং বাগধারার ব্যবহারে সাধু বা সাহিত্যিক ভাষা থেকে যথেষ্ট পার্থক্যপূর্ণ, যে পার্থক্য যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য, তবে পার্থক্য অতটা অধিক নয় যার ফলে সে ভাষার অন্যান্য উপভাষার চেয়ে তাকে একটা পৃথক মর্যাদা দেয়া যায়, উপরে বর্ণিত সংজ্ঞার (Pei and Gaynor, Dictionary of Linguistics, New York, 1954) নিরিখে কক্সবাজারের আঞ্চলিক কথ্যভাষাকে আলাদা 'ভাষা'র মর্যাদা দেয়া না গেলেও এ উপভাষার যে বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষযোগ্য।

ক. উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য যেমন–

১. অল্পপ্রাণ স্থলে মহাপ্রাণ (বোন-ভোন/ভইন, পানি/ফানি, তামাসা/ঠঁসা)।

২. মহাপ্রাণ অল্পপ্রাণে পরিবর্তিত (কোথায়- কড়ে)।

৩. নাসিক্য ধ্বনির প্রভাব (আমার-আঁর, তোমার-তোঁয়ার বা তর, কুমার-কুঁআর, ঠমক-ঠঁঅক, থামি-থাই।)

খ. সংক্ষিপ্ততা

কৈছালি/ কৈ মাছ ছাইয়ে পড়লে যেরূপ ছটফট করে তেমনি কোন উদ্বেগে প্রাণ ছটফট করাকে কৈছালি বলা হয়। (যেমন কৈছালি ন গরিছ)।

www.pathagar.com

কুঁইজ্জা/ খড়ের গাদা বা উঁচু স্তুপ বিশিষ্ট খড়ের গাদা। (খড়ের গাদা নিয়ে স্থানীয়ভাবে ধাঁধাও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- এক্কান হাড্ডি, একমণ গোস্ত; ভাংগি ন পাইললে মনরে বুঝদঅ।)

পান্ লা/মনে হয়। (যেমন-হয় পান লা, নয় পান লা।)

চঁঅরা গাই/ চাঁদ মারা গাভী, চাঁদের চিহ্ন অংকিত বস্তুত, যেমন- গরু-ছাগলের কপালে বা লেজের সাদা চিহ্নকে 'চঁঅরা' বলা হয়।

কালাইট্যা/ ঘরের চাল ছাওয়ার সময় পুরোনো শনের বা খড়ের শলা বিশেষ। (যেমন-চালের (ঘরের ছাউনি) কালাইট্যা ফেলি দে)।

গ. শব্দার্থ বৈচিত্র্য

গম - বাংলায় প্রচলিত অর্থে 'গম' খাদ্য বিশেষ। কিন্তু কক্সবাজারের আঞ্চলিক অর্থে 'ভালো'। (যেমন-'আঁই গম আছি'। বাংলায় 'আমি ভালো আছি')।

ঘ. শব্দ গঠন

তুয়াঙ্গর (ধনী) - তোয়ান+গর (প্রত্যয় যোগ)। যেমন- হিতারা বেশি তুয়াঙ্গর/ তারা বেশি ধনী।

পেরাইল্যা - পেরা (জলাভূমি) + ওয়ালা/অইল্লা= পেরার অধিবাসী। উপকূলীয় এলাকার যেখানে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সৃষ্টি হয় তাকে পেরা বা পেরাইল্যা বা পেরাপাত্তি বলা হয়।

আফুয়াইদ্যা - ফুয়াদ নয় অর্থে, বিস্বাদ। যেমন- আফুয়াইদ্যা ছালন/ তরকারি স্বাদ হয় নি।"[৪]

"কক্সবাজার জেলাসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য এতই বিচিত্র যে, সমগ্র এলাকার প্রায় বিশ মাইল অন্তর এ ভাষার অভ্যন্তরীণ একাধিক উপ-ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। কর্ণফুলী নদীর দুই পাশের জনগোষ্ঠির ভাষার স্বতন্ত্র উচ্চারণ-রীতি ও অর্থগত তারতম্য এই উপভাষাসমূহের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে। দেখা যায় যে, কর্ণফুলি নদীর উত্তর পাশের মিরসরাই-সীতাকুণ্ড এলাকার সঙে হাটহাজারি-রাউজান-রাঙ্গুনিয়া এলাকার ভাষার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। আবার পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালি ও সাতকানিয়া-লোহাগাড়া এলাকার সঙে মিরসরাই-সীতাকুণ্ড ও হাটহাজারি-রাউজান-রাঙ্গুনিয়া এলাকার ভাষার তফাৎ আছে। একইভাবে কক্সবাজার এলাকার ভাষা উপরোক্ত এলাকাগুলোর ভাষা থেকে অনেকটাই আলাদা। শুধু কি তাই, কক্সবাজার জেলার অভ্যন্তরে মহেশখালি দ্বীপ ও সীমান্ত শহর টেকনাফ উপজেলার ভাষা ও উচ্চারণেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় দেখা যাবে যে, মিরসরাই-সীতাকুণ্ড এলাকার ভাষা নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষা দ্বারা প্রভাবিত। তদ্রুপ কক্সবাজার এলাকার ভাষা রোসাঙ্গ বা রোহিঙ্গাদের উচ্চারণরীতি দ্বারা প্রভাবিত। ফলে কক্সবাজার এলাকা বৃহত্তর চট্টগ্রামের অন্তর্গত হয়েও আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণরীতি ও অর্থগত তারতম্যের ফলে চট্টগ্রামের অন্য এলাকা থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচনের ক্ষেত্রেও এই স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে।

www.pathagar.com

সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম (১৮৭১-১৯৫৩), সাংবাদিক-সাহিত্যিক মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী (১৮৯৪-১৯৫১), ভাষাবিজ্ঞানী ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২), শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করেছেন। কবি ওহীদুল আলম (১৯১১-১৯৯৮), সাংবাদিক নুরুল ইছলাম চৌধুরী (১৯৩৩-১৯৮৬) ও ছড়াকার নূর মোহাম্মদ রফিক চট্টগ্রাম অঞ্চলের শব্দ সংগ্রহ করে গেছেন। তাতে দেখা যাবে যে, বহু শব্দ চট্টগ্রামের অন্য এলাকায় প্রচলিত আছে, কিন্তু কক্সবাজার এলাকায় নেই। আবার এমন অনেক শব্দ কক্সবাজার এলাকায় প্রচলিত আছে যা চট্টগ্রামের অন্য এলাকায় নেই। কক্সবাজার এলাকার অঞ্চলিক শব্দগুলোর এক বিরাট অংশ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দ হলেও উচ্চারণরীতি ও অর্থগতভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র।

বাংলা সাহিত্যের অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতের ধারণা কক্সবাজার অঞ্চলে মহাপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার নেই। বিশেষ করে ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ বর্ণের ব্যবহার বা উচ্চারণ কক্সবাজারে নেই। কিন্তু তাঁদের এধরনের ধারণা সঠিক নয়। কক্সবাজার অঞ্চলের কথা-বার্তায়, প্রবাদ-প্রবচনে মহাপ্রাণ শব্দের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। এখানে দেখা যেতে পারে, কক্সবাজারে 'ঘর' শব্দকে 'ঘর'ই উচ্চারণ করে। 'ঘর'কে 'গর' উচ্চারণ করে না। অনুরূপ 'মধু'কে 'মধু'ই উচ্চারণ করে, 'মদু' উচ্চারণ করে না। 'ঘিঁইর বাসে ছালা বেচা যায়' এখানে ঘি উচ্চারণ করে 'গি' নয়। 'ঝরে বগা পরে' এখানে 'ঝরে'ই উচ্চারিত হয়, 'জরে' নয়। 'ঝরে'র স্থলে 'জরে' হলে শব্দার্থই বদলে যাবে। একই ভাবে 'ঢেই' কে 'ঢেই'ই উচ্চারণ করে,'ডেই' নয়। একই ভাবে ধ বা ভ এর ক্ষেত্রের তাই।"[৫]

যেমন আরো দেখা যেতে পারে যে কক্সবাজারের কোনো কোনো এলাকায় বাক্যটির উচ্চারণ এভাবে, "বুইজ্জ্যা কুঁইজ্জ্যাত্তু গইজ্জ্যাই গইজ্জ্যাই দইজ্জ্যাত পইজ্জ্যে।" তবে জেলার দ্বীপ-উপজেলা মহেশখালিতে উক্ত বাক্যটির উচ্চারণ একটু ভিন্ন। যেমন, "বুইরগ্যা কুইরগাততু গইরগাই গইরগাই দইরগাত পইরগে।" চট্টগ্রামের কোনো কোনো এলাকাতে মহেশখালির ন্যায় উচ্চারণের ব্যবহার দেখা যায়।"[৬]

উচ্চারণের বাচনভঙ্গি, উচ্চারণের ধ্বনি, শব্দের গাঁথুনিকে উপজীব্য করে অনেক মনীষী-পণ্ডিত কক্সবাজারের জনগোষ্ঠিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে। এই দুই ভাগ হলো চাঁডি বা চাডু ও রোয়াই বা রোমাই। চাঁড়িদের মধ্যে যেমন হিন্দু, মুসলিম বা বড়ুয়া বৌদ্ধদের উচ্চারণ, সংস্কৃতি পৃথক তেমনি রোয়াইদের মধ্যেও রয়েছে পৃথক সত্তা। চাঁড়িদের মধ্যে অনেকেই উচ্চারণ করে থাকেন, খাতুক, যাতুক, আসতুক, বসতুক। কোনো কোনো এলাকা এবং সম্প্রদায়ের লোক তাকে উচ্চারণ করেন খা, যা, আয়, বয় (বস) এভাবে। হিন্দু, মুসলিম ও বড়ুয়া বৌদ্ধরা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললেও তাদের মেধ্য রয়েছে মৌলিক তফাৎ। মুসলমানরা আগামীকালকে উচ্চারণ করে 'আইয়েদদে কাইল্যা বা 'আইয়েদদে কালিয়া', হিন্দু ও বড়ুয়ারা উচ্চারণ করে 'আইয়েদদে কালুয়া'। যা বাংলায় হবে 'আগামী কাল।'

মুসলমানেরা আরবি ভাষার ঢঙে ক্রিয়া পদের পূর্বে 'না' শব্দ ব্যবহার করে। যেমন আরবিতে ব্যবহার করে 'লা'। আরবি লা অর্থ না। ক্রিয়ার পূর্বে না বোধক অব্যয়ের প্রয়োগ স্থানীয় উপভাষার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

যেমন, ন যাইয়ুম (আমি যাব না), ন খাইয়ুম (আমি খাব না), ন লইয়ুম (আমি নেব না), ন গইজজুম (আমি করব না)।"[৭]

"পক্ষান্তরে কক্সবাজার জেলার রোয়াই সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাষার তারতম্য দেখা যায়। রোয়াই বা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি দলের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

যেমন দেখা যেতে পারে রোয়াই উচ্চারণে
'অ বদ্দা তরে মম্ মা ডাকে, লাল তম-মুচ জ-গরাইয়ে খাগাই খাগাই।'
চাড়ি উচ্চারণে
অ বদ্দা তরে মম্মা ডাকের, তরমুচ কাইট্টে খাই খাই।'
বাংলায় উচ্চারণ
'দাদা, মা তোমাকে তরমুজ খেতে ডাকছে।'
একই ভাবে রোয়াই ভাষাতে
'তারা মরে লঅরাইয়ে।'
চাড়ি উচ্চারণ
'তারা অ্যাঁরে দুরাইয়ে।'
বাংলায় উচ্চারণ
'তারা আমাকে তাড়া করেছে।'
রোয়াই উচ্চারণ
'মরেদে আছে ইয়ত ফেলাইদে।'
চাড়ি উচ্চারণ
'অ্যাঁরে ইয়ত নামাই দে।' বা 'অ্যাঁরে এন্ডে নামাইদে।'
বাংলায় উচ্চারণ
'আমাকে এখানে নামিয়ে দাও।' বা 'আমাকে এখানে নামতে দাও।"[৮]

টেকনাফের জালিয়াপাড়ায় বসবাসকারি অধিবাসী স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললেও তাদের কথার সাথে স্থানীয় লোকজনের কথার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাদের মূল পেশা নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ ধরা। গবেষকদের মতে তাদের পূর্বপুরুষ মিয়ানমারের রামব্রী এলাকা থেকে আগত। অষ্টম/নবম শতাব্দীতে উক্ত রামব্রী দ্বীপের কাছেই আরবিয় বণিকদের বাণিজ্যিক নৌবহরের কিছু বাণিজ্যিক জাহাজ সাগরে ডুবে গিয়েছিল। এখান থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকজনকে তামবুইগ্যা মগ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলমান। স্থানীয় অধিবাসীদের থাকার ফলে তাদের মূল মাতৃভাষা হারিয়ে তারা স্থানীয় ভাষার সাথে তাদের মাতৃভাষার সংমিশ্রণে একটি নতুন ভাষা ধারণ করেছে। তাদের কিছু অধস্তন পুরুষ টেকনাফে এসে আশ্রয় নেয়। তাদের কথায় যে স্বাতন্ত্র রয়েছে তা লক্ষণীয়। যেমন-অরা বেরা তুইদে আছে করে যদদে। (স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা- অ বেড়া তুই কড়ে যদদে। প্রমিত বাংলা- তুমি কোথায় যাচ্ছো।)

প্রাচীনকালে রোয়াই ও চাড়ির মধ্যে কথাবার্তা, আচার-আচরণ, সাংস্কৃতিক পরিভাষা নিয়ে বিরোধ লেগেই থাকতো। চাড়ি ও রোয়াইদের মধ্যে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ

www.pathagar.com

হওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের ইগু বা সংস্কৃতি তথা রীতিনীতি বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে চাড়ি বা চাড়ুদের পরিবারের মেয়ে বা ছেলের সাথে রোয়াই পরিবারের ছেলে বা মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে।

কক্সবাজার অঞ্চলের ভাষার মধ্যে আরবি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আকাশ-সংস্কৃতি এবং বাংলা ভাষার উপনিবেশের কারণে স্থানীয় শব্দ ভাণ্ডার মরে যাচ্ছে বা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পণ্ডিতদের মতে, প্রতি ২০ বছরে ১০টি আঞ্চলিক শব্দ মরে যাচ্ছে। পূর্বেই বলেছি অষ্টম-নবম শতাব্দীকে আরবিয় বণিকদের এ অঞ্চলে আগমনের ফলে এখানে আরবি শব্দের প্রভাব দেখা যায়।

উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে,

আরবি শব্দ 'কদয়া' স্থানীয়ভাবে বিকৃত হয়ে 'কদ্দা' হয়েছে, আরবি শব্দ 'বয়জতুন' (বাংলা অর্থ ডিম) স্থানীয় ভাবে হয়েছে 'বদা'। এই 'বদা' কক্সবাজার অঞ্চলে একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। বদা নিয়ে একটি প্রবাদও চালু আছে- 'হালার বদা শহরত আঁ্যাই (এসে) মামলেট হইয়ে। আরবি শব্দ 'লব্বায়েক' (হাজির আছি) থেকে স্থানীয়ভাবে বিকৃত হয়ে 'লব্বই' বা 'লয়' থেকে 'ল' হয়েছে। আরবি শব্দ 'জজিরা' অর্থ 'উপদ্বীপ'। উপদ্বীপ থেকে উপ শব্দ বাদ দিয়ে স্থানীয়ভাবে দ্বীপ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন 'জিনজিরা দ্বীপ' যা বর্তমানে সেন্টমার্টিন দ্বীপ নামেই খ্যাত। স্থানীয় লোকজন 'জিঞ্জিরা দ্বীপ'কে এখনো 'নারকিল জিনজিরা' নামেই অভিহিত করেন। আরবি শব্দ 'হাইওয়ান' অর্থ 'পশু'। আরবি শব্দ 'দবচ' অর্থ 'মজবুত'। আরবি শব্দ 'মুকতচর' অর্থ 'সংক্ষিপ্ত'। আরবি শব্দ 'নছিয়ত' অর্থ 'উপদেশ'। আরবি শব্দ 'মুসাফির' অর্থ 'সফরকারি (মেহমান)'। আরবি শব্দ 'জিল্লতি' অর্থ 'লজ্জা'। একই সাথে দেখা যেতে পারে 'এনতেজাম', 'এনতেজার', 'গিবত', 'তাজিম', 'দেমাক', 'ছবক', 'মকছুত', 'মুশায়েরা'সহ অসংখ্য শব্দ ভাণ্ডার রয়েছে।

এদিকে রয়েছে পর্তুগিজ শব্দ 'কুরা'। এই 'কুরা' শব্দের রয়েছে একাধিক সমার্থক শব্দ। যেমন রাতা কুরা (মোরগ), কুঁরি কুরা (মুরগি), কুরাচ্ছ (বাচ্চা), দুরুইচ্ছা কুরা, ছালইন্যা কুরা, দরকরইচ্ছা রাতা, বাক্কা রাতা, করইকুরা, করকরাদ্দে কুঁরি, বদাপারইন্না কুঁরি। বার্মিজ শব্দ 'নাব্বং'। 'নাব্বং' এর স্থানীয় উচ্চারণ 'নাফাং', যার বাংলা অর্থ 'বধির'।

এভাবে হিন্দি শব্দ থেকে এসেছে 'টাট্টি', 'মসহুর', 'পানি'সহ অনেক শব্দ। ফার্সি থেকে এসেছে 'দেমাগ', 'ইয়াদ', 'শরম', 'খোদা'। এভাবে পৃথিবীর তাবৎ দেশের শব্দ আমাদের ব্যবহার্য শব্দের মধ্যে রয়েছে।

এছাড়াও আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে রয়েছে 'ফাছা দে', 'টুনি দে', 'জান বাঁধি দে', 'অউৎ' (তরকারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে তরকারি এখনো কেউ খায় নি), 'ফট নাড়িদে', 'ওইত্তল', 'পলকামার', 'কওর', 'জুইর', 'খিল দে', 'লনদারা', 'কাইট্যা ফুতা অউল নগরিছ', 'পাইল ভাঙ্গা', 'জেরবাদি', 'ঠেঠ্ঠেলান নগরিছ', 'হৈয়াল দে', 'অইন পোয়া', 'খিয়া', 'হুদা' (হুদা হুদা ভাত খা ন যায় বা হুদা হুদা কইজ্জা নগরিছ। এখানে হুদা অর্থে কোনো কারণ ছাড়া বুঝাচ্ছে), 'করগুয়া তেল', 'করকরা

www.pathagar.com

ভাত', 'বেমক্কা', 'উধার', 'বরকন', 'হান্‌নাগ্‌গানে', 'ওম দে', 'ভাদাইম্যা', 'আতিক্কা', 'বেমক্কা' 'শরমিন্দা', 'অগ্‌গলানতি', 'লনদারা', 'ললপদানি', 'লন্ডালন্ডি', 'ফুকফাকগরি', 'খাছলৎ', 'নানদা মইষ', 'নানদা বেড়ি', 'পাইল ভাঙ্গা', 'ফিতিন', 'ফুরা মাইল্যার', 'ফুরা পইলমার'সহ অসংখ্য শব্দ রয়েছে। এসব শব্দের অনেকগুলোই ইতোমধ্যেই স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমন কিছু আঞ্চলিক শব্দ আছে বাংলা ভাষায় যার কোনো প্রতিশব্দ নেই। যেমন, 'গা হির্‌হিরার', 'গা রি রি গরের', 'গা ঝিম ঝিম গরের', 'গা চিক্কুত চিক্কুত গরের'।

ভিন্ন স্বাদের শব্দভাণ্ডার কক্সবাজারের ভাষাকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে। এমন কিছু শব্দ ভাণ্ডার রয়েছে একই শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, 'ন-ল পইজ্যে' (জমিতে পলি পড়া), 'ন-ল বাঁশ' (জমি পরিমাপ করার কাজে ব্যবহৃত হয়), 'ন-ল ফেল' (নোঙ্গর ফেলা)। আমাদের ব্যবহার্য বিভিন্ন কাপড়-চোপড়, দ্রব্য-সামগ্রী, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, খাদ্য-দ্রব্য, গাছ-পালা, ধান, শাক-সবজি, মাছ, ঘরের অবকাঠামো, ঘরের বিভিন্ন উপকরণ, ব্যবহার্য তৈজসপত্র ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে চাঁটগাইয়া ভাষায়। বিগত কয়েক যুগ পূর্বেও এসব শব্দের ব্যবহার ছিল ব্যাপক। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তা আমরা ভুলে যাচ্ছি। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এসব শব্দ ভিন্ন দেশি শব্দ হিসেবে তাদের কাছে দেখা দেবে।

## তথ্যনির্দেশ


১. কক্সবাজারের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-১০।
২. কক্সবাজারের বিলুপ্তপ্রায় লোকাচার- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-১৮।
৩. কক্সবাজারের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-১১।
৪. অধ্যাপক শফিউল আলম, 'ভাষা ও সাহিত্য'-কক্সবাজারের ইতিহাস, প্রকাশক : কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশ : ৩০ জুন, ১৯৯০ ইংরেজি, পৃষ্ঠা-১৮৭-১৮৮।
৫. কক্সবাজারের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-১১-১২।
৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০১।
৭. উখিয়ার ইতিহাস-মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রকাশক : কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১১, পৃষ্ঠা-৭৩।
৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৭-৭৮।


www.pathagar.com